সোদরাধিকাসু রামসমুদায়

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ

১৩১৫

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

স্থিতিপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! উৎপত্তি-প্রকরণের অনন্তর স্থিতিপ্রকরণ বলি, শ্রবণ কর। ইহা জ্ঞাত হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়[১]।

হে অনঘ! জগতের উৎপত্তি যদ্রূপে মিথ্যা, তদ্রূপে ইহার স্থিতিও মিথ্যা। অতএব, এই জগৎ-নামধারী চিত্তকে ও তাহার বিকার অহং-প্রভৃতিকে তুমি বস্তুভূত বিবেচনা না করিয়া, ভ্রান্তির প্রকারভেদ, সুতরাং অসৎ বলিয়া জানিবে[২]। চিত্রকর নাই, চিত্রের উপকরণ (তুলিকা প্রভৃতি) নাই, রঞ্জকদ্রব্য (রং) নাই, আধার পট নাই, কেবল আকাশে চিত্রিত, একপ এক চিত্রপটের সদৃশ এই বিস্তৃত বিশ্ব অতি অদ্ভুতভাবে বিরাজিত। ইহার দর্শকও নাই। যাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়, সেও ইহার অন্তর্গত। ইহা কেবল স্বপ্নের ন্যায় অনুভবমাত্র অথবা নিদ্রাবর্জ্জিত স্বপ্নের অনুরূপ[৩]। নগর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে শিল্পীর চিত্তক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যন্নগর নির্ম্মিত (রচিত বা কল্পিত) হয়, এই বিশ্বের নির্ম্মাণ সেইরূপ। গুঞ্জা গুটিক ও গৈরিকস্তূপ বহ্নি নহে, পরন্তু মর্কটেরা দূর হইতে তাহাতে বহ্নিজ্ঞান করিয়া শীত নিবারণ করে। তাহার ন্যায় এই বিশ্ব প্রকৃত কিছু না হইলেও অজ্ঞ জীবগণ ইহাকে বস্তু বিবেচনা করিয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব করে[৪]। ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, জলাবর্ত্তের ন্যায় ভিন্ন

স্বরূপে প্রস্ফুরিত হইলেও, সৎস্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এবং আকাশে আলোকের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, অবস্থিত নভোমণ্ডলে ভ্রমদৃষ্ট শলভপুঞ্জের ন্যায় ও পরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় আধারবিহীন, অথচ অনুভবগম্য হইলেও, সত্যবোধপ্রদ অসত্য মরীচিকার ন্যায় ও মনঃকল্পিত বিস্তৃত নগরের ন্যায় অসন্ময় এবং অতীব সারবান্ রূপে প্রতীয়মান হইলেও, কবিকল্পিত কথার্থের ন্যায় ও স্বপ্নদৃষ্ট অচলের ন্যায় অবস্থিত অথচ অসার[৭।৮]। ইহা ভূতাকাশের ন্যায় বিস্তৃত অথচ শূন্য, শরন্মেঘের ন্যায় অস্থির, এবং অশক্য-ক্ষয় অর্থাৎ অক্ষত বা অবিচ্ছিন্ন[৯]। ইহা আকাশীয় নীলিমার ন্যায় স্নিগ্ধদর্শন অথচ অবস্তু (কোন প্রকার বস্তু নহে)। স্বপ্নদৃষ্ট নারীসঙ্গম যদ্রূপ, ইহার প্রতীতিও তদ্রূপ। ইহা ভোগপ্রদান করে বটে; পরন্তু অনর্থ প্রসবের মূল[১০]। যেমন চিত্রলিখিত উদ্যান দেখিতে সুন্দর, পরন্তু তাহা নীরস ও নির্ম্মকরন্দ, তেমনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে সুন্দর, পরন্তু রসাদি পরিশূন্য। যেমন চিত্রলিখিত বহ্নি দেখিতে বহ্নির ন্যায় কিন্তু নিস্তেজ; সেইরূপ, এই বিশ্বও দেখিতে প্রকাশমান, কিন্তু নিঃসার[১১]। ইহা মনোরাজ্য ন্যায় অনুভূতিমাত্র, সুতরাং অসত্য ও অবাস্তব (স্বতঃ অসত্য এবং ফলতঃ অবাস্তব) যেমন চিত্রলিখিত পদ্মাকর (তড়াগ, পুষ্করিণী) সারসৌগন্ধ্যাদিবর্জ্জিত, তেমনি, ইহাও সারসৌগন্ধ্যাদিবর্জ্জিত[১২]। গগনে নানাবর্ণের ইন্দ্রধনুর উদয় যদ্রূপ, এই বিশ্বের উদয়ও তদ্রূপ[১৩]। শুষ্কপত্রপল্লবাদির দ্বারা পরিবৃত কদলীস্তম্ভ জড় ও অরসাত্মক, তদ্রূপ ইহাও জড় ও অরসাত্মক (শুষ্ক)। যেমন নেত্ররোগীরা * আলোকে অন্ধকারের আবর্ত্ত অবলোকন করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞান মানবেরা আত্মায় এই জগৎ অবলোকন করে[১৪।১৫]। হে রাঘব! চিত্রাঙ্কিত পদ্মের ন্যায় মকরন্দবিহীন, অন্তঃসারশূন্য এই আভোগী (কল্পিতাকার) জগৎ আপাত রমণীয়। ইহা অসৎ হইয়াও দীপ্তিশালী, অরস হইলেও রসাত্মক, উৎপত্তিবিনাশশীল, জলবুদ্বুদের ছায় ক্ষণধ্বংসী এবং বিস্তৃত নীহারপটলীর ন্যায় অথচ প্রস্ফুরিত হইতেছে। ইহা কাহারও মতে জড়, কাহার মতে শূন্যাস্পর্শী, কাহার মতে শূন্য এবং কাহার মতে পরমাণুপুঞ্জ[১৬।১৭]। ফলতঃ এই জগৎ ভূতময় না হইলেও ভূতময়, শূন্য হইলেও অশূন্যপ্রায়, এবং দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ বেতালগণের ন্যায় নিতান্ত অসদ্রূপ[১৮]।

* একরূপ নেত্ররোগকে ইংরাজীভাষায় কলার্-ব্লাইণ্ড বলে। অর্থাৎ রঙ্-কাণা মনুষ্য।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্যাসাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, কল্পকালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, কল্পাবসানে পুনর্ব্বার তাহা হইতে (বীজ হইতে) অঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হয়। জগৎ যদি সত্তাশূন্যই হয়, তাহা হইলে সেই সকল ব্যাসাদি ঋষির বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? হে ভগবন্! ঐরূপ বোধ কি কেবল অজ্ঞদিগের? অথবা জ্ঞানবান্ দিগেরও ঐরূপ মত? এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন১৯। ২০।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! যাঁহারা বলেন, এই দৃশ্যজাল বীজে অঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মে অবস্থিত থাকে, তাঁহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞ২১।* ঐ কথা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই মোহজনক। যে কারণে ঐ মত অসত্য, সে কারণ আমি বিস্তৃতরূপে বলি, শ্রবণ কর ২২। মহাপ্রলয়কালে এই জগৎ বীজে অঙ্কুরের ন্যায় অবস্থিত থাকে, এ বোধ মূঢ়গণের প্রলাপ বা জল্পনা মাত্র এবং ভ্রান্তির প্রকারভেদ। কেন? তাহা বিবেচনা কর২৩। বীজ দৃশ্য এবং তাহা হইতে যে অঙ্কুর পত্রাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়। বীজ ও অঙ্কুরাদি উভয়ই ইন্দ্রিয়গম্য। সুতরাং ধান্যাদি বীজ পত্রাঙ্কুরাদি কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে২৪। কিন্তু যিনি চিত্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, যিনি অতিসূক্ষ্ম, যাঁহার কারণ নাই, যিনি স্বয়ম্ভু, কিরূপে তিনি এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন? অর্থাৎ কিরূপে তাঁহাতে এই মূর্ত্ত জগৎ ব্যাসক্ত থাকিবেক? বা অবস্থান করিবেক?২৫। যিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, যিনি পরাৎপর ও পরমাত্মা, যিনি কোন প্রকার

---

* বশিষ্ঠ, ব্যাসাদি ঋষির উপদেশকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিতেছেন না বা ব্যাসাদি ঋষিকে সত্য সত্যই অজ্ঞ বলিতেছেন না। বলিতেছেন, দৃষ্টান্ত অংশ ঠিক্ নহে। এইমাত্র বলিতেছেন যে শ্রোতা যেন দৃষ্টান্তের অনুরূপ না বুঝে। মাত্র তাহাই বলা বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্ত বীজ ও অঙ্কুর। ব্রহ্ম বীজস্থানীয়, এবং অঙ্কুর জগৎস্থানীয়, এরূপ ভাবে বুঝিতে গেলে, লোকে যদি জগতের পৃথক্ সত্তা বুঝে, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে, এইটুকু বলাই বশিষ্ঠের উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠ পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ঐ মর্ম্ম স্পষ্ট প্রকাশ পাইবেক। বিকারী দ্রব্য ব্যতীত বীজ বলা যায় না। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার সুতরাং ব্রহ্মের বীজত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব, ইত্যাদি কথায় মনোযোগ কর, দেখিতে পাইবে, এবং বুঝিতে পারিবে, বশিষ্ঠ কি বলিতেছেন।

আখ্যায় প্রসিদ্ধ নহেন, এবং কোনও প্রকারে উপলব্ধ হন্ না, কিরূপে তাঁহার বীজতা সম্ভব হইতে পারে? ২৬। তিনি এতই সুসূক্ষ্ম যে অযোগী পুরুষের নিকট অসৎ বলিয়া বিবেচিত হন। অর্থাৎ অযোগী পুরুষেরা তাঁহার অস্তিতাও বুঝিতে পারে না। কিরূপে তাঁহাকে বীজ বলা যায়? যদি বীজতাই অপ্রমাণিত হয় তাহা হইলে অঙ্কুর কোথা হইতে হইবে? ২৭। আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, শূন্য, পরম পদে মেরু সমুদ্র গগনাদি সম্পন্ন বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিবে? ২৮। যাহা কিছু নহে, কি প্রকারে তাহাতে কিছু থাকিবেক? যাহা কোন বস্তু নহে, তাহাতে বস্তু সমুদয় কিরূপে থাকিবে? যদি থাকে, তাহা হইলে, কি নিমিত্ত তাঁহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না? যাহা কোন বস্তুই নহে, তাহা হইতে কি প্রকারে কোথায় কি বস্তু উৎপন্ন হইবে? শূন্য হইতে কি কখন পর্ব্বত উৎপন্ন হইতে পারে? ২৯। ৩০। আতপে ছায়ার ন্যায়, সূর্য্যকিরণে তিমিরের ন্যায়, অনলে হিমকণার ন্যায় ও অণুমধ্যে সুমেরুর ন্যায় সুসূক্ষ্ম পরমাত্মায় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান অসম্ভব। পরস্পর বিরোধী আতপছায়াদি পদার্থ কোনও ক্রমে ঐক্য (সহাবস্থিত) হইতে পারে না ৩১।৩২। সাকার বটবীজাদিতে অঙ্কুরের স্থিতি যুক্তিযুক্ত; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে মহাকার জগৎস্থিতি যুক্তিবিরুদ্ধ ৩৩। যাঁহারা কারণে কার্য্যাবস্থানের কথা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ কি? লৌকিক প্রমাণ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোনও প্রমাণ ঐ কথা সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। ভাবিয়া দেখ, যাহা দেশান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয়ে পরিদৃষ্ট হয়, কালান্তরে ও ব্যক্ত্যন্তরে আর তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং প্রলয়ে জগতের অবস্থিতির কল্পনা অনুভববিরুদ্ধ ৩৪। যাঁহারা ব্রহ্মকেই জগৎকার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাদেরও বোধ মোহকলুষিত। কেন না, শ্রৌত প্রমাণ, কার্য্য ও কারণ উভয়ের পৃথক্ সত্তা নির্দ্দেশ করেন না। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিতে একেরই অস্তিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। * সেইজন্য বলা যায়—যখন একই সত্তা অবধারিত,

---

* একমেবাদ্বিতীয়ং শ্রুতি কেবলমাত্র ব্রহ্মসত্তা উপদেশ করেন এবং উপদেশের তাৎপর্য্যার্থে দৃশ্য জগতের অস্তিতা নিষেধ করেন। জগৎ যদি বস্তু সৎ পদার্থ না হয় অর্থাৎ কেবলমাত্র ভ্রান্তিকল্পিত হয়, তাহা হইলে তাহার সত্তা তিনকালেই অসিদ্ধ। সুতরাং প্রলয়ে জগৎ থাকার কথা অর্থাৎ বীজবৎ সূক্ষ্মাকারে থাকার কথা ঠিক্ নহে। ঐ সকল

তখন আর কোন্ কারণে কাহার সাহায্যে কি উৎপন্ন হইবেক ?[৩৫]। * অজ্ঞানগ্রস্ত লোকেরাই বুদ্ধিমান্দ্য বশতঃ মাত্র স্বীয় পরিতোষ পোষণার্থ বৃথা কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, হে রামচন্দ্র! অজ্ঞানকল্পিত মিথ্যা জগতের মিথ্যা কার্য্যকারণ ভাব দূরে পরিহার করিয়া তুমি এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিবে যে, আদি মধ্য অন্ত বর্জ্জিত একমাত্র সত্য ব্রহ্মই এক্ষণে (সংসারাবস্থায়) জগৎ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে জগদ্ভাব, এ ভাব মিথ্যা, ব্রহ্মভাবই সত্য[৩৬]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

কথার মর্ম্মার্থে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, অরুন্ধতী প্রদর্শন ন্যায়ে অথবা শাখাচন্দ্র প্রদর্শন ন্যায়ে (যুক্তিতে) ঋষিরা জীবকে কেবল ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য ঐ সকল তটস্থ কথা বলিয়াছেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বশিষ্ঠোক্তি ও ব্যাসাদির উপদেশ সকল বলিয়া বিবেচিত হইবেক। উদ্দেশের ভিন্নতা থাকিলে উপদেশের আকার ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে বিরোধ বা পরস্পর ব্যাঘাত দোষ হয় না।

* যখন কোন পৃথক বস্তু নাই তখন ইহা কারণ, তাহা কার্য্য, এরূপ কথা কাল্পনিক ব্যতীত বাস্তব নহে।

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, তুমি তাহার তত্ত্বজ্ঞ, সেই কারণে তোমাকে আমি বলিতেছি, শুনিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে বেদ্যবিদাম্বর! যখন কোনও কিছু থাকে না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদির অতীত নির্ম্মল মহান্ চিদাকাশ মাত্র থাকে, তখন যদি তাহাতে জগতের অঙ্কুর থাকিত, তাহা হইলে বল দেখি, সেই অঙ্কুর কোন্ সহকারী কারণের বলে পুনরাবির্ভূত হইতে পারে? যদি সহকারী কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি বন্ধ্যাকন্যার অনুরূপ। বিনা সহকারী কারণে কখনও কেহ অঙ্কুরের উদ্ভব সন্দর্শন করে নাই[১।৩]। হে অঙ্গ! (সস্নেহ সম্বোধন) বিনা সহকারী কারণে অঙ্কুর সমুদিত হয়, অথবা সহকারী কারণ নাই, অথচ কার্য্যোৎপত্তি হইয়াছে, যদি কোথাও (রজ্জুসর্প ও মরু-মরীচিকা প্রভৃতিতে) এরূপ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝাই উচিত যে, একই মূল কারণ ভ্রান্তির মহিমায় জগদ্রূপে দৃষ্ট হই-তেছে[৪]। যখন সৃষ্টি আদিতেও অর্থাৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্ম আপনাতে আপনি বিরাজ করেন, তখন আর জন্যজনকক্রমের বাস্তবতা কোথায়?[৫]। যদি সহ-কারী কারণ স্বরূপ অন্য কিছু বিদ্যমান থাকিত তাহা হইলে জগতের বাস্তব উৎপত্তি অবধার্য্য হইত। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কে সহকারী কারণ ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। পৃথিবীভূত, অথবা অন্য কোন ভূত, কিংবা অন্য কিছু, সৃষ্টির সহায়তা করিবে, এ কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না, সে গুলিও পদার্থ বা উৎপন্ন দ্রব্য[৬]। অতএব, প্রলয়কালে জগৎ স্বীয় সহকারী কারণের সহিত পরম পদে বিশ্রান্ত থাকে, এ কথা অজ্ঞের উক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পণ্ডিতগণ কখনই ঐরূপ বলেন না[৭]। হে রামচন্দ্র! জগৎ হয় নাই, হইবেও না এবং বর্ত্তমানেও নাই। কেবল চেতনাকাশই ইদানীং এই জগৎ রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে[৮]। যখন জগতের অত্যন্তাভাবই অবধারিত, তখন ইহা যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার অন্যথা নাই[৯]। আপাততঃ মনে হয় বটে যে, জগৎ পরস্পর অভাবগ্রস্ত হইয়া প্রধ্বংস বা উপশম আখ্যা প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। জগৎ উপশম

প্রাপ্ত হয় না, চিত্তই উপশম প্রাপ্ত হয়। জগৎ থাকে না, এই লৌকিক কথা কেবল চিত্তের উপশমমূলক[১০]। জগৎ সত্য সত্য সমস্ত বস্তুর সহিত উপশম প্রাপ্ত বা অত্যন্তাভাবগ্রস্ত হয় বলিলেও বস্তুতঃ তাহা সম্পন্ন হয় না। কেন না চিত্ত বিদ্যমান থাকিলে সেই সমস্তের বাসনা বিদ্যমান থাকে; সুতরাং জগতের উপশম—আত্যন্তিক উপশম—অসম্ভব[১১]। হে রঘুনাথ! "জগতের সর্ব্বথা অত্যন্তাভাব হয়" ইহাতে অন্য কোন যুক্তি নাই। ঐরূপ অনর্থজনক বোধ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য[১২]। যাহাকে জগৎ সৃষ্টি বলা যায়, তাহা বস্তুতঃ চিদাকাশে বোধ বিশেষের আবির্ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই আমি, ইহা আমি নহি, তাহা আমার, এইরূপ বোধ, বিচিত্র কথার ন্যায় মিথ্যা[১৩]। সেই কল্প, সেই কল্পান্ত, সেই কল্পারম্ভ, এই মহাকল্প, এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, এই ভাব্যভাবক্রম, এই ক্ষণ, এই বৎসরাদি, এই কল্পাংশ, এই ব্রহ্মাণ্ড, এই অবনী, এই অদ্রি, এই মাস, ঋতু, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, এই জন্ম, এই মরণ, সে সমস্ত গত, এই সমস্ত উপাগত, এই সমস্ত গ্রহ, এবং এই দেশ ও সেই দেশ, তথা সে কাল ও এ কাল প্রভৃতি, অধিক কি, যে কোন ইয়ত্তা, সমস্তই একমাত্র পরাৎপর অনন্ত অনাবৃত শান্ত পরমাকাশ। সেই অনাবৃত মহাকাশ (ব্রহ্ম) ঐ সমস্তের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছেন। সেই মহাচিদাকাশের এই সকল প্রতিভাস গবাক্ষান্তর্গত পরমাণু সমূহে সহস্রাংশুর প্রতিভাসের ন্যায় পরিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই চিৎসমুদিত অন্তশ্চমৎকার প্রতিভাস, অরূপ ও অনাধার হইলেও সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে[১৪।১৯]। ইহার বাস্তব উদয় ও অস্ত নাই; ইহা জাত বা বিনষ্ট দুএর কিছুই হয় না। দূষিত দৃষ্টির দ্বারা স্ফটিকশিলায় প্রতীয়মান রেখা সন্নিবেশের ন্যায় এই সমস্ত সৃষ্টি নির্ম্মল আত্মায় স্বতঃই প্রস্ফুরিত ও দৃষ্ট হইতেছে। সলিলে দ্রবত্বের ন্যায়, বায়ুতে স্পন্দনের ন্যায়, অম্ভোনিধিতে আবর্ত্তের ন্যায়, দ্রব্য পদার্থে গুণের ন্যায় ও নভোমণ্ডলে নিরাকার নভোভাগের ন্যায় এই উদয়াস্তময় বর্জ্জিত অনন্ত জগৎ একমাত্র শান্ত অনন্ত বিজ্ঞানরূপ ব্রহ্মেই বিস্তৃত রহিয়াছে। জগৎ সহকারী কারণাদির অভাব থাকিলেও জাত হইয়াছে, এ নির্ণয় উন্মত্তের বা বালকের নির্ণয়। হে রামচন্দ্র! তুমি অবিদ্যারূপ দীর্ঘনিদ্রা দূরে বিদ্রাবিত করিয়া ভেদদর্শনস্বপ্নরহিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া বিকল্পরূপ অনন্ত শয্যা হইতে সমুত্থিত হওতঃ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত হও[২০।২২]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিয়াছি, মহাকল্পের অবসান হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা হইতে স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি প্রথমতঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হয়। সুতরাং এই জগৎও স্মৃত্যাত্মা[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মহাপ্রলয়ের অবসানে (সৃষ্টির আদিতে) প্রথমতঃ স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতি সমুৎপন্ন হন; এই জগৎ সেই স্মৃত্যাত্মা প্রজাপতির সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা সঙ্কল্পনগরের ন্যায় প্রতিভাত। সুতরাং ইহা স্মৃত্যাত্মা। কিন্তু পরমাত্মার স্মৃতি অসম্ভব, তৎকারণে তাহা আকাশীয় বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব[২।৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয় দৈনন্দিন সুষুপ্তির অনুরূপ, সেজন্য জিজ্ঞাস্য—সৃষ্টিপ্রারম্ভে পূর্ব্বকল্পীয় স্মৃতি আবির্ভূত হইবার বাধা কি? উহা কি মহাপ্রলয় সংমোহদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়?[৫]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! পূর্ব্বকল্পীয় তত্ত্ববিৎগণ—যাঁহারা ব্রহ্মাদি নামে খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা নির্ব্বাপিত, সুতরাং ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন[৬]। হে সুব্রত! বল দেখি, স্মৃতির পূর্ব্বতন কর্ত্তা কি কেহ থাকে? যে স্মরণকর্ত্তা সে মুক্ত হইলে অবশ্যই স্মৃতি নির্ম্মূলতা প্রাপ্ত হইবে। স্মরণকর্ত্তা না থাকিলে কোথায় কি প্রকারে স্মৃতি সমুদিত হইবে? ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, মহাকল্পকালে সকলকেই একপ্রকার মোক্ষভাগী হইতে হয়। যদি তাহাই হয়, তবে কি প্রকারে স্মৃতি বিদ্যমান থাকিবে?[৭।৮]। অতএব, তুমি যে জগৎস্থিতিকে হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিরূপা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, বস্তুতঃ তাহাও নহে। কেন না, যাহা জগৎস্থিতি তাহাও চিৎপ্রভা অর্থাৎ তাহাও ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিবিশেষ[৯]। অনাদি অনন্ত চিৎপ্রভাই এই জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছেন[১০]। হে মহাবাহো! যাহা অনাদিসিদ্ধ পরব্রহ্মের নিত্য নিয়মিত সত্তা বা প্রকাশ, তাহা এক্ষণে বিরাট ব্রহ্মের জগদাকৃতি আতিবাহিক দেহ। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি সমন্বিত ত্রিজগৎ পরমাণুতেই অর্থাৎ মনোব্রহ্মেই প্রতিভাত হইতেছে।

আবার সেই পরমাণুতে অর্থাৎ মনোব্রহ্মে এতাদৃশ আকারসম্পন্ন গিরিনদ্যাদি সঙ্কুল অন্যান্য জগৎ ও অন্যান্য পরমাণু এবং তাহার মধ্যে তাদৃশ আকার-সম্পন্ন গিরিনদ্যাদিসঙ্কুল অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান আছে[১১।১৪]। পরন্তু সেই সমস্ত পরমাণু তাদৃশ আকার সম্পন্ন হইলেও বস্তুতঃ কিছুই নহে। যাঁহারা সন্মাত্রদর্শী, তাঁহাদের দর্শনে ইহা অনন্ত ও কেবল সত্তা, এবং তদতিরিক্ত পুরুষের দর্শনে ইহা জগৎ বা নানাপরিচ্ছেদযুক্ত সৃষ্টি[১৫]। তত্ত্বদর্শিগণের নিকট একমাত্র অব্যয় ব্রহ্মই প্রস্ফুরিত হন, পরন্তু অজ্ঞগণের নিকট ভাস্বর ভুবনান্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হয়[১৬]।

হে রাম! প্রতিপরমাণুতেই (অর্থাৎ প্রত্যেক মনে) ঈদৃশ আকারসম্পন্ন সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন স্তম্ভের অঙ্গে পুত্তলিকা, তাহার ক্রোড়ে আবার পুত্র ও পুত্রিকা এবং তাহার ক্রোড়ে আবার অন্য পুত্তলিকা, এই ত্রৈলোক্য পুত্তলিকাকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন পর্ব্বতান্তর্গত পরমাণুপুঞ্জ পরমাণুত্বে অভিন্ন হইলেও অসংখ্য, সেইরূপ, ব্রহ্মরূপ মহামেরুতে ত্রৈলোক্যরূপ পরমাণু অভিন্ন হইলেও অসংখ্য[১৭।১৯]। যেমন সূর্য্যকিরণে অসংখ্য পরমাণু প্রস্ফুরিত হয়, সেইরূপ, চিদাদিত্যের প্রকাশে লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্যপরমাণু সমুদিত ও প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। [২০।২১]। এই আকাশ যেমন শূন্যরূপে অনুভবনীয়, তেমনি, চিদাকাশও সৃষ্টিরূপে অনুভবনীয়[২২]। ইহাকে যে সৃষ্টিভাবে দেখে তাহার নিকট ইহা সৃষ্ট, এবং যে ব্রহ্মভাবে জানে তাহার নিকট ইহা ব্রহ্ম। সৃষ্টিভাবে জানিলে ইনি জ্ঞাতাকে অধঃপাতিত করেন এবং ব্রহ্মভাবে জানিলে ইনি মোক্ষের কারণ হন[২৩]। বৎস! রামচন্দ্র! তুমি ইহাকে, বিশ্ববীজ, বিশ্বকারণ, বিশ্বশাস্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও চিদাকাশত্মক ব্রহ্ম বলিয়া জান। কেন না, যে বস্তু যাহা হইতে আবির্ভূত হয়, তাহা তাহাই। যাহা বেদ্য তাহা স্বীয় অন্তর্বোধ, এবং তাহারই অন্য অবস্থা শুদ্ধা চিৎ[২৪]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়জয়রূপ সেতুর দ্বারা এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অন্য কোন ক্রিয়ার বা উপায় দ্বারা নহে[১]। যে জিতেন্দ্রিয় ও বিবেকী, সেই ব্যক্তি শাস্ত্র এবং সৎসঙ্গ দ্বারা এই দৃশ্য বিশ্বের অত্যন্তাভাব অবগত হইতে পারে[২]। হে মনোজ্ঞশ্রেষ্ঠ! যেরূপে এই দুস্তর সংসার সাগর অপগত হয় ও হয় না, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সে সম্বন্ধে বহু বাক্য প্রয়োজন নাই; ফল কথা—কর্ম্মবৃক্ষের বীজস্বরূপ মনঃ বিনষ্ট হইলে এই সংসারবৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যায়[৩।৪]। হে রামচন্দ্র! তুমি মনকেই সর্ব্বরূপী বলিয়া জানিবে। মনঃ চিকিৎসিত হইলেই জগদ্রূপ মহারোগ প্রশমিত হয়[৫]। লোকমধ্যেও দেখা যায়, মনের লোলতা বা মনন (বিষয়াকারা বৃত্তি) প্রজাত হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু জন্মে না। মনের দেহাকারা বৃত্তিও স্বপ্নের ন্যায় উদ্ভূত হয়, তৎপরে তদনুরূপ বা তদ্যোগ্য ক্রিয়াসাধনোপযোগী দেহ জন্মে[৬]। * দৃশ্যপদার্থের অত্যন্তাসম্ভব ব্যতিরেকে অন্য কোন হেতুর বা উপায় দ্বারা শতকল্পেও মনঃপিশাচ প্রশান্ত হয় না[৭]। দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবরূপ মহৌষধই মনোব্যাধি চিকিৎসার উৎকৃষ্ট উপায়[৮]। মনই মোহগ্রস্ত হয় ও করে এবং মনই মৃত ও জাত হয়। মনঃ আপনারই চিন্তায় হয় বদ্ধ না হয় মুক্ত হইয়া থাকে। (ব্রহ্মচিন্তনে মুক্ত, অন্য চিন্তায় বদ্ধ[৯])। যেমন নিরাকার আকাশে গন্ধর্ব্বনগরাদি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, চিতে (চৈতন্যে) মনোবৃত্তির প্রভাবে এই বিশ্ব বিস্ফুরিত হইতেছে[১০]। যেরূপ পুষ্পগুচ্ছে আমোদ (সুগন্ধ), তিলকণায় তৈল, গুণীতে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, দিবাকরে রশ্মিজাল, তেজঃপদার্থে আলোক, অনলে উষ্ণতা, তুহিনে শীততা, নভোমণ্ডলে শূন্যতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা

---

* মৃত্যুকালে যাহার যেরূপ চিত্তবৃত্তি সুদৃঢ় হয়, তদ্দেহ ত্যাগের পর তাহার তদনুরূপ দেহাদি উৎপন্ন হয়। তৎপূর্ব্বেও ঐ নিয়মে দেহ হইয়াছিল। সুতরাং জন্ম মরণ প্রবাহ অনাদি।

বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ, এই জগৎ মনোমধ্যেই বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, মনই জগৎ অথবা জগতই মনঃ, উভয়ের অন্যতর বিনষ্ট হইলে অন্যতর বিনষ্ট হইয়া থাকে১১।১৫।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমুদায় ধর্ম্ম এবং ভূত ভবিষ্যৎ অবগত আছেন। অতএব, আপনি দয়া করিয়া দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টী আমাকে বুঝাইয়া দিউন যে, বহিরবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান জগৎ কিরূপে মনে অবস্থিত[১।২]। বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন ঐন্দব ব্রাহ্মণ-গণ শরীরবিহীন হইলেও তাঁহাদিগের চিত্তে জগৎপরম্পরা দৃঢ়রূপে ছিল, তেমনি, এই জগৎ মনোমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে[৩]। ইন্দ্রজাল সমাকুল লবণরাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি মনোমধ্যে জগতের অবস্থিতির অন্যতম দৃষ্টান্ত[৪]। চিরভাবিত ভোগানুরক্তির দ্বারা স্বর্গভোগেচ্ছু ভৃগুতনয়ের ভোগাধিপত্য ও চিরসংসারিত্ব যদ্রূপ, মনোমধ্যে জগতের অবস্থান তদ্রূপ, তাহাও বিদিত হইবে।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! স্বর্গভোগ উদ্দেশে ভৃগুপুত্রের কি প্রকার ভোগানুরক্তি ও সংসারিত্ব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সে সম্বন্ধে ভৃগু ও কাল উভয়ের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৫।৭]।

পূর্ব্বকালে মন্দরশৈলসানুতে ভগবান ভৃগু, অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন এবং তদীয় শিশুপুত্র তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় সেই পুত্রের নাম শুক্র এবং তিনি অতীব সুন্দরাকৃতি ও বুদ্ধি-মান্। প্রকাশ যেমন ভাস্করের সেবা করে, তাহার ন্যায় বালক শুক্র যোগাবস্থ পিতার সেবা করিতেন। ভৃগু অবিশ্রান্ত সমাধিতে নিমগ্ন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন কোন শিল্পী বনে বন্যপ্রস্তর খোদিত করিয়া প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রতিম পুত্রের চিত্ত বালকোচিত ক্রীড়ায় সদা ব্যাসক্ত ছিল। কিছু কাল পরে শুক্রের এরূপ বয়োনুরূপ অবস্থা আসিল—যে অবস্থা জ্ঞানাজ্ঞানের অন্ত-রালাবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারে। (জ্ঞান=আত্মতত্ত্বদর্শন বা মোক্ষাবস্থা। অজ্ঞান=পামর মনুষ্য প্রসিদ্ধ জগৎসত্যতা দর্শন বা ঘোর

সংসারাবস্থা। এ দুএর মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ না এদিক্ না সেদিক্ এরূপ কোন দোলায়মান চিন্তাবস্থা) ঐ অবস্থা আসিলে শুক্র ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে তাহার পিতা ভৃগু নির্ব্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইলেন৮।১৩। পিতা নির্ব্বিকল্প সমাধিগত হইয়াছেন দেখিয়া পুত্র শুক্র জিতশক্ররাজার ন্যায় নিরুদ্বেগ হইলেন। অর্থাৎ তখন আর পরিচর্য্যার প্রয়োজন থাকিল না সুতরাং অবসর পাইলেন। একদা তিনি (শুক্র) এক নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেখিলেন, পারিজাতমালাভূষিতা লোলনয়না কোন এক অপ্সরা গগন পথে গমন করিতেছেন। মৃদুমন্দ সমীরণ দ্বারা সেই অপ্সরার অলকা সকল বিচলিত হইতেছে, শরীরস্থ হারাদি অলঙ্কারের সুমধুর শিঞ্জিত হইতেছে এবং তিনি যে প্রদেশ দিয়া গমন করিতেছেন, তদীয় দেহপ্রভারূপ ইন্দুপ্রভাদ্বারা সেই প্রদেশ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

অনন্তর সেই পরমসুন্দরী অপ্সরাকে দেখিয়া শুক্রের তরল মন পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল; অপ্সরাও শুক্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত অধৈর্য্য হইল১৪।১৮। শুক্র সেই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দর্শনে মন্মথশর-নিপীড়িত হওয়াতে, তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে অন্যান্য বৃত্তি সকল বিগলিত হইল, তখন তিনি চতুর্দ্দিক সেই রমণীমূর্ত্তিই মনশ্চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন১৯।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অতঃপর ভৃগুপুত্র উশনা সেই রমণীকে স্মরণ করতঃ নিমীলিত নেত্রে বক্ষ্যমাণ প্রকার মনোরাজ্য অনুভব করিতে লাগিলেন[১]। * যেন তিনি সেই অপ্সরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যোমপথে স্বর্গে গিয়াছেন এবং সে স্থানে গিয়া যেন এই সকল দেখিতেছেন[২।৩]। আহা! এই সেই দৈবী পুরী, এই সেই সুর ও এই সেই সুন্দর সুরসেবিত স্বর্গ, এই সেই সকল মোহিনী ললনা, এই সেই দেববৃন্দ, এই মরুদ্‌গণ, এই অপ্সরাবৃন্দ, আহা! ইহাদের দেহকান্তি গলিত সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ইহারা পারিজাত কুসুমের ভূষণে বিভূষিত। আহা কি সুন্দরাকৃতি[৪।৫]! অন্যান্য দিকে দেখিতেছেন, মধুপগণ ঐরাবত-গণ্ডনিঃসৃত মদে ব্যাসক্ত না হইয়া গীর্ব্বাণগণের সুমধুর গীত একতান মনে শ্রবণ করিতেছে[৬]। মন্দাকিনীতে (স্বর্গনদীতে) অম্ভোজপংক্তি মধ্যে সারস ও বিরিঞ্চির হংস সমুদয় বিহার করিতেছে, এবং সুরনায়কগণ ইহার তটস্থিত উদ্যানে বিশ্রাম, বিহরণ ও বিলাস করিতেছে[৭]। কোথাও তেজঃপুঞ্জসম কান্তিবিশিষ্ট যম, চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, ও বায়ুদেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন[৮]। যুদ্ধপ্রসঙ্গে যাহার দন্তাঘাতে দৈত্যেন্দ্রমণ্ডল প্রোথিত হইয়াছে, সেই ঐরাবত হস্তীকেও দেখিলেন[৯]। যাহারা ভূতল হইতে ব্যোম-প্রদেশে তারকাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের দেহের কান্তি সূর্য্য কিরণের সদৃশ, সেই সকল বৈমানিকগণকেও দেখিলেন[১০]। বায়ুসমালোড়িত মেরুসঞ্জাত লতার আস্ফালন দ্বারা যাহার সলিল (জলকণা) দেবগণকে সিক্ত করিতেছে, যাহার তটভূমি অসংখ্য পারিজাতে সমাকীর্ণ, সেই দেবনদী গঙ্গার বীচিমালা যেন নৃত্য করিতেছে দেখিলেন। অন্যত্র দেখিলেন, মন্দারমঞ্জরী সুশোভিতা সুলোচনা চঞ্চলা অপ্সরাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্যান সমূহে ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও দেখিলেন, কুন্দমন্দার মকরন্দসুগন্ধি

---

* সেই অপ্সরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্বর্গে গমন, ইন্দ্রের সহিত দেখা শুনা, ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার সম্মাননা, ইত্যাদি এ সমস্তই মনোরাজ্য অর্থাৎ মনোমধ্যে ভাবরূপে দর্শন।

সমীরণ চন্দ্রাংশুর ন্যায় সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে[১১,১৩]। যাহা লতারূপ অঙ্গনাগণে পরিব্যাপ্ত, সেই সুখময় নন্দনবন তাঁহার নয়নগোচর হইল। যাহার মনোহর গীতি শ্রবণে সুর ও সুরাঙ্গনাগণ আনন্দভরে নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই স্নিগ্ধনিস্বন বীণাধারী নারদ তুম্বুরু প্রভৃতিকে দেখিলেন[১৪,১৫]। কোথাও দেখিলেন, পুণ্যকর্ম্মকারীরা বহু ভূষণে ভূষিত হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান বিমান সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন[১৬]। বনলতা যেমন বনের সেবা করে, তদ্রূপ, মন্মথমদে মত্তশরীরা এই সমস্ত সুররমণীগণ দেবরাজের সেবা করিতেছেন[১৭]। যাহার কুসুমসমূহ নীলকান্ত ও চন্দ্রকান্তমণি অপেক্ষাও সুসুন্দর, এবং কলিকাগুচ্ছ চিন্তামণির সদৃশ, সেই সকল কল্পবৃক্ষ ফল সমূহের দ্বারা যেন উন্নতদন্ত হইয়া শোভমান হইতেছে দেখিলেন[১৮]। এখানে লোকত্রয়স্রষ্টা দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায়, দেবরাজ ইন্দ্র, মহাসনে আসীন রহিয়াছেন দেখিয়া উশনা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন[১৯]। ভৃগুপুত্র শুক্র বাহ্যদৃষ্টি ও শরীর বিস্মৃত হইয়া কেবল মনঃকল্পনায় ঐ সকল দর্শন করিয়া দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন[২০]।

অনন্তর দেবরাজ শুক্র কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সমীপে উপবেশন করাইলেন[২১]। এবং বলিলেন, শুক্র! আপনার আগমনে এই স্বর্গ ধন্য হইল, আপনি এই স্থানে যত কাল ইচ্ছা তত কাল অবস্থান করুন[২২]। অনন্তর ভৃগুতনয় শুক্র দেবরাজের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে শুক্র সুরগণ কর্তৃক অভিবন্দিত ও রাজসত্তম দেবরাজের লালনীয় হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন[২৩,২৪]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

——)()(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র মরণ দুঃখ অনুভব না করিয়াই অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই ঐ প্রকারে স্বীয় তেজোবলে (স্বকীয় পুণ্যপুঞ্জের প্রভাবে) উৎকৃষ্ট মানসী স্বর্গপুরী প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রাক্তনভাব বিস্মৃত হইলেন[১]। তিনি মুহূর্ত্তকাল শচীপতির পার্শ্বে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গ সন্দর্শনে সমুৎসুক হইলেন এবং তৎপরক্ষণেই জনলোভনীয় স্বর্গের শোভা পরম্পরা সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সারস যেমন নলিনী দর্শনার্থ গমন করে, তদ্রূপ, তিনি সুরনারী সমূহ দর্শনার্থ গমন করিলেন[২।৩]। স্ত্রীবৃন্দ মধ্যে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বদৃষ্ট অপ্সরা উদ্যানমধ্যে চূতলতিকার ন্যায়, এবং আকাশে জোৎস্নার ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে[৪]। রাম! সেই অপ্সরাও তখন ভৃগুতনয়কে দেখিয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্তা হইল এবং ভৃগুতনয় উশনাও সেই বিলাসময়ী অপ্সরাকে দেখিয়া বিগলিতাঙ্গ (অর্থাৎ রসভাবে গদ্গদ ও স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গ) হইলেন। যেন তাঁহার শরীর দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে তিনি নির্নিমেষ নয়নে সেই বরাঙ্গনাকে দেখিতেছেন[৫।৬]। নিশিযোগে রোদনপরায়ণা কান্তবিরহিণী চক্রবাকী যেমন নিশান্তে চক্রবাক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া প্রণয়ের আতিশয্য বশতঃ আনন্দিত ও আনন্দিতা হয়, সেইরূপ, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দর্শনে আনন্দিত ও আনন্দিতা হইলেন[৭।৮]। যেমন প্রভাতকালে অর্ক ও নলিনী উৎকৃষ্ট শোভা ধারণ করে, তেমনি, আজ সেই নন্দন কাননে মনোরথ লাভে পরিতুষ্ট পরিতুষ্টা উক্ত উভয় সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন[৯]। তখন সেই অপ্সরা আপন সমুদায় শরীর অবশ করিয়া কামের প্রতি অর্পণ করিল, এবং অসংখ্য কামবাণ তাহার কোমল অঙ্গে নিপতিত ও বিদ্ধ হইল[১০]। তাহার বিবশাঙ্গ পদ্মপত্রস্থ সলিলের ন্যায় ঢল ঢল করিতে লাগিল। কামতাড়নায় কাঁপিতে লাগিল[১১]। হস্তী যেমন কমলিনীকে ক্ষোভিত করে, তদ্রূপ, কন্দর্প সেই ইন্দীবরনয়না ও হংসসারসগমনা অপ্সরাকে ক্ষোভিত করিতে লাগিল। তিনি মৃদু বাত বিতাড়িত

পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় থর থর করিতে (কাঁপিতে) লাগিলেন[১২]। অনন্তর সঙ্কল্পিত অভিলাষী শুক্র সেই অপ্সরার তাদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া, ভূতভুক্ রুদ্রদেব যেমন মহাপ্রলয় কালে তমঃ (অন্ধকার) কল্পনা (সৃজন) করেন, তাহার ন্যায়, অন্ধকার কল্পনা (সৃজন) করিলেন, তাহাতে স্বর্গের সেই প্রদেশ (নন্দন কানন) তিমিরাবৃত হইল। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন, অথবা লজ্জারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেন[১৩।১৪]। তদ্দর্শনে তত্রস্থ অন্যান্য অপ্সরা স্ব স্ব অভিমত প্রদেশে গমন করিল এবং তাহাতে তাঁহাদের লজ্জারূপ অন্ধকার যেন কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইল। যখন সম্পূর্ণরূপে লজ্জান্ধকার বিদূরিত হইল, তখন, ময়ূরী যেমন বারিদের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করে, সেইরূপ, মদনশরপীড়িতা বিশালনয়না চপলাপাঙ্গী অপ্সরা ভৃগুপুত্রের নিকট সমাগতা হইল এবং তদীয় হস্তদ্বয় ধারণ করতঃ তত্রস্থ কল্পিত স্ফটিকগৃহমধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কে উপগত হইয়া ঐরাবতসংলগ্ন মহা নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই ললনা স্নেহসম্বলিত সুমধুর বাক্যে বলিতে লাগিল[১৫।২০]। বলিল, হে অমলেন্দুবদন! দেখুন, স্মরদেব শরাশন বিস্ফারণ করিয়া এই অবলাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে নাথ! আমি আপনার শরণাগতা, আমাকে মদনভয় হইতে রক্ষা করা আপনার উচিত। শরণাগত দীনের প্রতি কৃপা করাই মহাত্মাদিগের নিত্য ব্রত। যাহারা মূঢ়, তাহাদের স্নেহদৃষ্টি নাই, এবং যাহারা রসজ্ঞ নহে (অরসিক), তাহারাই প্রণয়াতিশয্যকে বহু বলিয়া গণনা করে না। কিন্তু যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহারা জানেন, অশঙ্কিত ও দোষরহিত প্রণয় অমৃতস্বরূপ এবং পরমাহ্লাদদায়ক সহস্র নির্ম্মল চন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। প্রণয়ীর পক্ষে প্রণয়জনিত আনন্দ যেরূপ সুখসেব্য, ত্রিভুবনের আধিপত্যও সেরূপ সুখসেব্য নহে[২১।২৫]। রজনী সময়ে চন্দ্রকিরণস্পর্শ দ্বারা কুমুদ্বতীর ন্যায়, আজ্ আমি আপনার পাদস্পর্শ দ্বারা আশ্বাসিত হইলাম[২৬]। চন্দ্রাংশুরসপানে চপলা চকোরী যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, আমি আজ্ আপনার সংস্পর্শরূপ অমৃত পানে সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করিলাম[২৭]। এক্ষণে চরণে সংলীনা ভ্রমরীর ন্যায় আমাকে করপল্লব দ্বারা নিপীড়ন করতঃ অমৃতপরিপূর্ণ স্বীয় হৃৎপদ্মে স্থাপন করুন। হে রাঘব! এই বলিয়া সেই ব্যাঘূর্ণিত-ভ্রমরনয়না এবং কল্পবৃক্ষের মঞ্জরীসদৃশী কোমলাঙ্গী অপ্সরোরমণী শুক্রের

বক্ষঃস্থলে নিপতিতা হইল। পরে দ্বিরেফ যেমন পদ্মিনীমধ্যে (পদ্ম হইতে পদ্মান্তরে) ভ্রমণ করে, তদ্রূপ, সেই দম্পতী সেই সুরম্য বনস্থলীতে ইতস্ততো বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন২৮।৩০।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।
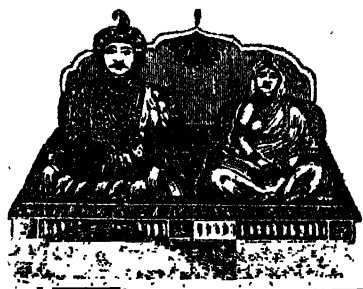
অষ্টম সর্গ ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের মন ঐরূপ মনঃকল্পিত প্রণয় রসের দ্বারা আপ্লুত ও সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলে,[১] তিনি সেই মন্দারমালাবিভূষিতা অমৃতপানমত্তা অপ্সরার সহিত কখন মত্তহংসসমাকুল হেমপঙ্কজশালী মন্দাকিনীতীরে বিহার, কখন পারিজাতকুঞ্জে রসায়ন পান, কখন বিদ্যাধরীগণ সহ মনোহর চৈত্ররথকাননস্থিত লতামণ্ডপে দোলক্রীড়া, কখন শিবানুচর প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দর ভূধরের ন্যায় নন্দনকাননান্তর্গত সরোবর আড়োলন, কখন অব্জিনীসঙ্কুল মেরুস্থলীতে উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নব নব হেমলতাচ্ছন্ন তরঙ্গিণী সমূহে পরিভ্রমণ, কখন বা কৈলাসবনকুঞ্জ মধ্যে দেবগীতি শ্রবণ পূর্ব্বক হরচূড়াবস্থিত চন্দ্রাংশুধবলা শর্ব্বরী ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। সেই কনকাম্ভোজদ্বারা আপাদমণ্ডিতা অপ্সরা সেই কৃতহাস মহাতপা ভার্গবের সহিত গন্ধমাদনসানুতে এবং ক্রমে বিলাস ও বিশ্রাম এবং কখন বা বিচিত্র মনোহর লোকালোক তট প্রান্তে ক্রীড়াকৌতুকাদির দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন[২।১০]।

হে রাঘব! ঐরূপে শুক্র সেই কল্পিত অমর মন্দিরে মন্দারতটসমূহে হরিণশাবকগণের সহিত প্রোক্ত প্রকার সুখে ষষ্টি বৎসর বাস করিলেন[১১]। শ্বেতদ্বীপীয় জনগণের সহিত ক্ষীরার্ণব তটে যুগার্দ্ধ অতিবাহিত করিলেন। গন্ধর্ব্বনগরে ও তাহাদের উদ্যানে অশেষ প্রকার সুখলীলা বিরচনার দ্বারা অনন্ত জগৎস্রষ্টা কালের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন[১২।১৩]। *

অনন্তর শুক্র সেই হরিণনয়নার সহিত সেই পুরন্দর পুরে পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশৎ যুগ পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন[১৪]। পরে ক্রমিক ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হওয়াতে তিনি বিশীর্ণদেহ, উপভোগানন্দবিহীন ও চিন্তাপরবশ হইয়া যোদ্ধা যেমন প্রতিযোদ্ধা কর্ত্তৃক অবনীতলে পাতিত হয়, তেমনি, তিনিও সেই মানিনী রমণীর সহিত বিগলিতদেহ হইয়া অবনীমণ্ডলে

---

* কাল শব্দের অর্থ এস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মা। তিনি স্বয়ং কল্পে কল্পে জগৎ রচনা করেন। শুক্রও স্বমনোরথ মাত্রে অসংখ্য ভোগ্য রচনা করিলেন, সুতরাং কালের সহিত শুক্রের ঐ অংশে তুলনা।

নিপতিত হইল[১৬,১৭]। দীর্ঘ চিন্তার সহিত ভূতলে নিপতিত শুক্রের ও সেই মহিলার শরীর শীলানিপতিত নির্ঝরের ন্যায় শতধা বিচূর্ণ অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতাবশেষিত হইয়া গেল[১৭]। তখন তাঁহাদের চিত্ত আধারবিহীন হইয়া বিহগের ন্যায় আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল[১৮]। পরে সেই চিত্তদ্বয় হিমাংশুর রশ্মিজালে আবিষ্ট হওয়ায় শীঘ্রই হিমকণাত্ব প্রাপ্ত ও পৃথিবীতলে নিপতিত হইয়া পার্থিব রস যোগে ধান্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল[১৯]। তদনন্তর দশার্ণদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ সেই ধান্য পাক করতঃ ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর শুক্র ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করতঃ শুক্ররূপে (রেতঃ) পরিণত হইয়া তদীয় ভার্য্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন[২০]। তথায় মুনিগণসংসর্গে উত্তম বুদ্ধি লাভ করতঃ মেরুগহনে গমন পূর্ব্বক উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার মন্বন্তর কাল অতিবাহিত হয়। অনন্তর উক্ত স্থানে তাঁহার মৃগীতে এক নরাকৃতি পুত্র সমুৎপন্ন হইল। এ বারও তিনি সেই পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন[২১,২২]। কিরূপে আমার পুত্র ধনশালী, আয়ুষ্মান্ ও গুণবান্ হইবে, নিরন্তর সেই চিন্তায় নিরত হইয়া ধ্যানজ্ঞানাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলেন[২৩]। পরে সেই ধর্ম্মচিন্তাপরিত্যাগী ও পুত্রের নিমিত্ত ভোগ চিন্তায় চিন্তিত শুক্র যথা সময়ে মৃত্যু কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলেন[২৪]। তিনি পূর্ব্বদেহে যাবজ্জীবন ভোগচিন্তায় ব্যাসক্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি মৃত্যুর পর মদ্রেশ্বরের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মদ্রদেশের অধিপতি হইলেন। তিনি মদ্রদেশে দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়া জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং চারুতর রাজশরীর পরিত্যাগ করিলেন। হে রাঘব! শুক্র যখন মদ্ররাজশরীরে মদ্রদেশোচিত ও রাজোচিত ভোগসমূহ অনুভব করেন, তখন তাঁহার তপোবাসনা সঞ্চিত হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি সেই তপোবাসনার সহিত রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া সমঙ্গানদীতীরে এক তপস্বীর সন্তান হইলেন এবং গতচিন্ত হইয়া তথায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন[২৫,২৮]।

হে রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র বিবিধ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করতঃ শরীরপরম্পরা অনুভব করিয়া এক্ষণে সমঙ্গা নদীতটে বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সমাধিজনিত নিশ্চেষ্টতা বা শীতবাতাদিসহিষ্ণু অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলেন[২৯]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, শুক্র সমাধিমগ্ন পিতার সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়াই ঐরূপ মনোরাজ্য বিস্তার করতঃ বহুসম্বৎসরাত্মক কাল অতিক্রম করিলেন[১]। দীর্ঘকাল পরে সেই সমঙ্গানদীতটে সুসমাহিত শুক্রের স্থূল শরীর শীতবাতাতপাদির দ্বারা জর্জ্জরিত হওয়ায় যথাকালে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল[২]। চঞ্চলস্বভাব তদীয় মন পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিচিত্র দশায় ভ্রমণ করিয়া অবশেষে সমঙ্গাসরিত্তটে বিশ্রান্তি লাভ করিল[৩।৪]। তথা অনন্তবৃত্তান্তঘটিত মনোরাজ্যময়ী সেই সেই সংসার দশা শুক্রদেহ অর্থাৎ স্থূল দেহ নিরপেক্ষ হইয়া অনুভব করতঃ অবস্থিত থাকিল[৫]। মন্দরশৈলসানুস্থিত শুক্রদেহ তাপাদি দ্বারা সংশুষ্ক ও চর্ম্মমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছিল[৬]। বেণুরন্ধ্রপ্রবিষ্ট বায়ুর শীৎকার যদ্রূপ, তদীয় দেহসঞ্চারী সমীরণের শীৎকার তদ্রূপ হইয়াছিল। তাহাতে বোধ হইয়াছিল, যেন তাহা দেহচেষ্টাদুঃখের অবসান হওয়ায় আনন্দ গান করিতেছে[৭]। তদীয় শুষ্কদেহস্থিত সুশুভ্র দন্তমালা দেখিলে বোধ হইত—যেন তাহা সংসারভূমিস্থ গর্ত্তে বিলুণ্ঠিত মনের প্রতি উপহাস প্রদর্শন করিতেছে[৮]। তাঁহার মুখরূপ অরণ্যস্থ জীর্ণ কূপ সদৃশ চক্ষুঃ কর্ণনাসিকাদি স্থানের শূন্য কোটর সকল দেখিলে প্রতীতি হইত, তাহারা যেন বিবেকী দিগকে জগতের শূন্যতা অর্থাৎ স্বাভাবিক অসদ্রূপতা উপদেশ করিতেছে[৯]। শুক্রের সেই আতপসংশুষ্ক শরীরে বর্ষাবারি নিপতিত হইয়া বাষ্পের সহিত বিনিঃসৃত হওয়াতে বোধ হইত —সেই শরীর যেন প্রাক্তন দেহ পরম্পরার অনুস্মরণে সোল্লাস বা সদুঃখ হইয়া আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে[১০]। সেই দেহ জলদাগমে প্রচণ্ডবায়ুদ্বারা বনভূমিতে বিলুণ্ঠিত, প্রবল বারিধারা পতনে বিগলিত ও গিরিনদীতটে পবনাহৃত পাংশুরাশিতে ভূষিত ও ধাতুরাগদ্বারা রঞ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল[১১।১২]। যদ্রূপ সচ্ছিদ্র শুষ্ক কাষ্ঠ বায়ুর দ্বারা প্রপূরিত, আন্দোলিত ও নিস্বন(শব্দ)যুক্ত হয়, তদ্রূপ, সেও হইয়াছিল। দেখিলে বোধ হইত, বনমধ্যে যেন মূর্ত্তিমতী তপস্যা তপোনুষ্ঠান করিতেছে। বক্রানুবক্র তদীয় শুক্রাস্ত্র সকল বায়ু বশে এরূপ ত্রাস জনক

শব্দ করিত যে তদ্দর্শনে কবিগণ চর্ম্মময়োদরী অলক্ষ্মীর বলি ভোজনের * শব্দের সহিত তুলনা করিতে বাধ্য হইতেন[১৩।১৪]। ভৃগু প্রচণ্ডতপঃ-প্রভাবে তদীয় পুণ্যাশ্রমস্থ জীবগণের রাগদ্বেষাদি রহিত বা প্রশমিত করিয়া ছিলেন, তাই মাংসাদ মৃগ ও পক্ষিগণ শুক্রের সেই দেহ ভক্ষণ করে নাই[১৫]। ভৃগুতনয় শুক্র যমনিয়মাদির দ্বারা শুষ্কশরীর হইয়া ঐরূপে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, পরে তদীয় নীরস নীরক্ত দেহ সমঙ্গা-নদীতটে শিলোপরি ঐ প্রকারে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল[১৬]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অলক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা উক্ত প্রকারে কৃত হয়। অর্থাৎ তাহার উদর বৃহৎ, শুষ্কপ্রায় ও নাড়ী প্রভৃতি বর্জ্জিত। বলি শব্দের অর্থ পূজার দ্রব্য। হিন্দুরা কুৎসিত দ্রব্যে বাম হস্তে অলক্ষ্মীর পূজা করে। ঈদৃশী অলক্ষ্মীর গলধ্বনি কর্কশ। অলক্ষ্মীর বলি ভোজনের শব্দ, এ কথার দ্বারা ঐ সকল পুরাণ বর্ণিত প্রসঙ্গ স্মরণ করান হইয়াছে।

দশম সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, অতঃপর দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর অন্তে ভগবান্ ভৃগুর পরমাত্মদর্শন সমাধি ভঙ্গ হইল[১]। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি তাঁহার সর্ব্বগুণাধার বিনয়াবনত পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না[২]। দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেবল একটী মনুষ্যকঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে। তাহা যেন দেহধারী অজ্ঞানের ও মূর্ত্তিমান্ দরিদ্রতার অনুরূপ শোচনীয় অবস্থাযুক্ত[৩]। আরও দেখিলেন, সেই অস্থিময় কলেবরের ছিদ্র সমূহে আতপতাপতপ্ত তিত্তিরি পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তদীয় শুষ্ক নাড়ীসমূহের ছায়ায় ভেক সকল বাস করিতেছে[৪]। নেত্রকোটরে কীটপুঞ্জ অণ্ড প্রসব করিতেছে ও পার্শ্বাস্থির অন্তরালে কোশকার কীট (মাকড়সা) সকল বাস করিতেছে[৫]। দেখিলে বোধ হয়, সেই নরকঙ্কাল বা শুষ্কাস্থি সকল যেন তদীয় প্রাক্তন ভোগবাসনাকে ইদানীং উপহাস করিতেছে[৬]। তাহার শিরোঘট এত মসৃণ ও সুশুভ্র হইয়াছে যে, যেন কর্পূরের প্রভাকেও লজ্জিত করিতেছে[৭]। ঊর্দ্ধগামী কণ্ঠ শিরা সকল শুষ্ক হইয়া অস্থি মাত্র অবলম্বনে রহিয়াছে। তাহা দেখিলেও বোধ হয়, তাহারা যেন আত্মানুসন্ধানার্থ গ্রীবাদেশ দীর্ঘীকৃত করিতেছে[৮]। তাহার বক্ত্র প্রদেশে যে নির্ম্মাংস নাসাস্থি রহিয়াছে, তাহা যেন মুখ মণ্ডলের মধ্যসীমা প্রদর্শনার্থ শঙ্কু (শঙ্কু=খোঁটা) স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে[৯]। সেই কঙ্কালের কন্ধরদেশ ঊর্দ্ধীকৃত। দেখিলে বোধ হয়, উৎক্রান্ত প্রাণ আকাশপথে কিরূপে গমন করে যেন তাহাই দেখিবার জন্য ঐ শবকঙ্কাল উন্নতগ্রীব হইয়া রহিয়াছে[১০]। জঙ্ঘা জানু, ঊরু বাহু এ সকল যেন দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, উহারা যেন পথ পরিশ্রমে কাতর হইয়া পরস্পর পলায়নার্থ বিশ্লিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতেছে[১১]। ইহার বৃহৎ রিক্তোদর দেখিলে জ্ঞান হয়, তাহা যেন অজ্ঞ হৃদয়ের শূন্যতা বুঝাইয়া দিতেছে[১২]। ভৃগু দুঃখরূপ হস্তীর বন্ধনস্তম্ভসম সম্মুখে তাদৃশ শুষ্ক কঙ্কাল দর্শন করিয়া তথ্য অনুসন্ধানার্থ উত্থিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ তর্ক বা চিন্তা করিতে লাগি-

লেন। এ কি! এই কি আমার সেই পুত্র! সে কি নাই! উৎক্রান্ত-জীব হইয়াছে[১৩।১৪]! বহুক্ষণ অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় পুত্রই নিশ্চয় করিলেন এবং কালের প্রতি সহসা কোপে পরিপূর্ণ হইলেন[১৫]। তাঁহার কোপের কারণ এই যে, কাল তাঁহার পুত্রকে অকালে গ্রাস করিয়াছে। কাল কেন আমার পুত্রকে অকালে গ্রাস করিল? এইরূপ বলিয়া ক্রোধপরবশ ভৃগু কালের প্রতি শাপ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন[১৬]।

অনন্তর অমূর্ত্তস্বভাব হইলেও সর্ব্বভক্ষক কাল এক্ষণে খড়্গপাশধারী কুণ্ডলযুক্ত কবচান্বিত দ্বাদশভুজসম্পন্ন ষড়ানন এবম্বিধ আধিভৌতিক দেহ ধারণ করতঃ কিঙ্কর ও সেনাগণে পরিবৃত হইয়া কোপতপ্ত মহর্ষি ভৃগুর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন[১৭।১৮]। তাঁহার শরীরসমুত্থিত জ্বালাজাল দ্বারা নভোমণ্ডল কুসুমিত কিংশুক শোভিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল[১৯]। তাঁহার করতলস্থ ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতে বিনিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা দিগঙ্গনাগণ যেন কনককুণ্ডল সমূহে অলঙ্কৃত হইল[২০]। তদীয় প্রচণ্ড নিশ্বাস পবন প্রবাহে ভূধর সকল যেন ছিন্নশিখর হইয়া ইতস্ততঃ বিচলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল[২১]। করস্থ করবাল তেজে সূর্য্যমণ্ডল যেন কল্পাগ্নিদগ্ধজগতের ধূমপটল দ্বারা শ্যামায়মান হইয়া গেল[২২]।

হে মহাবাহো রাম! বর্ণিতপ্রকার মূর্ত্তিধারী কাল সেই ক্রুদ্ধ মহামুনির অভিমুখীন হইয়া প্রলয়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিঃস্বনে বলিতে লাগিলেন[২৩]। হে মুনে! লোকমর্য্যাদাভিজ্ঞ পূর্ব্বাপরদর্শী সজ্জনগণ হেতুসত্ত্বেও বিমোহিত হন না; কিন্তু আপনি বিনা কারণেই মুগ্ধ হইতেছেন[২৪]। অনন্তপা এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ আমরা সেই পূর্ণ পরমাত্মার নিয়ম পালনে নিযুক্ত আছি। আপনি প্রোক্ত কারণে আমাদের সকলেরই পূজ্য। অন্য কোন কারণে অর্থাৎ শাপাদির ভয়ে আমরা আপনাকে পূজা করি না[২৫]। বোধ হয় আপনি বিমুগ্ধবুদ্ধি হইয়াছেন, সেই জন্য বলিতেছি, আপনি বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। প্রলয় মহাগ্নিও আমাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং আপনি শাপদ্বারা আমার কি করিবেন[২৬]? আমি শত শত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াছি, কোটী কোটী রুদ্র উদরসাৎ করিয়াছি ও সহস্র সহস্র বিষ্ণু ভক্ষণ করিয়াছি। বল দেখি আমি কোন্ বিষয়ে অসমর্থ[২৭]? হে ব্রহ্মন্! আমরা ভক্ষক এবং তোমরা

আমার ভক্ষ্য। ইহাই নিয়তি অর্থাৎ স্বভাবের মর্য্যাদা। সুতরাং ইহা স্থির জানিবেন যে, আমরা ইচ্ছার বা রাগদ্বেষাদির বশ্য হইয়া কোন কিছু করি না[২৮]। হে ব্রহ্মন্! অগ্নি স্বয়ংই উর্দ্ধমুখে ধাবমান হয়, সলিল স্বয়ংই নিম্নগামী হয়, ভক্ষ্য স্বতঃই ভক্ষকের বশ্য হয় এবং অন্তক স্বতঃই জন্যপদার্থের অন্ত (বিনাশ) করেন[২৯]। হে মুনে! আমি যে আমার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, ইহা পরমাত্মারই রূপ। কেননা, পরমাত্মা আপনিই আপনাতে উক্ত প্রকারে বিরাজ করিতেছেন[৩০]। যাঁহারা নির্ম্মলজ্ঞানী, তাঁহারা দেখিতে পান, ইহ জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তা কেহ নাই এবং ভোক্তাও কেহ নাই। যাহাদের জ্ঞান রজস্তমে অভিভূত, তাহাদেরই দৃষ্টিতে কর্ত্তাও অনেক, এবং ভোক্তাও অনেক[৩১]। ইহা অবধারিত জানিবেন যে, কর্ত্তৃতা ও ভোক্তৃতা উভয়ই অজ্ঞানের কল্পিত। ঐ সকল কল্পনা অতত্ত্বজ্ঞের, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের ঐ সকল কল্পনা তিরোহিত[৩২]। পুষ্পনিকর তরুখণ্ডে ও ভূতগণ ভুবন মণ্ডলে স্বতঃ বা স্ব স্বভাবে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে[৩৩]। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন জলের প্রচলনে প্রচলিতপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং তাহা যেমন সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য, সেইরূপ, কালের সৃষ্টিও সত্য মিথ্যার অতিরিক্ত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য[৩৪]। যেমন সদোষ চক্ষুঃ রজ্জুতে সর্প সৃজন (দর্শন) করে, তেমনি, ভ্রমাবিত মনঃই কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্বাদি সৃজন করে[৩৫]। এই যে আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি, ইহাও তপস্বী দিগকে মান্য করিতে হয় বলিয়া, শাপ ভয়ে নহে। আমরা প্রতিভার বা অভিমানের বাধ্য নহি। আমরা কেবল নিয়মের বাধ্য[৩৬,৩৭]। প্রাজ্ঞগণও নিয়তির বশ্য হইয়া সর্ব্ব প্রকার ব্যবহার ও চেষ্টা নির্ব্বাহ করেন, অভিমানের বশ্য হইয়া নহে। অভিমান মহাতমঃস্বরূপ[৩৮]। পণ্ডিতগণ ঈশ্বরেচ্ছারূপ নিয়ম পালনার্থ কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মুনিপ্রবর! তুমি সে নিয়ম, অজ্ঞান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নষ্ট অর্থাৎ ভঙ্গ করিও না[৩৯]। তাদৃশী অজ্ঞানময়ী দৃষ্টিই বা কোথায়? এবং সাত্ত্বিক মহত্ত্ব ও ধীরত্বই কোথায়? ভাবিয়া দেখ, দেখিয়া প্রাজ্ঞজনোচিত প্রজ্ঞা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধের ন্যায় মুগ্ধ হইও না[৪০]। হে মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কর্ম্মবিপাকজনিত অবস্থার বিচার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। বিচার না করিয়াই মূর্খের ন্যায় আমাকে অভিশপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ[৪১]।

হে মহর্ষে! এই জগতে সকল দেহীরই শরীর দ্বিবিধ। তাহা কি তুমি জান না? তন্মধ্যে এক শরীর মনোময়[৪২]। উভয় দেহের মধ্যে এই যে জড় দেহ, ইহা সামান্য কারণে বিনষ্ট হয় এবং মনোময় দেহ নিয়ত ক্রোধাদির দ্বারা পীড়িত ও কদর্য্য হইয়া থাকে[৪৩]। হে সাধো! যেরূপ চতুর সারথির দ্বারা রথ পরিচালিত হয়, তদ্রূপ, মনঃদ্বারা এই দেহরথ পরিচালিত হইতেছে[৪৪]। শিশুগণ যেমন পঙ্কদ্বারা মিথ্যা পুরুষ (পুত্তলিকা) নির্ম্মাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আবার সেই পঙ্কে নিমগ্ন করে, পরে আবার অন্যবিধ দৃশ্য নির্ম্মাণ করে, মনঃও সেইরূপ, বিদ্যমান দেহ বিনাশ পূর্ব্বক দেহান্তর কল্পনা করিয়া থাকে। অতএব, চিত্তই পুরুষ; অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা। তদ্দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহাই প্রকৃত কৃত। এই আমার স্থান, এই আমি আছি, এই আমার দেহ, এই আমার অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, এই আমার মস্তক, এ সমস্ত মনঃই বিধান ও অভিধান (প্রস্তুত ও উল্লেখ) করিয়া থাকে[৪৫।৪৬]। একমাত্র মনঃই জীব হইতে জীবান্তর নাম প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবের অনুগামী হয়, পরে অহঙ্কারের বশ্য হইয়া অভিমান প্রযুক্ত স্বয়ং নানাত্ব প্রাপ্ত হয়[৪৮]। চিত্ত দেহবাসনার দ্বারা আপনার পার্থিব শরীর অবলোকন করে; কিন্তু যখন সেই চিত্ত অসত্যময়ী শরীরভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সত্য পরব্রহ্ম অবলোকন করে, তখন তাহার পরমা শান্তি জন্মে। তখন তাহার উক্ত প্রকার কল্পনা-সামর্থ্যের বিশ্রাম হইয়া থাকে[৪৯।৫০]।

হে ব্রহ্মন্! তুমি সমাধিমগ্ন হইলে তোমার পুত্রের মনঃ স্বীয় মনোরথমার্গে বিচরণ করতঃ দূরতর প্রদেশে গমন করিয়াছিল[৫১]। তোমার পুত্রের জীব প্রথমতঃ ঔশনস দেহ (যে শরীরে তিনি শুক্র নামে অভিহিত হইতেন তাঁহার সেই স্থূল শরীর) ধ্যানের দ্বারা মন্দরপর্ব্বতকন্দরে পাতিত করিয়া নীড় হইতে সমুড্ডীন নভোবিহারী বিহগের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়াছিল[৫২]। তথায় তিনি বিশ্বাচী নাম্নী দেবসুন্দরীর সহিত মিলিত হইয়া কখন মনোহর মন্দারকুঞ্জে, কখন পারিজাত তলে, কখন নন্দনকাননে, কখন লোকপালগণের মনোহর পুরে বিহার করতঃ দ্বাত্রিংশৎ যুগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন[৫৩।৫৪]। পরে ঐরূপ ঐপরন্ধ তীব্র ভোগ দ্বারা পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তিনি সেই অপ্সরার সহিত নভোমণ্ডল হইতে কালপক্ক ফলের ন্যায় নিপতিত হইয়াছিলেন[৫৫।৫৬]।

তিনি সেই দেবদেহ আকাশে পরিত্যাগ করতঃ ভূতাকাশে, তৎপরে বসুধাতলে আগমন করতঃ, ক্রমে দশার্ণদেশে ব্রাহ্মণ, কোশল দেশের রাজা, মহাটবীতে ধীবর, ত্রিপথগাতীরে হংস, সূর্য্যবংশে নৃপ, পুণ্ড্রদেশে মহীপতি, শৌরশাস্ত্রে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্গে শ্রীমান্ বিদ্যাধর, বসুধা মণ্ডলে মুনিকুমার, মদ্রদেশে মহীপাল, সমঙ্গানদীতটে বাসুদেবাখ্য ব্রাহ্মণ, বিনশনে ভূপাল, কীকটদেশে কিরাত, সৌবীর দেশে সামন্তরাজা, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, কিরাতদেশে বংশগুল্ম, চীনদেশে হরিণ, তালবৃক্ষে সরীসৃপ, তমালবৃক্ষে বনকুক্কুট প্রভৃতি বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন৫৭।৬৩। ঐরূপে তোমার সেই পুত্র বিবিধ প্রদেশে বিবিধ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ এক উৎকৃষ্টব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তথায় তিনি একজন সুবিজ্ঞ মন্ত্রবিদ্যাবিদগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন, এবং বিদ্যাধর-পুরপ্রদায়িনী বিদ্যার অর্চ্চনা করতঃ নভোমণ্ডলে বিদ্যাধর হইলেন। হার, কেয়ূর ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে বিভূষিত, নায়িকাগণের আনন্দ-বর্দ্ধক, কন্দর্পের ন্যায় রূপসম্পন্ন, গন্ধর্ব্বপুরভূষণ ও বিদ্যাধরীগণের দয়িত হইয়া পুরুষমনোহারিনী সুন্দরী বিদ্যাধরীগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইতে লাগিলেন৬৪।৬৫। ক্রমে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তদীয় সঙ্কল্পের সীমা পরি-সমাপ্ত হইলে প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইল। তখন তাঁহার শরীর পাবকে শলভের ন্যায় সেই কল্পান্তকালীন দ্বাদশাদিত্যের প্রচণ্ডকিরণে ভস্মীভূত হইল৬৭। তদীয় বাসনা তখন নীড়বিহীনা বিহঙ্গীর ন্যায় সেই জগ-ন্নির্ম্মাণরহিত বিস্তৃত নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল৬৮। তৎপরে ব্রহ্মার রজনী (কল্পকাল) অতিক্রান্ত হইলে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সমূহ বিরচিত এবং নানা সংসার সৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সেই বাসনা সেই আদিযুগে বসুধাতলে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইল৬৯।৭০।

হে মুনে! সম্প্রতি আপনার পুত্র পবিত্রতম বিপ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি মতিমান্‌গণের মধ্যে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া সমস্ত শ্রুতি অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে মুনে! আপনার সেই পুত্র স্বীয় বিবিধ বাসনার অনুবৃত্তিদ্বারা ক্রমশঃ খদির ও করঞ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহের করালকোটরমধ্যে, বিবিধ প্রাণিগণের গর্ভসমূহে ও অশেষবিধ গহন কানন সমূহে ভ্রমণ ও স্বর্গে বিদ্যাধর দেহ ধারণ করতঃ আকল্প অবস্থান করিয়া এক্ষণে সমঙ্গানদীতটে তপস্যা করিতেছেন৭১।৭৩।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

কাল বলিলেন, অহে মুনিবর! আপনার পুত্র এক্ষণে জিতেন্দ্রিয়, জটাধারী ও অক্ষবলয়বিভূষিত হইয়া সেই তরঙ্গিণীর প্রবল কল্লোলধ্বনির দ্বারা শব্দায়মান ও সমীরণসম্পন্ন তীরে অবস্থান করতঃ অষ্টশত বর্ষ যাবৎ তপস্যা করিতেছেন। যদি আপনি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করুন, দেখিতে পাইবেন[১।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সর্ব্বত্র সমব্যাপী সমদর্শী জগদীশ কাল ঐরূপ কহিলে, মুনিবর জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া পুত্রের চেষ্টিত-পরম্পরা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন[৪]। তাহাতে ক্ষণকালমধ্যে তদীয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিদর্পণে স্বীয় পুত্রের বিবরণ সমস্ত প্রতিবিম্বিত হইল[৫]। পরে তিনি সমঙ্গাতট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই মন্দরসানুস্থিত স্বীয় কলেবরে প্রবিষ্ট হইলেন[৬]। অনন্তর তিনি সাতিশয় বিস্মিত ও পুত্রস্নেহে বিগলিত হইয়া কালকে অবলোকন করতঃ কহিতে লাগিলেন[৭], হে ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর! হে ভগবন্! আমাদের চিত্ত রাগাদিদ্বারা মলিন, সে জন্য আমরা অল্পজ্ঞ। হে দেব! ভবাদৃশ পুরুষগণের বুদ্ধি মলশূন্যা বলিয়া কালত্রয়দর্শিনী[৮]। এই জগৎস্থিতি অসত্যরূপিণী হইলেও নানাকার বিকার ধারণ করতঃ সত্যরূপে ভাসমানা হইয়া পণ্ডিত-গণেরও পরমার্থ বস্তুতে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে[৯]। হে দেব! ইন্দ্রজাল সদৃশ মায়ামোহবিধায়ক মনোবৃত্তির প্রকৃত রূপ আপনিই অবগত আছেন। কেননা, সমস্তই আপনার অভ্যন্তরবর্ত্তী[১০]। হে ভগবন্! আমার পুত্রের মৃত্যু না থাকিলেও আমি উহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া "কাল আমার অক্ষীণ জীবিত পুত্রকে গ্রাস করিলেন" এইরূপ সম্ভ্রম সম্পন্ন হইয়াছিলাম। হে বিভো! এখন বুঝিলাম, কেবল নিয়তির প্রভাবেই আমার তাদৃশী ইচ্ছা সমুদিত হইয়াছিল[১১।১২]। আমরা সংসারগতির কিছুই অবগত নহি, সুতরাং বিপদে অমর্ষে ও সম্পদে হর্ষে অভিভূত হইয়া থাকি[১৩]। হে ভগবন্! অযুক্তকারীর প্রতি ক্রোধও যুক্তকারীর প্রতি প্রসন্নতাপ্রকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য, এ নিয়ম এতৎসংসারে

চিরপ্রঢ় (অকাট্য নিয়মে স্থিত)[১৪]। হে জগদ্‌গুরো! যাবৎ জগদ্ভ্রম, তাবৎ উহা জীবের পক্ষে কার্য্য ও অপরিহার্য্য। ইহা কার্য্য তাহা অকার্য্য, ইহা ইষ্ট, তাহা অনিষ্ট, এ সকল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য বটে; পরন্তু জগদ্ভ্রমান্তর্গত ইষ্টানিষ্টসাধন কার্য্যকলাপ হেয় বোধে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর[১৫]। হে ভগবন্! আমি অবিবেক বশতঃ নিয়তির বিচার না করিয়াই আপনার প্রতি ক্রোধ করাতে স্বীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছি[১৬]। হে দেব! আপনি আজ্ আমার পুত্রের চেষ্টিত সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিলেন বলিয়াই আমি আজ্ আমার পুত্রকে সমঙ্গা-নদীতটে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি[১৭]। এই ভূমণ্ডলে জীবগণের আতি-বাহিক ও আধিভৌতিক শরীর বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আতিবাহিক শরীর অর্থাৎ মনোময় শরীর সর্ব্বগামী এবং তাহাই এতৎ জগৎ দর্শন করিয়া থাকে[১৮]।

কাল বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্থূল শরীর শরীর নহে, মনঃই প্রকৃত শরীর, এ কথা যথার্থ। যদ্রূপ কুম্ভকার মানস কল্পনার পর ঘট নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনঃও সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে[১৯]। বালকগণ যেমন মোহ বশতঃ বেতাল দর্শন করে, তেমনি, মনঃও সঙ্কল্প দ্বারা অনাকারের আকার সৃজন করে, আবার সেই স্বসৃষ্ট বস্তুর বিনাশ কল্পনা করে[২০]। ভ্রম, স্বপ্ন, মিথ্যাজ্ঞান এবং সে সকলের বিষয়, ভাস-মান রজ্জুসর্প ও গন্ধর্ব্বনগরাদি, সমস্তই মানসী শক্তির অন্তর্ভূত অর্থাৎ একমাত্র মনেরই কল্পনায় ঐ সকল রমণীয় ও অরমণীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে[২১]। হে মহামুনে! স্থূল দৃষ্টিতেই মনঃ ও শরীর এই দুই পৃথক্ বলিয়া প্রতীত ও অভিহিত হয়[২২]। কিন্তু হে মুনে! এই যে ত্রিজগৎ, ইহা কেবলমাত্র মনের মনন দ্বারা বিনির্ম্মিত। সুতরাং ইহা মনের মনন (মনোবৃত্তি) ভিন্ন অন্য কিছু নহে[২৩]। ভেদবাসনা সকল চিত্তদেহের অঙ্গীভূত। সুতরাং চিত্ত অজ্ঞানমূলক ভেদবাসনার দ্বারা (ভেদবাসনা= পূর্ব্বানুভূত বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক সংস্কার) উত্তেজিত হওয়ায় এই নানাত্বভ্রম দ্বিচন্দ্রাদি ভ্রমের রীতিতে উপস্থিত হইয়াছে[২৪]। মনঃই ভেদবাসনার আবেশে ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে[২৫]। মনঃই "আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়" ইত্যাদিবিধ ভেদ ভাবনা করতঃ কল্পনাসমুত্থিত বিবিধ সংসার অবলম্বন করে[২৬]। হে সাধো!

যাহা মনন, অর্থাৎ যাহা মনের বৃত্তি, তাহা কৃত্রিম, ইহা জানিয়া তুমি তাহা পরিত্যাগ করিবে। করিলে যাহা অকৃত্রিম শান্ত ব্রহ্ম তাঁহার সারূপ্য লাভ করিবে[২৭]। কাল পুনর্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেমন অতি বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও অন্যস্থানস্থিত জল জলত্বে সমান হইলেও সমুদ্রেই অসংখ্য তরঙ্গের ও কল্লোলাদির উদয় হয়, সেইরূপ, সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী মহামহিম পরমাত্মা-সমুদ্রে এই বিশ্বরূপ কল্পনা উদিত বা উত্থিত হইতেছে[২৮।২৯]। সেই ব্রহ্মই স্বস্বভাবে হ্রস্ব ভাবনায় (হ্রস্ব=ক্ষুদ্র। ভাবনা=মনের কল্পনা) ভাবিত হইয়া হ্রস্বতরঙ্গাকারে প্রকটিত হইতেছেন। দীর্ঘভাবনায় ভাবিত হইয়া দীর্ঘ তরঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন[৩০।৩১]। তিনি যেন রসাতল ভাবনায় ভাবিত ও পতন ভয়ে ভীত হইয়া তীরাভিমুখে যাইতেছেন এবং যেন তিনি দীর্ঘকাল ভোগযোগ্য জন্ম পাইয়াছি, এরূপ ভাবনায় ভাবিত হইয়া গিরিবপ্রের ন্যায় (বপ্র=প্রাচীরাকার ক্ষুদ্রপর্ব্বতশ্রেণী) রত্নাদিরশ্মিজালে পরিশোভিত হইতেছেন[৩২।৩৩]। তিনিই চন্দ্র হইয়া আপনার শৈত্যাদি অনুভব করিতেছেন এবং দাবাগ্নি হইয়া আপনার জ্বালাময় শরীর অনুভব করিতেছেন[৩৪]। তিনিই মহাড়ম্বরযুক্ত রাজ্য কল্পনা ও তদভিমানে কৃতকৃত্য হইতেছেন। আবার তিনিই দেহের ছেদ ভেদ দাহ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া রোরুদ্যমান হইতেছেন কিন্তু হে মহামুনে! সমুদ্রে যত প্রকার তরঙ্গ থাকুক, বা উঠুক, সমস্তই জলের অনতিরিক্ত[৩৫।৩৭]। অপিচ, যে সকল রূপের (আকারের) বর্ণনা করিলাম, সে সকলের কিছুই সৎ নহে। সেই সেই পদার্থ ও সেই সেই হ্রস্বদীর্ঘাদি গুণ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ স্বরূপে অবিদ্যমান[৩৮]। ঐ তরঙ্গাদি জলাদিরূপের বৈকল্য ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৯]। ইহা নষ্ট, তাহা অনষ্ট, ইহা জন্মিল, তাহা থাকিল, এ সকল, উক্তবিধ কল্লোলের পরস্পর মিলন (সমাবেশ) মাত্র অন্য কিছু নহে[৪০]। বস্তুতঃ ঐ সকল অম্বু অর্থাৎ জল ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। কাল বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! তুমি সমুদ্রতরঙ্গের দৃষ্টান্তে ইহাই অবধারণ করিবে যে, অতি বিস্তৃত অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাপী শুদ্ধ স্বচ্ছ নিরাময় স্ফাররূপ আদ্যন্তবর্জ্জিত ও সর্ব্বশক্তি চিদ্বপুঃ ব্রহ্মে এ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের তিরোধান বশে পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, পরন্তু ঐ সকলের কিছুই বাস্তব পৃথক্ নহে। সমস্তই ব্রহ্ম[৪১।৪২]। তাঁহার যে নিজশরীরস্থিত বিচিত্রাকার ও চঞ্চল-

স্বভাব নানা শক্তি, সেই শক্তিই এই নানা ভাবোদয়ের কারণ[৪৩]। যেমন জলের তরঙ্গ জলেরই বৃংহণ, তেমনি, ব্রহ্মের বিশ্বাকার বিবর্ত্তন ব্রহ্মেরই বৃংহণ অর্থাৎ বিবর্ত্তবৃদ্ধিভাব। ব্রহ্মই স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কল্পিত রূপ দ্বারা স্বয়ং বিবর্ত্তিত হইতেছেন[৪৪]। অতএব, যাহা বলিলাম, তদ-তিরিক্তা জগন্নাম্নী কল্পনা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের মধ্যে অল্প মাত্রও ভেদ বিদ্যমান নাই[৪৫]। শ্রুতিও বলিয়াছেন, এই দৃশ্য বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম। এই যে জগৎ, ইহা কেবল ব্রহ্মই। কাল পুন-র্ব্বার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি ইহাই পরিভাবিত করিবে যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছু নাই। তুমি ব্রহ্মকেই চিন্তা কর, আর সব পরিত্যাগ কর[৪৬]। অর্থাৎ দৃশ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করা আবশ্যক। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একরূপা নিয়তি, তাহা ব্রহ্মরূপিণী। সেই ব্রহ্মরূপিণী মূল শক্তি নানারূপিনী হইয়া পদার্থসমূহে অবস্থান করিতেছে। আত্মস্বরূপভূত বাসনারূপিনী নিয়তি জড় ও অজড় উভয়কেই গ্রহণ করে, পরন্তু চিত্ত অবশেষে চিন্ময় পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়[৪৭।৪৮]।

হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! স্পন্দনশীল পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ব্রহ্মের নানা রূপ প্রকাশমান রহিয়াছে[৪৯]। সেই পরমাত্মাই নানা আকার পরিগ্রহ করতঃ আপনার দ্বারা আপনাতে নানাপ্রকারে বিহার করিতেছেন। যেমন বিচিত্র বীচিমালা সলিলব্যতিরিক্ত নহে, সেইরূপ, এ সমস্ত কল্পনা সেই বিশ্বেশব্যতিরিক্ত নহে[৫০।৫১]। যেরূপ শাখা, পুষ্প, ফল, লতা ও কোর-কাদি, সমস্তই একমাত্র বীজে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ, সর্ব্বপ্রকার শক্তি সেই পরব্রহ্মেই বিদ্যমান রহিয়াছে[৫২]। যদ্রূপ উগ্র আতপে বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, সেই দেবেশে বিচিত্রা সদসন্ময়ী বিচিত্রা শক্তি বিদ্যমান দেখা যায়[৫৩]। যেরূপ পয়োদ হইতে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনু সমুদিত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে শক্তি সমুদায় প্রকটিত হয়[৫৪]। যেমন ঊর্ণনাভ হইতে তন্তু ও পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ, সেই অজড় পরব্রহ্ম হইতে তদীয় ভাবনামূলক বিবিধ অজড় ও জড় বস্তুর আবির্ভাব হয়[৫৫]। হে ব্রহ্মন্! মঙ্গলময় পরমাত্মাই আত্মাজ্ঞান ভাবনায় ভাবিত হইয়া কোশকার কৃমির ন্যায় জগৎ কোশ বিস্তার করিয়াছেন[৫৬]। পরন্তু, যদ্রূপ মত্ত হস্তী ত্বরায় আলান হইতে বিমুক্ত হয়, তদ্রূপ, তিনিও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় পূর্ণস্বরূপতা ভাবনার দ্বারা এই সংসার হইতে বিমুক্ত

হইয়া থাকেন[৫৭,৫৮]। আত্মা স্বয়ং যখন যে প্রকার ভাবনা করেন, তখনই তাঁহার তদুপযোগিনী মহতী শক্তি উদ্রিক্ত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপে প্রকটিত করে। যেমন প্রাবৃটকালের মহতী মিহিকা (কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টি) সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি, তাঁহার ভাবনাও ক্ষণকাল মধ্যে ভাবনীয় বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়[৫৯,৬০]। তাঁহার যখন যে শক্তি উদিত হয় তৎক্ষণাৎ তিনি তদ্রূপী হন[৬১]।

হে ব্রহ্মন্! ঈশ্বরের আবার মুক্তি কি? আত্মারই বা বন্ধন কি? আমি জানি না যে, লোকপ্রবাদসিদ্ধ বন্ধ মোক্ষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল! (অর্থাৎ বন্ধ মোক্ষ উভয়ই অজ্ঞপরিকল্পিত)[৬২]। বস্তুতঃ বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই। আমি দেখিতেছি, সমস্তই তন্ময় (ব্রহ্মময়)। অহো! জগৎ কি অদ্ভুত মায়ায় বিরচিত। অহো কি ব্যতিক্রম! অনিত্য নিত্যকে সদা গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। (অনিত্য=অবিদ্যা। তদ্দ্বারা নিত্য ব্রহ্মের গ্রাস অর্থাৎ আচ্ছাদন)[৬৩]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, ব্রহ্ম যেক্ষণে চিত্তকল্পনা (মনের বৃত্তি) করেন, সেই ক্ষণেই তিনি কোশকার কীটের ন্যায় চিত্ত কর্তৃক কবলিত (আচ্ছাদিত) হন[৬৪]। তখন তাঁহা হইতে মনের শক্তিসমুদয় শরীর সম্পন্ন হইয়া কোটী কোটী রূপ ধারণ করে[৬৫]। সেই সমুদয় কল্পিতরূপবতী শক্তি সেই ব্রহ্মে জাত ও সংস্থিত হইলেও চন্দ্রে মরীচির (মরীচি=জ্যোৎস্না) ন্যায় ও সমুদ্রে বীচিমালার ন্যায় পৃথক্‌রূপে পরিদৃশ্যমান হয়[৬৬]। সেই চিদ্রূপজলপরিপূর্ণ অতিবিস্তৃত পরমাত্মরূপ সমুদ্রের সেই সমুদয় শক্তির কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ ইন্দ্র, কেহ যম, কেহ চন্দ্র, কেহ সূর্য্য, কেহ কুবের আকারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন উক্ত ব্রহ্মসমুদ্রের এক একটী ক্ষুদ্র লহরী। ব্রহ্মসমুৎপন্ন ক্ষুদ্র লহরীর মধ্যে অন্যান্য লহরী দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সুর, অসুর, নর, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, অহি, গো, অজ, মশক, অজগর প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কেহ হনন করিতেছে, কেহ অনুষ্ঠান রত আছে, এবং কেহ বা তুষ্ণীম্ভাবে আছে। উহাদের চেষ্টাও অতি চপল। অপিচ, কেহ ঊর্দ্ধে উৎপতিত, কেহ অধঃ নিপতিত, কেহ পরিবল্গিত (ধাবমান) হইতেছে দেখা যায়। কাহার আকার স্থির, কাহার আকার স্থায়ী এবং কেহ বা উৎপন্নপ্রধ্বংসী। সকলেই ব্রহ্মমহাসমুদ্রের বুদ্বুদ

স্থানীয়[৬৭,৬৯]। কোন কোন লহরী অতি চপল। তাহারা বানর, মৃগ, গৃধ্র ও জম্বুক প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে[৭০]। অন্যান্য লহরীর মধ্যে কেহ কেহ এই সংসারস্বপ্নসম্ভ্রমে সুদীর্ঘ জীবিতা, কেহ অত্যল্পজীবিত্ব, কেহ বৃহদ্দেহিতা, কেহ ক্ষুদ্রশরীরত্ব এবং কেহ বা স্বীয় চিরজীবিত্ব বিধায়ক ভাবনাপরায়ণ। তদ্ভিন্ন কেহ দৃঢ় বিকল্পনার দ্বারা বিনাশশীল, কেহ জগতের স্থিরত্বকল্পনায় নিরত, কেহ দৈন্যাদি দোষ সমূহের বশীভূত এবং কেহ কেহ "আমি কৃশ, দুঃখী, আমি অল্পজীবী ও মূঢ়" এই-রূপ ভাবনার দ্বারা দুঃখপরম্পরার বশীভূত হইয়া প্রস্ফুরিত হইতেছে। কেহ কেহ স্থাবরত্ব ও কেহ কেহ জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ভূতলে অনেক শত কল্প অবস্থান করিতেছে এবং কেহ কেহ বা ইন্দুর (চন্দ্রের) ন্যায় জ্ঞানামৃতে পরিপূর্ণ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! মনন-নামধারিণী চিৎসম্বিদ্ এই প্রকারে সেই ব্রহ্মরূপ অর্ণব হইতে বিলোলা লহরীর অনুরূপে সমুদিত হইয়া প্রস্ফুরিত হয়[৭১,৭৫]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

——)(*)(——

কাল বলিলেন, হে মুনিবর! সুর, অসুর ও নর, ইত্যাদি আকারের সম্বিদ ব্রহ্মসমুদ্রের সহিত অভিন্ন। যাহা সম্বিদের ভেদক তাহা মিথ্যা। অর্থাৎ প্রতীয়মান প্রপঞ্চ অসত্য, কেবল একমাত্র মূল প্রতীতিই সত্য[১]। হে ব্রহ্মন্! জীবগণ শুদ্ধব্রহ্ম স্বভাব হইয়াও মিথ্যা বিভাবনের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা "আমরা ব্রহ্ম নহি" অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করতঃ অধোগত হই-তেছে[২]। তাহারা ব্রহ্মার্ণবে অবস্থিত থাকিলেও ব্রহ্মব্যতিরিক্ততা চিন্তা করতঃ (অহং এই মিথ্যা পরিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবিত হইয়া) ভীষণ ভব-ভূমিতে বিমোহিত হইতেছে[৩]। এই যে বিষয়োপলক্ষিত সংবিৎ (জ্ঞান), এ সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসংবিৎ-ই মননের (অহং দেহী, এইরূপ মনোবৃত্তির) দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া জীবকর্ম্ম সমূহের বীজ হইয়াছে। পরন্তু তাহা স্বভাবতঃ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাতীত। অথবা নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয়[৪]। হে মুনিবর! এই যে, অন্তঃস্থ সঙ্কল্পের উদ্রেক, ইহাই কর্ম্মপ্রচয়রূপ করঞ্জের বীজ[৫]। এই যে, প্রস্তরসদৃশ জড় শরীরশ্রেণী, এ সমুদায়ই চলন, বিচলন, সঙ্কলন, রোদন ও হাস্যাদিরূপ ক্রিয়ায় সমন্বিত। (তদুপলক্ষিত চেতন ব্রহ্ম ঐ সকল ক্রিয়ায় নির্লিপ্ত)[৬]। পবন যেমন স্বসংসৃষ্ট পদা-র্থকে পরিচালিত করে, স্পন্দিত করে, সেইরূপ, ব্রহ্মচৈতন্যই আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত তুচ্ছ শরীর পংক্তিকে উল্লাসিত, বিলাপিত, পরিম্লান ও বিহ-সিত করিতেছে[৭]। ঐ সকল শরীরী দিগের মধ্যে কেহ কেহ নিতান্ত পরিশুদ্ধ। যেমন হরিহর প্রভৃতি। কেহ কেহ অল্প বিমোহিত। যেমন নর, নাগ ও অমরগণ[৮]। কেহ কেহ অত্যন্ত বিমোহিত। যেমন তরু ও তৃণাদি। কেহ কেহ অজ্ঞান দ্বারা বিমূঢ় হইয়া কৃমিকীটাদি ভাব প্রাপ্ত[৯]। কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে তৃণবৎ উহ্যমান হইতেছে, তীর প্রাপ্ত হইতেছে না। যেমন উরগ ও নগ প্রভৃতি। কেহ কেহ শাস্ত্রাদি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিতামাত্র জ্ঞাত হইয়া তদভিমুখীন হইতে না হইতেই কৃতান্ত ও বিঘ্নকারী দুরদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাদিগের অবলম্বনীভূত

যোগ ভূমিকার মূল নষ্ট (ছেদন) করিয়া দিতেছে[১০,১১]। কেহ কেহ সেই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাম্বুধির অন্তরে প্রবৃষ্ট হইয়া সশরীরে ব্রহ্মস্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা হরি হর ব্রহ্মাদি[১২]। কেহ কেহ অল্পমোহপ্রযুক্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের মধ্যে অপ্রাপ্তপার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে[১৩]। কোন কোন ভূত (প্রাণী বা জীব) কোটী কোটী জন্ম উপভোগ করিয়াও পুনর্ব্বার জন্মৌঘসহস্র ভোগ করিবার নিমিত্ত রাগাদির দ্বারা অন্ধপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে[১৪]। কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধোভাগে, কেহ বা ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে, এবং কেহ বা অধঃ হইতে অধস্তন স্থানে (অতি নীচ যোনিতে) গমন করিতেছে। হে মহামুনে! সুখদুঃখের আকর স্বরূপ এবম্বিধ অক্ষয় সংসার বিষ কেবল স্বকীয় ব্রাহ্ম ভাবের (অহং ব্রহ্ম, এই জ্ঞানের) বিস্মরণপ্রযুক্তই সমুদ্ভূত হইয়াছে বটে, পরন্তু এ বিষের ব্যাঘাত বা বিনাশ কেবলমাত্র এক গরুড়স্থানীয় পরব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা সুসম্পন্ন হয়[১৫,১৬]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

——(*)——

কাল বলিলেন, মুনিবর! সাগরে উর্ম্মিমালার ন্যায় ও বসন্তকালে মাধবীলতায় পল্লবাদির ন্যায় অবস্থিত এই সমস্ত ভূতজাতির মধ্যে যাঁহারা মনোমোহ জয় করিতে সমর্থ হন, তাহারাই জীবন্মুক্ত হইয়া পরিভ্রমণ করেন, অবশিষ্ট নর অজ্ঞতাবিধায় কাষ্ঠ কুড্যাদির সহিত সমান থাকেন। যাহাদের মোহ অল্পীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, তাহারাই তত্ত্ব বিচারের অধীন হয়। (সাধন চতুষ্টয়=নিত্যানিত্য বিবেক, ফলভোগে বৈরাগ্য, শমদমাদি গুণ ও মোক্ষেচ্ছা) বিচারশাস্ত্র কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিতুল্য অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী, উভয়ের জন্য নহে[১।৩], অল্প অজ্ঞ দিগের জন্যই বিচার শাস্ত্রের উদয়। অজ্ঞ অবোধ দিগের উদ্ধারার্থ অর্থাৎ তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানার্থ আত্মজ্ঞজনগণ কর্তৃক যে সকল শাস্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র অদ্যাপি ইহ জগতে প্রচার প্রাপ্ত রহিয়াছে[৪]। যে সমস্ত জীবের আশয় (অন্তঃকরণ) পরিশুদ্ধ ও দুষ্কৃতসমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহাদেরই নির্ম্মল বুদ্ধি শাস্ত্রসমূহে প্রবর্ত্তিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়[৫]। সূর্য্য যেমন নভোভ্রমণ দ্বারা তিমির বিনাশ করেন, তাহার ন্যায় শাস্ত্রও স্বপ্রচার দ্বারা জীবগণের মনোমোহ বিদূরিত করেন। যাহারা তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রাদির দ্বারা মনোমোহ তিরোহিত করিতে না পারে, তাহাদের মন ক্ষীণ হয় না, অধিকন্তু তাহাদের মন নীহারপটলীর দ্বারা দিগন্ত প্রচ্ছাদনের ন্যায় মোহে সমাচ্ছন্ন হয়, হইয়া বেতালের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে[৬।৭]। হে মুনে! মনঃই সমস্ত ভূতজাতির সুখদুঃখভোগী শরীর। এই যে, মাংসময় দেহ, ইহা সুখদুঃখাদিভোগের আধার নহে[৮]। সেইজন্য বলিতেছি, এই ভূতপঞ্চকের বিকার মাংসাস্থিসংঘাত স্থূল দেহকে তুমি মনের কল্পনা বলিয়া জানিবে[৯]। হে মুনে! তোমার পুত্র মনোরূপ দেহ দ্বারা যাহা কল্পনা করিয়াছে তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে; সে বিষয়ে আমরা অল্পমাত্রও অপরাধী নহি[১০]। যে স্বীয় প্রবল বাসনায় যাহা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; ইতর ব্যক্তির তাহাতে অল্পমাত্রও কর্ত্তৃত্ব নাই[১১]। বাসনামাত্র উপাদানে মনের দ্বারা অন্তরে যাহা কৃত

হয়, এমন ভুবনেশ কে আছে যে, তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ[১২]। নরকভোগ ও জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই মনের সৃষ্টি। মন অত্যল্প বিচলিত হইলেই দুঃখপ্রদ হয়[১৩]।

হে ভগবন্! এক্ষণে আগমন করুন, আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। আপনার তনয় যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন আমরা সেই স্থানে গমন করি[১৪]। আপনার পুত্র শুক্র প্রথমে চিত্তশরীরদ্বারা স্বর্গাদি উপভোগ করিয়া চন্দ্ররশ্মি যোগে ক্রমে এই ভূতলে মানব হইয়া, এক্ষণে সমঙ্গানদীতীরে তপস্যা করিতেছেন[১৫]। অনন্তর ভগবান্ কাল হাস্য করিতে করিতে ঐরূপ কহিয়া ইন্দুসন্নিভ ভৃগুকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ভৃগুও "অহো! নিয়তির ব্যবস্থা অতি বিচিত্র" এইরূপ বলিতে বলিতে উদয়াচলে রবির ন্যায় উত্থিত হইলেন[১৬-১৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! অতঃপর সেই তমালপরিশোভিত মন্দর পর্ব্বতে সেই তেজোনিধিদ্বয় যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া সজলদ অম্বরে যুগপৎ সমুদিত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ঐরূপ কহিতেছেন এমন সময়ে দিবাবসান হইল। ভগবান্ সহস্রকিরণ যেন সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থই অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভ্যগণ পরস্পর অভিবাদন করতঃ সায়ন্তন কার্য্য করণার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং নিশাবসানে পুনঃ সূর্য্যোদয় হইলে পুনর্ব্বার সেই সভায় সকলে সমবেত হইলেন[১৯,২০]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! অনন্তর মহাদ্যুতি কাল ও ভৃগু উভয়ে সেই মন্দরাচল হইতে সমঙ্গাতটে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শৈলতট হইতে অবরোহণ করতঃ অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তাহার কোন স্থলে নভশ্চরগণ হেমলতাজালজড়িত কুঞ্জ মধ্যে নিদ্রিত রহিয়াছে[১।২]। কোন স্থলে তাহারা লতাবলয়দোলায় দোলক্রীড়া করিতেছে। তাহাদের বিলোলনয়নের কটাক্ষনিক্ষেপ যেন নীলোৎপল বিকীরণের অনুকার করিতেছে[৩]। কোন স্থলে ত্রিজগদ্দর্শন সমর্থ সিদ্ধগণ উত্তুঙ্গ শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া উৎসাহ সহকারে তপোঽনুষ্ঠান করিতেছেন[৪]। কোন স্থলে বৃহৎকায় গজযূথপতিগণ অজস্রনিপতিত ধারাসারসদৃশ পুষ্পরাশিতে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব তালবৃক্ষসদৃশ সমুন্নত শুণ্ডসমুদয় উত্তোলন করিতেছে[৫]। কোথাও বা পুষ্পপরাগে অরুণবর্ণ হস্তিগণ মদোন্মত্ত ও নিদ্রাবিহীন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে চঞ্চল চমরমৃগগণ পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের চারু চামর হইয়া অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে অজস্রনিপতিত পুষ্প-নিকরমধ্যে কিন্নরগণ অবস্থান করিতেছে। কোন স্থলে অসংখ্য খর্জ্জূর তরু অসংখ্য ঋজু শাখা সকল বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। উৎকট ভ্রমণকারী পাটলবর্ণ বিকৃতবদন বানরেরা ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি খর্জ্জূরাদি ফল নিক্ষেপ করিতেছে। তাহাতে নিকটস্থ কীচক (কীচক=বাঁশ) শ্রেণীরাও যেন ফলধারী হইয়াছে[৬।৯]। কোন স্থানে দেখিলেন, অমরনারীগণ সিদ্ধগণের (সিদ্ধ=দেবযোনি বিশেষ) সহিত কুসুম ক্রীড়া করিতেছে[১০]। সেই হিমশৈলের কোন কোন তটপ্রদেশ এত নির্জ্জন যে সে সকল স্থানের সহিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মন তুলিত হইতে পারে। কোন কোন স্থানে সরিৎসমূহ যেন সাগররূপ কান্তসমীপ গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়া কুন্দমন্দার প্রভৃতি পুষ্পনিকররূপ রঞ্জিত বসন পরিধান ও বাসন্তীপুষ্পরাজিরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতেছে[১১]। কোন স্থানে পুষ্পভার দ্বারা

নমিতাঙ্গ ও পবনকম্পিত বৃক্ষগণ যেন বসন্ত সমাগমে মত্তপ্রায় হইয়া মধুকররূপ নয়ন সমুদয় বিঘূর্ণিত করিতেছে[১২]।

হে রাঘব! তাঁহারা শৈলরাজ হিমালয়ের ঈদৃশী মনোহর শ্রী দর্শন করিতে করিতে শীঘ্রই পুরপত্তনমণ্ডিতা বসুমতীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবিলম্বে সেই লোলতরঙ্গিণী সর্ব্বপ্রকার পুষ্পপাদপে বিভূষিতা সমঙ্গা নদীর তটপ্রদেশে উপনীত হইলেন[১৩।১৪]। অনন্তর মহর্ষি ভৃগু সেই সমঙ্গাতটে উপনীত হইয়া স্বীয় পুত্রকে অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পুত্র দেহান্তর প্রাপ্ত, অন্য ভাবাক্রান্ত, অন্যরূপসম্পন্ন, শান্তেন্দ্রিয় ও সমাধিস্থ। কবিগণ ইহাকে দেখিলে বর্ণনা করিতে অর্থাৎ এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করিতে পারেন যে, তিনি যেন স্থিরচিত্তে অনাদিসংসারের দীর্ঘ পরিশ্রমের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এবং শ্রান্ত হইয়া অবশেষে শ্রম বিনাশের নিমিত্ত চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতেছেন[১৫।১৬]। চিরভুক্ত হর্ষশোকপ্রবাহযুক্ত সংসারজলধি হইতে চিরনির্ম্মুক্ত হইয়া এক্ষণে তাহারই অনন্ত গতি চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চল হইয়াছেন। অনাদি কাল হইতে অনন্ত জগদম্ভোনিধির আবর্ত্ত বিবর্ত্তনে পরিভ্রামিত হইয়া এক্ষণে তাহা হইতে চিরমুক্তি লাভ করতঃ শান্তিরূপ মহাশৈল অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায় পরম সুখে সেই নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন[১৭]। চক্র যেমন অতি ভ্রমণের পর ভ্রমণরহিত ও নিশ্চল হয়, তিনিও যেন সংসার চক্রে অতি ভ্রমণের পর প্রশান্ত, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব বর্জ্জিত হইয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনে নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া এক্ষণে যেন লোকগতির প্রতি উপহাস প্রয়োগ করিতেছেন। অপিচ, তিনি যেন অখিল প্রবৃত্তি সমূহ পরিজ্ঞাত ও অশেষ ফলরাজির ভোক্তা হইয়া এক্ষণে কল্পনাজালবিবর্জ্জিত, পরমপদাশ্রিত, অনন্ত পরমাত্মায় বিশ্রান্ত, সুতরাং হেয়োপাদেয়সঙ্কল্পবিহীন, প্রবুদ্ধমতি ও সুধীর হইয়াছেন। ভৃগু আপনার পুত্রকে এক্ষণে উক্তবিধ দেখিলেন[১৮।২৩]।

অনন্তর কাল ভৃগুকে তাদৃশ ভাবাপন্ন তদীয় পুত্রকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়া অব্ধিগম্ভীর নিঃস্বনে কহিলেন, ঋষে! এই তোমার পুত্র[২৪]। পরে ভগবান্ কাল "ইনি প্রবুদ্ধ হউন" এইরূপ কহিলে, সমাধিনিমগ্ন ভার্গব কালের সেই ঘনগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বর্ষাসমাগমে শিখণ্ডীর

ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রবুদ্ধ হইলেন[২৫]। এবং চক্ষুরুন্মীলন করিবা মাত্র সম্মুখে যুগপৎ সমুদিত সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় সেই কাল ও ভৃগুকে দেখিতে পাইলেন[২৬]।

অনন্তর ভার্গব সেই তীরভূমিস্থিত কদম্বতলপ্রদেশ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমকান্তি ও হরিহরের ন্যায় সমাগত বিপ্রদ্বয়কে প্রণাম করিলেন[২৭]। পরে তাঁহারা পরস্পর সময়োচিত সমালাপ অন্তে মেরু-পৃষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ন্যায় তত্রস্থ কোন এক উচ্চ শিলাতলে উপবেশন করিলেন[২৮]।

হে রামচন্দ্র! তৎপরে সেই দ্বিজ (শুক্র) সমঙ্গাতটে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সমাগত কাল ও ভৃগু উভয়কে অমৃতময় বাক্যে কহিলেন[২৯], হে দেবদ্বয়! আমি একসঙ্গে সমাগত হিমাংশুর ও উষ্ণকিরণের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করিয়া অদ্য পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলাম[৩০]। আমার যে মোহ শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা ও উপাসনার দ্বারা বিনষ্ট হয় নাই, সেই মোহ আজ্ আপনাদিগের দর্শনে সম্পূর্ণরূপে সংক্ষীণ হইল[৩১]। মহৎগণের নির্ম্মল দৃষ্টি জনগণের অন্তরে প্রবেশ করতঃ যাদৃশ সুখোৎ-পাদন করে, নির্ম্মল অমৃতবৃষ্টিও তাদৃশ হর্ষোৎপাদনে সমর্থ হয় না[৩২]। যেমন সমুদিত চন্দ্রসূর্য্যের বিচরণে নভোমণ্ডল পবিত্র হয়, তেমনি আজ্ আপনাদিগের চরণস্পর্শে এই প্রদেশ অতীব পবিত্র হইয়াছে। হে দেবদ্বয়! এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, পবিত্রকারী ও ভূরিতেজস্বী আপনারা কে[৩৩]?

হে রঘুনাথ! ভার্গব ঐরূপ কহিলে, ভগবান্ ভৃগু সেই পূর্ব্বপুত্র-উশনাকে পুত্র সম্বোধনে বলিলেন, পুত্র! তুমি এখন অজ্ঞানী নহ, প্রবুদ্ধ হইয়াছ। অতএব আপনাকে স্মরণ কর[৩৪]। আত্মস্মরণদ্বারা সমস্তই পরিজ্ঞাত হইবে। অনন্তর ভার্গব ভৃগুকর্ত্তৃক ঐরূপে প্রবোধিত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য ধ্যানোন্মীলিতনেত্র হইলেন। অনন্তর তন্মুহূর্ত্তেই তিনি আপনার সমুদায় জন্মান্তরদশা স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তিনি বিস্ময়প্রযুক্ত, ক্ষণকাল বিকশিত-বদন ও আনন্দমনা হইয়া পরে বিতর্কমন্থর-বাক্যে বক্ষ্যমাণ বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন[৩৫।৩৬]।

"পরমাত্মব্যবস্থিত নিয়তির উদয় হউক। যাহার দ্বারা এই জগচ্চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং যাহার শক্তি, সামর্থ্য ও নিয়মাদি সর্ব্বথা সর্ব্ব-

জনের অবিদিত, সেই নিয়তিরূপ ব্রহ্মের জয় হউক[৩৭]। অহো! আমি অদ্য কল্পান্ত সৃজনের ন্যায় মদীয় অতীত অনন্ত অবিদিত জন্মান্তর ও দশাফল সকল বিদিত হইলাম[৩৮]। অহো! ইতিপূর্ব্বে আমি কত শত কঠিন সংরম্ভ (ক্রোধ ও উদ্যোগ প্রভৃতি) যুক্ত রাজা, রাজপুরুষ, ও উপার্জ্জনভ্রান্তি দর্শন করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি লোকসম্পর্ক শূন্য সুমেরুস্থ দেবভূমিতে বিহার করিয়াছি[৩৯]। অহো! আমি পারিজাতপরিমল যুক্ত মন্দাকিনী জল পান করিয়াছি, তাহার কহ্লার পরিশোভিত তটে ক্রীড়া করিয়াছি,[৪০] মন্দরকুঞ্জে, সুমেরুশিখরে ও কল্পপাদপতলে পরিভ্রমণ করিয়াছি[৪১]। অধিক কি বলিব, এমন কিছুই নাই, যাহা মৎকর্ত্তৃক ভুক্ত, কৃত বা দৃষ্ট হয় নাই[৪২]। এক্ষণে আমি যাহা জ্ঞাতব্য তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দর্শন করিয়াছি, শ্রান্ত ছিলাম, এক্ষণে চিরবিশ্রান্ত হইয়াছি। আমার সমুদায় ভ্রম বিগলিত হইয়াছে[৪৩]। অতএব হে পিতঃ! এখন চলুন, আমরা সেই মন্দরাচলসংস্থিত মদীয় শুষ্কবনলতাসদৃশ পরিত্যক্ত দেহ দর্শন করিব[৪৪]। আমার বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত কিছুই নাই; তথাপি আমি নিয়তির রচনা পরম্পরা সন্দর্শনের নিমিত্ত বিহার এবং একাত্মবুদ্ধির দ্বারা শুভাবহ ও আর্য্যগণসেবিত বস্তুর অনুস্মরণ করিব। আর আমি পূর্ব্ববৎ মূঢ় থাকিব না, সুতরাং আমার পূর্ব্বতন মতি সম্যক্ সমাগত হইলেও তদ্দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হইবে না[৪৫।১৬]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! সেই তত্ত্বজ্ঞ ত্রয় উক্ত প্রকারে জগতের গতি বিচার করিতে করিতে সমঙ্গাতট হইতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১]; নভোভাগ আক্রমণ করতঃ অম্বুদ মধ্যস্থ ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া সিদ্ধগণের পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন[২]। ঐরূপে আকাশ পথে গমন করতঃ অবিলম্বে সেই মন্দরাচল কন্দরে উপনীত হইলেন এবং দেখিলেন, সেই পর্ব্বতের অধিত্যকায় ভার্গবের সেই পূর্ব্বজন্মোদ্ভূত দেহ গলিত পর্ণের ন্যায় শুষ্ক ও খণ্ডীভূত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে[৩]।

তখন ভার্গব তদীয় সেই পরিত্যক্ত দেহকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া মহর্ষি ভৃগুকে বলিতে লাগিলেন, হে তাত! আপনি যাহাকে বিবিধ-সুখসেব্য ভোগ্যের দ্বারা অতিযত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন, দেখুন, এই সেই দেহ শুষ্ক ও সংক্ষীণ হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে[৪]। ধাত্রী (যে সন্তান প্রতিপালন করে, সে ধাত্রী নামে অভিহিত হয়) স্নেহের বশীভূত হইয়া যাহার সমস্ত প্রত্যঙ্গে (প্রত্যঙ্গ=হস্ত পদাদি) কর্পূর ও অগুরু চন্দনাদি অনুক্ষণ বিলেপন করিত, দেখুন, এই সেই দেহ বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত রহিয়াছে[৫]। আপনি যাহার নিমিত্ত মন্দার কুসুম আহরণ করিয়া সুখস্পর্শ সমীরণসঞ্চার ভূমিতে সুশীতল শয্যা রচনা করিতেন, দেখুন, এই সেই দেহ ধরাতলে কি বিকৃত আকারে নিপতিত রহিয়াছে[৬]। সুরসুন্দরীরা এই শরীরকেই যত্ন সহকারে লালন করিত। দেখুন, দেখুন, আমার এই সেই দেহ সরীসৃপগণ কর্ত্তৃক ছিদ্রীকৃত হইয়া ধরাতলে শায়িত রহিয়াছে। হে পিতঃ! যাহা অনুক্ষণ নন্দনোদ্যানে বিলাস করিত, এক্ষণে মদীয় সেই শরীর শুষ্ককঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে দৃষ্ট করুন[৭।৮]। সুরাঙ্গনাগণের অঙ্গসংসর্গার্থ যাহার অবয়বীভূত চিত্তসমুদ্রে উত্তুঙ্গ কামতরঙ্গ উচ্ছসিত হইত, মদীয় সেই দেহ অদ্য সমস্ত চিত্তবৃত্তি রহিত হইয়া শুষ্ক হইতেছে[৯]। হা শরীর! তুমি সেই সমস্ত বিলাস, সেই সমস্ত দশা ও সেই সমস্ত ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া এ কি অভূতপূর্ব্ব প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছ? হা মদীয় দুর্ভাগ্যময় দেহ!

তুমি এক্ষণে শবনামধারী শুষ্ক কঙ্কাল মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া আমাকেও বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছ[১০।১১]। হা ধিক্! আমি, যে দেহে অবস্থিত থাকিয়া নানা বিলাস পরম্পরায় বিহার করিয়াছি, সেই দেহ আজ্ কঙ্কালতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে দেখিতেও ভীত হইতেছি[১১]। অহো! আমার যে দেহের বক্ষঃপ্রদেশে তারাজালসদৃশ মনোহর হারাবলী বিন্যস্ত থাকিত, সেই দেহকে আজ্ পিপীলিকাগণ বাসভূমি করিয়া লইয়াছে[১৩]। বরাঙ্গনাগণ যাহার গলিতকাঞ্চনসদৃশ কান্তি দেখিয়া কামভোগাভিলাষিণী হইত, সেই দেহ আজ্ ভীষণদর্শন কঙ্কালে পর্য্যবসিত হইয়াছে[১৪]। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, বনস্থিত মৃগেরা আমার এই বিকট দর্শন, তাপসংশুষ্ক, বিকৃতবদন ও কঙ্কালময় দেহ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে[১৫]। পিতঃ! দেখুন, দেখুন, আমার শবকঙ্কাল দেহের উদরবিবরে প্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণ প্রকাশ দ্বারা কেমন শোভমান হইতেছে। আহা! উহা যেন বিবেকের শোভা[১৬]। অহো! আমার এই শুষ্ক তনু উত্তুঙ্গ শিলাতলে সংস্থিত থাকিয়া যেন সজ্জনদিগকে বৈরাগ্যোপদেশ করিতেছে[১৭]। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির লোভ হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করতঃই গিরিতটে শুষ্ক হইতেছে[১৮]। চিত্তরূপ পিশাচ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই যেন এখন এ, সুখে অবস্থিতি করিতেছে। এখন এ দৈবোৎপাদিত বিপদ্ সমূহে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত নহে[১৯]। অহো! চিত্তবেতাল সংশান্ত হওয়ায় মদীয় তনু যাদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, ত্রৈলোক্যের আধিপত্যও তদ্রূপ আনন্দ প্রদানে সমর্থ নহে[২০]। হে তাত! দেখুন, আমার এই দেহ এখন বিগতসন্দেহ, গতকৌতুক ও কল্পনাজাল পরিত্যাগী হইয়া বনমধ্যে কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে[২১]। হে পিতঃ! চিত্তরূপ মর্কট কর্ত্তৃক শরীররূপ বৃক্ষ অনুক্ষণ আলোড়িত হইয়া সময়ে সময়ে এরূপ বেগে বিচলিত হয় যে তদ্দ্বারা উহা ছিন্নমূল হইয়া যায়। অর্থাৎ চিত্তই শরীরকে বিবেকাদির অনধিকারী করিয়া তত্রস্থ জীবকে স্থাবরাদি যোনিতে সম্পাতিত করে[২২]। হে পিতঃ! আরও দেখুন, আমার দেহ এক্ষণে চিত্তরূপ অনর্থ হইতে বিমুক্ত হওয়ায় এই ভীষণ পর্ব্বতে সিংহের, জলদের ও গজাদির ভীষণ গর্জ্জনেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না অধিকন্তু যেন পরমানন্দস্বরূপে অবস্থান করি-

তেছে[২৩]। হে তাত! আমি দেখিতেছি, জন্তুদিগের সম্বন্ধে অচিন্তুতা রূপ শরদাগমন ব্যতীত সর্ব্বদিক্‌ব্যাপিনী মোহরূপা মিহিকার উপশমের অন্য উপায় নাই[২৪]। অচিন্তুতাই শ্রেয়ঃ, অন্য শ্রেয় নাই। যে সমস্ত জনগণ শান্তধী ও বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই স্ব স্ব মহা বুদ্ধির দ্বারা পরম সুখ সম্ভোগের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব, হে তাত! আমি আজ্ সৌভাগ্য বশতঃই অদ্য এই বনে মদীয় মনোরহিত, সর্ব্বদুঃখদশা হইতে বিমুক্ত সুতরাং বিগতজ্বর দেহকে দেখিতে পাইলাম[২৫।২৬]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! ভার্গব ভৃগুজাত দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অপিচ, ভৃগুর উৎপাদিত শরীর বহু পূর্ব্বে পরিত্যক্ত সুতরাং বিস্মৃতির অধিকারে লুপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু বহু কাল পরে আজ্ পুনঃ সেই কঙ্কালাবশিষ্ট শরীর দেখিযা তৎপ্রতি তাঁহার অতিশয়িত স্নেহ ও তদর্থে পরিদেবনা উৎপন্ন হইল, ইহার কারণ কি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[২৭।২৮]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। পূর্ব্বকল্পে এই শুক্রজীবের জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুদায় তদীয় উৎক্রমণ কালে ভৃগূৎপদ্য শরীরাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তৎক্রমে এই ঔশনস দেহ জন্মে যে ক্রমে বা প্রকারে এই শুক্রদেহ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়ে ইনি পরম পদে (মায়া সম্বলিত ঈশ্বরে বিলীন) অবস্থিত ছিলেন, পরে কল্পান্ত কাল আগতে আকাশাদি ভাবে ক্রমিক অবস্থান এবং তৎপরে শাস্ত্রোক্ত ক্রমে শস্যাদি গত হইয়া ভৃগুর হৃদয়ে প্রবেশ ও রেতোভাব প্রাপ্ত হইয়া তদ্ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করতঃ এই শুক্রশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২৯।৩১]। * সেই শরীর ব্রাহ্মণোচিত দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া কালক্রমে শুষ্ককঙ্কালরূপে পরিণত হইয়াছে। শত শত শরীর পরিগ্রহ করিলেও শুক্র এই শরীরকে প্রবল প্রাক্তনের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই কারণে এই শরীরের প্রতি শুক্রের মমতাধিক্য আবির্ভূত হইয়াছিল[৩২।৩৩]। যদিও শুক্র শরীরধারণে অনিচ্ছুক ও বীতরাগী, তথাপি, স্বীয় প্রবল প্রাক্তনের বাধ্য হইয়া

* যে ক্রমে শুক্রশরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং যে কারণে শুক্র ভৃগূৎপদ্য শরীরের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়াছিলেন, সে ক্রম ও সে কারণ অতঃপরই টীকার আকারে বর্ণন করিব।

প্রাক্তন শরীরের নিমিত্ত অনুশোচনা করিতেছিলেন। কারণ এই যে, কেহই প্রাক্তন অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে[৩৪]। * দেহ ধারণের স্বভাব এই যে, যত দিন ভোগ থাকে, তত দিন কেহই তাহার অতিবর্ত্তন করিতে পারে না। জ্ঞানীর দেহই হউক, আর অজ্ঞানীর দেহই হউক, তাহা ব্যবহারী অংশে সমান। প্রভেদ এই যে, জ্ঞানীর দেহ অনাসক্তি পূর্ব্বক এবং অজ্ঞানীর দেহ আসক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হয়[৩৫]। সেইজন্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ইহারা লৌকিক ব্যবহারে সমান বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ের মধ্যে দেহের ব্যবহার সমান বটে; পরন্তু উক্ত উভয়ের বাসনা সমান নহে। বাসনা সমান নহে বলিয়াই বন্ধ মোক্ষের ব্যবস্থা স্থির থাকে। মূর্খদিগের বাসনা থাকে, সেইজন্য তাহারা বদ্ধ, এবং পণ্ডিতেরা বাসনা বিহীন হয়, সেই কারণে তাহারা মুক্ত[৩৬।৩৭]। যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ ধীর ব্যক্তিরাও অপ্রবুদ্ধের ন্যায় আপনাদিগকে দুঃখে দুঃখীর এবং সুখে সুখীর ন্যায় অন্যের জ্ঞানগম্য করান[৩৮]। মহাত্মারা দৃশ্য ব্যবহার বিষয়ে ঐরূপ, পরন্তু তত্ত্ব বিষয়ে ঐরূপ নহেন। অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা স্থির, অজ্ঞদিগের ন্যায় অস্থির

---

* এক্ষণে যাহাকে শুক্র বলা হইল, এই জীব পূর্ব্ব কল্পে যে সকল সৎকর্ম্ম (উপাসনাদি) করিয়াছিলেন, সে সকল সৎ কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল গ্রহপদ প্রাপ্তি: সেইজন্য শুক্র নব গ্রহের মধ্যে অন্যতম। পূর্ব্বকল্পে এই শুক্র, পূর্ব্বকল্পে যে শরীরে গ্রহাধিকার প্রাপক তপস্যাদি করিয়াছিলেন, সে শরীর নাশের সময় অর্থাৎ মরণ কালে সেই সকল তপস্যা জনিত শুভাদৃষ্ট বাসনাকারে তদীয় কর্ম্মাশয়ে আবিষ্ট হইয়াছিল, পরন্ত তাঁহারই অব্যবহিত পরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়ায় ঐ কর্ম্মাশয় কার্য্যকারী হইতে পারে নাই। পরে পুনঃ সৃষ্ট্যারম্ভ হইলে ঐ জীব ক্রমিক আকাশাদি ভাব প্রাপ্তির পর পৃথিবীতে শস্য ভাব, তৎপরে ভৃগুর খাদ্য হইয়া তদীয় শরীরে প্রবেশ, তৎপরে তাহার রেতঃ হইয়া তদীয় ভার্য্যার উদরে প্রবেশ করতঃ ঐ শরীর লাভ করেন। শুক্র শরীর লাভ করিয়া কতিপয় কর্ম্ম ভোগ করিলেন বটে; পরন্তু মধ্যে কর্ম্মান্তরের ফল ভোগ হওয়ায় (অর্থাৎ অপ্সরালাভাদি ফলের কাল উপস্থিত হওয়ায়) গ্রহাধিপত্যজনক কর্ম্মের ফল অবরুদ্ধ থাকিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই প্রাক্তন-বাসনারব্ধ শরীর সন্দর্শনে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগার্থে শুক্রের তৎ শরীরের প্রতি স্নেহের উদয় হইল। শুক্র যদি ঐ শরীরের জন্য পরিদেবনা না করিতেন তাহা হইলে গ্রহাধিকার ভোগের নিয়তি ব্যর্থ হইত। নিয়তির নিয়ম অব্যর্থ বিধায় এবং আধিকারিক ফল অপরিহার্য্য বলিয়া শুক্রের প্রাক্তন শরীরের প্রতি পুনঃ মমতা উপস্থিত হইয়াছিল।

নহেন[৩৯]। যেমন সূর্য্য স্বতঃ স্থির; পরন্তু তাহার প্রতিবিম্ব অস্থির, তেমনি, তত্ত্বজ্ঞ জীব স্বতঃ স্থির; পরন্তু ব্যবহার বিষয়ে অস্থির[৪০]। জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বস্তুতঃ স্বস্থস্বভাব (অচঞ্চল) হইলেও অস্বস্থের (চঞ্চলের) ন্যায় দৃষ্ট হন। সেইরূপ ব্যবহারকারী জ্ঞানীরা অজ্ঞানীর ন্যায় দৃষ্ট হন[৪১]। ফলত, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত। কিন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ আছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত থাকিলেও বদ্ধ[৪২]। প্রকাশে তেজের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েই সুখ, দুঃখ, মোক্ষ ও বন্ধাদি বিদ্যমান আছে[৪৩]। অতএব, হে মহাবাহো! তুমি অন্তরে নিষ্ক্রিয়, বাসনাবিহীন ও শান্ত থাকিয়া বহিঃস্থিত লোকাচারে অবস্থান করিবে[৪৪]। দেহ থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি হইবে? তুমি সর্ব্বপ্রকার এষণা (অভিলাষ) বর্জ্জন করিয়া নির্ম্মলা বুদ্ধি অবলম্বনে বাহ্যিক কর্ম্ম সমুদয় সম্পাদন কর[৪৫]। বিবিধ আধিব্যাধি-রূপ আবর্ত্তযুক্ত সংসারহ্রদে ও মমতারূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হইও না[৪৬]। হে কমললোচন! তুমি দৃশ্য বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিও না এবং দৃশ্য বস্তুও যেন তোমাতে অবস্থিতি না করে। তুমি স্বীয় অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ বোধ উদিত করিয়া সুস্থির হও এবং সেই অমলস্বভাব সর্ব্বাত্মা পরম শান্ত অজ বিশ্বপতিকে ভাবনা করতঃ সুখী হও[৪৭।৪৮]।

মহাত্মন্! যদি তুমি মোহান্ধকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুভবদ্বারা সকল বাসনার নিবর্ত্তক অবিদ্যাশূন্য অমলপদ প্রাপ্ত হইতে পার, তাহা হইলেই আমাদিগের বন্দনীয় হইবে[৪৯]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! অনন্তর ভগবান্ কাল একচিত্ত হইয়া শুক্রের সেই সমস্ত আক্ষেপ যুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গম্ভীরনিঃস্বনে কহিলেন, ভার্গব! তুমি সমঙ্গাতীরস্থিত এই তাপসী তনু (দেহ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্থিবের নগর প্রবেশের ন্যায় তোমার পরিত্যক্ত এই তনুতে প্রবৃষ্ট হও১।২। এবং এই শরীরে তপশ্চরণ করতঃ যথাকালে অসুরগণের গুরুত্ব কার্য্য করিবে৩। পরে যখন মহাকল্লান্তকাল সমাগত হইবে তখন তুমি এই ভার্গবী তনু পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে আর তোমার শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না৪। তুমি এই প্রাক্তন শরীরেই জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করতঃ মহাসুরেন্দ্রগণের গুরুত্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। হে মহামতে! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, আমরা অভিমত প্রদেশে গমন করি। অর্থাৎ আমরা পরম প্রেমাস্পদ আত্মভাবাবস্থায় গমন করি৫।৬।

ভগবান্ কাল ঐরূপ কহিয়া তেজের সহিত সূর্য্যের অস্তাচলে অদৃশ্য হওয়ার ন্যায় সাশ্রুলোচন ভৃগু ও ভার্গবের সাক্ষাতে অন্তর্হিত হইলেন৭। অতঃপর মহামতি শুক্র নিয়তি (কালনির্ব্বন্ধ) পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সেই সংশুষ্ক তনুতে প্রবেশ করিলেন। শুষ্ক তরুকে পুষ্পিত করিবার জন্য বসন্ত ঋতুর বন প্রবেশের ন্যায় শুক্র সেই বহুকাল পরিশুষ্ক প্রাক্তন যুবা শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন৮।৯। তৎক্ষণাৎ সেই সমঙ্গাতীরবাসী বাসুদেবনামধারী ব্রাহ্মণ শরীর বিবর্ণ ও বিকৃতাঙ্গ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল১০। মহামুনি ভৃগু মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কমণ্ডলুজল দ্বারা সেই প্রবিষ্টজীব পুত্র শরীরের শান্তিবিধান করিলে, উহাতে নাড়ী সকল সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত ও প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন বর্ষার আগমনে নদীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জলে পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ, জীবের প্রবেশে সেই শুষ্ক শরীর পরিপুষ্ট হইল। যেমন জলাশয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তদঙ্গে শৈবালাদি অঙ্কুরিত হয় সেইরূপ সেই শুষ্ক শরীরে তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলি নখ ও কেশাদি উৎপন্ন

হইতে লাগিল। এবং অচিরাৎ সেই শরীর সর্ব্বাঙ্গীন শোভায় বিরাজিত হইল[১১।১৩]। এতক্ষণ পরে তাঁহার শরীরে যথাযথ প্রাণবায়ু সঞ্চরণ করিতে লাগিল (শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল।) অতঃপর তিনি গাত্র উত্থাপিত করিলেন এবং পবিত্রাকৃতি পিতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন[১৪।১৫]। তাঁহার পিতাও জলদ যেমন অদ্রিতটকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ, স্নেহভরে শুক্রের সেই শরীর আলিঙ্গন করিলেন[১৬]। মহামতি ভৃগু শুক্রের সেই প্রাক্তন শরীর তাদৃশ সুষমান্বিত দর্শন করিয়া হাস্য সহকারে বলিলেন, এই শরীর আমা হইতেই জাত হইয়াছিল[১৭]। অতঃপর সূর্য্য যেমন নিশাবসানে পদ্মাকর সহ শোভমান হন, সেইরূপ, সেই এই পিতাপুত্রদ্বয় পরস্পর শোভা পাইতে লাগিলেন। ভৃগু "এই আমার পুত্র" এবং শুক্র "ইনি আমার পিতা" এই ভাবে ভাবিত হইয়া পরস্পর সুখী হইলেন[১৮।১৯]। যেমন চক্রবাক দম্পতি দীর্ঘকাল বিরহের পর সম্মীলিত হইয়া আনন্দিত হয়, ময়ূর দম্পতি যেমন বর্ষাগমে আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ এই পিতা পুত্র উভয়ে পরস্পর স্নেহপ্রণয়াদিভরে আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন[২০]। অনন্তর তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করতঃ তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমঙ্গাতীরবাসী বাসুদেবাখ্য দ্বিজদেহ ভস্মসাৎ করিলেন। পরে সেই মহামতিদ্বয় কিছুকাল কাননে ভ্রমণ করিয়া আকাশে শশিভাস্করের ন্যায় তথায় অবস্থিতি করতঃ স্থিরপ্রকৃতি ও জ্ঞাতজ্ঞেয় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালক্রমে শুক্র অসুরগুরুপদে ও গ্রহত্ব পদে অভিষিক্ত হইলেন[২১।২৩]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ভৃগুপুত্রের (শুক্রের) এই অনুভূতির আভাস অর্থাৎ মনোরাজ্য যেরূপ সফল হইয়াছিল, অন্য কোন ব্যক্তির আভাস (চিন্তা বা মনোরাজ্য) সেরূপ সফল হয় না কেন? বশিষ্ঠ বলিলেন, অনঘ! শুক্রের চরমজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপাসনাদির দ্বারা তদীয় পূর্ব্বকল্পের সমস্ত দোষের ক্ষয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান কল্পে তাঁহার সেই দেহ পরমাত্মা হইতে প্রথম সমুৎপন্ন হওয়াতে জন্মান্তরের অর্থাৎ অন্য জন্মের কলঙ্ক অপনীত সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছিল[১, ২]। সর্ব্ব প্রকার এষণা (অভিলাষ) উপশম প্রাপ্ত হইলে যে কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্তত্তা বিদ্যমান থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তদুপলক্ষিত চৈতন্যকে নির্ম্মলা চিৎ নামে উল্লেখ করেন[৩]। তৎকালের নির্ম্মলসত্ত্বময় মন যখন যাহা ভাবনা করেন তখনই তাঁহার সম্বন্ধে তাহা আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত—যেমন জলের আবর্ত্ত। জলই আবর্ত্তরূপে সমুদিত হইয়া থাকে[৪]। * শুক্রের ঐ সমস্ত বিভ্রমজাল যেমন স্বয়ং

* এ অনুবাদে রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর বিস্পষ্ট হয় নাই। শ্লোকস্থ শব্দ বজায় রাখিয়া অনুবাদ করিলে প্রায়ই অবিস্পষ্ট হয়, সেজন্য নীচে এক একটী তাৎপর্য্যবোধক নোট বিন্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আবশ্যক বিধায় রাম প্রশ্নের ও বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য টীকানুযায়ী কথার সঙ্কলন করা গেল। রামপ্রশ্নের অভিপ্রেতার্থ এই যে যেমন শুক্রের মনোরাজ্য সফল হইয়াছিল, অন্যের মনোরাজ্য (মনোরথ) সেরূপ সফল না হয় কেন? বশিষ্ঠপ্রত্যুত্তরের তাৎপর্য্য এই যে, মানসী চিন্তা সফল হওয়ার দুই প্রকার কারণ আছে। অর্থাৎ দুই প্রকার কারণে জীবের সঙ্কল্প সফল হইয়া থাকে। এক সত্যসঙ্কল্পতাজনক চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয়—মরণ কালে প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে ভাবী ভোগপ্রদ ধর্ম্মাধর্ম্মের উদ্বোধ বা উদয়। প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ মনোবৃত্তি দৃঢ়তর রূপে উদয় হইবে, প্রাণ বিয়োগের পর সেইরূপ দেহাদি ও ভোগাদি হইবে, ইহা নিয়তির অব্যভিচরিত নিয়ম। এই দুই কারণের মধ্যে প্রথমোক্ত কারণে শুক্রের মনোরথ সফল হইয়াছিল। অর্থাৎ শুক্র সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া জন্মিয়া ছিলেন, তাই তাঁহার সঙ্কল্প সফল হইয়াছিল। পূর্ব্বকল্পে শুক্রের যে চরম জন্ম

প্রোথিত (উদয়প্রাপ্ত) হইয়াছিল, প্রত্যেক জীবেরই ঐরূপ বিভ্রম, পূর্ব্ব-সংস্কারপ্রবাহে উৎপন্ন হইয়া থাকে[৫]। যেমন বীজে অঙ্কুর ও পত্রাদি স্বতঃ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ, প্রত্যেক ভূতগণে দ্বৈতভ্রম স্বতঃই সমুদিত হইয়া থাকে[৬]। কথিত প্রকারে সমুদিত এই জগৎ দৃশ্যমান হইলেও মিথ্যা। ইহা বাস্তবতঃ উদয় বা অস্ত প্রাপ্ত হয় না। মায়িক ব্যামোহের ন্যায় ইহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণে প্রতিভাত হইতেছে[৭।৮]। হে মহামতে! যেমন এক জীবের সম্বন্ধে এই সংসারখণ্ড প্রতিভাসিত হইতেছে, অন্যান্য জীবের পক্ষেও এইরূপ বহু সহস্র অলীক সংসার প্রতিভাসিত হইয়া থাকে[৯]। যেমন একের স্বপ্ন ও একের সঙ্কল্প অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ, একের সংসারভ্রম অন্যের অনুভূতিগম্য হয় না। তাহার প্রধান কারণ জ্ঞানবিহীনতা। জ্ঞানবিহীনতা কারণে আকাশে সঙ্কল্পনগর সমূহের ন্যায় এই সমস্ত মিথ্যা নগর দৃষ্টিগোচর হইতেছে[১০।১১]। এই সংসারে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ প্রভৃতি যে কিছু প্রাণী—সমস্তই স্ব স্ব সঙ্কল্পে সুখদুঃখময় দেহধারী হইয়া বিরাজ করিতেছে[১২]। হে রঘুনাথ! আমরাও সঙ্কল্পাত্মক মিথ্যা দেহ ধারণ করিতেছি। এবং মিথ্যায় সত্যতা ভাবনা করিয়া থাকি। অন্যের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ। রস যেমন বসন্তকাল আগতে গুল্মাদিরূপে সমুদিত হয়, তেমনি, সংসার প্রবাহ ও তদন্তঃস্থ বিশ্বনিচয় সমস্তই ঐ প্রকারে সমুদিত হয় সুতরাং মিথ্যা[১৩।১৪]। ব্রহ্মই এই সমুদায় জীব-জগতের আকারে উদিত রহিয়াছেন। প্রথম মায়িক সঙ্কল্পই যে, জগতের আকারে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ পায়[১৬]। আপনারই স্বভাব অর্থাৎ অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের উদরবর্ত্তী চিত্তই জগৎ ভাবে ভাবিত হইয়া জগৎ দর্শন করিতেছে ও অধোগামী হইতেছে[১৭]।

হইয়াছিল, সেই জন্মে তিনি প্রভূত তপস্যাদি করিয়া চিত্তদোষ ক্ষয় করিয়াছিলেন। এতজ্জন্মেও তিনি আধিকারিক হইয়া বিধাতার সঙ্কল্পে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেন। অপিচ তাঁহার উক্ত শরীর ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত অর্থাৎ নির্দ্দোষ হইয়াছিল। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি বশতঃ তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা নাম্নী সিদ্ধি সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার উক্তবিধ মনোরথ সফল হইয়াছিল। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী হন, তাঁহারাও রাগাদি দোষ বর্জ্জিত হওয়ায় সত্যসঙ্কল্প হন। যাহাঁদের চিত্ত উত্তমরূপে মার্জ্জিত হয় না, রাগাদি দোষে কলুষিত থাকে, তাহারা সত্যসঙ্কল্পতা লাভে বঞ্চিত থাকে।

প্রতিভাস কারণেই জগতের অস্তিতা, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে ইহার নাস্তিতাই স্থিরীকৃত হয়। এই দীর্ঘস্বপ্নরূপ জগজ্জাল চিত্তরূপ দন্তীর আলান (বন্ধন স্থান)[১৮]। বস্তুতঃ চিৎসত্তাই জগৎসত্তা এবং জগৎসত্তাই চিত্ত। উভয়ের মধ্যে সত্যবিচার দ্বারা একের অভাব প্রকটিত হইলে উভয়েরই অভাব খাঁটী হয় পরন্তু তৎকালে সত্যই বিরাজিত থাকে[১৯]। যেমন পরিমার্জ্জন দ্বারা মণির শুদ্ধতা জন্মে, তেমনি, সৎশাস্ত্র ও উপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিত্ত সংশোধিত হয়। চিত্ত সংশোধিত হইলে তাহাতে সত্যেরই প্রতিভা প্রতিফলিত হয়[২০]। চিত্ত দীর্ঘকাল একাগ্রাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই শুদ্ধ চিত্তের সকন্নে সত্যপ্রতিভাই উদিত হয়[২১]। যেমন মলিন বস্ত্রে শোভন বর্ণ স্থিতি লাভ করে না, তেমনি, মলিন আত্মায় অর্থাৎ চিত্তে অদ্বৈত জ্ঞান স্থিতি লাভ করে না[২২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শুক্রচিত্তস্থ জগৎ প্রতিভাসাত্মক অর্থাৎ কেবল কল্পনাময়। কিরূপে তাহাতে কাল, ক্রিয়া ও তাহার ক্রম, এ সকলের উদয়াস্ত সত্যস্বরূপে উদিত হইয়াছিল? * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! শুক্র ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে পিতার নিকট যেরূপে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তজ্জনিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল ভ্রমজ্ঞান উপার্জ্জন ও তদীয় বাক্য শ্রবণের দ্বারা যে সকল অনুভব বা মানসী আলোচনা করিয়াছিলেন এবং যাদৃশ উৎপত্তি বিনাশাদি ক্রম সমন্বিত সেই সেই বিষয় শাস্ত্রতঃ অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের অবস্থিতির ন্যায় সে সকল সংস্কাররূপে স্থিতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল সংস্কার তদীয় স্বভাবকোশে অর্থাৎ চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যায় আবদ্ধ ছিল, পরে সেই সকল সংস্কার ক্রমে বীজ হইতে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড, পুষ্প, ফল প্রভৃতির ন্যায় সমুদিত হইয়াছিল[২৩।২৪]। জীব যে প্রকার বাসনায় বাসিত (আবদ্ধ) হয়, অন্তরে সেই সেই রূপই সন্দর্শন করে। এ বিষয়ে স্বপ্রকল্পিত স্বাপ্ন

---

* রামচন্দ্রের জিজ্ঞাস্য এই যে, জগৎভ্রম বাসনানুযায়ী। বাসনা ও সংস্কার সমান কথা। শুক্রের স্বর্গ ও অপ্সরাদি সম্ভোগের বাসনা বা সংস্কার কোথা হইতে ও কি প্রকারে জন্ম লাভ করিল? তিনি ত পূর্ব্বে কখন ঐ সকল ভোগ বা অনুভব করেন নাই?

শরীরই উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যদি তুমি এইরূপ মনে কর যে, শুক্রের ঐ সংসার স্বপ্ন নহে; প্রত্যুত সত্য; তদুত্তর এই যে, কেবল শুক্রের জগৎ কেন? এই দৃশ্যমান সমুদায় জগৎ-ই দীর্ঘস্বপ্ন[২৬]। হে রামচন্দ্র! যেমন নরগণ দিবসে সৈন্যবাসনাবিশিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে স্বপ্নে সেই সমস্ত সৈন্য সন্দর্শন করে, সেইরূপ, প্রত্যেক জীব আপনাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার দ্বারা এই সমস্ত সংসার সন্দর্শন করিতেছে[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, গুরো! বুঝিলাম, সংসার মনঃকল্পনাসমুত্থ, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে, সংসার পরম্পরার মধ্যে পরস্পর ঐক্য আছে কি নাই। অর্থাৎ কাহার সহিত কাহার সংবাদীতা বা মীল আছে কি নাই। এক্ষণে এই বিষয়টী আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিয়া মদীয় সন্দেহ অপনয়ন করুন[২৮]। * বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অর্থকোবিদ! মলিন মন কখন শুদ্ধ মনের সহিত সংমিলিত হইতে পারে না। কেননা, মলিন মন অবীর্য্য বা শক্তিহীন অর্থাৎ শুদ্ধ মনের সহিত মিলিতে অসমর্থ। পরন্তু সেই মন যদি সমাধিজ্ঞানাভ্যাস প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ হয় তাহা হইলে তখন সন্তপ্ত লৌহখণ্ডের সহিত সন্তপ্ত লৌহের ন্যায় পরস্পর একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুদ্ধচিত্তই শুদ্ধচিত্তের সহিত মিলিত হয়। যেমন একরূপ জল একরূপ জলে অর্থাৎ পরিষ্কৃত জল পরিষ্কৃত জলে মিশ্রিত বা একতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধচিত্তে একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্তের শুদ্ধি কি? বাসনা শূন্যতাই তাহার শুদ্ধি এবং অভূতসম্বেদনই তাহার একত্ব। (অভূতসম্বেদন=ভৌতিক জ্ঞানের পরিমার্জ্জন বশতঃ

* অব্যবহিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যেমন সৈন্যস্থ মনুষ্যেরা দিবসে সৈন্য বাসনা বিশিষ্ট হইয়া রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় সকলেই স্ব স্ব বাসনা কল্পিত নানা সৈন্য দর্শন করে ও সকলেই এক বা অভিন্ন মনে করে। এই কথায় রামের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, স্বপ্নদৃষ্ট মনুষ্য স্বপ্নদ্রষ্টাই দেখে, অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। অতএব, দৃশ্য সমূহ যদি স্বপ্নবৎ কল্পিত হয় তাহা হইলে, গুরুদিগের শিষ্য উদ্ধারের প্রবৃত্তি ও শাস্ত্র প্রণয়নাদি, এ সকল স্বপ্নকৃত পরোপকারের ন্যায় মিথ্যা বা বিফল বলিতে হয়। সুতরাং উপদেশ সকল শিষ্যে অনুক্রান্ত না হওয়ায় তাহার মোক্ষের আশা সুদূর পরাহত। গুরুও স্বগুরুর উপদেশ উক্ত কারণে লাভ করেন নাই বলিতে হয়। সুতরাং কথিত প্রকার কল্পনা অন্ধপরম্পরার ন্যায় স্থূল ও মূলবিনাশক।

চৈতন্যগত ঐক্য অর্থাৎ যেমন ঘটাদি উপাধি বিনষ্ট হইলে তদুপহিত আকাশ এক হয় তাহার ন্যায়)। জনগণ চিত্তশুদ্ধির দ্বারা প্রবুদ্ধ হন, হইয়া অবিলম্বে পরমাত্মসম্পন্ন হন[২৯।৩১]। *

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ইহার দ্বারা রাম প্রশ্নের এই প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল যে, শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুদিগের চিত্ত সবীর্য্য অর্থাৎ শক্তিসম্পন্ন, এবং শিষ্যদিগের চিত্ত অবীর্য্য অর্থাৎ শক্তিহীন। গুরু-দিগের চিত্ত পরিমার্জ্জিত ও শিষ্যদিগের চিত্ত অমার্জ্জিত। যেমন কোন দেবতা স্বকীয় বীর্য্যবান্ চিত্তের দ্বারা পরকীয় স্বপ্নে প্রবেশ করতঃ বা আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে বস্ত্র দানাদির দ্বারা অনুগৃহীত করেন তাহার ন্যায় গুরুরাও স্বকীয় বীর্য্যে (ক্ষমতায়) শিষ্য মনঃকল্পিত জগতের অন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

অষ্টাদশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, শ্রবণ কর। সকল জীবেরই স্ব স্ব কল্পিত সংসার পরস্পর পৃথক প্রায়। তন্মধ্যে যে সকল প্রভেদ উক্ত হইল সে সমস্তই স্থূল জীবের (দেহধারী জীবের) মূল স্বরূপ পরমাত্মার প্রতিভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১]। প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া। কারণ এই যে, প্রত্যেক জীবেরই সুষুপ্তির পর যে দ্বৈত ব্যবহারের প্রবৃত্তি এবং স্বপ্নে ও জাগ্রতে যে বন নদ্যাদি দৃষ্টি বিষয়ের প্রবৃত্তি অথবা সে সকল হইতে নিবৃত্তি, সে সমস্তই সেই চিদেকরস সর্ব্বব্যাপিনী পরমা সত্তার অধীন। যে সকল জীব প্রবৃত্তিভাগী তাহারা সকলেই চিৎশক্তি অবলম্বনে অর্থ-দর্শী, অন্য কিছুর দ্বারা নহে। এই প্রত্যক্ষ (অনুভব) প্রমাণে তুমি ইহাই বিদিত হইবে যে, স্ব স্ব সাক্ষিচৈতন্যের উপাধির সম্মিলনে অথবা ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তায় একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই* পরস্পর পরস্পরের কল্পিত সৃষ্টি সন্দর্শন করে[২।৩]। (সার কথা—একই ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মনোরূপ উপাধির ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রকটিত হয়। সুতরাং সে সকল অবাস্তব। অবাস্তব হইলেও শুদ্ধচিত্তে সে সকল প্রতিফলিত হয়। আরও বিশদ কথা—জীব যখন সাধন বলে সর্ব্বজ্ঞ হয় তখন সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিই সকল সৃষ্টি দেখে, অন্যে নহে)। সৃষ্টিরূপা নদী বহু হইলেও সে সকলের দ্রষ্টা এক। সেজন্য সকল চিত্তের কল্পিত সৃষ্টি সকলে-রই নিকট সত্য বলিয়া প্রতীত হয়[৪]। এক একটী ব্রহ্মাণ্ড যেন এক একটী গুল্ম, (গুল্ম—কুচফল) সে সকলের মধ্যে কোনটী পৃথক্ সংস্থিত হইয়া পৃথক্ ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং কোনটি বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় বা চিরস্থায়ীর ন্যায় অবস্থিতি করে[৫]। কাহার সহিত কাহার সংশ্রব নাই এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগুল্ম যাহা প্রস্ফুরিত হইতেছে, সে সমস্তই মায়াসমন্বিত ব্রহ্মের বিহার কানন[৬]। পরস্পরের

---

* সাক্ষিচৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণ। তাহার সম্মিলন অর্থাৎ শুদ্ধির সমানতা। ব্রহ্মৈক্যের দৃঢ়তা অর্থাৎ চিত্ত সংশোধন দ্বারা চিত্তোপহিত চৈতন্যের আবরণ (অজ্ঞান) বিনাশ।

ব্যবহার ও সম্বন্ধাদির দ্বারা নিবিড় হইলেও সকল জগৎ সকলের দর্শন যোগ্য হয় না। যাহা যাহার কর্ম্মফল ভোগের অনুকূল, সে তাহাই দেখিয়া কাল কর্ত্তন করে। প্রত্যেক সৃষ্টি উক্ত নিয়মের অধীন বলিয়া জীব সকল নিয়মিত রূপেই সৃষ্টি সন্দর্শন করে, তাহার অন্যথা হয় না। অর্থাৎ দেশান্তরীয় ও লোকান্তরীয় ভাব বা সৃষ্টি (অর্থাৎ যে যে দেশে ও যে কালে বিদ্যমান থাকে সে সেই দেশের ও কালের সৃষ্টি ব্যতীত অন্য দেশের ও কালের সৃষ্টি সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না[৭]। মনোরূপ উপাধি এক নহে, প্রত্যুত বিভিন্ন। সেজন্য জীবও বিভিন্ন, অর্থাৎ বহু। মনঃ বিভিন্ন বলিয়াই এক মনের মনোরাজ্য (কল্পনা) অন্য মনের ভোগ্য বা অনুভাব্য হয় না। একের মনোরাজ্য অন্যের অনুপভোগ্য, এই সর্ব্বানুভাব্য প্রমাণ মনোভেদ ও তদনুসারে জীবভেদ বুঝাইতে সমর্থ[৮]। ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন মনোরাজ্যই সর্গ বা সৃষ্টি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে। অপিচ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনা একের সহিত অপরের যদি সমান হয় এবং সে সকল যদি এক সময়েই ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে ব্যষ্টিই বল, আর সমষ্টিই বল, সকল জীবেরই স্থূল দেহের সত্তা তখন দৃঢ় হইয়া যায়। অর্থাৎ সকলেই সমান রূপে আপনাদিগকে অহং দেহী ইত্যাকারে সন্দর্শন করে। অতএব, কর্ম্মবাসনাদি সমুপস্থাপিত মনোরাজ্যের দৃঢ়তাতেই দেহের অস্তিতা এবং তাহার বিস্মরণেই দেহের অভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে[৯]। স্থূল দেহ ঘটিত মনোভাব নিরূঢ় হইলেই আত্মবিস্মৃতি ও কাল্পনিকী সংসারস্থিতি সংঘটিত হয়। চিৎ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যকে সুবর্ণস্থানীয় এবং সংসারকে বলয়াদি অলঙ্কার স্থানীয় বিবেচনা করিবে[১০]। যেমন যোগীদিগের যোগপরিশুদ্ধ প্রাণবায়ু অন্য শরীরে প্রবেশ করতঃ তদীয় প্রাণকে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়কে স্ববশীভূত করিয়া তদ্‌গত বেদ্য অর্থাৎ তাহাদের অন্তরস্থ মনোরাজ্য জানিতে পারে তেমনি পবিশুদ্ধ মনঃও অন্যান্য সৃষ্টি বা অন্যান্য মনোরাজ্য জানিতে সমর্থ হয়[১১]। জীববৃন্দ অর্থাৎ প্রত্যেক জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয় আশ্রয় করতঃ স্থিত আছে। অবস্থাত্রয়াবলম্বন জীবেরই স্বভাব, দেহের স্বভাব নহে[১২]। যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা জানেন, যেমন জলে লহরী উঠে, আবার লহরীর অবসানে জল হয়, তেমনি, জীবও জাগ্রদাদি অবস্থায় পরিবর্ত্তিত

হয়, পুনঃ তদবসানে তুর্য্যপদে (তুর্য্যপদ=ব্রহ্ম) অবশেষিত হয়। অপিচ, দেহও জীবের অবস্থা প্রভেদ, সুতরাং তাহাও অবস্তু। তত্ত্বজ্ঞগণ আপনাকে জ্ঞান দ্বারা অবস্থাত্রয়াতীত জানিয়া জীবভাব হইতে মুক্ত হন এবং অতত্ত্ববিৎগণ সুষুপ্তির অন্তে পুনঃ দেহাদি ও পৃথিব্যাদি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়[১৩,১৪]। জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর সুষুপ্তির প্রভেদ নাই। সুষুপ্তি উভয় ব্যক্তির তুল্য, পরন্তু ফলের প্রভেদ আছে। অজ্ঞ জীব দেহপ্রেমিক, সেজন্য তাহার সুষুপ্তি পুনঃ সৃষ্টির বীজ (পুনঃ অহং দেহী অহং মনুষ্য ইত্যাদিপ্রকার মিথ্যা জ্ঞানের কারণ) পরন্তু জ্ঞানী জীব দেহপ্রেমিক না হওয়ায় তাহাদের সুষুপ্তি দেহ সৃষ্টির কারণ হয় না[১৫]। চিদ্বস্তু সর্ব্বগামী অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। সেজন্য একের সৃষ্টি (কল্পনা) অন্যের অন্তরে কখন কখন প্রতিফলিত হইয়া থাকে[১৬]। সৃষ্টি সকল কদলী দল কোষের (কদলী=কলাগাছ। কোষ=তাহার বল্কল) এবং ব্রহ্ম কদলীদল মণ্ডপের (আধারের) অনুরূপ। বিবরণ এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবশীতল ও সর্ব্বদা একরূপ, পরন্তু সৃষ্টি বিভিন্নাকার ও বহুস্তরযুক্ত। কদলী বৃক্ষ বহুপত্রযুক্ত হইলেও কদলীদল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তদ্রূপ শত শত বাহ্য ও আভ্যন্তর সৃষ্টি সৃজিত হইলেও সে সকল ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে[১৭,১৮]। বীজ জলসংযোগে প্রস্ফুটিত ও বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পুনর্ব্বার বীজভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ব্রহ্মও মনোরূপে পরিণত হইয়া পুনঃ প্রবোধ দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। বীজ রসকারণ দ্বারা ফলরূপে প্রকাশিত হয়, জীবও ব্রহ্মকারণ দ্বারা জগৎস্বরূপে প্রকাশমান হন। এস্থলে বক্তব্য এই যে, যেমন রসের কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন অনুপযুক্ত, তদ্রূপ, ব্রহ্মের কারণ কি, এ প্রশ্নও অনুপযুক্ত। অনাদি নির্ব্বিকার ব্রহ্মে নিমিত্তীভূত বস্তুর বিদ্যমানতার সম্ভাবনা নাই[১৯,২২]। অতএব, অসার বিচারণা পরিত্যাগ করিয়া সার মাত্রের গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অসার বিচারণায় কিছু মাত্র উপকার নাই। সার বিচারেই পুরুষার্থ লাভ[২৩]। ভাবিয়া দেখ, বীজ নিজ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্কুরাদিরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুরূপে স্বরূপ প্রচ্যুত হইয়া জগৎ স্বরূপে অবলোকিত হন। এই উপদেশ শিষ্যের বুদ্ধিসংশোধক মাত্র; প্রকৃত উপদেশ বা প্রকৃত দৃষ্টান্ত নহে। বস্তুতঃই বীজ আকৃতিসম্পন্ন বলিয়া আকারবিহীন পরম পদের সহিত তুলিত হইতে পারে না[২৪,২৫]।

তবে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই জাত হন, তদ্ভিন্ন আর কিছু জাত হয় না। অতএব, হে রাঘব! তুমি এই মিথ্যা জগৎকে অজাত ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে[২৬]। যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সে দ্রষ্টা আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। কোন্ প্রপঞ্চদর্শীর জ্ঞান নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার ব্যবস্থিতি জানিতে পারে? জলভ্রান্তি জন্মিলে তাহার সে জ্ঞানের সত্যতা কোথায়? জ্ঞান যদি সত্যগ্রাহী থাকে তাহা হইলে কি আর মরীচিকায় জলভ্রান্তি জন্মে?[২৭।২৮]। চক্ষুঃ সব দেখে, কিন্তু আপনাকে দেখে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, দ্রষ্টা-পদার্থ আকাশ-অপেক্ষা নির্ম্মল হইয়াও স্বীয় স্বরূপ দর্শনে ক্ষমবান্ হয় না[২৯]। যেমন বিনিবৃত্তভ্রম মুক্তাত্মা দ্বৈত দর্শন করে না, সেইরূপ, ভ্রান্ত জীব আকাশের ন্যায় বিশদ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে পরিস্ফুটরূপে দেখে না। অর্থাৎ আপনার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারে না[৩০]। হে রাঘব! বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় বিশদ সত্য; এবং শত শত জীব তাঁহাকে দেখিবার জন্য যত্ন করে সত্য; পরন্তু তাহা তাহাদের ঘটে না। হেতু এই যে, তিনি দৃশ্য, তাঁহাকে দেখা যাইবে, এ ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দূরে পলায়ন করে[৩১]। যে ভাবে ঘটাদি বস্তু দেখা যায়, সে ভাবে দেখিতে গেলে ব্রহ্মদর্শন দূরে পলায়ন করে। কারণ এই যে, সে ভাবের দর্শকেরা ব্রহ্মের বিশুদ্ধচিন্মাত্রতা অবধারণ করিতে পারে না[৩২]। হে রামচন্দ্র! তাহারা দৃশ্যই দেখে, দ্রষ্টাকে দেখে না। কারণ এই যে, তাহারা জানেনা যে, দৃশ্য নাই, একমাত্র দ্রষ্টাই আছে। সর্ব্বাত্মক দ্রষ্টা দৃশ্যরূপে অবস্থিত হইলে তখন আর দ্রষ্টৃতার সম্ভাবনা কি[৩৩।৩৪]? যেমন বসন্তকালে রস সংযোগে বনখণ্ড লতা পুষ্প ও ফল দ্বারা সমুন্নত হয়, তদ্রূপ, চিদাত্মা যখন যে ভাবে যে মনোবৃত্তির সংযোগে অনুরূপিত হন তখন তিনি সেই ভাবেই উদয় প্রাপ্ত (দৃষ্ট) হন[৩৫]। যেমন বসন্তকালীন রস বৃক্ষশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ফলপুষ্পাদিতে পরিণত হয়, সেইরূপ, চিদাত্মার বিকাশবিশেষ জীবও দেহিরূপে উৎপন্ন হয়[৩৬]। আত্মা যে কোন প্রকারে উদিত (দৃশ্য) হউন, চিন্মাত্রতা পরিত্যাগ করেন না। তিনি নির্ব্বিকারস্বভাব হইলেও নিজ মহিমায় নিজে দৃশ্য, নিজে দর্শন, এবং নিজে দ্রষ্টা হন এবং এই জগৎ নামক স্বপ্ন দেখেন[৩৭]। যেমন একই পার্থিব রস নানা খণ্ডাধারে (খণ্ড=শর্করা বা চিনি) অর্থাৎ সেই সেই আধারে (ইক্ষু প্রভৃতিতে) বিভিন্নাস্বাদের খণ্ড সৃজন

করে, সেইরূপ, পার্থিবরসস্থানীয় অহন্তাদি পরমাত্মায় বহু ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে[৩৮]। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ভোগরসও অনন্ত। অর্থাৎ যেমন ভূমি-রস এক হইলেও ইক্ষুতে এক প্রকার আস্বাদ অর্পণ করে, খর্জ্জুরে অন্য প্রকার, সেইরূপ। এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড যেন একটী বন, বিভিন্ন ভাবের চিৎ-প্রকাশ (জীববৃন্দ) বৃক্ষ, শত শত দৃশ্য তাহার শত শত শাখা, প্রত্যেকের রস (ভোগ) অনন্ত বা বিচিত্র, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত চিৎ তাহার আস্বাদক। জীবশক্তি (সংস্কারাপন্ন আত্মা) যেখানে যখন যেরূপে উদিত বা উদ্বোধিত হয়, তখন তাহার সেই ভাবেরই সংসার, ইহা বিদিত হও[৩৯।৪১]। কোন কোন জীবের সংসার পরস্পর একরূপ হয়[৪২]। কোন কোন জীব দীর্ঘকাল সংসার বিহারের পর সূক্ষ্ম দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করতঃ সংসারাতীত হয়[৪৩]। হে রাম! তুমি জ্ঞানচক্ষুঃ বিস্তার করিয়া দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক পরমাণুর (মনের) মধ্যে সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। যেমন তিল মধ্যে তৈল অলক্ষ্যরূপে বাস করে সেইরূপ চিত্তমধ্যেও লক্ষ লক্ষ সংসার তাহাদের অলক্ষ্যে অবস্থিতি করে। পরন্তু যখন চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় তখন তাহা চিন্মাত্রে পর্য্য-বসিত হয়[৪৪।৪৫]। চিৎপদার্থ সর্ব্বগত, তাহা সামান্য কীট হইতে পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবে বিরাজিত,—তন্মধ্যে যে সংসার দর্শন—তাহা স্ব স্ব কল্পনা বা বাসনানুসারে ব্যবস্থিত জানিবে[৪৬]। এই যে জগ-দ্দর্শন—ইহা সুদীর্ঘ মহাস্বপ্নের অনুরূপ। ইহা স্ব স্ব অন্তর হইতেই সমুত্থিত। যেমন যেমন বাসনায় বাসিত হয়, চিৎ পদার্থও তেমনি তেমনি দৃঢ়তায় ও সত্যতায় ব্যবস্থিত হয়। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-কালে সত্য, অন্যকালে মিথ্যা, সেইরূপ, জগদ্দর্শনও সংসারকালে সত্য, মোক্ষকালে মিথ্যা। সত্য মিথ্যা এই দুই অনুভব সূক্ষ্মতম চিৎপদার্থেই স্থিতি লাভ করিতেছে[৪৭।৪৯]। অতএব, চিৎ ও জগৎ, পৃথক কি অপৃথক তাহা বিচার্য্য নহে। দ্বৈত কি অদ্বৈত তাহা চিন্তা করিও না। এই মাত্র চিন্তা বা অবধারণ করিবে যে, উক্ত উভয় যেন আকাশে আকাশ লীন থাকার ন্যায় রহিয়াছে[৫০]। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, এ সমস্তই স্বাত্মভূত চিদংশ। তদ্ব্যতীত বস্বন্তর নহে। কারণ এই যে, চিৎ ব্যতীত অন্য কোন বাস্তব বস্তু থাকা অসম্ভব অর্থাৎ যুক্তি-বহির্ভূত। চিৎ ব্যতীত আর আর পদার্থ সকল ভ্রম-বাসনারই অবস্থা

প্রভেদ, ইহাই সুসম্ভব অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ[৫১]। চিৎপদার্থ পূর্ণ অর্থাৎ মহান্ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। অন্তঃকরণ সামান্য কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত জীবে বিদ্যমান ও বিভিন্ন। তাহাদের সকলেরই জগদ্দর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ। সুতরাং সে সকল অনির্ব্বাচ্য ও মায়িক। যেহেতু মায়িক, সেইহেতু তাহা মিথ্যা। রহস্য এই যে, যেমন কোন ভ্রান্ত বা উন্মত্ত ব্যক্তি আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হয় সেইরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন চিৎ অর্থাৎ জীববর্গ স্বাত্মভ্রান্তিবশতঃ স্বাত্মভূত দ্বৈত অনুভব করিতে প্রবৃত্ত থাকে[৫২।৫৩]। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চেতনাই আপনাকে দেহাকারে অনুভব করিতেছে, আবার বাহিরে ঘটাদির আকার দর্শন করিতেছে। যে কিছু দৃশ্যের কথা বলিবে, সে সকলের বীজ চিৎ। কোন কোন জীব বাহিরে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব দর্শন না করিয়া সে সকলের অন্তঃস্থতা (অন্তরে থাকা) অনুভব করে। (যেমন বৌদ্ধেরা, বৌদ্ধেরা বলে, বাহিরে যাহা দেখে, তাহা বস্তুতঃ বাহিরে নহে; সমস্তই অন্তরে বা মনোমধ্যে) যেমন। জীব দৈনন্দিন ক্ষুদ্র স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-রূপ দীর্ঘস্বপ্ন দর্শন করে। খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্ব্বত চূড়া হইতে স্খলিত হইয়া ভূতলে বিলুঠিত হয়, সেইরূপ, অনেক জীব স্বাত্মবিচ্যুত হইয়া সংসাররূপ মহাগর্ত্তে লুঠিত হইতেছে[৫৪।৫৭]। কেহ অপরের সহিত সমান সংসারী, কেহ ভ্রান্তিবর্জ্জিত, কেহবা আত্মজ্ঞান পথে বিরাজিত। এই জগৎ, এই আমি, এই তুমি, এ সমস্তই অন্তঃস্থ সংবিদে স্বপ্নের ন্যায় স্ফুরিত বা উদিত হইতেছে[৫৮।৫৯]। আত্মবস্তু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বস্বরূপ। সেই কারণে যে কিছু দৃশ্য সমস্তই তিনি[৬০]। সমষ্টি জীবের অন্তঃস্থ প্রতিভাস (অজ্ঞানকৃত কল্পনা) বশতঃ ব্যষ্টি সমুদায় জীবের উদয় এবং তাহাদেরও অন্তঃস্থ প্রতিভাসে (কাল্পনিক দর্শনে) জীবান্তরের ও পদার্থা-ন্তরের উদয় হইয়া থাকে[৬১]। জীবের অন্তরে জীবের জন্ম, তাহার অন্তরেও জীবান্তরের জন্ম হইতেছে[৬২]। বুদ্ধি যদি দৃশ্য দর্শন হইতে পরাবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ (আত্মা) অভিমুখী হয় তাহা হইলে তখন প্রত্যক্-তত্ত্ব পরিজ্ঞানের উদয় এবং তদ্বলে দৃশ্য দর্শনের ও দৃশ্যের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে[৬৩]। আমি কি? এ সমস্ত কি? এ বিমর্শ (বিচার) যাহার অন্তরে না উঠে সে বিমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, জীবভ্রান্তিরূপ

দীর্ঘজ্বরভোগ করিয়া ক্রমেই জীর্ণ ও জীর্ণতম হইতে থাকে[৬৪]। সোঽহং এবং কিমিদং এই দুই রহস্যের বিচার তাহারই সফল হয়—যে ভোগ-লিপ্সু নহে। অর্থাৎ যে বৈরাগ্যযুক্ত। বৈরাগ্যপূর্ব্বক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগলালসা দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে এবং যাহা পরম বিজ্ঞেয় —তাহা বিজ্ঞাত হয়[৬৫]। যেমন উপযুক্ত ঔষধের উপযোগে (সেবনে) দেহ আরোগ্য লাভ করে, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারিলে বৈরাগ্যও ফল প্রসব করে[৬৬]। যাহার বাক্যে বিবেক, পরন্তু চিত্তে অবিবেক, তাহার ভোগ বা ভোগ্য পরিত্যাগ কেবল দুঃখেরই কারণ হয়[৬৭]। "বায়ু আছে, বহিতেছে" এইরূপ কথায় বায়ু থাকা সিদ্ধ হয় না। তাহার স্পর্শ হওয়া আবশ্যক। যদি স্পর্শ হয় তবেই বায়ু থাকা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যদি ইচ্ছার বেগ হ্রাস হইতে দেখা যায় তবেই বিবেক বা বৈরাগ্য হওয়া স্থির হইবে[৬৮]। চিত্রিত অমৃত অমৃত নহে, চিত্রলিখিত বহ্নি বহ্নি নহে, চিত্রলিখিত নারী নারীর কার্য্য করে না, সেইরূপ, বাচিক বিবেকও প্রবোধ ফল প্রসব করে না[৬৯]। প্রথমতঃ বিবেক দ্বারা বিষয়াসক্তির অর্থাৎ ভোগলালসার ক্ষীণতা জন্মে, পরে ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি ও পরিহার বিষয়িণী প্রবৃত্তি প্রক্ষীণা হয়, তৎপরে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা জন্মে। অতএব, একমাত্র বিবেকই পরম পাবন[৭০]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

উনবিংশ সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! জীবের বীজ স্বরূপ পরব্রহ্ম আকাশের স্থায় সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন। সেইজন্য জীবপূর্ণ জগতে বহুপ্রকার জীবের অবস্থিতি দৃষ্ট হয়[১]। জীবসমূহ চিদ্‌ঘন বা কেবলা চিৎ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কদলীদলে কীটের ন্যায় এই ধরার উদরে অবস্থিতি করিতেছে[২]। যেরূপ গ্রীষ্মকালে স্বেদ (দোষদুষ্ট, পচা, ঘর্ম্ম, ইত্যাদি) হইতে কৃমি সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ, শুদ্ধচিৎ আকাশপ্রায় হইলেও যেখানে যেরূপ দৃশ্যের অবস্থিতি তথায় তদ্‌ভোগার্থ আপনা হইতেই তদনুরূপ জীবের উৎপত্তি হয়[৩]। সেই সকল জীবেরা যেখানে যে অভিপ্রায়ে যেরূপ যত্ন করে, বিচিত্র উপাসনা ক্রমাদির দ্বারা তথায় সেইরূপই হইয়া থাকে। সেইজন্য যাহারা দেবযাজী তাহারা দেবযোনি, যাহারা যক্ষপূজক তাহারা যক্ষ জন্ম এবং যাহারা ব্রহ্মধ্যায়ী তাহারা ব্রহ্ম লাভ করতঃ সঙ্কল্পের সাফল্য অনুভব করে। হে রাঘব! ঐ কারণে উপদেশ—যাহা অতুচ্ছ, তাহারই আশ্রয় লওয়া জীবের কর্ত্তব্য[৪।৫]। ভৃগুপুত্র শুক্র, প্রথমে অপ্সরোরূপ দৃশ্য দর্শনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে আত্মসংবিদের নৈর্ম্মল্যে (দৃশ্যত্যাগে) মুক্ত হইয়াছিলেন[৬]। অতএব, বালা সংবিৎকে (বালা সংবিৎ=প্রথম বয়সের জ্ঞান) যেরূপে ব্যুৎপাদিত করিবে সেই রূপেই সে অবনামিত হইবেক, ইহা বিদিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ব্যুৎপাদিত করা বিধেয়, বৃথা জীবাদি ভাবে পরিভাবিত করা বিধেয় নহে[৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার প্রভেদ কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন। স্বপ্নকালে যাহা দেখা যায় তাহাও তৎকালে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং জাগ্রৎ কালে যাহা দেখা যায় তাহাও জাগ্রৎ কালে সত্য বলিয়া বোধ হয়। তবে কেন বলেন যে, স্বপ্নজ্ঞান ভ্রম এবং জাগ্রৎজ্ঞান সত্য?[৮] * বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম!

* অনুভব কালে সত্য বোধ উভয় অবস্থাতেই হয়। পরন্তু প্রাত্যহিক প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ সেই বস্তু এই. এইরূপ স্থিরতর কল্পনা জাগ্রৎ ব্যতীত স্বপ্ন সংবিদে থাকে না।

যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা তাহা জাগ্রৎ এবং যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরতা না থাকে তাহা স্বপ্ন[৯]। স্বপ্নও যদি কালান্তরে অবস্থিতি করতঃ প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে তাহাও জাগ্রৎ বিশেষ এবং জাগ্রৎ যদি ক্ষণকালের জন্য স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় তাহা হইলে সে জাগ্রৎও স্বপ্ন[১০]। অতএব, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় দশার ভেদ—স্থির ও অস্থির ঘটিত। পরিষ্কার কথা এই যে, প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান দীর্ঘস্বপ্নও জাগ্রৎ এবং অপরিস্ফুট প্রতীয়মান ক্ষণিক জাগ্রৎও স্বপ্ন। আরও বিশদ কথা—জাগ্রদ্বুদ্ধির সমান স্বপ্নও জাগ্রৎ এবং স্বপ্নবুদ্ধির সমান জাগ্রৎও স্বপ্ন বলিয়া গণ্য[১১।১৩]। এই শরীরের অভ্যন্তরে এমন এক পদার্থ আছে যাহা জীবিত থাকার প্রধান কারণ। জীবন ধারণের প্রধান কারণ বলিয়া সে পদার্থকে আমরা জীবধাতু বলি। এই জীবধাতুর অন্য নাম তেজ ও বীর্য্য। এতদ্ভিন্ন আরও নাম আছে[১৪।১৫]। ব্যবহার যোগ্য এই শরীর যখন ব্যবহারী (ব্যবহার প্রবৃত্ত) হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়, কায়িক বাচিক মানসিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উন্মুখ হয়, ঐ জীবধাতু তখন বায়ু প্রবর্ত্তিত হইয়া সরোবরস্থ জল যেমন কুল্যা দ্বারা ইতস্ততঃ প্রসৃত হয় তাহার ন্যায় সেই সেই কুল্যা স্থানীয় ইন্দ্রিয় পথে ও তৎসংযুক্ত নাড়ী পথে প্রসর্পিত হইয়া থাকে[১৬]। জীবধাতু উক্ত প্রকারে সমস্ত অঙ্গের নাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সম্বিদের উদয় হইয়া থাকে। সেই সমস্ত সম্বিদের উদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার অনুরূপী। অন্তরে যে চিত্ত নামক জগৎভ্রম বা জগদ্ভ্রমের বীজ চিত্ত নামক পদার্থ রহিয়াছে, জীবধাতু প্রসর্পিত হইয়া তৎসংযুক্ত হইলেই দৃষ্টানুসারী অর্থাৎ বাসনানুসারী সংবিদের অনুকারী হয়। এই বাসনাময়ী সংবিৎ স্বপ্ন নামের নামী[১৭]। যখন ঐ জীবসংবিৎ নেত্রাদির দ্বারা বহিঃ প্রসৃত হইয়া বাহ্যবস্তুময়ী জ্ঞানের উদয়কারী হয়, তখন সেই বাহ্যদৃষ্টিময়ী সংবিৎ জাগ্রৎ আখ্যা ধারণ করে। এই দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির বা স্থায়ী বলিয়াই নাম জাগ্রৎ[১৮।১৯]। *

* সংবিদের আবার বালকত্ব প্রৌঢ়ত্ব কি তাহা বুঝিবার জন্য রাম জাগ্রদাদি অবস্থা বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সংবিদের অর্থাৎ চিৎ পদার্থের বিশেষ বিশেষ অবস্থা (ঔপাধিক অবস্থা) প্রতিবোধিত হইবে।

সুষুপ্ত্যাদির ক্রম এই যে, মন যখন নিজের দ্বারা ও শারীরিক অথবা বাচিক ক্রিয়ার দ্বারা এই দেহকে বিক্ষোভিত না করে, যখন সেই জীবধাতু এই শরীরে শান্তাত্মা ও সুস্থ হইয়া অবস্থান করে, তখন ঐ জীবধাতু নির্ব্বাত সদনে দীপের ন্যায় হৃদম্বরে বিক্ষোভিত না হওয়ায় এবং নাড়ী প্রভৃতি অঙ্গান্তরে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুতরাং সম্বিৎ কোন কিছুর দ্বারা বিক্ষোভিত না হওয়ায়, চক্ষুরাদি রন্ধ্র দ্বারা বাহ্যে প্রসর্পিত না হওয়ায়, সুষুপ্তি আখ্যায় অবস্থান করিতে থাকে। সম্বিদ তখন তিলে তৈলসম্বিদের ন্যায়, হিমে শীতসম্বিদের ন্যায় ও ঘৃতে স্নেহসম্বিদের ন্যায় জীবে জীবভাবাপন্ন হইয়া প্রস্ফুরিত হয় এবং সেই জীবরূপিণী অংশরূপা চিৎ উপাধিকালুষ্যরহিত ও স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মাত্মায় শান্তবাতা দীপশিখার ন্যায় বিচেতনপ্রায় সৌসুপ্তদশা প্রাপ্ত হয়। হে অঙ্গ! যোগিগণ শাস্ত্র ও গুরূপদেশ প্রভৃতির দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া একাগ্রতা সাধন ও বিচার দ্বারা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনঅবস্থায় সমভাবে বিচরণ করতঃ সমাধিস্থ হন, ও ক্রমে স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করতঃ তূর্য্যব্রহ্ম (নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা) হন[২০।২৫]। বৎস রাম! প্রাগ্বর্ণিত সুষুপ্তি ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনঃ প্রাণ কর্ত্তৃক উক্ত জীবধাতু ও সংবিৎ পুনর্ব্বার প্রাক্তন সংস্কারের অনুরূপে চিত্তে উদ্বোধিত বা উদিত হইয়া থাকে এবং সেই কারণে আপনার অন্তঃরস্থ জগৎকে (সংস্কারীভূত জগৎকে) আপনার (চিত্তের) অন্তরে দেখিয়া হৃষ্ট পুষ্ট অথবা ক্লিষ্ট হইতে থাকে। যোগীরা যেমন বীজস্থ বৃক্ষ দেখিতে পান সেইরূপ[২৬।২৭], সুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ সৌসুপ্ত জীব যখন বায়ুধাতু কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ সংক্ষুব্ধ হন তখন তিনি "অহমস্মি" ইত্যাকার অনুভব করেন। এবং ঐ অনুভব অহঙ্কারের উদয় বা জন্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি অধিক বিচলিত হয় তাহা হইলে সে আপনার আকাশগমনাদি অনুভব করে[২৮]। সুষুপ্তি ভোগের পর যদি উক্ত জীব জলধাতু কর্ত্তৃক প্লাবিত হয় তাহা হইলে নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় ভ্রান্তি (স্বপ্ন) দর্শন করে পরন্তু সে সমস্তই চিত্তের অভ্যন্তরে, অন্যত্র নহে[২৯]। পিত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে গ্রীষ্মাদি স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, পরন্তু তাহাও অন্তরে, বাহিরে নহে[৩০]। নাড়ী প্রবাহিত রুধিরে আপ্লাবিত বা আচ্ছন্ন হইলে রক্তবর্ণ দেশ, স্থান, কাল (সন্ধ্যা ও উষা সময়) সন্দর্শন করে পরন্তু সে

সকল স্বীয় অন্তরে, বাহিরে নহে। বাহিরে না থাকিলেও বাহিরে থাকার ন্যায় দৃষ্ট হয়[৩১]। অপিচ, নিদ্রিত জীব যে বাসনায় আবিষ্ট থাকে সেই বাসনাই পুষ্ট হইয়া স্বপ্নাকারে প্রতিভাত হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারে অর্থাৎ চক্ষুরাদি স্থানে জীবের অধিষ্ঠান রুদ্ধ হইলেই স্বপ্ন এবং অধিষ্ঠান অনবরুদ্ধ হইলেই জাগ্রৎ, ইহাই স্বপ্নের ও জাগ্রতের প্রভেদ বর্ণনার সংক্ষেপ[৩২।৩৪]। হে মহাবাহো! তুমি এই সমস্ত বিদিত হইয়া এই অসৎ জগতের প্রতি সত্য দৃষ্টি (সত্যতাবোধ) পরিত্যাগ কর। জগৎ-সত্যতা বোধই মরণাদি ক্লেশের কারণ[৩৫]।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।
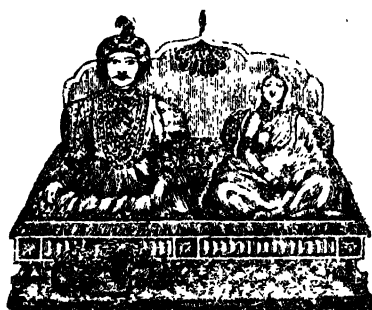
বিংশ সর্গ।

—)(*(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট মনের স্বরূপ নিরূপণার্থ যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই তোমার জ্ঞান বর্দ্ধনার্থ, অন্ত হেতু নহে[১]। যেমন অনল সংযোগে লৌহপিণ্ডাদি অনলত্ব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ, দৃঢ় নিশ্চয়বান্ চিত্ত যাহা ভাবনা করে তাহার আকারে আকারবান্ হয়[২]। ভাব অভাবের গ্রহণ ও উৎসর্গাদি অর্থাৎ ত্যাগাদি, মনের কল্পনা ব্যতীত বস্তুন্তর নহে। সুতরাং সে সকল সত্যও নহে, অসত্যও নহে অর্থাৎ সে সকল অনির্ব্বাচ্য। মনের যে চপলতা তাহাই এ সকলের কর্ত্তা। মোহযুক্ত মনঃই জগৎস্থিতির কারণ ও কর্ত্তা। যে হেতু মনঃ বিশ্বরূপী, সেই হেতু বলিতে হয়, মনঃই এই সমস্ত বিস্তার করিয়াছে[৩।৪]। বৎস রাম! তুমি মনকেই পুরুষ বলিয়া জানিবে এবং মনোরূপ পুরুষকে শুভ বিষয়ে নিযুক্ত করিবে। জগতে যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) আছে সে সমস্তই মনোজয়সাধ্য[৫]। শরীর যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে মহামতি শুক্র জন্মান্তরশত ভ্রমণ করিতে পারিতেন না। অতএব চিত্তই পুরুষ, শরীর তাহার চেত্য (চিত্তের দ্বারা নিষ্পাদ্য)। চিত্ত যন্ময় হইবে, চেত্যও সেই ভাবে নিষ্পন্ন হইবে[৬।৭]। অতএব রাঘব! যাহা অতুচ্ছ, অনায়াস, অনুপাধি ও ভ্রমের অতীত, তুমি যত্ন পূর্ব্বক তাহারই অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তুমি তাহাই প্রাপ্ত হইবে[৮]। মনেরই অভিলষিত বিষয় শরীরের অভিমুখে আগমন করে, শরীরের চাপল্য (স্পন্দন) মনের অভিমুখীন হয় না। হে সুন্দর! তোমার মনঃ অসত্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অভিমুখী হউক[৯]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

——)(*)(——

রামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্! আমার এক মহান্ সংশয় রহিয়াছে—যাহা আমার হৃদয় সাগরে কল্লোলের ন্যায় উদ্বেল হইতেছে। তাহা এই যে, একমাত্র নিত্য নিরাময় দিক্‌কালাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন পরম বস্তু—তিনি মনোনাম্নী ম্লানসম্বিৎ প্রাপ্ত হইলেন—তাহা কিরূপে ও কোথা হইতে আগত বা উৎপন্ন হইল[১।২]? যখন তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং সে বস্তু যখন নিত্য নিরঞ্জন, স্বস্থ বা নির্ম্মল, তখন যে তাহাতে মনোরূপ কলঙ্কের বিদ্যমানতা, ইহা অবশ্যই সংশয়ের কারণ[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সাধু রামভদ্র! অধুনা তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মনে হইতেছে, তোমার মতি মোক্ষভাগিনী হইয়াছে[৪]। শঙ্কর প্রভৃতি যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি অচিরাৎ সেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[৫]। কিন্তু হে অনঘ! এখনও তোমার ঐ প্রশ্নের উপযুক্ত সময় হয় নাই। যখন উক্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গ হইবে তখনই তুমি ঐ প্রশ্ন করিও, করিলে তাহার সিদ্ধান্ত অবাধে বুঝিয়া গতসংশয় হইতে পারিবে[৬]। সেই সিদ্ধান্ত কালে, তোমার এই প্রশ্ন বর্ষাকালে কেকোক্তির (কেকা=ময়ূরের রব) ও শরৎকালে হংস রবের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইবে[৭।৮]। যেমন বর্ষাকালের অবসানে নভোমণ্ডলে সহজ নীলিমা বিরাজিত হয়, কিন্তু বর্ষা বিদ্যমান থাকিতে কেবল পয়োদপটলীই সমুত্থিত থাকে, তখন সহজ নীলিমা দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ, তোমার প্রশ্নও উপযুক্ত কালে স্বতঃই প্রব্যক্ত হইবে, এখন হইবে না[৯]। হে সুব্রত! এক্ষণে যাহা হইতে জনগণের উৎপত্তি হইয়াছে সেই মনের নির্ণয়রূপ প্রকৃত বিষয় বর্ণন করা যাউক, ইহাই মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর[১০]। মুমুক্ষু জনগণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা এইরূপ নির্ণয় করেন যে, অজ্ঞানমালিন্য অজ্ঞগণেরও অনুভব সিদ্ধ। তদুপহিত চিদ্বস্তু ব্যাক্রিয়া কালে অর্থাৎ যে সময়ে প্রকৃতি সৃষ্টুন্মুখী হন সেই সময়ে মননধর্ম্মের আবির্ভাবে মন, দর্শন শক্তির উদয়ে চক্ষুঃ, শ্রবণকারণে শ্রোত্র,

এবং কর্মেন্দ্রিয় ভাবাপত্তিতে কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি) ইত্যাদি আকারে প্রথিত হন[১১]। ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তৃগণ আপন আপন বুদ্ধি ও মত অনুসারে ও বিচিত্র শাস্ত্র দর্শনে সেই একই পদার্থের বিচিত্র নাম, রূপ ও আকার বর্ণন করিয়া থাকেন[১২]। সেরূপ ঘটনা ভেদের কারণ এই যে, মনন-চঞ্চল মন যে যে ভাবের মনন করে সেই সেই ভাবেই পরিণামিত হয়। বায়ু যেমন গন্ধবিশেষের সংসর্গে গন্ধবিশেষের আকারে ও নামে প্রবাহিত হয় সেইরূপ[১৩]। প্রথমতঃ বাসনানুযায়ী মননের (বৃত্তির বা কল্পনার) উদয়, তৎপরে যুক্তির দ্বারা তাহারই অবধারণ, তৎপরে অন্তঃস্থ রঞ্জনা (স্বকল্পিত বিষয়ে স্বীয়তা ও সত্যতা বোধ) এবং পরে তদ্দ্বারা স্বীয় অহঙ্কৃতিকে রঞ্জিত অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন করণ, এবং ক্রমে তাহারই আস্বাদন করিতে থাকে। বিষয়ী দিগের বিষয়াস্বাদ পক্ষেও এই রীতি জানিবে। মন যন্ময়, দেহধারণ ও বুদ্ধ্যাদি, সমস্তই তন্ময়। হে রামচন্দ্র! গন্ধের অন্তঃপ্রবিষ্ট পবন যেমন গন্ধভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায়, মন যে ভাবে ভাবিত হয়, তন্ময় দেহ তাহারই বশীভূত হয়[১৪।১৬]। মনোভাব অনুসারে বুদ্ধীন্দ্রিয় সকল বল্গিত হইলে, চঞ্চল অনিলে রজোরাশির ন্যায় কর্মেন্দ্রিয়গণও তদনুসারে বল্গিত হইতে থাকে[১৭]। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলে কর্ম্মসকল (ধর্ম্মাধর্ম্ম) নিষ্পন্ন হয়। অতএব বুঝা উচিত যে সমস্তই মনের এবং মনঃই কর্ম্মবীজ। যেমন কুসুম ও গন্ধ উভয়ের সত্তা অভিন্ন, তদ্রূপ, কর্ম্ম ও মন, এ দুএরও সত্তাও অভিন্ন[১৮।১৯]। দৃঢ় অভ্যাসের বশে মন যাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ দেহস্পন্দ এবং তাহার কর্ম্মনামক শাখা যথাবৎরূপে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং সমাদর সহকারে অনুরূপ ক্রিয়া ও ক্রিয়াফল নিষ্পাদন করতঃ আশু তাহার ফলাস্বাদ (অনুভব) করিয়া সুখাভিমানী বা দুঃখাভিমানী হয়। মন যে যে ভাব গ্রহণ করে, সে, সে সমুদয়কে সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে ও শ্রেয়স্কর বলিয়াও নিশ্চয় করে[২০।২২]। মন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারের জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করে। মনঃ অংসখ্য আকারে অবস্থিত এবং সে সকল আকারও অত্যন্ত দৃঢ় ও পরস্পর বিভিন্ন। সেই সকল দৃঢ় নিশ্চয় অনুসারে এবং স্ব স্ব প্রতিপত্তি (বোধশক্তি) অনুসারে সকলেই স্ব স্ব কল্পিত বিষয়ের পক্ষপাতী হয়[২৩]। কপিল প্রভৃতির মন আপনার প্রতিপত্তির (জ্ঞানের) নির্ম্মলতা স্থাপিত

ও বিস্তারিত করিয়া সাংখ্য নামক দর্শন কল্পনা করিয়াছে[২৪]। কাপিল মনের নিশ্চয় এই যে, আমাদের অভিহিত উপায় ব্যতীত অন্য উপায়ে মোক্ষ হইবে না। যে হেতু তাহাদের চিত্তনিশ্চয় ঐরূপ, সেই হেতু তাহারা আপন আপন জ্ঞান গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া শিষ্যসংসারে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অভিপ্রায়—যেন কেহ মোক্ষ বিষয়ে অন্যমতি না হয়। পরন্তু তাহারা জানে না যে, তাহাদের ঐ নিয়ম জড়কল্পিত অর্থাৎ মাত্র মনঃ কল্পিত সুতরাং ভ্রান্ত[২৫]। ঐরূপ, বৈদান্তিক মনঃও স্বকল্পিত বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বং ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় করতঃ মুক্তির প্রতি শমদমাদি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে[২৬]। মুক্তিতে কিছু প্রাপ্তি নাই এবং নূতন কিছু হয় না। যাহা স্বরূপ, তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এই নির্ণয় তাহারা স্বকল্পিত ভ্রান্ত নিয়মের (শাস্ত্রের) দ্বারা বিস্তৃত করে[২৭]। * বিজ্ঞানবাদী দিগের মন স্বকীয় বুদ্ধি শক্তির দ্বারা কল্পনা করিয়া বলে—সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধিধারা প্রাপ্তিই মুক্তি এবং তাহার উপায় শমদমাদি সাধন। (সংবৃত্তিক উপপ্লব উপাশান্ত হওয়ার নাম শম এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সংবরণ করার নাম দম)[২৮]। ইহাদের মতেও মুক্তিতে কোন কিছু নূতন হয় না; স্বাভাবিক নিরুপপ্লব বুদ্ধিধারারূপ আত্মা প্রতিষ্ঠিত থাকে। বৌদ্ধেরা এইরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদের কল্পনা বা ভ্রান্ত নিয়মাদি শিষ্যপরম্পরায় প্রচার করে[২৯]। ঐরূপ আর্হতেরাও অর্থাৎ জৈনেরাও আপন আপন কল্পনায় আপন আপন মতের শাস্ত্র দর্শন প্রচারিত করিয়াছে এবং আরও অনেকে অনেক প্রকার বিচিত্র কল্পনার দ্বারা স্ব স্ব মতের শাস্ত্র প্রচার করিয়াছে[৩০]। অতএব, এ বিষয়ে এইরূপ অবধারণ করিবে যে, সাগর যেমন রত্ন সমূহের আকর, মনও সেইরূপ নানা আকারসম্পন্ন রীতির, নীতির, আকৃতির ও সংস্থানাদির আকর। সমুদ্র থাকিলেই তাহাতে নিষ্কারণে (অতর্কিত কারণে) বুদ্বুদাদি উত্থিত হয়। তাহার ন্যায় মন থাকিলেই তাহাতে নানা আকারের আকৃতি কল্পনাকারে জন্মলাভ করে। নিম্ব তিক্ত, ইক্ষু মধুর, এ সকল এবং ইহা শীতল, তাহা উষ্ণ, ইহা অগ্নি, তাহা তীক্ষ্ণ, ইহা মৃদু, তাহা

---

* বেদান্তী দিগের মতে জ্ঞেয় তত্ত্ব সত্য, পরন্তু উপায় প্রক্রিয়া কল্পিত। কল্পিত উপায়ে অকল্পিত তত্ত্ব প্রাপ্তি যায়, ইহা বৈদান্তিক দিগের মুখ্য মত।

অম্ল, এ সকলও উক্তস্বভাব মনের সৃষ্ট। মন যে প্রকার দৃঢ় অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় সেই প্রকারই উপলব্ধ লাভ করে[৩১।৩৩]। অতএব, যাহা অকৃত্রিম ও নির্ম্মল আনন্দ বা স্বাত্মসুখ, মনুষ্যের কর্ত্তব্য—নিয়মাদি তৎ-পর হইয়া মনকে তন্ময়ীভাবে ভাবিত করা। মনকে তন্ময়ীভাবে (আনন্দ ব্রহ্ম ভাবে) অভ্যস্ত করিলে মন তাহাই পাইবে এবং তাহাই দেখিবে[৩৪]। দৃশ্যজাল পরিত্যাগ করিলে, তখন আর মন দৃশ্যজালজন্য সুখ দুঃখে আচ্ছন্ন হইবে না[৩৫]। অতএব হে অনঘ! এই দৃশ্য বিশ্ব অপবিত্র, অসদ্রূপ, মোহজনক ও ভয়ের কারণ ও বন্ধনের রজ্জু, এইরূপ ভাবিয়া ইহাকে পরিত্যাগ কর[৩৬]। এই যে দৃশ্য দর্শন, ইহাই মায়া, ইহাই অবিদ্যা এবং ইহাই ভয়াবহ ভাবনা। সম্বিদের যে এতন্ময়তা, অর্থাৎ বিশ্বময়তা, পণ্ডিতগণ তাহাকে কশ্ম বলিয়া থাকেন[৩৭]। সংবিৎ যে, দৃশ্যের সহিত একলোল হইয়া আছে, তাহাকেই তুমি মোহ কলুষিত মন বলিয়া বিদিত হও এবং কর্দ্দমসদৃশ মিথ্যা দৃষ্টিকে তুমি মার্জ্জন কর[৩৮]। এই যে দৃশ্যতন্ময়তা, ইহাকেই তুমি সংসার মদ ও অবিদ্যা বলিয়া জান[৩৯]। অন্ধ যেমন প্রচণ্ডতপনালোক দর্শনে সমর্থ হয় না, সেই-রূপ, এই অবিদ্যায় উপহত ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না[৪০]। সঙ্কল্প দ্বারা উৎপাদিত এই দৃশ্যতন্ময়তা আকাশ বৃক্ষের সমান। হে মহামতে! যদি ক্রমিক যত্নে অল্পে অল্পে সংকল্প পরিত্যাগ অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে দৃশ্যভাবনা ক্ষীণা ও ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসঙ্কল্প ভাব অভ্যস্ত হইলে তখন বিচার (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক) জন্মে, ক্রমে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন জন্মে, ক্রমে সমাধি অভ্যাস দৃঢ় হয়, তখন দৃশ্যের সহিত আত্মাসম্বন্ধের উচ্ছেদ ঘটনা হয় ও সত্য দর্শনে স্থিরতা জন্মে[৪১।৪২]। যাহার সত্যদৃষ্টি প্রসন্না ও অসত্য দৃষ্টি ক্ষীণা হইয়াছে, তাহাকেই আমরা নির্ম্মলাত্মা ও বিশুদ্ধ চিৎ বলি[৪৩]। যাহার সত্তা, অসত্তা, সুখ ও দুঃখ নাই, যাহার অন্তরে কেবল পরমাত্মভাব বিদ্য-মান, যাহার অন্তর অনর্থ ভাবনায় (দেহাদির চিন্তায়) সমাকুলিত হয় না, তিনিই সেই আত্মবস্তু লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানি। আকাশ যেমন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হয়, তাহার ন্যায় যাহার আত্মা অসংখ্য বাসনা জালে আবৃত এবং রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় যে আপনাতে দেহাদি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি আপনিই আপনার বন্ধন কর্ত্তা[৪৪।৪৬]।

চিদাকাশ (আত্মা) অবদ্ধস্বভাব, সুতরাং তাঁহার বন্ধনভাব কল্পিত। তিনি নিজেরই কল্পনায় নিজে বদ্ধের ন্যায় হন। তিনি আপনাকে অন্যথা কল্পনা করেন, তৎকারণে তিনি বদ্ধের ন্যায় হন। কিন্তু যখন তিনি কল্পনাজাল পরিত্যাগ করেন, তখন, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত বা পরমপুরুষার্থ সুখে (মোক্ষে) অবশেষিত হন। কুসুলে (ধান্যাধারে) সিংহ ভয় না থাকিলেও, আছে ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া যেরূপ, শরীরের মধ্যে আত্মা, ও তিনি বদ্ধ, এ ভাব বাস্তব না হইলেও, আমি বদ্ধ, এইরূপ ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া সেইরূপ। সিংহভীত ব্যক্তি কুসুল পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নির্ভয় হয়। কেননা কুসুলে সিংহ পাওয়া যায় না। তাহার ন্যায় কে বদ্ধ? কাহার বন্ধন? অনুসন্ধান করিলে অবদ্ধ হওয়া যায়। কেননা পর্য্যবেক্ষণে আত্মার বন্ধন দৃষ্ট হয় না[৪৭।৫০]। যাহা অতুচ্ছ অনায়াস নিরুপাধি ও কল্পনাতীত ও ভ্রান্তি রহিত, তাহাই পরম সুখের স্বরূপ ও উপাদান। এই জগৎ, এই আমি, ইত্যাকারের ভ্রম বালকগণের সন্ধ্যাকালে বেতালছায়াদর্শনের ন্যায় অলীক। জীবগণের ভাব, অভাব ও সুখদুঃখাদি, সমস্তই কল্পনামূলক[৫১।৫২]। কল্পনামূলক বলিয়াই ঐ সমস্ত ক্ষণমধ্যে তিরোহিত ও আবির্ভূত হইয়া থাকে[৫৩]। মাতাকে গৃহিণীভাবে দেখিলে মাতাও গৃহিণীর কার্য্য এবং গৃহিণীকে মাতৃভাবে দেখিলে গৃহিণীও মাতার কার্য্য সম্পন্ন করে। গৃহিণীভাব উদ্বেলিত হইলে মন্মথের উদয় এবং মাতৃভাব দৃঢ় হইলে মন্মথের বিস্মরণ হইতে দেখা যায়। অপিচ, ফলাফল সকল ভাবানুযায়ী। তাহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ কোনও পদার্থের একরূপতা স্বীকার করেন না। চিত্ত দৃঢ়রূপে যে যে ভাব ভাবনা করে[৫৪।৫৬], সেই ভাব, সেই আকার ও সেই ফল সে অবাধে দেখিতে পায়। এমন কিছু নাই যাহা সত্য নহে এবং এমন কিছু নাই যাহা মিথ্যা নহে[৫৭]। এ বিষয়ে এই কথা বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, যে, বুদ্ধির দ্বারা যে প্রকার নির্ণয় করে সে সেই প্রকারই দেখে। তাহার দৃষ্টান্ত—আকাশে হস্তী ভাবনা করিলে তৎক্ষণাৎ আকাশে হস্তিদর্শন হয়। (আকাশে হস্তিদর্শন মেঘের সংস্থান বিশেষ হইতে সমুৎপন্ন ভ্রান্তিবিশেষ)[৫৮]। অতএব, হে রাঘব! ইহাই অবধারণ কর যে, মানবসঙ্কল্পই সর্ব্বভাবাত্মক[৫৯]। উহা অবধারণ করিয়া তুমি সুষুপ্তের ন্যায় স্বাত্মভাবে অবস্থান কর। চিত্তকে তুমি

স্ফটিকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে নিরুদ্ধ কর, তাহা হইলে তাহাতে আর এই জগদ্বৈতের প্রতিবিম্বনা হইবে না। যদি কখন দৈবাৎ চিত্ত জাগরিত হয়, আর তাহাতে এই জগজ্জাল প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে তুমি সেই প্রতিবিম্বনাকে অবস্তু, মিথ্যা অথবা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিয়া তাহার অনুরঞ্জন পরিহার পূর্ব্বক আত্মাকে অনাদি অনন্ত বিবেচনা করিবে। তোমার চিত্তপ্রতিবিম্বিত সেই সমস্ত অসত্য ভাব যেন তোমাকে রঞ্জিত করিতে না পারে৩০।৩৩। জীবের মন স্ফটিক রত্নের সদৃশ। মনন করিলেই মন মন্তব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিবেই করিবে। পরন্তু মনন পরিত্যাগ (মন নিরুদ্ধ) করিলে তখন আর কোনও পদার্থের প্রতিবিম্বনা হইবে না৩৪।

একবিংশসর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। যে জীব তত্ত্ববিবেকী ও বিচার-পরায়ণ, যাহার চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, যে মনন পরিত্যাগ করিয়াছে, যে আত্মভাবে বিশ্রান্ত হইয়াছে, যে হেয়দৃশ্য পরিত্যাগী ও উপাদেয় আত্মব্রহ্মগ্রাহী, যে আত্মাভিন্ন বস্তু দেখে না, যে দ্রষ্টাকেও দৃশ্য বলিয়া জানে, যে বিজ্ঞাতব্য পরমতত্ত্বে অবস্থিত ও তদনুধ্যানে রত, যে মোহময় নিবিড় সংসারবর্ত্মে সুপ্তপ্রায় এবং যে অত্যন্তবৈরাগ্যপ্রযুক্ত ভোগ সমূহে বিরক্ত ও আশাবিহীন, সেই ব্যক্তিরই অজ্ঞানতা আতপে হিমকণার ন্যায় বিগলিত হইয়া যায় এবং সেই ব্যক্তিই আত্মৈকত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়[১।৫]। যেমন বর্ষা বিগমে বিলোলকল্লোলশালিনী তরঙ্গরঙ্গিণী নদী সমূহ শান্তভাব ধারণ করে, তদ্রূপ, তৃষ্ণার (অর্থাৎ বিষয় লালসার) অপগমে তাঁহারা পরমা শান্তি প্রাপ্ত হন[৬]। বাসনাজাল মূষিকত্রোটিত পক্ষিবন্ধন জালের ন্যায় ত্রোটিত হইলে এবং হৃদ্‌গ্রন্থি বৈরাগ্যের তেজে শ্লথ হইলে, জল যেমন কতক ফল (নির্ম্মলীফল) দ্বারা প্রসন্ন অর্থাৎ স্বচ্ছ হয়, তাহার ন্যায় তখন বিজ্ঞান প্রবর্ত্তনে স্বভাব (মন) সুপ্রসন্ন (নিরাবিল) হইয়া থাকে[৭।৮]। তখন সে পুরুষ নীরাগ, দোষশূন্য, আসক্তিবর্জ্জিত, একল ও উপাশ্রয়বিহীন (ভোগস্থানত্যাগী) হইয়া পিঞ্জর হইতে বিহগের ন্যায় মোহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়[৯]। তাহার তাদৃশ চিত্ত তখন শান্ত, সন্দেহহীন, দৌরাত্ম্যবিহীন, কৌতুকাদিবিভ্রম রহিত ও পূর্ণ হইয়া পূর্ণশশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত হয় এবং শান্তবাত অর্ণবের ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাব ও সমদৃষ্টিতা ধারণ করে[১০।১১]। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারময়ী নিশার অপক্ষয় হয়, সেইরূপ, সে সময়ে তাহার সংসার বাসনার অপক্ষয় হইয়া থাকে[১২]। পদ্মিনী যেমন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় দর্শনে বিকাসমানা হয় তাহার ন্যায় প্রজ্ঞাও তখন চিদ্রূপ ভাস্কর দর্শনে বিকাসিত ও নির্ম্মল-দ্যুতিসম্পন্না হয়[১৩]। সেই ভুবনানন্দদায়িনী হৃদয়হারিণী সত্ত্বগুণশালিনী প্রজ্ঞা তখন শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে[১৪]। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল জ্ঞাতজ্ঞেয় মহামতিরা আকাশকোশের ন্যায়

উদয় ও অস্ত উভয় বিকারের অতীত হন[১৫]। বিচার দ্বারা পরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিকে কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন[১৬]। যাহার অন্তরে আত্মরূপের প্রাকট্য বিস্তৃত হইয়াছে, যাহার চিত্ত হইতে অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়াছে, কোনও বিকল্প তাহাকে স্বপরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে না[১৭]। তরঙ্গ যেমন জল হইতে আইসে (উঠে) ও জলেই যায় (লয় প্রাপ্ত হয়), সেইরূপ, এই সমস্ত লোক চিত্ত হইতেই আইসে (জন্মে) ও চিত্তেই যায় (লয়প্রাপ্ত হয়)। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই এই চিত্তজাত লোকের (ভোগ্যের) ক্রোড়ীকৃত হয় পরন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা উহার অধীন হয় না। অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণ প্রবন্ধ নাই[১৮]। আবির্ভাব ও তিরোভাব ইহা সংসারেরই ক্রম, উক্ত ক্রমে যাহারা রমমাণ তাহারাই বদ্ধ[১৯]। যেমন ঘটই ভাঙ্গে, তাহাতে ঘটাকাশের ক্ষতি হয় না, তেমনি, দেহই নষ্ট ও দুষ্ট হয়, তাহাতে আত্মার কিছুই হয় না। যাহারা এই রহস্য বিদিত, সেই সকল আত্মজ্ঞগণ দেহ ভূষিতই হউক বা দূষিতই হউক, কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। অতিশীতল বিবেকচন্দ্র সমুদিত হইলে, তখন আর ভ্রমরূপ মরুভূমিতে বাসনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা উদিত হয় না[২০।২১]। "আমি কে? এ সকলই বা কি"? যাবৎ না ঐ দুই বিষয়ের বিচার উদিত হয়, তাবৎ এই অন্ধকারোপম সংসারাড়ম্বর বিদ্যমান থাকে[২২]। মিথ্যা ভ্রমের প্রভাবে উদ্ভূত এই শরীররূপ পাদপ (বৃক্ষ), যে ব্যক্তি ইহাকে আত্মভাবে না দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দ্রষ্টা বা দর্শক[২৩]। এই দেহে দেশ ও কালাদি উপলক্ষে শত শত সুখ দুঃখ আশ্রয় করিতেছে। যে ব্যক্তি সে সকলকে "আমার" মনে না করে, সেই অভ্রান্ত ব্যক্তিই যথার্থ দর্শক[২৪]। এই যে অপার নভোমণ্ডল, এই যে দিক্‌কালাদি এবং এই যে বিচিত্র ক্রিয়া বিক্রিয়া সমন্বিত বিশ্ব, এ সমস্তই আমি এবং সর্ব্বত্রই আমি, যে এইরূপ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ বা দ্রষ্টা[২৫]। আমি কেশাগ্রের লক্ষভাগের এক ভাগের কোটি কোটি অংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথচ সর্ব্বব্যাপী, যে আপনাকে এইরূপে দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দেখে[২৬]। যে পুরুষ আপনাকে ও ইতরকে (শরীরাদি বাহ্য বস্তু সমুদায়কে) নিত্য অভেদ জ্ঞানের বিষয় করিয়া এবম্প্রকার অবধারণ করে যে "এ সমস্তই চিজ্জ্যোতিঃ, বস্ত্বন্তর নহে" সেই পুরুষই জ্ঞানী বা দ্রষ্টা[২৭]।

যে মহাত্মা সর্ব্বান্তর সর্ব্বশক্তি অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিৎবস্তুকে স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[২৮]। যে প্রাজ্ঞ আপনাকে আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, জরা, মরণ ও জন্মাদিশালী দেহী, ইত্যাকারে দর্শন না করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[২৯]। যিনি সর্ব্বদা ও অসন্দেহে অবলোকন করেন যে, আমার মহিমা তির্য্যক্, (আড়্ভাবে) ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বত্রই বিরাজিত; সুতরাং আমার দ্বিতীয় নাই, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[৩০]। সূত্রে যেমন মণি গ্রথিত (মালা) থাকে তাহার ন্যায় আমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত আছে। এবং আমি চিত্ত নহি, ইহা যে ব্যক্তি জানে সেই ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানী[৩১]। অহং নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বা কোন বস্তু নাই, কেবল নিরাময় ব্রহ্ম বিদ্যমান, যিনি সৎ অসৎ উভয়ের মধ্যে ঐ প্রকার দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন[৩২]। তরঙ্গ যেমন সমুদ্রেরই অন্তর্ভূত, তেমনি, এই ত্রৈলোক্য আমারই অন্তর্ভূত, যিনি অন্তরে এই-রূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[৩৩]। যিনি এইরূপ দর্শন করেন যে এই ক্ষুদ্রা ত্রিলোকী মৃতপ্রায় বলিয়া শোকার্হা এবং আপনারই সত্তার দ্বারা ভগিনীর ন্যায় পালনীয়া, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন[৩৪]। আত্মত্ব, পরত্ব, তত্ত্ব, মত্ত্ব, (আমি তুমি, আত্মপর, ইত্যাদি) এ সকল যাহার দেহাদি সাংসারিক বস্তু হইতে উপরত হইয়াছে অর্থাৎ বিবেক দ্বারা বাধিত (মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত) হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ও যথার্থদর্শী[৩৫]। যিনি দেখেন যে, দৃশ্যসম্বলনরহিত, অব্যাহত-স্ফূর্ত্তি চিন্মাত্রে এই জগজ্জাল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তিনিই যথার্থ দেখেন[৩৬]। সুখ দুঃখ, হেয় ও উপাদেয় ও অন্যান্য দৈহিক ভাব (গুরু, দেবতা ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা ও নিত্যানিত্য বিবেকাদি) সমস্ত আমিই, যিনি এইরূপ দেখেন তিনি কদাপি হীন হন না[৩৭]। যার পর নাই আনন্দ-ঘন আত্মসত্তার দ্বারা ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগৎ আপূরিত, যে আনন্দের কণামাত্র স্পর্শে মিথ্যাভূত জগতে আনন্দের অস্তিতা অনুভূত হয়, আমিই যখন সেই ব্রহ্মানন্দরূপ আত্মা, তখন আর আমার হেয়ই বা কি! উপাদেয়ই বা কি!' যাহার দৃষ্টি ঐরূপ সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুদৃক্[৩৮]। যে বস্তু তর্কের অতীত ও চিত্তবৃত্তির বা জ্ঞানের সাক্ষী, এ সমস্তই সেই বস্তু (ব্রহ্ম), এইরূপ বোধ যাহার হেয়োপাদেয় বোধ বিনষ্ট করিয়াছে সেই মহান্ পুরুষই যথার্থ পুরুষ[৩৯]। যে আকাশের

ন্যায় একাত্মা হইয়াছে অথবা সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ কোনও ভাবে অনুরক্ত নহে, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা ও মহেশ্বর[৪০]। যিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন, মৃত্যুরও আত্মা হইয়াছেন, স্বস্থ ও তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমপদপ্রাপ্ত পুরুষকে আমি নমস্কার করি[৪১]। যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বৃত্তিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতেছেন সেই ব্রহ্মৈকমতি পরম বোধবান্ সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করি[৪২]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে উত্তমপদাবলম্বী (জীবন্মুক্ত) পুরুষ এই শরীর-নগরীতে নির্লিপ্ত হইয়া রাজ্য করিতে পারেন, এই উপবনোপমা শরীর নগরী সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরই ভোগ, মোক্ষ ও সুখপ্রদ হয়। এমন কি তিনি কখনই এই শরীরমহাপুরীতে কোনও প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হন না[১।২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! শরীর কি প্রকারে নগরী হইল? ইহাতে নগরীর কি লক্ষণ আছে? আপনি বলিলেন, শরীর নগরীর অধিবাসী যোগী পুরুষ রাজ্যসুখভাগী, সে কথার মর্ম্ম কি? তাহা আমার নিকট বিশদ করিয়া বলুন[৩]। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো রাম! প্রাজ্ঞের পক্ষে এই শরীরনগরী অতিরমণীয় ও সর্ব্বগুণান্বিত। যে হেতু ইহা আত্মজ্যোতিঃরূপ সূর্য্যের আলোকে আলোকিত[৪]। আত্মা ইহার সূর্য্য, নেত্র ইহার বাতায়ন, ইন্দ্রিয়রূপ প্রদীপ ঐ বাতায়ন দিয়া নিরন্তর ভুবনান্তর প্রকাশ করিতেছে। করদ্বয় ইহার (শরীর নগরীর) পথ; এই পথ বিস্তৃত হইয়া (লম্বা হইয়া) পাদরূপ উপবন প্রাপ্ত হইয়াছে[৫]। রোম সকল উক্ত উপবনের লতা, কেশগুচ্ছ গুল্ম, চর্ম্মগত শিরাজাল জালক (গুল্মের মূল), ঐ জালক পাদগুল্ফ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, জঙ্ঘা অবধি উরু পর্য্যন্ত তাহার স্তম্ভ স্থানীয়[৬], রেখাবিভক্ত পাদাগ্রদ্বয় (পায়ের চেটো বা তালু) আধার প্রস্তর, চর্ম্ম ও মর্ম্মস্থান সকল সীমাবিশেষ * এবং সন্ধিস্থান গুলিও সীমা বিশেষ[৭]। তৎপ্রযুক্ত দেখিতে ইহা অতীব সুন্দর। স্তনদ্বয়ে ও উরু দ্বয়ের মধ্যে অথবা মধ্যকায়ের সন্ধি স্থানে যে উপস্থেন্দ্রিয় আছে, তাহাই প্রণালী, এই প্রণালী (জলপ্রণালী) অত্রত্য উপবনের কৃত্রিমা নদী। কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি সুদৃশ্য ক্ষুপ (ক্ষুদ্র বৃক্ষ) দ্বারা সুশোভিত শিরা প্রদেশ সকল এই উপবনের ক্রীড়া শৈল[৮]। ভ্রূ,

---

* শারীর শাস্ত্রে মর্ম্মস্থানের নির্ণয় আছে। সেই সেই স্থানে অল্প আঘাত লাগিলে মৃত্যু হয়। সীমা—যেমন গ্রামের সীমা—গ্রামের শেষ প্রান্তর। স্তন হইতে দুগ্ধস্রাব হয়, সেজন্য তাহা শুভ্র পয়ঃপ্রণালী রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যকায়—ধড়।

ললাট ও ওষ্ঠাদির দ্বারা সুশোভিত রমণীয় বদনোদ্যান পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। ইহার বিহার স্থল কপোল, (কপোল দেখিলে মন তথায় ক্রীড়া করে অর্থাৎ তৃপ্ত হয়।) তাহা কটাক্ষরূপ উৎপলে আকীর্ণ। বক্ষঃস্থল -সরোবর, তাহা স্তনরূপ পঙ্কজ দ্বারা শোভিত। গুচ্ছায়মান রোম সমূহে সমাচ্ছাদিত স্কন্ধদেশ এই সরোবরের তার ভূমি[১০]। উদর এই নগরীর কোষাগার। এই আগার সর্ব্বদা অন্নরূপ ধনে পরিপূর্ণ। উদান বায়ু যখন উদররূপ কোষাগারের কণ্ঠরূপ কবাট উদ্ঘাটিত করে তখন তাহা হইতে মহান্ শব্দ সমুত্থিত হয়[১১]। হৃদয় এই মহাপুরীস্থ বিপণী, বুদ্ধিশক্তি তত্রস্থ রত্ন-পরীক্ষক (ভাল মন্দ বলিয়া দেয়), ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক ঐ বিপণীতে নানাবিধ অর্থ (বস্তু) নীত হয়, এবং দৃশ্যবাসনা (দৃষ্ট বস্তুর সংস্কার) সমূহ সে সকলের পণ্য রূপে গৃহীত হয়। ইহার দ্বার নয়টী, তদ্দ্বারা প্রাণরূপ নগরবাসী অনারত গমনাগমন করে[১২]। মুখবিবর সিংহদ্বার, দন্ত তাহার গজদন্তনির্ম্মিত কীল কাষ্ঠ, জীহ্বা এই নগরের চণ্ডী (দেবী), ইনি প্রতিদিন চতুর্ব্বিধ অন্নের স্বাদ গ্রহণ করেন[১৩]। রোম সকল এই নগরের শষ্প, এবং কর্ণ কোটর ইহার কূপ। পৃষ্ঠদেশ এই নগরের প্রান্তর[১৪]। নগরে কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র থাকে, এবং সে স্থান (যন্ত্র স্থান) সর্ব্বদা কর্দ্দমিত থাকে। এই দেহ নগরেও তাহার অভাব দৃষ্ট হয় না। পায়ু ও মূত্রদণ্ড যন্ত্র, মূত্র জল, ও পায়ুমল (বিষ্ঠা) কর্দ্দম। চিত্ত উদ্যান, আত্মচিন্তা উদ্যান-স্বামিনী (উদ্যানের অধিপতি)[১৫]। এই নগরে বুদ্ধিরূপ সুদৃঢ় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়রূপ মর্কট সদা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বদন ইহার বহি-রুদ্যান। এ উদ্যানের পুষ্প হাস্য[১৬]। এই সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরী শরীরনগরী তত্ত্ববিৎগণের সুখের বৈ দুঃখের স্থান নহে এবং হিতের বৈ অহিতের উপকরণ নহে[১৭]। কিন্তু হে রামচন্দ্র! এই দেহনগরী অজ্ঞগণের অনন্ত দুঃখের আগার এবং প্রাজ্ঞগণের অনন্তসুখরত্নের খনি[১৮]। ইহা বিনষ্ট হইলে প্রাজ্ঞগণের মোক্ষরূপ ধনের কিছুই নষ্ট হয় না পরন্তু থাকিলে সমস্তই থাকে (অর্থাৎ সুখপ্রদ হয়)। অতএব, ইহা প্রাজ্ঞগণেরই সুখ-দায়িনী[১৯]। জ্ঞানিগণ ইহাতে আরোহণ করিয়া সংসারে সঞ্চরণ করেন ও অশেষ ভোগ মোক্ষ অর্জ্জন করেন বলিয়া ইহার নাম জ্ঞানিরথ[২০]। তাঁহারা ইহারই দ্বারা শব্দ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদির জ্ঞান, বন্ধু এবং শ্রীলাভ

করেন বলিয়া ইহা লাভদা নামে কথিত হয়[২১]। সুখ, দুঃখ ও ক্রিয়া, এই রথের দ্বারা বাহিত হয় বলিয়া ইহা সর্ব্ববাহী শব্দে অভিহিত হয়[২২]। প্রাজ্ঞগণ এই শরীরপুরীতে ঐরূপে রাজত্ব করেন এবং বাসব যেমন স্বীয় পুরীতে স্থিতি করেন তাহার ন্যায় বিগতজ্বর ও অব্যগ্র হইয়া অবস্থিতি করেন[২৩]। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই মনোরূপ উন্মত্ত তুরঙ্গমকে কামসন্নিধানে প্রেরণ, প্রজ্ঞারূপ কন্যাকে অধর্ম্মে সমর্পণ অথবা অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র বা তাহার রন্ধ্র অন্বেষণ করেন না। তিনি সর্ব্বদা সাবধানতা সহকারে প্রজ্ঞারাজ্যে সংসাররূপ অরিভয়ের মূলস্বরূপ স্নেহকে ছেদন করিয়া বিরাজ করেন[২৪।২৫]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোন প্রলোভনে এই সুখ দুঃখপরিদেবনাদিসঙ্কুল কামসম্ভোগাদি ভীষণ জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ সংসার-রূপ অসার বা মিথ্যা নদীতে নিমগ্ন হন না[২৬]। তিনি বাহিরে ও অন্তরে সদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনপ্রযুক্ত মনোগত সাগরসঙ্গম তীর্থে অবিরত যথেষ্ট স্নান করিয়া থাকেন[২৭]। ইন্দ্রিয়দৃষ্ট সুখে পরাঙ্মুখ ও ব্রহ্মধ্যানরূপ সুখে নিমগ্ন থাকেন[২৮]। অতএব, বিদিতাত্মাদিগের এই নগরী অতীব সুখাবহা এবং শক্রের অমরাবতীর ন্যায় বিহারস্থলী ও ভোগমোক্ষপ্রদা-য়িনী[২৯]। ইহা স্থিত থাকিলে তাঁহাদের সর্ব্বসুখ থাকে পরন্তু ইহা বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের কিছুই বিনষ্ট হয় না সুতরাং ইহাকে সুখাবহ বলায় দোষ হয় না[৩০]। যেরূপ কুম্ভ বিনষ্ট হইলে কুম্ভস্থিত আকাশ বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ, এই দেহনগর বিনষ্ট হইলে তাহার অন্তরস্থ বস্তুর (আত্মার) কিছুই বিনষ্ট হয় না। সর্ব্বগত হইলেও এই দেহনগরাধিষ্ঠাতা পুরুষ (আত্মা) প্রারব্ধভোগ করতঃ অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন[৩১।৩৩]। অপিচ, অসঙ্গভাবে ক্রিয়োন্মুখ হইয়া কখন কখন ব্যবহার দৃষ্টি সহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, এবং কখন বা পরমার্থ দৃষ্টিতে কিছুই করেন না। অপিচ, কখন প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং কখন বা মনের সহিত লীলাসহকারে বিমানতুল্য হৃৎপুণ্ডরীকে অধিরোহণ করতঃ লীলা বা বিলাস করিতে থাকেন। কখন সর্ব্বলোকসুন্দরী ও অতিশীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপা পরমা প্রিয়ার সহিত বিহার করেন[৩৪।৩৬]। ইহার দুই পার্শ্বে দুই কান্তা। এক সত্যতা, অপর একতা। এই দুই কান্তার দ্বারা ইনি বিশাখা দ্বয়ের (তন্নামক নক্ষত্র দ্বয়ের) মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভ-মানা[৩৭]। এ অবস্থায়, সূর্য্য যেমন অতি উচ্চ নভোভাগে থাকিয়া পৃথিবী

দেখেন তাহার ন্যায় ইনিও দেখেন—অজ্ঞ লোক সকল লতাজড়িত বনের ন্যায় বিবিধ দুঃখজড়িত হইয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছে[৩৮]। ইহার আশা এখন চিরকালের নিমিত্ত প্রপূরিত, সুতরাং এখন সমুদায় ঐশ্বর্য্যশ্রী ইহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেজন্য এখন ইনি অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিরাজিত আছেন[৩৯]। ভোগ সমূহ এখন ইঁহাকে সেবা করিলেও পুনর্জ্জন্মাদি দুঃখ প্রদানে সমর্থ নহে। কালকূট বিষ শিবের অল্পমাত্রও ক্লেশপ্রদ হয় নাই, অধিকন্তু তাঁহার কণ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। তাহার ন্যায় স্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগসজ্ঞ এই জ্ঞানীর আত্মার শোভা-বৃদ্ধিরই কারণ হয়, অন্য কিছুর (সংসার পতনের) হেতু হয় না[৪০]। ভোগ্য বা ভোগ সকল তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সন্তোষের বৈ অসন্তোষের কারণ হয় না। চোর বন্ধুভাবে সেবিত হইলে বন্ধুই হয়, কদাপি শত্রু হয় না[৪১]। জ্ঞানী লোক ভোগসম্পদ্‌কে দূরগামী যাত্রোৎসবযুক্ত নর নারীর অনুরূপ বিবেচনা করেন, করিয়া পরিতুষ্ট হন। (উৎসবলিপ্ত নহে, এরূপ উদাসীন ব্যক্তি দূর হইতে উৎসব কোলাহলকে যেরূপ ভাবে দেখে, জ্ঞানীরা ভোগ সম্পদ্‌কে সেইরূপ দেখিয়া থাকেন)[৪২]। পথিকেরা যেমন পথমধ্যস্থ গ্রাম প্রাপ্তে অশঙ্কিত ভাবে তদ্‌গ্রামের ভাব দেখিতে থাকে, জ্ঞানীরাও তেমনি সংসারের ব্যবহারময়ী ক্রিয়া অশঙ্কিত ভাবে দর্শন করিতে থাকেন[৪৩]। চক্ষু যেমন অযত্নপূর্ব্বক যাদৃচ্ছিক দৃশ্যে নীরাগভাবে নিপতিত হয়, সেইরূপ, ধীরগণের বুদ্ধিও নীরাগভাবে ব্যবহার কার্য্যে নিপতিত হইয়া থাকে[৪৪]। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ানীত পদার্থ গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অহংমমাভিমানী হন না। তাঁহাদের পক্ষে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি উভয়ই সমান, সুতরাং তাঁহারা পূর্ণস্বভাবে বিরাজ করেন[৪৫]। (অর্থাৎ অভাব বোধ রহিত হইয়া থাকেন) পিচ্ছাঘাত যেমন সুমেরু শৈলকে কম্পিত করিতে পারে না, সেইরূপ, অপ্রাপ্তচিন্তা পরিত্যাগ ও প্রাপ্তিচিন্তায় উপেক্ষা এই দুই কারণে অনুতাপাদি বিষম দোষ তাদৃশ জ্ঞানীকে ক্ষণকালের নিমিত্তও বিচলিত করিতে পারে না[৪৬]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই শরীর-নগরীতে সন্দেহ বিগলিত, কৌতুকী ও কুল্পনাপরিত্যাগী হইয়া সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করেন[৪৭]। যদি অজ্ঞ দৃষ্টি অনুসারে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত অবস্থা স্বর্গরাজ্যের (স্বর্গের রাজত্ব) সহিত তুলিত হইতে পারে। পরন্তু

তত্ত্বদৃষ্টি অনুসারে ঐ অবস্থা অতুলনীয়। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় আপনিই আপনার দৃষ্টান্ত এবং আপনাতেই আপনার বিজৃম্ভণ (বিলাস) প্রকট করেন[৪৮]। যেমন অনুন্মত্ত ব্যক্তি উন্মত্ত পুরুষ দেখিয়া অবহাস করে, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞেরা ভোগলম্পট অতৃপ্তেন্দ্রিয় জনগণকে দেখিয়া হাস্য করিয়া থাকেন[৪৯]। একের পরিত্যক্তা স্ত্রী অপরে ইচ্ছা করিলে সে যেমন অবহাসের পাত্র হয়, সেইরূপ, ভোগেচ্ছু ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানীর হাস্যাস্পদ হয়[৫০]। নাগেন্দ্র যেমন অঙ্কুশে বশীভূত হয়, তেমনি, বিষয়-বিদ্রুত মন বিচার দ্বারা বশীভূত হয়[৫১]। তৃষ্ণাই মনোবৃত্তিকে ভোগে নিয়োজিত করে, সুতরাং অগ্রে তাহাকেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য[৫২]। কোন্ ব্যক্তি তাড়িত হইয়া পশ্চাৎ সম্মানিত হইলে সে সম্মানকে বহু বলিয়া মনে করে? (অভিপ্রায় এই যে, মন পুনঃ পুনঃ নিগ্রহপীড়িত হইলে ক্রমে হতাশ্বাস হইয়া ভোগস্পৃহা ত্যাগী হইবে)। প্রাবৃট্ যেমন পূর্ণ সরিতের পূর্ণতা বা অপূর্ণ অবস্থার অপূর্ণতা অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ, আর্ত্ত না হইলে সম্মান বহুমান বুঝিতে পারে না[৫৩।৫৪]। অর্ণব যেমন জগৎপূরণযোগ্য সলিল সম্পন্ন হইয়াও অন্য সলিল গ্রহণ করে, সেইরূপ, আত্মা স্বতঃ পূর্ণস্বভাব হইলেও অন্য বস্তুর বাঞ্ছা করে, তাহাতে তাহার দোষ হয় না। শত্রুবদ্ধ ভূপাল অনুগ্রহদ্বারা মুক্তি লাভ করতঃ একখানি মাত্র গ্রাম পাইলে তাহাতেই তাহার পরম সন্তোষ জন্মে, কিন্তু শত্রুকর্তৃক অনাক্রান্ত অবদ্ধ ভূপতি বিশাল রাজ্যকেও বহু বলিয়া বোধ করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, মনঃও প্রথমে দৃঢ় নিগৃহীত ও ভোগসমূহ হইতে অপসারিত হইয়া পশ্চাৎ যৎসামান্য বিষয় সুখ প্রাপ্ত হইলে সেই স্বল্প বৈষয়িক সুখকেই সে সমধিক বলিয়া অনুভব করে[৫৫।৫৭]। মল্লযোদ্ধারা যেমন হস্ত দ্বারা শত্রুহস্ত নিপীড়ন, দন্ত দ্বারা পরদন্ত নিষ্পেষণ ও স্বদেহ দ্বারা রিপুদেহ আক্রমণ করিয়া জয়ী হয়, প্রত্যেক মনুষ্যের সেইরূপে হৃদয়শত্রু ইন্দ্রিয় দিগকে জয় করা অতীব কর্ত্তব্য[৫৮।৫৯]। যাঁহারা আপন চিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন, এই ধরণীতলে সেই সমস্ত পুরুষই সচেতন, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই পুরুষগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। হৃদয়গর্ত্তনিবাসী মনোরূপ উর্দ্ধমুখ ভুজগ যাহার সম্বন্ধে শান্তভাব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যথাহীন মহাপুরুষকে আমরা নমস্কার করি[৬০।৬১]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহানরক সাম্রাজ্য, তাহাতে দুষ্কৃতিরূপ মত্ত মাতঙ্গ, আশারূপ শর, ও ইন্দ্রিয়গণ মহাশত্রু। এই শত্রু নিতান্ত দুর্জ্জয়[১]। আপনার মুখ্য আশ্রয় দেহকে যাহারা বিনষ্ট করে, সেই সকল নর কৃতঘ্ন। কৃতঘ্নের নিকট কুকার্য্যের কোষ স্বরূপ ইন্দ্রিয়শত্রুগণ পরম দুর্জ্জয়[২]। হে রামচন্দ্র! ইন্দ্রিয়গণ গৃধ্রস্বরূপ। কার্য্য ও অকার্য্য তাহাদের পক্ষ (ডানা)। তাহারা এই কলেবররূপ নীড়ে থাকিয়া বিষয়রূপ আমিষের লোভে বর্দ্ধিত হয়[৩]। যে মহাপুরুষ বিবেকরূপ জালে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট গৃধ্র দিগকে বদ্ধ করিতে পারে, ঐ শঠ পক্ষিগণ কদাচ তাঁহার শান্ত্যাদি বিনাশ করিতে পারে না[৪]। যাঁহারা আপাতরমণীয় এই কলেবররূপ কুপত্তনে (কুগ্রামে) বিবেকরূপ ধন সঞ্চয় করতঃ বিহার করেন, তাঁহারা এতদন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় শত্রুর দ্বারা অভিভূত হন না এবং এই মৃণ্ময় উগ্র শরীরের অধিপতিত্বে সুখ বোধ করেন না। অর্থাৎ শারীর সুখের অভিমানী হন না[৫]। যাহারা এই শরীর পুরীর ঈশ্বর হইয়া ইন্দ্রিয় ভৃত্যের বশ্য না হয়, মনোরূপ শত্রুর অধীন না হয়, সেই সকল শুদ্ধবুদ্ধি নরেরা বসন্ত কালে পত্র পুষ্পাদির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহারা ইন্দ্রিয় শত্রু জয় করিয়াছে, যাহাদের চিত্তের দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ভোগবাসনা হিম কালে পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া যায়। মন যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা বিজিত হয়, তাবৎ হৃদয়াকাশে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অবস্থান করে ও বাসনারূপ বেতাল নৃত্য করিতে থাকে। আমি মনে করি, বিবেকিগণের মনঃই তাহাদের অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্য সাধক বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে বলিয়া সামন্ত, এবং লালনকারী বলিয়া ললনা, পালনকারী হেতু পিতা ও উত্তম বিশ্বাসভাজন বলিয়া সুহৃৎ[৬।১১]। মন শাস্ত্র দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে দর্শন ও বোধ শক্তির দ্বারা আপনার স্বরূপ অনুভব করতঃ সিদ্ধি প্রদান পূর্ব্বক বিনষ্ট হয়। সুতরাং মনঃই

প্রবুদ্ধ দিগের পরম পিতা। এই মনোরূপ সুদৃঢ় ও উত্তম মহামণি সুদৃষ্ট, সুমার্জ্জিত, সুপ্রবোধিত ও সদ্‌গুণে গ্রথিত হইয়া বিবেকী দিগের হৃদয়ে পরম শোভা বিস্তার করে। এই মনোরূপ মহামন্ত্রীই জন্মরূপ বৃক্ষের ছেদনকারী কুঠার নির্ম্মাণ করিয়া বিবেকী দিগের হস্তে অর্পণ ও উত্তরকালীন সুফলের নিরতিশয় আনন্দপ্রদান প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া থাকে। হে রামচন্দ্র! তুমি পরমা সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত এই বহু পঙ্ক কলঙ্কিত মনোমণিকে বিবেকবারির দ্বারা প্রক্ষালন কর এবং ইহারই দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীকরণ করতঃ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হও। আত্মহারা প্রাকৃত লোকের ন্যায় এই উৎপাতপরিপূর্ণ ভীষণ ভবভূমিতে নিপতিত থাকিও না। বিবেকযুক্ত ও সর্ব্বপ্রকারকল্পনারহিত হইয়া সুখে অবস্থান কর। তুমি সংসারমায়াসম্ভাবিত নানা অনর্থসঙ্কুল মহামোহ মিহিকায় (কুয়াশায়) সমাচ্ছাদিত থাকিও না। স্বকীয় নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা সত্য বস্তু দর্শন, বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ ও ইন্দ্রিয়শত্রু দিগকে পরাভূত করতঃ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হও। এই অসত্য শরীরে সুখদুঃখাদি সমস্তই অসৎ। সেইজন্য পুনঃ পুনঃ বলি, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থা না হয়। তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত হও এবং বিশোক হইয়া অবস্থান কর[১২।২০]। হে মহামতে! তুমি স্বকীয় উত্তমা সুবুদ্ধির দ্বারা "এই জগৎ ও এই আমি" এই বৃথা জ্ঞান বর্জ্জন পূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখে পান ভোজনাদি কার্য্য কর। তাহা হইলে জীবন্মুক্ত, অমনস্ক ও অমর হইবে[২১]।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ইহলোকে এরূপে বিহার করিবে, যে, যাহাতে তুমি জনগণের সুখের ও বিশ্রামের স্থান হইতে পার। তুমি ধীমান্, সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্নকর ও আপনাতে শমদমাদি গুণ প্রকটিত কর। হে রঘুকুলপাবন রাম! তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয়; তুমি কেবল ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি প্রাপ্ত ও বিশোক হইয়া অবস্থান কর১।২।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন যে, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের ন্যায় অবস্থিতি না হয় এবং তুমি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি লাভ করিয়া বিশোক হও। হে পাপতাপহারিন্! হে প্রভো! আপনার ঐ উদার বাক্য কিরূপ অর্থের প্রকাশক তাহা বিস্তৃত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমাকে প্রবোধ প্রদান করুন৩।৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমার নিকট দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থা ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থিতি বর্ণন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণান্তে যেরূপ ইচ্ছা হয় কর৬। হে মহামতে! আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ অতিমনোরম পাতালপুরে মায়ারূপ মণির অর্ণবস্বরূপ শম্বর নামে এক দৈত্যেন্দ্র বাস করিতেন৭।৮ তিনি মায়াবলে আকাশে নগরসমূহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে রমণীয় উদ্যান ও তন্মধ্যে মনোহর সুরমন্দির সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই দানবেন্দ্র সর্ব্বদা মায়াবিরচিত শশিভাস্করভূষিত ও আত্মীয়মণ্ডলে পরিবৃত থাকিতেন৮। তদীয় গৃহে অঙ্গনারত্ন সমূহের গীতির দ্বারা অমরবধূগণের ধ্বনি পরাজিত হইত, এবং তদীয় গৃহ সকল পদ্মরাগ প্রভৃতি মহার্হ মণির দ্বারা বিনির্ম্মিত হওয়ায় অমরাচলের শোভা তিরস্কার করিয়াছিল। উক্ত দানব অনন্ত বৈভবে উক্তরূপে সর্ব্বদা পরিপুষ্ট এবং তদীয় উপবনস্থ ক্রীড়া পাদপ সকল সর্ব্বদা চন্দ্রালোকে সমুদ্ভাসিত থাকিত৯।১০। তদীয় ক্রীড়া গৃহ গুলি অনুক্ষণ প্রফুল্লনীলোৎপল ভূষিত থাকিলেও সাধারণ কামিজনের ভয়াবহ ছিল এবং তত্রস্থ হেমপদ্মপরিব্যাপ্ত

সরোবরে রক্তহংসগণ অনুক্ষণ ধ্বনিসহকারে সারসগণকে আহ্বান করিত[১১]। উদ্যানস্থিত হেমপাদপের অগ্রভাগে বহু অম্ভোরুহ মুকুলিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিত। তত্রস্থ করঞ্জ কুঞ্জ সমূহও মন্দারপুষ্পের পতনে শোভমান হইত[১২]। তিনি যন্ত্রধারী অসংখ্য উগ্র দৈত্য সেনায় পরিবৃত হইয়া বাসবকে এবং তদীয় কুসুমোদ্যান নন্দনোদ্যানকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এবং তিনি মায়াবলে সসর্পচন্দনতরুপরিপূর্ণ মলয়াচল নির্ম্মাণও করিয়াছিলেন[১৩।১৪]। তদীয় অন্তঃপুরস্থা সুন্দরী দিগের রূপলাবণ্যে হেম-শ্রীও পরাজিত হইত এবং নানাবিধ পুষ্প সম্ভার দ্বারা তদীয় প্রাঙ্গণ ভূমি সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত থাকিত। তদীয় গৃহান্তরালে যে রত্নসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা দেখিলে বোধ হইত—তদীয় পুরান্তর্গত আকাশ অনুক্ষণ তারকিত রহিয়াছে। তিনি যে ক্রীড়ার্থ মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা চক্রগদাধর বিষ্ণুকেও পরাজিত করণে সমর্থ[১৫।১৬]। সেই পাতাল কুহরের নভোভাগ অমাবস্যা দিবসেও শত শত পূর্ণশশধর দ্বারা সুশোভিত থাকিত। তদ্ভিন্ন, তৎকৃত শালভঞ্জিকারাও (শালভঞ্জিকা=প্রতিমূর্ত্তি, ষ্ট্যাচিউ) যেন তদীয় যুদ্ধোৎসাহে সমুৎসাহিত হইত[১৭]। তদীয় মায়াকৃত ঐরাবত গজ কর্তৃক অমরবারণও ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইত। বলা বাহুল্য যে তদীয় অন্তঃপুর ত্রিলোকের যাবতীয় বিভবে সদা পরিপূর্ণ থাকিত[১৮]। সেই সর্ব্বসম্পত্তিশালী সুভগ দৈত্যেন্দ্র সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে সুসেবিত ও সমস্ত দৈত্যসামন্তে পরিবন্দিত হইয়া উগ্র শাসন সহকারে দৈত্যগণকে পালন বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তদীয় মহাভুজ বৃক্ষের বিস্তৃত ছায়ায় অসুরগণ নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রাম করিত। তিনি সর্ব্ববুদ্ধির আকর ও সর্ব্বরত্নে বিমণ্ডিত ছিলেন[১৯।২০]। এই দেবোৎসাদনকারী ভীষণাকৃতি দৈত্যেন্দ্র শম্বরের বিপুল সুরনাশন অসুর সৈন্য ছিল[২১]। মায়াবলে একদা শম্বর দেশান্তরগত ও তথায় প্রসুপ্ত হইলে অমরগণ ছিদ্র (অবসর) পাইয়া সহসা তদীয় সৈন্যদল আক্রমণ করতঃ হনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২২]। পরে দৈত্যরাজ শম্বর তাহা অবগত হইয়া মুণ্ডি (এক শ্রেণীর অসুর), ক্রোধ ও দ্রুমাদি সামন্ত দিগকে স্বীয়সেনা রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন[২৩]। শ্যেনপক্ষী যেমন কলবিঙ্ক বিনাশ করে, তাহারই ন্যায় দেবতারা ছিদ্র পাইয়া ঐ সকল অসুর বল বিনাশ করিতে লাগিলেন[২৪]। দেবগণ কর্তৃক ঐরূপে আসুর সামন্ত সকল পরাজিত হইলে অসুরসত্তম শম্বর

পুনর্ব্বার সাগরতরঙ্গের ন্যায় মহারবসম্পন্ন অন্য সেনা ও সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন[২৫]। দেবগণ সেই সমস্ত সেনা ও সেনাপতি দিগকেও শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে দানবরাজ শম্বর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অমর বিনাশার্থ অমরগণপরিপূর্ণ স্বর্গপুর গমন করিলেন[২৬]। মায়াযোধী শম্বর অমরাবাস স্বর্গ আক্রমণ করিলে দেবগণ ভীত হইয়া সিংহ দর্শনে মৃগগণের ন্যায় পলায়নপর হইলেন[২৭]। পরে সেই দৈত্যেন্দ্র অল্পকাল মধ্যেই কল্পক্ষীণ জগতের ন্যায় সেই স্বর্গপুরী শূন্যময় অবলোকন করিলেন[২৮]। যখন তিনি দেখিলেন, স্বর্গপুরী নির্দ্দেব হইয়াছে তখন তিনি স্বর্গপুরীর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ রত্নাদি সমুদায় আহরণ পূর্ব্বক তত্রস্থ গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় আলয়ে আগমন করিলেন[২৯]। এই কার্য্য করার পর দেবদানবের পরস্পর বিদ্বেষভাব দৃঢ়ীভূত হইল। অতঃপর দেবতারা ও দৈত্যেরা স্বর্গপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন[৩০]। বলা বাহুল্য যে, শম্বর দৈত্য ঐ সময়ে যাহাকে যাহাকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, দেবতারা যত্ন সহকারে পরোক্ষে থাকিয়া তাহাদের সকলকেই নিহত করিয়াছিলেন[৩১]। তাহাতে সে যার পর নাই উদ্বিগ্ন ও কোপে তৃণাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল[৩২]। দেবতারা কোথায় থাকিয়া অনিষ্টাচরণ করে, লোকত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও শম্বর তাহা জানিতে পারিলেন না[৩৩]। তখন কোপে অধীর হইয়া স্ববলরক্ষার্থ মায়ার দ্বারা মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় অতিঘোর অসুরত্রয় সৃজন করিলেন[৩৪]। সেই মায়াপ্রভব অসুরত্রয় যখন আবির্ভূত হইল, তখন বোধ হইল, যেন পক্ষবান্ পর্ব্বতত্রয় আকাশ গমনে উদ্যোগ করিতেছে[৩৫]। এই তিন্ অসুর যথাক্রমে দাম, ব্যাল, ও কট, এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত। ইহারা কোন প্রাক্তন জীব নহে এবং ইহাদের কোন স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম না থাকায় কোনরূপ বাসনাও ছিল না। কেবল চিন্মাত্রের সন্নিধানপ্রযুক্ত (শম্বর-চৈতন্যের দ্বারা) ইহাদের দেহ পরিস্পন্দনস্বভাবে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ইহাদের জয় বা পলায়নাদি কোনও বিকল্প বুদ্ধি ছিল না[৩৬।৩৭]। ইহারা কর্ম্মজীব শম্বরের অংশ ও কর্ম্মকৌশলে নিপুণ, এবং অন্তর্যামি-চিচ্ছক্তির প্রভাবে উৎপন্ন। সেই জন্য ইহারা অপুষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাদির দ্বারা অপুষ্ট। কৃত্রিম অর্থাৎ মায়াকল্পনার সদৃশ। ভোগপ্রযত্নবর্জ্জিত অর্থাৎ শম্বরাসুরের

এক মাত্র মনোবৃত্তি অবলম্বনে (শত্রুপরাজয়রূপ মনোবৃত্তি অবলম্বনে) আবির্ভূত। সমুদায় কথার নিলিতার্থ—ঐন্দ্রজালিক সৃষ্ট মানব বিশেষের সদৃশ এবং তাহারা যে কার্য্যের নিমিত্ত সৃষ্ট সেই মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত[৩৮]। অন্ধপরম্পরার ন্যায় অথবা কাকতালীয় ক্রমের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ইহারা কেবল মাত্র প্রকৃত কার্য্যের অনুগামী হইয়াছিল। ইহারা বাসনা বিহীন হইয়া কার্য্য করিত। যেমন অর্দ্ধসুপ্ত শিশুরা অঙ্গ পরিচালন করে তাহার ন্যায় ইহারা বাসনা ও অভিমান বিহীন হইয়া শরীরচেষ্টা করিত[৩৯]।[৪০]। ইহারা পতন, উৎপতন ও পলায়ন, কিছুই অবগত ছিল না। ইহাদিগের জীবন, মরণ এবং যুদ্ধে জয় অথবা পরাজয় এ সকল জ্ঞান ছিল না। ইহারা কেবল "শত্রুগণকে প্রহার করা কর্ত্তব্য" শম্বরাসুরের এতদ্রূপ সঙ্কল্পে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া ইহারা সম্মুখে সৈনিক বা সৈন্য দেখিলেই সংহার করিতে উদ্যত হইত[৪১]।[৪২]।

অনন্তর শম্বর পরিতুষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, এবার মদীয় সেনানিচয় এই তিন্ মায়াসুর কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অবশ্যই জয় লাভ করিবে। সুমেরুর হেমশৃঙ্গ যেমন দিগ্‌গজগণের দন্তবিঘট্টনেও সুস্থির থাকে; দাম, ব্যাল ও কট দ্বারা পরিপালিত মদীয় মহাবল সেনা সকল তদ্রূপ স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[৪৩]।[৪৪]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দৈত্যপতি শম্বর ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া দাম ব্যাল ও কট এই তিন অসুরে সমন্বিত দেবনাশিনী সেনা ভূতলে প্রেরণ করিলেন[১]। দৈত্যগণ তখন আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক সাগরতটস্থ কুঞ্জ ও পর্ব্বতগহ্বর হইতে ভীষণ রবে সপক্ষপর্ব্বতের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল[২]। তাহারা হস্ত প্রহারে ভাস্করকেও তেজোবিহীন ও রোদসী কোটর (পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়ের মধ্যভাগ অর্থাৎ অন্তরিক্ষ) পরিপূরিত করিল[৩]। দৈত্যগণের উদ্যোগ দেখিয়া অতিভীষণ অক্ষুব্ধ দেবসেনা-সকল নিকুঞ্জ, কন্দর ও সুরাচল হইতে বিনির্গত হইয়া উর্দ্ধপথে গমন করিতে লাগিল[৪]। পরে অকালে মহাপ্রলয়ের ন্যায় অতিভীম সেই দেবাসুর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল[৫]। তখন কুণ্ডলযুক্ত তেজোময় মস্তক সকল দিক্ সকল বিভিন্ন করতঃ প্রলয়বিপর্য্যস্ত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় ধরা-তলে নিপতিত হইতে দেখা গেল[৬]। যেমন পর্ব্বত সকল মহাপ্রলয় সময়ে প্রচণ্ডপবনাহত হইয়া ঘোর শব্দে বিঘূর্ণিত হয় সেইরূপ অদ্য মহাকায় দেববীর ও দানববীর সকল সিংহনাদ সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল[৭]। তাহাদিগের আঘাতে হিমালয়াদির বপ্র সকল ভগ্ন ও ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং তত্রস্থ সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু সকল ভয়ে পলায়নপর হইল[৮]। হেতিসমূহের পরস্পর আঘাতে যে সকল অনলকণা সমুত্থিত ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল, সে সকল দূরবর্ত্তী দর্শকের তারকারাজি ভ্রম জন্মাইতে লাগিল[৯]। সেই রক্তমাংসময় মহার্ণব তুল্য মহাসমরে ভদগুরূপ বেতাল সকল করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল[১০]। কুণ্ডলোদ্যোত শত্র শত সুরাসুরমুণ্ড অস্ত্রাঘাতে কর্ত্তিত হইয়া রুধির বিকীরণ করতঃ আকাশ প্রদেশ হইতে নিপতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন ভাস্কর শত খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতেছেন[১১]। এইসময়ে দেখা গেল, ভাস্কর-তুল্য তেজস্বী দৈত্যেরা প্রহারার্থ কল্প বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করতঃ উদ্যত হস্তে দিক্ বিদিক্ সমস্তই সমাচ্ছাদিত করিয়াছে। পর্ব্বতরাজি

যেমন কল্পাগ্নির প্রভাবে কণীভূত হইয়া যায়, তাহার ন্যায় যোধগণের অসি নিপাতনে কুলাচল সমূহের অগ্র প্রদেশ কণীভূত হইতে লাগিল[১২]।[১৩]। অতঃপর দেখা গেল, বায়ু যেমন জলদমণ্ডল আক্রমণ করে, মার্জ্জার যেমন বৃদ্ধ মূষিক আক্রমণ করে, তদ্রূপ, দেবগণ ক্রীড়ায় অসুরগণকে আক্রমণ করিতেছেন[১৪]। এবং অসুরগণও প্রমত্ত হইয়া ভল্লুকের বৃক্ষ আক্রমণের ন্যায় সেই সমস্ত দেবগণকে আক্রমণ করিতেছেন[১৫]। এই সময়ে ভুজরূপ বৃক্ষে শস্ত্ররূপ পল্লব ও হেতিরূপ কুসুম সমূহ বিরাজিত থাকায় অসুর ও অমরগণ প্রফুল্লকুসুমসুশোভিত বিচরমান দ্রুমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১৬]। যেমন সুমেরু পর্ব্বতের বন বাতবিক্ষিপ্ত কুসুমে প্রপূরিত হয় সেইরূপ উভয় দলের অস্ত্র শস্ত্র নিপাতনে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল[১৭]। যেমন উডুম্বর মধ্যস্থ আকাশে মশকগণের তুমুল সংগ্রাম হয় সেইরূপ আকাশাবকাশে দেবদানব সেনায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল[১৮]। অনন্তর মহাবলশালী ভীমকায় লোকপাল-দিগের হস্তিগণের ভীষণ গর্জ্জনে সেই সমরকোলাহল কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত দারুণ হইয়া উঠিল[১৯]। সেই সেই অসংখ্য সৈন্য নিতান্ত নিবিড় হওয়ায় কোথাও স্তূপীভূত ভূভাগের ন্যায়, কোথাও জলভারমন্থর জলদের ন্যায়, কোথাও [illegible] চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[২০]। যুদ্ধের [illegible] ও অস্ত্রের প্রহারে অনেক দুর্ব্বল সেনা প্রাণ পরি[illegible]াগ করিল এবং বাণ বিদীর্ণহৃদয় সেনাগণের ক্রন্দনের ভীষণ ঘর্ঘর [illegible] শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[২১]। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির যেরূপ আচরণ হয়, এই সমর কোলাহল আজ সেইরূপ আচরণযুক্ত হইল। অথবা প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্যের তেজে [illegible] কঠিন পর্ব্বত দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হইলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দযুক্ত হইল[২২]। কোন মহাস্রোতঃ (প্রবল জলপ্রবাহ) প্রবল বেগে যাইতে যাইতে বাধা প্রাপ্তে পরাবৃত্ত হইলে যেরূপ গম্ভীর জল-গর্জ্জন সমুত্থিত হয়, এই সমরগর্জ্জনকে আজ তাহার অনুরূপ বুঝিলে অত্যুক্তি হয় না[২৩]। [illegible] পর্ব্বত বায়ুভরে আবেগে ধাবিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, এই শব্দ তাহারও অনুরূপ। যদি ব্রহ্মাণ্ডের বিদীর্ণ হয় তাহা হইলে যে শব্দ উত্থিত হয়, এ শব্দ তাহারও অনুরূপ। [illegible] মন্থন কালে মন্দরাচলের আলোড়ন [illegible] শ্রোত্রপীড়াকর শব্দ

জন্মাইয়াছিল, এ শব্দ তাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে। অমৃত উৎপত্তি হইলে সহসা যে প্রকার জীবগণের হর্ষরোল জন্মিয়াছিল এবং তাহার সহিত তাহাদের ভুজাস্ফোট মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর নির্বিভিত্ত শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, উপস্থিত মহাসমরে সেরূপ শব্দও শুনা যাইতে লাগিল[২৫]।

হে রামচন্দ্র! রণস্থলে ঐ প্রকার ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইলে, সেই বিক্ষুব্ধ সেনাগণের সংগ্রাম ক্রমে অতিভীষণ হইয়া উঠিল। বলোন্মত্ত দৈত্যদানবগণের দ্বারা নগর, গ্রাম, গিরি, কানন ও নিকটবর্ত্তী মানবগণ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল[২৬]। শত শত মহাস্ত্রের দ্বারা ছিন্নভিন্ন দানবীয় মহাবলে দিক্‌সমূহ পরিপূরিত ও উভয় পক্ষীয় বিঘূর্ণিত হেতি সমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল[২৭]। ভুশুণ্ডী অস্ত্রের আস্ফোটে মেরুশৃঙ্গ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল ও নিক্ষিপ্ত শর নিকরে বিকর্ত্তিত দেবদানবগণের মস্তক ইতস্ততো নিপতিত হইতে লাগিল[২৮]। এই সমরসাগরে চক্ররূপ আবর্ত্ত, তাহাতে গতপ্রাণ দেবদানবরূপ তৃণ, সেনাগণের প্রহার শব্দ কল্লোল স্থানীয় হইয়াছিল[২৯]। আয়ুধ নিপাতজনপ্রভব উগ্র বায়ুর দ্বারা বৈমানিক ব্রজ নিপতিত, বারুণাস্ত্র প্রয়োগ জনিত সলিলে ব্যোমপত্তন প্লাবিত, তদুপরি হেতি, বাণ, শূল, অসি ও শক্তি প্রভৃতি মহাস্ত্র সমুদয় প্রবাহিত হইতে দেখা গেল। পক্ষযুক্তশৈলসম ভটগণের আস্ফোটে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ কম্পিত, দৈত্যগণের পাষ্ণিপ্রহারে লোকপালগণের পত্তন (স্থান বা পুরী) নিষ্পিষ্ট, এবং নারীগণের ভয় জনিত হলহলা রবে পুরমন্দির সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল[৩০, ৩১]। কেহ চিৎকার ধ্বনি করিয়া সমর পরিত্যাগ করিতেছে; কেহ রক্তে ধৌতসর্ব্বাঙ্গ হইতেছে, কেহ রক্তকর্দ্দম ম্রক্ষিত হইয়া সমরাঙ্গনে বিলুণ্ঠিত হইতেছে[৩২]। ভ্রমর যেমন পদ্মিনীবৃন্দে ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় যমরাজ আয়ু শেষ প্রাণ হরণের নিমিত্ত লোকপালগণের সেনামধ্যে কখন মুকুলিত ও কখন বা মুক্তার্থ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভীমাকার দানবগণের গর্জনাস্ফোট সমুত্থিত শব্ শব্ ধ্বনিতে [illegible] আকাশে [illegible] কুলাহল নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। [illegible] বিদীর্ণ পর্ব্বত হইতে নির্ঝর নিপতিত হয়, সেইরূপ [illegible] কায় দৈত্য দেহ হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। [illegible]

বিনির্গত রক্তে পর্ব্বত, অর্ণব ও বসুধা অরুণিত হইয়া পড়িল[৩৬]। রাষ্ট্র, নগর, বিপিন ও গ্রাম সমুদায় উৎসন্ন হইয়া গেল। মৃত অসুর, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অসংখ্য শব রাশীকৃত হইয়া অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[৩৭]। নারাচরাজির দ্বারা বারণগণ সুশোভিত ও মুষ্টিপ্রহার দ্বারা উন্মত্ত ঐরাবতের স্কন্ধদেশ বিনিষ্পিষ্ট ইহল[৩৮]।

এই ভীষণ দেবদানবসংগ্রামে প্রলয়পয়োধরের জলধারা বর্ষণের ন্যায় অস্ত্র বর্ষণ আরব্ধ হইল। তদ্দ্বারা পর্ব্বতসমুদয় বিগলিত ও মহাশনিনিষ্পেষণে কুলাচলতটও নিষ্পিষ্ট হইল[৩৯]। হুতাশন যেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্জ্বলিত শিখা বিস্তার করিয়া দাবানলের ন্যায় দানবদল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিভীষণমূর্ত্তি দানবগণ অনলোৎসাদনার্থ অঞ্জলিপুটে সমুদ্রজল আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেবহুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করতঃ তদ্দ্বারা সেই অতিভীষণ অগ্নি উৎপাদন করিতে লাগিল। অতঃপর দেবগণ শিলাগ্নি নির্ব্বাণার্থ বনব্যূহতুল্য বহুল ইন্ধনানল প্রস্তুত করিলে সেই অগ্নির তেজে দানবকৃত শিলাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া সলিলপ্রায় হইয়া গেল[৪০।৪১]। দেবতারা দানবকৃত হুতাশন উক্ত প্রকারে নির্ব্বাপিত করিয়া অস্ত্রযোগে কালরাত্রিসম দুর্ব্বার ও ভয়ঙ্কর তমঃপটল আবির্ভূত করিলেন, এবং দৈত্যগণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া মায়াসূর্য্য উদ্ভাবিত করতঃ তদ্দ্বারা সেই তমঃপটল উৎসাদিত করিলেন[৪২]। ইহার পরে দেবদানব সংগ্রাম আরও অধিক ভীষণ হইয়া উঠিল। উভয় সৈন্যের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহাস্ত্র বৃষ্টি হইতে লাগিল, মায়ামেঘ আবির্ভূত হইয়া মায়াগ্নিবৃষ্টি পান করিল, অগ্নিবমনকারী অস্ত্রসমূহ সীৎকার সহকারে দিক্ বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল[৪৩], শিলা বর্ষণে অসংখ্য যোদ্ধা নিষ্পিষ্ট হইল, বজ্রবর্ষী ভীষণ অস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়া শিলাবর্ষী অস্ত্ররাজি নির্দ্ধূত করিল, নিদ্রাস্ত্র সমূহ আবির্ভূত হইয়া সৈন্যদিগকে নিদ্রায় অবিভূত করিল, প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা প্রবোধাস্ত্র প্রয়োগে তাহার অবহার করিল[৪৪]। এই সংগ্রামসমুদ্র এখন সংঘর্ষরূপ জলজন্তুগণের পরমাশ্রয় হইয়া উঠিল। আকাশ এখন আয়ুধ সম্পাতে নীরন্ধ্র, শিলাস্ত্র বর্ষণে খিলীভূত (ফাঁক রহিত) ও আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণে ভাস্বর। পক্ষে বৃক্ষাস্ত্র প্রয়োজিত হইলে প্রতিপক্ষ হইতে ক্রকচাস্ত্র, বারুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত, ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োজিত

হইলে বৈষ্ণবাস্ত্র বা শৈবাস্ত্র প্রযোজিত হইতে লাগিল৫৫।৫৬। এই সময়ে দর্শকেরা দূর হইতে দেখিল, অত্যুচ্চ রথধ্বজের পতাকারাজি যেন চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং বীরগণ ঘোর হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ মুহুর্মুহু যেন উদয়াচল ও অস্তাচল উল্লঙ্ঘন করিতেছে৫৭। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবিরত বজ্রপ্রহারে মহাসুরগণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা পুনর্ব্বার শুক্রের মৃতসঞ্জীবনী মহাবিদ্যার প্রভাবে জীবিত হইতে লাগিল৫৮। এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেবগণ প্রচণ্ড অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগৎ এখন রুধিরে আপ্লুত। পরক্ষণেই দেখা গেল, পর্ব্বতপ্রতিম অসংখ্য শবীভূত দেহের দ্বারা সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইতেছে। এই সময় আরও দেখা গেল, অত্যুচ্চ তরুশিখরে মহাশব (বৃহৎ বৃহৎ মৃত দেহ) সকল লম্বমান হইতেছে এবং তালবৃক্ষ অপেক্ষাও সমুন্নত শরসমূহে নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নাচিতে নাচিতে শত শত কবন্ধ সমরপ্রাঙ্গণে সঞ্চরণ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রেণীভূত রুধিরাক্ত বীরদেহ সকল ফুল্লকিংশুক বনের সাদৃশ্য বিস্তার করিতেছে৫৯।৬৩, তাহাদের চঞ্চল বিশাল বাহু দ্বারা আকাশস্থ অম্ভোদ, বিমান, সুর এবং তারকা সকল নিপাতিত হইতেছে। শর, শক্তি, গদা, প্রাস এবং পট্টিশাদি দ্বারা পর্ব্বত সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। যদ্রূপ মহাপ্রলয়ে পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘ গর্জ্জন করে তাহার ন্যায় ভীষণ দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দিগ্‌গজ সকল প্রতিগর্জ্জন করিতে ত্রুটী করিতেছে না। অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্গণ নিস্পন্দভাব অবলম্বন করিলেন। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অমর এবং চারণগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সংগ্রামে এখন অনাবৃত ঝঞ্ঝাবাত ও অশনিনিপাত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারাও প্রাণিগণের অঙ্গসমুদয় খণ্ডিত ও শিলাসমুদয় বিদলিত হইতে লাগিল৬৪।৬৮।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভয়জনক ঈদৃশ দারুণ সংগ্রাম সময়ে দেবতাদের ও অসুরদিগের শরীর ব্রণীকৃত হইলে তাহাদিগের সেই শরীরগর্ত্ত হইতে গঙ্গাপ্রবাহের স্থায় রুধিরস্রোতঃ বিনির্গত হইতে লাগিল। এই সময়ে অসুরসেনাপতি দাম দেবতাদিগকে বেষ্টন করিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিল, ব্যাল তাহাদিগকে আকর্ষণ বিকর্ষণ এবং তাহাদিগের আলয় সকল করদ্বারা নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিল, তথা কট তাহাদিগের নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিল[১।৩]। দেবরাজের বাহন ঐরাবত এখন আর গর্জ্জন করে না, সে পলায়মান, এবং দানবগণ এখন মধ্যাহ্ন ভাস্করের স্থায় প্রবৃদ্ধ ও জয়তেজে তেজীয়ান্[৪]। তাহাদিগকে দেখিয়া তখন অগত্যা পতিতাঙ্গ, ব্যথার্ত্ত, রুধিরাক্তকলেবর দেবসেনাগণ ভগ্নসেতু সলিলের স্থায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল[৫]। পাবক যেমন ইন্ধনের অনুগামী হয়, তদ্রূপ দাম, ব্যাল, কট, এই অসুরত্রয় সিংহনাদ সহকারে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; কিন্তু যত্ন সহকারে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগের ছায়া স্পর্শও করিতে পারিল না। দৈত্যগণ দেবগণের অনুসন্ধান না পাইয়া আপনাদিগের জয়লাভ বিবেচনা করতঃ প্রফুল্ল হইয়া পাতালতলস্থ প্রভুর নিকট গমন করিল[৬।৮]।

এ দিকে, দেবগণ সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ জয় লাভের উপায় মন্ত্রণার্থ অমিততেজা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন[৯]। চন্দ্রমা সায়ংকালে রক্তসমুদ্রে উদিত হইলে যেরূপ দৃশ্য হয়, ব্রহ্মা রক্তাক্ত কলেবর ও রক্তানন দেবতাবৃন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সেইরূপ দৃশ্যের অনুকার করিলেন[১০]। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শম্বরের চেষ্টা ও তৎসৃষ্ট দাম, ব্যাল ও কট এই তিন দানবের পরাক্রমের বিষয় নিবেদন করিলেন[১১]। বিচারজ্ঞ ব্রহ্মা ঐ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ ও মনে মনে বিচার করতঃ পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস বাক্য বলিলেন, যে, হে সুরগণ! সহস্র বর্ষের পর ঐ সকল অসুর হরির হস্তে বিনষ্ট হইবে। অতএব তোমরা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা

কর[১২,১৩]। হে সুরগণ! তোমরা ঐ দানব ত্রয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ মায়াযুদ্ধ কর ও পুনঃ পুনঃ পলায়ন কর। যুদ্ধাভ্যাস বশতঃ উহাদের অন্তরে বাসনাবীজ (অহমিকা) অঙ্কুরিত হইলে তখন উহারা জালবদ্ধ বিহগের ন্যায় পরাজিত হইবে। মুখবিম্ব মুকুরে অর্পিত হইলেই মুকুর তৎপ্রতিবিম্ব গ্রাহী হয়। সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ বিজয়ে উহাদের আশয়ে (অন্তঃকরণে) অবশ্যই অহঙ্কার উদ্রিক্ত হইবে। অহঙ্কারের উদয়ে অবশ্যই বাসনা (আমরা বিজয়ী, ইত্যাদিবিধ অভিমান।) জন্ম লাভ করিবে। অহং-পূর্ব্বক কৃত কর্ম্মই বাসনার কারণ, ইহা শাস্ত্রে অবধারিত আছে[১৪,১৬]। হে দেবগণ! ইহারা বাসনাবিহীন ও সুখদুঃখবিবর্জ্জিত হওয়াতেই ধৈর্য্যগুণে শত্রুবিনাশ করতঃ দুর্জ্জয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে[১৭]। যাহারা বাসনাসূত্রে বদ্ধ ও আশার বশীভূত, তাহারাই রজ্জুবদ্ধ বিহগের ন্যায় বদ্ধ ও বশীভূত হয়[১৮]। কিন্তু যাহারা বাসনাবিহীন ও সর্ব্বত্র অসংসক্তবুদ্ধি, তাহারা কিছুতেই হৃষ্ট, তুষ্ট, পুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয় না। সেই কারণে তাঁহারা সর্ব্বত্র দুর্জ্জেয় হয়। ঐরূপ বীর ই মহাবীর। যাহার অন্তঃস্থ বাসনায় শরীরের গ্রন্থি পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছে, সে ব্যক্তি বহুজ্ঞ ও মহৎ হইলেও অনেক বালক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়[১৯,২০]। এই আমি, ইহা আমার, এরূপ কল্পনাকারী পুরুষ মহা আপদের ভাজন হয়[২১]। সর্ব্বপ্রকার বাসনার মধ্যে, দেহাদিতে অহংজ্ঞানরূপ বাসনাই মহৎ অনর্থের কারণ। যে তাদৃশ বাসনাবিশিষ্ট, সে সর্ব্বজ্ঞ হইলেও সর্ব্বত্র হীনতাপ্রাপ্ত হয়[২২]। অসদ্বস্তুতে (মিথ্যা পদার্থে) যে আস্থা, তাহা অনন্ত দুঃখের এবং অস-বস্তুতে যে অনাস্থা, তাহা অনন্ত সুখের আকর। অপরিচ্ছিন্ন ও অপ্র-মেয় আত্মবস্তুকে যে ইয়ত্তার অধীন করে (এই আমি, ইত্যাকার অবধারণ করে), সে আপনারই ছায়ায় আপনি ভীত ও ভ্রান্ত হয়। ত্রিজগৎ মধ্যে যে কিছুকে আত্মাতিরিক্ত ভাবিবে তাহারই দ্বারা বাসনা ও তদ্দ্বারা বদ্ধ হইতে হইবেই হইবে[২৩,২৪]। হে সুরগণ! দানব ত্রয় কট যাবৎ এই সংসারে অনাস্থা প্রদর্শন করতঃ অবস্থিতি করিবে, তাবৎ তোমরা মশক যেমন অনল জয় করিতে পারে না তাহার ন্যায় তোমরা কদাচ তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে না[২৫]। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, জন্তুগণ অহম্ভাবগ্রাহিনী অন্তর্ব্বাসনার দ্বারাই কাতরতা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা অমরাচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবেই অবস্থিতি করে[২৬]। যাহাতে

বাসনা জন্মে, বাসনা তাহাতেই দিন দিন বৃদ্ধি পায়, ইহা অবধারিত আছে। অতএব হে শক্র! দামাদি শত্রুগণ যাহাতে "এই আমি, ইহা আমার" ইত্যাদিরূপ বাসনাযুক্ত হয়, তোমরা তাহারই উপায় বিধান কর[২৮।২৯]। যে কোন বিপদ্ এবং যে কিছু অবস্থা, সমস্তই তৃষ্ণারূপ করঞ্জবল্লীর মঞ্জরী[৩০]। যে ব্যক্তি বাসনাতন্তুবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই বাসনাই তাহার দুঃখের নিমিত্ত প্রবৃদ্ধ ও সুখের নিমিত্ত উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩১]। সিংহও শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার ন্যায় কি ধীর, কি বহুজ্ঞ, কি কুলজাত, সকলেই তৃষ্ণার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন[৩২]। তৃষ্ণা কি? তৃষ্ণা দেহান্তর্ব্বর্ত্তী হৃদয়রূপনীড়স্থিত চিত্তরূপ বিহগের বাগুরা স্থানীয়[৩৩]। যেমন বালকেরা পাশবদ্ধ বিবশাঙ্গ শ্বাসপ্রবাহযুক্ত বিহঙ্গম গণকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় জনগণ বাসনাবদ্ধ হইয়া কৃতান্তকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে[৩৪]। অতএব, হে শক্র! তোমাদিগের এক্ষণে আর বৃথা আয়ুধ ভার বহনের ও রণপরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। উহাদের যাহাতে অভিমান সমুদিত হয়, তোমরা যত্ন-তৎপর হইয়া সেই বিষয়েরই যুক্তি কর। হে অমরপতে! যাবৎ শত্রুগণের অন্তরে ধৈর্য্য অক্ষুব্ধ থাকিবে তাবৎ কি শস্ত্র, কি অস্ত্র, কি শাস্ত্র, কিছুতেই তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। তোমাদেরসেই দামব্যালকটাদি উন্মত্ত রিপুগণ তোমাদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলে অবশ্যই তাহারা অহঙ্কারময়ী বাসনাকে গ্রহণ করিবে। যখন দেখিবে যে, শম্বরসৃষ্ট অজ্ঞ অসুরেরা বাসনার আশ্রয়ীভূত হইয়াছে, তখনই তোমরা তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই[৩৫।৩৮]। অতএব, হে অমরগণ! যাবৎ সেই অসুর শত্রুরা বাসনাবলিত না হয়, তাবৎ তোমরা যুক্তিযুক্তদ্বারা তাহাদিগকে ব্যবহার পথে জাগরূক কর। তাহা হইলে তাহারা অচিরাৎ বাসনাকবলিত হইয়া তোমাদিগের বশীভূত হইবে, এ বিষয়ে সন্দিহান হইও না। ইহ লোকে কেহই এককালে বিষয়তৃষ্ণাবিহীন নহে। বিলোল সমুদ্রলহরীর ন্যায় এই জগৎপ্রবাহ বাসনারই অন্তরে নিত্য নিত্য প্রধাবিত হইতেছে। অতএব তোমরা অগ্রে তাহাদিগের বাসনা সমুত্তেজিত কর, পশ্চাৎ তাহাদিগের পরাজয় বিষয়ে উদ্যোগ করিও[৩৯।৪১]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ পিতামহ দেবতাদিগকে ঐ প্রকার বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন তটে শব্দ করিয়া সমুদ্রে পুনঃ অন্তর্ধান করে, তাহার ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন[১]। পরে অনিল যেমন কমলের সুরভি গ্রহণ করতঃ বনবীথিতে গমন করে, তাহার ন্যায় দেবগণ পিতামহপ্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। পরে পদ্মশ্রেণীতে দ্বিরেফের ন্যায় স্ব স্ব মন্দিরে গিয়া কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করতঃ পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলেন[২।৩]।

তাঁহারা যথাযথ যুদ্ধোদ্‌যোগ করিয়া ভীষণ দেবদুন্দুভি ধ্বনিত করিলে, কল্পান্ত জলদ নাদের ন্যায় সেই দুন্দুভি নিনাদ অসুরগণের শ্রবণকোটরে প্রবিষ্ট হইল[৪]। তখন তাহারা রোষভরে অবিলম্বে পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডলে সমাগত হইল। এবং পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত কালক্ষেপকর সংগ্রাম আরম্ভ করিল[৫]। ক্রোধভরে অসি, শর, শক্তি, মুষল, মুদ্‌গর, গদা, পরশু, শঙ্খ, চক্র, শিলা, বজ্র, গিরি, অগ্নি, বৃক্ষ এবং অহিমুখ, গরুড়মুখ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল[৬]। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে যেন শত শত ঘনঘোষবতী নদী প্রবাহিত হইল। অসংখ্য মায়িকাস্ত্র এই নদীর জল, সে সকলের বেগ প্রবাহ, তাহা লক্ষ লক্ষ পাষাণ ও বৃক্ষ প্রভৃতির দ্বারা বিক্ষুব্ধ সুতরাং শব্দকারিণী[৭]। ইহার মধ্যপ্রবাহ উল্মুক, শূল, শৈল, প্রাস, অসি, কুন্ত, শর ও তোমর মুদ্‌গরাদি বহন করতঃ অমরমন্দির বেষ্টনপূর্ব্বক প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা বিবুধালয় সুমেরু প্রভৃতির বপ্রদেশ গঙ্গাবলিত হিমালয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল[৮]। কি দেব, কি দানব, উভয় পক্ষ হইতেই পুনঃ পুনঃ বিবিধ মায়া উদ্ভাবিত ও পুনঃ পুনঃ প্রশমিত হইতে লাগিল। এই মায়াযুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ এই যে, কখন পৃথিবীময়ী, কখন অগ্নিময়ী, কখন জলময়ী এবং কখন বা বায়ুময়ী মায়া প্রকটিত হইতে লাগিল। যখন

পৃথিবী মায়া বিস্তৃত হয় তখন সামরিক দিগের জ্ঞান হয়—পৃথিবী যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, অধোগামী হইতেছে ও পাতালস্থ জলে মগ্ন হইতেছে। আগ্নেয়ী মায়া প্রকটিত হইলে বোধ হয়—পৃথিবী যেন এখনই ভস্মীভূত হইবে। জলময়ী মায়ার প্রাদুর্ভাব কালে তাহারা বোধ করে—জগৎ যেন অচিরাৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইবে। ঐরূপ, বায়বীয় মায়াকালে বোধ হয়—পৃথিবী যেন পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইতেছে ইত্যাদি[৯]। এবংক্রমের সমর তুমুল হইয়া উঠিলে শৈলোপম আয়ুধসম্পাতে নিকটস্থ ভূধরসমূহ বিঘট্টিত ও বিচূর্ণিত হইল, শোণিতসলিলে সমরমহার্ণব পরিপূর্ণ হইল, তদুপরি প্লবমান দেবদানবগণের মৃতদেহোপরি কুন্তাস্ত্রপংক্তি সকল শৈলোপরি তালতরুরাজির শোভা বিতরণ করিতে লাগিল[১০]। এই মহাসমরে অপর এক দৃশ্য দেখা গেল—যাহার সহিত শিল্পিনির্ম্মিত জীবন্ত লৌহসিংহ তুলিত হইতে পারে। যেন শত শত লৌহসিংহ সজীব হইয়া কুন্ত, শর, শক্তি, অসি, চক্র ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র উদ্গীরণ করিতেছে এবং অবলীলাক্রমে লক্ষ লক্ষ দেবদানবদেহরূপ পর্ব্বত নিগীরণ করিতেছে। সুশাণিত ক্রকচ সমূহ যেন এই মহাসিংহের নখর ও দন্ত, তৎপ্রহারেও শত শত দেবদানব প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[১১]। তৎপরক্ষণে দেখা গেল, অতিভীষণ মায়াসর্পসকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অসংখ্য দৃষ্টিবিধ বিষধর সৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে অব্ধি-তরঙ্গের ন্যায় উল্লাস সহকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সমুজ্জ্বল নেত্র হইতে যেন বিষাগ্নিশিখা নির্গত হইয়া যুগান্তমার্ত্তণ্ডের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে[১২]। এই মায়িক সর্পাস্ত্র প্রতিসংহৃত হইলে অতিবিষম মায়াসমুদ্র আবির্ভূত হইতে দেখা গেল। বজ্র প্রভৃতি আয়ুধরূপ মকরাদি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ মায়ামহার্ণবের প্রবল তরঙ্গ অতিবেগে জগন্মণ্ডল নিপীড়িত করিতে লাগিল এবং হেতিরূপ মহানদীসমূহ অচলেন্দ্র বেষ্টন করিয়া মহাবেগে ঐ সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল[১৩]। এইরূপে উভয়পক্ষ হইতে শৈলাস্ত্র, সর্পাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র ও অচলাস্ত্র আবির্ভূত হইতে লাগিল। সুরাসুরগণ এই সময়ে যুদ্ধপ্রাঙ্গনস্থ অন্তরীক্ষে কখন মায়াসমুদ্র, কখন মায়াময় অগ্নিরাশি, কখন দিনকরনিকর ও কখন বা প্রগাঢ় অন্ধকারপটল সমুৎপন্ন করতঃ দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন[১৪]। ক্ষণকাল পরে দেখা গেল, জগৎ মায়া-

সম্ভূত গরুড়গণের গুড় গুড় ধ্বনিতে ও অস্ত্ররূপ আগ্নেয় পর্ব্বতের উপদ্রবে কল্পান্ত কালের ন্যায় অসহনীয় হইয়াছে। এই সময়ে আরও দেখা গেল সমুদায় দেবনিবাস ও প্রাণিগণের আবাস যেন দগ্ধ হইতেছে[১৫]। পক্ষিগণ যেমন কলহ কালে কেহ উৎপতিত, কেহ আপতিত, কেহবা নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় অসুরগণ কখন বসুধাতল হইতে গগনে উৎপতিত কখন বা দেবগণ উর্দ্ধদেশ হইতে ভূতলে আপতিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে সে ভাবের তিরোভাব হইতে দেখা গেল এবং তৎ পরক্ষণেই দেখা গেল—অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত সুরাসুরগণ যেন অগ্নিবেষ্টিত হইয়া কল্লাগ্নিজ্বালাজ্বলিত হইয়াছেন। পুনরপি তন্মুহূর্ত্তে দেখা গেল, তাঁহারা যেন কল্পানিল কর্ত্তৃক আন্দোলিত পর্ব্বত সমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন[১৬।১৭]। এই সময়ে সুরাসুরসৈন্যরূপ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অসংখ্য শোণিতনদী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতাদৃশ সমরক্ষেত্রে কখন গিরি বর্ষণ, কখন অম্বু বর্ষণ, কখন উগ্র আয়ুধ বর্ষণ, কখন অশনি বর্ষণ ও অগ্নি বর্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমরনীতিজ্ঞ বীরগণ গিরীন্দ্র ভিত্তি বিদলিত করতঃ সে সকল উৎসববিশেষে জনগণ যেমন করিমস্তকে গন্ধচন্দনাদি নিক্ষেপ করে তাহার ন্যায় বীরগণের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন[১৮।২০]। কি দেব, কি অসুর, সকলেই উৎসাহ সহকারে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ দলনার্থ ব্যগ্র হইয়া ঐরাবতসন্ততিসদৃশ পুষ্টকলেবর বীরগণের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করতঃ আকাশমণ্ডলে অনুপম শোভা বিস্তার ও হেতি হস্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২১]। ছিন্নশির, ছিন্নকর, ও ছিন্ন উরু সুরাসুরগণ ভ্রাম্যমান হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন অমঙ্গল্য শলভকুল চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্ সমূহ ও শৈলরাজি অবরুদ্ধ বা আচ্ছন্ন করিতেছে[২২]। যেন উগ্র মেঘমণ্ডল দ্বারা জগজ্জঠর আচ্ছন্ন হইয়াছে, ভটগণের বাহ্বাস্ফোটনে ও বিনিক্ষিপ্ত শিলাপর্ব্বতাদির দ্বারা ধরিত্রী যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছেন[২৩]। সুমেরুতুল্য কঠিনাঙ্গ বীরগণের শরীরসংঘর্ষ শব্দে, তথা পরস্পরনিক্ষিপ্ত আয়ুধ, শিলা, অচল এবং বৃক্ষের উগ্র শব্দে এই সংগ্রাম যেন কল্পক্ষয়কালের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে[২৪]। সুর ও অসুর এই দলদ্বয় যেন প্রলয়কালীন বিক্ষুব্ধ জল, অনল ও অনিলের তুল্য হইয়াছেন[২৫]। এই ভীষণ সংগ্রামে সর্ব্বদিক্

হইতে হেতি আহত বীরগণের অতিকঠোর ভ্রমণশব্দ ও নিপীড়িত ব্যক্তিগণের শ্রবণকর্কশ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল[২৬]। নভোমণ্ডলের অন্তর্ভাগ মায়ানদীর জলরাশি, অগ্নি, বৃক্ষ, সুরাসুরগণের শবসমূহ, অচল, শিলাসমূহ ও পরিভ্রমণশীল শর, অসি, শক্তি, গদা, অস্ত্র ও শস্ত্র, তথা সুমেরুর প্রত্যন্ত পর্ব্বত সদৃশ দুর্ব্বার করিগণের ভীম দেহ, তথা নিপতিত ভটগণের প্রকাণ্ড কলেবর, এই সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইল[২৭,২৮]। রণদুন্দুভির ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ, রুধিরধারায় ভূধর ও ধরা প্রক্ষালিত এবং রুধিরহ্রদভক্ষক যক্ষরক্ষঃপিশাচগণের ঘন ঘোর আরাব, এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যেন আকুলিত হইয়া উঠিল। অহো! কি ভীষণ সংগ্রাম! এই দেবাসুর সংগ্রাম ক্রমে অবিদ্যাদি দুঃসংস্কারের ন্যায় দুস্তর ও নির্ব্বিকার ব্রহ্মচৈতন্যে জগদ্বিকার আবির্ভাবের ন্যায় দুরভিগম্য হইয়া উঠিল[২৯,৩০]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।
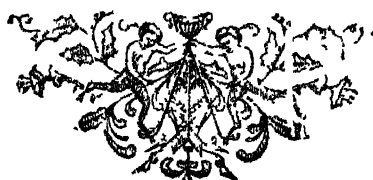
একোনত্রিংশৎ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, অসুরেরা বর্ণিতপ্রকারে ভীষণ যুদ্ধাড়ম্বর করিয়া উক্ত প্রকারে তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল[১]। তাহারা কখন মায়াযুদ্ধ, কখন বাহুযুদ্ধ, কখন সন্ধি, কখন বিগ্রহ, কখন পলায়ন, কখন ধৈর্য্য-সহকারে স্বজনরক্ষা, কখন কার্পণ্য, কখন অস্ত্রযুদ্ধ ও কখন অন্তর্ধান দ্বারা দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের প্রথম যুদ্ধ ত্রিংশৎ বর্ষ ব্যাপী, দ্বিতীয় যুদ্ধ পঞ্চবর্ষ অষ্টমাস ও দশ দিন, তৃতীয় যুদ্ধ দ্বাদশ দিন। এই তিন্ যুদ্ধেই উভয় পক্ষ হইতেই বৃক্ষ, অগ্নি, বজ্র ও পর্ব্বত অনবরত অভিবৃষ্ট হইয়াছিল[২।৪]। দামাদি অসুরেরা ঐ কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধে নিমগ্ন থাকায় অল্পে অল্পে তাহাদের অহংবৃত্তি অভ্যস্ত হইয়া আইসে। ক্রমে তাহাদের চিত্ত অহংগ্রস্ত হওয়ায় তাহারা অহঙ্কারের উপরেই আস্থা করিতে লাগিল[৫]। নিকটস্থ বস্তু যেমন দর্পণে অপ্রতি-বন্ধকে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অভ্যাসের আতিশয্য হইতেই তাহারা অহঙ্কারগ্রস্ত হইয়াছিল[৬]। আদর্শে দূরস্থ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় না। তাহার ন্যায় অভ্যাস বর্জ্জিতের পদার্থবাসনা জন্মে না[৭]। যখন সেই দামাদি অসুরেরা অহঙ্কারময়ী বাসনায় আবিষ্ট হইল, তখনই তাহারা আমার জীবন, আমার অর্থ, ইত্যাদিবিধ ভাবনায় যার পর নাই দীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৮]। পরে তাহারা মোহাক্রান্ত হইয়া ভববাসনাগ্রস্ত ও আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পরম কার্পণ্য (কাতরতা) প্রাপ্ত হইয়াছিল[৯]। যেমন দৃষ্টির দোষে রজ্জুতে সর্পের কল্পনা জন্মে, তাহার ন্যায় দামাদি অসুরেরাও মোহের বশে মমত্বের কল্পনা করিয়াছিল। তাহাতেই তাহারা "মম—আমার" এই মিথ্যা জ্ঞানে অভিভূত হইয়াছিল। তখন তাহারা কিসে আমার এই আপাদ মস্তক দেহ চিরস্থায়ী অথবা অবিনাশী হইবে, ভাবিয়া কাতর হইতে লাগিল[১০।১১]। আমার শরীর খুব হৃষ্ট পুষ্ট ও দৃঢ় হউক, আমার ধনাদি সুখহেতু হউক, এই সকল ভাব তাহাদের বদ্ধমূল হইলে তাহাদের ধৈর্য্য অন্তর্দ্ধান

করিল[১২]। শরীরবাসনা প্রবল হওয়ায় তাহারা অলসত্ব হইয়া পড়িল। সে কারণ তাহাদের আর প্রহারপরতা থাকিল না[১৩]। তখন তাহাদের এইরূপ ইচ্ছা বলবতী হইল যে কি উপায়ে আমরা ইহ জগতে অমর হইব। ঐ চিন্তাতেই তাহারা অঙ্গে অঙ্গে বিবশাঙ্গ হইয়া সলিলবিহীন পদ্মের ন্যায় দীনতা ও হীনতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল[১৪]। যোষিৎ, অন্ন ও পানাদি উপভোগ তাহাদের অহঙ্কৃতির অনুসারিণী হইল সুতরাং তাহাদের রতি বিষয়নিষ্ঠ ও যার পর নাই কুৎসিত হইয়া আসিল[১৫]। অনন্তর তাহারা কুপিত বন্যহস্তী দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় সংগ্রামভীরু হইয়া জীবনে নিরাস হইতে লাগিল[১৬]। তাহাদের আশয় "পাছে আমরা মরি" এই চিন্তায় হত অর্থাৎ বিনষ্ট (কলুষিত) হওয়ায় তাহারা সমরস্থলে প্রথম প্রথম কুপিত ঐরাবতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়াছিল সত্য; পরন্তু অবশেষে তাহারা ইন্ধন ক্ষয়ে অনল যেমন হবির্দাহ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, সম্মুখাগত ভটগণকে হনন করিতে সমর্থ হয় নাই[১৭,১৮]। অধিকন্তু আপনারাই বিবুধগণের সহিত সংগ্রামে অশক্ত হইয়া সামান্য যোদ্ধার ন্যায় ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়াছিল[২০]। অধিক কি বলিব, দৈত্যগণ অবশেষে মরণে ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল[২১]। সেই প্রসিদ্ধ দামব্যালকট নামক অসুরত্রয় ভয়ে দেবালয়ে পলায়ন করিয়াছিল। দামাদির পলায়নে তাহাদের সৈন্যগণ কল্পান্তকালীন পবনোদ্ধূত তারাজালের ন্যায় আকাশমণ্ডল হইতে ইতস্ততঃ নিপতিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত পর্ব্বতাকার সুরারিগণ স্ফুটিতাঙ্গ ও ছিন্নকরবাহু হইয়া অমরাচলকুঞ্জে, তদীয় শিখরাগ্রভাগে, সমুদ্রতটে, পয়োদপটলে, সাগরাবর্ত্তমধ্যে, শ্বভ্রে, সরিৎসমূহে, জঙ্গলে, দিগন্তে, প্রজ্বলিত বিপিনমধ্যে, বিবিধ গ্রামে, নগরে, অটবীতে, মরুভূমিতে, দাবাগ্নিমধ্যে, লোকালোক পর্ব্বত প্রান্তে, পর্ব্বতসমূহে, হ্রদসমূহে, এবং অন্ধ্র, দ্রবিড়, কাশ্মীর ও পারসীক পুর মধ্যে, নানাসাগরতরঙ্গমধ্যে, গঙ্গাসলিলরাশিতে, দ্বীপান্তরে, বিস্তৃত মৎস্যবেধনজালে, জম্বুখণ্ডে ও লতানিকরে লুক্কায়িত হইয়াছিল[২২।২৩]। যে সকল অসুর পলায়ন কালে দেবসেনাগণ কর্ত্তৃক মারিত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদরনিষ্কাশিত অন্ত্র (নাড়ী) বৃক্ষশাখায় বিলগ্ন, ভূমে রক্তচ্ছটা, মস্তক বিপর্য্যস্ত এবং তাহাদের আয়ুধসমুদয় ছিন্ন ও নিপতিত হইতে দেখা গিয়াছিল। অনেক অসুরকে ভীত ও পর্ব্বতের

অগ্রভাগস্থ শিলায় লম্বমান হইতে দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি অসুর শাল্মলীর অগ্রভাগে নিপতিত হওয়ায় কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মহাসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছিল। শিলাফলকের আস্ফালনে অনেকের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়াছিল। যেমন বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইলে পাংশুরাশি বিনষ্ট হয়, তেমনি, সেই অসুরশ্রেষ্ঠগণ তৃতীয় যুদ্ধের প্রারম্ভ মাত্রেই ঐরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল[৩০,৩৪]।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ পরিতুষ্ট ও দানবগণ বিনষ্ট হইলে, দাম ব্যাল ও কট অত্যন্ত দুঃখিত ও ভয়বিহ্বল হইল[১]। শম্বর তদ্বার্ত্তা শ্রবণে দাম ব্যাল কটের প্রতি কোপ বশতঃ কল্পান্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া নিকটস্থ দানব দিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দাম ব্যাল কট কোথায়[২]? এদিকে দাম ব্যাল কট শম্বরভয়ে ভীত হইয়া নিজমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তম পাতালে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল[৩]। শম্বরের কথা দূরে থাকুক, এখানে যম হইতেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যুসম নরকপালক যমকিঙ্কর সকল কুতূহলে বাস করে[৪]। তাহারা এই শরনাগত অসুরত্রয়কে অভয় প্রদান করিল এবং প্রত্যেককে মূর্ত্তিমতী দুশ্চিন্তাসদৃশী এক একটী কন্যা সম্প্রদান করিল[৫]। দাম ব্যাল কট ঐরূপে কন্যাত্রয় সহ অভয় লাভ করিয়া ক্রমে দশ হাজার বৎসর সেই সপ্তম পাতালে অতিবাহিত করিল[৬]। তাহারা কু বাসনার বশীভূত হইয়া "এই আমার কামিনী" "এই আমার কন্যা" ইত্যাদি-বিধ সুদৃঢ় মমতা পাশে বদ্ধ থাকিয়া কাল কর্ত্তন করিতে লাগিল[৭]। একদা ধর্ম্মরাজ মহানরককার্য্য পরিদর্শনার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন[৮]। দামাদি অসুরত্রয় তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া অবগত ছিল না, সুতরাং তিনি তথায় সমাগত হইলে তাহারা তাঁহাকে সামান্য যমকিঙ্কর মনে করিয়া প্রণাম করিল না। ধর্ম্মরাজ তাহাদের উক্ত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভ্রূস্পন্দন করিবামাত্র তদীয় অনুচরবর্গ সেই সপরিবার অসুরত্রয়কে প্রজ্বলিত অঙ্গারযুক্ত ভীষণ স্থানে নিক্ষেপ করিল[৯।১০]। দামাদি অসুরত্রয় বলপূর্ব্বক প্রজ্বলিত ভূমিতে সংস্থাপিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে দাবানল যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষ ভস্মসাৎ করে তাহার ন্যায় সেই প্রজ্বলিত হুতাশন তাহাদিগকে স্বজনবর্গের সহিত দগ্ধ করিল[১১]। সেই দাম, ব্যাল ও কট উক্ত প্রকারে অসুর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব ক্রূর বাসনার, প্রভাবে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

তাহারা বন্ধনাদি ক্রূর কার্য্যকারী যমকিঙ্করগণের সহবাসে থাকিয়া তৎসদৃশী বাসনায় বাসিতাশয় হইয়াছিল বলিয়া প্রথমতঃ বন্ধন ও বধ প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্মকারী কিরাতযোনিতে জন্ম গ্রহণ করতঃ কিরাত রাজের কিঙ্কর হইল[১২]। পরে সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া বায়স জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গর্ত্ত সমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। বায়স জন্মের অবসানে গৃধ্রজন্ম এবং গৃধ্রজন্মের পর শুকপক্ষিকুলে উৎপন্ন হইল[১৩]। অতঃ-পর তাহারা ত্রিগর্ত্তদেশে শূকর এবং পর্ব্বতে পার্ব্বতীয় মেষ হইল। তদনন্তর মগধ দেশে কীটজন্ম পরিগ্রহ করিল[১৪]। এই কীটজন্ম তাহা-দের দুস্তর দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

হে রামচন্দ্র! সেই কুবুদ্ধিশালী অসুরত্রয় ঐ সমস্ত ও অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র জন্মপরম্পরা অনুভব করতঃ এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় অরণ্যে এক কুৎসিত পল্বলে মৎস্যশরীরে অবস্থান করিতেছে[১৫]। তাহারা সে স্থানে দাবাগ্নিক্বথিত (প্রতপ্ত) কর্দ্দমাক্ত জল পান করে ও কষ্টে না মরে না বাঁচে এরূপ জর্জ্জরিত অবস্থায় বাস করে[১৬]। সেই মূঢ়মতি অসুরত্রয় আপন আপন বাসনার অনুরূপ পুনঃ পুনঃ বিবিধ যোনিজন্ম অনুভব করতঃ জললহরীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উদ্ভব ও বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইতেছে[১৭]। ঐরূপে তাহারা বাসনা তন্তুতে অনুবিদ্ধ হইয়া অপার ভব-সাগরে পতিত ও তাহাতে দেহরূপ তরঙ্গের দ্বারা তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ উহ্যমান হইতেছে। হে রাঘব! অদ্যাপি তাহারা উপশম প্রাপ্ত হয় নাই। তুমি আলোচনা কর—বাসনার প্রভাব কিরূপ নিদারুণ[১৮]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! উপরোক্ত কারণে এবং তোমার বোধ বুদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার নিকট দাম ব্যাল কটের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। আমি যে তোমার প্রবোধের নিমিত্ত বলিয়াছিলাম—"তোমার যেন দাম ব্যাল কটের ন্যায় অবস্থান না হয়" তাহার মর্ম্ম এখন বুঝিলে[১]। চিত্ত অবিবেকের অনুগামী হইলে দুঃখভোগের নিমিত্তই ঐরূপ আপদ্ পরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে[২]। অহো! দাম ব্যাল কটের সেই সেনাপতিত্বই বা কোথায়? আর তাপতপ্ত পঙ্কমধ্যে জর্জ্জরিতদেহ জলজন্তুত্বই বা কোথায়? তাহাদের অমরবিদ্রাবণ মহৎ ধৈর্য্যই বা কোথায়, আর কিরাতরাজের ক্ষুদ্রকিঙ্করত্বই বা কোথায়? এবং নিরহঙ্কার চিৎসত্তার উদয়জনিত ধীরতাই বা কোথায়? আর মিথ্যাবাসনার বশ্য অহঙ্কারের কুকল্পনাই বা কোথায়[৩।৪]? একমাত্র অহঙ্কার হইতেই ঐরূপ ও অন্যরূপ শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন দুঃসহ সংসারবিষবল্লী (লতা) বিস্তৃত হইয়া থাকে[৫]। অতএব হে রাম! তোমার চিত্ত হইতে অহঙ্কার অচিরাৎ পরিত্যক্ত হউক। তুমি "নাহং—আমি নহি" এইরূপ ভাবনার দ্বারা সুখী হও[৬]। অমৃতময় অর্থাৎ তাপত্রয়রহিত, রসায়ন অর্থাৎ আনন্দৈকরস, এমন যে পরমার্থরূপ চন্দ্রমণ্ডল, তাহা অহঙ্কাররূপ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে অদৃশ্য হইয়াই থাকে[৮]। বর্ণিত দাম ব্যাল কট নামক অসুরত্রয় মায়িক সুতরাং অসত্য হইয়াও অহঙ্কাররূপ পিশাচের আবেশে সত্যের ন্যায় সত্তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল[৯]। ইহারা মায়াময় ও অসৎ হইলেও একমাত্র অহঙ্কারের গ্রাসে নিপতিত হওয়ায় শৈবাল ভক্ষণ লালসায় অদ্যাপি সতের ন্যায় (সত্যবৎ) কাশ্মীরবনখণ্ডস্থ পল্বলে মৎস্যরূপে অবস্থান করিতেছে[১০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! অসতের সদ্ভাব ও সতের অসদ্ভাব হয় না। তবে কিরূপে অসৎ দাম, ব্যাল, কটাদি, সদ্ভাব প্রাপ্ত হইল তাহা আমাকে উপদেশ করুন[১১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবাহো! অসৎ

সৎ হয় না অর্থাৎ যাহা মূলতঃ নাই তাহা কখন হয় না বা জন্মে না, ইহা সত্য, কিন্তু যাহা সৎ (যাহা আছে) তাহা বৃহৎ ও সূক্ষ্ম হইতে পারে (আবির্ভাব অবস্থা দৃষ্টে বৃহৎ ও উৎপত্তি এবং তিরোভাব অবস্থা দৃষ্টে সূক্ষ্ম বা বিনাশ)। যাহা হউক, তোমার অভিপ্রায় কি? অর্থাৎ তুমি কি ভাবে সৎ অসৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রশ্ন করিতেছ তাহা তুমি আমাকে বিশেষ করিয়া বল। বলিলে আমি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তদ্বিষয়ে তোমার বোধ উৎপাদন করিব[১২।১৩]। রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা আছি, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং আমরাই সৎ। পরন্তু দাম ব্যাল কট মায়িক, সেজন্য তাহারা অসৎ অর্থাৎ তাহারা মূলতঃ নাই। তাই বলিতেছি, তাহারা কি প্রকারে সদ্ভাব প্রাপ্ত হইল[১৪]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, দামাদি অসুরেরা যদ্রূপ মায়াময়, আমরাও তদ্রূপ মায়াময়। মৃগতৃষ্ণিকা মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাহার ন্যায় দামাদি অসুরেরা অসত্য হইয়াও সত্যবৎ ব্যবহারের আস্পদ হইয়াছিল। আমরা অসত্য, তথাপি আমরা সত্যবৎ ব্যবহারের আস্পদ হইতেছি। অর্থাৎ গমনাগমন ও অবস্থানাদি করিতেছি[১৫।১৬]। স্বপ্নে স্বমরণপ্রত্যয় যদ্রূপ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়,—তুমি, আমি, তিনি, এ সকল প্রতীতিও তদ্রূপ জানিবে। বস্তুতঃ তুমি, আমি, এ সকল ভাব স্বপ্নে স্বমরণ দর্শনের ন্যায় অলীক ও অসৎ[১৭]। যেমন স্বপ্নে কোন বন্ধুর মরণ অনুভূত হইলেও তাহা অসন্ময় অর্থাৎ মিথ্যা, "এই ব্যক্তি মৃত" এরূপ জ্ঞানও তদ্রূপ অসন্ময় অর্থাৎ মিথ্যা। এই জগৎপ্রত্যয়ও তদ্রূপ[১৮]। বলা বাহুল্য যে, এই অলীক জগতের সত্তাবধারণ করিতে যাওয়া মূঢ়েরই কার্য্য। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও উক্তি শোভা পায় না। ফলিতার্থে দেখা যায়—বিচারাভ্যাস ব্যতীত ঐ অনুভূতি বিলোপ প্রাপ্ত হয় না[১৯]। অন্তরে যাহার যেরূপ নিশ্চয় দৃঢ়প্ররূঢ়, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহার সে নিশ্চয় কদাচ বিনষ্ট হয় না[২০]। জগৎ অসত্য, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও নিত্য, এই বাক্যে যাহারা উপহাস করে, তাহারা মূঢ় অর্থাৎ তাহারা সারদর্শী নহে। সুতরাং তাহাদের সে উপহাস উন্মত্তপ্রলাপসদৃশ[২১]। মদমত্ত ও বিমদ, অন্ধকার ও সূর্য্য, ছায়া ও আতপ, পরস্পর যেমন এক বা একরূপ হইতে পারে না, তাহার ন্যায় বোধ বিষয়ে অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উভয়ের একত্ব কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে[২২]। শব (মৃতদেহ) যেমন

শত নিয়োগেও পদোত্তোলন করে না, তাহার ন্যায় বহু যত্নে বুঝাইলেও অজ্ঞলোক অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে দ্বৈতভাব নিরূঢ় তাহারা অদ্বৈত ব্রহ্ম বুঝিবে না[২৩]। সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম, এ কথা অজ্ঞদিগের মুখে আসিবে না। মুখে আসিলেও অন্তরে থাকিবে না। অথবা অজ্ঞদিগের প্রতি ঐ উপদেশ ফল প্রদ নহে। কারণ এই যে, তাহারা তপোবিদ্যাদি অনুভবের বাহিরে থাকিয়া চিরকাল কেবল সংসারভাবই সন্দর্শন করিতেছে[২৪]। যাহারা অল্পপ্রবুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ বিবেকাদিবিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরই প্রতি "অহং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নাই, এ সমস্তই ব্রহ্ম, ইত্যাদি উপদেশ সফল হইয়া থাকে[২৫]। সুধীগণ অনুভব করেন—এ সমস্তই শান্ত ব্রহ্ম। তাঁহাদের সে অনুভব কেহই বিলোপ করিতে পারে না[২৬]। যেমন সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত অঙ্গুরীয় নাই, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত অহন্তাদি নাই[২৭]। কিন্তু মূঢ়গণের বুদ্ধিতে অঙ্গুরীয় হেমের অতিরিক্ত এবং ভূতভৌতিও আত্মার অতিরিক্ত[২৮]। মূঢ়গণ সর্ব্বত্রই মিথ্যা অহন্তাবময় এবং সুধীগণ সত্য পরমাত্মময় অবলোকন করেন। যাহার যে স্বভাব, তাহার তাহা সহসা অপগত হয় না। যে যন্ময় হইয়াছে, তাহা তাহার অপগত হইবার কি যুক্তিযোগ আছে? "আমি ঘট" এ বাক্য যেমন উন্মত্তপ্রলাপ সেইরূপ আমি মনুষ্য, এ বাক্যও অজ্ঞপ্রলাপ[২৯।৩০]। অতএব, আমরা ও দামাদি অসুর বস্তুতঃ সমান অসত্য। সুতরাং তাহাদের ও আমাদের সত্যতা ও উদ্ভব সর্ব্বথা অসম্ভব[৩১]। হে রাঘব! একমাত্র সত্য, সম্বেদনরূপ, সর্ব্বগত, শান্ত, নিঃশূন্য, অকিঞ্চিদ্রূপে অবস্থিত, উদয়াস্তরহিত ও নিরঞ্জন চিদাকাশকেই তুমি সত্য বলিয়া জানিবে[৩২।৩৩]। এই সমস্ত সৃষ্টিপরম্পরা সেই নির্ম্মল আকাশে প্রতিভাসরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন দোষকলুষিত চক্ষুঃ কেশোণ্ডুক দর্শন করে, সেইরূপ, উক্ত পরমাত্মাকাশে পরিকল্পিত আভাস (ভ্রান্তি) সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে[৩৪]। সত্যাত্মা আপনিই আপনাকে যেখানে যখন যে ভাবে দর্শন করেন বা পরিভাবিত করেন, সেস্থানে তিনি তখন সেই ভাবেই প্রকটিত হন[৩৫]। উক্ত চিদ্ব্যোম ভিন্নরূপ ধারণে অসত্যরূপী হইলেও আত্মভাবনার দ্বারা সত্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব, সত্যাসত্যের কোন পারমার্থিক নির্দ্ধারণ নাই। সত্যই বল,

অসত্যই বল, সমস্তই কল্পনাময় বা আত্মভাবনামূলক। অতএব, দামাদি অসুরেরা যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরাও তদ্রূপে উৎপন্ন। সুতরাং ইহা সুস্থির জানিবে যে, উৎপত্তি দৃষ্ট হইল বলিয়া তাহার সত্যাসত্য চিন্তা নিরর্থক। যখন কোন কিছুর উদ্ভব দেখিলে বাস্তব উৎপত্তি নাই তখন আর তদ্দর্শনের সত্যাসত্য চিন্তা কেন[৩৬।৩৭]? এইমাত্র চিন্তা করিবে যে, সেই নিরাকৃতি চিদাকাশের চিৎ যখন যেরূপে প্রতিভাত হয় তখন তিনি স্বয়ং সেইরূপে প্রস্ফুরিত হন। সম্বিদ যখন অস্মদাদি বা দামাদিরূপে সমুদ্রিক্ত (প্রকটিত) হয়, তখন তিনিই তদ্রূপতা প্রাপ্ত হন[৩৮।৪০]। যেমন সৌর কিরণই মৃগতৃষ্ণিকা, তেমনি, চিদ্বপু পরমাত্মার স্বরূপ প্রচ্ছাদনই জগৎ। চিদাকাশ যখন প্রবুদ্ধ, তখনই দৃশ্যদর্শন ঘটনা হয় কিন্তু তিনি যখন সুষুপ্ত, তখন তাঁহার মোক্ষ বলিয়া কল্পনা করা হয়। ফলতঃ ঐ সকল পরিভাষা মাত্র, বস্তুতঃ চিদতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। অতএব, হে রামচন্দ্র! তুমি এই স্বর্গশ্রীকে ও মোক্ষকে চিদ্ব্যোমেরই রূপ বিশেষ বলিয়া জানিবে। ঐ সম্বন্ধে শব্দভেদ ব্যতীত পদার্থভেদ নাই[৪১।৪৪]। কলুষিত চক্ষুঃ যে কেশোণ্ডুক দেখে, বস্তুতঃ তাহা কেশোণ্ডুক নহে। এই জগদ্দর্শনকে তুমি তদ্রূপ জানিবে। যেমন কেশোণ্ডুক দর্শন কালে দৃষ্টি যাহা তাহাই থাকে অর্থাৎ চৈতন্যের অন্যথা হয় না, সেইরূপ, জগদ্দর্শন কালে পরমাত্মা যাহা তাঁহাই থাকেন, কোনও বিকারস্পৃষ্ট হন না[৪৫।৪৬]। হে প্রাজ্ঞ! যাহা আছে, তাহা অনুভূতিরই স্বরূপ (অনুভূতি=সাক্ষীচৈতন্য) এবং যাহা অনুভূতি ব্যতিরিক্ত তাহা নাই। তুমি সেই সদ্রূপ শান্ত ব্রহ্মকে অনুভূতিতে মিশাইয়া শোকভয়াদি ভেদ পরম্পরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হও। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরের ন্যায় মহাচিতের অন্তরে দৃশ্যমান জগৎ কেবলমাত্র প্রতিভাস, অন্য কিছু নহে। যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় সমস্তই সেই মহাচিৎ। বুঝিতে হইবে, সেই মহাচিৎই তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই মহারহস্যে বিশ্বাস স্থাপন কর, করিলে সুখী হইবে[৪৭।৪৮]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

——)(*)(——

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি বুঝিলাম, ভূত প্রেত পিশাচাদি বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ। তাহার ন্যায় দাম ব্যাল কটাদি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ এবং অজ্ঞ দৃষ্টিতে সৎ। পরন্তু আমি জানিতে ইচ্ছা করি—কোন্ উপায়ে কত কালে ও কি প্রকারে তাহাদের দুঃখের অন্ত অর্থাৎ মোক্ষ হইবে১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! দাম ব্যাল কটের কুটুম্ব যমকিঙ্করগণ যমরাজের নিকট ঐ বিষয় প্রার্থনা করিলে যম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর। যম বলিয়াছিলেন, "যে দিন ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মজিজ্ঞাসু হইবে সেই দিনই ইহারা মুক্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই২।৩।" রাম বলিলেন, হে মহামুনে! তাহারা আত্মবিবরণ কিরূপে ও কোথায় শুনিবে এবং কাহার নিকট অবগত হইবে, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, উহারা কাশ্মীর দেশে মহাপদ্মসরোবরের তীর সন্নিহিত এক পল্বলে পুনঃ পুনঃ মৎস্যযোনি পরম্পরা ভোগ করিবে। পরে তাহারা মৎস্যযোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উক্ত সরোবরে সারস জন্ম পরিগ্রহ করিবে৫।৬। সরোদ্ভব সারস জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাহারা সেই মহাপদ্মসরোবরে কখন বিকসিত কহ্লারমালা মধ্যে, কখন প্রফুল্ল সরোজপটলীতে, কখন শৈবালবলিত বননীথিতে, কখন বিলোল তরঙ্গপংক্তিতে, কখন বাতবিচলিত কুসুমসমূহে, কখন নীলোৎপলরাজিতে, কখন সুশীতল সীকরনিকরে ও কখন বা শীতস্পর্শ সলিলাবর্ত্তশ্রেণীতে বিহার করতঃ সরোবরসুখ সম্ভোগ করিবে। বহুদিবস ঐরূপ ভোগের পর তাহারা বুদ্ধিশুদ্ধি লাভ করিবে৭।৮। যেমন সত্ত্বরজস্তমো গুণ বিবেচনা সহকারে পর্য্যালোচিত হইলে বিবেকোদয়ের কারণ হয়, তাহার ন্যায় উক্ত অসুরত্রয় যাদৃচ্ছিকরূপে বিচারবুদ্ধি প্রাপ্তে পরস্পর বিচ্ছিন্ন (একল) হইবে১০।১১। তৎপরে যাহা হইবে শ্রবণ কর। কিছু কাল

ছিল, তাই অমর হইতে পারে নাই; অধিকন্তু শিরশ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাঁহারা সংসারে এই প্রাকৃত জন্ত ভোক্তাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কোনও কালে মোহান্ধকারের বশীভূত হয় না। যাহা নিতান্ত আরাধ্য—তাহাও তাহাদের বাধ্য (বশীভূত) হয় এবং যে কোন আপদ্—সমস্তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[৩৭]। যে সকল পুরুষসিংহ বৈরাগ্য ও শমদমাদি গুণে বিখ্যাত—যে সকল মহাপুরুষ ঐ সকল গুণে পরিবৃত—তথা অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণে ও তদভ্যাসে অনুরক্ত—তথা সত্য বাক্যে ও সত্য কর্ম্মে বাসনা—সেই সকল মহাপুরুষেরাই যথার্থ নর এবং তাহাদেরই জন্ম ও জীবন সার্থক। অবশিষ্ট নর গণের, তাহারা পশুবিশেষ। যাহাদের হৃদয়সরোবর সুযশোরূপ চন্দ্রচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত (প্রকাশিত), তাহারা ক্ষীরসমুদ্রের সমান এবং তাহাদেরই মূর্ত্তিতে ভগবান্ হরি সর্ব্বদা শয়ান থাকেন। যাহাদের প্রারব্ধ ভোগ শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ দূর হইয়াছে[৩৮।৩৯], তাহাদের আর ভোগস্পৃহা কি? কেন তাহারা ভাবিজন্মপরম্পরা দ্বারা আত্মবিনাশক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? তুমি যথাক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাচার ও যথাস্থিতি * অবলম্বন করতঃ ভোগসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া মুক্ত হও। সাধুজনগণ তোমার সুগন্ধপ্রসারিত অনন্ত সদ্গুণ ও সুকীর্ত্তি গান করুন এবং হৃষ্ট হইয়া ভূয়ো ভূয়ো সাধুবাদ প্রয়োগ করুন[৪১।৪২]। ঐ সকল সদ্গুণ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করে, ভোগ তাহা করে না। সিদ্ধপুরনারীরা যাহাদের চন্দ্রসদৃশনির্ম্মল যশোগাথা গান করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে চিরজীবি; অবশিষ্ট মনুষ্য মৃত। উৎকৃষ্ট পুরুষকার, যত্ন ও উদ্যম অবলম্বন করিয়া ও উদ্বেগরহিত হইয়া যথাশাস্ত্র সাধনতৎপর হইলে কোন্ ব্যক্তি না সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়? শাস্ত্রপরতন্ত্র ও সদ্ব্যবহারপরায়ণ ব্যক্তিগণই [illegible] করিয়া থাকেন[৪৭।৪৮]। চিত্ত পরিপক্ক হইলে তবেই [illegible] ফল [illegible] (স্পষ্ট) হয়। হে রামচন্দ্র! তুমি শোক, ভয়, [illegible] ঐ সকল [illegible] যথাশাস্ত্র ব্যবহার [illegible] প্রবৃত্ত থাকিবে; [illegible]

[illegible]

উদ্দাম ইন্দ্রিয় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্ধকূপস্বরূপ ভবে নাশ প্রাপ্ত না হয়[৩০।৩১]। তুমি অতঃপর যেন অধমত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধোগামী হইও না। তুমি এই অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ শস্ত্র অনুশীলন কর; এই মহাশস্ত্রই আপদ্ সমূহের নিবারক ও ইন্দ্রিয় শত্রু জয়ের প্রধান সহায়। ইহারই দ্বারা ইন্দ্রিয় শত্রু সকল উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে[৩২।৩৩]। এই পঙ্কসদৃশ সংসারে জীবিতাশা নিতান্তই ভ্রান্তি। অতএব হে আর্য্য! তুমি হৃদয় হইতে সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর সৎশাস্ত্র সন্দর্শন কর। পরমাত্মা কর্তৃক প্রেরিত বুদ্ধির দ্বারা "এ সমস্তই আত্মপ্রতিবিম্বমাত্র" এইরূপ সত্য অবলম্বন ও বিচারপরায়ণ হও। দুর্ভাগ্যদায়িনী দীনা অশিবা হীনবিচারণারূপিণী মহানিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। পঙ্কল মধ্যে বৃদ্ধ কচ্ছপের ন্যায় সুপ্ত হইয়া অবস্থান করিও না। জরামরণশান্তি বিধানের নিমিত্ত সত্বর উত্থিত হও[৩৪-৩৭]। অর্থসম্পত্তিকে অনর্থ, ভোগ-পরম্পরাকে রোগদায়ক, আপদ্‌কে সর্ব্বসম্পদ ও অনাদরকে বিজয়স্বরূপ বলিয়া জান। লোকতন্ত্রের অনুসরণ, সদ্‌ব্যবহারিগণের বিচার ও শাস্ত্রাচারের অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা সংফল লাভে উদ্‌যুক্ত হও। যিনি সুচারুরূপে সদাচারে বিচরণ করেন, যাঁহার বুদ্ধি বিবেকযুক্ত হইয়াছে ও যিনি সংসারের কোন দশার অভিলাষী নহেন, অনন্ত আয়ুঃ, যশ, সদ্‌গুণ প্রভৃতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বিকসিত মাধবীলতার ন্যায় সৎফল প্রদানের নিমিত্ত উল্লসিত হয়[৩৮।৩৯]।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, সাধনের যথোচিত উৎকর্ষে সাধ্যসিদ্ধি হয়, এই নিয়ম স্মরণ করতঃ স্থির করিতে হইবে যে, সমস্তই সাধনের সাধ্য, সাধনের অসাধ্য নাই। যেহেতু সাধনের (কার্য্যোদ্‌যোগের) অসাধ্য কিছুই নাই, সেই হেতু তোমাকে বলিতেছি, তুমি সমুদ্যোগ পরিত্যাগ করিও না[১]। মিত্র ও স্বজন গণের আনন্দবর্দ্ধন নন্দী সরোবর তীরে ঈশানের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকেও পরাজয় করিয়াছিলেন[২]। *

---

* কোন সময়ে শিলাদ নামক কোন মুনি সর্ব্বজ্ঞতম পুত্রকামনায় ভগবান্ রুদ্রদেবের আরাধনা করিলে তিনি তাঁহার সেই সুদীর্ঘ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনে! আমা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ লোকত্রয়ে দৃষ্ট হয় না। অতএব আমিই অংশরূপে ত্বদীয় পুত্র হইয়া জন্মিব, কিন্তু আমার অংশ, তোমার সেই পুত্র ষোড়শবর্ষীয় হইলে কালকবলে নিপতিত হইবে। তখন শিলাদ শিববাক্য অন্যথা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং তথাস্তু বলিয়া সেই বাক্য অনুমোদন করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তদীয় পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইল। শিলাদ পত্নীর গর্ভাবস্থা দর্শন করিয়াও আনন্দ অনুভব করিলেন না। কারণ, তদীয় অন্তঃকরণ পুত্রমরণোৎকণ্ঠায় নিরন্তর উৎকণ্ঠিত থাকিত। কালক্রমে শিলাদপত্নী একটী পূর্ণচন্দ্রপ্রভ পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিলাদ, পুত্রের "নন্দি" এই নাম রাখিলেন। কিছুদিন পরে নন্দি পিতৃমুখে স্বীয় অবশ্যম্ভাবী মরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্বালয় হইতে বহির্গত হইয়া রুদ্রদেবের আরাধনার্থ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক সরোবরতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একান্তচিত্তে স্বীয় মৃত্যু বিজয় কামনায় সরোবরতীরে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন, ক্রমে তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম সমুপস্থিত হইল। তখন সর্ব্বজনান্তকারী মৃত্যু প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় পাশ হস্তে অবিলম্বে সেই সরোবরতীরে হইলেন এবং তাঁহাকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিলেন। এ দিকে সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্ব-শান স্বীয় অংশভূত নন্দির সমুপস্থিত বিপদ্ অবগত হইয়া অবিলম্বে সেই

বলি প্রভৃতি দানব উৎকৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া হস্তিগণের পদ্মবন মর্দ্দনের ন্যায় দেবতাদিগকেও বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন[৩]। মহর্ষি সম্বর্ত্ত, মরুত্তযজ্ঞে ব্রহ্মার ন্যায় মানস সুরাসুর সৃজন করিয়া ছিলেন। * মহাতপা বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ উৎকট সাধনা প্রয়োগ করিয়া দুর্ল্লভ তপোমার্জ্জিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন[৪।৫]। যে উপমন্যু এক সময়ে (শৈশবে) ভাগ্যহীনতা প্রযুক্ত বহু রোদনের পর অতিকষ্টে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টাম্বু পান করিয়া অমৃত পান জ্ঞান করিয়াছিলেন, সেই উপমন্যু তপঃপ্রভাবে ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রে বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৬]। যে কালের (কাল = সর্ব্বভূত সংহারী যম) নিকট অতিবল বিষ্ণু ও ব্রহ্মা প্রভৃতি তৃণবৎ, সেই কাল শ্বেত নামক কোন মুনির তপোবলে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন[৭]। রাজকন্যা সাবিত্রী ভর্ত্তৃপ্রাণের অনুগমন, যমদেবতার স্তুতি ও তাঁহার প্রীতিজনক বাক্য বিন্যাস প্রভৃতি উপায়ে যমকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় ভর্ত্তা সত্যবান্‌কে পরলোক হইতে প্রত্যানীত করিয়াছিলেন[৮]। হে রাঘব! বহু উদাহরণে প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কথা এই যে, এমন কোন আতিশয্যের অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উদ্যোগের আতিশয্য নাই যাহার ফল দৃষ্ট হয় না। তাই তোমাকে বলিতেছি, যিনি অন্তরে ফল লাভের তারতম্য বা যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া উৎকট রূপে উদ্যোগ পরায়ণ হন, তিনি অবশ্যই ফল লাভে অন্তে কৃতার্থ হন[৯]। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ফল লাভের প্রত্যাশায় গুরুতর উদ্যোগে তৎপর হওয়া সঙ্গত নহে। যাহা অশেষসুখদুঃখদশা ও প্রতিকূলদৃষ্টি প্রভৃতির মূলচ্ছেদকর; সেই আত্মজ্ঞান ফল লাভের নিমিত্ত যথোচিত আতিশয্য অর্থাৎ শাস্ত্রীয় যত্ন বা উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য[১০]। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভোগানুরক্তি বিদূরিত করা

স্থানে সমাগত হইলেন এবং নাম[illegible]দের অগ্রভাগ প্রহারে [illegible]কে বিতাড়িত ও সেই দারুণ পাশ ছেদন করিয়া নন্দিকে জরামরণবিমুক্ত করিলেন। এই উপাখ্যান লিঙ্গপুরাণে প্রসিদ্ধ।

* মহাভারতের মতেও মহর্ষি সম্বর্ত্ত মরুত্তযজ্ঞের বিঘ্নকারী। তিনি মহেন্দ্রকে সত্যসঙ্কল্পের দ্বারা পরাভূত করিয়াছিলেন। এখানে যে দেবতাসুর সৃজনের কথা বলা হইল, ইহা কল্পভেদ অনুসারে মীমাংস্য।

বিধেয়। কেননা, ভোগদৃষ্টিই সর্ব্ব অনর্থের মূল। অনর্থদায়িনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিতে হইলে অগ্রে তাহার দোষ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিষয়ের বা তদ্‌ভোগের দোষ অন্বেষণ করিতে হইলে ভোগদৃষ্টিবিনাশীর যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ স্বীকার করিতে হয়। কেনই বা তাহা না করিবে? দুঃখ স্বীকার ব্যতীত সুখ লাভ হয় না[১১]। যদি অসম অর্থাৎ চিদাত্মাই পরব্রহ্ম বটেন এবং শম ও পরম পদ ও বটেন, অর্থাৎ সমূল সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থরূপী বটেন, তথাপি, তুমি প্রথমে তাঁহাকে শঙ্কর অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দদাতা বলিয়া জানিবে[১২]। তুমি অভিমান পরিহার পূর্ব্বক শাশ্বত কৈবল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনার মোক্ষ যোগ্য জন্মাদি লাভের উদ্দেশে সজ্জনসেবায় নিয়ত রত থাকিবে[১৩]। যদি সজ্জনসেবা না কর, তাহা হইলে কি তপস্যা, কি তীর্থ, কি দান, কি শাস্ত্র, কোন কিছুর দ্বারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই[১৪]। যাঁহার সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে ও শাস্ত্রানুসারে আহার বিহারাদি স্বকর্ম্মে রত থাকা যায়, তাঁহাকেই তুমি সজ্জন বলিয়া স্থির করিবে[১৫]। পরে সেই সকল আত্মবিদ্‌গণের সংসর্গে এই দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব ক্রমেই জ্ঞানারূঢ় হইতে থাকিবেক। যখন দৃশ্যের অত্যন্তাভাব অবধারিত হইবে তখন কেবল মাত্র এক পরম বস্তুই অবশিষ্ট থাকিবেন। যখন কেবল এক পরম বস্তু অবধারিত হইবে, অন্য কিছু থাকিবেক না, (অন্য কিছু জ্ঞানারূঢ় হইবেক না,) জীবও তখন সেই পরমে লয় প্রাপ্ত হইবেক। অর্থাৎ তখন আমি জীব, এ বোধ উদিত থাকিবেক না[১৬।১৭]। দৃশ্য মণ্ডল উৎপন্ন হয় নাই, পূর্ব্বেও ছিল না, এবং বর্ত্তমানেও নাই[১৮]। পূর্ব্বে এ বিষয়ে সহস্র সহস্র যুক্তি দর্শিত হইয়াছে এবং বিদ্বান্ মাত্রেই উহা অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি পুনর্ব্বার উক্ত বিষয়ে যুক্তি কথা বুদ্ধি প্রণিহিত হও[১৯]। এই যে ত্রিজগৎ, ইহা ত্রিজগৎ নহে। ইহা শুদ্ধ সংবিৎ এবং সংবিৎই পরম তত্ত্ব। পাওয়া যায় ও পাওয়া যায় এরূপ অতত্ত্বভূত মায়ার বিস্তৃতিরূপ আকাশাদি বাস্তবতঃ নাই[২০]। শক্তির চমৎকারিত্বই জগৎরূপে অনুভূত হইতেছে, সুতরাং ইহা পদার্থান্তর নহে[২১]। এই লোকত্রয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ের অনুভূতি, সমস্তই সেই চিৎসূর্য্যের প্রকিরণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন অংশু-

মালীর সহিত অংশুর পদার্থগত ভেদ নাই, সেইরূপ, চিৎব্রহ্মের সহিত তদংশভূত অনুভূতিরও ভিন্নতা নাই। যখন কল্পনা মাত্রেই মিথ্যা, তখন, শত বা লক্ষ ত্রৈলোক্য অনুভূত হউক না কেন, অনুভূতি-স্বভাব চিদ্ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পস্বভাব বলিতে হইবেই হইবে[২২]। নির্ব্বিকল্প চিৎ-ই মায়িক প্রতিবিম্বনে সবিকল্প হন। অর্থাৎ চিদাভাসই (জীবই) সবিকল্প (নানা প্রভেদ যুক্ত), ব্রহ্মচিৎ সবিকল্প নহে। তাহা একরূপ, একরস, ও একাকার। সবিকল্প চিতের অর্থাৎ চিদাভাসের যে উন্মেষ, তাহাই জগৎ অনুভবের উদয় এবং তাহার যে নিমেষ, তাহাই জগৎ অনুভবের অন্ত (অবসান)। অথবা উক্ত নির্ব্বিকল্পক চিৎ-তত্ত্বের অ-পরমত্ব সাক্ষাৎকারের উন্মেষকে জগৎ অনুভবের উদয় এবং তাহার পর-মত্ব সাক্ষাৎকারবরূপ নিমেষকে জগৎ অনুভবের অন্ত বলিয়া জানিবে[২৩]। যাবৎ অহং আমি, এই কথার ও বোধের প্রকৃত অর্থ (মর্ম্ম) অপরি-জ্ঞাত থাকে, তাবৎ পরমার্থাকাশ মলিন থাকে, কিন্তু উহা পরিজ্ঞাত হইলে উক্ত অহংতত্ত্ব তখন পরমার্থরূপেই প্রকাশ পায়[২৪]। অহংতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তখন অনহংভাবও থাকে না। জল যেমন জলের সহিত এক হইয়া যায়, সেইরূপ, অহংও তখন চিদাকাশের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়[২৫]। অহং প্রভৃতি দৃশ্য জগৎ বাস্তবতঃ নাই। অহং-ভাবকে বিচার পূর্ব্বক দেখিতে গেলে অবশ্যই উহা চিদাকাশে পর্য্য-বসিত হইবে[২৬]। যেমন শিশুদের আপিশাচে পিশাচবোধ বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যে তিরোহিত হয়, সেইরূপ, বিচারনিষ্পন্ন বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যেও অনাত্মবুদ্ধি বিলো-পিত হয়[২৭]। চিজ্জ্যোতিঃ বা চিৎ জ্যোৎস্না যাবৎ অহঙ্কার মেঘে আবৃত থাকে, তাবৎ পরমার্থরূপ কুমুদ্বতী বিকশিত হয় না[২৮]। চিদাত্মা যদি অহঙ্কারবর্জ্জিত হন তাহা হইলে তখন কি আর স্বর্গ, নরক বা মোক্ষাদি কল্পনা থাকে[২৯]? তাহা থাকে না। হৃদয়াকাশে যাবৎ অহঙ্কাররূপ মেঘ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ কেবল তৃষ্ণারূপ কুটজমঞ্জরীই বিকশিত হইতে থাকে[৩০]। অহঙ্কার মেঘ চৈতন্যসূর্য্যকে আক্রম করিয়া অবস্থান করিলে জড়তা ব্যতীত প্রকাশতার উদয় হয় না[৩১]। এই অসত্য অহঙ্কার কেবল দুঃখের নিমিত্তই পরিকল্পিত হইয়াছে[৩২]। বৃথা পরিকল্পিত এই অহঙ্কার কেবল দামাদি অসুরের ন্যায় মোহকেই সৃজন করে, এবং তৎ-সৃষ্ট মোহ যাহা কখন উৎপন্ন হয় নাই, হইবেও না, তাদৃশ অনর্থ শত

ও প্রবলতম তমঃ আবির্ভূত করায়[৩৩।৩৪]। সেই তমঃ "এই আমি" ইত্যাকার বিস্পষ্ট মোহান্তর ও অনর্থশতসংকুল সংসার বিস্তার করিতে থাকে। সংসারে যে কিছু সুখদুঃখাদি, সমস্তই অহঙ্কার হইতে বিজৃম্ভিত[৩৫]। যিনি বিচারপরিমার্জ্জিত মনোরূপ হল দ্বারা অহঙ্কারাঙ্কুর উন্মূলিত করিয়াছেন, সংসৃতিবিনাশন জ্ঞানবৃক্ষ তাঁহারই আত্মক্ষেত্রে সহস্রশাখ ও দুশ্ছেদ্য হইয়া ফল প্রদান করে[৩৬]। দুশ্ছেদ্য জন্মবৃক্ষসমূহের অঙ্কুরস্বরূপ অহংভাব "মম ইদং" ইহা আমার ইত্যাকারে বিস্তীর্ণ ও সহস্রশাখান্বিত হইলেও নিঃসার[৩৭]। জন্মরূপ বৃক্ষের ধনবাসনাদিরূপ ফল শাল্মলী ফলের ন্যায় ঈষৎ পাতনে স্ফোটিত এবং তরঙ্গপংক্তির ন্যায় ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে[৩৮]। আত্মা তুমি, আমি, ইত্যাদিভাব বিবর্জ্জিত; পরন্তু অহন্তাব থাকাতেই তিনি আত্মপ্রাকট্য বর্জ্জিত হইয়া এই সংসারচক্রের বাহক ভাবে প্রতিভাত হইতেছেন[৩৯]। যাবৎ জন্মারণ্যে অহন্তাবরূপ তমোজাল বিস্তৃত থাকিবে তাবৎ চিন্তারূপিণী পিশাচী সবেগে বিচরণ করিবেই করিবে[৪০]। যে নরাধম অহঙ্কারপিশাচ কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে; কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কিছুতেই তাহার সে পিশাচভাব নিবৃত্ত হইবে না[৪১]।

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয়, আপনি তাহা আমার সংসারভয় নিবারণার্থ কীর্ত্তন করুন[৪২]। বশিষ্ঠ বলিলেন, নির্ম্মল দর্পণ সদৃশ চিদাত্মায় চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এই তত্ত্ব সর্ব্বদা অনুসন্ধান (স্মরণ) করিলে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না[৪৩]। এ সমস্তই ইন্দ্রজালতুল্য মিথ্যা, (ভেল্কী) সুতরাং ইহার প্রতি আমার হেয় জ্ঞানের বা অনুরাগের প্রয়োজন নাই, অন্তরে এই ভাবের অনুসন্ধান থাকিলে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় না[৪৪]। যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আত্মায় অহং নাই এবং এই দৃশ্যশ্রীও নাই, সেই ব্যক্তিই অহঙ্কার শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতে পারেন এবং তাহারই অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না[৪৫]। অন্তরে অহং, বাহিরে জগৎ, এই দুই ভাব হেয় ও উপাদেয় ব্যবহারের কারণ। পরন্তু যাহার উক্ত উভয় দৃষ্টিই পরিক্ষীণ হয় তাহারও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না[৪৬]। আমি চিন্মাত্র, আমারই অন্তরে জগৎ, এই ভাব স্থির ও হেয় উপাদেয় ভাব ক্ষীণ হইলে সমতা প্রমুদিত হয় এবং সমতার উদয়ে অহন্তাব পরিক্ষীণ হয়[৪৭]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অহঙ্কার কিরূপ আকারসম্পন্ন? উহা

সশরীর কি অশরীর? উহা কিরূপে পরিত্যাক্ত হয়? এবং পরিত্যাগ করিলেই বা কি হয়? তাহা কীর্ত্তন করুন[৪৮]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! এই জগত্ত্রয়ে অহঙ্কার ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দুই প্রকার উপাদেয় ও এক প্রকার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য। আমি তোমার নিকট সেই তিন প্রকার অহঙ্কারের বর্ণনা করি, শ্রবণ কর।

আমিই এই সমস্ত বিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমা ছাড়া কিছুই নাই, এই উৎকৃষ্ট ভাবকে প্রথমা অহঙ্কৃতি কহে[৪৯।৫০]। এই অহঙ্কার বন্ধকারণ নহে, প্রত্যুত মোক্ষকারণ। ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান থাকে, পুরুষান্তরে নহে। আমি এ সমুদায় হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র, ও পরম সূক্ষ্ম, এই ভাবের যে সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাকে দ্বিতীয়া অহঙ্কৃতি বলা যায়; ইহাও বন্ধনকর নহে, প্রত্যুত মোক্ষকর। ইহাও জীবন্মুক্ত পুরুষে বিদ্যমান[৫১।৫২]। আমি হস্তপদাদিমান্ দেহী, আমি মনুষ্য, ইত্যাদিবিধ নিশ্চয় মিথ্যাভিমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মিথ্যাভিমানাত্মক কল্পিত অহঙ্কার তৃতীয়। ইহা অত্যন্ত তুচ্ছ, এবং লৌকিক পুরুষে (অশাস্ত্রবিৎ-মনুষ্যে) বিরাজ করে। এই অহঙ্কারই পরম শত্রু ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়[৫৩।৫৪]। বিবিধ আধিপ্রদ এই বলবান্ রিপু কর্ত্তৃক জন্তুগণ একবার অভিহত হইলে পুনঃ আর সে অপরিচ্ছিন্নভাবে আবির্ভূত হইতে পারে না[৫৫]। এই দুরহঙ্কৃতির দ্বারা জনগণ নিপীড়িতচিত্ত হইয়া বিবিধ সঙ্কটে নিপতিত হয়[৫৬]।

যে ভাগ্যবান্ জীব পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কার প্রাপ্ত হন, সেই সৌভাগ্যশালী জীব লৌকিক অহঙ্কার ও সর্ব্বপ্রকার রাগাদি দোষ দূরে পরিহার পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি "আমি দেহী নহি" এইরূপ নির্ণয় করিয়া প্রথমতঃ লৌকিক দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করেন; পরে প্রথম ও দ্বিতীয় অহঙ্কৃতিকে অন্তরে আবদ্ধ করতঃ সুখে বিচরণ করেন[৫৭।৫৮]। যাহাকে তৃতীয় ও লৌকিক বলা হইল সেই অহঙ্কার অত্যন্ত দুঃখপ্রদ এবং ঐ তৃতীয় অহঙ্কারের দ্বারাই দাম ব্যাল ও কট প্রভৃতি অসুরেরা সেই সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তৃতীয় অহঙ্কারের উল্লেখও দুঃখপ্রদ[৫৯।৬০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্, লৌকিকী তৃতীয়া অহঙ্কৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! দুঃখদায়ী তৃতীয় অহঙ্কার বর্জ্জন করতঃ

সাধুগণ যে প্রকারে অবস্থান করেন ও পরমাত্মা প্রাপ্ত হন, সে প্রকার অর্থাৎ তাহার প্রণালী আমার নিকট বর্ণন করুন। অপিচ, যাঁহারা তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাব ও চেষ্টা কিরূপ তাহাও অতঃপর বর্ণন করুন[৩১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শেষোক্ত অহঙ্কার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। পুরুষ ঐ দুঃখদায়িনী দুরহঙ্কৃতিকে যতই পরিত্যাগ করিবে ততই পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে[৩২]। যে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত শুভা অহঙ্কৃতি অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই পুরুষই পরম পদ প্রাপ্ত হন[৩৩]। তিনি ক্রমে সর্বাহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া উচ্চতর পদে অধিরোহণ পূর্ব্বক শাশ্বত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। পরমানন্দ বোধ লাভার্থ যত্নসহকারে নাশাত্মিকা লৌকিকী দুরহঙ্কৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য[৩৪।৩৫]। দেহের প্রতি জীবের যে অহং মম ইত্যাদি প্রকারের আস্থা আছে, ঐ আস্থাই পাপময় দুরহঙ্কার। ঐ দুরহঙ্কারের বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ ও পরম পদ লাভের উপায়[৩৬]। বিচার দ্বারা ঐ স্থূল লৌকিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান বা ব্যবহার করিলে অধোগামী হইতে হয় না[৩৭]। যেমন সুতৃপ্ত ব্যক্তি বিষমিশ্রিত সুরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছু হয়, সেইরূপ, যিনি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনি ভোগাস্বাদ গ্রহণের ইচ্ছা করেন না। ভোগাস্বাদ পরিত্যাগ করিলেই শ্রেয়ঃ তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হয়[৩৮]। অহঙ্কার অন্ধকারময় কূপ স্থানীয়, তাহা তাহা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলে তখন আর শ্রেয়োলাভের বাধা হইবে কেন[৩৯]? হে মহাবাহো! উৎকৃষ্ট পুরুষকার প্রয়োগে অহঙ্কার বিনাশ করিতে পারিলেই ভবসাগরের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আমি অন্য কিছু নহি, আমারই সমস্ত ও আমিই সমস্ত" অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই বিশুদ্ধ আত্মসংবিৎ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাত্মগণ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৪০,৪১]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। দামাদি অসুর বিনষ্ট (অদর্শন-গত অর্থাৎ পলায়নপর) ও আসুর সৈন্য সকল শরন্মেঘের ন্যায় বিচ্ছিন্ন, বিভ্রষ্ট ও কালকবলে নিপতিত হইলে শম্বরের সুমেরু সদৃশ নগরে যেরূপ ব্যবহার (ঘটনা) হইয়াছিল তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিব১।২।

হে মহাবাহো! অসুরেন্দ্র শম্বর দেবগণকর্তৃক নির্জ্জিতসৈন্য ও নিরুৎসাহ হইয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুনর্ব্বার যুদ্ধ সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মায়াবলে যে অসুরত্রয় সৃজন করিয়াছিলাম, তাহারা মূঢ়তাপ্রযুক্ত যুদ্ধে বৃথা ভুরহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই তাহাদের দ্বারা বিফল মনোরথ হইয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার আমি অন্য অসুর সৃজন করি। এবার আমি মায়াবলে যাহাদিগকে সৃজন করিব, তাহাদিগকে অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ ও বিবেকযুক্ত করিয়া সৃজন করিব, যাহাতে তাহারা আর অহঙ্কৃতিপ্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং সুরগণকে অনায়াসে জয় করিতে পারিবে৩।৪।

দানবেন্দ্র শম্বর মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া বারিদের বুদ্বুদ সৃজনের ন্যায় মায়াবলে তাদৃশ অসুরত্রয় সৃজন এবং তাহাদিগকে ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই নামত্রয় প্রদান করিলেন৫। ভীম, ভাস ও দৃঢ়, এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত। সেই তিন্ অসুর সর্ব্বজ্ঞ, বেদবেত্তা, বীতরাগ, নিষ্পাপ, আত্মজ্ঞ, সর্ব্বকার্য্যক্ষম ও পবিত্রাশয়। এতাদৃশ অসুরত্রয় সৃষ্ট হইয়া এই লোকত্রয়কে ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিতে লাগিল৮।৯। যেমন প্রাবৃট্ সমাগমে বিদ্যুন্মালিত জলদজাল নভোমণ্ডল আচ্ছাদন করে, সেইরূপ, ঐ তিন্ অসুর শম্বরের অভিপ্রায় ও অনুমতি অনুসারে অসংখ্য সৈন্য সহ ঘনঘটার ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ভুবন আক্রম করিল। তাহারা ঊর্দ্ধে গমন করতঃ নভোমণ্ডল অস্ত্রধারারূপ বারিধারায় সমাচ্ছন্ন করতঃ দেবগণের সহিত বহুবর্ষ যুদ্ধ করিল। পরন্তু

বহুবর্ষ যুদ্ধ করিয়াও বিবেক বশতঃ অহঙ্কার প্রাপ্ত হইল না[১০।১১]। তাহাদিগের মনে কদাচিৎ "আমার বা আমি" ইত্যাকার বাসনা সমুদিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনে "আমি কে, এই বা কে" ইত্যাকার আত্মবিচার সমুদিত হইত তাহাতে উক্ত প্রকার বাসনা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইত[১২]। "ভীমাদি অসুরের আমি কে, এই বা কি, এই শরীর অসৎ" এইরূপ বিচার সমুদিত হওয়াতে দেবগণ তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ভীত করিতে পারিত না[১৩]।

অনন্তর সেই নিরহঙ্কার জরামরণভয়রহিত যথোপস্থিতকর্ম্মকারী ধীর অসুরত্রয় "এই শরীর অসৎ, ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎসত্তাই আমাতে বিদ্যমান, আমাতে অহংকার বা অন্য পদার্থ নাই" অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া উপস্থিত মতে শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। সুতরাং তাহারা বাসনাবিনির্ম্মুক্ত ও অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া অবিনাশী রূপে শত্রুদল বিনাশ করিতে লাগিল এবং কার্য্যে অনাসক্ত থাকিলেও তাহারা "প্রভুর কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ বুদ্ধির অনুগামী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল[১৪,১৭]। তাহাতে বীতরাগ, দ্বেষরহিত সর্ব্বদা সমদর্শী ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই নামত্রয়ে পরিলাঞ্ছিত সেই দানবত্রয় দেবসেনাদিগকে বিনা ক্লেশে হত, আহত, শুষ্ক, ক্ষত, বিক্ষত দগ্ধ ও লয় প্রাপ্ত করিতে লাগিল। তখন উক্ত প্রবল পরাক্রান্ত অসুরত্রয় কর্ত্তৃক দেববাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয়বিচ্যুতা গঙ্গার ন্যায় মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর উক্ত মহাবল অসুরত্রয়ের প্রতাপে ছিন্ন ভিন্ন ও পরাজিত দেবসেনাসকল বাতবিদলিত মেঘমালার শৈলাশ্রয় গ্রহণের ন্যায় ক্ষীরার্ণবশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইল[১৮।২০]। ভর্ত্তা যেমন ভুজঙ্গবেষ্টিতা ভয়বিহ্বলা রমণীকে অভয় প্রদান করে, তাহার ন্যায় সেই ভয়হারী হরি শত্রুপরিলুতা ভয়ার্ত্তা দেববাহিনীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু যাবৎ তিনি সুরারি বধার্থ ক্ষিরোদকুহর হইতে সমরে সমাগত না হইলেন, তাবৎ অসুরভয়ার্ত্তা সুরবাহিনী সেই ক্ষীরোদসমুদ্রগর্ভেই অবস্থান করিতে লাগিল[২১।২২]।

পরে ভগবান্ বিষ্ণু সুরভয়হরণার্থ ক্ষীরোদকুহর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া সমরস্থলে সমাগত হইলেন। তখন অসুরেন্দ্র শম্বরের সহিত তাঁহার ভীষণ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। সেই অকালকল্পান্তসদৃশ দারুণ

যুদ্ধে কুলাচল সকল বিধূনিত হইয়া সমুড্ডীন হইতে লাগিল[২৩]। অসুরগণ ভয়বিহ্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। অসংখ্য অসুর আর্ত্তনাদ সহকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দৈত্যরাজ শম্বর বলবাহনের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণ হস্তে বিনষ্ট হওয়ায় শম্বর বিষ্ণুলোক লাভ করিল[২৫]। ভীম, ভাস, দৃঢ়, ইহারাও সেই বিষম সমরে বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিদেহত্ব প্রাপ্ত হইল। বায়ু যেমন দীপ নির্ব্বাপিত করে, তাহার ন্যায় ভগবান্ হরি ঐ সকল অসুরকে নির্ব্বাপিত করিলেন[২৬]।

সেই বাসনাবিহীন অসুরত্রয় উক্ত প্রকারে দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইলে তাহারা আর সংসারগতির কিছুই অনুগত হয় নাই[২৬]। অতএব, মনঃ যে বাসনাদ্বারা বদ্ধ হয় ও বাসনাশূন্য হইলে মুক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতীত হইতেছে। হে রামচন্দ্র! তুমি অবিলম্বে বিবেকদ্বারা নির্ব্বাসন ভাব গ্রহণ কর[২৭]। বাসনা সম্যক্ বিচারের প্রভাবে বিলীন হইয়া যায় এবং বাসনাবিলয়ে চিত্তও প্রদীপের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হয়[২৮]। সম্যক্ বিচার বা সম্যক্‌দর্শন (সত্যদৃষ্টি) কি? তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। এ সকল মিথ্যা, একমাত্র পরমাত্মাই সত্য, পূর্ণ ও সৎস্বরূপ, এইরূপ দৃঢ় ভাবনার নাম সম্যক্ দর্শন। সম্যক্‌দর্শন (দৃষ্টি বা জ্ঞান) অবিচাল্য হওয়া আবশ্যক[২৯]। এই জগৎ আত্মারই অন্য প্রকার প্রস্ফুরণ। সুতরাং ভাব্য ভাবক ভাবনা ও ভাবনার আধার, সমস্তই আত্মা, আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ ভাব্যভাবনাদি নাই। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম সম্যক্‌দর্শন[৩০]। শব্দ (অর্থসমন্বিত নাম), বাসনা ও চিত্ত এ সকল নাম মাত্র। ঐ নাম মধ্যে অবস্থিত পদার্থভাব সত্য অবলোকনে (ব্রহ্ম বিলোকনে) বিলীন হইয়া গেলে যাহা থাকে তাহাই পরম পদ[৩১]। চিত্ত বাসনা সমাক্রান্ত হইয়াই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং উহা বাসনাবিমুক্ত হইলে বিদেহ মুক্তি জন্মিবে[৩২]। চিত্ত ঘট পটাদি নানা আকারে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া বালকের বেতাল দর্শনের ন্যায় দর্শন করিতেছে। তাহার সেই নানাকারতা প্রশান্ত হইলে তখন আর তাহার উপশম হইতে অবশেষ থাকে না। চিত্তের উপশমই ব্রহ্মাত্মলাভ। শম্বরের চিত্তই দাম ব্যাল কটাকারে ও ভীম, ভাস ও দৃঢ়াকারে পরিণত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে রামচন্দ্র!

আমি তোমাকে ধীমান্ ও প্রিয়শিষ্যবোধে যাহা যাহা বলিলাম, পূর্ব্বে এ সমস্তই পিতা কমলযোনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, তুমি যেন দাম ব্যাল কটের ন্যায় না হও, কিন্তু ভীম ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় হও৩৩।৩৭। *

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* ভীম, ভাস, দৃঢ়, ইহারা বাসনাবর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞানী ছিল বলিয়া দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি বা বিদেহ কৈবল্য লাভ করিয়াছিল। শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাণ ও ইন্দ্রিয়, মনঃ, এ সমস্তই দেহের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়। সেজন্য আর পুনর্জন্ম হয় না। সুতরাং নির্ব্বাণ নামক পরম মোক্ষ হয়।
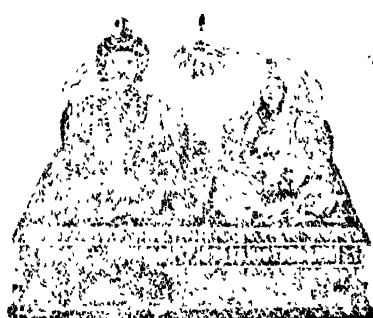
পঞ্চত্রিংশ সর্গ

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা অবিদ্যামন্থর ও বিষয়োন্মুখ মনকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধু, শূর ও যথার্থ বিজয়ী[১]। এই সংসার সর্ব্বোপদ্রবদায়ী ও দুঃখময়; তাহার নিবারণের একমাত্র উপায় মনোজয়[২]। রামচন্দ্র! যাহা জ্ঞানের সার বা সর্ব্বস্ব তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। শ্রবণের পর তাহা অবধারণ করিবে অর্থাৎ মনন দ্বারা দৃঢ় করিবে। ভোগের ইচ্ছাই বন্ধ এবং তাহার পরিত্যাগই মোক্ষ[৩]। তোমার শাস্ত্র সন্দর্ভে কার্য্য বা প্রয়োজন নাই। তুমি ইহাই অভ্যাস করিবে যে, যাহা যাহা স্বাদু অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিতোষজনক তাহা তাহাই বিষের ও বহ্নির ন্যায় পরিত্যাজ্য[৪]। বিষয় ভোগ অতিবিষম, তুমি ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার ও সুস্থির করতঃ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখের অধিকারী হও[৫]। কণ্টকবীজসমাকীর্ণা ভূমি কণ্টক বৃক্ষই প্রসব করে। তদ্রূপ বাসনাক্রান্ত বুদ্ধিও দোষরাশি প্রসব করিয়া থাকে[৬]। যে বুদ্ধি বাসনা জালে জড়িত নহে, যে বুদ্ধি রাগদ্বেষাদি রিপুকুল কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হয় না, সেই সুস্থিরা বুদ্ধিই কালে পরমা শান্তি লাভের কারণ হয়[৭]। তাদৃশী শুভা মতিই শ্রেষ্ঠবীজবতী ভূমির ন্যায় শান্তিফলপ্রদা হয় ও সদ্গুণযুক্ত অঙ্কুর সমুদয় প্রসব করিয়া থাকে[৮]। মনঃ ফলানুসন্ধান হইতে বিচ্যুত ও প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইলে, মিথ্যাজ্ঞানরূপ মেঘ প্রশান্ত হইলে, সৌজন্য তখন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে সূর্য্যকিরণের প্রসর হয়, সেইরূপ, অন্তরে বিবেক প্রসন্ন হইলে তখন বেণুমধ্যে মুক্তাফলের ন্যায় হৃদয়ে ধৈর্য্যের অবস্থিতি হয়। অন্তঃকরণ আত্মসুখলাভে কৃতার্থ হইলে শান্তিরূপ শীতলছায়াপ্রদায়ী বৃক্ষরূপ গুরু প্রভৃতি ও সাধুসঙ্গ সকল মোক্ষ ফলের জনক হয়। সমাধিরূপ সরল বৃক্ষে আনন্দরূপ সুস্বাদু রস প্রস্তুত হইলে মনঃ তখন নিঃসন্দেহ, নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কাম ও নিরুপদ্রব হয়। চাপল্য, শোক, মোহ, ভয় ও পাপ প্রভৃতি অনর্থপরম্পরা প্রশান্ত বা প্রশমিত হইয়া যায়[৯।১০]। আরও

তাহাই দেখিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—চিত্ত যে ভাবনায় আবিষ্ট হইয়া শয়ন করে, নিদ্রাগমে তাহাই দর্শন করে (স্বপ্ন দেখে)[২৮]। মধুর রস পরিভাবিত হইলে অম্লবীজও বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া মধুর ফল প্রসব করে এবং মধুর বীজও কটু রসে পরিভাবিত হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ কটু ফল প্রদান করে[২৯]। চিত্ত উৎকট শুভবাসনার দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্র নামক ব্রাহ্মণের মনোরাজ্য জনিত ইন্দ্রত্ব[৩০]। চিত্ত ক্ষুদ্র বাসনার দ্বারা ক্ষুদ্রই হয়, মহৎ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত—পিশাচদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তির স্বপ্নকালেও পিশাচ দর্শন হয়[৩১]। স্বচ্ছ জলের সরোবরে কালুষ্য স্থিতি লাভ করে না। এবং কালুষ্যপূর্ণ ক্ষুদ্র জলাশয়ে নৈর্ম্মল্যও স্থিতি প্রাপ্ত হয় না[৩২]। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিবে যে, কলুষিত মনে নির্ম্মলত্ব ও নির্ম্মল মনে কালুষ্য অবস্থান করে না[৩৩]। উত্তম পুরুষ দারিদ্র্যভাব ও দেশোপদ্রবাদির দ্বারা আক্রান্ত হইলেও চিত্ত-নৈর্ম্মল্যকারক শান্তি ও সমাধি প্রভৃতি পরিত্যাগ করেন না[৩৪]। তত্ত্ব-জ্ঞান একবার আবির্ভূত হইলে তখন আর সহস্র উপদ্রবেও কালুষ্যের আগমন হইবে না। তাহার কারণ—আত্মার মোক্ষ বন্ধ বা বদ্ধতা, কিছুই নাই। ঐ সমস্ত ইন্দ্রজালদণ্ডের ন্যায় মিথ্যা সমুত্থিত, সুতরাং মায়ামাত্র[৩৫]। একত্ববিবোধী দ্বৈতবিভ্রমকে তুমি গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, মৃগ-তৃষ্ণানদীর ন্যায়, দ্বিচন্দ্রভ্রমের ন্যায় মিথ্যা প্রতিভাত বলিয়া জানিবে[৩৬]। সংসার প্রস্ফুরিত হইতেছে সত্য, পরন্তু ইহা অত্যন্ত নিঃসার ও অস-ত্যময়[৩৭]। একমাত্র ব্রাহ্মী সত্তাই অজ্ঞানের কুহকে এতদাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছে। অজ্ঞানের কুহকেই "আমি অনন্ত নহি, আমি অতিক্ষুদ্র, আমি দুঃখী," এইরূপ দুর্নিশ্চয় উদিত হইয়াছে; পরন্তু ঐ দুর্নিশ্চয় "আমি অনন্ত, আমি সর্ব্বব্যাপী, আমি সর্ব্বময় ও সর্ব্বশক্তি," এইরূপ সুনিশ্চয় দ্বারা বিলীন হইয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ স্বচ্ছ পরমাত্মার যে "অহং" ইত্যাকার কল্পিত ভাবনা; সেই ভাবনাই বন্ধন। যাহাই হউক, বন্ধ, মোক্ষ, দ্বিত্ব ও একত্ব, সমস্তই এক ব্রাহ্মী সত্তা। অধিক কি, এ সমস্তই ব্রাহ্মী সত্তা, এইরূপ দৃষ্টি (জ্ঞান) পরমার্থ[৩৮।৪০]। চিত্তনৈর্ম্মল্যের অতি-শয়ে, যাহার বিনাশ নিকটবর্ত্তী এবং যে অমনস্তাপন্ন, তাদৃশ মনঃ এতৎ শরীরেই ব্রহ্ম দর্শনে সমর্থ হয়[৪১]। মনঃ যদি শুভসংস্কাররূপ নির্ম্মল জলে ধৌত হয়, তাহা হইলে সেই মনঃই ব্রহ্মদৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারক

হইবে। সুশুভ্র বস্ত্রই রঞ্জিত হয়, মলিন বস্ত্র রঞ্জিত হয় না[৪২]। হে অনঘ! সমস্তই আমার আত্মা, অথবা আমার আত্মাই সমস্ত, এইরূপ ভাবনার দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান পরিহার কর, করিয়া বন্ধমোক্ষ হইতে উত্তীর্ণ হও[৪৩]। মনঃ যদি প্রথমে শরীরের দ্বারা অর্থাৎ অধিকারিত্ব সম্পাদন দ্বারা, তৎপরে শাস্ত্র ও সৎসঙ্গাদির দ্বারা, তৎপরে বৈরাগ্য বুদ্ধির দ্বারা স্ফটিক মণির ন্যায় নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ (মার্জ্জিত) হয়, তাহা হইলে তখন তাহাতে এই জগতের রহস্য প্রতিফলিত হইবে। তৎপূর্ব্বে হইবে না[৪৪]। মনঃ যে বহিঃ পদার্থে একতান হইতেছে, আত্মায় একতান হইতেছে না, তাহাকেই তুমি ক্ষণবিনাশিনী অসত্য-জ্ঞানদৃষ্টি বলিয়া জানিবে[৪৫]। মনঃ যখন কি বাহিরের কি অন্তরের দৃশ্য দর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পদে লীন হইবে, তখন তুমি জানিবে, তৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছ[৪৬]। তুমি অসন্ময়ী দৃশ্য দৃষ্টিকে মনের অন্তরতম রূপ বলিয়া জানিবে। বস্তুতঃও বাহ্যপদার্থ সকল মনের রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৭]। যাহা অগ্রে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎকাল প্রতীয়মান হয় মাত্র, নিশ্চয়ই তাহা অসৎ। যাহারা মনের এই রহস্য বিদিত নহে, তাহারা অনন্ত দুঃখ অর্জ্জন করে[৪৮]। ইহা জগৎ নহে, ইহা কেবল আত্মা, এই ভাব উদিত না থাকাতেই এই অসন্ময়ী দৃশ্যশ্রী দুঃখপ্রদা হইতেছে। কিন্তু যদি ইহাকে পরমার্থরূপে দর্শন করা যায় তাহা হইলে তখন এই দৃশ্যশ্রী ভোগ (সুখানুভব) ও মোক্ষ উভয় ফল প্রদান করিবে[৪৯]। যেমন জলে তরঙ্গের কল্পনা, তাহার ন্যায় আত্মায় এই দৃশ্যজালের কল্পনা। পরন্তু যে জানে, জল পৃথক্ ও তরঙ্গ পৃথক্, সে, সে বিষয়ে (তরঙ্গতত্ত্বে বা জলতত্ত্বে) অজ্ঞ। কিন্তু যে জানে, জলই তরঙ্গ, সে জলতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ[৫০]। যাহা হেয় অথবা উপাদেয় রূপে উপস্থিত হয় তাহা অসৎ ও দুঃখপ্রদ। যাহা হেয় ও উপাদেয় পরিশূন্য, তাহা অনন্ত বা অসীম পরমার্থ[৫১]। মনঃও দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত সুতরাং তাহাও সঙ্কল্পকল্পিত, সেজন্য মনঃও অসন্ময়। হে রাঘব! বল দেখি, যাহা অসন্ময় তাহার বিনাশে শোক কিং[৫২]? তুমি স্নেহরহিত বন্ধুর ন্যায় রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত বুদ্ধি অবলম্বনে পৃথিব্যাদি ভূতের ও আত্মার তত্ত্ব অবলোকন কর[৫৩]। যেমন নিঃস্নেহ বন্ধু স্বীয় বন্ধুর সুখদুঃখে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ, যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনিও ভৌতিক

অজ্ঞের চিন্তায় সৃষ্টি চিত্তের অতিরিক্ত বটে; পরন্তু তাহাও তাহাদের কল্পনা। সুতরাং চিদতিরিক্ত মাত্রই কল্পনা। ফলিতার্থ—চিৎস্বরূপকেই চিদ্ব্যতিরিক্ত ও অন্য প্রকার পদার্থ বলিয়া মনে করে[১১]। এই চিৎ অজ্ঞগণের নিকট অসদ্ভাবাপন্ন হইয়া ঘোর সংসার বিস্তার করে এবং যে জানে তাহার নিকট ব্রহ্মাত্মিকা হইয়া প্রকাশিত ও বিরাজিত হয়[১২]। এই চিদ্বস্তুর অন্য নাম অনুভূতি। সুতরাং তাহারই প্রভাবে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রকাশমান হইতেছে। (অনুভূতির দ্বারাই উঁহাদের অস্তিতা সিদ্ধি হইতেছে সুতরাং উঁহারা অনুভূতি ছাড়া নহে) এবং উক্ত চিদ্বস্তুই জীবের জন্মাদির প্রতি প্রধানের কারণ[১৩]। উদয়, অস্ত, উত্থান, স্থিতি, গতি, এ সকল তাঁহাতে নাই। তিনি এই জগতে আছেনও বটে, এবং নাইও বটে। তিনি আপনিই আপনাতে অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাঘব! তিনিই এই প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত ও জগৎ নামে প্রকাশমান ও আভাসিত হইতেছেন[১৪,১৫]। যেরূপ তেজের দ্বারা তেজ ও সলিল দ্বারা সলিল স্ফূর্ত্তি পায়, সেইরূপ, উক্ত চিৎ সৃষ্টি-বিভ্রম দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছেন। (অর্থাৎ জীবের গোচরীভূত হইতেছেন)[১৬]। অবস্থাভেদে ইহার দ্বৈরূপ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমার্থ দশায় প্রকাশ ও শুদ্ধ চিৎ এবং ব্যবহার দশায় আমি আমাকে জানি না, ইত্যাকারে অপ্রকাশ, অশুদ্ধ (মলিন) ও অসর্ব্বগ[১৭]। তিনি যখন অবিদ্যার উদয়ে আপনার পরমত্ব হইতে বিচ্যুত হন তখন তাহাতে "অহমস্মি" এইরূপ ভাবের আবেশ হয় ও তৎক্রমে ক্রমশঃ অজ্ঞপদ প্রাপ্তি হয়[১৮]। অহম্ভাব আবিষ্ট হওয়ার পর সংসার। তাহাতে বৃথা নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনিই ইহা আছে, তাহা নাই, ইহা গ্রাহ্য, ইহা অগ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, ইহা অত্যাজ্য, ইহা ইষ্ট এবং ইহা অনিষ্ট, এইরূপ এইরূপ ভেদ ভাব ও তদনুরূপ চেষ্টা প্রকটিত করিতে থাকেন। তিনি বস্তুতঃ কিছু না করিলেও দেহস্পন্দ দৃষ্টে বোধ হয়, যেন তিনিই বিহিত নিষিদ্ধ শত শত কার্য্য করিতেছেন। এবং কখন উন্নত এবং কখন বা অধোগত হইতেছেন[১৯,২০]। আকাশের অবকাশ, বায়ুর স্পন্দন, জলের রসভাব, পৃথিবীর কাঠিন্য, তেজের রূপ, বিশ্বের স্থিতি, কালের অস্তিতা, এ সমস্তই চিৎস্বভাবের অনতিরিক্ত[২১,২২]। তিনি পুষ্পকেশরসঞ্চিত গন্ধ, মৃৎকোটরস্থিত রস ও ভূতলে স্থাণুরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সেই পদা-

র্থই পুষ্পপল্লব রাশির বসন্ত, তাপশক্তির নিদাঘ, জলধরাশির প্রাবৃট্, ধান্যাদি শস্যের শরৎ, হিমাচ্ছাদনের হেমন্ত ও শীতলানিলের শিশির। অজ্ঞ লোক যাহাকে সম্বৎসর ও যুগাদি কাল নামে উল্লেখ করে তাহাও চিৎস্বভাবের অন্তর্ভূত। একমাত্র চিৎই তরঙ্গিণীর তরঙ্গলীলার ন্যায় সৃষ্টি লীলা বিস্তার করিতেছেন[২৭।২৯]। তাঁহারই দ্বারা নিয়তি প্রলয়কালপর্য্যন্ত স্থির ভাবে ধরা (বিশ্ব) ধারণ করিয়া থাকে, তাঁহারই দ্বারা ভূতগণের জন্ম মরণ প্রবাহ পুনঃ পুনঃ জাত ও বিলীন হইতেছে এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডকোটির অন্তর্গত কৃতান্তের বশবর্ত্তী মূঢ় প্রাণিগণ উন্মত্তের ন্যায় ইহ জগতে কখন আগত, কখন বা গত হইতেছে; কখন বা ইহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, কখন ধর্ম্মরূপ স্বার্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এবং কখন বা জন্মনাশধারা ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে[৩০।৩৩]।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

—)।*।(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে বর্ণিত প্রকারের স্থিরতরাকার সংসার ধারা পুনঃ পুনঃ আগত ও গত হইতেছে। ইহা সেই ব্রহ্মস্বভাবজাত, তদ্দ্বারা বিনষ্ট ও তাহাতেই বিলীন হইতেছে[১,২]। যেমন অগাধজল জলাশয়ের অভ্যন্তরে জলশূন্য স্থান না থাকায় স্পন্দস্বভাব জল অস্পন্দাকার (স্থিরভাব) ধারণ করে, তেমনি, এই অসত্য বিশ্বও কদাচিৎ সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হয়[৩]। নিদাঘ কালে (নিদাঘ-সময়ে) নিরাকার আকাশে নদী দর্শন হইয়া থাকে। (সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি)। তাহার ন্যায় সৃষ্টিপরম্পরা ব্রহ্মাকাশেই পরিদৃষ্ট হইতেছে[৪]। আপনি এক প্রকার পরন্তু মত্ত ব্যক্তি মত্ততা বশতঃ আপনাকে অন্য প্রকার দর্শন করে। তাহার ন্যায় চিদ্বস্তুও চিত্তাবেশ বশতঃ অন্যাকারে পরিদৃষ্ট হয়[৫]। রাঘব! এ সকল সৎ, অসৎ, ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মত্ব নহে, চেতন, অচেতন বা চৈতনিক বা অচৈতনিক, কিছুই বলিবার যোগ্য নহে[৬]। যাহার বলে তুমি কাল, দেশ, ক্রিয়া ও দ্রব্য জানিতেছ তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে। এই আত্মাই পরব্রহ্ম এবং সেই পদার্থই সর্ব্বত্র অবস্থিত। তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি অজ্ঞান, তিনি সর্ব্বগামী, তাঁহার দ্বিতীয় বা অংশ নাই। একত্ব বা নানাত্ব, সমস্তই তাঁহাতে ও তৎকর্তৃক কল্পিত[৭,৮]। ভাব, অভাব, ভাল, মন্দ, এ সকল মায়িক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৯]। যে হেতু সৃষ্টি আত্মারই রূপভেদ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টি আত্মাতিরিক্ত নহে। এ বিষয়ে আরও বিবেচ্য এই যে, যদি আত্মাতিরিক্ত বস্তু থাকা প্রমাণিত হইত তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছাদি থাকাও সপ্রমাণ হইত। যখন তাহা নাই অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণ বহির্ভূত। অপিচ, তাঁহার ইচ্ছাদি সদ্ভাবও প্রমাণ বহির্ভূত। অতএব, হে রাঘব! যখন কিছুমাত্র আত্মা হইতে ভিন্ন নহে তখন সেই আত্মা কি ইচ্ছা করিয়া কি কার্য্য করিবেন? এবং কি-ই বা লাভ করিবেন[১০]? ইহা বাঞ্ছনীয়, তাহা অবাঞ্ছনীয়, এ-সকল ভাব তাঁহাকে স্পর্শও করে না,

ইহা অবধারণ করিবে। যে হেতু তিনি নিরিচ্ছ, সেই হেতু তিনি কিছুই করেন না। কর্ত্তা, করণ, কর্ম্ম, এ সকল প্রভেদ মিথ্যা; একাত্মতাই সত্য। ইহা আধার, তাহা আধেয়, এ সকল কল্পনাও তাঁহাতে অস্পৃষ্ট। অধিক কি বলিব, দ্বিতীয়কল্পনাও তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে। ইচ্ছা না থাকায় তিনি কোন অভিপ্রেত কার্য্য করেন না[১১]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট যে প্রকার আত্মস্থিতি বর্ণন করিলাম, তুমি ঐ প্রকার অবস্থিতিকে ব্রহ্মস্থিতি বলিয়া জানিবে। এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া কার্য্য সমুদায়ের কর্ত্তা হইবে[১২]। আমি করিতেছি, এরূপ অভিমান ধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করিলে তুমি দেহের উপচয় অপচয় ব্যতীত অন্য কি সুফল প্রাপ্ত হইবে? তাই বলিতেছি, হে রাঘব। তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যক্ত হউক, অকর্ত্তৃত্ব ভাবে আস্থা হউক, শ্রুতি ও গুরুবাক্য দ্বারা আত্মপ্রবোধ লাভ করতঃ তুমি স্বস্থ, স্বচ্ছ নিরহঙ্কার ও নির্ব্বাত সমুদ্রের ন্যায় নিষ্প্রকম্প হও[১৩]।

যাহাতে পূর্ণতা লাভ হইবে অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ হইবে তাহা বহু যত্নে ও সুদূরে ভ্রমণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা স্থির করিয়া তুমি বাহ্য পদার্থের অন্বেষণে ক্ষান্ত হও। তুমি চিদাত্মা, সুতরাং তুমিই পরম[১৪]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, তত্ত্বজ্ঞদিগের যে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ লোকে দেখে বটে, তাঁহারা আহরণ বিহরণাদি কার্য্য করিতেছেন, তথা তপস্যাদিও করিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের সে কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব নহে। অজ্ঞদিগের কর্তৃত্বই কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব কি? বা কর্তৃত্ব কাহাকে বলে? তাহা বিবেচনা কর। অন্তরস্থ মনোবৃত্তির যে নিশ্চয় অথবা কার্য্যের পূর্ব্বে ও পরে ইহা হেয় বা উপাদেয় ইত্যাকার মনোবৃত্তি, তাহাই কর্তৃত্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ। তাদৃশ কর্তৃত্ব হইতে বাসনা (সঙ্কল্পবিশেষ) জন্মে এবং বাসনানুরূপ ফলও উপস্থিত হয়। সে ফল বা তাহা পুরুষগণ কার্য্যের পরে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব, কর্তৃত্ব হইতেই ফল ভোক্তৃত্বের উদয়, ইহাই সংশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের উক্তি আছে যে, "পুরুষ করুন বা না করুন, বাসনা জন্মিলে তদনুরূপ ফল স্বর্গে অথবা নরকে অনুভব করিবেন, তাহার অন্যথা হইবে না।" অতএব অজ্ঞাততত্ত্ব জনগণেরই কর্তৃত্ব, প্রাজ্ঞগণের বাসনাহীনতা প্রযুক্ত অকর্তৃত্ব। জ্ঞাততত্ত্বগণ গলিতবাসন, সেজন্য কার্য্য করিলেও তাহার ফল তাঁহাদের ভোগ হয় না। তাঁহারা কেবলমাত্র দেহস্পন্দন করেন, মন তাঁহাদের অনাসক্ত থাকে। যদিও অজ্ঞাতসারে কোনরূপ কার্য্যফল উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা সে ফলকে "এ সমস্তই পরমাত্মা" এইরূপ অনুভব করেন। ভোগাসক্ত অজ্ঞগণ বাহিরে কোন কিছু না করিলেও ফলপ্রসবকারী কর্ম্ম তাহাদের অন্তরে অনুষ্ঠিত হয়। কেননা মনঃকর্তৃক যাহা কৃত হয় তাহাই প্রকৃত কৃত এবং মনঃকর্তৃক যাহা কৃত না হয়, তাহা বস্তুতঃ অকৃত। অতএব হে রাঘব! মনঃই কর্ত্তা, দেহ কর্ত্তা নহে। চিত্ত হইতেই সংসার সমাগত সুতরাং তাহা চিত্তময় ও চিত্তে অবস্থিত। এ তত্ত্ব বিচার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রূপ রসাদি বিষয় ও তদাকারা মনোবৃত্তি উপশান্ত বা বিনষ্ট হইলে তখন সে সমুদায়ের বাসনা বা সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। জীব সেই

সংস্কার বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে[৮]। কিন্তু আত্মজ্ঞগণের বর্ণিত প্রকারের বাসনা জলদাগমে মৃগতৃষ্ণা সলিলের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহারা তুর্য্য পদে অবস্থিতি করেন। সেই তুর্য্য পদ না আনন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না স্থির, না অস্থির। অর্থাৎ বর্ণনাতীত বা বাক্‌পথের অতীত[১০]। জ্ঞানীদিগের মন স্পন্দময় বাসনায় নিমগ্ন হয় না। তাঁহারা দেখেন, অজ্ঞদিগেরই মন নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-স্থান। এ সম্বন্ধে অপর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন এক মনুষ্য গর্ত্তে নিপতিত হয় নাই, শয্যায় শয়ান কিম্বা আসনে উপবিষ্ট আছে, অথচ সে গর্ত্তপতন সংস্কারের প্রাবল্যে গর্ত্তপতন দুঃখ অনুভব করে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, গর্ত্তে নিপতিত হইয়াছে অথচ সে তজ্জনিত দুঃখ অনুভব না করিয়া শয্যাশয়ন সুখ অনুভব করিতেছে। এতদ্দৃষ্টান্তে অপর এক সিদ্ধান্ত লাভ হয় যে, পুরুষ চিত্তময়। চিত্ত যখন যেরূপ তখন সে সেইরূপ[১১][১২]। অতএব, তত্ত্বজ্ঞ কোন কিছু করুন বা না করুন, তাহাদের চিত্ত সদা অসংসক্ত থাকে। কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন, আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য কিছু নাই। থাকিলে অবশ্য সংসক্তি সম্ভাবনা থাকিত বা করিতে পারিত। না থাকায় তাহা পারা যায় না। জগৎ বা জগদন্তর্গত যে কিছু—সমস্তই আভাস[১৩]। সেইজন্য, তাদৃশ জ্ঞাতজ্ঞেয় পুরুষের আত্মা সর্ব্ববিদিত ও সুখ দুঃখের অতীত। আত্মা সুখ দুঃখের অতীত, এই জ্ঞান যাহাদের দৃঢ় নিশ্চয়ে নিবদ্ধ থাকে তাহাদের ইহা আধার তাহা আধেয় এ সকল দৃষ্টি থাকে না। যাহাদের জ্ঞান ঐরূপ অবধারণে নিমগ্ন থাকে, তাহারা প্রথম সোপানে এইরূপ জানে যে, আমি কর্ত্তা ভোক্তা সর্ব্বপদার্থব্যতিরিক্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সূক্ষ্মতম জীব। অবশেষে স্থির হয় যে, যে কিছু—সমস্তই আমি, আমা ছাড়া কিছু নাই। আমিই সর্ব্বপ্রকাশক ও সর্ব্বব্যাপী। এইরূপ সর্ব্বব্যাপিতা-নিশ্চয় সুদৃঢ় হইলে তৎপরিপাক দশায় স্থির হয়—আমি সুখ দুঃখে অস্পৃষ্ট। তখন তাহাদের লোকব্যবহার, লীলাব্যবহারের সদৃশ হইয়া দাঁড়ায়[১৩]। সঙ্কট অবস্থা আসুক আর হর্ষাবস্থা আসুক, তত্ত্বজ্ঞ মন সর্ব্বদা জ্যোৎস্নার ন্যায় শোভমান থাকে। চিত্ত মৃতকল্প থাকায় তাঁহারা করিলেও কর্ত্তা হন না, নির্লিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা অনপরিত্যাগনিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্মের ফলাফলও অনুভব করেন না[১৪]।

হে রামচন্দ্র! মন অভিহিত প্রকারে সর্ব্বকর্ম্মের, সর্ব্বচেষ্টিতের, সর্ব্বভাবের, সর্ব্বলোকের ও সর্ব্বগতির বীজ। মনঃ পরিহৃত হইলে সমস্ত কর্ম্ম পরিহৃত, সর্ব্ব দুঃখ ক্ষীণ ও সর্ব্বকর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয়। মনঃ যেরূপ কর্ম্ম করুক না কেন, প্রাজ্ঞ তাহাতে আসক্ত বা বিবশীকৃত অথবা তাহার অনুরঞ্জনা প্রাপ্ত হন না। কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন—আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই[১৩]। মনঃ বালকের ন্যায় নগর নির্ম্মাণাদি করুক, জ্ঞানী দেখিবেন, তিনি কিছুই করেন না। তত্ত্বজ্ঞগণের সম্বন্ধে মোক্ষকথাও নাই। সমস্তই অজ্ঞগণের জন্য। এ বিষয়ের উপসংহার এই যে, আত্মা অকর্ত্তা ও অভোক্তা। কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত মাত্র[১৭।১৮]। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবিত জীবের সম্বন্ধে অনিবার্য্য বটে; পরন্তু সে সমস্তই জ্ঞানমালিন্যমূলক। জ্ঞানের মালিন্য বিচারে উন্মার্জ্জিত হইলে তখন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃতাদির নাস্তিত্বই অবধারিত হয়। যাহাদের দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে, তাহাদেরই দেহাভিমানাদি আবির্ভূত হয়, অন্যের নহে[১৯]। যাহাদের চিত্ত অনাসক্তস্বভাব, তাহাদের বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই। অর্থাৎ তাহারা নিত্যমুক্ত। বন্ধনব্যবহার ও মোক্ষের উপদেশ সমস্তই বিষয়াসক্তচিত্ত জীবদিগের জন্য। তাঁহাদের বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই বিদ্যমান[২০]। জ্ঞানিগণের নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই উদ্ভাসিত হয়। একত্ব, দ্বিত্ব, এ সকল তাহাদের ব্যবহার মাত্রে প্রতিভাসিত[২১]। প্রকৃত পক্ষে বন্ধও নাই, মোক্ষও নাই, অবন্ধ ও অমোক্ষ, তএর কিছুই নাই। এই যে সংসারদুঃখ, ইহা অপ্রবোধমূলক, প্রবোধ জন্মিলে ইহা বিলীন হইয়া যায়। মোক্ষ ও বন্ধন বৃথা এবং ঐ দুই কথাও বুদ্ধিকল্পিত। হে রামচন্দ্র! তুমি ঐরূপ মতি (আমি বদ্ধ আছি, কিসে মুক্ত হইব? এতদ্রূপ বুদ্ধি) পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহঙ্কাররহিত, আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া ব্যবহার কর[২২।২৩]। *

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* এই সর্গে মনের স্বরূপ উপদেশার্থ কোথাও আত্মবিস্মৃতির নাম মন, এইরূপ বলা হইয়াছে। মনঃই জগদাকার হইতেছে, এইরূপ বলা হইয়াছে। কোথাও চিত্ত বিষয়াকার হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। এ সকল দৃষ্টে এমন বুঝিতে হইবে না যে, মন ও চিত্ত পদার্থতঃ পৃথক্। মন ও চিত্ত একই বস্তু; তাহার বৃত্তি উদয়ের পার্থক্য দৃষ্টে ঐরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

—()※()—

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে এই বিচিত্র-রূপা সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? কিছু নাই অথচ সৃষ্টি, এ কথা ভিত্তি নাই অথচ চিত্র প্রস্তুত হইল? এই কথার অনুরূপ। অতএব, হে মহাত্মন্! আপনি বলুন, সৃষ্টির প্রকার কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজপুত্র! শ্রবণ কর। এই সমস্ত দৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্বের অনতিরিক্ত। তিনি সর্ব্বশক্তি। যে হেতু সর্ব্বশক্তি সেই হেতু সমুদায় শক্তি ব্রহ্মেই লক্ষিত হয়। স্বত্ব, মমত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব, সাদিত্ব, অনাদিত্ব, সমস্তই সমুদ্র হইতে সলিল রাশির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তিনি স্বীয় উল্লাসে নানা আকারে প্রকাশিত।[৯] চিদ্ঘন (ব্রহ্ম) হইতে চিত্ত (চিত্তোপাধিক জীব)। আবার চিত্ত হইতে কর্ম্মময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তি বৰ্দ্ধিত, দৃষ্ট, ধৃত, জাত এবং বিক্ষিপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্ম হইতে সমুদায় জীবের ও সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিলয় হইতেছে।[৯]।

রঘুকুলপাবন রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার এ বাক্যও অতিগহন, অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য। আমি ইহার অর্থ অবগত হইতে পারিলাম না। কোথায় মনঃপ্রভৃতির অতীত ব্রহ্মতত্ত্ব? আর কোথায় ক্ষণভঙ্গুর পদার্থশ্রী? যাহাই হউক, সৃষ্টি যদি ব্রহ্ম হইতেই আপাতিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ব্রহ্মাকার হওয়া উচিত ছিল। কেননা, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু তদ্রূপাকারেই হইয়া থাকে। যেমন দীপ হইতে দীপ, পুরুষ হইতে পুরুষ ও শস্য হইতে শস্য জন্ম লাভ করিয়া থাকে।[১১] যে নির্ব্বিকার হইতে যাহার আগমন (উৎপত্তি) হয়, তাহার তদ্রূপ নির্ব্বিকার হওয়াই উচিত।[১২] অতএব, আপনার সিদ্ধান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও পরমেশ্বর চিদাত্মায় কলঙ্কারোপ করিতেছে। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রাঘবের ঐরূপ আপত্তিকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন এখনও এ সমস্ত ব্রহ্ম। এ তাঁহার কলঙ্ক অর্থাৎ বিকার নহে। সুব্র

জলতরঙ্গই জন্মে, ধূলি জন্মে না[১৩।১৪]। যেরূপ অগ্নিতে উষ্ণতা ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ, আত্মাতে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ স্থিতি লাভ করে না[১৫]। রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত, কিন্তু তদুৎপন্ন এই বিশ্ব সদ্বন্দ্ব ও অনন্তদুঃখপরিপূর্ণ। তাই আমি আপনার তাদৃশী অস্পষ্টার্থ বাক্যের অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না[১৬]।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহাত্মা রাম ঐরূপ কহিলে মুনি-শার্দ্দূল বশিষ্ঠ রাঘবকে উপদেশ প্রদানার্থ অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত মনে মনে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৭]। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া চিন্তা করিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, রামচন্দ্রের বুদ্ধি এখনও যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল হয় নাই। কেবল বাহ্য বস্তু পরিত্যাগে অল্প পরিমাণে নির্ম্মল হইয়াছে[১৮]। যাহার মন সম্যক্ নির্ম্মল, যে জ্ঞেয়তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার চিত্ত জগতের জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিদেকরসভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মোক্ষকথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ। সেই ব্যক্তিই বিবেকী ও বুদ্ধিমান্[১৯]। তাদৃশ ধীমান্‌গণের বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে কোনও প্রকার বিরোধ প্রতিভাত হয় না। সুতরাং এই রাঘব যাবৎ না সম্যক্ উপদেশ লাভ করিবেন তাবৎ ইহার বিশ্রান্তি লাভ হইবে না। অর্থাৎ সংশয়াদি নিরাস হইবে না[২০]। যে ব্যক্তি অর্দ্ধ বুৎপন্ন, "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এ উপদেশ তাহার প্রতি কার্য্যকারী নহে। কেননা, তাহারা এখনও দৃশ্য দর্শন করিতেছে, তৎ কারণে তাহাদের মতি তত্ত্ববোধভ্রষ্ট হয়[২১]। যাহাদের দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত, যাহাদের ভোগেচ্ছা বিনিবৃত্ত, "এ সকল ব্রহ্ম" এ সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগেরই পক্ষে উপযুক্ত[২২]। শিষ্য প্রবোধনের রীতি এই যে, গুরু প্রথমতঃ গুণসম্পন্ন শিষ্যকে শমদমাদি সদ্‌গুণ শিক্ষা দিয়া বিশোধিত করিবেন, পশ্চাৎ তাহাদিগকে "এ সকল ব্রহ্ম" এই মহা বাক্য উপদেশ করিবেন[২৩]। কিন্তু যাহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ, তাহাদিগকে "ব্রহ্মই সমস্ত" এ উপদেশ করিলে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে মহা-নরকেই নিয়োজিত করা হয়[২৪]। যাঁহাদের ভোগেচ্ছা ক্ষীণ, বুদ্ধি বিক-সিত, প্রার্থনা তিরোহিত, সেই সকল মহাত্মা দিগকে "ব্রহ্ম নির্ম্মল, অবিদ্যাকলঙ্ক মিথ্যা বা ভ্রান্তি বিশেষ," এ উপদেশ প্রদান করা

কর্ত্তব্য[২৫]। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমোহ বশতঃ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ করে, সে শিষ্যপ্রতারক বৈ গুরু নহে। সুতরাং সে আকল্প নরক ভোগ করিতে বাধ্য[২৬]।

মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মে কলঙ্ক ঘটনা হয় কি না, তাহা আমি উপযুক্ত সময়ে বলিব এবং তখন তাহা সহজে বা স্বয়ং অবগত হইতে পারিবে[২৭।২৮]। তুমি এখন এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিস্থ কর যে, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত এবং তিনিই আমার অহং-বুদ্ধির অবগাহ্য। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা মায়ার দ্বারা বিচিত্র কার্য্য করে, সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎস্বরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ, মায়াতীত আত্মাও স্বাশ্রিত মায়ার দ্বারা মায়াময়ী দৃশ্যশ্রী প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি নিজেই এই সকলের আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা ঘটকে পট ও পটকে ঘট করে, প্রস্তরে লতা ও লতায় প্রস্তর জন্মায়, কল্পবৃক্ষে রত্নস্তবক ও আকাশে বন নগরাদি দেখায়, গন্ধর্ব্ব নগরীর রাজগৃহে বরাঙ্গনা সঞ্চার ও ভূতলে আকাশ ও আকাশে ভূতল প্রভৃতি বিবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় তিনিও চিদাকাশে স্বমায়ায় এই সকল পদার্থ রচনা করিয়া থাকেন[২৯।৩০]। বস্তুতঃই একাদ্বয় অব্যক্তরূপ ঈশ্বরই বিচিত্ররূপ ধারণ করতঃ প্রতীয়মান হইতেছেন[৩১]। যখন তিনি সর্ব্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, তখন যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেই একই বস্তু বিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ কি[৩২]। সে বিষয়ে হর্ষ, অমর্ষ ও বিস্ময় প্রভৃতির অবসর কোথায়? ধৃতিমান্ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি করতঃ বিস্ময়, হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি বিকার পরিত্যাগ করেন[৩৩।৩৭]। যাবৎ না সমদৃষ্টি স্থিতি লাভ করে তাবৎ জগতের বিচিত্র রচনা দৃষ্ট হইতে থাকে। ব্রহ্ম মনুষ্যাদির ন্যায় যত্নপূর্ব্বক বিশ্ব রচনা করেন না, উৎপন্নের বিনাশও করেন না। সাগর যেমন যত্নপূর্ব্বক স্ববক্ষে তরঙ্গ উৎপাদন করে না, উৎপন্ন তরঙ্গের বিনাশও করে না, তাহার ন্যায় তিনিও উৎপাদন ও বিনাশ করেন না[৩৮।৩৯]। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, মৃত্তিকায় ঘট, তন্তুতে বস্ত্র, বীজে বৃক্ষ অবস্থান করে তাহার ন্যায় পরমাত্মায় সমুদায় সৃষ্টিশক্তি বিরাজ করে। সে সকল শক্তির যখন যে শক্তি প্রাকট্য প্রাপ্ত হয় তখন তাহার উৎপত্তি হইল, এইরূপ ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। বস্তুতঃ কেহ কর্ত্তা বা ভোক্তা

নাই এবং কোন কিছু বিনষ্টও হয় না। সর্বসাক্ষী, নিরাময়, এক ও চিন্ময় আত্মতত্ত্ব বিদ্যমান থাকাতেই এ সকল সম্পন্ন হয়। যেমন দীপ থাকিলেই আলোক, সূর্য্য থাকিলেই দিবস, পুষ্প থাকিলেই গন্ধ, বিনা-প্রযত্নে জন্মে, তাহার ন্যায় কেবল আত্মতত্ত্বের বিদ্যমানতায় এই জগৎ জন্ম গ্রহণ করিতেছে৪০।৪৩। যেমন সমীরণের স্পন্দনই দৃশ্য, তেমনি, ব্রহ্মেরই আভাস জগৎ। ইহা না সৎ না অসৎ। যে বস্তু আত্মার বা আত্মভূত (স্বরূপান্তর্গত) নহে, তাহা কদাচ জাত বা বিনষ্ট হয় না৪৪।৪৬। সুতরাং বোদ্ধব্য এই যে, একমাত্র আত্মা হইতেই সমুদয় সমুদিত হইয়াছে এবং সে সকলের উদয়কালে অবিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞান তখন দৃঢ়তা অবলম্বন করে নাই, অজ্ঞানতাই দৃঢ় হইয়াছিল। পরে তাহা হইতে সংসার নামে এক বৃহৎ বৃক্ষ আবির্ভূত হইয়াছে। এই বৃক্ষ শতসহস্র স্কন্ধশাখাদিসম্পন্ন, শুভাশুভ বিবিধ ফলপ্রদ, আশারূপ মঞ্জরীবিশিষ্ট, দুঃখাদি দারুণ ভোগসমূহ বাসনা পল্লবশালী, জরামরণাদিরূপ কুসুমনিকরে শোভিত ও তৃষ্ণালতাদির দ্বারা বিজড়িত হইতেছে। হে অঙ্গ! তুমি বারণপতির স্তম্ভ উন্মথনের ন্যায় ঐ সকল লতাদি উন্মূলন এবং বিবেকরূপ অসির দ্বারা ঐ বলে দুঃখপ্রদ সংসারবৃক্ষকে ছেদন করতঃ মুক্ত হইয়া বিহার কর৪৭।৫১।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

——()*()——

* রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ব্রহ্মপদ হইতে কিরূপে জীব-সংঘের উৎপত্তি হইয়াছে? তাহাদের সংখ্যা ও স্বভাবাদি কত ও কিরূপ? তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, ব্রহ্ম হইতে যেরূপে ভূতসংঘের উৎপত্তি হয়, যেরূপে তাহারা নাশপ্রাপ্ত হয় এবং যেরূপে তাহারা মুক্ত, পরিবর্দ্ধিত, স্থিত ও অন্তর্হিত হয়, আমি তোমার নিকট তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২।৩]।

সর্ব্বশক্তিমতী নির্ম্মলা ব্রাহ্মী চিৎশক্তি স্বয়ং (আপনা আপনি) যদৃচ্ছা-ক্রমে কলনাত্মক চেত্য হন[৪]। * চেত্য কলনার পর তাহা ঘনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা হইতে অহংভাবের স্ফুরণ হয়। সেই স্ফূর্ত্তিমৎ অহঙ্কারই মনঃ এবং জীবের উপাধি। জীবের উপাধি অর্থাৎ জীব জগন্ময় হইবার উপকরণ। পশ্চাৎ উপধি উক্ত মনঃ যাহা যাহা সঙ্কল্প করে তাহা তাহাই তাঁহার দৃশ্যাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়[৫]। মনঃ ক্ষণমধ্যে সঙ্কল্পের দ্বারা গন্ধর্ব্বপুরবৎ এই অসত্য দৃশ্য বিস্তার করেন[৬]। চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও স্ব-প্রকাশ, তিনি প্রথমতঃ স্বকর্ত্তৃক স্বাতিরিক্ত শূন্যাকারে দৃষ্ট বা অবভাসিত হন। এই অবস্থাটী সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ আকাশ[৭]। এই আকাশরূপ আধারে চতুর্ম্মুখাদির ও ভুবন সমূহের কল্পনা। তাহার ক্রম বা প্রকার পরিপাটী এইরূপ—আকাশ কল্পনার পর তিনি পদ্মজ-সঙ্কল্পে (পদ্মজ=ব্রহ্মা বা হিরণ্য-গর্ভ) আপনাকে পদ্মজরূপে দর্শন করেন, তদনন্তর তিনি দক্ষাদি প্রজা-পতির সহিত বিবিধ বহুভূতসমন্বিত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগতের সৃষ্টি করেন। হে রামচন্দ্র! সৃষ্টি এই প্রকারে সেই চিতের স্বভাব চিত্ত হইতে সমাগত হইয়াছে, সেজন্য ইহা চিত্তময়ী ও শূন্যা সুতরাং ব্যোম-শরীরা ও সঙ্কল্পনগরীর সদৃশী। ইহার বিদ্যমানতা ভ্রান্তির অন্তত্তম

---

* কল্পনাত্মক চেত্য, এ কথার অর্থ—প্রাক্তন বাসনার উদ্বোধ বা পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ভবিষ্যৎ দেহাদি আকারের স্বপ্নবৎ স্ফুরণ বা উদয়।

প্রকার[৮।১০]। এই অসৎ জগতে কতিপয় ভূতজাতি মহামোহদ্বারা সমাক্রান্ত, কতক (সনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি) তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও কতক মোক্ষলাভার্থ যত্নশীল। যত্নশীল হইলেও দৃঢ় বৈরাগ্যের অভাবে পুনঃ পুনঃ বিঘ্নের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় কৃতকার্য্য হইতেছে না[১১]। সমুদায় ভূতজাতির মধ্যে ভারতখণ্ডবাসী নরজাতিরাই শাস্ত্রাধিকারী ও অধিক পরিমাণে বৈরাগ্য সম্পন্ন। সেই জন্য ইহারাই উপদেশের উত্তম পাত্র[১২]।*

হে রামচন্দ্র! বহুল-আধি-ব্যাধি--ভয় মোহ-দুঃখাদির দ্বারা নিপীড়িত ও সংসারমগ্ন হইলেও যে সকল নরজাতি উপদেশ গ্রহণে সমর্থ, সেই সকল রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১৩]। স্থিরজল সিন্ধুর তরঙ্গচাঞ্চল্য প্রাপ্তির ন্যায় সেই অমৃত সর্ব্বব্যাপী নিরাময় অনাদি অনন্ত বিগতভ্রম অনন্তাখ্য নিস্পন্দবপু ব্রহ্মের একদেশে তদীয় স্পন্দনসম্ভাবিত চিৎ ঘনতা প্রাপ্ত হয়[১৪।১৫]।

অবসরপ্রাপ্তে রামচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, অনন্ত আত্মতত্ত্বের আবার একদেশ কি? কি নিমিত্ত তিনি বিকারিতা প্রাপ্ত হন? এবং কি নিমিত্তই বা তাঁহাকে অদ্বিতীয়বিক্রম বলে? বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন—রাম! "তৎকর্ত্তৃক ও তাহা হইতে জাত" ইত্যাদিবিধ বচন-রচনা কেবল শাস্ত্রব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ তাহাও নহে[১৬।১৭]। বিকারিত্ব, সাবয়বত্ব, দিক্‌সত্তা ও প্রদেশত্ব প্রভৃতি প্রতীত হইলেও ঈশ্বরে ঐ সকল সম্ভাবিত হয় না। অর্থাৎ সপ্রমাণ করা যায় না। যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনও কল্পনা সম্ভবে না, তখন পূর্ব্বাপর ক্রমের কথা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। ঐ সকল শব্দ, মাত্র ব্যবহার কারণে জন্মলাভ করিয়াছে[১৮।১৯]। ইহাও বলা বাহুল্য যে, শব্দ অর্থ বাক্য সমস্ত কল্পনাই ঈশ্বর হইতে জাত ও ঈশ্বরময়[২০]। যেমন বহ্নি হইতে বহ্নি জন্মে, ময়ূর হইতে ময়ূর, সেইরূপ তাঁহা হইতে যাহা হয়, সমস্তই তিনি। ইহা জন্য, তাহা জনক, এ সকল ভেদ কেবল কল্পনাপ্রসূত। ইহা ইহা হইতে সমুৎপন্ন, ইত্যাদি ইত্যাদি জগৎ স্থিতি অর্থাৎ ভেদ ব্যবহার কেবলমাত্র ক্রিয়াশক্তির আতিশয্যমূলক। "ইহা অন্য ইহা অন্য" এরূপ শব্দ ও অর্থ উভয়ই উক্তিমাত্রে অবস্থিতি করিতেছে। পরম দেব পরমাত্মায় নহে[২১।২২]। সেই পরম দেব সম্ভূত বর্ণিত প্রকারের মনঃশক্তি হইতেই সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম সকল বা বস্তুজ্ঞান সকল স্বতঃ

প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাহারই দৃঢ় ভাবনার দ্বারা তাহা হইতে অভীষ্ট অর্থ লব্ধ হয়[২৪]। এ সকল মাত্র ব্যবহার-রহস্য; বস্তুকল্পে জন্মজনকাদি ক্রম উক্তিবৈচিত্র মাত্র[২৫]। তিনি যখন একমাত্র অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি কোথায় কি উৎপন্ন করিবেন? সুতরাং তাঁহাতে জন্মজনকাদি ক্রম অসম্ভব বলিয়া অবধারিত হয়[২৬]। উক্তিরও স্বভাব এই যে, সে আপনার উদয়ের পর স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী, ভেদ ও দ্বিত্বাদি সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত বা সম্বদ্ধ হয়। * পরমার্থে তাহার যোগ হয় না[২৭]। পরমার্থে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অব্ধিতে উর্ম্মির ন্যায়, সেজন্য পণ্ডিতগণ সে সকলকেও ব্রহ্ম বলেন[২৮]। যিনি ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চিৎও ব্রহ্ম, মনঃও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানও ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দও ব্রহ্ম, অর্থ ও তদুভয়ের যোগও ব্রহ্ম, ধাতুও ব্রহ্ম, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্ম, বিশ্বাতীত বস্তুও ব্রহ্ম। তাঁহারা জানেন, জগৎ কেন? ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই [২৯,৩০]। এই অমুক, তাহা অমুক, এ সকল বিভাগ মিথ্যা জ্ঞানের বিকল্পনা। বাক্যের আবার সত্যতা কি[৩১]? বহ্নিই শিখার আকারে জন্মে, সুতরাং শিখা শব্দ শব্দমাত্র ও মনঃকল্পনার নাম মাত্র। বিকল্প মাত্রেই চাঞ্চল্যমূলক; সেজন্য সে সকলের বস্তুতা অসিদ্ধ[৩২]। বিকল্প সকল অসত্য। যাহা সত্য তাহা হইতে তাদৃশ বিকল্প প্রসূত হয়। বিকল্পের প্রসূতি অর্থাৎ জন্মলাভ দ্বিচন্দ্র দর্শনের অনুরূপ[৩৩]। সর্ব্বগামী ও অনন্ত ব্রহ্ম হইতে পদার্থান্তর জন্মের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাহা যাহা তজ্জাত তাহা তাহাই ব্রহ্ম। ইহ জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সত্তা উপপন্ন হয় না এবং "এ সকল ব্রহ্ম" এই শ্রুত্যর্থই পরমার্থ[৩৪,৩৫]।

হে প্রাজ্ঞ! তোমার প্রশ্নের সিদ্ধান্ত প্রায় এইরূপ হইবে। যখন তাহা হইবে, অর্থাৎ যখন সিদ্ধান্তোপদেশ যোগ্য কাল বা অবস্থা আসিবে, তখন সিদ্ধান্ত কথা বহুযুক্তি ও উদাহরণ সহ বলিব[৩৬]। তোমার অজ্ঞান সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তুমি "ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন কল্পনা

---

* স্বাশ্রয়তাদাত্ম্যবিরোধী অর্থাৎ মিলিত বা সংযুক্ত হওয়া। যেমন গুড় একটী শব্দ, তন্নামক দ্রব্য বিশেষ তাহার অর্থ, পরন্ত গুড় এই কথাটী গুড় দ্রব্যে সংযুক্ত, মিলিত এক বা অভিন্ন হয় না। হইলে উচ্চারণ মাত্রে গুড় কথার অর্থ জিহ্বাস্বাদ্য হইত। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ কথা কল্পিত সঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

নাই," ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে[৩৭]। যেমন অবস্তু সংক্ষীণ হইলে বস্তু প্রসন্ন হয়, তদ্রূপ, কুদৃষ্টিদৃষ্ট বিশ্ব প্রশান্ত হইলে তুমি নির্ম্মল-প্রভ বিস্তৃত পরম পদে স্থান প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[৩৮।৩৯]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—()✱()—

রাম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! যেমন শরৎ কালের দিবস কখন মেঘাচ্ছন্ন কখন আলোকদ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকে তাহার ন্যায় আমি ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত নির্ম্মল শশাঙ্ক সদৃশ সুশীতল ও বিচিত্রার্থসম্পন্ন ভবদীয় উপদেশ দ্বারা কখন মোহান্ধকারাচ্ছন্ন ও কখন বা জ্ঞানালোকদ্বারা প্রকাশিত হইতেছি১।২। হে মুনিপুঙ্গব মহর্ষে! অনন্ত অপ্রমেয় একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ পরমার্থে কি প্রকারে কল্পনা সমুদিত হইতে ও থাকিতে পারে৩?

বশিষ্ঠ বলিলেন, তোমার উক্ত প্রকার ব্যামোহ আমার বাক্যদোষে নহে। কেননা, আমার উক্তি সকল যোগ্যার্থসম্পন্ন। উহাতে অসঙ্গত, বিরূপার্থ বা পূর্ব্বাপরবিরোধ কিছু মাত্র নাই। তুমি বুদ্ধিমালিন্য বশতঃ মদীয় বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ, তাই তোমার ব্যামোহ বা সন্দেহ হইতেছে। তোমার জ্ঞানচক্ষুঃ সম্যক্ প্রস্ফুটিত ও প্রবোধ সূর্য্য সম্যক্ সমুদিত হইলে তখন আমার বাক্যের বলাবল যথাবৎ অবগত হইতে পারিবে৪।৫। আপাততঃ "ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নাই" এইমাত্র বুদ্ধিস্থ করিয়া রাখ। উপদেশ্য (উপদেশযোগ্য শিষ্য) দিগের উপদেশ করিবার জন্য শব্দার্থসমন্বিত বাক্য রচিত হইয়া আছে, সে সকল কল্পিত হইলেও তদ্দ্বারা সত্য প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। অতএব, বাক্য সকল ভ্রমান্তর্গত বিবেচনায় ভ্রমময় হইও না৬। যে দিন তুমি জানিবে, অর্থাৎ মদীয় উপদেশের মর্ম্মার্থ তোমার প্রত্যক্ষবৎ গোচর হইবে, সে দিন তোমার, তাহা বাচ্য ইহা বাচক, এ সকল ভেদ পরিত্যক্ত হইবে। যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ও পরম সত্য, তাহাই মদীয় বাক্যের অর্থ৭। ✱

✱ রামের প্রশ্ন ও বশিষ্ঠের প্রত্যুত্তর উভয় অংশের সার সংকলন এইরূপ— রামের আশঙ্কা—"এ সমস্তই ব্রহ্ম" "ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নাই" এ সকল কথা "মম মাতা বন্ধ্যা" "আমার জিহ্বা নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যের অনুরূপ, সুতরাং

বাক্যপ্রপঞ্চ উপদেশের নিমিত্ত অর্থাৎ শিষ্য বুঝাইবার নিমিত্ত (শাস্ত্রার্থ শিষ্যে সঞ্চারিত করিবার জন্য কল্পিত বা বিরচিত) সুতরাং সে সকল অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য; জ্ঞানীর পক্ষে অসত্য। * কলনা, মালিন্য, মোহ, এ সকল আত্মায় অবস্থিত নহে। আত্মা নীরাগ, নির্লেপ, পরম ও ব্রহ্ম। এবং তাহাই এই জগৎ[৮।১০]। হে অনঘ! আমি এই বিষয়টী পুনর্ব্বার বিবিধ যুক্তিসহকারে বলিব[১১]। বাক্প্রপঞ্চ ব্যতীত নিবিড়ান্ধকারতুল্য দুর্ভেদ্য অজ্ঞান দূরীভূত করিতে পারা যায় না[১২]। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্য রাশির দ্বারা পরিশোধিত অন্তঃকরণাকার অবিদ্যা আপনার বিনাশ কামনায় আত্মদোষনাশিনী বিদ্যার উদয় প্রার্থনা করিতে থাকে। (যেমন পতিব্রতা কামিনী পতিহিতার্থে আপনার মরণ লক্ষ্য করে না, তাহার ন্যায় অবিদ্যাও আত্মহিতার্থে স্বমরণ অঙ্গীকার করে।)[১৩]। হে রাঘব! অস্ত্রদ্বারা অস্ত্র, মলদ্বারা মল, বিষদ্বারা বিষ ও রিপুর দ্বারা রিপু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অবিদ্যা অবিদ্যার দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা নাম্নী মায়া স্বাত্মবিনাশে কাতরা নহে, প্রত্যুত অকাতরা। ইহার অপর স্বভাব এই যে, একবার দৃষ্ট (পূর্ণরূপে চৈতন্য ব্যাপ্ত) হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়[১৪।১৫]। মায়া অদৃশ্য ভাবে বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া জগদ্বিস্তার করে, পরন্তু, আশ্চর্য্য এই যে, জগৎ যাহার দ্বারা প্রস্ফুরিত হইতেছে, তাহা সে কাহারও নিকট ব্যক্ত করে না। অথচ সে নিজে অলক্ষিত ভাবে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যদি কদাচিৎ কাহার দৃষ্টিগোচরে পড়ে তবে সে তাহার নিকট তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট বা অস্তগত হয়[১৬।১৭]। অহো! কি আশ্চর্য্য! ঈদৃশী সংসারবন্ধনী মায়া নিতান্ত অসত্য হইয়াও পরম পদে অত্যন্ত সত্য স্বরূপে

অসঙ্গত বা ব্যামোহ জনক। বশিষ্ঠের অভিপ্রায়—যেমন মলিন দর্পণে উত্তম প্রতিবিম্ব পড়ে না, তাহার ন্যায় বুদ্ধির অত্যন্ত নৈর্ম্মল্য ব্যতীত মোক্ষ বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ হয় না।

* বাক্যপ্রপঞ্চ অসত্য হইলেও সত্যার্থ বোধ উদ্বোধিত করিতে সমর্থ। অসত্য স্বপ্নাদি সত্য বস্তুর বোধ জন্মায় তাহার ন্যায় অসত্য বাক্যও সত্য বস্তুর বোধ জন্মায়। সেইজন্য, তত্ত্বজ্ঞান হইলে বাক্প্রপঞ্চ কেন, জগৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। কিন্তু যত দিন না জ্ঞানোদয় হয় তত দিন উহা চক্ষুরাদি প্রমাণের ন্যায় অর্থকারী হইয়া থাকে।

বিস্তৃত হইতেছে[১৮]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যে পদ অতিনির্ভেদ, সে পদে সে, ভেদ বিস্তার পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে। কিন্তু পরমার্থ পক্ষ—পরম পদে অবিদ্যা নাই। রাম! পরম পদে অবিদ্যা নাই, তুমি এইরূপ দৃঢ় ভাবনার দ্বারা যখন জ্ঞেয় বস্তু প্রাপ্ত ও প্রাজ্ঞ হইবে তখন আমার এই সদুক্তির সাফল্য অবগত হইতে পারিবে[১৯,২০]। কিন্তু যাবৎ না প্রবুদ্ধ হইবে, তাবৎ তুমি মদীয় বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক "আত্মার অবিদ্যা নাই" এইরূপ দৃঢ় ভাবনা অভ্যাস করিতে ক্ষান্ত হইও না[২১]। মনের যে সকল মনন দৃশ্যাকারে নিবিড়িত হইয়াছে সে সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অতিতুচ্ছ। কারণ, মনঃই সেই সেই দৃশ্যাকারে বিজৃম্ভিত হইতেছে[২২]। যে উক্ত রহস্য অবগত হইয়াছে এবং যাহার অন্তরে একাদ্বয় ব্রহ্মভাব সুদৃঢ়রূপে সংস্থিত, সেই মহাপুরুষ পরমমোক্ষভাগী। যে কিছু চল অচল আকৃতি অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সে সমস্তই মোক্ষের প্রতিবন্ধক। প্রাণিগণের বন্ধন রজ্জু রূপ জগৎকে যিনি স্বপ্নভূমির ন্যায় দেখেন, সেই অনাসক্তচিত্ত ব্রহ্ম ব্যক্তি কোনও কালে দুঃখে নিপতিত হন না। মিথ্যাভূত ইন্দ্রিয়দেহাদিরূপ দ্বৈতে যাহাদের অহংবুদ্ধি বিদ্যমান, তাহারা বহু দুঃখপ্রদায়িনী অবিদ্যাসরিতে নিমজ্জিত হয়। কেননা, বিকারিতা প্রভৃতি দোষ আত্মায় অবিদ্যমান। পরমাত্মায় ঐ সকল দোষ সলিলে পাংশুর ন্যায় জানিবে। তত্ত্বজ্ঞগণ জগদন্তর্গত নামের ও নামীর ব্যবহার করেন বটে; পরন্তু সে সকলে তাঁহাদের অনুরঞ্জনা নাই[২৩,২৭]।

যাহা যাহা ব্যবহার প্রয়োজনে আত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সে সকল আত্মার অব্যতিরিক্ত। যেমন বিনা তন্তুতে পটের স্থিতি অসম্ভব, সেইরূপ বিনা ব্যবহারে ও ব্যবহারিক পদার্থে শাস্ত্রাদির স্থিতি অসম্ভব। রঘুনাথ! অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মা উপলব্ধিগোচর হন না। তৎকারণে সকলেরই অবিদ্যানাশক আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব, বিনা আত্মজ্ঞানে দুস্তরা অবিদ্যা নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার আত্মজ্ঞানও বিনা শাস্ত্রচর্চ্চায় লাভ করা যায় না। ঐরূপ, বিনা আত্মলাভে অক্ষয় পদ পাওয়া যায় না। অবিদ্যা যাহা হইতেই হউক, অবিদ্যা জন্মিলে তাহা আত্মাকে মলিন করিবে[২৮,৩১]। আত্মজ্ঞানের অভাব কালে যে মলদায়িনী অবিদ্যা স্থিতি লাভ করে, তাহা সেই ব্রহ্মপদ অবলম্বনে, (ব্রহ্মপদ=আত্মা), তুমি এইমাত্র বিদিত হইবে। কোথা হইতে কি প্রকারে জন্মিল সে

বিচার অনাবশ্যক[৩২]। উহাকে কিরূপে বিনষ্ট করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ কর। বিচারে অর্থাৎ উপায় বিশেষে অবিদ্যা ক্ষীণ ও অস্ত-গত হইলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, অবিদ্যা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিসে ও কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে এবং কিরূপে বিনষ্ট হইল। উহা কোন বস্তু নহে। প্রকাশিত হয় না, দৃষ্টও হয় না[৩৩।৩৪]। যেরূপে এই বিস্তৃতাকৃতি অবিদ্যা জাত ও প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তুমি মনের দ্বারা বলপূর্ব্বক উহাকে বিনষ্ট করিলেই বুঝিতে পারিবে। অন্যথা, কে কবে কোথায় অসতের রূপ জানিতে পারিয়াছে। অতিশূর হউন বা অতিশান্ত হউন, অবিদ্যাবশীভূত না হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি নাই[৩৫।৩৬]। অতএব, যাহাতে রোগরূপিণী অবিদ্যা তোমাকে জন্মমরণদুঃখে নিক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার নিমিত্ত তুমি যত্নবান্ হও ও তাহার বিনাশচেষ্টা কর। সর্ব্বপ্রকার আপদের সখীস্বরূপা, অনর্থে স্বার্থবোধদায়িনী ও বহুদুঃখপ্রসবিনী অবিদ্যাকে সত্বর সংক্ষীণ কর। তুমি বিবেকবলে সত্বর ভয়, বিষাদ ও আধিব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ্‌প্রদায়িনী, হৃদয়ে মহামোহপটলের অঙ্কুরজননী অবিদ্যাকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ভবার্ণবের পার প্রাপ্ত হও[৩৭।৩৮]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশপাবন রাম! তুচ্ছ ও (জ্ঞাননাশ্য) প্রবল অবিদ্যাব্যাধির ঔষধ কি তাহা বলি, শ্রবণ কর। মনোবীর্য্য বিচারার্থ আমি যে রাজস ও সাত্বিক জন্মের বিবরণ বলিয়াছি, এক্ষণে তাহাই পুনঃ বর্ণন করি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর[১।২]। পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মের সৃষ্ট্যুন্মুখ হওয়া স্তিমিত জল সমুদ্রের সংক্ষোভের অনুরূপ[৩।৪]। যেমন সমুদ্রগর্ভের জল স্পন্দ ও অস্পন্দ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, (কোন স্থানে স্পন্দ অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট এবং কোন স্থানে নিস্পন্দ অর্থাৎ গতিবর্জ্জিত), তাহার ন্যায় সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব হইলেও কদাচিৎ কোন এক অংশে স্পন্দশক্তিতে আবির্ভূত হন। আকাশে বায়ু স্বয়ং প্রসারিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মাও আপন শক্তিতে আপনি কলনাযুক্ত হন অর্থাৎ সৃষ্ট্যর্থ উন্মুখ হন[৫।৬]। যেমন দীপ আপন শিখার স্পন্দশক্তিতে উন্নত (পরিবর্দ্ধিত) হয়, তাহার ন্যায়, আত্মাও স্বশক্তিসৃষ্ট শরীরে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হন[৭]। যেমন শরৎকালের সূর্য্যকিরণ সাগরজলকে কনকদ্রবের (কনকদ্রব=গলা শোণা।) ভ্রম জন্মায়, তাহার ন্যায় চিৎসমুদ্র আত্মার প্রস্পন্দে জগৎভ্রম জন্মাইয়া থাকে[৮।৯]। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ অতিন্দ্রীয়, তাহা দেখা যায় না, অথচ তহাতে কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে, যেন মুক্তামালা দোলিত হইতেছে (ইহা দর্শকের দৃষ্টির দোষে)। সেইরূপ, চিদাকাশ স্বতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহাতে এই জগৎচাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। (ইহাও আপন আপন দৃষ্টির বা জ্ঞানের দোষে) [১০]। অর্ণবে যে উর্ম্মি দেখা যায়, তাহা অর্ণবের সংক্ষোভ। তাহার ন্যায় চিদার্ণবে দৃষ্ট জগৎও চিৎসমুদ্রের আজ্ঞানিক সংক্ষোভ[১১]। আলোক-কোটরে (সূচ্যাদির ছিদ্রে) আলোকশ্রী যদ্রূপ, চিদ্বস্তুতে চিচ্ছক্তিও তদ্রূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমাবিষ্ট চিচ্ছক্তিও নিরুপাধিক চিতের অনতিরিক্ত[১২]। এই দেবী (চিচ্ছক্তি) স্বীয় শক্তিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রস্ফুরিত হন ও চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা বিস্তার করিয়া আত্মশক্তিকে বিস্তৃত করিতে

থাকেন[১৩]। দেশ, কাল, ক্রিয়া, এ সকল শক্তিও সেই চিৎ শক্তির সখী[১৪]। চিৎশক্তি যখন আপন স্বভাব বিজ্ঞাত হন তখন অনাদি অনন্ত পদে স্থিতি লাভ করেন। এবং যখন আত্মবিস্মৃত হন তখন রূপাদির ভাবনায় প্রবৃত্ত হন। তখন অসংখ্য দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাঁহার অনু-গমন করিতে থাকে[১৫।১৬]। তখন অর্ণবের লহরী বিজৃম্ভণের ন্যায় পরমার্থাতিরিক্ত অনন্ত দৃশ্য চিদর্ণবে বিজৃম্ভিত হইতে থাকে[১৭]। যেমন ভাবনার প্রভেদে সুবর্ণ হইতে বলয়াদির ভেদ লক্ষিত হয় তাহার ন্যায় ভাবনার দোষেই আত্মা হইতে চিতের প্রভেদ ব্যবহৃত হয়[১৮]। যেমন দীপ হইতে দীপসমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি, চিদাত্মা হইতে এই সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, তাদৃক্‌স্বভাব চিদাত্মা হইতেই দেশকালকল্পনা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছে[১৯]। চিদাত্মা দেশকালপরি-স্পন্দনরূপা শক্তির দ্বারা বিস্পষ্ট হইয়া সঙ্কল্পের অনুগামী হন। এবং কলনাপদও প্রাপ্ত হন। (কলনাপদ=সৃষ্টিরূপী পদ)। হে মহাবাহো! চিতের যে রূপটী দেশ কাল ক্রিয়াদির পরিকল্পক, সেই রূপটী শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যায় পরিভাষিত হইয়াছে। (ক্ষেত্র=শরীর। তাহার জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ। অর্থাৎ চৈতন্যের অহংদেহী ইত্যাকার ভাব)[২০।২১]। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনানুরূপ কল্পনায় অহঙ্কৃতি পদ প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কার পদ তাহার কলঙ্ক স্থানীয় এবং তাহা বুদ্ধি শব্দের লক্ষ্য। প্রকারান্তরের বুদ্ধি মনোনামেও অভিহিত হয়। মনঃ আবার ঘনবিকল্পদ্বারা ইন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় এই পাণিপাদাদিমান্ দেহের আকারে পরিণত হয়। দেহ-পদার্থ উক্ত প্রকারে কল্পিত হইলেও সত্যের সংশ্রবে সত্যবৎ জাত, প্রসূত, মৃত ও জীবিত হইতে থাকে[২২।২৫]। সঙ্কল্প ও বাসনা এই দুই রজ্জুতে বেষ্টিত ও দুঃখজালে বিজড়িত জীব তখন বাহ্যবস্তুস্বরূপিনী চেতনায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তখন সে যেমন যেমন ভাবনার পরিপাক (চিন্তার গাঢ়তা) তেমনি তেমনি ফল অনুভব করিতে থাকে। সেই সেই রূপে জীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। অবিদ্যামালিন্যের পরিবর্ত্তনানুসারে তাহার বিভিন্ন যোনি ও দেহ প্রাপ্তি হইতে থাকে। অধিক কি বলিব, সঙ্কল্পময় মন স্ত্রীপুত্রাদি শরীরের আকারে আকৃতিমান্ হইয়া অর্থাৎ সেই সেই প্রকারের বৃত্তি লাভ করিয়া মনোরথরূপ (মনোরথ=মনঃকল্পিত) তুচ্ছ ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে

সমাসক্ত হয়[২৬,২৯]। তখন সরিৎ সমুদয় যেমন সাগরের অভিমুখে ধাবমানা হয়, ঋতুমতী গো যেমন বৃষের অনুগামী হয়, তাহার ন্যায় তাহার ইচ্ছাদি শক্তি তাদৃশ চিত্তের অনুসরণ করিতে থাকে[৩০]। তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন চিত্ত ঘনীভূত অহঙ্কারের বশে কোশকার কীটের ন্যায় আপনার কার্য্যে আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হয়[৩১]। আত্মা অভিহিত রীতিতে সঙ্কল্পের অনুসন্ধান করতঃ আপনা আপনি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া "সংসারে বিষম কষ্ট" এইরূপ পরিতাপ ও "আমি বদ্ধ," এইরূপ কল্পনায় মৃত্যুর বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। আত্মা কথিত প্রকার বিকল্পের বশ্য হইয়া হৃদয়কাননে পুনঃ পুনঃ জগৎ জঙ্গলের রাক্ষসীস্বরূপ অবিদ্যার (জন্ম মরণ ভ্রান্তির) উৎপাদন করিতে থাকে। সঙ্কল্পকল্পিত শব্দাদি বিষয় রূপ শুষ্ক ইন্ধন হইতে সমুদ্ভূত রাগরূপ বহ্নির বিস্তৃত শিখার অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া বিদগ্ধ হইতে থাকে এবং শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহের ন্যায় সাতিশয় বিবশতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ, বাসনা বশতঃ স্বেচ্ছামাত্র দ্বারা বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সমূহের উপর বিচিত্র ভোক্তৃত্বাদি স্থাপন করিতে থাকে[৩২,৩৫]।

হে রাঘব! বর্ণিত প্রকারের চিত্ত কোন কোন স্থলে মন, কোথাও বুদ্ধি, কোথাও জ্ঞান, কোথাও ক্রিয়া, কোথাও অহঙ্কার, কোথাও পূর্য্যষ্টক, * কোন কোন শাস্ত্রে প্রকৃতি, মায়া, মল, কর্ম্ম, বন্ধ, অবিদ্যা, ইচ্ছা, প্রভৃতি শব্দে পরিভাষিত হইয়াছে[৩৬-৩৮]। তথা ঐ চিত্তই বদ্ধ এবং তৃষ্ণা ও শোক প্রভৃতিতে সমাবিষ্ট ও রাগের বিস্তৃত আয়তন (স্থান)[৩৯]। তথা চিত্তই জরামরণজনিত ভয়ে ব্যাকুল, দুঃখে কাতর, দুর্ভাবনায় নিপীড়িত, ইষ্টানিষ্টবোধ দোষে দুষ্ট, ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইতে থাকে[৪০]। কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুররূপ চিত্ত বাসনাসংক্ষুব্ধ ও উৎপত্তি পদে বিস্তৃত হইয়া কল্পিত অনর্থপরম্পরার কল্পনা করিতে থাকে[৪১]। তাহাতে শোকপ্রাপ্ত ও কোশাকার কৃমির ন্যায় স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবদ্ধ হইয়া বাসনানুরূপ স্বর্গ নরকাদি ফল ভোগ করিতে থাকে[৪২]। ঐ চিত্তই জরামরণাদিরূপ শাখা-

---

* কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়গণৌ ভূতপ্রাণমনোগণাঃ।
অবিদ্যাকামকর্ম্মাণি লিঙ্গং পূর্য্যষ্টকং বিদুঃ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মহাভূত, প্রাণ, মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, এই সমন্বিত অষ্টপ্রকারকে লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মদেহ ও পূর্য্যষ্টক কহে।

বিশিষ্ট সংসাররূপ বিষফলপ্রদ দুর্ব্বৃক্ষ। চিত্ত চক্ষুরাদির দৃষ্ট হয় না অথচ সুমেরু অপেক্ষাও গুরুভার ও অত্যন্ত ভয়াবহ[৪৩]। এই চিত্তই নিখিল সংসার, আশাপাশবিধায়ক ও নিষ্ফল বৃক্ষের অনুকারী[৪৪]। এই চিত্তই চিন্তানলে দগ্ধীভূত, কোপরূপ অজগর কর্ত্তৃক চর্ব্বিত, কামাদি কল্লোলে উহ্যমান, আত্মপিতামহকে (আত্মপিতামহ=পরব্রহ্ম) বিস্মৃত, যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় শোকোপহত, বিষয় পাবকে নিপতিত, ছিন্নমূল পদ্মের ন্যায় গ্লানি প্রাপ্ত, বিচিত্র ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকুল দ্বারা নিপীড়িত, অনন্ত দশায় নিপতিত, বিবিধ সঙ্কটে নিয়োজিত, অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ও অনাদর রূপ সমুদ্রে উহ্যমান হইতেছে। অতএব, হে অমরসঙ্কাশ (দেবতাতুল্য) মহাবাহো! তুমি ত্বদীয় এবম্বিধ অনন্তদুঃখক্লিষ্ট চিত্তরূপ মাতঙ্গকে বিষয়রূপ কর্দ্দম হইতেউদ্ধার কর। হে কৃপার্দ্রহৃদয় অরিন্দম! কামপল্বলনিমগ্ন, ও শীর্ণদেহ বলীবর্দ্দরূপ মনকে সত্বর বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর। যে হেতু শুভাশুভ বিষয়ে মলিনীকৃতদেহ, সর্ব্বদা বিচলিত, জরামরণবিষাদদ্বারা মূর্চ্ছিত ও স্বীয় ঈদৃশ সাতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন মনের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহার উদ্ধারে যে ব্যক্তি যত্ন না করে, সেই কঠিনহৃদয় নরাধম নরাকার রাক্ষস[৪৫।৫২]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—()※()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিদ্বস্তুর ঔপাধিক ভাব জীব। জীবেরা সংশয়ে ও বাসনায় অপবাহিত হইতেছে। তাহারা সকলেই কল্পিতাকার ও ব্রহ্ম হইতে জাত। এবম্প্রকারের জীব অসংখ্য। যেমন নির্ঝর হইতে অসংখ্য জলকণা জন্মে, তাহার ন্যায় ব্রহ্ম পদ হইতে অসংখ্য জীব জন্মিতেছে, এখনও জন্মিতেছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মিবে[১]।[২]। স্বস্ব বাসনার আবেশে বিবশ ও বিবিধ দশাগ্রস্ত হইয়া অনবরত ভিন্ন ভিন্ন দেশে, জলে ও স্থলে জলবুদ্বুদের ন্যায় জন্মিতেছে ও মরিতেছে[৩]।[৪]। কোন কোন জীব এতৎ কল্পে একটী মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কোন কোন জীব ততোধিক জন্ম ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে এবং কতকগুলির জন্মের সংখ্যা নাই। কোন কোন জীবের দুই ও তিন জন্ম অতীত হইয়াছে, কোন জীব ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করিবে, ও কাহার বা জন্ম অতীত হইয়াছে, কেহ বা সম্প্রতি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ বা আজও জন্ম গ্রহণ করে নাই, (এতৎকল্পে)[৫]।[৬]। কেহ ক্রমিক সহস্র কল্প ব্যাপিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ একমাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও কেহ বা যোন্যন্তর প্রাপ্ত হইয়াছে[৭]। কেহ দুঃখসহিষ্ণু হইয়া নরকে, কেহ অল্প সুখভোগী হইয়া মর্ত্ত্যলোকে, কেহ অত্যন্তসুখী হইয়া দেবলোকে, এবং কেহ বা সূর্য্যলোকে অবস্থান করিতেছে[৮]। কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর, কেহ মহোরগ, কেহ সূর্য্য, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ, কেহ মহেশ্বর, কেহ বিষ্ণু, কেহ ব্রহ্মা, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ভূপাল, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ কুষ্মাণ্ড, কেহ বেতাল, কেহ যক্ষঃ, কেহ রাক্ষস, কেহ পিশাচ, কেহ শ্বপচ, কেহ চণ্ডাল, কেহ কিরাত ও কেহ পুক্কশ দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে করিতেছে ও করিবে। কেহ তৃণ, কেহ ওষধি, কেহ ফল, কেহ মূল, কেহ পতঙ্গ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কেহ লতা, কেহ গুল্ম, কেহ উৎপল, কেহ কদম্ব, কেহ জম্বীর, কেহ শাল, কেহ তাল, কেহ তমাল জন্ম পাইয়াছে, পাই-

তেছে ও পাইবে[১১,১২]। কেহ বিভবসম্পন্ন মন্ত্রী, কেহ সামন্ত ভূপাল, কেহ চীরাম্বরধারী মৌনব্রতী মুনি, কেহ ভুজঙ্গ, কেহ পতঙ্গ, কেহ কৃমি, কেহ কীট, কেহ পিপীলিকা, কেহ মৃগেন্দ্র, কেহ মহিষ, কেহ মৃগ, কেহ ছাগ, কেহ চমরমৃগ, কেহ সারস, কেহ চক্রবাক, কেহ কাক, কেহ কোকিল, কেহ কমল, কেহ কহ্লার, কেহ কুমুদ, কেহ করভ, কেহ মাতঙ্গ, কেহ বরাহ, কেহ বৃষ, কেহ গর্দ্দভ, কেহ ভ্রমর, কেহ মশক, কেহ পুত্তিকা, ও কেহ কেহ বা দংশ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে[১৩,১৬]। কেহ বিবিধ আপদে সমাক্রান্ত হইতেছে, কেহ বা অতুল সম্পদ প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ স্বর্গপুরে, কেহ বা মহানরকে বাস করিতেছে[১৭]। কেহ নক্ষত্রচক্রে, কেহ বৃক্ষরন্ধ্রে, কেহ সূর্য্যাংশুতে, এবং কেহ বা ব্যোমপদে (আকাশে) অবস্থান করিতেছে। কেহ কেহ তৃণ, লতা ও গুল্ম প্রভৃতির রসাস্বাদে নিরত রহিয়াছে[১৮,১৯]। কোন কোন কল্যাণভাজন মহাত্মগণ জীবন্মুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কোন কোন মহাত্মগণ বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ দীর্ঘকাল পরে মুক্ত হইবেন এবং কোন কোন ভোগলম্পট জীব আপনার কেবলীভাব (নির্ব্বাণ) ইচ্ছা করেন না[২০,২১]। কেহ দিগ্‌দেবতা, কেহ মহাবেগবতী নদী, কেহ বিলাসবতী রমণী, কেহ সু সুন্দর পুরুষ এবং কেহ বা নপুংসকরূপে বিরাজ করিতেছে। কেহ প্রবুদ্ধমতি, কেহ জড়াশয়, কেহ বা সমাধিযুক্ত, কেহ বা জ্ঞানোপদেষ্টা গুরু হইয়া অবস্থান করিতেছে[২২,২৩]।

জীবগণ কেবল বাসনার আবেশে বৈবশ্য প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ ঐরূপ বিভিন্ন বিচিত্র অবস্থায় শত শত আশারজ্জুবেষ্টিত ও কোশধারী হইয়া পক্ষীরা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যায় তাহার ন্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণে তৎপর রহিয়াছে। কেহ মর্ত্ত্যলোকে কেহ স্বর্গে কেহবা নরকে গমনাগমন করিতেছে। ইহারা মৃত্যুর কন্দুক (কন্দুক = খেল্‌না) স্থানীয়[২৪,২৬]। অবিদ্যা ঐরূপ অসংখ্য সঙ্কল্পকল্পনারূপ মায়া উৎপাদন করতঃ এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতেছে[২৭]। জীবসকল যাবৎ না আপনাকে বিদিত হয় তাবৎ তাহারা মূঢ় থাকে ও সংসারে পরিভ্রমণ করে[২৮]। আত্মদর্শী মহাত্মগণ অসত্য পরিহার ও সত্যসম্বিদ্ অবলম্বন করতঃ পরম পদ প্রাপ্ত হন, আর তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন না[২৯]. কোন কোন অবোধ নর জন্মসহস্রের পর বিবেক প্রাপ্ত হই-

য়াও পুনর্ব্বার সংসারসঙ্কটে নিপতিত হয়[৩০]। কেহ দেব, ব্রাহ্মণ ও গন্ধর্ব্বাদি উচ্চপদ লাভ করিয়াও তুচ্ছবুদ্ধির প্রাবল্যে পুনর্ব্বার তির্য্যক্ যোনি ও তদনন্তর নরকপ্রাপ্ত হয়[৩১]। কোন কোন প্রশস্তবুদ্ধি মহাত্মা আদিসৃষ্টিতে ব্রহ্মপদ হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই জন্মেই মোক্ষপদে প্রবেশ করেন[৩২]। কেহ এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রাপ্ত হন[৩৩]। বৎস! এতদ্ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও কেহ নাগত্ব, কেহ অসুরত্ব, কেহ দেবত্ব, কেহ বা বিহগত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৩৪]। এ জগৎ যদ্রূপ বিস্তৃতাকার অন্যান্য জগৎও এতদ্রূপ বিস্তৃতাকার। এতৎ জগতের ন্যায় অন্য ন্য জগৎও উৎপন্ন, অতীত ও বর্ত্তমানে স্থিত হইতেছে। পরেও যে কত হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই[৩৫]। জীবের বাসনানুসারে অসংখ্য সৃষ্টি হয়। সে সমুদয়ের মধ্যে কেহ গন্ধর্ব্বত্ব, কেহ যক্ষত্ব, কেহ সুরত্ব ও কেহ কেহ বা দৈত্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে জনগণ যেরূপ ব্যবহার পরম্পরায় বিচরণ করে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ ব্যবহার করতঃ অবস্থান করে[৩৬।৩৮]। সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর সমভাবে আবির্ভূত, তিরোভূত, উন্মজ্জিত, নির্মজ্জিত ও তরঙ্গিণীর উর্ম্মিমালার ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়[৩৯]। দীপ হইতে আলোকের ন্যায়, সূর্য্য হইতে মরীচির ন্যায়, কুসুম হইতে আমোদের ন্যায়, পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, বারি হইতে তুষার জালের ন্যায়, অব্ধি হইতে উর্ম্মির ন্যায়, কাল হইতে বসন্তাদি ঋতুর ন্যায় অসংখ্য জীবরাশি সেই পরম পদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই প্রস্রবিত হয়। তাহারা অসংখ্য দেহপরম্পরা উপভোগ করিয়া প্রলয় কালে সেই পরম পদেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। যেমন তরঙ্গিণীশরীরে বিলোল লহরী জন্মে তাহার ন্যায় পরব্রহ্মেই ত্রিভুবনরচনাকারিণী মোহরূপিণী মহামায়া উক্ত প্রকারে অবিরত আবির্ভূত ও বিস্তৃতিপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইতেছে[৪০।৪৪]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

——(*)(○)(*)——

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যে জীব দেহপরম্পরা ভোগ করিয়া মহাপ্রলয়ে পরম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, সে জীব আবার কিরূপে অস্থিপঞ্জর বিশিষ্ট দেহত্ব প্রাপ্ত হয়? * বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তোমার নিকট ঐ তথ্য কীর্ত্তন করিয়াছি। তুমি কি তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও নাই? তোমার তাদৃশী পূর্ব্বাপর বিচারযোগ্যা নির্ম্মলা বুদ্ধি কোথায় গমন করিল? যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলি, শ্রবণ কর[১,২]।

এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং এই যে শরীরাদি, এ সকলি কেবল আভাস মাত্র। সুতরাং অসৎ ও স্বপ্নকল্প[৩]। হে অনঘ! হে রাঘব! এই সংসার একপ্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন এবং দ্বিচন্দ্র বিভ্রমের অনুচ্ছেদরূপ মিথ্যা। যেমন ভ্রমান্তর্গত ভ্রান্ত শৈল, তাহার ন্যায়[৪]। যাহাদের অজ্ঞান নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, বাসনা বিগলিত হইয়াছে, চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা এই সংসাররূপ স্বপ্ন দেখিয়াও দেখে না[৫]। হে রামচন্দ্র! জীবস্বভাবপরিকল্পিত এই সংসার আপন আত্মারই অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহা মোক্ষ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে[৬]। সলিলে আবর্ত্তের, বীজে অঙ্কুরের, অঙ্কুরে পল্লবের, পল্লবে পুষ্পের, পুষ্পে ফলের অবস্থিতির ন্যায় মনের অন্তরে জীবদিগের দেহের অবস্থিতি। শরীর মনেরই বহুবাসনার দ্বারা সমুৎপন্ন হয় সুতরাং ইহা মনেরই প্রতিভাস, (ভ্রমবিশেষ) অন্য কিছু নহে। সৃষ্টির আদিতে মনের প্রতিভাস সকল মৃৎপিণ্ডের ঘটত্ব প্রাপ্তির ন্যায় বাসনাদ্বারা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। যদি উত্তম কর্ম্মের (বাসনার) পরিপাক হয় তাহা হইলে উত্তমদেহ প্রাপ্ত হইয়া

---

* পরম পদ প্রাপ্তির নাম মুক্তি, এবং মুক্তি হইলে আর দেহ ধারণ হয় না। এই সিদ্ধান্তে রামের আশঙ্কা—যে জীব মহাপ্রলয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয় সে জীবকে অবশ্য মুক্ত বলা যাইতে পারে। যদি তাহারা মুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে কেন?

থাকে[৭]।[১০]। উত্তম কর্ম্মের ফল উত্তম দেহ। তাহার প্রথম নিদর্শন পদ্মযোনি ব্রহ্মা। পদ্মকোশরূপ গৃহে অবস্থিত বিভু পদ্মজ ব্রহ্মাও মনঃসঙ্কল্পপ্রসূত। তদীয় এই অসীম সৃষ্টি মায়ারই রচনাবিশেষ।

রাম পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্! জীব যেরূপে মনঃপদ প্রাপ্তে বৈরিঞ্চ্য পদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহামতে! আমি তোমার নিকট ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ ক্রম বর্ণন করি শ্রবণ কর[১১]।[১৩]। ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ নিদর্শনে তুমি সংসার স্থিতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

যাহা দিক্‌কালকল্পনারহিত নির্ম্মল আত্মতত্ত্ব, তাহাই স্বসামর্থ্যে লীলাক্রমে অর্থাৎ স্বতন্ত্রস্বভাব প্রভুদিগের অহেতুক ক্রীড়ার (স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তার যাদৃচ্ছিক ক্রীড়ার) ন্যায়, কল্পিত দিক্‌কালাদি আকার গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এবং তাহাতেই বিলোল (কল্পনাময় ও চঞ্চল স্বভাব) মন জন্ম লাভ করে। এই মন বাসনা[illegible] পে পে বিভূষিত, জীব সংজ্ঞার কারণ ও কল্পনা বিষয়ে উন্মুখ। তাদৃশ রমণীয় [illegible] ক্ষণমধ্যে আপনার আবির্ভাব কল্পনা করে[১৪]।[১৬]। * ঐ মনঃশক্তি, অ[illegible] তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি কল্পনায় প্রবৃত্ত হয় এবং ক্ষণমধ্যেই প্রবৃশভাবনার দ্বারা শব্দ তন্মাত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। পরে স্পর্শতন্মাত্রাত্মক অনিলের ও ত্বগিন্দ্রিয়ের কল্পনা বা সৃজন করে। মনঃ উক্তক্রমে চক্ষুর অদৃশ্য শব্দতন্মাত্রায় ও স্পর্শবীজাত্মক বায়ুর ঘাত প্রতিঘাতে অনলের ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সৃজন করেন। এই সময়ে আলোক আবির্ভূত হয়। অনন্তর আকাশ, বায়ু ও অনল, এই তিনের পরস্পর ব্যতিকরে রসতন্মাত্রাত্মক সলিলের ও রসনেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়। অতঃপর মনঃ সেই আকাশ, বায়ু, অনল ও সলিলের উপচয় ভাবনায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ বিশিষ্ট গন্ধতন্মাত্রাত্মিকা মেদিনীর ও গন্ধবীজাত্মক ঘ্রাণেন্দ্রিয় সৃজন করেন। মনঃ এই-

---

* যে জীব পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মাহমস্মি, এবং ক্রমে অহংগ্রহ উপাসনায় সিদ্ধ হয়, কল্পশেষে সে বা তাহার তাদৃশ সংস্কৃত মনঃ অব্যাকৃতে লীন থাকে। লীনাবস্থার মনকে বা জীবকে মনঃশক্তি বলা যায়। এই মনঃশক্তি কল্পারম্ভের প্রথমে আপনার হিরণ্যগর্ভাকারে আবির্ভাব কল্পনা করিয়া হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ পদ্মজ ব্রহ্মা আখ্যা ধারণ করতঃ অন্যান্য সৃষ্টি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

রূপে পঞ্চ ভূতের স্বজন করেন, করিয়া পঞ্চভূতাত্মক সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করেন। এই ভূত সৃষ্টি মন হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে। ঐরূপ ঐরূপ ভাবনার গাঢ়তায় বা পরিপাকে মনঃ আপনাকে ঐ ঐ রূপে দর্শন করেন মাত্র১৭।২২। যেমন নভোমণ্ডলে বহ্নিকণার প্রস্ফুরণ হয়, তাহার ন্যায় মনঃ অনন্ত চিদাকাশের একদেশে আপনার সূক্ষ্মভূতপরিবেষ্টিত ও অহং-গর্ত্ত ও বুদ্ধিবীজ সমন্বিত শরীর অনুভব করেন। মনের (মন শব্দ এখানে হিরণ্যগর্ভবাচী) এই শরীর সূক্ষ্ম দেহ, লিঙ্গশরীর ও পুর্য্যষ্টক নামে অভিহিত হয়। পরে সেই মনোরূপ ব্রহ্ম সূক্ষ্ম শরীরে ভাস্বর বৃহদ্বপুঃ ভাবনা করতঃ সেই ভাবনার পরিপাক প্রভাবে বিল্বফলের ন্যায় ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ আপনাকে স্থূলশরীরী বিবেচনা করেন। যেমন মূষানিক্ষিপ্ত গলিত সুবর্ণ মূষারই (মূষা=ছাঁচ) অনুরূপ আকারে প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় উক্ত মনঃ সেই শূন্যাকার ব্যোম মধ্যে স্বকীয় ভাবনার (জগৎ বিরাজ করতঃ ক্রমে ভাবনার দ্বারা সন্নিবেশ অর্থাৎ আপনকারাং অসৎ ও অস্‌ বিভাগ কল্পনা করিতে থাকেন। ঊর্দ্ধদেশে মস্তকার দীর্ঘদেশে পাদ, পার্শ্বে হস্ত, মধ্যে উদর, উদরের বিপরীত ভাগে পৃত ভ্রান্তি কল্পনা করিয়া আপনার বিস্তৃতাকার বৃহদ্বপুঃ স্বজন করেন। এই মনোরূপ মহামুনি বাসনা বশতঃ উক্তক্রমে উক্তবিধ মনোরথসৃষ্ট বৃহদ্বপুতে অবস্থান করতঃ প্রকাশিত অর্থাৎ অমল-বিগ্রহধারী হইয়া আবির্ভূত হন২৩।৩০।

হে রামচন্দ্র! এই মনোরূপ ব্রহ্মা বর্ণিত প্রকারে কল্পিতাকার অপররূপ-বান্ হইয়া পরমাকাশে অবস্থান করেন। শাস্ত্রকারেরা ইহাকে বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও সিদ্ধি, এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বলোক পিতামহ ও ব্রহ্মা এই আখ্যায় অভিহিত করেন। পরমাকাশসম্ভূত ও দ্রবীভূত কনকপ্রভ এই হিরণ্যগর্ভ কখন কখন চিত্তলীলাদ্বারা আপনাতে মোহ উৎপাদন করেন। কখন কখন পারবর্জ্জিত (অসীম) পরমব্যোম স্বরূপে, কখন বা অনাদিমধ্যান্ত (আদি মধ্য ও অন্ত নাই, এমন এক অখণ্ড) নির্ম্মল সলিলরূপে, কখন বা ভাস্বরজ্বালাজালবিমণ্ডিত কল্পান্ত-কালীন হুতাশনরূপে, কখন হরিদ্বর্ণ কানন সম্পন্ন ভুবনরূপে ও কখন বা ভুবনপালক কনককুণ্ডলবান্ বিষ্ণুস্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি স্বয়ং স্বলীলাক্রমে স্থলজলাদিসম্পন্ন ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপালক বিষ্ণু-

স্বরূপে অবস্থিতি করতঃ আপনাকেই আপনি পালন করিয়া থাকেন।

ত্রিকালদর্শী অমলজ্ঞান প্রভু ব্রহ্মা আত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মপদ হইতে প্রথমে উক্ত ক্রমে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত (আত্মভাব বিস্মৃত) ও অণ্ডগর্ভে নিদ্রিত হন। পরে নিদ্রা অপগত হইলে, স্বীয় বিস্তৃত ভাস্বর দেহ সন্দর্শন করিতে থাকেন[৩১।৩৭]। প্রাণ ও অপান প্রভৃতি বায়ু সমূহের প্রবাহযুক্ত, ভূতপঞ্চকে বিনির্ম্মিত, রোমকোটিদ্বারা সমাকীর্ণ, দ্বাত্রিংশৎ দশনান্বিত, ত্রিস্থূণ, (উরুদ্বয় ও কশেরু) পঞ্চদেবের আধার (পঞ্চ প্রাণকে পঞ্চ দেব কহে) চরণলাঞ্ছিত, পঞ্চভাগে বিভক্ত (পাণি, পাদ, মস্তক, বক্ষঃ ও কুক্ষি, এবংবিধ পঞ্চভাগ) নবদ্বার যুক্ত, ত্বক্‌প্রলিপ্ত, মসৃণ, বিংশতি নখলাঞ্ছিত, বিংশতি অঙ্গুলি পরিশোভিত; দ্বিবাহু, দ্বিস্তন, দ্বি অক্ষি ও দ্বি কর্ণ, সংযুক্ত ঐ দেহ চিত্তরূপ বিহঙ্গমের নীড়, তৃষ্ণারূপ পিশাচীর নিলয়, জীবরূপ কেশরীর কন্দর, অভিমানরূপ মাতঙ্গের আলান (বন্ধনস্তম্ভ) ও মানরূপ পদ্মের সরোবর স্বরূপ।

অনন্তর তিনি আপনার [illegible] রমণীয় দেহ সন্দর্শন করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন যে, এই শ্যামবর্ণ [illegible] ও বিস্তৃত আকাশ-কুহরে আমার উৎপত্তির পূর্ব্বে কি বিদ্যমান [illegible] ত্রিকালদর্শী, অপ্রতিহতজ্ঞান ও সদ্যোজাত ভগবান্ ব্রহ্মা ঐরূপ চিন্তাপরায়ণ হইলে, অতীতসৃষ্টিপরম্পরা তদীয় জ্ঞানে আবির্ভূত হয়। ধ্যাননিরত চিত্তে তিনি সৃষ্টিপরম্পরা সন্দর্শন করিয়া ক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই স্মরণ ও সঙ্কল্প দ্বারা প্রজা সমুদায়ের সৃজন অর্থাৎ কল্পনা করেন[৩৮।৪৩]। তদনন্তর তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যাভূত বিবিধ আচারপরম্পরা ও চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্র সমূহের কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

হে রঘুনাথ! যেমন মধুমাসের আগমনে পুষ্পশোভা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ন্যায় মনোনামধারী বিরিঞ্চি হইতে সৃষ্টিশোভা সমাগত হইয়াছে। হে রঘুসুত! পদ্মজরূপধারী মনঃ কর্ত্তৃক এই সর্গলক্ষ্মী সমানীত হইয়াছে এবং বিবিধ বিরচনক্রিয়াবিলাসাদির দ্বারা ইহা স্থিতি প্রাপ্তও হইয়াছে[৪৭।৪৯]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ উৎপন্ন বস্তুর ন্যায় হইলেও বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় নাই। ইহা শূন্যকল্প ও প্রতিভাসাত্মক সুতরাং ইহার স্থিতিও মনোবিলাস মাত্র[১]। এই ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারা দেশ বা কাল কিছুই আবৃত বা ব্যাপ্ত নহে। ইহা বৃহৎ ও রূপসম্পন্ন হইলেও নিস্তত্ব ও আকাশরূপী[২]। ইহা সঙ্কল্পময় ও স্বপ্নপুরীর সমান। ইহা যাহাতে অবস্থিত তাহাও শূন্যকল্প, কেবল ও ব্যোমরূপী[৩]। দৃষ্ট হইতেছে সত্য; পরন্তু ইহা আধার পট ও রঙ্গদ্রব্যরহিত চিত্রের সমান। ইহা অকৃত হউক আর কৃত হউক, এই সৃষ্টিশ্রী নভোমণ্ডলে বিচিত্র চিত্রের সমান অর্থাৎ ভ্রান্তিদৃষ্টিতে সমুদিত। ভুবনত্রয় ও তদন্তর্গত দেহাদি সমস্তই মনঃকল্পিত (আদি মন হিরণ্যগর্ভ। ইহা তাঁহারই কল্পনাজাল)। অথবা স্মৃত বস্তুর সদৃশ[৪।৫]। জগৎ কেবলমাত্র আভাস। সুতরাং ঘটপটাদি দৃশ্য সমূহ কোন পৃথক্ বস্তু নহে[৬]। যেমন কোষকার কীট আত্মবন্ধনার্থ কোষ (গুটি) নির্ম্মাণ করে, তাহার ন্যায় আদি মন আপন বাসনার দ্বারা আত্মবন্ধনকোষস্বরূপ এই শরীর রচনা করিয়াছেন[৭]। এমন দুষ্কর দুর্গম্য বা দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই যাহা চিত্ত কর্ত্তৃক কৃত গম্য বা প্রাপ্ত না হয়[৮]। এমন কোন শক্তি নাই যাহা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে নাই। অধিক বলা বাহুল্য; ফলতঃ এমন কিছুই নাই যাহা মনোগুহা আশ্রয় না করে। সর্ব্বশক্তি বিভুমহাপুরুষে সমস্ত পদার্থেরই সত্তা সম্ভাবিত হয়[৯।১০]। নিদর্শন এই যে, মন কল্পনাদ্বারা আত্মজ বপু প্রাপ্ত হয়। হে মহাভুজ রাম! প্রোক্ত কারণে কল্পনাকেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলা যায়[১১]। কি অসুর, কি নর, কি অমর, সকলেই সংকল্পের প্রভাবে সমুৎপন্ন হইতেছেন এবং সঙ্কল্প উপশমে সকলেই নিঃস্নেহ দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইতেছেন[১২]। হে মহাবুদ্ধি রাম! জগৎকে তুমি আকাশ সদৃশ, কল্পনার বিজৃম্ভণ ও দীর্ঘ স্বপ্নের সমান বলিয়া জানিবে[১৩]। সত্য সত্যই ইহার কিছুই জাত ও মৃত হয় না। যাহা অসত্য তাহার আবার

হওয়া যাওয়া কি? যাহার পরমত্ব নাই তাহা মিথ্যা[১৪]। ইহার বৃদ্ধি নাই, হ্রাসও নাই। যাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই তাহার খণ্ডন (টুক্‌রা টুক্‌রা হওয়া পরিচ্ছিন্ন হওয়া) অসম্ভব[১৫]। হে রাঘব! তুমি মোহের বশ্য হইও না।, তুমি যদি নিপুণ হইয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার ঐ কায়া হইতে সেই ভূমা বস্তু (ব্রহ্ম) উদ্ভূত হইয়াছেন। (ভাবার্থ এই যে, দেহাভিমান ত্যাগ হইলে তখন পরিপূর্ণ চিদ্ব্রহ্মই দৃষ্ট হন)[১৬]। যেমন্ তাপ হইতে মৃগতৃষ্ণিকার উদয়, তাহার ন্যায় মনের নিশ্চয় হইতে অসত্য ব্রহ্মাদি তৃণান্ত জগতের উত্থান[১৭]। যেরূপ দোষদুষ্ট দৃষ্টি নভোমণ্ডলে দ্বিচন্দ্র দর্শন করে, নৌকারোহীরা যেমন তীর-বর্ত্তী বৃক্ষের প্রচলন দর্শন করে, সেইরূপ, অজ্ঞেরাই এই মনোরথবপুঃ মিথ্যা জগৎকে আকৃতিমৎ বিবেচনা করে[১৮।১৯]। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি মনের মনননির্ম্মিত এই অসন্ময় জগৎকে ইন্দ্রজালের বা শাম্বরিকী মায়ার ন্যায় জানিবে[২০]। জগৎ যখন মনোরচিত, তখন অবশ্যই অব-ধার্য্য হইতেছে, এ সমস্তই মনের অপগমে ব্রহ্ম। যে হেতু সমস্তই ব্রহ্ম, সেই হেতু পদার্থান্তরের অস্তিতা অসম্ভব[২১]। "এই স্থাণু" "এই পর্ব্বত" এরূপ এরূপ বোধ বিভ্রম সমুত্থিত ও মনোভাবনার দৃঢ়তা মূলক। সুতরাং এ সকল অসৎ। যাহারা অবিবেকী, কামী ও ভোগ-তৃষ্ণার ব্যাকুল, তাহাদেরই মনে জগতের স্থিতি ও স্বর্গনরকাদির আরম্ভ দেখা যায়। হে রামচন্দ্র! সেই কারণে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, অজ্ঞজনগণের মননীভূত জগৎ পরিত্যাগ করিয়া যাহা জগদ্ভ্রমের আধার (ব্রহ্ম) তাহারই ভাবনা কর[২২।২৩]। যেমন মহা আড়ম্বর যুক্ত স্বপ্ন ভ্রান্তি বৈ সত্য নহে, তাহার ন্যায় এই দীর্ঘস্বপ্নসদৃশ চিত্তপরিকল্পিত বৃহৎ জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া জানিবে[২৪]। এই সংসারাড়ম্বর আশাভুজঙ্গের বসতি স্থান। সেজন্য ইহার পরিত্যাগ বিধেয়[২৫]। "ইহা অসৎ" এই-রূপ জ্ঞান করিবে এবং কদাচ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করিবে না। কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক জানিয়া শুনিয়া মৃগতৃষ্ণিকার অনুধাবন করে[২৬]। যে ব্যক্তি সঙ্কল্প-সমুত্থিত আপাতরমণীয় মনোরথময়ী ভোগশ্রীর অনুগমন করে, সেই মূঢ় দুঃখভাজন হয়[২৭]। যে ব্যক্তি বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অবস্তু কামনা করে, সে বস্তু প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হয়[২৮]। রজ্জুকে সর্প ভাবে গ্রহণ করিলেই ভয় কম্পাদি জন্মে। তাহার

ন্যায় ইহাকে জগদ্ভাবে গ্রহণ করিলেই স্বর্গনরকাদি ভোগ হয়[২৯]। ইহার স্থায়িত্বও ভাবনার অনুরূপে নিষ্পন্ন। জলান্তর্গত চন্দ্রচাঞ্চল্যের ন্যায় মিথ্যা সমুদিত ভাব বিশেষ দ্বারা মূর্খেরাই প্রতারিত হয়। পরন্তু ভবাদৃশ প্রাজ্ঞগণ প্রতারিত হন না[৩০]। বহ্নি ভাবিয়া তুষারস্তূপে শীত নিবারণের চেষ্টা আর গুণসংঘাত দেহে সুখ লাভের চেষ্টা সমান জানিবে[৩১]। এই জড়পঞ্জর দেহাদি অসৎ ভোগপ্রদ। হৃদয়ে নগর নাই, অথচ মন তন্মধ্যেই নগর নির্ম্মাণ করিয়া সুখ দুঃখের কল্পনা করে[৩২]। অতএব, গন্ধর্ব্বনগরাকার মিথ্যাভূত এই জগৎ কেবল চিত্তের ইচ্ছাতেই পরিবর্ত্তিত ও চিত্তের অনিচ্ছাতেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে। গন্ধর্ব্বনগর (ভ্রান্তি বিশেষ) যেমন কল্পনা মাত্রে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় ইহাও কল্পনা মাত্রে আরূঢ় হইয়া দৃষ্ট হইতেছে[৩৩]। হে রামচন্দ্র! প্রোক্ত কারণে ইহার বিনাশে জ্ঞানীর কিছুই বিনষ্ট হয় না এবং ইহার অবস্থিতিতেও জ্ঞানীর কিছুমাত্র স্থিতিলাভ করে না[৩৪]। মন যে হৃদয় মধ্যে নগর নির্ম্মাণ করে, তাহা সমৃদ্ধ হইলেই বা কি? ভগ্ন হইলেই বা কি[৩৫]? যেমন ক্রীড়াসক্ত বালকদিগের হৃদয়ে পুত্তলিকা বিবাহাদি কল্পনার উদয় হয়, সেইরূপ, প্রোক্ত মন হইতে অনবরত জগতের উদয় হইতেছে[৩৬]। যেমন ঐন্দ্রজালিক জলবর্ষণে কাহার কিছু নষ্ট ভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হয় না, যেমন পুত্তলিকা ব্যবহার বিষয়ে বালকদিগের শোকাদি হয় না, তাহার ন্যায় জগতের উদয়ে ও নাশে জ্ঞানী দিগের শোক বা অভাব বোধ হয় না[৩৭]। যাহা অসৎ তাহার অসত্তায় কাহার কি ক্ষতি হয়? তাহা হয় না। অতএব, সংসারে হর্ষের ও বিষাদের স্থান বা বস্তু নাই[৩৮]। যাহা অত্যন্ত অসৎ তাহারও বিনাশ নাই। যাহা নাই তাহার আবার বিনাশ কি? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে দুঃখশোকাদির অবসর কোথায়? যাহা নিতান্ত সৎ অর্থাৎ অনশ্বরস্বভাব তাহারও নাশ নাই। সুতরাং তাহাও সুখদুঃখের স্থান বা কারণ নহে[৩৯।৪০]। যাহা সর্ব্বদা অসৎ তাহার আবার হ্রাস বৃদ্ধি কি? যদি হ্রাস বৃদ্ধি না থাকে তাহা হইলে তজ্জনিত হর্ষবিষাদের প্রসঙ্গ কি[৪১]? অতএব, এই অসত্যভূত মিথ্যা ও প্রপঞ্চভূত সংসারে এমন কি উপাদেয় আছে, যাহা প্রাজ্ঞগণের বাঞ্ছনীয়[৪২]? যখন সর্ব্বময় ও সত্যভূত ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু এবং তাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তখন আর এমন কি হেয়

আছে, যাহা প্রাজ্ঞগণের বর্জ্জনীয়[৪৩] ? মূর্খগণই এই সংসারে বিনাশ-জনিত শোকদুঃখে অভিভূত হয়, প্রাজ্ঞগণ তাহাতে (সুখদুঃখে) লিপ্ত হন না[৪৪]। যাহা পূর্ব্বে কখন উৎপন্ন হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, বুঝিতে হইবে—তাহা বর্ত্তমানেও নাই। যে ব্যক্তি ঐরূপ বিচার করিয়াও অসতের বাঞ্ছা করে তাহার অসত্তাই দৃষ্ট হয়। যাহা আদৌ সত্য এবং অন্তেও সত্য তাহা বর্ত্তমানেও সত্য, যিনি এইরূপ জ্ঞান করেন অর্থাৎ জানেন, তাঁহার দর্শনে সমস্তই সর্ব্বদা সৎ (পূর্ব্বোক্ত অসৎ জগৎ এবং সম্প্রতি উক্ত সৎ ব্রহ্ম)[৪৫।৪৬]। অতএব, হে রামচন্দ্র! বালকেরাই অর্থাৎ অবোধ মনুষ্যেরাই অসত্যভূত জলচন্দ্রের বাসনা করে, উত্তম ব্যক্তিরা অর্থাৎ অভিজ্ঞ লোকেরা তাহা করে না[৪৭]। বালকগণই বিস্তৃতাকার অবস্তু নির্ম্মাণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগের সেই অচিরস্থায়ী সন্তোষ সুখের নিমিত্ত হয় না। পরন্তু কষ্টের নিমিত্তই হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞগণ কখনই সেইরূপ অনর্থ সন্তোষের বাসনা করেন না। হে রাজীবলোচন! তুমি বালকের ন্যায় হইও না। সর্ব্বদা সুস্থিরচিত্ত হইয়া, অবিনশ্বর আত্মাকে সন্দর্শন কর। জগতের ন্যায় আমার দেহও অসৎ এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইহার বিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ কর। অথবা এই জগৎ আমার ন্যায় সৎ, এইরূপ বিচার করিয়া নাশ ভয় পরিত্যাগ কর[৪৮।৫০]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ এইরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে ভগবান্ সহস্ররশ্মি অস্তাচলশিখরে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠদেব সায়ন্তন কার্য্য সাধনার্থ সভা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সভ্যগণও পরস্পর অভিবাদনাদি করতঃ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলনে। পর দিন সূর্য্যোদয় ইহলে সকলেই আবার সভায় আগমন করিলেন[৫১]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আপাতরমণীয় ধনে ও পুত্রদারাদিতে শোকের অবসর কৈ? অর্থাৎ তাহা শোক স্থান নহে। ইন্দ্রজালের ক্ষণবিধ্বংসিতা দেখিয়া কে কবে রোদনাদি করিয়াছে[১]? স্ত্রীপুত্রগণ গন্ধর্ব্বনগরের স্থায় অসৎ ও অবিদ্যার অংশ। সুতরাং তাহারা ভূষিত হউক, আর দূষিত হউক, সুখদুঃখের বিষয় নহে[২]। মৃগতৃষ্ণানদী পরিবর্দ্ধিত হইলে সলিলার্থীর তাহাতে আনন্দ কি? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়[৩]। সেইরূপ ধনপুত্রাদি পরিবর্দ্ধিত হইলে কেবল দুঃখই পরিবর্দ্ধিত হয়; সন্তোষ পরিবর্দ্ধিত হয় না। কোন্ মূঢ় মহামোহের পরিবর্দ্ধনে আশ্বস্ত হয়[৪]? যাহাতে মূর্খগণের রাগ—প্রাজ্ঞগণের নিকট তাহা বি[illegible]নে[৫]। হে রাঘব! নশ্বরস্বভাব ধনাদিতে হর্ষের উপাদান কি আছে? [illegible]গণ ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ করেন, হর্ষ বিষাদ অনুভব করেন না[৬]। অতএব, হে রাঘব! তুমিও এই সংসার ব্যবহারের তত্ত্বজ্ঞ হও, হইয়া নষ্টকে উপেক্ষা কর এবং প্রাপ্তকে (সদা প্রাপ্ত আত্মাকে) গ্রহণ কর[৭]। পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, অনাগত ভোগের বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও আগত অর্থাৎ বর্ত্তমান ভোগে ভোক্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন করা। উক্ত লক্ষণ দ্বয় যুক্ত পণ্ডিত পুরুষ দুঃখদায়িনী মোহপ্রদায়িনী ভ্রমময়ী সংসার ভূমিতে প্রবুদ্ধ থাকিয়া এইরূপে বিহার করেন[৮]—যাহাতে মূঢ়তা আক্রমণ করিতে না পারে। তুমিও আততায়ী সংসার ভ্রমে এরূপ প্রবুদ্ধ থাকিবে—যেন মূঢ়তা আগমন না করে[৯]। প্রাজ্ঞগণ এই সংসারাড়ম্বর দর্শন করেন না, প্রপঞ্চরহিত তত্ত্বজ্ঞানকেই সম্যক্ দর্শন গোচরে রাখেন। যাহারা সংসারে মুগ্ধ হয়, তাহারা অতি কুবুদ্ধি[১০]। "ইহা অসৎ" যিনি এইরূপ জানিয়া বিষয়ের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, অবাস্তবী অবিদ্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। যে কোন যুক্তি অবলম্বনে দৃশ্য মিথ্যার অনুশাসন করিতে পারিলে বিষয়াস্থা নিবৃত্ত হয় ও বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য বাড়িতে থাকে[১১]। "আমিই অখিল জগৎ" যাঁহার বিমল-

বুদ্ধি এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা বিভূষিত, তাহারই বিষয়াস্থা বিনষ্ট হয় সুতরাং তিনি কখনই ভবসাগরে নিমজ্জিত হন না[১২।১৩]। হে সুমতে! তুমি সৎ ও অসৎ এই দুয়ের মধ্যগত শুদ্ধ সন্মাত্র বুদ্ধি অবলম্বন অর্থাৎ মাধ্যস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক বাহ্যাভ্যন্তরস্থ দৃশ্য নিচয়ের গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবে না[১৪]। সর্ব্বদা উদাসীন থাকিবে। তুমি কার্য্যবান্ হও তাহাতে ক্ষতি নাই, পরন্তু তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত, স্বস্থ, বাসনাবিবর্জ্জিত ও নভোমণ্ডলের ন্যায় নীরাগ হইয়া অবস্থান করিবে। যে কর্ম্মনিষ্ঠ প্রাজ্ঞের ভোগে ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দুয়ের কিছুই নাই, সে সলিলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় ভোগদ্বারা বা কর্ম্মদ্বারা বিলিপ্ত হয় না[১৫।১৬]। তোমার ইন্দ্রিয়গণ দর্শন বা স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্য করুক বা না করুক; তুমি সে সমুদায়ে অনিচ্ছু ও আত্মবান্ হও[১৭]। তোমার কিছু করুক আর না করুক, তুমি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মমত্ব বন্ধন করতঃ নিমগ্ন হইও না। কেননা "ইহা আমার" এ বোধ অসৎ। হে রামচন্দ্র! যখন তোমার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়ার্থশ্রী আস্বাদিত না হইবে, (ঐন্দ্রিয়ক সুখ ভুলিয়া যাইবে), তখনই তুমি বিজ্ঞাত-বিজ্ঞান ও ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে[১৮।১৯]। ইন্দ্রিয়সুখ আস্বাদনের পর তাহাতে যদি অরুচি জন্মে, তাহা হইলে ইচ্ছা না করিলেও মুক্তি সুসম্পন্ন হইবে[২০]। তুমি প্রজ্ঞাবলে চিত্তকে বাসনা হইতে পৃথক্ করিবে। যিনি বাসনাম্বুপরিপ্লুত সংসারসমুদ্রে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণী আরোহণ করিয়াছেন, তিনিই ইহা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে সমর্থ; অপরে নহে[২১।২২]। 'তুমি ক্ষুরধার অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উদার বুদ্ধি অবলম্বন ও ধৈর্য্য সহকারে আত্মতত্ত্ব বিচার কর, পরে স্বীয় পদে প্রবেশ কর[২৩]। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানপ্রবর্দ্ধিতচিত্ত জীবন্মুক্ত প্রাজ্ঞ তত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপে আহার বিহারাদি করেন, তুমি তদ্রূপে আহার বিহারাদি ব্যবহার করিবে। মূঢ়েরা যেরূপে করে, সে রূপে করিবে না[২৪]। তুমি আচার বিষয়ে জীবন্মুক্ত মহাত্মা ও মহাবুদ্ধিধর দিগেরই অনুগামী হইবে। ভোগলম্পট দিগের অনুগামী হইও না[২৫]। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা জগত্তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা জগদ্‌গত কোনও ব্যবহার ত্যাগ বা বাঞ্ছা করেন না। পদার্থের উপস্থিতি অনুযায়ী সমুদায় ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হন। তত্ত্বদর্শীরা প্রভুত্বাভিমানের যশ ও ভোগলক্ষ্মীর অভিলাষী হন

না[২৬।২৭]। তাঁহারা সর্ব্বনাশে ক্ষিন্ন ও দেবোদ্যানে হৃষ্ট হন না। তাঁহারা নিয়তির অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগের অনুবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করেন[২৮]। তাঁহারা দেহরূপ রথে অবস্থান করতঃ ইচ্ছাবিহীন হইয়া যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্ত্তনা করেন[২৯]। হে রাম! তুমিও বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছ; প্রজ্ঞাবলে স্বস্থতা লাভ করিয়াছ, সুস্পষ্ট দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ, নির্ম্মল ও মৎসররহিত হইয়াছ। তাই তোমাকে বলিতেছি, তত্ত্বদর্শিগণের ন্যায় ভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিহরণ কর, তাহাতে তোমার সিদ্ধি প্রাপ্তির বাধা হইবে না। হে অনঘ! তুমি সমুদায় বাঞ্ছিত বিষয় পরিত্যাগ ও কৌতুক দর্শন বাসনা পরিহার করতঃ স্বস্থ ও পরম শীতল হইয়া মহীতলে বিচরণ কর[৩০।৩২]।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! বিমলাশয় মহামুনি বশিষ্ঠ এই প্রকার আশ্বস্ত বাক্যে রামচন্দ্রকে সমাশ্বাসিত করিলে মহামতি দশরথাত্মজ সেই সকল বাক্যদ্বারা পরিমার্জ্জিতান্তঃকরণ হইয়া দর্পণের ন্যায় প্রভা প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই জ্ঞানামৃতময় মধুর উপদেশদ্বারা বিরাজিতান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় পরম শীতলতা প্রাপ্ত হইলেন[৩৩]।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

——()*()——

অতঃপর রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে "হে বেদবেদাঙ্গপারগ হে সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদ হে তত্ত্ববিদ্ হে ভগবন্!" এইরূপ সম্বোধন করতঃ বলিলেন, আমি ভবদীয় নির্ম্মল বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মবিকাশকারী জ্ঞানপ্রভ সূর্য্যবৎ সমুদিত উদার বাক্যপরম্পরা দ্বারা আশ্বস্তপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছি। আপনার এই বিবিক্ত বিবিধ যুক্তিযুক্ত সুনির্ম্মল উপদেশবাক্যরূপ অমৃত শ্রবণপাত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না। অপিচ, হে ভগবন্! আপনি রাজসিক ও সাত্ত্বিক জীব জাতির ও কমলোদ্ভব পিতামহের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলেন, উহা পুনর্ব্বার সুস্পষ্টরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন১।৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র, সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়া গিয়াছেন। এখনও এই ব্রহ্মাণ্ডে ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধাচার সুরাসুর বিরাজ করিতেছেন। এবং ভবিষ্যতেও অনন্তব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভূরি ভূরি সুরাসুরগণ আচার বিচার সম্পন্ন হইবেন৪।৬। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি দেবগণের সৃষ্টি ইন্দ্রজালের ন্যায় বিচিত্র৭। সেই সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি সৃষ্টি শিবকর্তৃক, কতকগুলি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক, কতকগুলি বিষ্ণুকর্ত্তৃক ও কতকগুলি মুনিগণদ্বারা উদ্ভাবিত৮। ব্রহ্মা কখন পদ্ম হইতে, কখন সলিল হইতে, কখন অণ্ড হইতে ও কখন বা আকাশ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন৯। কোন ব্রহ্মাণ্ডে শিব, কোন ব্রহ্মাণ্ডে বাসব, কোন ব্রহ্মাণ্ডে পুণ্ডরীকাক্ষ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য কর্ত্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন১০। কোন সৃষ্টিতে পৃথিবী তরুগণে নিবিড়িত, কোন সৃষ্টিতে নরগণে পরিপূর্ণ, কোন সৃষ্টিতে ভূধরগণে পরিবৃত১১। কোন সৃষ্টির পৃথিবী মৃত্তিকাময়ী, কোন সৃষ্টির প্রস্তরময়ী, কোন সৃষ্টির হেমময়ী ও কোন সৃটির তাম্রময়ী১২। যেমন এতদ্ব্রহ্মাণ্ডে আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা নাই,

এইরূপ অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও জানিবে। কত শত সূর্য্যাদির ন্যায় প্রকাশ পদার্থ ও কত শত অপ্রকাশময় পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে তাহারও ইয়ত্তা নাই[১৩]। যদ্রূপ সমুদ্রে লহরীমালার উদয় ও লয় হয় তাহার ন্যায় এক ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাকাশে অসংখ্য জগৎ-পরম্পরা কখন আবির্ভূত ও কখন তিরোভূত হইতেছে[১৪]। বিশ্বশ্রী সমুদ্রে তরঙ্গের ও মরুভূমিতে মৃগসরিতের ন্যায় পরব্রহ্মেই বিদ্যমান, অন্যত্র নহে। যেমন সূর্য্যরশ্মিস্থ ত্রসরেণু অসংখ্যেয়, তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডজালও অসংখ্যেয়[১৫।১৬]। যেমন মশককুল বর্ষাকালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসৃষ্টিও কালে কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে[১৭]। উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মা সৃষ্টিপরম্পরা যে কবে বা কোন্ কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা কাহার জ্ঞানগম্য হয় না[১৮]। কোন্ তরঙ্গটী প্রথম? কোন্ সময়ে তরঙ্গের প্রথমারম্ভ? তাহা যেমন জানা যায় না, সেইরূপ, সৃষ্টিতরঙ্গেরও প্রথমতা বা আদিমত্ব জানা যায় না। এইমাত্র জানা যায়—সৃষ্টি উৎপন্ন পদার্থ বটে; পরন্তু তরঙ্গের ন্যায় অনাদি প্রবাহে প্রবাহিত। (যেমন এক তরঙ্গের উত্থান, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গের পতন, তাহার ন্যায় এক সৃষ্টির আবির্ভাব, তৎপূর্ব্বসৃষ্টির তিরোভাব, এইমাত্র তথ্য বুদ্ধিস্থ করা যায়) ভাবিতে গেলে, এ সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অন্য সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টির পূর্ব্বেও তদ্রূপ অন্য সৃষ্টি ছিল, এরূপ অনাদিভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৯]। যেমন নদীর তরঙ্গ হয় আর যায়, তাহার ন্যায় সুরাসুর প্রভৃতি অসংখ্য ভূতজাল পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও বিলীন হইতেছে[২০]। যেমন বৎসরে সহস্র সহস্র ঘটিকা অতিবাহিত হইতেছে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বে সহস্র সহস্র ব্রহ্মা, ইন্দু ও ব্রহ্মাণ্ড পরিক্ষীণ হইতেছে[২১]। এই ব্রহ্মপুরের অর্থাৎ ব্রহ্ম-সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে বিস্তৃত ব্রহ্মস্থান, তাহাতে এইরূপ অনেক অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড পঙ্ক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে[২২]। যদ্রূপ শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মে অন্যান্য ব্রহ্মপুরী (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে[২৩]। মৃৎপিণ্ডে ঘটের ও অঙ্কুরে পল্লবের অবস্থিতির ন্যায় ব্রহ্মাকাশেই সৃষ্টিপরম্পরা বিলীন হইয়া থাকে, কালে তাহা প্রকটতা প্রাপ্ত হয়[২৪]। ব্রহ্মচিদাকাশে অনন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডপঙ্ক্তি দৃষ্ট হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে[২৫]। সে সকল

মূর্খপরিকল্পিত আকাশলতার ন্যায় অসত্য। মূর্খেরা বুঝিতে অক্ষম হইয়াই সে সকলের সত্যতা অনুভব করে[২৬]। সৃষ্টিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণের দৃষ্টি এই যে, এই বিচিত্রাকার ব্রহ্মাণ্ডপঙ্ক্তি জলদ হইতে বৃষ্টির ন্যায় পরব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত হয় এবং যেমন সলিল ও বৃষ্টি উভয় অভিন্ন বা একই বস্তু, তাহার ন্যায় সৃষ্টি ও ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ এক বা অভিন্ন। অপিচ, সৃষ্টি উৎকৃষ্টই হউক বা নিকৃষ্টই হউক, তাহা যে পরমাকাশ হইতে উৎপন্ন সে বিষয়ে সংশয় নাই[২৭।৩১]।

হে রামচন্দ্র! কোন কল্পে প্রথমে নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হয়, পরে সেই ব্যোম হইতে ব্যোমজ প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হন[৩২]। কোন কোন কল্পে প্রথমে বায়ু আবির্ভূত হয়, পরে সেই বায়ু হইতে বায়ুজ প্রজাপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন[৩৩]। কখন প্রথমে তেজের সৃষ্টি হয়, পরে সেই তেজ হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হন[৩৪]। কখন প্রথমে বারির সৃষ্টি হয়, পরে সেই বারি হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা বারিজ নামে উৎপন্ন হন[৩৫]। কখন বা প্রথমেই পৃথিবী স্ফারতা প্রাপ্ত অর্থাৎ আবির্ভূত হয় সুতরাং সেই পৃথ্বী হইতে পার্থিব প্রজাপতি আবির্ভূত হন[৩৬]। যখন প্রত্যেক ভূত অপর চারি ভূতের অংশ গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, অর্থাৎ স্থূল হইতে থাকে তখন সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি তদ্দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে প্রবৃত্ত হন (স্থূল সৃষ্টি বা ব্যবহার যোগ্য সৃষ্টি আরম্ভ করেন)[৩৭]। * পূর্ব্বকল্পে উপাসনাপ্রভাবে প্রকৃতিলীন উপাসক-আত্মা এতৎকল্পে আপনার বাসনানুযায়ী ভাবে আবির্ভূত হওয়ার নিয়ম থাকায় কেহ বায়ুর আধিক্যে, কেহ তেজের আধিক্যে, কেহ বা জল ভূতের আধিক্যে অহং-অভিমানধারী হন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সেই সেই ভূতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা

---

* তন্মাত্রাময়ী পৃথিবী স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি তন্মাত্রাত্মক ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য স্থূল হয়। এইরূপ জল স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, তেজ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, বায়ু স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ, আকাশ স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য চারি ভূতের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ গ্রহণ করতঃ পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য স্থূল হয়। এইরূপে স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়, তৎপরে সূক্ষ্মভূতোৎপন্ন প্রজাপতির কর্তৃত্ব প্রকট হয়।

যায়[৩৮]। অনন্তর সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতির দেহাবয়ব হইতে সৃষ্টি পরম্পরা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার ক্রম এই যে, তাঁহার মুখাবয়ব হইতে ব্রাহ্মণাদি শব্দ এবং সে সকলের অর্থ অর্থাৎ তজ্জাতীয় মনুষ্যাদি উৎপন্ন হয়। কোন কোন কল্পে পদাবয়ব হইতে, কোন কোন কল্পে পুরোভাগ হইতে এবং কোন কোন কল্পে পশ্চাদ্ভাগ হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়। কোন কোন কল্পে নেত্রভাগ হইতে এবং কখন বা হস্তাবয়ব হইতে সৃষ্ট্যারম্ভ হয়[৩৯]। কোন কোন কল্পে সেই নারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিভাগে প্রথমতঃ পদ্ম জন্মে, এবং তৎপদ্মে প্রজাপতি ব্রহ্মা পরিবর্দ্ধিত হন। পদ্মে পরিবর্দ্ধিত হন বলিয়া তাঁহাকে পদ্মজ পদ্মযোনি প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হয়[৪০]। রাম! অকস্মাৎ অর্থাৎ আপনাআপনি বা বিনা হেতুতে প্রজাপতির জন্ম ঘটনা কি প্রকারে হইতে পারে? এরূপ আপত্তি হইতেই পারে না। কারণ এই যে, সমস্তই মায়ার প্রভাব। মায়ার রচনা স্বপ্নের ন্যায় ও ভ্রান্তির ন্যায় মিথ্যা। মায়ার রচনা মনোরাজ্যের অনুরূপ[৪১]। যদি আপনারই নাভিপদ্মে আপনার জন্ম সম্ভব হয় ত * অসঙ্গস্বভাব জ্ঞপ্তিরূপ ব্রহ্মে জগদাকার আবির্ভূত হয় এ তথ্য অসম্ভব হইবে কেন? বালকের মনোরাজ্য (খেয়াল) হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর[৪২]। কখন কখন মনস্তত্ত্বের অনুরঞ্জনায় সেই শুদ্ধ নির্ম্মল চিদাকাশে আপনা আপনি সুবর্ণময় ব্রহ্মগর্ভ অণ্ডস্বরূপে আবির্ভূত হয়[৪৩]। কখন বা সেই মনোনামক পুরুষ আপনাকে জলরূপে সৃষ্ট করিয়া আপনিই তাহাতে বীজরূপী হন ও সেই সলিলে সেই বীজ (সৃষ্টিবীজ) রোপন করেন। তাহাতে সেই বীজ কখন পদ্মাকারে কখন বা অণ্ডরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড নামে বিখ্যাত হয়[৪৪]। সেই অণ্ড হইতে কখন ব্রহ্মা, কখন ভাস্কর, কখন বরুণ, কখন বায়ু প্রজাপতি নাম

---

* নারায়ণ ও ব্রহ্মা তত্ত্বতঃ একই পদার্থ। অতত্ত্ব অর্থাৎ মায়িক উপাধি অনুসারে ঐ একের দ্বিত্ব কল্পনা হয়। আপনার নাভিপদ্মে আপনার আবির্ভাব, এ কথা ঐ ভাবের কথা। যেমন আত্মা এক পরন্তু শরীর ভিন্ন বলিয়া পিতা ও পুত্র এই সংজ্ঞা জন্মে তেমনি। শাস্ত্রকারেরা বলেন; "আত্মা বৈজায়তে পুত্র", আত্মাই পুত্র রূপে জন্মেন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তাহার ন্যায় নারায়ণই ব্রহ্মা হন, বা নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মার একটা উপাধি মাত্র বৃদ্ধি হয়, অন্য কিছু হয় না।

ধারণ করতঃ আবির্ভূত হন[৪৫]। হে রাম! এইরূপে একাদ্বয় প্রত্যক্ আত্মায় এবম্বিধা অসতী ও বিচিত্রা সৃষ্টিপরম্পরা ও ব্রহ্মার বিচিত্র উৎপত্তিপরম্পরা অতীত হইয়াছে[৪৬]। আমি তোমার নিকট দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত একটীমাত্র প্রজাপতির উৎপত্তি বর্ণন করিলাম। ফলতঃ সৃষ্টিবিষয়ে কোন নিয়ম নাই[৪৭]। এই সংসার কেবল মনেরই বিজৃম্ভণ, এইমাত্র বুঝাইবার জন্য সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম। বস্তুতঃ সৃষ্টির কোন নিয়ত ক্রম বা উদ্দেশ্য নাই[৪৮]। সৃষ্টি কল্পনার মধ্যে আমি যে সাত্বিকী রাজসী প্রভৃতি জাতি ও বর্ণ বিষয়ক বর্ণনা করিয়াছি, তাহাও ঐরূপ জানিবে[৪৯]।

সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হয়। কেবল সৃষ্টি নহে, কি সৃষ্টি, নাশ, সুখ, দুঃখ, কি অজ্ঞত্ব, কি জ্ঞত্ব, কি বন্ধ, মোক্ষ, স্নেহ, অস্নেহ, সকলই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে[৫০,৫১]। দেহাদির উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত দীপের উৎপত্তি বিনাশ উপমিত হয়। দীপ অল্পকাল স্থায়ী, ব্রহ্মার দেহ না হয় অধিক কাল স্থায়ী। ব্রহ্মার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ বিষয়ে ঐরূপ কালকৃত প্রভেদ ব্যতীত উৎপত্তি বিনাশ অংশে কোনরূপ প্রভেদ নাই[৫২]। সুতরাং এই উৎপত্তি ও বিনাশ ভাব পদার্থের অবস্থা বিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতেছে। জগৎও চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে[৫৩]। মন্বন্তরের আরম্ভ, সৃষ্টির আরম্ভ, কি কল্পপরম্পরার উদয়, নানা প্রকার কার্য্যদশা, দিবা ও রাত্রি, সমস্তই পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে আবর্ত্তিত প্রবর্ত্তিত নিবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রাতঃকাল গেল, আবার প্রাতঃকাল আসিল, এই দিন গেল, আবার দিন আসিল, এ সকল কেবল আন্তর পরিচ্ছেদ জনিত ভ্রান্তি মাত্র। বস্তুতঃই এ সমুদায়ই আন্তর। যেমন লৌহ পিণ্ডের আঘাতের অভাব কালে প্রস্তরে (চকমকীর পাথরে) বহ্নিকণা লুক্কায়িত থাকে, তাহার ন্যায় এই সমস্ত ভাব চিদাকাশে মায়া ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে[৫৪,৫৬]। তাই কখন ব্যক্ত কখন বা অব্যক্ত[৫৭]। যাহা চিদ্বিবর্ত্ত, তাহা সর্ব্বাত্মক। এবং তাহা সর্ব্বদা ঈদৃশী। যেমন লোচন হইতে দ্বিচন্দ্রের উদয় তাহার ন্যায় চিদ্বিবর্ত্ত হইতে সৃষ্টির উদয়[৫৮]। যেমন চন্দ্র হইতে মরিচিমালা

আগমন করে, তাহার ন্যায় চিৎ হইতে এই সমস্ত আগমন করিয়া তাঁহাতেই প্রতিভাত হয়[৫৯]। রাম! যদিও এই সংসার সেই সর্ব্বশক্তি চিদাত্মায় প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলেও তাহা কিছু নহে। কেননা, তাঁহাতে অসংসারশক্তিই সত্যরূপে বিদ্যমান। যে হেতু তাঁহাতে সংসার সত্যরূপে নাই সেই হেতু দৃষ্ট সংসার মিথ্যা। হে সাধো! এই জগৎকে আপাততঃ যে ভাবে দেখা যায়, এ ভাব ইহার প্রকৃত বা যথার্থ নহে। তবে এরূপ দেখা যায় কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, সর্ব্বশক্তিতার মধ্যে এরূপ সংসারশক্তিও নিহিত আছে, পরন্তু তাহার মর্য্যাদা বা সার চিৎশক্তি। যে হেতু চিৎশক্তিই সার, সেই হেতু জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা দর্শন করিলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সংসাররূপ দৃষ্ট হয় না। তাহা উপপন্নও হয় না। মোক্ষ হইলে সংসার থাকিবেক না, সুতরাং সংসারের অবধি বা সীমা মোক্ষ, এ কথাতেও বুঝা যায়, সংসার এখনও স্বরূপতঃ নাই। হেতু এই যে, সংসার অজ্ঞান বিরচিত বলিয়াই জ্ঞান তাহাকে বিদূরিত করে। যাহা বাস্তব সৎ পদার্থ তাহার বিনাশ অসম্ভব। তবে যে ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা সত্যব্রহ্মরূপ (অধিষ্ঠানের) আধারের মহিমা। সত্য ব্রহ্মে সংসারের আরোপ বলিয়া, সংসারের প্রতিও সত্যতা বোধের উদয় হয়[৬০।৬৩]। কিন্তু অজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কেবল অনবরত সংসাররূপই দৃষ্ট হইবে। অজ্ঞ দৃষ্টিতে অনবরত দৃষ্ট হয় বলিয়া এই সংসারমায়া প্রকারান্তরে নিত্যা, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মে বলিয়া সে ভাবে অনিত্যা। মীমাংসকেরা যে বলে, জগৎ-প্রবাহ নিত্য, তাহা উক্ত কারণ বশতঃ। দৃশ্যজাল বিদ্যুন্মালার ন্যায় অনারত উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, ইহা সহজে উপপন্ন করা যায় (যুক্তি দিয়া বুঝান যায়)। চিরকাল সমানরূপে ও সর্ব্বত্র সূর্য্য চন্দ্র উদিত হয়, দিক্ কাল চিরকাল আছে; জগৎও নিত্যকাল বিদ্যমান, ইহা কখনও বিনাশী নহে, এই যে কল্পনা, এ কল্পনা বা ঐরূপ বোধ কল্পনামাত্রের বিলাস হইলেও সত্যের ন্যায় প্রচলিত রহিয়াছে[৬৪।৬৭]। ঐ সকল সত্যতুল্য প্রতীতিও পরমকারণ পরমাত্মায় উপপন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, এমন কোনও কল্পনা বা আরোপবুদ্ধি নাই—যাহা সেই পূর্ণ পরমাত্মরূপ অধিষ্ঠানে না হইতে পারে[৬৮]। এই জগৎ, এতদন্তর্গত জন্ম, মরণ, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, দিক্, কাল, আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত,

সমস্তই পুনঃ পুনঃ জন্মে ও বিনষ্ট হয়। সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। যেমন একই সূর্য্যের কিরণ নানা গৃহের নানা গবাক্ষে নানা আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় একই পরমাত্মা নানা কল্পিত পদার্থে নানা ভাবে প্রকট প্রাপ্ত হন। দৈত্য, দানব, লোক, লোক সমূহের ব্যবহার ক্রম, স্বর্গ, অপবর্গ, ইন্দ্র, চন্দ্র, নারায়ণ, দেব, এ সকল যে কতবার আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াছে ও হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। দিক্‌সকল, চঞ্চলপ্রভা বিদ্যুৎ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, বায়ুদেব, ইহাদেরও উদয় ও অন্তর্ধান, বিদ্যুতের উদয়ের ও অন্তর্ধানের ন্যায় অগণ্য৬৯।৭২। এই যে রোদসীরূপ নলিনী (উপরে স্বর্গ, নীচে পৃথিবী, সমুদায়ের নাম রোদসী।), সুমেরু ইহার কর্ণিকা, সহ্যাদি পর্ব্বত ইহার কেসর, প্রাণিপুঞ্জের পুণ্য ইহার সুগন্ধ, ভোগ মকরন্দ, এ নলিনীও অজস্র প্রস্ফুটিত ও বিগলিত হইয়া আসিতেছে৭৩। এই যে ভাস্কররূপ সিংহ, এ সিংহও পুনঃ পুনঃ আকাশরূপ কানন আক্রম রতঃ কিরণরূপ নখর দ্বারা অন্ধকাররূপ হস্তিযূথ বিনাশ করিতেছে৭৪। চন্দ্রও যে কতবার স্বীয় সুন্দর করে দিগঙ্গনা দিগকে বিভূষিত করিয়াছেন তাহার গণনা নাই৭৫। স্বর্গরূপ বৃক্ষ হইতে ভোগদ্বারা পুণ্যকর্ম্মক্ষয়কারী রাশি রাশি জীবরূপ পুষ্প পুণ্যক্ষয়রূপ মহাবাতে বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতেছে৭৬। কালরূপ কপিঞ্জল পক্ষী কার্য্যক্রীয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার সৃজন আরম্ভ করিয়া যৎকিঞ্চিৎকাল পট পট রব করিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে৭৭। স্বর্গলোকরূপ পদ্মে এক ইন্দ্র-ভ্রমর আসিয়া বসিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে সে আবার চলিয়া গেল, অপর এক ইন্দ্রভ্রমর আসিয়া বসিল৭৮। এইরূপ, এক কলি আসিয়া পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, আবার সত্য আসিয়া পবিত্রতা স্থাপন করিতেছে৭৯। এইরূপে কালরূপ কুম্ভকার মাসবৎসরাদি চক্রের আবর্ত্তনে অজস্র ভৌতিক শরীরাদি প্রস্তুত করিতেছে৮০। এই জগৎ যে কতবার অশুভগ্রস্ত ও শুষ্ক কাননের ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে ও হইবে তাহার গণনা কে করে৮১। কতবার যে আদিত্যগণ উদিত হইয়া জগতের সর্ব্ব বস্তু দগ্ধ করিয়া ইহাকে শ্মশানসম করিয়াছে ও করিবে তাহারও গণনা নাই৮২। কতবার পুষ্করাদি মেঘ উদিত হইয়া জল বর্ষণে জগৎকে একার্ণব করিয়াছে। কতবার এই জগৎ বায়ু তেজ জল পৃথিবী পরিশূন্য হইয়া

শূন্যকল্প হইয়াছে ও হইবে। জীবেরা কতিপয় বৎসর মাত্র জীবন অনুভব করিয়া পুনর্ব্বার জীর্ণদেহ হইয়া অনির্দ্দেশ্য আত্মায় প্রলীন হয়। ভ্রান্ত জীব যেমন শূন্যে গন্ধর্ব্বনগর কল্পনা করে তাহার ন্যায় পুনঃ পুনঃ এক এক আদিম মন (ব্রহ্ম) এক এক সময়ে বহু জগতের কল্পনা করিয়া থাকেন[৮৩।৮৬]। হে রামচন্দ্র! প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অবসানে পুনঃ প্রলয়, ইহা চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তাই বলিতেছি, মহামায়ার এবম্বিধ আড়ম্বরের আবার সত্যাসত্য নির্ণয় কি[৮৭।৮৮]? আমি যে তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, ইহা কেবল সংসার চক্রের আভাস মাত্র বুঝাইবার অভিপ্রায়ে। অতএব, ইহা বাস্তব বস্তুশূন্য ও কল্পনারচিত, এই মাত্র নিশ্চয় করা দাশূরোপাখ্যান শ্রোতার কর্ত্তব্য[৮৯]। অজ্ঞানকল্পিত দ্বিচন্দ্রের ন্যায় এই জগৎ মনঃকল্পিত হইয়া বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র সত্য ব্রহ্মসত্তাই ইহার সত্তা ও সার। সুতরাং বুঝিতে হইবে, তিনিই এই জগৎস্বরূপে অধুনা বিরাজ করিতেছেন। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, বলিয়াছি, তোমার ইহাতে ভয় মোহের কারণ নাই[৯০]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা সর্ব্বদা লৌকিক বৈদিক কাম্য কর্ম্মে রত, যাহাদের আশয় ভোগ ও ঐশ্বর্য্য (উচ্চ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য=অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। সাধারণ জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ধন রত্নাদি।) দ্বারা আহৃত, যাহারা সত্যলিপ্সু নহে, সেই সকল আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক শঠেরা ব্রহ্মতত্ত্ব সন্দর্শনে সমর্থ হয় না[১]। যাহারা ভোগবিরত, যাহারা বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়গণের বশ্য নহে, তাহারাই এই সমস্ত জগদাকারে দৃশ্যমানা মায়া উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ হয়[২]। বিচারবান্ জীব "এই জগৎ কেবল মায়ার রচনা" এইরূপ বুদ্ধি উদিত করতঃ ইহার প্রতি উদাসীন হন এবং ইহাকে অতিশয়িত হেয় জ্ঞান করেন। সেই জন্য তাঁহারা এতৎপ্রতি যে অহঙ্কারময়ী মায়া অর্থাৎ যাহা অহং মম ইত্যাদি নানা ভাবের মূল, তাহাকে অনায়াসে সর্পের জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় পরিত্যাগ করেন[৩]। যেমন ভৃষ্ট বীজ দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে নিপতিত থাকিলেও অঙ্কুরোৎপাদন করে না, পরন্তু যথা কালে মৃত্তিকা লীন হইয়া যায় (পচিয়া মৃত্তিকা হয়), তাহার ন্যায় অহং-মম-ত্যাগী অনাসক্ত জীব দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও কর্ম্মলিপ্ত হন না এবং তদ্দেহ নাশের পর আর জন্ম গ্রহণ করেন না[৪]। যাহারা অজ্ঞ তাহারাই আধিব্যাধিনিপীড়িত ক্ষণবিনাশী শরীরের হিতচেষ্টা করে; প্রকৃত আত্মহিতের চেষ্টা করে না[৫]। হে রাঘব! তুমি অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ শরীরের সমীহিত (চেষ্টিতপরম্পরা) পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিও না। কেবল মাত্র আত্মপরায়ণ হইবে[৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন যে, সংসারচক্র কেবল মনঃকল্পিত, সুতরাং মিথ্যা বা সারশূন্য। অপিচ, এই দৃশ্য ব্যাপার দাশূর আখ্যায়িকার সমান। হে ব্রহ্মন্! আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহা কিরূপে দাশূর আখ্যায়িকার সমান। তাই আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, দাশূর-আখ্যায়িকা কি? আপনি আমার

বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করুন[৭]। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জগৎ মায়াময়, এই তথ্যের বর্ণন ব্যপদেশে আমি দাশূর আখ্যায়িকা বর্ণন করি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর[৮]।

এই বসুধাতলের কোন এক স্থানে অতিবিস্তৃত ও মনোরম এক জনপদ আছে, তাহার নাম মগধ[৯]। তাহার কোন কোন স্থানে কদম্ব-বন; এবং কোন কোন স্থানে তালশ্রেণী পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। তত্রস্থ বৃক্ষে বহু বিচিত্র বিহঙ্গ নিরন্তর মধুরস্বরে গান করিয়া থাকে এবং সে স্থান সর্ব্বদা বহু আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূর্ণ থাকে[১০]। ঐ জনপদের সীমান্তঃ প্রদেশ নীলবর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এবং সে সকলের অদূরে আশ্চর্য্যপূর্ণ ও শোভাময় উপবন সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। সেই স্থানের তরঙ্গিণী সকল কমল কহ্লার প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র পুষ্প সমূহে শোভমানা[১১]। তত্রত্য উদ্যান সকল দোলাবিলাসে ও অঙ্গনাগণের গানে উৎসবান্বিত[১২]। এই জনপদের কোন এক স্থানে এক পর্ব্বত আছে। তাহার তট ভূমি কর্ণিকার বৃক্ষে, কদলীবনে ও কদম্বশ্রেণীতে সর্ব্বদা শোভমানা। তত্রস্থ বৃক্ষ সকল সর্ব্বদা পুষ্প ফলে শোভমান এবং তন্নিকটস্থ সরোবর সকল হংস কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণের কল কল রবে পরিপূর্ণ[১৩।১৪]।

এবম্বিধ বিশেষণ সম্পন্ন পরম রমণীয় ও বৎপরোনাস্তি বিচিত্র বৃক্ষাদির ও বিহঙ্গমাদির আশ্রয়ীভূত পর্ব্বতোপরি এক পরম ধার্ম্মিক ও মহাতপস্বী মুনি বাস করিতেন। তাঁহার নাম দাশূর। দাশূর অতীব বীতরাগ ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বাসস্থান এক কদম্বরূক্ষে ছিল। অর্থাৎ তিনি এক কদম্বতরুর শাখোপরি অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা মহাতপোযোগে নিমগ্ন থাকিতেন[১৫।১৬]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! এই তপস্বী কি নিমিত্ত বিপিন মধ্যে বাস করিতেন? এবং কি নিমিত্তই বা কদম্বতরুপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেন[১৭]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! দাশূর মুনির পিতা শরলোমা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় ব্রহ্মার ন্যায় উক্ত পর্ব্বতে বাস করিতেন[১৮]। যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র পুত্র কচ, তেমনি উক্ত মুনিরও একমাত্র পুত্র দাশূর। মুনিবর শরলোমা প্রিয়তম পুত্র দাশূরের সহিত ঐ অরণ্যে জীবন যাপন করিতেন[১৯]। মুনিবর শর-

লোমা প্রিয় সন্তান ধর্ম্মাত্মা দাশূরের সহিত সেই গিরিবনে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়া যথাকালে মুক্তনীড় বিহগের ন্যায় স্বদেহ পরিত্যাগ করতঃ সুরলোকে গমন করিলেন[২০]। দাশূব পিতৃবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পিতৃবিরহিত কুররপক্ষীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন[২১]। পূর্ব্বে মাতৃবিয়োগ, পরে পিতৃবিয়োগ, এই উভয় বিয়োগে দাশূর সাতিশয় কাতর অর্থাৎ পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন এবং শোকসন্তপ্ত-চিত্তে হৈমন্ত পঙ্কজের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন[২২]। অনন্তর, অদৃশ্যশরীরিণী বনদেবী সেই বালক ঋষিপুত্রকে এই বলিয়া সমাশ্বাসিত করিলেন যে, হে ঋষিকুমার! তুমি প্রাজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি বুঝিতেছ না যে, সংসারের অস্থিরতা স্বাভাবিকী[২৩।২৪]? হে সাধো! এই সংসারে যাহারা আগমন করে তাহাদের গতি ও স্থিতি সর্ব্বদাই ঐরূপ অশাশ্বত (অনিত্য)। ব্যবহার দৃষ্টিতে পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল স্থিতি প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়[২৫]। হে মননশীল! এই সংসারে যে কিছু দৃষ্ট হয়, এমন কি ব্রহ্মাদি মহা মহা প্রাণী, সমস্তই বিনাশের অধীন[২৬]। অতএব, হে মুনে! তুমি মাতা পিতার মরণে বৃথা শোক করিও না। যেমন দিবাকর উদিত হইলে তাহার অস্ত অবশ্যম্ভাবী, তাহার ন্যায়, জাত বস্তু মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার নিমিত্ত শোক বা দুঃখ বহন করা উচিত নহে[২৭]। যেমন শিখণ্ডী (ময়ূর) মেঘধ্বনি শ্রবণে সমাশ্বস্ত হয়, তাহার ন্যায় রক্তাক্ষ ও অশ্রুমুখ দাশূর উক্ত অশরীরিণী বাণী (আকাশ বাণী) শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন[২৮]। অতঃপর উত্থিত হইয়া যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে পিতার ঔর্দ্ধ-দেহিক কার্য্যপরম্পরা নির্ব্বাহ করিলেন এবং উত্তম পদ (মুক্তি) লাভার্থ দৃঢ়তা সহকারে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন[২৯]। সেই বিপিন মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা করিতে করিতে শ্রোত্রিয়তা লাভ করিলেন, অর্থাৎ বেদার্থবিচারনিষ্ঠ হইলেন[৩০]। শ্রোত্রিয়তা লাভে পবিত্র হইলেও জ্ঞেয়তত্ত্ব (ব্রহ্মতত্ত্ব) অজ্ঞাত থাকায় তাঁহার চিত্ত এই ধরণীতলে বিশ্রান্তি লাভ করিল না। অর্থাৎ পৃথিবীতলে বাস তাঁহার অরুচিজনক হইল[৩১]। ধরাতলের সমস্ত স্থান শুদ্ধ হইলেও তিনি "যেন অশুদ্ধ" এইরূপ জ্ঞানের দোষে কুত্রাপি রতি লাভ করিতে পারিলেন না[৩২]।

পরে বৃক্ষাগ্র শুদ্ধ, এইরূপ মনে করিয়া বৃক্ষাগ্রে বাস মনোনীত করিলেন। কিন্তু বৃক্ষাগ্র বাস নিতান্ত দুঃসাধ্য, সেজন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে স্থির করিলেন, আমি এরূপ কঠিন তপস্যা করিব—যাহাতে পক্ষীর ন্যায় অনায়াসে বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও পত্র সমূহে অবস্থান করিতে পারা যায়[৩৩,৩৪]।

দাশূর মনে মনে ঐরূপ চিন্তা অর্থাৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তথায় যজ্ঞোপযোগী বহ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে মনোরথ সিদ্ধি কামনায় আপনার স্কন্ধদেশ হইতে মাংস উৎকর্ত্তন করতঃ সেই ভীম হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন[৩৫]। অনন্তর ভগবান্ হুতাশন দেখিলেন, ব্রাহ্মণ অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেবগণ যদি এই বিপ্রের কণ্ঠমাংস মদীয় মুখদ্বারা ভোজন করেন, * তাহা হইলে এই বিপ্রের কণ্ঠমাংসের সহিত সমগ্র দেবগণের কণ্ঠদেশ বিনষ্ট হইবে। ভগবান্ পাবক ঐরূপ চিন্তা করিয়া, পূর্ব্বে যেমন বৃহস্পতির সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, তাহার ন্যায় দাশূর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং ধীর বচনে কহিলেন, হে মুনিকুমার! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। হে সাধো! যেমন ভাণ্ডারস্বামী স্বীয় ভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট মণি গ্রহণ করে, তেমনি তুমিও আমার নিকট হইতে স্বীয় অভিমত বর গ্রহণ কর; তোমার অভিষ্ট অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে[৩৬,৩৮]।

ভগবান্ হুতাশন ঐরূপ কহিলে বিপ্রকুমার পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং স্তব স্তুতি অন্তে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এই ভূত পরিপূর্ণ বসুধামণ্ডলের কোন স্থান পবিত্র মনে করিতেছি না। সেইজন্য, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই-রূপ বর প্রদান করুন, যাহাতে আমি অনায়াসে বৃক্ষের উপরিভাগে অবস্থান করিতে পারি[৩৯,৪০]।

দেবগণের মুখস্বরূপ ভগবান্ হুতবহ মুনিপুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন এবং জলদপটলে বিদ্যুন্মালার ন্যায় নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন। ভগবান্ ঈশ্বর অন্তর্হিত

* শাস্ত্রকারেরা বলেন, "অগ্নিমুখা দেবাঃ" অগ্নিই দেবতাদের ভক্ষণসাধন মুখ। অর্থাৎ দেবতারা অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক প্রক্ষিপ্ত ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজন করেন, করিয়া তৃপ্ত হন।

হইলে বিপ্রকুমার কাম্য লাভ জনিত সন্তোষে পূর্ণেন্দুসপ্রভ বদনকান্তি ধারণ করিলেন। তদীয় ঈষৎ হাস্যে সেই দ্যুতিমান্ বদনচন্দ্র ঈষৎ বিকশিত ও সুশুভ্র দশনপংক্তি বিস্তার পূর্ব্বক প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কবি তাঁহার সে মুখশোভা দেখিলে অবশ্যই বলিতেন—তদীয় তাদৃশ বদনে যেন যুগপৎ শশি ও পদ্ম সমুদিত হইয়াছে৪১।৪৩।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিপ্রকুমার স্বাভিমত বর প্রাপ্ত হইয়া তপস্যা হইতে বিরত হইলেন এবং স্বীয় বাসোপযোগী বৃক্ষের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি পরিচালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সেই কাননের মধ্যভাগে এক বৃহৎ কদম্ববৃক্ষ রহিয়াছে। এই বৃক্ষ এত উচ্চ যে দেখিলে মনে হয়, যেন গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া উর্দ্ধস্থ মেঘমণ্ডল স্পর্শন করিতেছে। ভাস্করদেব যখন মধ্যাকাশে আগমন করেন, তখন যেন তদীয় অশ্ব এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশে পদ স্থাপন করিয়া কথঞ্চিৎ শ্রমাপনোদন করিয়া সুখী হয়[১]। ইহার বিটপ সকল এমন সুদীর্ঘ ও সুনিবিড় যে দেখিলে বোধ হয়, এই বৃক্ষ যেন আপন সুদীর্ঘ ও অসংখ্য বাহু বিস্তৃত করিয়া অনাবৃত দিক্‌কুক্ষির বিতানকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। শাখায় শাখায় অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ যেন কুসুমরূপ নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিঙ্মণ্ডল দর্শন করিতেছে[২]। ভ্রমর সকল বায়ুবিধূত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, সে দৃশ্য দোলায়মান মুখস্থিত চঞ্চল কুণ্ডলের সহিত তুলিত হইতে পারে। বায়ুর দ্বারা পল্লবাগ্র এরূপ সঞ্চালিত হইতেছে যে, কোন কবি তাহা দেখিলে বলিতেন, বৃক্ষ যেন স্নেহপরবশ হইয়া দিগঙ্গনাদিগের মুখ প্রমার্জ্জন করিতেছেন[৩]। লতাবিশেষে বিজড়িত পল্লবাগ্রভাগে অরুণবর্ণ কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষ তাম্বূলরাগযুক্ত সহাস্য আস্যে বনমালিকা দিগকে উপহাস করিতেছে[৪]। এই বৃক্ষ অরুণবর্ণপুষ্পরেণুদ্বারা সুশোভিত ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান এবং ইহার শিরঃপ্রদেশ মণ্ডলাকার ও বিস্তৃত। ইহার বিটপজাল যেন সিদ্ধগণের গমনাগমন পথ অবরোধ করতঃ উর্দ্ধপ্রদেশে দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অবস্থান করিতেছে[৫।৬]। ইহার বিস্তৃত বিটপ পংক্তির উপরিভাগে ও লতাবিজড়িত শাখাসংকটে চকোর পক্ষিগণ গান করিতেছে এবং স্কন্ধদেশে ময়ূরগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকায় এরূপ দৃশ্য হইয়াছে যে, যেন, অম্বুদমণ্ডলে রামধনু রহিয়াছে[৭]।

শুভ্রবর্ণ চমর মৃগেরা ইহার প্রত্যেক স্কন্ধকোটরে অবস্থান পূর্ব্বক কখন বহিরাগত হইতেছে, কখন বা কোটরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় দেহার্দ্ধ বাহির করিতেছে, কখন বা একবারে কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইতেছে[৮]। কপিঞ্জল কুলের কলরবে, কোকিল কুলের কাকলীতে ও জীবঞ্জীব পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে এবং চকোরনিচয়ের কুজনে এই বৃক্ষ সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে[৯]। অসংখ্য কলহংস এই বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতেছে। অহো! সে সুষমা দেখিলে মনে হয়, বৃক্ষটী যেন স্বর্গবিশ্রান্ত সিদ্ধগণের রাজ্য বা দেশ[১০]। এই মহান্ বৃক্ষ নবপল্লব মণ্ডিত ও বিলোল মঞ্জরীসমূহে পরিবৃত। এ অবস্থা প্রবালহস্ত বিলোল অপ্সরোগণসমাকীর্ণ স্বর্গের অনুকার করিতে সমর্থ[১১]। শ্যামবর্ণ মঞ্জরী ও পত্র সমূহে শ্যামীকৃত এবং মারুতহিল্লোলে প্রস্ফুরিত অরুণবর্ণ কুসুমরেণুসংকুল লতাসমূহে বিমণ্ডিত। এ দৃশ্য ইন্দ্রধনুবিমণ্ডিত জলধরপটলের সুষমা তিরস্কার করিতে পারক[১২]। ইহার সহস্র সহস্র শাখা আকাশকোটর পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাও চন্দ্র সূর্য্যরূপ কুণ্ডলালঙ্কৃত ভগবান্ বিষ্ণুর বিশ্বরূপ সম[১৩]। ইহার তলপ্রদেশে নিবদ্ধ নাগেন্দ্রগণ, উপরে গ্রহ নক্ষত্রগণ, মধ্যভাগে লতা পুষ্পাদি মধ্যে পক্ষিকুল অবস্থিত[১৪]। এই তিন্ ভাগই নাগেন্দ্রসংকুল পাতালের, গ্রহগণ পরিপূর্ণ ব্যোমমণ্ডলের ও বৃক্ষলতা প্রাণী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ভূতলবিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদরাকাশের সহিত উপমিত হইতে পারে[১৫]। ইহার পল্লব প্রদেশস্থ পুষ্পরেণুসমাচ্ছন্ন কলিকা জাল তারানিকরমণ্ডিত ব্যোমমণ্ডলের সহিত, এবং চঞ্চলবিহগপরিপূর্ণ কুলায়কুলসংকুল স্কন্ধদেশ জনপরিপূর্ণ জনপদ সমাচ্ছন্ন ভূতলের সহিত, তথা মঞ্জরীরূপ পতাকাসমন্বিত পুষ্পরূপ রত্নবিমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পুষ্পদ্বারা ধবলীকৃত চকোর ভ্রমর শুক কোকিল ও সারিকা প্রভৃতির কুজন ও প্রতিকুজনযুক্ত নিবিড় লতাকুঞ্জের অন্তরালরূপ গবাক্ষবিশিষ্ট ও পক্ষিরূপ জনগণের ঘনসঞ্চারসম্পন্ন বনদেবতাগণের অন্তঃপুরের সহিত দৃষ্টান্তীকৃত হইতে পারে[১৬,২০] অবিরত পুষ্পকেশর নিপতিত হওয়াতে এই বৃক্ষ অবিরত নিপতিত নদীসমূহসংকুল পর্ব্বতের ন্যায় ও মন্দ মন্দ সমীরণ দ্বারা বিচলিত পত্র পুষ্প সমূহে আচ্ছাদিতস্কন্ধ হওয়াতে বাতবিচলিত অভ্রপটলাবৃত ভূধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পর্ব্বত যেমন নদীবৃন্দে রাজমান, তাহার ন্যায় এই বৃক্ষ গানকারী ভৃঙ্গশ্রেণী পরিশোভিত পুষ্প-

স্তবকে রাজমান। ভূধর যেমন সুশুভ্র মেঘের দ্বারা শোভা ধারণ করে তাহার ন্যায় এই অত্যুচ্চ বৃক্ষও পুষ্প পল্লবাদির দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন কোন মহাচল (বর্ষপর্ব্বত) উপত্যকাস্থ তরুপুঞ্জে আবদ্ধ, তাহার ন্যায় এই মহাবৃক্ষও মাতঙ্গকটঘৃষ্ট শিকড়সমূহের (কট= গণ্ডদেশ। হস্তীর গণ্ড ঘর্ষণে ছাল উঠিয়া গিয়াছে এরূপ শিকড়) দ্বারা আবদ্ধ[২২]।[২৩]। ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ বিষ্ণু যেমন পার্শ্বদবৃন্দে পরিবৃত, তাহার ন্যায় এই বৃক্ষও বিচিত্র পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত[২৪]। ইহার নিকটবর্ত্তী বল্লীগণ মারুতহিল্লোলে যেন কোন অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং এই বৃক্ষ যেন স্বীয় স্তবকরূপ বিলোল অঙ্গুলিদ্বারা উহাদিগকে অভিনয় কার্য্যের নিষ্পাদনপ্রকার দেখাইয়া দিতেছে[২৫]। অধিক কি বলিব, কি মূল, কি কোটর, কি শাখা, কি পত্র, কি পুষ্প, ইহার সকল অঙ্গই মনুষ্য মৃগ পশু পক্ষীর প্রার্থনীয়, সুতরাং বৃক্ষটী যেন "আমার সর্ব্বাঙ্গ সকল, জন্ম সুসার্থক," এই ভাবের ভাবুক হইয়া পরিতোষে ও আহ্লাদে উৰ্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছে[২৬]। লতারূপিণী বহু কান্তার আমিই একমাত্র কান্ত, এতদ্রূপ আভিমানিক সুখের উল্লাসে বৃক্ষ যেন ভ্রমরগীতিচ্ছলে রসগান করিতেছে[২৭]। যেন আদর সহকারে কোকিলকুলের ধ্বনি দ্বারা কুসুমপ্রার্থী ব্যোমচারী সিদ্ধগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে পুষ্প সমূহ উন্মোচন করতঃ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতেছে[২৮]। পুষ্পরূপ কুণ্ডলের নির্ম্মল দীপ্তি প্রদীপ্ত হইয়া লতা পুষ্প ফলের উল্লাস জন্মাইতেছে এবং যেন তদীয় প্রান্তস্থিত পঞ্চ পুণ্যমহীরুহকে উপহাস করিতেছে[২৯]। অপিচ, এই বৃক্ষ উৰ্দ্ধগ খগমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া যেন পারিজাত বৃক্ষকে জয় করিতেই উদ্ধগ্রীব হইয়া ব্যোমান্তরে ধাবিত হইয়াছে[৩০]। ইহার সহস্র সহস্র স্তবকের মধ্যভাগে শ্যামবর্ণ ভৃঙ্গগণ প্রস্ফুরিত হওয়াতে বৃক্ষ যেন অসংখ্য নেত্রসম্পন্ন সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছে[৩১]। ইহার সহস্র গুচ্ছে সহস্র পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহাও যেন সহস্র মণিসম্পন্ন সহস্র ফণাশালী অনন্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন, নাগরাজ পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া নভোদর্শনের নিমিত্তই উৰ্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছেন[৩২]। ভস্মবিভূষিত কলেবর ভগবান্ শঙ্কর কেবল ভক্তগণেরই শঙ্কর, কিন্তু এই বৃক্ষ পুষ্পরেণুবিভূষিত হইয়া শঙ্করাকার

ধারণ করতঃ ছায়া, পুষ্প ও ফল প্রদান দ্বারা সমস্ত ভূতবর্গেরই শঙ্কর স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইহার শাখাসমূহ বিকসিত ও মুকুলিত পুষ্পে পরিশোভিত, দলরাজিতে সুশোভিত এবং বিবিধ কুসুমপরিপূর্ণ লতানিকরে বিমণ্ডিত হইয়া রমণীয় মণ্ডপ সমূহের ন্যায় ও বিবিধ বিচিত্র বিহগকুলের অনবরত গমনাগমন দ্বারা নাগরগণের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়াতে এই বৃক্ষ যেন বিবিধ মণ্ডপ পরিপূর্ণ ও নগরবাসিগণসংকুল ব্যোমপুরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে৩৩।৩৪।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তম সর্গ

-()❀()-

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! ভূমি অপবিত্র, এতদ্বিধ বুদ্ধিশালী দাশূর তাদৃশ ফলপল্লবশাখাযুক্ত অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু যেমন একার্ণবকালে বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায়, দাশূর তন্মুহূর্ত্তে সেই আকাশস্তম্ভ সদৃশ উন্নত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন[১।২]। এই বৃক্ষের একটী ব্যোমসংলগ্ন অত্যুচ্চ শাখা, দাশূর তাহারই প্রান্তস্থিত পল্লবে আরোহণ পূর্ব্বক তপস্যার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাহার অপবিত্রতাজনিত তপোবিঘ্নকর চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিল না[৩]। সেই বৃক্ষের একটী অভিনব কোমল পল্লব তাঁহার আসন হইল, তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক তিনি কৌতুক বশতঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন[৪]। দেখিলেন, দিক্‌সমূহ যেন অপূর্ব্ব দশটী অঙ্গনা, তাহারা যার পর নাই অদ্ভুত সুষমা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শৈলরাজের অত্যুচ্চ শিখর যেন তাহাদের স্তন, সরিৎসমূহ তাহাদের একাবলী হার, নীল নভোমণ্ডল তাহাদের কবরী, চঞ্চল মেঘশ্রেণী যেন তাহাদের অলকাবলি[৫], নিবিড়িত বৃক্ষের শ্যামল পল্লবাবলী যেন তাহাদের বসন, পুষ্পরাশি তাহাদের কর্ণভূষণ, সাগর যেন তাহাদের বিধৃত পূর্ণকুম্ভ, প্রফুল্ল পদ্মিনীবৃন্দ যেন তাহাদের করবিধৃত পুষ্পগুচ্ছ, পবনবাহিত কুসুমগন্ধ যেন তাহাদের মুখ মারুত, পক্ষিগণের কলরব যেন তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠনিনাদ, নির্ঝর পাতের প্রগাঢ় নিস্বন যেন তাহাদের নূপুরধ্বনি[৬।৭], স্বর্গ যেন তাহাদের মস্তক এবং পৃথিবী যেন তাহাদের পদতল, বন সকল যেন রোমশ্রেণী, জাঙ্গল প্রদেশ যেন উরুস্থল, চন্দ্র ও সূর্য্য যেন তাহাদের কুণ্ডল[৮], শালী প্রভৃতি শস্যের ক্ষেত্র সমূহ যেন তাহাদের প্রত্যঙ্গ বিভাগ, পর্ব্বতশিখরসংলগ্ন শুভ্র মেঘ খণ্ড সমূহ যেন তাহাদের মস্তকস্থ কেশের প্রাবরণ[৯], পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র যেন তাহাদের দর্পণ, নক্ষত্রবৃন্দ যেন

তাহাদের ঘর্ম্ম বিন্দু[১০], ঋতুসম্ভূত কুসুমনিচয় যেন তাহাদের স্তনকঞ্চুক, সূর্য্যকিরণ যেন তাহাদের ব্যবহার্য্য কুঙ্কুম দ্রব, চন্দ্রিকা অর্থাৎ জ্যোৎস্না-রাশি যেন তাহাদের চন্দনপ্রলেপ[১১]। এবম্বিধ দিগঙ্গনাগণ যেন ভুবনরূপ অন্তঃপুর আলো করিয়া রহিয়াছে। দাশূর আরও দেখিলেন, কুসুম-মণ্ডিতা এতাদৃশী দিগঙ্গনাগণের পয়োবাহরূপ (মেঘরূপ) পরিধান বস্ত্র বাতবিধূত হইয়া কখন প্রসৃত ও কখন বা প্রস্খলিত হইতেছে[১২]।

পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ।

——(*)(⌒)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! দাশূর সেই কদম্ববৃক্ষ আরোহণান্তে দিক্‌সকল অল্পকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া শূরের ন্যায় উৎসাহের সহিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও উগ্রতর তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বনবাসীরা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে তপস্যা করিতে দেখিয়া, কদম্বদাশূর নামে বিখ্যাত করিল[১]। কদম্বদাশূর কদম্বশাখাদলে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমতঃ বর্ণিত প্রকারে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন, পরে তাহারই অব্যবহিত ক্ষণে স্বীয় চিত্তকে তাদৃশ দিক্ সমূহ হইতে আকর্ষণ করিলেন এবং বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন[২]। পরম তত্ত্ব কি? দাশূর তাহা জানিতেন না। কিন্তু অন্যকে যাগাদি ক্রিয়া করিতে দেখিয়া ছিলেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং এক্ষণে তিনি তপস্যায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধি কামনায় মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন[৩]। সেই অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষের নভোগত পল্লবাগ্রে উপবিষ্ট দাশূর মনে মনে অগ্ন্যাধান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত যজ্ঞই সম্পাদন করিলেন। ধ্যান মাত্র অবলম্বনে বহুবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে তাঁহার দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। এই দশ বৎসরে তিনি মানস কল্পনায় বিপুল দক্ষিণাযুক্ত গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধ প্রভৃতি যজ্ঞও সুসম্পন্ন করিলেন[৪।৫]। তাদৃশ দীর্ঘ কালের পর অর্থাৎ দশ বৎসরের পর তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও সুপ্রশস্ত হইল। চিত্তনৈর্ম্মল্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার অন্তরে তখন হটাৎ আত্মপ্রসাদজনিত জ্ঞান অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইল[৬]। তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইল, মায়াবরণ বিশীর্ণ ও বাসনারূপ চিত্তমল একবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গেল। এই বিগলিত অজ্ঞানাবরণ ও বাসনাবিহীন দাশূর একদা সেই কদম্বের অগ্রপ্রান্তে নির্ব্বাত নিষ্পন্দ দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল নিষ্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বিলোলকুসুমবসনা, কান্তবদনা, বিশালাক্ষী, মদঘূর্ণিত-

লোচনা, নিলোৎপলভূষিতা, আমোদশালা, রূপলাবণ্যবতী, লোকললামভূতা কামিনী তাঁহার সম্মুখে লতার উপরিভাগে কুসুমভারাবনত লতার ন্যায় অবনতবদনে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তিনি সেই অনিন্দিতাঙ্গী লজ্জাশীলা অবনতবদনা বনদেবীকে দর্শন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্তই বা তুমি পুষ্পগণের বয়স্যারূপিণী হইয়া এই লতা-দলে অবনতবদনে অবস্থান করিতেছ? মহাতপস্বী দাশূর ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মৃগশাবাক্ষী গৌরবর্ণা পীনপয়োধরা বনদেবী মৃদুমধুর স্বরে বক্ষ্যমাণ স্নিগ্ধাক্ষরযুক্ত বচনপরম্পরা বলিতে লাগিলেন[৭।১২]। এই ধরা-তলে যে কিছু বাঞ্ছিত অথচ দুষ্প্রাপ্য, সে সমস্তই একমাত্র মহতের সেবায় লাভ করা যায়। কেননা মহতের নিকট প্রার্থনা অব্যর্থ-বা অমোঘ। হে ব্রহ্মন্! আমি এই লতাকীর্ণ ও ভবদীয় কদম্বসমলঙ্কৃত বিপিনের বনদেবতা। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথীতে নন্দনবনে মদনোৎসবোপলক্ষে বনদেবীগণের সমাগম হইয়াছিল। আমিও সেই ত্রিলোকললনাগণের সভায় গমন করিয়াছিলাম[১৩।১৫]। সে স্থানে গিয়া আমি দেখিলাম, মদীয় সমস্ত বয়স্যাই পুত্রবতী। কেন? তাহা জানিনা, আমার মনে তদ্দর্শনে আপনার অপুত্রবতীত্ব নিবন্ধন সাতিশয় দুঃখের অনুবন্ধ উপস্থিত জন্মিয়াছিল। তদবধি আমি দুঃখকাতরা হইয়াই আছি। তাই আজ আমি ভাবিলাম, সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ কল্পতরুসদৃশ আপনি এই স্থানে বিদ্যমান থাকিতে আমি কি নিমিত্ত অপুত্রিকা থাকিয়া অনাথার ন্যায় শোকসন্তপ্ত হই[১৬।১৭]? অতএব, হে ভগবন্! অনুকম্পাবিতরণ পূর্ব্বক আমাকে পুত্রফল প্রদান করুন। নচেৎ আমি ত্বদীয় সম্মুখে পুত্রদুঃখদাহের শান্তি বিধানার্থ মদীয় এই দেহ প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব[১৮]।

মুনিশার্দ্দুল দাশূর সেই তন্বঙ্গী বনদেবীর উক্তবিধ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং হাস্য সহকারে তাঁহার হস্তে একটি পুষ্প প্রদান করিয়া বলিলেন[১৯], হে কোমলাঙ্গি! তুমি স্বস্থানে গমন কর। যদ্রূপ উৎকৃষ্ট লতা প্রসূন প্রসব করে তাহার ন্যায় তুমি এক মাসের পর একটী সুন্দর ভ্রমরকৃষ্ণনয়ন জগৎপূজ্য পুত্র প্রসব করিবে[২০]। কিন্তু তুমি কষ্টকর অবস্থা প্রাপ্তে মরণে কৃতসঙ্কল্প ও বীতরাগিনীর ন্যায় হইয়া আমার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ, সেই কারণে তোমার পুত্রটী

তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, অন্ত বনদেবী পুত্রদিগের ন্যায় ভোগলম্পট হইবে না[২১]।

দাশূর ঐরূপ কহিলে প্রসন্নবদনা বনদেবী "আমি এই স্থানে থাকিয়া মুনিপুঙ্গবের পরিচর্য্যা করিব" এ ভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং অবিলম্বে স্বভবনে গমন করতঃ একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন[২২।২৩]। পরে যথাকালে তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মিল। ক্রমে মাস ঋতু ও সম্বৎসর অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল পরে প্রসূত পুত্র দ্বাদশবর্ষীয় হইল। উৎপলনয়না বনদেবী এই সময়ে পুত্র সহ দাশূর মুনি সমীপে সমাগতা হইলেন[২৪]। অনন্তর প্রণামান্তে, ভ্রমরী যেমন সহকার (আম্র-বৃক্ষ) সমীপে মধুর নিনাদ করে তাহার ন্যায় তিনি বিনয় মধুর বাক্যে চন্দ্রনিভানন মুনিপুঙ্গবের সমীপে উপবেশন করতঃ নিম্নলিখিত বাক্য-পরম্পরা সকল বলিতে লাগিলেন[২৫]। "ভগবন্! এই সেই আপনার ও আমার সুখাবহ পুত্র! আমি ইহাকে সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়াছি[২৬]। কেবল এই বালক সে জ্ঞান লাভ করে নাই—যে জ্ঞানে জীব পুনঃ সংসার চক্রে পরিবর্ত্তিত হয় না[২৭]। হে বিভো! অধুনা আপনি কৃপা করিয়া ইহাকে জ্ঞানে উপদিষ্ট করুন। কোন্ ব্যক্তি বংশধর পুত্রকে মূর্খ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হয়[২৮]?

বনদেবী ঐরূপ কহিলে মহাত্মা দাশূর বলিলেন, অবলে! তোমার এই পুত্র আমার শিষ্য হইল, তুমি ইহাকে এই স্থানে রাখিয়া স্বস্থানে গমন কর। মুনি এই বলিয়া বনদেবীকে বিদায় করিলে, বনদেবী পুত্রকে মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন[২৯]। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ বালক মুনির শিষ্য হইলেন বলিয়া তদীয় সম্মুখে অতি সংযতভাবে উপবেশনাদি করিতে লাগিলেন। এবং গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতচর্য্যা প্রভৃতি ক্লেশ পরম্পরার সহিত সময়াতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৩০]। অতঃপর তিনি প্রথমতঃ গুরুর বিচিত্র উক্তিপরম্পরা শ্রবণে পরোক্ষরূপে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিলেন, অনন্তর দীর্ঘকাল পরে তাহা অপরোক্ষ পথে আনীত করিলেন। যাহাতে তাহার তত্ত্বজ্ঞান অনুভূতি পথে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, মুনি তদর্থ যত্ন সহকারে বিবিধ দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও সহস্র সহস্র জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পরম্পরা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের যদ্রূপ দৃঢ় বা অবিচাল্য ব্রহ্মজ্ঞান, পুত্রেরও সেইরূপ দৃঢ় বা অবিচাল্য ব্রহ্মজ্ঞান হউক, এই

ভাবে ভাবিত হইয়া ঋষি বিবিধ প্রকার কথাক্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়বিধ কথা যোগ্যরূপে বলিতে লাগিলেন[৩১।৩৩]। তাহাতে পুত্রেরও ক্রমশঃ বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল[৩৪]।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

——(*)(◯)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, একদা আমি কৈলাসনিলয়া মন্দাকিনী সলিলে স্নান করিবার মানসে অদৃশ্যভাবে সেই দাশূর মুনির কদম্বতরুর উপরিভাগস্থ গগন পথে গমন করিতে ছিলাম। সেই স্নান উপলক্ষ্যে আমি নভোমণ্ডলান্তর্গত সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া রাত্রিকালে সেই দাশূর মুনির উন্নত কদম্বতরু প্রাপ্ত হইলাম। সেই অত্যুচ্চ তরুবর প্রাপ্ত হইলে, যেমন পদ্মকোষ মধ্য হইতে ভ্রমরধ্বনি শুনা যায় তাহার ন্যায় সেই তরু কোটর হইতে দাশূর মুনির বক্ষ্যমাণ মধুর বচনপরম্পরা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল[১,৩]।

দাশূর বলিতেছেন, পুত্র! আমি তোমার নিকট এই সংসারের উপমা স্বরূপ এক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর[৪]। এই জগতে মহাবীর্য্যশালী খোথ নামে এক ভুবনবিখ্যাত রাজা আছেন। এই রাজা শ্রীমান্ ও ত্রিভুবন আক্রমণে সমর্থ[৫]। ভুবননায়কগণ দেবগণ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারা এই রাজার অনুশাসন (আদেশ) অবনত মস্তকে বহন বা প্রতিপালন করিয়া থাকেন[৬]। এই রাজা এরূপ সাহসী, সাহসপ্রিয় ও কৌশলসম্পন্ন যে, ত্রিভুবনে কেহই তাঁহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ নহে[৭]। তাঁহার সুখদুঃখপ্রদ কার্য্যসংরম্ভ এত অধিক যে, গণনা করা কাহারও সাধ্য নহে[৮]। ত্রিভুবনে এমন বীর্য্যশালী কেহই নাই, যিনি এই অতুলবীর্য্য মাহাত্মা রাজাকে শস্ত্র, অস্ত্র বা পাবক দ্বারা আক্রমণ করিতে সমর্থ হন। আকাশ যেমন অনাক্রম্য সেইরূপ এই খোথ রাজাও অস্ত্রাদির অনাক্রম্য[৯]। ইনি লীলাক্রমে যে সমস্ত সৃষ্টি করেন, কি হর, কি হরি, কি মহেন্দ্র, কেহই তাঁহার শতাংশের একাংশ নির্ম্মাণে সমর্থ নহেন[১০]। এই মহাবাহুর উত্তম, অধম ও মধ্যম, ত্রিবিধ দেহ বিদ্যমান, সমস্ত জগৎ উক্ত দেহত্রয়ে আক্রান্ত রহিয়াছে[১১]। এই ত্রিশরীর রাজা অতিবিস্তৃত আকাশে সমুৎপন্ন হইয়া তাহাতেই স্থিতি লাভ করতঃ পক্ষীর ন্যায় তাহাতেই পরিভ্রমণ করেন[১২]। ইনি আপনার

উৎপত্তির ও স্থিতির স্থান অনন্ত আকাশে সুরম্য মহানগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদীয় বিনির্ম্মিত উক্ত মহানগর তিন্ ভাগে বিভক্ত, চতুর্দ্দশ মহারণ্যে বিভূষিত, বন ও উপবন সমূহে পরিবৃত, অত্যুচ্চ ক্রীড়াপর্ব্বতে পরিশোভিত, বিলোল মুক্তালতায় বিজড়িত, ও সপ্তবাপীবিশিষ্ট। তাহা একটী শীতল ও একটী উষ্ণ অক্ষীণ দীপদ্বয়ে আলোকিত এবং ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতিরূপ দুঃখ সুখ এই দ্বিবিধ বাণিজ্যের পথে সুশোভিত করিয়াছেন[১৩,১৫]। ভূপতি এবম্বিধ অতিবিশাল নগরে জঙ্গম জীবের সঞ্চরণ যোগ্য অনেক প্রকার অপবরক (স্বকীয় আচ্ছাদন স্থান অর্থাৎ গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়াছেন[১৬]। সেই সমস্ত অপবরকের অর্থাৎ গৃহের মধ্যে কোন গৃহ ঊর্দ্ধে, কোনটী অধঃপ্রদেশে ও কোনটী বা মধ্যস্থানে সংস্থাপিত। সে সকলের মধ্যে কোন কোন গৃহ বিলম্বে বিনষ্ট হয় এবং কোন কোন গৃহ শীঘ্র বিনষ্ট হয়[১৭]। ঐ সমস্ত গৃহ শ্যামবর্ণ তৃণসমূহে আচ্ছাদিত, নবদ্বারযুক্ত, বহুবাতায়নবিশিষ্ট, সর্ব্বদা বায়ুসঞ্চারযুক্ত, পঞ্চদীপপ্রকাশিত, স্থূণাত্রয়ে (স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন্ স্থানে) সমন্বিত। এই সকল গৃহের কাষ্ঠ সকল শুক্লবর্ণ, তথা স্নিগ্ধ মসৃণ মৃত্তিকাদির দ্বারা প্রলিপ্ত, এবং বহির্গমন পথ সমূহে পরিবৃত রহিয়াছে[১৮,১৯]। রাজা তাহার রক্ষাবিধানের নিমিত্ত আলোকভীরু (যে আলো দেখিলে ভয় পায়। পলায়ন করে।) মহাযক্ষ সমুদয় মায়ার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারা সর্ব্বদাই উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে[২০]।

পুত্র! মহীপতি এই নগরে এতদ্বিধ যক্ষগণসংরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরম্য গৃহ সমুদয় প্রস্তুত করতঃ নীড়মধ্যে বিহঙ্গমের ন্যায় সেই সকল গৃহের মধ্যে কত প্রকার ক্রীড়া করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্রত্য যক্ষগণের সহিত ক্রীড়ায় বশীভূত হইয়া কিয়ৎকাল বিহার করতঃ তথা হইতে পুনঃ প্রস্থান করিয়া থাকেন[২১,২২]।

বৎস! এইরূপে সেই অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা সেই মহানগরে অবস্থান করতঃ কখন কখন ইচ্ছা করেন যে, অন্য নগর নির্ম্মাণ করিব এবং তদন্তর্গত গৃহে বাস করিব। ঐরূপ বাসনা করিয়া তিনি ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সহসা পুরী হইতে বেগে বহির্গত হন এবং গন্ধর্ব্বনির্ম্মিত নগরের ন্যায় নবনির্ম্মিত পুরীতে প্রবেশ করেন[২৩,২৪]। এই চঞ্চলমতি রাজার অন্তরে কখন কখন বিনাশবাসনাও সমুপস্থিত হয়। অনন্তর সেই

বাসনার দ্বারা তিনি অচিরাৎ স্বনগরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হন। পুনরপি জল হইতে তরঙ্গের উদ্গতির ন্যায় আপনা হইতে বা আপনার আত্মা হইতে আপনি পুনরুদ্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন[২৫।২৬]। কখন বা ইনি ব্যবহারপরম্পরায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই ইচ্ছাদ্বারা শত্রু, রোগ ও দারিদ্র্যাদির দ্বারা অভিভূত হন এবং "আমি অজ্ঞ, এখন আমি কি করি, আমি এখন অত্যন্ত দুঃখগ্রস্থ হইয়াছি" এইরূপ শোক করিতে থাকেন। কখন বা প্রাবৃট্‌কালীন নদীবেগের ন্যায় পূর্ব্বানুভূত সুখ স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুখানুশয়ী হইয়া হর্ষে অতিশয় প্রফুল্ল হন। পুত্র! সেই মহামহিম মহীপতি বায়ুবিতাড়িত সরিৎপতির ন্যায় কখন বল্‌গিত, কখন জৃম্ভিত, কখন বা প্রস্ফুরিত হন, কখন বা অপ্রকাশিত বা লুক্কায়িতপ্রায় হন[২৭।২৮]।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই মহারজনীতে এবং সেই জম্বুদ্বীপান্তর্গত বৃহৎ কদম্ববৃক্ষে অতি পবিত্রাশয় ও পিতা পুত্র উভয়ের ঐরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি। পিতা ঐরূপ কহিলে, পুত্র সেই পবিত্রাশয় পিতাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিলেন[১]।

পুত্র কহিল, পিতঃ! আপনি যে খোত্থনামে বিখ্যাত উত্তমাকৃতি মহারাজার কথা বলিলেন, তিনি কে? আপনি তৎকথা উপলক্ষ্যে আমাকে যে কি বলিলেন? কি উপদেশ প্রদান করিলেন? তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। ভবিষ্যৎ পুরীই বা কোথায়? এবং বর্ত্তমানে তন্মধ্যপ্রবেশই বা কি? ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একাধারে বা এক সময়ে সংঘটন অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং আপনার কথার মর্ম্ম আমার বুদ্ধিগম্য না হওয়ায় আমি মোহ অনুভব করিতেছি। অতএব, আমার মোহ ভঙ্গের নিমিত্ত আপনি উহা বিশদ করিয়া বলুন[২।৩]।

পিতা কহিলেন, পুত্র! আমি তোমাকে উহার তত্ত্বকথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা শুনিলে তুমি অনায়াসে সংসারচক্রের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে[৪]। আমি আখ্যায়িকাচ্ছলে যাহার কথা বলিলাম, [illegible] তুমি অবস্তু, বৃথা আরম্ভসম্পন্ন ও অসৎ অর্থাৎ [illegible] সমুখ বিস্তৃত সংসার বলিয়া জানিবে[৫]। [illegible] ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে প্রথমতঃ সঙ্কল্পপ্রধান (যাহার প্রধান কার্য্য [illegible]) মন (সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন) মায়িক বিকারে (মায়ার পরিণামে) আবির্ভূত হয়। সেই প্রথমোৎপন্ন মনকে আমি খোত্থ বলিয়াছি। খ আকাশ, তাহা হইতে উত্থ অর্থাৎ উৎপন্ন সুতরাং খোত্থ। ইনি আপনা আপনি প্রবৃত্তি বাসনার প্রভাবে জন্মেন, এবং নিবৃত্তি বাসনার দৃঢ়তায় লয় প্রাপ্ত হন[৬]। এই যে এত বিস্তৃত বিচিত্র ভাবান্বিত জগৎ দেখিতেছ, এ সমস্তই তাহারই রূপ। কেননা, মন বা সঙ্কল্পাত্মক পুরুষ

জাত হইলেই এ সকল জন্মে এবং তাহারই বিনাশ হইলে এ সকল বিনষ্ট হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যখন মনের থাকা না থাকা অনুসারে এ সকলের থাকা না থাকা সংঘটন হয়, তখন এ সকল মনেরই রূপ বিশেষ, অন্য কিছু নহে[৭]। যেমন শৃঙ্গ ও শাখা মহীধরের ও মহীরুহের অবয়ব, সেইরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি উক্ত মনের রূপান্তর অর্থাৎ অবয়ব বিশেষ[৮]। অর্থাৎ সেই আদি মনের কল্পিত। যাহাতে কোন জগৎ নাই ও ছিলনা ও থাকিবে না, তাদৃশ ব্রহ্মাকাশে তিনিই বিরিঞ্চিত্ব পদ প্রাপ্তির পর এই জগত্রয়রূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উক্ত মন নিজে অচেতনস্বভাব হইলেও ব্রহ্মচৈতন্যের অনুগ্রহে চেতন বিরিঞ্চি (প্রজাপতি ব্রহ্মা) হন। তাহার জগন্নির্ম্মাণও তদ্রূপ অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিভাস (বিবর্ত্ত বা কল্পনা) ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৯]। বিরিঞ্চির স্বকল্পিত মহাপুরে অর্থাৎ তাঁহার সঙ্কল্পময় ব্রহ্মাণ্ডে যে চতুর্দ্দশ মহারথ্যা বা মহামার্গ আছে বলিয়াছি, তাহা সূর্য্যাদি প্রভায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ ভুবনে জীব দিগের গমনাগমন হয় বলিয়া সে সকল মহামার্গ। নন্দনাদি উদ্যান পরম্পরাকে বন ও উপবন বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ক্রীড়া পর্ব্বতের কথা বলিয়াছি, সে সকল সহ্য, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। উষ্ণস্পর্শ ও শীতস্পর্শ দুইটী দীপের কথা বলা হইয়াছে, তাহার একটী সূর্য্য ও অপরটী চন্দ্র[১০।১১]। নদীস্থ তরঙ্গপংক্তি সূর্য্যরশ্মিপ্রতিফলিত হইয়া মুক্তামালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতীতি অনুসারে আমি নদী সমূহকে মুক্তালতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি[১২]। ক্ষীর সমুদ্র ইক্ষু সমুদ্র প্রভৃতি সমুদ্র সপ্তককে ঐ নগরের সরোবর বা বাপী বলিয়াছি[১৩]। বলিয়াছি যে, উক্ত পুরী ত্রিধা বিভক্ত, তাহার মর্ম্ম—অধঃ উর্দ্ধ ও মধ্য। অধোভাগ পৃথিবী, উর্দ্ধভাগ স্বর্গ এবং মধ্যভাগ অন্তরীক্ষ। ইহারই মধ্যে পুণ্য ও পাপরূপ ধনে ধনী নর, অমর ও পুণ্যবহিষ্কৃত ম্লেচ্ছ বণিকেরা বাণিজ্য বা পরস্পর ক্রয় বিক্রয় (পাপ পুণ্য অর্জ্জন ও প্রত্যর্জ্জন) করিতেছে[১৪]। উক্ত সঙ্কল্পপুরুষ বা খেচর রাজা স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডনগরে সঙ্কল্পের দ্বারা বিচিত্র অপবরক অর্থাৎ ক্রীড়াগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন বলা হইয়াছে। সে সকল গৃহ দেহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। দেহ অসংখ্যবিধ, সুতরাং বিচিত্র। দেবদেহ উর্দ্ধ বিভাগে, মনুষ্যদেহ অধোবিভাগে, নাগাদিদেহ অধোবিভাগে (পাতালে)

এবং খেচরদেহ মধ্য বিভাগে (অন্তরীক্ষে) সংস্থাপিত রহিয়াছে[১৫।১৬]। এই দেহরূপ ক্রীড়াগৃহ গুলি প্রাণবায়ুরূপ বাতযন্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ইহার গাত্রে মাংসরূপ মৃত্তিকার প্রলেপ আছে এবং শুভ্রবর্ণ অস্থি ইহার কাষ্ঠ। ত্বক্ তাহার উপরিভাগকে মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে[১৭]। ঐ সকল ক্রীড়া গৃহের মধ্যে কতকগুলি শীঘ্র ও কতকগুলি বিলম্বে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বলিয়াছি যে, ঐ সকল গৃহ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত, সে সকল শ্যামল তৃণ কেশ ও লোম[১৮]। নয়টী দ্বারের কথা বলিয়াছি, সে গুলিকে তুমি কর্ণ অক্ষি নাসিকা প্রভৃতি নয়টী স্থান বুঝিবে। ঐ সকল বাতায়ন স্থানীয়, কেননা তদ্দ্বারা অনবরতঃ পুরমধ্যে বায়ুর সঞ্চার রহিয়াছে। হস্তাদি এই গৃহের প্রতোলী (বারাণ্ডা) এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মধ্যস্থ পাঁচ প্রদীপ[১৯।২০]। খোথ রাজা মায়ার (নিজ কল্পনা শক্তির) দ্বারা মহাযক্ষ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে পুররক্ষক করিয়াছেন, তাহারা পরম-আলোক-ভীত, এ কথার অর্থ—অহং মম ইদং অভিমান যক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের বিনাশক। ভাবিয়া দেখ, অহংকারই শরীর বিধৃত রাখিয়াছে কি না? মরণকালে অহং-অভিমান ত্যাগের পর তদ্দেহ আর থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে অহং-অভিমান তদ্দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য এক ভাবময় দেহ আশ্রয় করে। (কল্পনা করিয়া লইয়া তদাশ্রয়ে স্থিত হয়)। পরম আলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহার উদয়ে ঐ সকল অভিমান অন্ধকারের ন্যায় ভয়ে পলায়ন করে। অথবা মরিয়া যায়। এ রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বিদিত আছেন[২১]। অতুলপরাক্রম খোথ রাজা দেহরূপ ক্রীড়াগৃহে মিথ্যাসঙ্কল্পসমুত্থিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষগণের সহিত অনুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন[২২]। যেমন কুহূলে (ধান্যাধারে) মার্জ্জার, ভস্ত্রায় বায়ু এবং শুক্তিতে মুক্তা, সেইরূপ দেহে অহঙ্কার। অর্থাৎ অহঙ্কার দেহ নহে, দেহে অবস্থিত ও দেহ হইতে স্বতন্ত্র[২৩]। উক্ত রাজা উক্ত দেহগৃহে অহঙ্কারাদি যক্ষগণের সহিত কখন বিচরণ কখন বা বিলাস করেন। কখন বা দীপের ন্যায় শান্তিপ্রাপ্ত হন[২৪]। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, যখন তাহার ইচ্ছা হয় তখন তিনি ভবিষ্যৎ নূতন পুর প্রস্তুত করেন, তাহার অর্থ এইরূপে অবগত হইবে যে, সাঙ্কল্পিক বস্তুই ভবিষ্যৎ বস্তু বলিয়া উদাহৃত বা উল্লিখিত হয়। যখন তিনি কোন বস্তুর সঙ্কল্প করেন তখন তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। তাই বলা হই-

রাছে, তিনি তখনই ভবিষ্যৎ ও নবনির্ম্মিত-পুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[২৫]। এই রাজা দেহগৃহমধ্যে বিবিধ ক্রীড়া করতঃ সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া যখন শ্রমশান্তির নিমিত্ত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুষুপ্ত হন, তখনই সর্ব্বসঙ্কল্প রহিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্তপ্রায় হন। তিনি স্বীয় সঙ্কল্পমাত্র দ্বারা জাত হইয়া কেবল অনন্ত দুঃখই ভোগ করিয়া থাকেন; কখনও তাহার পরমানন্দ লাভ হয় না[২৬]। বালক কল্পিত যক্ষ (ভূত প্রেত) যেমন বালকদিগের সঙ্কল্পমাত্রপ্রসূত, সেইরূপ, খোথ রাজাও আপন সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। তাহার এ উৎপত্তি দুঃখের বৈ আনন্দের নহে[২৭]। এই যে বিস্তীর্ণ জগদ্দুঃখ, ইহাও কল্পনার বা সঙ্কল্পের প্রভাব। যদি কখন তাহার (সঙ্কল্পের) অসদ্ভাব ঘটনা হয়, তখন দেখা যায়, জগদ্দুঃখের গন্ধমাত্রও থাকে না। অন্ধকারই বস্তুদর্শনাভাবরূপ আন্ধ্যের হেতু, অন্ধকারের অভাবে তাহার অভাব অর্থাৎ তাহা থাকে না[২৮]। যেমন কোন চঞ্চল কপি একদা তক্ষকর্ত্তৃক অর্দ্ধবিদারিত কাষ্ঠমধ্যে বৃষণ রুদ্ধ হওয়ায় আপনারই চেষ্টার দ্বারা প্রোথিত কীলক উৎপাটিত করিয়া পরিশেষে মহাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় এই খোথ রাজাও অর্থাৎ মনঃও স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বকীয় দুঃখদ চেষ্টার দ্বারা দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়া থাকেন। যেমন কোন গর্দ্দভ একদা যদৃচ্ছাক্রমে উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময়ে তাহার মুখে অকস্মাৎ কোথা হইতে একবিন্দু মধু নিপতিত হওয়ায় সে তাহার আস্বাদে আনন্দ কল্পনা করিয়া সর্ব্বদাই উর্দ্ধ মুখে থাকিত, তেমনি, এই খোথ রাজাও স্বসঙ্কল্প-কল্পিত কিঞ্চিন্মাত্র বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছে[২৯।৩০]। যেমন চঞ্চলমতি বালকের কোন কার্য্যের স্থিরতা নাই, তাহার ন্যায় ইহারও স্থিরতা নাই অর্থাৎ সে কখন বিরতি, কখন রতি ও কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩১]। পুত্র! তুমি ইহাকে (মনকে) যত্নপূর্ব্বক ভাব (বহির্ম্মুখ বৃত্তি) হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। এ যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অর্থাৎ আত্মাভিমুখী হয়, তাহা কর[৩২]। এই সঙ্কল্পপ্রধান খোথ রাজার অধম, উত্তম ও মধ্যম দেহ আছে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ তমঃ সত্ত্ব ও রজঃ। এই তিনই জগৎস্থিতির কারণ[৩৩]। ঐ তিন্ দেহের মধ্যে যাহা তামস দেহ তাহার বিবরণ এই যে, তমঃপ্রভাবে প্রাকৃত চেষ্টাপরম্পরাদ্বারা অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

পরম্পরা দ্বারা কার্পণ্য অর্থাৎ নরক দুঃখ ভোগ করে, পরে কৃমিকীটাদি দেহ প্রাপ্ত হয়। সাত্ত্বিক দেহের বিবরণ এই যে, সত্ত্ব প্রাবল্যে ধর্ম্ম-পরায়ণতা লাভ করিয়া মোক্ষের সন্নিহিত হইতে থাকে। রাজসিক দেহের বিবরণ এই যে, রজোগুণের উত্তেজনায় লোকব্যবহারপরায়ণ হইয়া স্ত্রীপুত্রগণের সহিত সংসারে অবস্থান করে, তাহাতে তাহারা তুল্যরূপে দুরবস্থা বা সু-অবস্থা প্রাপ্ত হয়[৩৪।৩৬]। হে বুদ্ধিশালিন্! সঙ্কল্প-ময় খোখ রাজা যখন ঐ তিন্ প্রকারই পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনাকে পরম পদের দিকে অগ্রসর করেন, করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন[৩৭]। অতএব, হে পুত্র! তুমিও ত্রিবিধ দেহসম্পন্ন সঙ্কল্পরূপ মনকে নির্ব্বিকল্প মনঃদ্বারা বিনষ্ট কর, বাহ্য দৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবহার দৃষ্টি উভয়ই পরিত্যাগ কর, এবং সঙ্কল্প সমুদয় ক্ষয় কর[৩৭।৩৮]। তুমি যদি সহস্র বৎসর যৎপরোনাস্তি কঠোর তপোনুষ্ঠানে রত থাক, যদি তুমি বিস্তৃত শিলাখণ্ডে আপনার স্বদেহকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর, যদি তুমি প্রজ্বলিত হুতাশনে অথবা ভীম বাড়ব বহ্নিতে প্রবিষ্ট হও, যদি তুমি কণ্টক-সমাকীর্ণ শ্বভ্রমধ্যে নিপতিত হও, যদি তুমি প্রচণ্ডবেগবিঘূর্ণিত খড়্গা-ধারের দ্বারাও স্বদেহ খণ্ড খণ্ড কর, যদি তুমি মহেশ্বর, ব্রহ্মা, অথবা বিষ্ণু কর্তৃক গৃহীতমন্ত্র বা উপদিষ্ট হও, যদি তোমার দুঃখে লোকপতি মহেন্দ্রও করুণাক্রান্ত হন, আর যদি তোমার সঙ্কল্প ক্ষয় না হয়, তবে তোমার পরিত্রাণ নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে। তুমি পাতালে যাও আর স্বর্গে যাও, অথবা এই স্থানেই অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্প ক্ষয় ব্যতিরেকে কোন প্রকারে ও কুত্রাপি তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না। সঙ্কল্প বিনাশ ব্যতীত দুঃখোপশমের অন্য উপায় নাই[৩৯।৪২]। অতএব, তুমি পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক বাধারহিত, বিকারশূন্য ও পরম পাবন সঙ্কল্প উপশমের জন্য যত্নবান্ হও[৪৩]। হে অনঘ! একমাত্র সঙ্কল্পরূপ তন্তুতে নিখিল ভাবপরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্পতন্তু বা বাসনাতন্তু ছিন্ন হইলে দেখিবে, বিষয়ভাব সকল কোথায় পলায়ন করিয়াছে। কোথায় গেল, কি হইল, তাহাও জানিতে পারিবে না[৪৪]। জগৎ অসৎ হইয়াও সৎ এবং সৎ হইলেও পরমার্থতঃ অসৎ। যখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন ইহার সত্যতা কোথায়? হে তাত! সঙ্কল্প দ্বারা যাহা যখন কল্পিত হয়, তখন তাহা সৎ

বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, তুমি কোনও বিষয়ের সঙ্কল্প করিও না। সঙ্কল্প ক্ষীণ হইলেই চিৎ চেত্যত্ব পরিত্যাগ করিবে। অতএব, তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাগত ব্যবহারে অন্তমনস্কের ন্যায় প্রবৃত্ত থাকিবে৪৫।৪৭। সত্য ব্রহ্ম অসত্য মায়ার প্রচ্ছাদনে যোনি-পরম্পরা হইতে প্রাণিরূপে সমুত্থিত হইয়া থাকেন এবং অনাত্মময় ও অনর্থভূত জন্মমরণাদি সংসারদুঃখপরম্পরা বৃথা ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব হে অনঘ! যাহা আত্মসদৃশ নহে, অর্থাৎ নিত্য নিরঞ্জন আত্মার অনুপযুক্ত, সেই অনন্ত সংসারের অসৎ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিবার নিমিত্ত তোমার মরণে প্রয়োজন কি? মরিলেই জন্ম, জন্মিলেই অনর্থ। প্রাজ্ঞগণ ব্রহ্মপদই অবলম্বন করিয়া থাকেন; কদাচ দুঃখপ্রদ সংসারকে অবলম্বন করেন না। অতএব, তুমিও বিকল্পজাল পরিত্যাগ ও পরমার্থ গ্রহণ করতঃ সুষুপ্তচেতা হইয়া পরম সুখের নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় পরম পদের সাধনা কর৪৮।৫০।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—()✳()—

পুত্র কহিল, হে পিতঃ! সঙ্কল্প কি প্রকার? কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? কিসে তাহা বৃদ্ধি পায়? এবং কিসে তাহা বিনষ্ট হয়[১]? দাশুর বলিলেন, অসীম আত্মতত্ত্বের রূপ সত্তাসামান্য। ঘটসত্তা, মঠসত্তা, নদীসত্তা, নদসত্তা, ভূধরসত্তা, এ সকলকে বিশেষ সত্তা বলে। ঐ সকল বিশেষ সত্তায় যে ঘটাদি বিশেষণ সংলগ্ন আছে তাহা বিগলিত হইলে যে অসীম নির্ব্বিশেষ সত্তা খাঁটী হয়, তাহাকেই আমরা সত্তাসামান্য বলি। ঐ সত্তাসামান্য আর চিৎ-তত্ত্ব তুল্য কথা। চিৎতত্ত্ব যে অবিদ্যা সম্বলনে স্বরূপাবস্থান ত্যাগ করিয়া চেত্যোন্মুখ হয়, পণ্ডিতেরা সেই চেত্যোন্মুখতাকে অবিদ্যাবীজোদ্ভব সঙ্কল্প বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর বলিয়া বর্ণন করেন। (চেত্য=চিতের প্রকাশ্য। চিৎ বা চৈতন্য কোন প্রকার অবিদ্যাবিকারে প্রতিবিম্বিত হওয়া অর্থাৎ প্রথম বিকারকে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আর চেত্যোন্মুখ হওয়া সমান কথা।)[২] লেশমাত্র প্রাপ্তসত্তা সেই অঙ্কুর অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে এবং মেঘের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে[৩]। এতাদৃশ সঙ্কল্পবৃক্ষ চিতের অনন্ত দুঃখের নিমিত্ত স্বয়ং জাত বা উদ্ভূত হয়। এবং পরিবর্দ্ধিতও হয়। সঙ্কল্পবৃক্ষের জন্ম কদাচ সুখের নিমিত্ত নহে। যেমন বীজই অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, চিৎশক্তিও আপনার স্বরূপাতিরিক্ত চেত্য ভাবনা করে, করিয়া বিস্পষ্ট সঙ্কল্পভাব ধারণ করে[৪]। ক্রমে এক সঙ্কল্প হইতে আর এক সঙ্কল্প। এবংক্রমে সঙ্কল্পের জন্ম ও ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে থাকে[৫]। অর্ণব যেমন জলমাত্র, তদ্রূপ এই জগৎও সঙ্কল্প মাত্র। অতএব, সঙ্কল্পই সংসার, সঙ্কল্পই দুঃখ, তদ্ভিন্ন সংসার বা দুঃখ নাই[৬]। এই জগৎ সঙ্কল্পমাত্র বটে, মৃগতৃষ্ণা সলিলের ও দ্বিচন্দ্রের ন্যায় অসত্যও বটে, পরন্তু তাহা সত্যের ন্যায় জাত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার জন্ম কাকতালীয় ন্যায়ে ও বিভ্রমমূলক[৭]। হে পুত্র! মাতুলিঙ্গ নামে এক ফল আছে, তাহা

ভক্ষণ করিলে চাক্ষুষ পিত্ত দূষিত হইয়া যায়। চাক্ষুষ পিত্ত দুষ্ট হইলে শ্বেতেও কনক অর্থাৎ পীত ভ্রম জন্মে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, চিৎ অল্পমাত্র অজ্ঞান দোষে দুষ্ট বা কলুষিত হওয়ায় অসত্য সঙ্কল্প যেন কোথা হইতে আপনা আপনি আগমন করে[৮]। তাই বলিতেছি, তোমার হৃদয়স্থ সঙ্কল্প অসত্য, তাহার জন্মও অসত্য, স্থিতিও অসত্য। এই রহস্য জ্ঞানগোচর হইলে তখন আর সে অসত্যতাও থাকে না। যাহা কেবল সত্য পরমাত্মা, তন্মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে[৯]। এই আমি, ইহা আমার, এই সমস্ত ভাব অর্থাৎ পদার্থ বা বস্তু, এ সকল সুখের অথবা দুঃখের হইলেও মিথ্যা। সুতরাং ঐ সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিলে তখন আর পরিতাপের কিছুই থাকিবে না[১০]। তুমি স্বীয় সঙ্কল্প বশ-তঃই "আমি জাত" এইরূপ ভ্রান্তির দ্বারা বিমোহিত হইতেছ। তোমার আবার জন্ম কি? তুমি কদাচ ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কল্প করিও না। সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবনা কর; তাহাতে পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে[১১।১২]। সঙ্কল্পপরি-ত্যাগের জন্য যে প্রযত্ন, তাহা সর্ব্বপ্রকার ভয়ের বিনাশক। ভাবনার অভাব হইলেই সঙ্কল্প সংক্ষীণ বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[১৩]। শিরীষকুসুম দলন করিতে বরং কথঞ্চিৎ কষ্ট আছে ত সঙ্কল্পদলনে কিছুমাত্র কষ্ট নাই[১৪]। কেননা, সঙ্কল্প ভাবনামাত্র পরিত্যাগে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব, হে পুত্র! সঙ্কল্পরূপ শিরীষপুষ্প বিদলনের নিমিত্ত করস্পন্দরূপ যত্নও করিতে হয় না। কেবল মাত্র ভাবনাপরিত্যাগে উহা অর্দ্ধনিমেষ কাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে[১৫।১৬]। হে অঙ্গ! তোমার সঙ্কল্প প্রশ-মিত ও তুমি স্বীয় আত্মায় স্থিতি প্রাপ্ত হইলে তোমার সকল অসাধ্যই সুসাধ্য হইবে, তখন তোমার কিছুই দুঃসাধ্য থাকিবে না[১৭]। তুমি আপনারই মনের দ্বারা মনকে ও সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পকে বিনাশ করিবে, তাহাতে আবার দুষ্করতা কি? সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পের ছেদন, এ কথার অর্থ—সঙ্কল্প করিব না, এইরূপ সঙ্কল্পের দ্বারা এবং মনের দ্বারা মনের ছেদন, এ কথার অর্থ—নির্ব্বিকল্প মনঃদ্বারা সবিকল্প মনকে প্রশমিত করা। হে মহামতে! সঙ্কল্প উপশমিত হইলেই নিখিল সংসারদুঃখ সমূলে উন্মূলিত বা বিনষ্ট হইবে[১৮।১৯]। মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, এ সমস্তই সঙ্কল্পের রূপভেদ। সঙ্কল্পার্থ ব্যতীত ঐ সকলের অন্য কোন অর্থ নাই। যে হেতু সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই, সেই হেতু তুমি পৌরুষ অবলম্বনে

হৃদয়স্থ সংকল্প ছিন্ন কর; বৃথা শোক করিও না[২০।২১]। এই আকাশ যেমন শূন্য, জগৎও এতদ্রূপ শূন্য। উক্ত উভয় বিকল্পসমুত্থিত সুতরাং অসৎ বা অলীক[২২]। * এই জগৎ কখনও হয় নাই। কেবল মাত্র ভাবনারূপ সংকল্প ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে। যে ভাবনা ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে সে ভাবনা ক্ষয় হইলে ইহার কি থাকিবে[২৩]? ইহা যে সম্পূর্ণ অসৎ তাহা সহজে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। অবহেলা দৃষ্টিতে ইহাকে অবস্তু ভাবে দর্শন করতঃ আত্মামাত্রের ভাবনা করিলে ইহার অসত্তা প্রত্যক্ষীকৃত হয়। তাহা হইলে তখন আর স্ত্রীপুত্রাদিতে স্নেহ বা আস্থা প্রবর্ত্তিত হয় না। যখন আস্থা ক্ষয় হইলে সুখদুঃখ ও ভাবাভাব সমুৎপন্ন হয় না, তখন যে সুখদুঃখাদি কেবল বিভ্রমমূলক ও জগৎ অসৎ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না[২৪।২৬]। বাসনাবলিত ও উদ্ভূতশক্তি অবিদ্যাপ্রভব মনোরূপ জীব বাসনার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জগদ্রূপ মানস নগর বিস্তৃত করিতেছে। কখন বা বিনষ্ট ও কখন বা উৎপন্ন করিয়া তদ্ব্যবস্থায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জীব হৃদয়কাননের মর্কট। সে আত্মসদৃশ ক্রীড়ায় রত হইয়া কখন দীর্ঘতা এবং কখন বা হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইতেছে[২৭।২৯]। যেমন অগ্নিকণায় তৃণ নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা প্রদীপ্ত হইয়া নিঃশেষ হয়, সেইরূপ, এই জগৎও সংকল্প দ্বারা বিস্তৃত হইয়া অবশেষে সংকল্পের বিরামে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হে পুত্র! সংকল্প যখন তড়িদগ্নির ন্যায় ক্ষণবিধ্বংসী, ভ্রমপ্রদ, জড় ও জড়তাকারক এবং অসন্ময়, তখন ইহার চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি অনায়াসে ইহার চিকিৎসা করিতে সমর্থ। কারণ, যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না। যাহা সৎ তাহার চিকিৎসা করাই দুঃসাধ্য; কিন্তু যখন ইহা নিতান্ত অসৎ, তখন ইহার চিকিৎসায় পরিশ্রম কি? আত্মার সংসারমালিন্য যদি অঙ্গারের মলিনতার ন্যায় সত্য হইত, তাহা হইলে

---

* একটা শব্দ বা নাম আছে, পরন্তু বস্তু নাই। বস্তু নাই তথাপি নাম শুনিলে এক প্রকার জ্ঞান বা মনোবৃত্তি জন্মে। সে জ্ঞান, বস্তু না থাকায় মিথ্যা, অসৎ ও ভ্রম বিশেষ। যেমন অশ্বডিম্ব নাম আছে, বস্তু নাই। আকাশকুসুম নাম আছে, বস্তু নাই। সুতরাং ঐ সকল নামশ্রবণজনিত জ্ঞান বিকল্পজনিত ও অসৎ। এই জগৎও নাই অথচ নাম আছে ও জ্ঞান হইতেছে। কাযেই জগৎও বিকল্পজনিত ও মিথ্যা।

তাহা পুরুষার্থসলিল দ্বারা (পুরুষার্থ=মুক্তি) ধৌত হইত না। কিন্তু যখন ইহা আত্মায় তণ্ডুলে তুষকঞ্চুকের ন্যায় অবস্থিত, তখন ইহা পৌরুষ-প্রযত্নে অবশ্যই ধৌত বা বিনষ্ট হইবে। হে পুত্র! এই সংসারমল কেবল অজ্ঞগণের দুঃখের নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট অঙ্গারে মলিনতার ন্যায় সত্যভাবে সমুদিত হয়। কিন্তু প্রাজ্ঞগণের নিকট ইহা তাম্রে কালিমার ন্যায় ও তণ্ডুলে তুষের ন্যায় যত্ন দ্বারা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যত্ন দ্বারা ইহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, তুমি ইহার বিনাশে উদ্যত হও[৩৭।৩৮]। যখন এই সংসার অসৎ বিকল্প জ্ঞানে সমুত্থিত হইয়াছে, তখন ইহা অত্যল্প যত্নেই লয়-প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কোন্ অসদ্বস্তু দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে? যেমন দীপালোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, যেমন চক্ষু নির্ম্মল হইলে দ্বি-চন্দ্রভ্রম তিরোহিত হয়, তদ্রূপ, আত্মবিচার সমুদিত হইলেই এই অসৎ সংসার বিলীন হইয়া থাকে[৩৯।৪০]। এই সংসার সত্যবৎ দৃষ্ট হইলেও যখন ইহা মূলতঃ অসত্য, তখন তোমার ঈদৃশীসংসারের ভাবনা পরি-ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ এই সংসারে তোমার বা আমার বলিতে কিছুই নাই। এবং তুমিও এই সংসারের কিছু নহ। অতএব তুমি অবিলম্বে এই অনর্থভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। হে পুত্র! তোমার অন্তর হইতে মহাবিভব বিলাসাদি ভ্রান্তি সমুদয় সত্বর উপশম প্রাপ্ত হউক এবং তুমি স্বীয় সর্ব্বপ্রকার বিলাসের সহিত আত্মতত্ত্বরূপ পরম পদে বিলাস কর[৪১।৪২]।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সেই রাত্রে কদম্বগত দাশূর ও তৎপুত্র উভয়ের বর্ণিতপ্রকারের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া নভস্তল হইতে সেই কদম্বতরুর সন্নিহিত প্রদেশে বৃষ্টিবিহীন মেঘের পর্ব্বত শৃঙ্গে ও নভোগত পক্ষীর বৃক্ষাগ্রে পতনের ন্যায় নিঃশব্দে ফলপুষ্পসঙ্কুল কদম্ববৃক্ষের অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়াছিলাম১।২। দেখিলাম, মহামুনি দাশূর ইন্দ্রিয়নিগ্রহে মহাশূর ও তপস্তেজে হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী৩। অধিক কি বলিব, তাঁহার শরীর হইতে বিনির্গত ব্রাহ্ম্য তেজ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমূহের ন্যায় ধরাতল কাঞ্চনীকৃত করিতেছে। অপিচ, সূর্য্যদেব যেমন ভুবনকোষ প্রতপ্ত করেন, তাহার ন্যায় দাশূর স্বীয় তেজঃপ্রভায় সেই বৃক্ষ প্রজ্জলিতপ্রায় করিয়া রহিয়াছেন৪। অনন্তর তিনি আমাকে দেখিবামাত্র পত্রাসন বিস্তার করিয়া দিলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘাদির দ্বারা আমায় যথোচিত সৎকার করিলেন৫। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও তৎসহ সংসারতারণক্ষম তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বাক্যনিচয় বলাবলি করিলাম, তদনন্তর কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই মহামুনির কদম্বাশ্রমের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, মহাত্মা দাশূরের প্রসাদে মৃগগণ অব্যাকুলিতচিত্তে সেই লতামণ্ডিত বৃক্ষের কোটর প্রদেশে অবস্থান করিতেছে৬।৭। আরও দেখিলাম, ঐ বৃক্ষ শশাঙ্কধবল চমরপুচ্ছসমূহে ও শুভ্রবর্ণ মেঘমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া শরৎকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে৮।৯। তাহা হিমবিন্দুসমূহরূপ মুক্তামালায় ও পুষ্পনিকররূপ অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত১০। কদম্বপুষ্পের রেণুরূপ চন্দনরেণুতে বিচর্চ্চিত। বৃক্ষটী যেন সিন্দূরবর্ণ পল্লবরূপ রক্তাম্বরধারী ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া লতাঙ্গনার সহিত বিবাহার্থী বরবেশ ধারণ করিয়াছে১১।১২। মঞ্জরীসমাকীর্ণ লতামণ্ডপসমূহে বিমণ্ডিত হইয়া পতাকাকীর্ণ উটজ সমূহে পরিব্যাপ্ত মহোৎসবযুক্ত পুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে১৩। আরও বলিতে পারি,

মৃগগণ তদঙ্গে গাত্র কণ্ডূয়ন করায় তত্রস্থ পুষ্পসকল রেণু পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল রেণু তাহার (বৃক্ষের) সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হওয়ায় দেখিতে এরূপ হইয়াছে যে, বনবাসীরা যেন এক ধূলিধূসর উত্তুঙ্গ বৃষমল্লকে উপান্ত্য বনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে[১৪]। তত্রস্থ ময়ূরগণ পুষ্পপরাগে পাটলবর্ণ। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতেরা যেন সন্ধ্যা মেঘের শিশু পুত্র দিগকে (সন্ধ্যা-মেঘের শিশু পুত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড) এই বৃক্ষের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছে[১৫]। আরও মনে হয়, এই বৃক্ষ যেন এক বিলাসী পুরুষ, কিম্বা বনদেবী, অথবা বনদেবী দিগের নিলয়। যে যে অংশে ইহার বিলাসী পুরুষের ও বনদেবতার সহিত তুলনা হয় তাহা বলিতেছি। ইহার নব পল্লব গুলি যেন অলক্তক ম্রক্ষিত করশাখা, ফুল্ল পুষ্প ঈষৎ হাস্য, পুষ্পমধু মধুপানের বিপ্রুষ, (ফুৎকার করিলে যে বিন্দু বিন্দু বা কণা নির্গত হয় তাহাকে বিপ্রুষ বলে) পুষ্পের উপরিভাগস্থ কেশর পুলক, বায়ুসমান্দোলিত পুষ্প ভারান্বিত শাখাগ্রের প্রচলন মধুপানমত্ততার প্রস্খলন, মুকুল সকল নিদ্রালস চক্ষু, গুচ্ছীভূত পুষ্পপ্রকর স্তন, পুষ্পপরাগ সমাচ্ছাদিত সর্ব্বাঙ্গ কুঙ্কুমরঞ্জিত বসনের (পরিধানের) অনুকারী, লতাবিতানের মধ্যভাগ বাসস্থান, তাহার মধ্যগত অবকাশ (ফাঁক) বাতায়ন, পুষ্প পত্রাদির চঞ্চলতা দোলাবিলাস, পক্ষীর কলরব আলাপ, পুষ্পোপবিষ্ট ভ্রমর সকল চক্ষুর নীলবর্ণ তারক (মণি)[১৬।২০]। হে রাঘব! তাহার সুষমার কথা আর বলিব! অপর এক দৃশ্যের বর্ণনা এই যে, অসংখ্য উন্মত্ত ভ্রমরমিথুন যেন পরস্পর প্রণয়োচিত ধ্বনি সহকারে কখন পুষ্পগর্ভরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ এবং কখন বা তথা হইতে বহিরাগমন করতঃ সানন্দে ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। নীলবর্ণ মক্ষিকা (মৌমাছি) গণ যেন উপান্ত্য বনের সংবাদ দিতেছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহারা যেন উৎকর্ণ করিয়া কি শুনিতেছে। কখন বা ফলাগ্রভাগে বিশ্রাম, কখন বা অন্তর শাখায় অবস্থান, কখন বা পত্রপুট মধ্যে অবস্থান, কখন বা নিলীন ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই স্থানের মৃগেরা যেন বনস্থলীর সরলস্বভাব শিশু পুত্র। এই স্থানের পক্ষিগণ নিরুপদ্রবে সুবিশ্বস্তভাবে কুলায়মধ্যে অবস্থিত। ইহার ফল যখন সুপক্ক হইয়া নিপতিত হয়, তখন উপান্তস্থিত (নিকটবর্ত্তী) মৃগাদি তদ্ভক্ষ-

পার্শ্বে আগমন করিয়া মণ্ডলাকারে অবস্থান করে[২১,২৬]। ভ্রমরগণ যেন অরিগণের ভয়ে চুপ্ করিয়া পুষ্পগুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছে। পল্লবমণ্ডিত পুষ্পগুচ্ছ সমূহের সুগন্ধে সমুদায় বন আমোদিত। চতুর্দ্দিক্ পুষ্পপরাগ ও ফলাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অধিক কি বলিব, এই তরুশ্রেষ্ঠের এমন পত্র নাই, যাহা তত্রত্য প্রাণিগণের উপকারী নহে। মৃগগণ বিশ্বস্ত-ভাবে ইহার গলিত (পতিত) পত্রে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং পক্ষিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে ইহার প্রত্যেক কচ্ছপ্রদেশে (কচ্ছ=পত্রের নিম্নভাগ) নিলীন রহিয়াছে[২৭,৩০]।

অশেষগুণবিশিষ্ট তাদৃশ বৃক্ষ দেখিতে আরম্ভ করিলে আমার পক্ষে সেই তমস্বিনী মহোৎসবসদৃশী আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছিল। অনন্তর আমি হৃষ্টচিত্তে কিয়ৎকাল সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিক দর্শন করিয়া পরে মহাত্মা দাশূরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত মহামতি দাশূরের সেই সর্ব্বগুণাকর শিষ্যকে বিজ্ঞানালোকরম্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদানও করিলাম[৩১,৩২]। তাহাতে সেই বনদেবীর পুত্র পরম বোধ প্রাপ্ত হইল। বিজ্ঞানগর্ভ বিচিত্র কথোপকথনে সেই শর্ব্বরী মুহূর্ত্ত-কালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। প্রভাতকালের আগমনে তারকানিকর অদর্শন প্রাপ্ত হইল। তখন আমি দাশূর মুনির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অমরনদীতে গমন করতঃ স্নানাদি স্বাভিমত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিলাম এবং পুনর্ব্বার নভোমার্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল ভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলাম[৩৩,৩৬]।

হে রঘুনন্দন! আমি তোমার নিকট দাশূরোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। মহাত্মা দাশূর যাহা কহিয়াছেন, সে সমস্তই সত্য। জগৎ প্রতিবিম্বতুল্য, অসত্য ও অসৎ। জগতের উক্তবিধ রহস্য বিজ্ঞাপনার্থই আমি তোমার নিকট দাশূরাখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি দাশূর মুনির দৃষ্টান্ত দ্বারা অবাস্তব বস্তু পরিত্যাগ ও বাস্তব বস্তু গ্রহণ করতঃ উদারাত্মা হও। তুমি দাশূরসিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা হইতে ব্যর্থ কল্পনা সকল পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করতঃ অচিরাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হও[৩৭,৪০]।

দাশূরোপাখ্যান সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

—()✻()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এ সকল কিছু অর্থাৎ কোন বস্তু নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তুমি এ সকলের অনুরঞ্জনা পরিত্যাগ কর। যাহা নাই তাহার প্রতি বিচারশীল দিগের আস্থা কি[১]? যদি দেখা যায় বলিয়া দেহাদির কোন সত্তা থাকে তবে সে সত্তা তুমিই; কেননা, তুমি আছ বলিয়াই তোমার নিকট সে সকল আছে। অতএব তুমি আপনাতে অবদ্ধভাবনা হও, জড় জগতের ভাবনায় আত্মাকে বদ্ধ করিও না[২]। যদি ইহার সত্তা অসত্তা উভয় থাকা অবধারণ কর, তথাপি ভাবনার প্রয়োজন নাই। যাহা চলাচলস্বভাব তাহার ভাবনায় বদ্ধ হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত[৩]? রাম! যদি জড় জগতের স্বতন্ত্র অস্তিতা না থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, নির্ম্মল আত্মতত্বই ঈদৃশভাবে বিস্তৃত হইয়াছে[৪]। ইহা কোন কর্ত্তার কৃতি বা কার্য্য নহে এবং ইহাতে কর্ত্তৃকর্ম্মাদির কোনরূপ ক্রমও নাই। অমুক কর্ত্তা, অমুক কর্ম্ম, এরূপ প্রতীতি আভাসমাত্র অর্থাৎ বুদ্ধির বিভ্রাট্‌ মাত্র। বুদ্ধির বিভ্রাট্‌ বা বিপর্য্যয় আকস্মিক[৫]। অকর্ত্তৃকই হউক আর সকর্ত্তৃকই হউক, তুমি চিত্তে ইহার ভাবনা রাখিও না[৬]। আত্মা যখন নিরিন্দ্রিয় তখন বুঝিতে হইবে যে, যদি আত্মা ইহার কর্ত্তা হন তবে তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব জড়ের কর্ত্তৃত্বের অনুরূপ। (যেমন লোকে বলে, মঞ্চ ক্যাঁচ্‌ কোঁচ্‌ শব্দ করিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, মঞ্চের শব্দকর্তৃত্ব উপচার ব্যতীত বাস্তব নহে)। যেমন কাক গমনের পর তাল ফলের পতন দেখিলে লোকে বলে কাক তাল ফেলিয়া গেল, বস্তুতঃ কাক তাহা ফেলে নাই, সেইরূপ জগৎকেও লোকে আত্মার কৃত বলে, অথচ আত্মা ইহাকে করে নাই। ইচ্ছা, জ্ঞান, যত্ন, এই তিনের দ্বারা যাহা কৃত, তাহাই প্রকৃত কৃত অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তাই প্রকৃত কর্ত্তা। জগৎ কার্য্য সে প্রক্রিয়ায় কৃত বা নিষ্পন্ন না হওয়ায় ইহাকে আকস্মিক ব্যতীত

প্রকৃত কর্তৃকৃত বলা যায় না। যাহা কাকতালীয় ন্যায়ে জন্মে তাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ। সুতরাং তাহাতে ভাবের (অস্তিতার) অনুসন্ধান নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত অন্য কেহ করে না[৭।৮]।

হে রামচন্দ্র! বর্ত্তমানে ইহা অনুক্ষণ দেখা যাইতেছে ও ভবিষ্যতেও ইহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইবে। এ ভাবে (এরূপ দেখা অনুসারে) ইহা আছে ও অবিনাশী। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ইহা নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং ইহার বাস্তব সত্তা নাই। অর্থাৎ ইহার অস্তিত্ব কোনও কালে নাই। অপিচ, ইহা সর্ব্বদাই অনুমানে অবস্থান করে সুতরাং ইহার বিনাশও অবাস্তব[৯।১০]। যখন ইহার বিনাশ ও অবিনাশ উভয়বিধ অবস্থা দৃষ্ট হয় তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা এক অকিঞ্চিৎ তুচ্ছ ও অনির্ব্বাচ্য। যাহা বাস্তব সত্য তাহার কি কখন ক্ষয় আছে? না বিনাশ আছে? থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যিনি আদ্যন্তবর্জ্জিত বিজ্বর ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত তিনি (পরমাত্মা) কেন ইহাতে বৃথা কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া খেদ প্রাপ্ত হইবেন? তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ভাব ও অভাব উভয় অবস্থান্বিত ঈদৃশ দৃশ্য মূলে একই মিথ্যা হইতে জন্মিয়াছে। ইহা যতই প্রৌঢ়, যতই দীর্ঘ, এবং যতই স্থিরা হউক, আত্মা ইহার সন্নিধানে আছেন বলিয়া ইহার তদনুযায়ী সত্তা বা অস্তিতা আছে। তিনি কর্ত্তা হন হউন, পরন্তু ইহার সহিত একলোল হইয়া দুঃখানুভব করা উচিত নহে[১১]। মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর, তাহা অনন্তকালের নিকট নিমেষের লক্ষৈক ভাগ অপেক্ষাও অল্প ও তুচ্ছ। কেনই বা আদ্যন্তরহিত পরমাত্মা তাদৃশ শত বৎসরের নিমিত্ত মিথ্যা বিষয়ের অনুগামী হইবেন? যদি এমনও হয় যে, জগতের ভাব সকল (পদার্থ) স্থিরস্বভাব, তাহা হইলেও চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আস্থা করা শোভা পায় না। কেননা, জগতের ভাব জড়, কিন্তু তিনি চেতন। জড় ও চেতন এই দুই বিসদৃশ ভাবের পরস্পর সংশ্লেষ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে[১২।১৩]? যদি ইহাই স্থির হয় যে, জগদ্ভাব অস্থির, অর্থাৎ ক্ষণধ্বংসী, তাহা হইলে ত ইহার প্রতি আস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেই পারে না। কেননা কেনতুল্য নশ্বর পদার্থের প্রতি আস্থা স্থাপন করিলে দুঃখ পাওয়ার স্থিরতাই আছে[১৪]। অতএব হে মহাবাহু রাম! জগৎ স্থায়ী হউক,

আর অস্থায়ী হউক, ইহাতে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। কেনের পর্ব্বত স্থায়ী হউক, আর অস্থায়ী হউক, বুদ্ধিমান লোক তৎপ্রতি অনুসক্ত হন না (তাহাতে আরোহণ করে না। কেননা, কখন ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা জানা যায় না)[১৬]। আত্মা ইহার কারণ সত্য; কিন্তু কর্ত্তা নহেন। দীপ যেমন আলোকের কারণ হইলেও কর্ত্তা নহে, তেমনি, আত্মাও জগৎ কার্য্যের কারণ হইলেও কর্ত্তা নহে, অধিকন্তু তিনি উদাসীন[১৭]। সূর্য্য হইতেই দিবস হইতেছে, অথচ সূর্য্য দিবসকার্য্য করিতেছেন না। দিন যাইতেছে কিন্তু রবি যাইতেছেন না। তিনি আপনারই আস্পদে (স্থানে) রহিয়াছেন। যেমন অরুণানদীর জলের আবর্ত্ত, সেইরূপ এই জগতের স্থিতি ও বিস্তৃতি *। হে রাঘব! যদি তুমি প্রমাণপরিশুদ্ধ চিত্তে নিপুণ হইয়া ঐরূপ বিচার ও অবধারণ করিয়া থাক, তথাপি তোমাকে বলি, তুমি পদার্থ ভাবনা করিও না। কে অলাতচক্রের, স্বপ্নের ও ভ্রমের ভাবনা করিয়া ক্লেশ পায়[১৮।২১]? জীব আপনা আপনি আকস্মিক ভাবে আসিয়াছে, সেজন্য সে সৌহার্দ্দের পাত্র নহে। ভ্রান্তিজনিতদুঃখের প্রতি কাহার সৌহার্দ্দ থাকে[২২]? যেমন শীতকাতর ব্যক্তি উষ্ণভ্রান্তিময় চন্দ্রে, তাপার্ত্ত ব্যক্তি শীতলভ্রান্তিযুক্ত অর্কে ও তৃষ্ণার্ত্ত জীব মৃগতৃষ্ণিকা জলে আস্থা ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় তোমারও জগতের আস্থা ত্যাগ করা উচিত। যেমন সঙ্কল্পপুরুষ, স্বপ্ন, যেমন দ্বিচন্দ্রভ্রম, তেমনি এই জগদ্ভাব। অতএব তুমি যে হও সে হও, কিছুমাত্র ভাবিবে না, এবং অন্তরস্থ এই সকল দৃশ্যের ভাব ভাবিও না। ভাবনা পরিত্যাগ করিবে এবং লীলাসহকারে বিহার করিবে।

---

* অরুণানদীর তীর স্বভাবতঃ শিলাসঙ্কটযুক্ত। পরন্তু সেরূপ শিলাসঙ্কট সম্বন্ধে সে উদাসীন। অর্থাৎ সে তাহা করে নাই। তদীয় জলের পরিমাণাদিও নিম্নানুসারী, সে পক্ষেও সে উদাসীন। অর্থাৎ তাহাও সে করে নাই। কিন্তু তাহার তাদৃশ তীর ও জলের প্রপূরণ উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ ঘোরতর আবর্ত্ত জন্মে। তাই বলিয়া কি উক্ত নদী আবর্ত্তের কর্ত্তা হইল? এইরূপ মনে করা উচিত যে, কোন এক প্রকার আকস্মিক কারণে ঐ আবর্ত্ত জন্ম লাভ করিয়াছে, অরুণা তাহা করে নাই। সেইরূপ, চিৎ ও জড় দুয়ের সন্নিধানে এই অযথা ও আশ্চর্য্য দৃশ্য (জগৎ) আকস্মিক কারণে জন্ম লাভ করিয়াছে মাত্র, আত্মা ইহা করেন নাই। আত্মার উপর কর্ত্তৃতার স্থাপন করা নিতান্ত অযুক্ত।

যেমন ইচ্ছারহিত দীপের সন্নিধান মাত্রে আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত রত্নের সন্নিধানে অন্ধকার তিরোহিত হয়, যেমন ইচ্ছারহিত সূর্য্যের সন্নিধান মাত্রে জগৎ-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়, যেমন মেঘের উদয় কালে নিরিচ্ছ কুটজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ ইচ্ছারহিত দেবের সত্তাসন্নিধান মাত্রেই এই জগৎ স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই মনে করিতে হইবে যে, আত্মা ইচ্ছারহিত, সুতরাং অকর্ত্তা এবং তাঁহার সন্নিধান আছে, তাই সে ভাবে তিনি কর্ত্তা। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া তিনি কর্ত্তা নহেন, ভোক্তাও নহেন। আবার সন্ময় এবং সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হওয়ায় কর্ত্তাও বটেন, ভোক্তাও বটেন[২৩।৩২]। হে অনঘ! আত্মাতে উক্ত প্রকারে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বিদ্যমান আছে। উভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা তোমার শ্রেয়োলাভ হয়, তুমি তাহারই আশ্রয় লও অর্থাৎ তাহাই স্থির কর[৩৩]। যদি তুমি "আমি কর্ত্তা নহি" এইরূপ ভাবনাকে সুদৃঢ় করিতে পার তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি তাহাতে লিপ্ত হইবে না। যাহার আমি কর্ত্তা নহি, কিছু করিনা, এইরূপ নিশ্চয় আছে, চিত্তের অপ্রবৃত্তি হেতু তাহার ভোগসংশক্তি জন্মে না[৩৪।৩৫]। লোকে দেখে বটে যে, যেন সে ভোগ করিতেছে বা ভোগ ত্যাগ করিয়াছে, পরন্তু উক্ত উভয় ভাবেই সে অনাসক্ত। তাদৃশ বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ ভোগ সমূহ করুক বা না করুক, তাহার নিকট উভয় পক্ষই সমান। তাই বলিতেছি, "আমি অকর্ত্তা" নিত্য এইরূপ ভাবনায় চিত্ত রাগ-হীন হইলে সর্ব্বত্র এক সমতারূপ পরমামৃত অবশিষ্ট বা বিদ্যমান থাকে। আর যদিও "আমিই সমস্ত করিতেছি" এইরূপ মহাকর্ত্তৃতা অবলম্বন কর, (ব্রহ্মের ন্যায়) তাহা হইলে সে ভাবও মন্দ নহে; প্রত্যুত তাহাও উত্তম। কেননা, তাহাতেও শ্রেয়োলাভ হইবে। আমিই জগতের এক-মাত্র কর্ত্তা, ইহাতে অন্য কর্ত্তা নাই, অন্তরে এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলে রাগদ্বেষাদি থাকার সম্ভাবনা কি? আমি জগতের কেহই নহি, স্বাভাবিকী নিয়তির দ্বারাই আমি এরূপ হইয়াছি, আমার এই দেহ অন্য কর্ত্তৃক জাত, অন্য কর্ত্তৃক লালিত, অন্য কর্ত্তৃক পালিত ও অন্য কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতেছে, অন্তরে এরূপ অকর্ত্তৃভাব দৃঢ়ীভূত হইলেও হর্ষা-মর্ষক্রমের সম্ভাবনা থাকে না। একমাত্র আমারই সুখাসুখ বিস্তারের

নিমিত্ত আমিই এই জগতের ক্ষয়োদয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, অন্তরে এরূপ এককর্তৃভাব দৃঢ়তরীভূত হইলেও খেদোল্লাসাদি তিরোহিত হয় [৩৮।৪১]। ঐরূপ এককর্তৃতার দ্বারা খেদোল্লাসাদি বিলীন হইলে একমাত্র সমতাই অবশিষ্ট থাকে। সেই সত্য পরা সমতায় যাহার চিত্ত অবস্থিত, সেই সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনই জন্মমরণ দুঃখে নিপতিত হয় না। অথবা হে রাঘব! তুমি কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্ব উভয় পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান কর। "এই আমি, উহা আমি নহি, আমি ইহা করিতেছি, আমি উহা করিতেছি না" জনগণ স্বীয় দুঃখের নিমিত্তই ঐরূপ ভাবময়ী দৃষ্টির অনুসন্ধান করে। আমি দেহী, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যাহারা দেহে স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই স্থিতিকে কালসূত্র নামক নরকে স্থিতি, মহাবীচিনামক নরকের বন্ধনী ও অসিপত্রবন নামক নরকের সংস্থিতি বলিয়া জানিবে। অতএব সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইলেও যত্নসহকারে ঐরূপ স্থিতি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ক্ষেমাকাঙ্ক্ষিগণ ঐরূপ কুক্কুরমাংসবাহিনী চণ্ডালিনীসদৃশী মাংসভারবাহিনী দেহস্থিতি হইতে দূরে অবস্থান করেন। এই অনর্থদায়িনী স্থিতিকে দৃষ্টিপথ হইতে দূরে পরিহার করিতে পারিলে দৃষ্টি তখন মেঘবিহীন জ্যোৎস্নার ন্যায় পরম নির্ম্মলা হইয়া প্রকাশ পায়। তখন সেই বিমল দৃষ্টি দ্বারা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় [৪২।৪৮]। হে সাধো! আমি কর্ত্তা নহি, এই দেহাদি আমার নহে, তুমি অন্তরে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করতঃ অবস্থান কর; অথবা আমিই একমাত্র কর্ত্তা, সমস্ত জগৎই আমি, এইরূপ নিশ্চয় করতঃ সর্ব্বোত্তম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হও। অথবা আমি কে?, আমি কেহই নহি, এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পদজ্ঞ উত্তম সাধুগণ যে পদে অবস্থান করেন, সেই পরম পদের আশ্রয় গ্রহণ কর [৪৯]।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ।

—)(*)(—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে বলিলেন, আত্মা অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা ও অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা, কিছু না করিলেও ভূত কৃৎ, বুঝিলাম, তাহাই সত্য ও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত[১]। তিনি উক্ত প্রকারে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বগামী। এই পৃথিবীতে যেমন চতুর্ব্বিধ জীব শরীরের অবস্থান, তাহার ন্যায় সেই চিন্ময় দেবে এই সকলের ও ভুবনের অবস্থিতি; অথচ তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত[২]। এ রহস্য আমি এখন আপনার উক্তিপরম্পরা শ্রবণে বোধগম্য করিতে পারিয়াছি[৩]। সত্য বটে; সেই দেব উদাসীন ও নিরিচ্ছ; সুতরাং তিনি কোন কিছু করেন না এবং ভোগও করেন না, তথা তাঁহারই সত্তায় সমগ্র লোক সত্তা প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত, এ ভাবে তিনি করেন এবং ভোগও করেন, এরূপ বলা যায়[৪]। কিন্তু হে ভগবন্! উহা ছাড়া আমার হৃদয়ে আর এক মহান্ সংশয় জাগরূক রহিয়াছে। অতএব, সূর্য্য যেমন আলোক দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহার ন্যায় উপদেশ প্রদান দ্বারা আমার সে সংশয় দূরীভূত করুন[৫]। হে ব্রহ্মন্! "ইহা সৎ, ইহা অসৎ, তাহা এই, এই আমি, উহা আমি নহি," ইত্যাদিবিধ অজ্ঞানমূলক কল্পনাজাল সেই একাদ্বয় পরব্রহ্মে কিরূপে স্থান লাভ করে? যেমন সূর্য্যে অন্ধকারের কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ তেমনি ব্রহ্ম-সূর্য্যেও ঐরূপ ঐরূপ আজ্ঞানিক কল্পনাও যুক্তিবহির্ভূত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তাই আমার জিজ্ঞাস্য—নিতান্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ আত্মায় প্রথম কল্পনা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল[৬।৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি সিদ্ধান্ত কালে তোমার এই প্রশ্নের এমন অকাট্য উত্তর প্রদান করিব যাহার দ্বারা তুমি ঐ তত্ত্ব অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারিবে[৮]। রাম! যত দিন না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও, তত দিন তুমি এরূপ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বোধগম্য করিতে পারিবে না[৯]। রাম! যেমন যুবকেরাই কান্তাগীতবাক্য শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, সেই-

রূপ, নির্ম্মলাশয় পুরুষই ঐরূপ প্রশ্নের সদুত্তর গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র[১০]।
অনুরাগকথা বালকের নিকট বৃথা হয়। তাহার ন্যায় অর্দ্ধবোধবান্ ব্যক্তির নিকট উদার কথা বৃথা হইয়া থাকে[১১]। শরৎকাল উপস্থিত হইলে তখন নাগরঙ্গ প্রভৃতি বৃক্ষের ফল হইতে দেখা যায়, বসন্তকালে নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তদ্রূপ, পুরুষের সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণের ফলাফলও সময় সাপেক্ষ[১২]। রং যেমন নির্ম্মল বস্ত্রে উত্তমরূপে সংলগ্ন হয়, মলিন বস্ত্রে নহে, তাহার ন্যায়, উদার বিজ্ঞান কথাও পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, মলিন বুদ্ধিতে নহে[১৩]। আমি ইতিপূর্ব্বে একবার এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়াছি; কিন্তু বিস্তৃতরূপে বর্ণন না করায় তুমি তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই[১৪]। যখন তুমি আপন আত্মজ্ঞানে আপনাকে অবগত হইতে পারিবে, তখনই তুমি স্বয়ং ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবে[১৫]। যখন তুমি বোধপ্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল আত্মায় অবস্থান করিবে, তখন আমি সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইব এবং তখনই এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তারক্রমে বর্ণন করিব। রাম! আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি সুপ্রসন্ন হইলেই তদ্দ্বারা আপনাকে জানা যায়, ইহা নিশ্চয় জানিবে। তিনি কর্ত্তা কি অকর্ত্তা, তাহার বিচার প্রণালী বলা হইল। বলা হইল বটে; কিন্তু যাবৎ অখণ্ডব্রহ্মাত্মভাবের উদয় না হয় তাবৎ বিচার করিলেও বাসনা ক্ষয় হয় না। সেজন্য বাসনা ক্ষয়ের কতিপয় উপায় বর্ণন করি, প্রণিহিত হও[১৬।১৮]।

বৎস রাম! বাসনার দ্বারাই বন্ধন, এবং বাসনার ক্ষয়েই মোক্ষ। অতএব প্রথমে তুমি সংসার বাসনা পরিত্যাগ কর, পশ্চাৎ মোক্ষ কামনায় বাসনাকে (সংস্কারকে)ও পরিত্যাগ করিবে[১৯]। বাসনা বিনাশের প্রথম পীঠিকা বৈরাগ্য। সুতরাং প্রথমতঃ যাহাতে তামসী বাসনা অর্থাৎ দুর্গতিজনক তমঃপ্রধান ও মানুষ্যাদিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা পরিত্যাগ হয় তাহার চেষ্টা করিবে। পরে মৈত্র্যাদি বিষয়ক নির্ম্মল বাসনা অবলম্বন করিবে। * তৎপরে সে বাসনাও পরিত্যাগ

* দুর্গতিজনক বাসনা—নরকোৎপাদক কর্ম্মের ইচ্ছা অর্থাৎ পাপাচরণে প্রবৃত্তি। মানুষ্যাদিজনক রজঃপ্রধান বিষয়ের বাসনা—সকাম কর্ম্মে অথবা পুণ্যপাপ মিশ্রিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি। নির্ম্মলবাসনা—নিষ্কাম কর্ম্মে স্থিতি এবং যোগশাস্ত্রোক্ত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, এই গুণচতুষ্টয়ে সুসিদ্ধ। সর্ব্বভূতে দয়ার নাম মৈত্রী, তাহাদের দুঃখে

করিয়া চিদ্বাসনাতৎপর হইবে। যখন তুমি মন ও বুদ্ধি সমন্বিত চিদ্বাসনাকেও বিলীন করিতে পারিবে তখন তুমি নিরবচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্বে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তি পদে স্থিত হইতে পারিবে[২০,২২]। অতএব, যাহাতে তুমি প্রাণস্পন্দন, কল্পনা, কাল, প্রকাশ ও তিমিরাদি, ইত্যাদিবিধ বাসনাবাসিত বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমুদয়কে ও সমূল অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিয়া ব্যোমের ন্যায় প্রশান্তমনোবৃত্তি সুতরাং কেবল চিন্ময় হইতে পার, তাহার যত্ন করিবে[২৩,২৪]। হে মহামতে! যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত ভাবাভাব উন্মূলিত করিয়া অব্যগ্র অবস্থায় অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত এবং তিনিই পরমেশ্বর[২৫]। যিনি হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থা বিতাড়িত করিয়াছেন, পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সমাধি বা অন্যান্য কার্য্যাদি করুন বা না করুন, মুক্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহার মন হইতে বাসনা বিগলিত হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না, এবং কর্ম্ম না করিলেও অকরণজনিত প্রত্যবায় প্রাপ্ত হন না। অধিক কি বলিব, তিনি সমাধি ও জপাদি দ্বারাও ফল প্রাপ্ত হন না[২৬,২৭]। পণ্ডিতগণ দীর্ঘকাল বিচারের পর এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, বাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন না করিলে কদাচ উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না[২৮]। দশদিক্ পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া অনেকে অনেক দেখেন বটে, কিন্তু বস্তু দেখেন, এরূপ লোক কয়টী লোক[২৯]? যিনিই হউন, তাঁহারা যাহা দেখেন তাহা অবিদ্যমান। অর্থাৎ যাহা দেখেন তাহা নাই। মনুষ্য প্রায়ই বহিঃপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই কারণে তাহারা বাহিরে ইষ্ট ও অনিষ্ট এবং তদ্দ্বয়ের প্রাপ্তি ও পরিহার উদ্দেশে চেষ্টিত হয়[৩০]। তাহারা যাগ যজ্ঞ দান হোম পূজা পরোপকার প্রভৃতি যে কিছু কার্য্য করে সমস্তই তাহারা দেহপ্রেমের প্রেরণায় করে, আত্মানন্দের জন্য নহে[৩১]। কি পাতালে, কি ব্রহ্মলোকে, কি স্বর্গে, কি বসুধাতলে, কি অন্তরীক্ষে, এরূপ প্রাজ্ঞ অতি বিরল, যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে হেয়োপাদেয় প্রভৃতি অসদুত্থিত নিশ্চয় পরম্পরা বিগলিত হইয়াছে। জনগণ ত্রিভুবনের রাজত্ব

দুঃখিত হওয়ার নাম করুণা, তাহাদের সুখে সুখী হওয়ার নাম মুদিতা এবং তাহাদের দুর্ব্বৃত্ততায় উদাসীন থাকারই নাম উপেক্ষা।

প্রাপ্তই হইক, জলধর মধ্যেই প্রবেশ করুক, অথবা সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করুক, আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত কুত্রাপি বিশ্রান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। যে সমস্ত মহামতি জরা ও জন্ম বিনাশার্থ ইন্দ্রিয়রূপ মহাশত্রুর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, তাঁহারাই পূজ্য[৩২।৩৫]।

স্বর্গ বল, পাতাল বল, ভূতল বল, যে স্থানে যাও সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত পাইবে, ষষ্ঠবস্তু পাইবে না, সুতরাং কোন্ মহাত্মা স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে গিয়া রতি প্রাপ্ত হয়[৩৬]? প্রাজ্ঞ লোক তত্ত্বযুক্তির সহিত বিচরণ করেন, তাই তাঁহাদের নিকট সংসার গোষ্পদ তুল্য। অজ্ঞ লোক সেরূপে বিচরণ করে না, সেই কারণে তাহারা দেখে, সংসার উন্মত্ত মহার্ণব তুল্য[৩৭]। যাঁহাদের চিত্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্বগোলকের ন্যায় অতিক্ষুদ্র সুতরাং সমস্তই তাঁহাদের প্রাপ্ত; প্রাপ্তব্য কিছু নাই। সেজন্য তাঁহারা দান, আদান, ভোগ, কিছুই করেন না[৩৮]। হে রামচন্দ্র! যাহাদের বুদ্ধি মহতী নহে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সমস্ত আধি স্বরূপ। এই সকল তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত মূঢ়গণ যে লক্ষ লক্ষ প্রাণিবিনাশন সমরাদি ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সেই কার্য্যকে ও তাহাদিগকে ধিক্[৩৯।৪০]। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, স্বর্গাদির দ্বারা আত্মার কোনরূপ উন্নতি বা অবনতি হয় না। সুতরাং ত্রিজগৎ প্রাপ্তে তাঁহার কি বল বৃদ্ধি হইবে[৪১]? এক দিকে শৈলশতব্যাপ্ত ও অপরদিকে জলব্যাপ্ত এই পৃথিবী পরিমাণে কতটুকু যে তদ্দ্বারা সর্ব্বত্যাগী বিপুলাশয় মহাপুরুষের মানসোদর পূরণ করিতে পারে[৪২]? এ জগতে, পাতালতলে ও স্বর্গলোকে এমন কিছু নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞগণ প্রয়োজন বোধ করিবেন[৪৩]।

হে মহামতে! একতাপ্রাপ্ত, বিগলিতমনা, ব্যোমবৎ বিস্তৃত, স্বস্থ ও আত্মরত তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট নির্ম্মল ও ভাস্বর ব্রহ্মই অমল সমুদ্র। এই সমুদ্র আকাশকোটরসন্নিভ অপার, অপর্য্যন্ত ও অতিবিস্তৃত। এ সমুদ্র শরীররূপ নীহারজালে বিবলিত, ত্রিলোকরূপ বিপুল তটে পরিবেষ্টিত ও কুলাচলরূপ ফেনদ্বারা মণ্ডিত ও সৃষ্টিরাজিরূপ তরঙ্গে রঙ্গিত। ইহা হইতেই অনুত্তম পদরূপ জলধরমণ্ডল সমুত্থিত হইয়া শাস্ত্রদৃষ্টিরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারই বিপুল তট-প্রদেশে চিৎসূর্য্যের মহান্ আলোক এবং তাহা হইতেই এই জগৎশ্রীরূপ মৃগতৃষ্ণানদী সমুদ্ভূত হইয়া ঘোর সংরম্ভসহকারে প্রবাহিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রতারিত হইয়া

কামভোগরূপ তৃণভোজী এবং তৎস্পৃষ্ট সংসাররূপ অরণ্যে সুরাসুরনরাদি অরণ্যচারী মৃগগণ বিচরণ করিতেছে। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি, এ সকল তদীয় আলোককণায় আলোকিত, অর্থাৎ প্রকাশিত[৪৯।৫০]। এই বনে কতকগুলি চর্ম্মপুত্রিকা বা পুত্তলিকা (চামড়ার পুতুল) অবোধ দিগের বুদ্ধি বিনোদনের উপায় স্বরূপে সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সকল পুত্রিকা (পুত্তলিকা) এক একটী পেট্‌রা মধ্যে নিহিত বা স্থাপিত। পেট্‌রার অর্গল অস্থিখণ্ড, মস্তককপাল (মাথার খুলি) তাহার পিধান, স্নায়ু তাহার শিকল[৫০।৫১]। কিন্তু যাহারা মহাবুদ্ধি ও উদারমনা তাঁহারা ঐ সকল চর্ম্মপুত্রিকা (পুত্তলিকা) হইতে স্বতন্ত্র। বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগসমূহ তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না[৫২]। জ্ঞানীরা এরূপ অত্যুচ্চ পদে অবস্থান করেন যে, সে পদ বা যে স্থান হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদির স্থান পাতাল অপেক্ষাও নিম্ন[৫৩]। লোকপাল সকল যে আলোকে সমালোকিত হন, তত্ত্বজ্ঞগণ সেই আলোকে বিরাজ করেন[৫৪]।

হে মহামতে! আকাশে অম্বুদের উদয় হয় কিন্তু অম্বুদ আকাশের অনুরঞ্জন করে না। তাহার ন্যায় হৃদয়াকাশে জগদ্ভাব সমুদিত হয় বটে; কিন্তু তাহা তত্ত্বজ্ঞগণের অনুরঞ্জনে সমর্থ হয় না[৫৫]। পূর্ব্বে পার্ব্বতী বহুযত্নেও মহেশ্বরের অনুরঞ্জন করিতে সমর্থা হন নাই, * তাহার ন্যায় এই জগৎশ্রীও তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মুখে নৃত্য করিয়াও তাঁহাদিগকে রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা কেবল মর্কটের ন্যায় অনর্থ নৃত্য করিতে থাকে[৫৬]। রাজহংস যেরূপ তুচ্ছ শৈবালে অনুরক্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ এই ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ বিলোল বিষয়সুখভোগে অনুরক্ত হন না। অধিক কি, কোনও জগদ্ভাব তত্ত্বজ্ঞের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় না[৫৭।৫৮]।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

---

* দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। হিমালয়-কন্যার অপর নাম পার্ব্বতী। যে দিন সতী প্রাণ ত্যাগ করেন সেই দিন হইতে মহেশ্বর মহাযোগ অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হন। এ দিকে পার্ব্বতী বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে দেবতাদের অনুরোধে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যত্নবতী হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা পারেন নাই। অধিকন্তু শিবের কোপে কামের বিনাশ ঘটনা হয়। এ ইতিবৃত্ত পুরাণে বিখ্যাত।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ

—)(*)(—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই বিষয়ে বৃহস্পতি পুত্র কচ যে গাথা (গাথা=শ্লোক বিশেষ) গান করিয়াছিলেনন বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুমেরুর অন্তর্গত কোন এক গহন বনে সুরগুরুপুত্র কচ ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস করিতেছিলেন। অভ্যাসে পটুতা জন্মিলে সহসা একদিন তিনি আত্মায় বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন১।২। তাঁহার বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃতে পরিপ্লাবিত হওয়ায় তাঁহার রতি পঞ্চভূত দৃশ্যজাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল৩। তাদৃশ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত কচ সর্ব্বত্র একমাত্র আত্মাই অবস্থিত, এই রহস্য বা ব্যাপার অবলোকন করতঃ যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রীতমনে হর্ষগদ্গদ্বচনে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন৪, অহো! আজ্ আমার করণ, গমন, গ্রহণ, ত্যাগ, সমস্তই স্রক্ সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়াছে। যেমন মহাকল্পে সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হয় তাহার ন্যায় আজ্ এই বিশ্ব আত্মায় পরিপূর্ণ দেখিতেছি৫। অহো! আমি দেখিতেছি, সুখও আত্মা, দুঃখও আত্মা, আশাও আত্মা, আকাশও আত্মা ও সমস্তই আত্মা। আজ্ আমি আপনা আপনি নষ্টকষ্ট (যাহার ক্লেশ নাই সে নষ্টকষ্ট) হইয়াছি। বাহিরেও আত্মা, অন্তরেও আত্মা, নিম্নেও আত্মা, ঊর্দ্ধেও আত্মা, সমস্ত দিকেই আত্মা, এখানে আত্মা, ওখানে আত্মা, সর্ব্বত্রই আত্মা, সমস্তই আত্মময়, ও আত্মাই সমস্ত, আত্মা নহে এমন কিছুই নাই৬।৭। আমি এখন আত্মাতেই অবস্থিত। এমন কোন বস্তু বিদ্যমান নাই যাহা আত্মা হইতে অতিরিক্ত। কি চেতন, কি অচেতন, সমস্ত পদার্থই সন্ময় আত্মারই রূপান্তর। যে হেতু আমিই সমস্ত, সেই হেতু আমার আর কোন কিছুর অভাব নাই; আমি একার্ণবের ন্যায় সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি৮।৯।

হে রামচন্দ্র! বৃহস্পতিপুত্র কচ সেই কনকাচল সুমেরুর অন্তর্গত কুঞ্জমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘণ্টানিনাদস্বনে ওঁ ধ্বনি

করিলেন। যেমন সেই ধ্বনির বিরাম হইল, তেমনি তিনি তুর্য্যপদ প্রাপ্ত হইলেন এবং বাহ্যান্তরবিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রকার কলনাকলঙ্ক বিগলিত ও প্রাণবায়ুর বৃত্তিনিচয় অন্তর্ব্বিলীন হইল। তখন তিনি বিগতভ্রম, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া মেঘবিহীন শরদাকাশের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন[১০।১২]।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

——(*)(○)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! যাঁহারা অন্নপান বা স্ত্রীসম্ভোগাদিতে কিছুই শ্রেয়ো নাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা এই জগতে কি বাঞ্ছা করিবেন[১]? পশুরা, পক্ষীরা ও অসাধু মূঢ় মানবেরা আদি মধ্যান্ত-ভঙ্গুর বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত হয়[২]। এক দিকে কেশ ও এক দিকে রক্তমাংসাদি। তাহারই সমবায়ে প্রমদাতনু (নারীমূর্ত্তি)। যাহারা তাহাই বাঞ্ছা করে, তাহারা নরগর্দ্দভ[৩]। কুকুরেরাই তাহা পাইয়া পরিতুষ্ট হয়, যাহারা প্রকৃত মানব, তাহারা নহে। সমুদায় মহী মৃত্তিকাময়ী, সমস্ত তরু কাষ্ঠময়, এবং সমুদায় দেহ মাংসময়[৪]। নীচে মৃত্তিকা, এবং পৃষ্ঠে আকাশ, ইহাতে এমন কি অপূর্ব্ব বস্তু আছে—যাহা সুখ দিতে পারে? সমস্তই ইন্দ্রিয় স্পর্শের অনুসারী, বিবেকের নিকট ভঙ্গপ্রবণ, সুতরাং কেবল মাত্র মোহপ্রদ, অবিচার রমণীয় ও ব্যবহার মাত্রের আস্পদ। বলা বাহুল্য যে সমস্তই পরিণাম বিরস[৫।৬]। যেমন দীপের মালিন্য কজ্জল, তেমনি, ভোগের মালিন্য দুঃখ। মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মাত্রেই দুঃখপ্রদ, আগমাপায়ী সুতরাং অনিত্য[৭]। বিষয় সম্পদ পুনঃ পুনঃ ভোগে ভোগে হস্তিপদ বিদলিত লতার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অহো! মোহের কি অদ্ভুত ক্রম! যাহারা অস্থিরচিত্ত তাহাদিগকে রক্তমাংসময়ী পুত্তলিকাকে দেহ ভ্রমে আলিঙ্গন করাইতেছে। (তাহাতে আমার আমি ইত্যাকার অভিমান জন্মাইতেছে।) হে রাঘব! যাহারা অজ্ঞ তাহাদের নিকট ঐ সকল স্থির, সত্য ও সুখের স্থান। কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের নিকট এ সমস্তই অস্থির, অসত্য ও অতুষ্টির স্থান। এই দৃশ্যজাল অতি দুরন্ত বিষ। এ বিষ ভক্ষণ না করিলেও ইহার স্মরণ (ভাবনা) বিষমূর্চ্ছা প্রদান করে[৮।১০]। সেইজন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি ভোগের আস্থা দূরে, পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মগতির ভজনা কর। আত্মময়ী ভাবনা বিদ্যমান থাকিলে বিষয়ভোগ নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হয় না। চিত্ত যখন অনাত্মভাবনায়

স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখনই এই জগজ্জাল আবির্ভূত হইয়া থাকে। বলিতে কি, ব্রহ্মও অনাত্মভাবনায় কল্পিত বৃহদ্বপু প্রাপ্ত হন[১১।১২]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মন বিরিঞ্চিপদ * প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ক্রমে অর্থাৎ কোন্ প্রণালী অবলম্বনে এই জগৎকে চতুর্ব্বিধ জীব সৃষ্টির দ্বারা নিবিড়িত করেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই প্রথম শিশু পদ্মযোনি বিরিঞ্চি পদ্মকোষরূপ শয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়াই "ওঁ ব্রহ্ম" এই শব্দ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার ব্রহ্মা নাম হইয়াছে। তখন ইঁহার আকৃতি কোটী কোটী সঙ্কল্পময় মনের সমষ্টিমাত্র ছিল। পরে তিনি আপনার কল্পনায় আপনার চতুর্ম্মুখতা নিষ্পাদন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি পর পর সৃজন করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন[১৩।১৪]। তাহাতে প্রথমতঃ মহাপ্রভাযুক্ত সুতরাং আলোকপ্রধান ও সর্ব্বনভোব্যাপী এক মহাতেজ আবির্ভূত হইয়াছিল। শরৎকালের অবসানে তুষারধবল লতাচক্র যেমন দিগ্বিভাগ পরিবেষ্টিত করে তাহার ন্যায় সেই মহাতেজ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে সেই মহাপ্রভ তেজের উভয় পার্শ্ব দিয়া শত শত তেজ বিচ্ছুরিত (নির্গত) হইতে লাগিল। পক্ষীরা পক্ষ বিস্তার করিলে যেমন তাহাদের পক্ষে শত শত ক্ষুদ্র পালক গ্রথিত থাকা দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় মনোব্রহ্মার উভয় ভাগ হইতে বিনিঃসৃত সেই সকল মহাতেজ যেন সেইরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্থাৎ সেই মূল তেজোমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে কদম্বগোলকে

* পূর্ব্বকল্পীয় উপাসকের ব্যষ্টি অভিমানী মন সমষ্টি উপাসনায় (আমিই সব, এই ভাবের উপাসনায়) দৃঢ়তার দ্বারা আপনার ব্যষ্টিত্ব দূর করিয়া সমষ্টিতায় পরিণামিত হইয়াছিল। পরে কল্পারম্ভ কালে সেই উপাসনাসিদ্ধ সমষ্টি মন প্রথমতঃ বিরিঞ্চি অর্থাৎ প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মা হইয়া কথিত প্রকারে আবির্ভূত হন। হইয়া প্রথমতঃ সূর্য্য সৃজন করেন। সূর্য্য সৃজনের পর অগ্নি ও অন্যান্য তেজ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের সৃজন করেন। এ সকল তাঁহার মানসী সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায় ক্রমেই ঐ সকল আবির্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় অঙ্গ হইতে শতরূপা প্রভৃতি নারী সৃজিতা হয়। নারী সৃজনের পর রৈতসী সৃষ্টির আরম্ভ। পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃতের বা শুভাদৃষ্টের অনুবলে ব্রহ্মপুত্র দিগের বিনা রেতে জন্ম হইয়াছিল। সেরূপ শুভাদৃষ্ট না থাকায় অন্যের সেরূপে জন্ম হয় নাই ও হইতেছে না। অন্যান্য পুরাণে এই সৃষ্টির বিষয় বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা—ব্রহ্মার মানস পুত্রের ন্যায় মানসী কন্যাও কতকগুলি হইয়াছিল তৎপরে আর তিনি মানস মানসী পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন নাই।

কেশরের ন্যায় অসংখ্য কিরণ গাঁথা রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। সেই সকল বিপ্রসৃত তেজ অসীম, পিঞ্জরবর্ণ, বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় ভাস্বর ও ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় নির্ম্মল[১৬।১৭]। পদ্মজ ব্রহ্মা তাহার মধ্যগত হওয়ায় তিনি সেই প্রভাজালাত্মক মণ্ডলকে আপনার শরীর বলিয়া স্থির করিলেন। তেজোমণ্ডলমধ্যগত সেই দেব অদ্যাপি পিণ্ডাকৃতি দিবাকর হইয়া লোকের প্রত্যক্ষ হইতেছেন[১৮।২১]। অনন্তর তিনি সূর্য্যমণ্ডল নির্ম্মাণের পর অন্যান্য তেজোমণ্ডলও সৃজন করিলেন। অগ্নিনামা তেজ সেই সূর্য্যাংশুর প্রান্তস্থিত[২২]। পরে সেই পূর্ব্বোক্ত তেজের অংশ বিশেষ হইতে তদীয় সঙ্কল্পে মরীচি প্রভৃতি অবান্তর প্রজাপতি জন্মিলেন। তাঁহারাও পদ্মজের সঙ্কল্পে পদ্মজের ন্যায় সিদ্ধসঙ্কল্প ও তুল্যক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁহারা যখন যেরূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাহাতেই ক্রমে বর্ত্তমান ভূতগণের অর্থাৎ প্রাণিগণের আদিপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল[২৩।২৫]। পরে মৈথুনধর্ম্মের দ্বারা সেই সমস্ত ভূতগণের পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। * বহুল প্রজার, সৃজন হইল দেখিয়া তাহাদের নিমিত্ত পূর্ব্বকল্পাধীত বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশপ্রাপ্ত করিলেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী ক্রমে যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে লাগিল এবং অন্যান্য শাস্ত্র মর্য্যাদাও স্থাপিত হইল[২৫]।

এইরূপে সেই বিশ্ব বৃংহণ কর্ত্তা মনোব্রহ্মা সঙ্কল্প দ্বারা সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণসম্পন্ন বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত করিয়াছেন। ইহা সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, নানাবিধ লোক, মেরু, মেরুপীঠ, সুখ, দুঃখ, জরা, জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি, রাগ, দ্বেষ, উদ্বেগ ইত্যাদি বহুভাবে পরিপূর্ণ[২৬।২৮]। তিনি আদিসর্গে যে যে বস্তুর কল্পনাময়ী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা দৃষ্ট হইতেছে[২৯]। হে রামচন্দ্র! তুমি ভাবিয়া দেখ, যখন ইহা মনোরূপ পদ্মজের সঙ্কল্প সমুদ্ভুত, তখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু

* প্রলয়কালে সমুদয় জীব ব্রহ্মে বিলীন ছিল। পরে পুনঃ কল্পারম্ভ কালে কতকগুলি জীব ব্রহ্মার মানস পুত্র ও মানসী পুত্রী রূপে আবির্ভূত হইল। এবং কতক গুলি ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতাকাশে কিছু কাল থাকিয়া স্থূল ভূত সৃষ্টির পর সমুদায়ের সমবায়ে রক্তমাংসাদিময় শরীর গ্রহণে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের দ্বারায় মৈথুন ধর্ম্মের ও তাহা হইতে পুত্র পুত্রীর জন্মারম্ভ হয়।

নহে। একমাত্র সঙ্কল্পদ্বারাই এই জগজ্জাল ও দেশকালক্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়াছে। দেবগণও সঙ্কল্পে সমুৎপন্ন হইয়া নিয়তির নিয়মে অবস্থান করিতেছেন। অতএব, মোহই এ সকলের স্থিরতা বুদ্ধির মূল। অধিক কি বলিব, জগতের সমুদায় কার্য্যই সঙ্কল্প হইতে প্রসূত। পদ্মাসনস্থ প্রভু ব্রহ্মা সৃষ্ট্যর্থ যখন যাহা চিন্তা করেন তখনই তাহা তাঁহার মনঃস্পন্দে অর্থাৎ সঙ্কল্পে সৃষ্ট হয়। এবং উক্ত ক্রমেই এই বিচিত্রব্যবহারময়ী সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে। রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও শৈল, সাগর, পাতাল, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি, সমস্তই তদীয় সঙ্কল্পিত সৃষ্টির কোটরে অবস্থিত[৩০।৩৫]। সেই পদ্মজ ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকে আপনারই সঙ্কল্পজাল সমুত্থিত সুতরাং মায়িক বা মিথ্যা বলিয়া জানেন, তখন আর তিনি সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টি হইতে বিরত হন। আমি আর এরূপ বিকল্প কল্পনা করিব না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অনর্থসঙ্কুল কল্পনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনিই আপনাকে অনাদি অনন্ত পরম মহৎ পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন[৩৬।৩৭]। তখন তাঁহার মনোবৃত্তি বিগলিত ও অহঙ্কার তিরোহিত হয় এবং তিনি স্বয়ং নির্ম্মল পরম প্রশান্ত অবিক্ষুব্ধ হইয়া বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় অপার অপর্য্যন্ত নির্ম্মল শান্ত আত্মায় পরম সুখে অবস্থান করেন। এইরূপে তিনি কখন সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টিকল্পনা করেন এবং কখন বা সৃষ্টিকল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত পরমাত্মায় অবস্থান করেন[৩৮।৩৯]। সেই প্রভু ভগবান্ কখন কখন ঐরূপে ধ্যান হইতে বিরত হন, এবং কখন বা সুখদুঃখ সমন্বিত শত শত আশাপাশে বিবলিত এবং রাগ দ্বেষ ভয় প্রভৃতিতে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের তত্ত্ব বিচার করেন[৪০।৪১]। অনন্তর তিনিই করুণাক্রান্ত হইয়া প্রাণীদিগের মঙ্গলার্থ বিবিধ মহার্থযুক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র, বেদ ও বেদাঙ্গ প্রভৃতির সংগ্রহ এবং পুরাণাদি প্রকট করেন[৪২।৪৩]। পরে পুনর্ব্বার আবার তৎপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া এই পরম আপদ হইতে উত্তীর্ণ, স্বস্থ ও শান্ত হইয়া অবস্থিতি করেন[৪৪]। কমলপীঠস্থ ব্রহ্মা এক এক বার জগচ্চেষ্টা দর্শন ও মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং পুনঃ কেবল আত্মায় অবস্থান করেন[৪৫]। সেই সঙ্কল্পপরিহীন পদ্মজ ব্রহ্মা কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে লোকানুগ্রাহী হন[৪৬]। অপিচ, ত্যাগ, শরীরগ্রহণ, সৃষ্টিরূপে নানাত্ব, পদ্মে স্থিতি, অন্যত্র অবস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্ট

নানা ভাবের সমারম্ভ (অর্থাৎ মহান্ আড়ম্বর) যে কিছু বলিবে, সকল অবস্থায় বা সকল সময়ে তিনি পরমার্থকল্পে মুক্ত ও পরিপূর্ণ একার্ণব-তুল্য[৪৭।৪৮]। তিনি যে কখন কখন প্রবুদ্ধ হন তাহাও জীবানুগ্রহার্থ[৪৯]।

হে মহামতে! আমি যে তোমার নিকট এই পবিত্র ব্রাহ্মী স্থিতি বর্ণন করিলাম, এ স্থিতি প্রজাপতিগণ ও দেবগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মানসী চিন্তার ফলস্বরূপ, সেই হেতু তাঁহারা প্রোক্ত ব্রহ্মারই অনুরূপ[৫০।৫১]। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি-সম্পন্ন। পরে তাঁহাদের দ্বারা যাঁহারা সৃষ্ট হন তাঁহাদের মধ্যে কেহ সুর, কেহ যক্ষ, তাঁহারা উপদেশ শ্রবণ মাত্রে ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ[৫২।৫৩]। ফল কথা এই যে, দেব হউক, আর মনুষ্য হউক, সকলেই সত্ত্বগুণানুসারে মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। তথা সত্ত্বগুণানুসারে ভোগলম্পট ও ভোগ-বিমুখ হন। মোক্ষও তদনুসারে শীঘ্র ও অশীঘ্র হয়। হে রামভদ্র! এই জগৎস্থিতিকে তুমি এইরূপ জানিবে যে, ইহা স্ফুট, প্রকট ও সঙ্কট, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। স্ফুটকর্ম্ম=জ্ঞানবহুল কর্ম্ম অর্থাৎ উপাসনাদি। প্রকটকর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ যাগ যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম। সঙ্কটকর্ম্ম অর্থাৎ অধোগতির কারণীভূত অবৈধ কর্ম্ম। মিশ্রকর্ম্মও এতন্মধ্যে নিবিষ্ট আছে বলিয়া জানিবে। ঐ সকল কর্ম্মের অনুসরণ, তজ্জনিত বিবিধ প্রারব্ধের উৎপত্তি, সে সকলের বেগ, তদনুযায়ী আহার বিহার, ক্রীড়া কৌতুক, তদ্‌ঘটিত ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির উদয় বা উত্তেজনা, তদ্‌ঘটিত ব্যবহার পরম্পরা, এবংক্রমে এই অনীকত্রয়যুক্ত সৃষ্টি ব্রহ্মার কল্পনায় পরব্রহ্মে আবির্ভূত ও স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে[৫৪।৫৫]। *

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

---

* অনীক ত্রয়ের বিবরণ এই যে, প্রথম বিধ্যনীক অর্থাৎ মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণের সৃষ্টি। তৎপরে মিথুন ধর্ম্মে প্রজাত সুরানীক অর্থাৎ দেব গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ প্রভৃতি। তৎপরে তৃতীয় অনীক মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি। এতন্মধ্যে প্রথম অনীক উৎকৃষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। কারণ এই যে, এই অনীক ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মানস পুত্র। সেই কারণে উৎকৃষ্ট। এই অনীকে সত্ত্বগুণ অধিক এবং সে সত্ত্ব উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অতি যৎসামান্য রজস্তমের সম্বন্ধ যুক্ত। সেই কারণে এই অনীক স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী। দ্বিতীয় অনীক মধ্যম। কারণ এই যে, ইহারাও সত্ত্ববহুল অর্থাৎ প্রচুর সত্ত্বগুণোৎপন্ন। ইহারা সেই কারণে সকৃৎ উপদেশে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ। তৃতীয় অনীক অধম। কারণ এই যে, ইহারা রজোস্তমোগ্রস্ত হওয়ায় সহস্র সহস্র প্রযত্ন অবলম্বনের পর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! কল্পান্তকালে ব্রহ্মলীন জীবেরা (মহাপ্রলয়ে জীবগণ ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। পরে আবার তাঁহা হইতে বহিরাগত হয়) ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে প্রকারে বা যে ক্রমে দেহ পরিগ্রহ করে, সে ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মার সমাধি ভঙ্গ * হইলে অর্থাৎ তিনি প্রবুদ্ধ হইলে সৃষ্টির বা কল্পান্তরের প্রারম্ভ হয়[১]। অর্থাৎ যেমন পদ্মমধ্যে ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইলেন, অমনি অন্য কল্পের প্রারম্ভ হইল। কল্পের প্রারম্ভ হইল, এ কথার অর্থ এই যে, জীবজগৎ যেন এক অপূর্ব্ব ঘটীযন্ত্র, তাহা এক্ষণে পুনর্ব্বার আপন ব্যবস্থায় বা পূর্ব্ববৎ বহমান হইল। কল্পান্তমৃত জীবসংঘ তাহার ঘট, জীবিত-তৃষ্ণা অর্থাৎ পুনর্ব্বার দেহ গ্রহণের ইচ্ছা তাহার রজ্জু, দেহে জীবিত থাকা তাহার জল[২]। ফলকথা—জীবদিগের পুনঃ আরোহ অবরোহ অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ ও ঊর্দ্ধগতি অধোগতি হওয়া আরব্ধ হইল। ঈশ্বরের প্রথম পুত্র যে ব্যোম অর্থাৎ মনঃসমষ্টিরূপ ব্রহ্মা, তাঁহারই মধ্যগত প্রলয়বিলীন ব্যষ্টি মন। সে সকলের মধ্য হইতে কতকগুলি পক্ষীর ন্যায় ভবপিঞ্জরে প্রবেশ করিল। কতক ব্রহ্ম লাভার্থে বিচলিত হইতে লাগিল, কতক অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং কেহ বা সুষুপ্তের ন্যায় তাঁহাতেই বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইল[৩,৪]। (অর্থাৎ অসংখ্য জীব মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে একীভূত বা মিশ্রিত প্রায় হইয়া-

---

* এ সমাধি পূর্ব্বকল্পের সমাধি। যে উপাসক ব্রহ্মাহমস্মি এবংপ্রকারে সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন, সেই উপাসক সে কল্পের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই রূপেই ছিলেন। তাঁহার তৎকল্পের দেহাদি লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল তাঁহার অগণ্যসংস্কারযুক্ত মনোমাত্র বিদ্যমান ছিল। সমাধি বশতঃ সে মনঃও প্রসুপ্তের ন্যায় বা নাস্তিপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সেই সমাধি বা যোগনিদ্রা অপসৃত বা ভঙ্গ হইল।

গিয়া এক হইয়াছিল, এখন আবার সেই সকল জীব পূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞান কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে কেহ সমষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, কেহ বা বিচ্ছিন্ন হইল না। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল না, তাহারা সেই ব্রহ্মশরীরে বা সমষ্টি মধ্যে থাকিয়া গেল। যাহারা থাকিয়া গেল তাহাদের কেহ কেহ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকিল, কেহ বা নির্ব্বাণ লাভার্থ সমাধিগত হইয়া থাকিল। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইল, তাহারাই দেহী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে যাহারা পক্ষীর নীড় ত্যাগের ন্যায় সমষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বহিরাগত হইল, তাহারা বক্ষ্যমাণ ক্রমে দীর্ঘকাল পরে শরীরী হইয়াছিল এবং যাহারা অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গমের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র রূপে অযোনিসম্ভব শরীরী হইয়াছিল। মরীচ্যাদি ঋষি সেই অযোনিসম্ভব শরীরী অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস পুত্র)।

হে রামচন্দ্র! সমুদ্রে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় অনাদিমধ্যান্ত (যাহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই) পরব্রহ্মে জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন কি না ব্রহ্মার কল্পনায় বিস্পষ্ট হওয়া°। ধূম যেমন মেঘ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তাহারা অর্থাৎ সেই সকল জীবেরা প্রথমে ভূতাকাশে প্রবেশ করে। পরে তাহারা আকাশের ও বায়ুর সহিত ক্ষীরনীরের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া যায়*। পরে তেজ জল ও পৃথিবী সৃষ্ট হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রায় সংসৃষ্ট হয় এবং এই সময়ে বায়ু তাহাদিগকে আক্রম করে। অর্থাৎ বায়ু তখন তাহার প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়। (বায়ু যেমন প্রাণ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি, তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও অন্যান্য ভূত অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়।) বিশদ কথা—উক্ত ক্রমে প্রথমে লিঙ্গদেহ জন্মে। এই লিঙ্গদেহস্থ জীবগণ আকাশ ও মারুত কর্ত্তৃক তেজ ও অম্বু যুক্ত ভূতলে আনীত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই তন্মাত্রগণের সহিত সমবেত হয়। এবং বায়ু তাহাদের স্থানীয় হইয়া তাহাদিগকেও বিবশীকৃত করে। পরে আকাশ ও মারুত সমাক্রান্ত প্রাণাত্মতাপ্রাপ্ত জীব সংঘাত সেই মারুতের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণবাতের সহিত মিলিত হয় ও ওষধি প্রভৃতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করে। তদনন্তর সেই সকল ওষধি দেহিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া

তাহাদিগের শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই রেত স্ত্রী গর্ব্ভে নিষিক্ত হয়, তৎপরে দেহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অনভিব্যক্ত জ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তৃতীয় অনীকের উৎপত্তি এবং লিঙ্গশরীরের ও স্থূল শরীরের উৎপত্তির ক্রম এইরূপ। * এক্ষণে দ্বিতীয় অনীকের উৎপত্তি ক্রম বলি শ্রবণ কর। দ্বিতীয় অনীকের লিঙ্গদেহোৎপত্তি একই ক্রমে অর্থাৎ প্রোক্ত ক্রমে হইয়া থাকে। তৎপরে তাহারা যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যের সংস্কার বলে অর্থাৎ স্ব স্ব অদৃষ্টের তেজে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে তাহারাই দেবতা ও দ্বিতীয় অনীক। অবান্তর ক্রম এই যে, যাহারা ওষধি বা বনস্পতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক ফলপুষ্পাদি রূপে পরিণত হয় তাহারা যজমান কর্ত্তৃক অগ্নিতে আহুত হইয়া আহুতি সমুত্থ ধূমের সহিত সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডল হইতে চন্দ্ররশ্মিতে নিপতিত এবং সেই ইন্দুকিরণের সহিত রসভাব প্রাপ্ত হইয়া কল্পবৃক্ষ (দেবলোকের বৃক্ষ) ফলমধ্যে প্রবেশ করে। সে সকল সূর্য্যকিরণদ্বারা পরিপক্ক হইলে দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ভোক্তার শরীরে রেতোভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর দেবীগণের গর্ব্ভে মূর্চ্ছিতপ্রায় ও সুপ্তবাসন (সুপ্তবাসন=অনুদ্বুদ্ধ-সংস্কার) হইয়া অবস্থান করে। পরে দেবজন্ম পরিগ্রহ করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করে। দ্বিতীয় সুরানীকগণের ও তমোগুণযুক্ত রাজস সাত্বিক জাতির অর্থাৎ তৃতীয় অনীকের (মনুষ্যাদির) সৃষ্টি এইরূপ। হে রামচন্দ্র! যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, বট বীজে বট ও মৃত্তিকায় ঘট থাকে, পরে বিবিধ ক্রমে সে সকল বহিরাগত হয়। তাহার ন্যায় প্রোক্ত

---

* যাঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ও প্রজাপতি (কশ্যপ প্রভৃতি), কেবল তাঁহাদেরই দেহ অযোনিসম্ভব অর্থাৎ রেত রক্ত সম্ভূত নহে। পরন্তু দেহ হওয়ায় দেহের ধর্ম্ম ভক্ষণাদি ও রেতোরক্তাদি সমস্তই তাঁহাদের ছিল। সুতরাং তাঁহারাও শস্যপ্রবিষ্ট জীব ভক্ষণ করিতেন ও শস্যপ্রবিষ্ট জীবেরা তাঁহাদের দেহেও রেত রূপে পরিণত হইয়াছিল। জীব রেতেই থাকে, স্ত্রীদিগের আর্ত্তব রক্তে থাকে না। সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, জীব রেতেই অবস্থান করে, আর্ত্তব রক্তে নহে। আর্ত্তব রক্ত দেহোৎপত্তির উপকরণ মাত্র। যে রেতে জীব থাকে না, সে রেতে সন্তান জন্মে না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হওয়ার ও প্রত্যেক সংসর্গে সন্তান না হওয়ার ঐ রহস্যই অন্যতম কারণ।

মহেশ্বর হইতে জীব সকল নানা ক্রমে বহিরাগত হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে স্ত্রীপুত্রাদি অবলোকন করেন নাই, অর্থাৎ আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, যাঁহারা মরণ পর্য্যন্ত সর্ব্বভোগে বিরত ছিলেন, তাঁহারাই পর-জন্মে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া উদার ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকেন[৭।১৭]। ঐরূপ দেবজন্ম ও মনুষ্যজন্ম সাত্ত্বিক জন্ম বলিয়া গণ্য। কিন্তু হে মহাবাহো! যাঁহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ভোগলম্পট হন, তাঁহাদিগকে তুমি রাজসসাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট প্রথম জাত বিধ্যনীকের অর্থাৎ পিতামহসৃষ্ট সাত্ত্বিক প্রজাপতি গণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না[১৮।২০]। রাজসসাত্ত্বিক পুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা আত্মবোধ প্রাপ্ত হইয়া যখন সাত্ত্বিকত্ব প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন না। তখন সেই সমস্ত মহাগুণশালী দুর্লভ পুরুষগণ জীবন্মুক্ত হইয়া পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন। যাহারা তামসপ্রধান অর্থাৎ রাক্ষস-পিশাচ তির্য্যগাদি, তাহারা স্থাবরতুল্য জ্ঞানহীন। সেজন্য আত্মজ্ঞান বিচার তাহাদিগের নিকট বিরাজ করে না[২১।২৫]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা রাজসসাত্ত্বিক উপাদানে জন্ম লাভ করেন তাঁহারা নিত্যপ্রমুদিত ও প্রকাশগুণান্বিত[১]। আকাশ যেমন সর্ব্বদাই নির্ম্মল তাহার ন্যায় তাঁহারাও অমলস্বভাব; সেজন্য তাঁহারা কদাচ বা কোনও সময়ে খেদ প্রাপ্ত হন না। যেমন সুবর্ণপদ্ম রাত্রিকালেও অম্লান থাকে তাহার ন্যায় তাঁহারা দিবা রাত্র অম্লান থাকেন, সমূহ আপদেও ম্লান হন না[২]। যেমন পাদপগণ প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, তদ্বৎ তাঁহারাও প্রারব্ধানুযায়ী ভোগ ব্যতীত ভোগান্তরের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সর্ব্বদা সদাচারে অবস্থান করেন[৩]। হে রামচন্দ্র! যেমন শীতলতা হিমাংশুকে পরিত্যাগ করে না, তাহার ন্যায় মোক্ষদায়িনী শান্তিসুধাপরিপূর্ণা তত্ত্বধীরূপা শশাঙ্কসুন্দরী বিপদেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না[৪]; প্রত্যুত বন্ধুর ন্যায় তাঁহাদিগের অনুগমন করে। সেই সমস্ত সাধুরা স্বভাবতঃ মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সর্ব্বদা বিরাজিত, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বগুণার্ণব। সমুদ্র যেমন মর্য্যাদা (তীরভূমি) উল্লঙ্ঘন করে না, তাহার ন্যায় তাঁহারাও বেদবিহিত সীমা উল্লঙ্ঘন করেন না। হে মহাবাহো! সেই কারণে তাঁহারা আপদ্ শূন্য পথে গমন করিতে সক্ষম। যে পথ বা যে পদ নিরাপদ, সেই পথে বা সেই পদে গমন করাই উচিত। যাহা কেবল আপদের সমুদ্র তাহাতে গমন করা উচিত নহে। জগতে এরূপে বিহরণ করিবেক যাহাতে আপদের সমুদ্রে পড়িয়া খেদ প্রাপ্ত হইতে না হয়[৫।৮]। অতএব, তুমিও সর্ব্বাপদ্‌বিবর্জ্জিত রাজসসাত্ত্বিক পদে অবস্থান করতঃ সর্ব্বখেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহার কর। হে রঘুনাথ! যাঁহারা রজঃক্ষয়যুক্ত সাত্ত্বিক, তাঁহারা যেমন যেমন আত্মোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন তেমনি তেমনি পুনঃ পুনঃ সৎশাস্ত্রার্থ বিচারে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিচার প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্রই এই বিচিত্র ভাবনিচয়ের উপাদান ও তাহার অনিত্যতা বোধ-

গম্য করেন। তদন্তে তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করতঃ ঐহিক ভোগের উপযুক্ত অন্নপানাদি ও যশঃ কীর্ত্ত্যাদি ও পারলৌকিক সুখ ভোগের উপযুক্ত স্বর্গ, বিমান ও অপ্সরঃ প্রভৃতি, এ সকলকে নিতান্তই তুচ্ছ ও আপদ্ স্থান বিবেচনা করেন। তাদৃশী বৈরাগ্যযুক্ত সাধু তখন আমি কি? এই সংসার আড়ম্বর কিসে হইল? এই সকল বিষয়ের বিচার করেন, করিয়া কৃতার্থ হন। অর্থাৎ ঐরূপ বিচারে মিথ্যা জ্ঞানের অপনয়ন হয় সুতরাং এ সকল অজ্ঞানেরই সন্ততি (বংশ) এইরূপ অবধারণ হয়[৯,১১]। সেইজন্য সাধুরা ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা অনন্তজ্ঞানরূপ পরম পুরুষার্থলাভ প্রাপ্তির আশায় আমি কে? এ আড়ম্বর (সংসার) কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তায় রত থাকেন। অপিচ, তাঁহারা সাধুগণের সহিত ঐরূপে ঐ সকল বিচার করতঃ অনর্থসঙ্কুল কার্য্যে মগ্ন হন না এবং তৎসহ বসতি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্থাপনও করেন না[১২,১৩]। অতএব, ময়ূর যেমন মেঘের অনুগমন করে, তাহার ন্যায় সংসারস্থ সমুদায় প্রিয় বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু ও সৎসঙ্গের অনুগমন করা কর্ত্তব্য[১৪]। ব্যর্থ বোধে অহঙ্কার, দেহ ও সংসারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা সত্য তাহারই দর্শনে (ব্রহ্ম দর্শনে) নিমগ্ন হওয়া বিধেয়। অনিত্য দেহের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য চিন্মাত্রের ভাবনাই শ্রেয়স্কর[১৫,১৬]। চিৎ-তত্ত্বই নিত্য, তাহা যার পর নাই অধিক বিস্তৃত, সর্ব্বগ, সর্ব্বভাবন, শিবস্বরূপ, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বময় বলিয়া উদাহৃত হয়। সূত্রে যেমন মুক্তা-নিচয় গ্রথিত থাকে তাহার ন্যায় একমাত্র চিৎতত্ত্বে এই ত্রিভুবন গ্রথিত রহিয়াছে[১৭]। যে চৈতন্য ভুবনসন্দর্ভে, যে চিৎ ব্যোম মণ্ডলে, যে চিৎ ধরাবিবরকোষে (অর্থাৎ পাতালাদি লোকে) সেই চিৎ অতিক্ষুদ্র কীটে বিরাজ করিতেছে[১৮]। যেমন ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের ভেদ নাই, একই আকাশ ঘটে, পটে, তথা অন্যত্র অবস্থিত, সেইরূপ, শরীরাবচ্ছিন্ন চিৎ ও অনবচ্ছিন্ন চিৎ এক বা অভিন্ন। একই চিৎ শরীরে শরীরে ও শরীরের বাহিরে বিরাজ করিতেছে[১৯]। যখন সমুদায় জীবেরই তিক্ত কটু কষায়াদি বিষয়ে একই অনুভব, তখন আর চিতের বা চৈতন্যের একত্ব পক্ষে সংশয় কি[২০]? যখন একমাত্র সদ্বস্তু সর্ব্বত্র বিদ্যমান তখন "এ জাত, এ মৃত," এ সকল ভাব ভ্রান্ত। যাহা হয় ও যায়,

তাহা বস্তু নহে। তাহা আভাসমাত্র ও অনির্ব্বাচ্য[২১,২২]। যখন মোক্ষকালে এ সকল বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ এ সকলের অস্তিত্বা রজ্জু সর্পের ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায় এবং এ সকল পূর্ব্বেও ছিল না, তখন ইহা অসৎ। আবার ইহাও বলা যায় যে, যখন ইহা আমোক্ষ অপ্রশান্ত চিত্ত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে গৃহীত হইতেছে, তখন ইহা সৎ। অতএব, ইহা সৎও বটে; অসৎও বটে। তন্মধ্যে অসৎ পক্ষই বাস্তব এবং সৎপক্ষ কেবল মোহসলিলে উহ্যমান[২৩,২৫]।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

——)(*)(——

বশিষ্ঠ বলিলেন, ধীর ব্যক্তি প্রথমতঃ বিচারপরায়ণ হইয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের সহিত শাস্ত্রাবলম্বনে শাস্ত্রার্থ বিচার করিবেন। যাঁহার সহিত বিচার করিবেন তাঁহার সৌজন্য ও অলুব্ধতা গুণ থাকা আবশ্যক। তাদৃশ মহাপুরুষের সহিত তত্ত্ববিচার করতঃ যোগাবলম্বী হইলে মহৎ পদ পাওয়া যায়[১,২]। যিনি বেদবেদাঙ্গপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা-সুজন গুরুর উপদেশে সৎসঙ্গপরায়ণ ও বৈরাগ্যাভ্যাসদ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, সেই ভবাদৃশ মহাত্মাই আত্মবিজ্ঞান লাভের ভাজন[৩]।

হে মহাবাহো! তুমি সম্প্রতি উদারাচার, ধীর, সদ্‌গুণাকর ও সর্ব্ববিভ্রমরহিত হইয়া আত্মাতে সুখে অবস্থান করিতেছ, ভবভাবনাবিমুক্ত ও সম্বিদ্‌সংযুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই মেঘরহিত শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছ, তোমার মন চিন্তামুক্ত, কল্পনামুক্ত, মুক্তবিভাগ ও মুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই ভূমণ্ডলের নরগণ তোমার দৃষ্টান্তে রাগদ্বেষ-বিহীন হইয়া তোমার পদবী অনুসরণ করিবে[৪,৭]। যাহার মতি তোমার মতির অনুরূপ, যে তোমার ন্যায় সুজন ও সমদর্শী, সেই ব্যক্তিই আমার অভিহিত জ্ঞানদৃষ্টি লাভের যোগ্য। তাহারা বাহিরে লোকোচিত আহার বিহারে বিচরণ করিলেও সেই সমস্ত ধীমান্ আত্মজ্ঞানরূপ পোতে আরোহণ করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই[৮,৯]।

হে রামভদ্র! যাবৎ দেহ, তাবৎ তুমি রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া বাহিরে লোকোচিত আচারে অবস্থান করিবে পরন্তু অন্তরে যেন তোমার এষণা-ত্রয় পরিত্যক্ত থাকে[১০]। (এষণাত্রয়—ধনাদির ইচ্ছা, স্ত্রীপুত্রাদির ইচ্ছা, বিবিধ শিল্প বিদ্যাদি শিক্ষার ও যশঃ মান উপার্জ্জনের ইচ্ছা) গুণশালী মহাপুরুষেরা যেরূপে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় সেইরূপে পরমা শান্তি লাভ কর। যাহারা শৃগালধর্ম্মী অর্থাৎ পরবঞ্চক শঠ এবং যাহারা শিশুধর্ম্মী অর্থাৎ অবোধ ও যথেষ্টাচারী, তাহারা অবিচার্য্য অর্থাৎ তাহাদের কোনও দৃষ্টান্ত স্মরণ পর্য্যন্ত করিতে নাই[১১]। তুমি গৃহীত জন্ম মহাপুরুষ দিগের সেই সেই উৎকৃষ্ট স্বভাব ভজনা করিবে[১২]। হে প্রাজ্ঞ! জন্তুগণ ইহলোকে উৎকৃষ্ট হউক আর নিকৃষ্ট হউক, যেরূপ জাতির (যেরূপ জন্মবিশিষ্ট লোকের। নীচ জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির অথবা উৎকৃষ্ট জন্ম বিশিষ্ট ব্যক্তির। অভিহিত নীচতা ও উচ্চতা সত্ত্বরজস্তমোগুণানুসারে গ্রাহ্য।) ভজনা করে, পরলোকে তদ্রূপ জন্মই লাভ করিয়া থাকে। জীবগণ স্বকর্ম্মবশে প্রাক্তন ভাবপরম্পরাই প্রাপ্ত হয়। পৌরুষদ্বারাই যে স্বাভিমত ফল উৎপন্ন হয় তাহা বলা বাহুল্য। জন্তুগণ নিকৃষ্ট জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহার মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত পৌরুষ প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা, একমাত্র নীতিশাস্ত্রানুসারী পৌরুষ বলে (পুরুষকারের প্রভাবে) কি সসৈন্য পরা-ক্রান্ত রাজা, কি নিবিড় বনসংকুল ভীষণ পর্ব্বত, সমস্তই নির্জ্জিত হইয়া থাকে[১৩।১৪]। কি রাজসী জাতির, কি তামসী জাতির ও কি অন্য জাতির, সকল জন্তুগণই (সকল ব্যক্তিই) ধৈর্য্য সহকারে পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক বুদ্ধিকে পঙ্কনিমগ্ন গাভীর ন্যায় বিষয়ভোগ হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলেই বিবেকবলে শুদ্ধসাত্ত্বিক জাতিতে অবস্থিত ও জীবন্মুক্ত হইতে পারে[১৬।১৮]। হে রাঘব! অন্তরস্থ চিত্তরূপ মণিতে যে অবস্থান ও তন্ময়ত্ব, তাহাই উৎকৃষ্ট বিভব ও উত্তম পৌরুষ। গুণশালিগণ সেই পৌরুষ প্রযত্নের দ্বারা সাত্ত্বিক শুভ জাতিত্ব লাভ করতঃ মুমুক্ষু হইয়া থাকেন। কি পাতালে, কি ভূতলে, কি স্বর্গে, এরূপ দুষ্প্রাপ্য কিছু নাই, যাহা গুণান্বিত গণ পৌরুষ বলে প্রাপ্ত না হন।

হে সর্ব্বগুণাভিরাম রামভদ্র! ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, বৈরাগ্য, বেগ-সম্পন্ন ও যুক্তিযুক্ত পৌরুষ অবলম্বন করিতে না পারিলে অত্যন্ত শুভ

ফলপ্রদ আত্মতত্ত্ব লাভে সমর্থ হইবে না। অতএব, এক্ষণে তুমি মহাসত্ত্বগুণান্বিত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতঃ পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বীতশোক হও। তুমি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ও বীতশোক হইলে ইহলোকে জনগণ তোমার দৃষ্টান্তানুসারে বীতশোক ও মুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। তাই বলিতেছি, তুমি বিবেক মহিমাযুক্ত সাত্ত্বিক পদ লাভ করতঃ জীবন্মুক্ত হও। আশীর্ব্বাদ করি, ভবসঙ্গরূপ বিমোহচিন্তা তোমাতে যেন স্থান প্রাপ্ত না হয়[২০।২১]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

স্থিতিপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।

—০()*()০—

[illegible]

[illegible]

উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ সর্গের টিপ্পনী।

বালকাখ্যানের মধ্যে কোন রূপক কল্পনা নাই। আখ্যায়িকাটী এই মাত্র তাৎপর্য্যে অভিহিত যে, বিচারানভিজ্ঞ ব্যবহারিক জীব দিগের জগৎপ্রতীতি বালপ্রতীতির সদৃশ। অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত জ্ঞান শূন্য বালকেরা যেমন উপকথা শুনিয়া তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে, এবং আখ্যানস্থ পদার্থকে ও আখ্যানকে সত্য মনে করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞ মনুষ্যেরাও, দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দেখা যায় বলিয়া, জগৎকে সত্য মনে করে ও তৎপ্রতি আস্থা স্থাপন করে। বস্তু নাই অথচ কথা (নাম) আছে, যেমন আকাশ-কুসুম, তাদৃশ কথা যে জ্ঞান জন্মায়, সে জ্ঞান শাস্ত্রে "বিকল্পজ্ঞান" নামে কথিত হয়। এই বিকল্প জ্ঞান অন্য এক প্রকার মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান। জগৎ বিষয়েও যে কথা বা নামনিচয় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ও তজ্জনিত যে জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞানও ঐ বিকল্পজ্ঞান বলিয়া গণ্য। কেননা, জগৎও সত্য পক্ষে নাই। এই মিথ্যা নাম ও মিথ্যা জ্ঞান এত নিরূঢ় যে, সহসা কেহই অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। এইটুকু মাত্র রহস্য আবেদন করা বশিষ্ঠের অভিপ্রেত এবং তদর্থই বালকোপখ্যানের অবতারণা। অতএব, বালকোপাখ্যানে অন্য কোন পদার্থের রূপক নাই, ইহাই টীকাকার দিগের মত। তবে যদি কেহ রূপক কল্পনা করিয়া তাহা ভঙ্গ করতঃ রূপকীয় বস্তু বুঝিতে চাহেন, তাহা হইলে এইরূপ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

সংকল্প বিকল্প ও তদাত্মক মন এই তিন্ রাজপুত্র। ইহারা শূন্য নগরের রাজা অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনার কর্ত্তা। ইহাদের পিতা মাতা নাই। অর্থাৎ কাহার জঠরে উৎপন্ন নহে। সুতরাং বিবান্ধব। ইহারা চিন্তাযোগে বহুদূর যায় ও কষ্ট পায়। ইহারা যে তিনটী বিশ্রাম বৃক্ষ পাইয়াছিল, তাহা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত এই তিন্ অবস্থা। তাহারা যে তিন নদী প্রাপ্ত হয় তাহা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোক। তাহাদের প্রাপ্ত ভবিষ্য নগর পরলোক। তত্রস্থ বন ও গৃহাদি পারলৌকিক ভোগের প্রতীতি। তত্রস্থ ভবন তিন্‌টী মোহ, মহামোহ ও অতিমোহ অথবা পাপ পুণ্য ও পাপপুণ্যের মিশ্রণ, কিম্বা

অহং মম ইদং এই তিন্ জ্ঞান। কাঞ্চন স্থালী তিন্‌টী ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল। ১১ দ্রোণ তণ্ডুল—এগার ইন্দ্রিয় দ্বারা উপার্জ্জিত সাত্ত্বিকাদি ভেদে ১১ প্রকার কর্ম্ম। অর্থাৎ পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এক অন্তরিন্দ্রিয়। ইহাদের দ্বারা সত্ত্ব, রজোমিশ্রিত সত্ত্ব, তমোমিশ্রিত সত্ত্ব (এইরূপ রজঃ, সত্ত্বমিশ্রিত রজঃ, তমোমিশ্রিত রজঃ, তথা তমঃ, সত্ত্বযুক্ত তমঃ ও রজোযুক্ত তমঃ) এবং ক্রমে ৯, ইহার এগার গুণ কর্ম্ম অর্থাৎ ৯৯ প্রকার কর্ম্ম কৃত হয়। ঐ সকল কর্ম্মের ফলভোগ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই শরীর অবলম্বনে হইয়া থাকে সুতরাং ঐ তিন্ শরীরকে তিন ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মুখ নাই কথার অর্থ বাক্‌শক্তি নাই। অর্থাৎ জড়। আত্মার সাহায্য ব্যতীত জড় শরীরের বাক্‌শক্তি কেন, কোনও ক্ষমতা নাই। উক্ত রাজপুত্রেরা অদ্যাপি তথায় আছে, ইহার অর্থ মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমস্ত বিদ্যমান থাকে। থাকিলেই প্রবৃত্তি স্রোত প্রবাহিত হয়। সুতরাং পুনঃ পুনঃ ইহ-পর-লোকে গমনাগমন, শরীর ধারণ, ও ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। এ সমস্তই মায়ার পরিণাম সুতরাং মিথ্যা।

স্থিতিপ্রকরণের ২৯ সর্গের টিপ্পনী।

প্রথমে উদ্রেক বা উৎপত্তি, পরে তাহার সঞ্চার বা স্থিতি, তৎপরে তাহার বৃদ্ধি, ঘনতা বা গাঢ়ভাব, দেহাত্মাভিমানের এই তিন অবস্থা। দেহাত্মাভিমান উদিত হইয়া যতই বাড়ে ততই জীব আত্মহারা হয়, হইয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তর অনুভব করে। প্রত্যেক অভিমানেরই উদ্রেক, সঞ্চার, গাঢ়তা, এই অবস্থাত্রয় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রথম প্রথম কিছু কিছু তেজ থাকে, তাই শারীরিক মানসিক ও বাচিক ক্ষমতা পরিচালন করিয়া জীব স্বার্থাভিমান চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে সঞ্চার অবস্থায় তেজোহীন হয়। অনন্তর গাঢ়তা অবস্থায় অবসন্ন হয়। দামাদি অসুরদিগেরও ক্রমিক উক্ত অবস্থাত্রয় হইয়াছিল। তাই তাহারাও প্রথমে শারীরিক বল (১), বীর্য্য (২), শিক্ষা (৩), উৎসাহ, তেজ (৪) প্রয়োগ বা পরিচালনা (৫), সম্প্রয়োগ (৬) অভিযোগ (৭), বিদ্যা (৮), নীতি (৯), নিয়ম (১০), এই ১০ প্রকার এবং মানসিক ঐ দশ প্রকার, তথা বাচিক ঐ দশ প্রকার অনুসারে ৩০ প্রকার ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। পরে দ্বিতীয়াবস্থা আসিলে হীনতেজী হইয়াছিল। মানুষ যতই হীনতেজ হয় ততই ছল ও কৌশল লক্ষ্য করিতে থাকে। দামাদি অসুরেরাও হীনতেজ হওয়ায় ছলে বলে কলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল। সে অবস্থায় তাহারা দেবতা দিগকে দণ্ড দিতে অক্ষম, কাযেই দণ্ড ব্যতিরেকে সাম, দান, ভেদ, সন্ধি, বিগ্রহ, এই পাঁচ নৈতিক উপায় এবং মায়াযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ, অন্তর্ধান, গোপন যুদ্ধ, কূট অস্ত্র, কূট নীতি, বাক্‌বিতণ্ডা ও নিষ্ফল দাম্ভিকতা, এই ৮ এবং ঐ সকলেরই অবান্তর ব্যাপারে আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, যুদ্ধে বৈমুখ্য, অনুৎসাহ, ভ্রান্তি, বৈক্লব্য, ব্যামোহ, দৌর্ব্বল্য, দুশ্চিন্তা, দিগ্‌ভ্রান্তি, এই ১০ এবং তৎপরে তাহারা দেহাভিমানের গাঢ়তায় পাছে আমি মরি, পাছে আমার স্বজন মরে, সেই চিন্তায় ও ভয়ে কাতর হইয়া যুদ্ধত্যাগ, পলায়ন, প্রচ্ছন্নস্থিতি, শরণ লওয়া, যাচ্ঞা করা (মারিও না বলিয়া প্রার্থনা করা), দেশত্যাগ, ধনাদি পরিত্যাগ, জয়েচ্ছা পরিত্যাগ, হীনতা, দীনতা, লঘুতা ও কামুকত্ব, এই ১২ প্রকারই স্বীকার করিয়াছিল। প্রথম অবস্থা ৩০ বৎসর, দ্বিতীয়াবস্থা ৫।৮।১০ দিন, এবং শেষোক্ত অবস্থা ১২ দিন, এ কথার অর্থ উক্ত প্রকারে বুঝিলে অসমঞ্জস হয় না অথবা ঐ প্রকার রূপক বিবেচনা করিলেও অসঙ্গত হয় না, এবং প্রকৃত বৎসর মাসাদি গ্রহণ করিলেও দোষ বা অসমঞ্জস হয় না।

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

উপশমপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! স্থিতিপ্রকরণ বলা হইয়াছে, সম্প্রতি নির্ব্বাণ-কারী উপশম প্রকরণ বলি, শ্রবণ কর১। মহামুনি বাল্মীকি ভরদ্বাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভরদ্বাজ! অসংখ্য তারকাপরিপূর্ণ শরদাকাশের ন্যায় সুষমা যুক্ত সেই সভায় ভগবান্ বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিলে, শ্রবণার্থী পার্থিবগণ শ্রবণ মানসে নির্ব্বাক অবস্থায় স্থিত হইলে, সেই সভা নির্ব্বাত নিস্পন্দ কমলবনশালী সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল২।৩। আরও দেখা গেল, তখন বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে বিলাসিনী রমণীগণেরও মদ, মোহ ও বল প্রশান্ত হইয়াছে এবং তরুকোটরে বায়সগণের লীন হওয়ার ন্যায় তাঁহাদের করকমলস্থ হংসায়মান চারু চামর সকল যেন নিলীন হইয়াছে সুতরাং তাহাদের অঙ্গস্থ অলঙ্কারের শব্দও বিবর্জ্জিত। অর্থাৎ তাহারা যেন চিত্র লিখিতের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং জ্ঞান-পিপাসু রাজগণও নাসিকা পার্শ্বে তর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক তদ্গত চিত্তে বিচারপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন৪।৫। যেমন সূর্য্যোদয়ে পঙ্কজ বিকাসমান হয় তাহার ন্যায় রামচন্দ্রও বদনশোভায় বিকাসমান হইয়াছেন এবং বিচারপরায়ণ সারণ প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গও মর্কটসম চঞ্চল চিত্তকে সর্ব্বভোগ হইতে আহরণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে নিয়োজিত করিয়াছেন৬।৭।

সুশিক্ষিত লক্ষণের আত্মারূপ চন্দ্রও বশিষ্ঠোপদেশ শ্রবণে মেঘ নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে[১০]। শত্রুঘ্নও ইন্দ্রিয়শত্রু দলন করিয়া পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছেন, সুমিত্রনামক মন্ত্রীও মনের সহিত মিত্রতায় সুখী এবং অন্যান্য মুনিগণ ও রাজগণ উল্লাসিতচিত্ত হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সভায় সমুদ্রনিস্বনের ন্যায় ও কল্পান্ত-কালীন মেঘনিনাদের ন্যায় গম্ভীরতর মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খনিনাদ সমুত্থিত হইল। সেই মহাশঙ্খের মহানিস্বনে জলদনাদ দ্বারা কোকিলধ্বনির তিরোধানের ন্যায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের বাক্য তিরোধান প্রাপ্ত হইল[১১।১২], মহর্ষিও তৎশ্রবণে আপনার বাক্য উপসংহার করিলেন[১৩]। মুহূর্ত্তকাল সেইরূপে অবস্থান করিয়া সেই নিবৃত্তকোলাহল সভায় রামচন্দ্রকে বলি-লেন, হে রামচন্দ্র! আজ্ এই পর্য্যন্ত বক্তব্য বর্ণন শেষ করিলাম; কল্য বক্তব্যান্তর বলিব[১৭।১৮]। দ্বিজাতিগণের মধ্যাহ্নকালীন কর্ত্তব্যকর্ম্ম—যাহা নিয়ম শাস্ত্রে পাওয়া যায়—তাহা অবমাননা বা অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। হে সৌম্যদর্শন রাম! তুমিও উঠ। উঠিয়া স্নান, দান ও অর্চ্চনাদি সৎ ক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও[১৯।২০]।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে ঐরূপ বলিয়া গাত্রোত্থান করিলে রাজা দশরথ ও তৎসহ সভাস্থ জনগণ সকলেই সমুত্থিত হইলেন[২১]। তাঁহাদিগের উত্থানকালে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি মন্দবাতসমাক্রান্ত নলিনীর ন্যায় বিকম্পিত হইয়াছিলেন। নিষ্ক্রমণত্বরা বশতঃ তাঁহাদিগের যে পরস্পর অঙ্গসংঘট্টন সংঘটন হইয়াছিল ও অঙ্গস্থ রত্নরাজির অরুণ প্রভার শোভা বিস্তৃত হইয়াছিল, সে শোভা সন্ধ্যাকালীন অস্তাচল শোভার অনুকার করিয়া-ছিল[২২।২৩]। অঙ্গদ সমূহের অরুণবর্ণে মাল্যবিভ্রান্ত ভৃঙ্গগণ পরস্পর সমাহত হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত ও ঘুম্‌ঘুম্ ধ্বনি সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল। মুকুটরত্নের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হওয়ায় গগনমণ্ডলে ও জনগণের অঙ্গাবৃত রত্ন বসনে ইন্দ্রধনুর শোভা উৎপাদন করিয়াছিল[২৪।২৫]। অথবা ঐ সময়ে সেই সভা বনলেখার সুষমা বিস্তার করিতেছিল। চামরধারিণী কমনীয়া কান্তাগণ তদ্‌বনের লতা, তাহাদের কর সকল পল্লব, করশাখা সকল দল, তাহাদের বিধৃত চামর সকল মঞ্জরী[২৬]। অপিচ প্রভাস্রমন্বিত কটক (হস্তা-ভরণ) সমূহের প্রভা দ্বারা নভোমণ্ডল আরক্তীকৃত হইয়াছিল। সেই সভারূপ দিঙ্মণ্ডলে সমুড্ডীন কর্পূরকণারূপ শুভ্র নীহারপটলী ঘনীভূত

হইয়া শারদ অম্বুদের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসৃত ও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল[২৭।২৮]। জনগণের বিলোল মস্তক সমূহে অবস্থিত মণিসমূহের প্রান্তভাগ হইতে যে প্রভাপুঞ্জ বিনির্গত হইতেছিল, তদ্দ্বারা অম্বর মণ্ডল পাটলীকৃত হওয়াতে বোধ হইয়াছিল, যেন অকস্মাৎ কার্য্যসংহারিণী অকালসন্ধ্যা সমুপস্থিত হইয়াছে। রত্নরূপ তারকারাজির অংশুদ্বারা সভ্যগণের মুখরূপ পদ্মরাজি যেন মলিনীকৃত এবং নূপুররূপ সারসগণের ধ্বনি যেন কলকল রবে বিস্তৃত ও সমুত্থিত হইতে লাগিল। রাজন্যশতসমাকুলা সেই সভা বর্ণিত প্রকারে সমুত্থিত হইলে তাহা ভূতভৃংশতসমাকুলা ভূতসন্ততি-সম্পূর্ণা নূতনা সৃষ্টির ন্যায় প্রতীয়মানা হইয়াছিল।

অনন্তর বীচিজালবিবলিত অম্বুনিধির ন্যায় নানালঙ্কারভূষিত ভূপালগণ নৃপতি দশরথকে প্রণাম করিয়া সেই সভাস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তখন সুমন্ত্র ও ব্রহ্মবিজ্ঞানকোবিদ মন্ত্রিগণ বশিষ্ঠকে ও তদনন্তর নৃপতিকে প্রণাম করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। বামদেব ও বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণ বশিষ্ঠের সম্মুখে অবস্থান করতঃ তদীয় অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন[২৯।৩৪]।

অনন্তর রাজা দশরথ মুনিবৃন্দকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনার্থ গমন করিলেন[৩৫]। পরে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিগণ বনে, ব্যোমচরগণ ব্যোমমণ্ডলে ও নগরবাসিগণ নগরে প্রস্থান করিলেন[৩৬]। হে ভরদ্বাজ! এই দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের সহিত বশিষ্ঠভবনে রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন[৩৭]।

ভগবান্ বশিষ্ঠ দ্বিজগণ, পথিকগণ, মুনিগণ, রামাদি দশরথাত্মজগণ ও অন্যান্য জনগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সেই প্রদেশ হইতে পদাবনত দশরথাত্মজ রামাদি ও নভশ্চর, ধরণীচর এবং নগরবাসী জনগণদিগকে যথাক্রমে পরিহারাদি করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করতঃ পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বিজজনোচিত বাসরক্রিয়া সমাধা করিলেন[৩৮।৪১]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, শশিপ্রভ রাজতনয়গণ স্ব স্ব গৃহে গমন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সমাধা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, নৃপতিগণ, মুনিগণ ও দ্বিজগণ আপন আপন গৃহে ও কমলকহ্লারাদিযুক্ত জলাশয় প্রদেশে গমন করতঃ স্নান ও আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে হিরণ্য, শয্যা, আসন, উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও বস্ত্র সমূহ দান করিলেন। দেবালয়ে গমন করতঃ ঈশান প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিলেন[১।৫]। তদনন্তর পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্ ও বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া বিধি বিধান ক্রমে ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইলে, পরে সায়ংকালও তৎকালোচিত কার্য্যে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যোপাসনা, অঘমর্ষণমন্ত্র জপ, পবিত্র স্তোত্র পাঠ ও মনোহর গাথা সমুদায় গান করা হইল। ক্রমে শোকহারিণী বিভাবরী পূর্ব্বদিক্ শ্যামীকৃত করিয়া জগৎ আক্রম করিল। তখন রামাদি দশরথতনয়গণ চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নোপরি বিরাজ করেন তাহার ন্যায় সুবিস্তীর্ণ ইন্দুরশ্মিসম কুসুম শয়নে (শয্যায়) অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৬।১১]। রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট সেই বিভাবরী মুহূর্ত্তকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। কিন্তু করভ যেমন স্বীয় মাতা করিণীর চিন্তায় বিনিদ্রিত থাকে, তদ্রূপ, রামচন্দ্র ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সেই মধুরোদার বচনাবলী চিন্তা করতঃই যেন সেই রজনী নিদ্রার বশবর্ত্তী না হইয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন[১২।১৩]।

তাঁহার চিন্তার বিষয় এইরূপ—সংসার ভ্রমণ কি? এই সমস্ত জনগণ ও অন্যান্য জীবগণ কি নিমিত্ত গত ও প্রত্যাগত হইতেছে? এরূপ মায়াজাল কোথা হইতে সমুত্থিত হইল? কেনই বা এ সকল প্রবর্ত্তিত ও কি প্রকারেই বা নিবর্ত্তিত হয়[১৪।১৫]? মায়া বিনিবৃত্ত হইলে বা হওয়ার গুণ কি? দোষই বা কি? আকাশ অপেক্ষা বিস্তীর্ণ পরমাত্মায় এরূপ সঙ্কোচভাব প্রাপ্তি কি কারণে ও কি প্রকারে সংঘটন হইয়াছে[১৬]?

ভগবান্ মুনি মনোনাশ, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহাই বা কি? আত্মাই জীব, চিত্ত, মন ও মায়া প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া এই মিথ্যা সংসার বিস্তার করিতেছেন, এ কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি? এ সমস্তই মনোরূপ তন্তুতে গ্রথিত, সুতরাং এ সকলের সহিত মনোরূপ তন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দুঃখের উপশম হয়, সুতরাং মনস্তন্তুর বিনাশ করাই এই দুঃখপ্রদ ব্যাধির উত্তম চিকিৎসা; ইহা সত্য কি না[১৭।১৯]? হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত সলিল হইতে ক্ষীরভাগ পৃথক্ করে, তাহার ন্যায় আমি কিরূপে আমার বুদ্ধিরূপ বক-পক্ষীকে ভোগাভ্রপটল হইতে পৃথক্ করিব[২০]? অহো! কি সঙ্কট! এখনও আমরা ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। অথচ ভোগ ত্যাগ ব্যতীত বিপদুদ্ধারের অন্য উপায় নাই[২১]। এক দিকে দেখিতেছি, পরম প্রয়োজনীয় বা পরম প্রাপ্তব্য আত্মতত্ত্ব মন ব্যতীত নহে। আবার অন্য দিকে দেখিতেছি, সেই মনই এই সকল বিষয় দর্শনের কারণ। অজ্ঞানপ্রভব যক্ষ যেমন শিশুগণের দুরপনেয়; তাহার ন্যায় আমাদের মনঃও আমাদের সেইরূপ দুরপনেয়[২২]। আমার মন যে কবে পরমা শান্তি প্রাপ্তে সংসারভ্রমরহিত হইবে; কবেই বা লব্ধদয়িতা বালার ন্যায় চিন্তা রহিত হইবে? এবং কত দিনে আমার শান্তমতি উদিত হইবে এবং কত দিনেই বা আমার মন সংরম্ভশূন্য, বিগতকৌতুক, নিষ্পাপ ও পরম পাবন হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না[২৩।২৪]? আমি যে কত দিনে শশাঙ্ক অপেক্ষাও সুশীতল পরম পদে বিশ্রাম লাভ করতঃ জগৎ ভ্রমণ করিব তাহা জানিতে পারিতেছি না! কত দিনে আমার মন কল্পিতরূপ পরিহার পূর্ব্বক আত্মায় লীন হইয়া সলিলে তরঙ্গের ন্যায় উপশান্ত হইবে[২৫।২৬]? কত দিনে আমি গতজ্বর হইয়া তৃষ্ণারূপ তরঙ্গসমাকুল আশামকর বিরাজিত সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইব? কত দিনে আমি সর্ব্বশোক বিস্মৃত হইব এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়া মুমুক্ষুগণের উপশমরূপ পবিত্র পদবী প্রাপ্ত হইব[২৭।২৮]? যাহার প্রতাপে আমার অঙ্গ অত্যন্ত সন্তাপিত ও ধাতু সকল ভয়াবহ হইয়াছে, কত দিনে আমার সেই সংসারজ্বর নাশ প্রাপ্ত হইবে[২৯]? হে বুদ্ধে! তুমি কত দিনে গতব্যথ হইয়া নির্ব্বাত দীপলেখার ন্যায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হইবে?

এবং অন্ধকার বিনাশ করতঃ সুপ্রকাশ হইবে[৩০]? কত দিনে আমার দুশ্চেষ্ট দগ্ধ ইন্দ্রিয়গণ গরুড়পক্ষীর সাগর সন্তরণের ন্যায় দুঃখরাশি সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইবে[৩১]? আমি যে মূঢ় হইয়া পুত্র ধনাদির অভাবে রোদন করি, তাহার প্রধান কারণ দেহের প্রতি আত্মভ্রম। সে ভ্রম আমার কবে শরন্মেঘমণ্ডলের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[৩২]? আমার যে বুদ্ধি, পারিজাতবনোদ্যানে সঞ্চরণ করিত সে বুদ্ধিকে আমি কবে তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করিব এবং যাহা প্রকৃত আত্মপদ তাহা প্রাপ্ত হইব[৩৩]? অহে মন! বল, তুমি কত দিনে বীতরাগিগণপ্রোক্ত নির্ম্মল জ্ঞান দৃষ্টি অবলম্বন করিবে তাহা আমায় বল[৩৪]? দুঃখরূপ অজগরগণের ভক্ষ্য হইয়া যেন আমাকে আর হা তাত! হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র! বলিয়া রোদন করিতে না হয়[৩৫]। হে বুদ্ধে! তুমি আমার ভগিনী, অতএব ভ্রাতার প্রার্থনা পূর্ণ কর। তুমি মোক্ষের নিমিত্ত বশিষ্ঠদেবের বাক্যনিচয় বিচার কর[৩৬]। আমি প্রীতি সহকারে তোমার চরণে নিপতিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ভবোচ্ছেদরূপ ভূতি লাভের নিমিত্ত সুস্থির হও[৩৭]। হে মতে! বশিষ্ঠপ্রোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলভূ বিজ্ঞানগর্ভ ও সমতাপ্রদ বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি ও স্থিতিপ্রকরণ যথাবৎ স্মরণ ও বিচার কর। সাতিশয় নৈপুণ্যসহকারে শত বার বিচার কর, করিয়া যাহা লব্ধ হয় তাহা অবলম্বন কর। যদ্দ্বারা মতি সুপ্রসন্না না হয়, শত বার বিচারেও যদি মতি সুপ্রসন্না না হয়, তাহা হইলে সে বিচার নিষ্ফল। অতএব মতির প্রসন্নতাই বিচার কার্য্যের সার বা ফল[৩৮।৪০]।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

——(*)(○)(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, কমল যেমন সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষায় রাত্রি যাপন করে তাহার ন্যায় রঘুকুল পাবন রাম ঐরূপ বিস্তৃত ও উদার চিন্তায় রজনী অতিবাহিত করিলেন[১]। ক্রমে দিঙ্মণ্ডল ঈষৎ কপিলবর্ণ ও পূর্ব্বদিক্ অরুণবর্ণ ও নভোমণ্ডল বিরলতারক হইল। এই সময়ে শ্রীমান্ রাঘব প্রভাতকালীন দিবাকরের সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সদনে গমন করিলেন। দূর হইতে সেই আত্মপরায়ণ মুনিপ্রবরকে ধ্যানসংস্থিত দর্শন করিলেন এবং নতকন্ধর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন[২।৫]। অনন্তর যাবৎ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও মুখমণ্ডল সুব্যক্ত না হইল, তাবৎ তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত তত্রত্য প্রাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৬]। পরে অমরগণের ব্রহ্মলোকে আগমনের ন্যায় রাজগণ, রাজপুত্রগণ, ঋষি-গণ ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে সেই বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন করিতে লাগি-লেন[৭]। তৎকালে বশিষ্ঠভবন মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথাদির দ্বারা পরিপূর্ণ হইল ও রাজধানীর ন্যায় শোভমান হইল[৮]। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ বশিষ্ঠ সমাধি হইতে বিরত হইলেন এবং সমাগত দিগকে প্রিয়বচনাদি শিষ্টাচার পরম্পরা দ্বারা পরিতুষ্ট ও প্রণত জনগণকে সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন্ সুবগণ সমভি-ব্যাহারে শক্রপুরে গমন করেন তাহার ন্যায় ভগবান্ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিগণ সহ রথারোহণে দশরথ ভবনে গমন করিলেন[৯।১১]। যেমন যুথপরিবৃত রাজহংস অব্জিনী সমীপে গমন করে, তাহার ন্যায় সেই রমণীয় দাশরথী সভার সমীপবর্ত্তী হইলেন। এ দিকে মহারাজ দশরথ সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর তিন পদ অগ্র গমন করতঃ বশি-ষ্ঠাদি মুনিগণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন[১২।১৩]। পরে দশরথ প্রভৃতি ভূপাল-গণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, সৌম্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজপুত্রগণ, শুভ প্রভৃতি

মন্ত্রিপুত্রগণ, অমাত্যগণ, প্রজাগণ, ব্যালব প্রভৃতি ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য মান্য পৌরগণ সকলে সমবেত হইয়া সভায় প্রবেশ ও উপবেশনার্থ স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন[১৪।১৩]। তাঁহারা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলে, সভার কলকল ধ্বনি প্রশান্ত হইল। বন্দিগণ মৌনাবলম্বন করিল। সভ্যগণ পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসায় বিরত হইল। অম্ভোজকোটর হইতে বিনির্গত পরাগ সভাস্থলে প্রসৃত হইতে লাগিল। রাজন্যবর্গের গ্রীবাস্থ মুক্তাদাম চঞ্চলভাবে বিচলিত হইতে লাগিল। পুরস্ত্রীবর্গ বাতায়ন পথে ও সুকোমল পুষ্পদামসমাকীর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সভা অভিমুখে দৃষ্টি স্থাপন করিল। সুশুভ্রচামর-ধারিণীগণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইল। তত্রস্থ রত্নসমূহে, বিশেষতঃ মুক্তাশ্রেণীতে অর্করশ্মি অনুরঞ্জিত হওয়ায় কুসুম শ্রেণীর শোভা প্রভাসিত হইল। ভ্রমরকুল সূর্য্যরশ্মিভ্রমে তত্রত্য বিকীর্ণ পুষ্পসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডলে মেঘের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ঈদৃশ অবসরে বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার কথায় উদ্যত হইলেন এবং সেই সজ্জনসমাজস্থ জনগণ সকলেই বশিষ্ঠবদননিঃসৃত পূর্ব্বোক্ত পবিত্র ও গম্ভীরার্থ বিস্ময়কর মৃদুপদাক্ষর বচনপরম্পরার বিষয় পরস্পর বলা বলি করিতে লাগিলেন[১৭।২৪]। নানা দিক্, পুর, ও নানা বন হইতে সিদ্ধ, বিদ্যাধর, আর্য্য, মুনি ও বিপ্রগণ সমাগত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে মৌনভাবে প্রণাম করতঃ নিঃশব্দে সভা প্রবেশ করতঃ মৃদুস্বরে গৌরবযুক্ত বাক্যে পরস্পর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠদেবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। বিকসিত রক্তোৎপলকোশনিমগ্ন অলিজালের গাত্রস্থিত মকরন্দ-সুবর্ণ পরাগরাগে রঞ্জিত হইয়া সমীরণ গৃহপ্রান্তস্থিত ঘণ্টার টঙ্কারধ্বনিরূপ গীতদ্বারা গৃহোৎপন্ন গীতকে পরাভব করতঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। চন্দনামোদমিশ্র অগরুতগরের নির্য্যাসধূমদ্বারা কুসুমদামের উদ্দাম গন্ধ ও চঞ্চল কুসুমরাজিদ্বারা অভ্রমণ্ডল সুবাসিত হইল[২৫।২৭]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মিকি বলিলেন, রাজা দশরথ মেঘগম্ভীর নিস্বনে মুনিনায়ক বশিষ্ঠকে সম্বোধন পূর্ব্বক সুশ্রাব্য পদ বিন্যাস সহকারে বক্ষ্যমাণ বচনাবলি বলিতে লাগিলেন[১]। বলিলেন, হে ভগবন্! গত দিবস আপনি যে আমাদের হিতার্থে বাক্যপরম্পরা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আপনি ত তজ্জনিত ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন? গত দিবসোক্ত আপনার বাক্য পরম্পরা অতীব আনন্দদায়ক, তৎশ্রবণে আমরা যার পর নাই, সমাশ্বাসিত হইয়াছি[২।৩]। যেমন চন্দ্রকিরণ সুশীতল ও অন্ধকারের নাশক, আপনার নির্ম্মল বাক্যসন্দর্ভ তদপেক্ষা অধিক সুশীতল অর্থাৎ অন্তস্তাপের ও অজ্ঞানান্ধকারের নাশক[৪]। মহাত্মা দিগের শোভন পদবিন্যাসযুক্ত উপদেশ বাক্য সমূহ অপূর্ব্ব আনন্দের জনক ও প্রবলতর মোহের নাশক[৫]। যাহাদের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব অবলোকনের দীপস্বরূপ যুক্তিসমুপেত সদুক্তিলতা উৎপন্ন হয় সেই সকল সুজনরূপ বৃক্ষ আমাদের নিত্য বন্দনীয়[৬]। যেমন হিমাংশুর রশ্মি অন্ধকার প্রমার্জ্জন করে, তাহার ন্যায় সজ্জন দিগের উক্তি জনসমূহের যে কোন দুশ্চেষ্টা ও দুরাচার থাকুক্ সে সমস্তই বিদূরিত করে[৭]। হে মহর্ষে! শরৎকাল আগতে অম্বুদমণ্ডল অল্পে অল্পে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহার ন্যায় আপনার উক্তি আমাদের সংসারনিগড় ও তৃষ্ণা প্রভৃতিকে অল্পে অল্পে প্রক্ষীণ করিয়া থাকে[৮]। যেমন জন্মান্ধগণ রসাঞ্জনানীতদৃষ্টি হইয়া সুবর্ণান্বেষণে সক্ষম হয় তাহার ন্যায় আজ্ আমরা নিষ্পাপ হইয়া পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছি[৯]। * হে মুনে! আপনার উক্তিরূপ শরতের উদয়ে আমাদের হৃদয়স্থিত সংসারবাসনা নাম্নী মিহিকা এক্ষণে তিরোধান প্রাপ্ত হইয়াছে[১০]। হে মহর্ষে! আপনার উদার বাক্যে আমরা যেরূপ অনুপম

* রসাঞ্জনানীত। রস শব্দের অর্থ এক পক্ষে ব্রহ্ম, অপর পক্ষে পারদসিদ্ধযোগী দিগের কৃত ঔষধ বিশেষ। সেই ঔষধের অঞ্জন অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ করে এবং ব্রহ্মরসের আস্বাদনরূপ অঞ্জনে ব্রহ্ম দেখিবার উপযুক্ত হয়।

আনন্দ লাভ করিয়াছি, অসংখ্য মন্দারকুসুমের মঞ্জরী বা অমৃতসাগরের তরঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণকে সেরূপ আহ্লাদিত করিতে সমর্থ নহে[১১]। রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবকে এইরূপ বলিয়া রামের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন, রাঘব! যে দিন মহাজনসপর্য্যাদ্বারা অতিবাহিত হয়, সেই দিনই আলোকিত; অবশিষ্ট অন্ধকারাবৃত। হে রাজীবলোচন রাম! মহর্ষি এক্ষণে প্রসন্ন আছেন, তুমি মহর্ষিকে পুনর্ব্বার প্রকৃত বিষয় জিজ্ঞাসা কর[১২।১৩]।

বাল্মিকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ ঐরূপ কহিলে, উদারাত্মা ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাঘব! মদুক্ত বাক্যের পূর্ব্বাপর বিচারিত সদর্থ বা তাৎপর্য্যার্থ ত তোমার স্মরণ আছে? হে অরিমর্দ্দন! উৎপত্তি সত্ত্বাদিগুণভেদে বিচিত্র, এ কথা ত তোমার মনে আছে[১৪।১৬]? মায়া-যোগে ব্রহ্মের জগৎরূপে অবস্থিতি, এবং তিনি সর্ব্বময় ও অসর্ব্বময়, নিষ্প্রপঞ্চ, ও সপ্রপঞ্চ, সৎ, ও অসৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সত্য ও অসত্য, বিভাগানুসারে পূর্ব্বকথিত এই সকল বিষয় ত তোমার স্মৃতি পথে উদিত আছে? আমি যে পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট পরমাত্মার সর্ব্ব, অসর্ব্ব, সৎ ও অসৎ রূপের বিষর কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা তুমি বিদিত আছ ত? হে সাধুবাদভাজন! হে সাধো! এই বিশ্ব সেই বিশ্বেশ ঈশ্বর হইতে সমুদিত হইয়াছে, এ কথা কি তোমার স্মরণ আছে[১৭।১৮]? অবিদ্যার চঞ্চল, বিস্তৃত ও ভঙ্গুর রূপের কথা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা ত তোমার সম্যক্ স্মরণ আছে[১৯]? নরগণ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে, ইহা লক্ষণাদি বিচার দ্বারা তোমার নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছি, সেই সাধুবাক্য তুমি ত বিস্মৃত হও নাই[২০]? তুমি পূর্ব্ব রাত্রে যে সকল বাক্যার্থের বিচার করিয়াছিলে, তাহা ত তোমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছে[২১]? পুনঃ পুনঃ পরিমার্জ্জিত করিলেও অর্থাবধারণে অসমর্থ পুরুষাধম দিগের অতিমলিন হৃদয় দর্পণে প্রয়োজন ফল প্রতিফলিত হয় না। বিশালবক্ষঃ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে মুক্তা মালার ন্যায় তুমিই শুদ্ধি-শালী বিবেক বাক্যের ভাজন[২২।২৩]।

বাল্মিকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! কমলাসনতনয় মহাতেজস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হে ভগবন্! আমি আপনার বাক্যের প্রভাব সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি বিনিদ্র হইয়া আপনার কথিত বাক্য রাশির মর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়াছি[২৪।২৬]। হে প্রভো! আমি বুঝিয়াছি, ভবান্ধকার নাশের নিমিত্তই আপনার মুখরূপ দিবাকর কর্ত্তৃক বাক্যরূপ রশ্মিপটল বিস্তৃত হইয়াছে। হে অদীনাত্মন্! আমি রমণীয় পবিত্র অতীত বৃত্তান্ত সমুদায় সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি[২৭।২৮]। কোন্ সিদ্ধ ব্যক্তি আপনার হিতজনক, পবিত্র ও সর্ব্বপ্রকার আনন্দসাধক অনুশাসন অবনত মস্তকে গ্রহণ না করেন[২৯]? আমরা আপনার প্রসাদে শারদীয় দিবসের ন্যায় সংসাররূপ মেঘাবরণ নিরাকৃত করতঃ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার পবিত্র অনুশাসন আপাতমধুর ও উত্তর কালে মোক্ষ ফলপ্রদ[৩০।৩১]। আপনার বাক্যরূপ সুশুভ্র কল্পপাদপকুসুম, কি দেবাদি ও কি সর্পাদি, সকলেরই আনন্দজনক। অতএব উহা আমাদিগের শুভ ফলপ্রদ হউক। মহর্ষে! আপনি শাস্ত্র ও বিচাররূপ হংসাদি পক্ষীর দ্বারা সুশোভিত, বিততব্রত, সর্ব্বপাপবিনাশন, পুণ্যরূপ জলরাশির একমাত্র মহাহ্রদ। অতএব হে প্রভো! সম্প্রতি আপনি আমাকে আপনার উপদেশ বাক্যরূপ প্রবাহ দ্বারা পুনঃ পবিত্র করুন[৩২।৩৩]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে সৌম্য! উত্তমসিদ্ধান্তযুক্ত, সুশ্রব্য ও হিতজনক উপশমপ্রকরণ বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[১]। হে রামচন্দ্র! এই যে সুদীর্ঘা সংসারী মায়া, ইহা রাজস ও তামস জন্তুর দ্বারা বিধৃত হইতেছে[২]। কিন্তু যাহারা তোমার ন্যায় গুণসম্পন্ন, সেই সকল ধীর ও সাত্ত্বিক জন্মবান্ পুরুষ সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় দেহ অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন[৩]। হে সাধো! যাহারা সত্ত্বজন্মা বা রাজসসাত্ত্বিক, সেই সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই জগতের পূর্ব্বাপর ভাব বিচার করিয়া থাকেন[৪]। শাস্ত্র, সজ্জন ও সৎকার্য্য সেবনে যাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই প্রদীপতুল্য নির্ম্মলা বুদ্ধি (প্রদীপ যেমন বস্তুপ্রকাশক, তাহার ন্যায় বস্তুপ্রকাশিকা বুদ্ধি) প্রাপ্ত হন[৫]। যাবৎ জনগণ আত্মবিচারদ্বারা জ্ঞেয় আত্মাকে অবগত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব[৬]। হে রঘুনন্দন! প্রজ্ঞাবান্, নীতিবিশারদ ও ধীর রাজসসাত্ত্বিক জন্মবান্ দিগের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ[৭]। হে প্রাজ্ঞ! তুমি এই সংসারে কি সত্য ও কি অসত্য, তাহা অবলোকন করিতে ও সত্যপরায়ণ হইতে সমর্থ[৮]। যাহা আদিতেও নাই ও অন্তেও নাই তাহার আবার সত্যতা কি? পরন্তু যাহা আদি ও অন্ত এই উভয় কালে বিদ্যমান, তাহাই সত্য; অবশিষ্ট অসত্য[৯]। যে বস্তু আদ্যন্তে অসৎ, তাহাতে যাহার মন অনুরক্ত হয়, সেই মুগ্ধ জন্তুর মনে বিবেক জন্মিবার সম্ভাবনা কি[১০]? সংসারে মনই জাত, মনই বর্দ্ধিত এবং সম্যক্‌দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে মনই বিমুক্ত হইয়া থাকে[১১]।

রামচন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! ভুবনত্রয় মধ্যে মনই যে জরামরণভাজন, তাহা আমি পরিজ্ঞাত হইয়াছি[১২]। এক্ষণে সংসারোত্তরণের উপায় কি, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট করুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সৎশাস্ত্রের অনুশীলন (সৎশাস্ত্র=অধ্যাত্মশাস্ত্র), সজ্জনের সংসর্গ ও বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান, এই সকল দ্বারা মন জ্ঞানপ্রাপ্তিযোগ্য বিশুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়[১৪]। ঐ সকল দ্বারা চিত্ত

যদি অভিমানবিহীন হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৈরাগ্যোদয় হইবে। বৈরাগ্যোদয় হইলেই তখন জ্ঞানগুরু গুরুর অনুগমন করা বিধেয়[১৫]। তদনন্তর তদুপদিষ্ট কালে ও নিয়মে সগুণ ঈশ্বরের ধ্যানার্চ্চনাদিতে রত থাকিতে হয়। তৎপরে কাহার বা শীঘ্র এবং কাহার বা কিছু বিলম্বে সেই প্রার্থনীয় পরম পদ লব্ধ হইয়া থাকে। শীতল চন্দ্রচন্দ্রিকান্বিত আকাশ যদ্রূপ নির্ম্মল তদ্রূপ বিচারান্বিত হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল সুতরাং আত্মদর্শনে সমর্থ[১৬।১৭]। জনগণ যাবৎ বুদ্ধিরূপ ভেলকদ্বারা বিচাররূপ তট প্রাপ্ত না হয় তাবৎ ভবরূপ মহাসাগরে তৃণের ন্যায় বাহিত হইতে থাকে[১৮]। বালুকা যেমন সলিলের মালিন্য অধঃপাতিত করে তাহার ন্যায় বিচারপরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বও জনগণের বুদ্ধির দোষ ও সমুদায় আধি (মনের মালিন্য) অধঃপাতিত করে[১৯]। স্বর্ণকার যখন জানে—ইহা সুবর্ণ, ইহা সুবর্ণ নহে কিন্তু অন্য বস্তু, তখন আর তাহার সুবর্ণ বিষয়ে কোন প্রকার মোহ থাকে না। তদ্রূপ, যে ব্যক্তি বিচার দ্বারা আত্মা ও অনাত্মা বিজ্ঞাত হইয়াছে, আত্মবিষয়ে তাহার আর কোন প্রকার মোহ থাকে না[২০]। অজ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের মনই মুগ্ধ হয়, জ্ঞাততত্ত্ব পুরুষের মূঢ়তা থাকে না[২১।২২]। হে জনগণ! আত্ম-অজ্ঞানতাই তোমাদিগের দুঃখের কারণ এবং আত্মবিজ্ঞানই তোমাদের অনন্ত সুখের ও দুঃখোপশমের উপায়[২৩]। তোমরা এই দেহের সহিত একলোল হইয়া (মিশিয়া গিয়া) আত্মহারা হইয়াছ। তাই বলিতেছি, তোমরা ঐ মিশ্রণ হইতে আত্মাকে ব্যক্ত বা পৃথক্ করিয়া শীঘ্র স্বস্থ হও, বিলম্ব করিও না[২৪]। অহে মানবগণ! যেমন কলঙ্কের সহিত হেমের সম্বন্ধ নাই, তাহার ন্যায় পরমাত্মার সহিত দেহের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ নাই[২৫]। যেরূপ পদ্মাধার মহাসলিল ও পদ্মপত্রস্থিত সলিলবিন্দু অভেদ হইলেও পদ্মপত্ররূপ উপাধি তদুভয়ের ভিন্নতা বোধ জন্মায়, তদ্রূপ, ব্রহ্ম ও শরীরী (জীব) বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধি ভেদভ্রম উৎপাদন করতঃ তিনি ব্রহ্ম, আমি জীব, ইত্যাদিবিধ ভেদানুভব জন্মাইতেছে। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কিন্তু কেহই আমার ঐ হিত কথা শুনিতেছে না। আবার বলিতেছি, জড়ধর্ম্মী মন যতদিন কূপকচ্ছপের ন্যায় আত্মবিচারে বিমুখ হইয়া ভোগমার্গে অবস্থিতি করিবে তত দিন ইন্দু ও বহ্নি প্রভৃতি সর্ব্বতেজের সহিত দ্বাদশ সূর্য্যের দ্বারাও এই ঘোর

সংসারতিমির কদাচ বিনষ্ট হইবে না[২৬।২৮]। মন আত্মবিচার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলেই এই সংসারতিমির সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় পলায়ন করিবে। মন যদি উত্তম বোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগরূপ তত্ত্ব অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই মিথ্যা ভববোধ হইতে উৎকৃষ্ট প্রবোধযুক্ত-আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। ভব অর্থাৎ সংসারই অনন্ত দুঃখপ্রদ[২৯।৩০]। যেরূপ কমল অম্বুরাশির সহিত বসতি করিলেও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, তদ্রূপ, আত্মাও দেহের সহিত একযোগে থাকিলেও তাহাতে সংশ্লিষ্ট বা লিপ্ত নহেন। হেমের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্দ্দম যেমন পৃথক্ স্থিতি প্রাপ্ত হয়, কদাচ হেমের স্বরূপে পরিণত হয় না, তদ্রূপ এই জড় দেহও কদাচ আত্মায় পরিণতি প্রাপ্ত হয় না। আত্মাতে যে সুখদুঃখের অনুভব, তাহাও অধ্যাস বশতঃ সুতরাং অসত্য। দেহী বা সর্ব্বাতীত আত্মা সুখদুঃখ অনুভব করেন না। উহা অজ্ঞানীরাই অনুভব করিয়া থাকে। অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইলে কাহাকেও উহা অনুভব করিতে হয় না[৩১।৩৪]। হে রাঘব! এই জগতে কাহারও কিছুমাত্র সুখ বা দুঃখ নাই। সমস্তই আত্মময়, এইরূপ অবধারণ বা অবলোকন করিবে। জলে তরঙ্গভ্রমের ন্যায় আত্মায় এই বিতত সৃষ্টির ভ্রম অথবা আকাশে পিচ্ছভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্রদ্বারা এই বিশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। মণি যেমন অকারণ স্বীয় তেজোময়ী কান্তি প্রসারিত করে, তদ্রূপ, আত্মাও ঈদৃশী সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া থাকেন। হে সুমতে! দ্বৈত বা অদ্বৈত, এই দুইটী কল্পনাও বস্তুতঃ কিছুই নহে। কারণ উহা আভাসমাত্র[৩৫।৩৮]। দ্বৈত ও একত্ব, এ সকল আত্ম-অজ্ঞানের প্রভাবেই প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ কেবল একত্বই সার অথবা সত্য। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, জগৎ ব্রহ্মময়। একমাত্র আত্মাই এই বিততরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাঘব! আমি অন্য, ইহা অন্য, এ জ্ঞান ভ্রান্তি-বিশেষ। তাই বলিতেছি, তুমি ঐরূপ ভ্রান্তি বা ভেদজ্ঞান (ভ্রান্তি) পরিত্যাগ কর। পরমাত্মায় যে দ্বৈত কল্পনা, তাহা জলে লহরী কল্পনার ন্যায় মিথ্যা[৩৯।৪০]। যেমন বহ্নিতে হিমের লেশও নাই, তেমনি, একা-দ্বয় পরমাত্মায় বাস্তবতঃ দ্বিতীয় পদার্থ নাই[৪১]। হে রাঘব! যাহা আপ-নার স্বরূপ, তাহা পরোক্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞাত হইয়া সাক্ষাৎকারার্থ আপনাকে সদা তদ্ভাবে ভাবিত (অর্থাৎ নিদিধ্যাসন) করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে

মায়া-কৌটিল্য-মালিন্য-রহিত পরমাত্মা প্রথমান অর্থাৎ যথাযথরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইবেন। আত্মা তাদৃক্ প্রকারে প্রথমান হইলেই বিশ্রান্তি লাভ হয়[৪২]। হে রামভদ্র! আত্মায় শোক, মোহ, জন্ম, জরা, কিছুই নাই। যাহা আছে তাহাই আছে; অর্থাৎ পূর্ব্বেও যেরূপ, পরেও সেইরূপ এবং মধ্যেও সেইরূপ জানিবে। তুমি তাদৃক্ রূপে অবস্থিতি করতঃ বিজ্বর হও[৪৩]। তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগক্ষেমরহিত, আত্মবান্ এবং বিশোক ও বিজ্বর হও। * হে রাঘব! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্বস্থ, স্থিরমতি মুনির ন্যায় শান্তশোক, মৌন, উৎকৃষ্ট মণির ন্যায় স্বচ্ছ ও বিজ্বর হও। তুমি স্বাধীনচিত্ত, শান্তসঙ্কল্প, শান্তধী, বিজিতাশয় ও বিজ্বর হও। তুমি বীতরাগ, নিরায়াস, বিমল, বীতকল্মষ ও আদান প্রদান বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজ্বর হও[৪৪।৪৭]। তুমি বিশ্বাতীত পদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণার্ণবের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থিতি করতঃ বিজ্বর হও [৪৮]। তুমি বিকল্পজাল হইতে নির্ম্মুক্ত ও মায়াজালবিবর্জ্জিত হও এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করতঃ বিজ্বর হও[৪৯]। হে আত্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ রাঘব! তুমি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও ধরাধরপ্রধান মেরুর ন্যায় ধীর হইয়া বিজ্বর হও[৫০]। তুমি আপনাতে আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় হইয়া পূর্ণেন্দুবিম্বের ন্যায় আনন্দ ভজনা কর। (ফলিতার্থ—অপরিচ্ছিন্ন ও অভাব বোধ বর্জ্জিত হইয়া একরূপে থাক। তদ্রূপ হওয়াকেই জীবন্মুক্তি ফল বলা যায় এবং উক্ত অবস্থাই পূর্ণানন্দাবস্থা।)[৫১।৫২]।

হে রাঘব! এই স্বরচিত বিশ্বপ্রপঞ্চ অসত্য। যাহা অসত্য, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহার অনুধাবনা করেন না। তুমি তত্ত্বজ্ঞ, শান্তকলন ও নিরাময় হইয়াছ সুতরাং তুমি শান্তশোকও হইয়াছ। তুমি গুণরাশির দ্বারা নিখিল রাজ্য ও প্রজা অনুরঞ্জন করিয়াছ। তুমি এই বৈধ রূপে পরিপ্রাপ্ত পিতৃরাজ্য সমদৃষ্টিদ্বারা পরিপালন কর, পরন্তু ইহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া অথবা ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দুএর কিছুই হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ তুমি সর্ব্বাতীত হইয়া থাক[৫৩।৫৪]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

---

* নির্দ্বন্দ্ব=শীতোষ্ণাদির দ্বারা শারীর বিক্ষেপ বিরহিত। নিত্যসত্ত্বস্থ=রজস্তমঃ দ্বারা মানস বিক্ষেপ রহিত। যোগক্ষেমরহিত=লাভালাভ চিন্তা বর্জ্জিত। আত্মবান্ =ব্রহ্মাকারা মনের বৃত্তি বিশিষ্ট হওয়া। সুতরাং শোকাদি দুর্দ্দশা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া। এইরূপ হওয়াকে জীবন্মুক্তিপদ প্রাপ্তি বলা যায়।

ষষ্ঠ সর্গ।

—()(*)()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি, মাত্র সন্নিধান দ্বারা নিখিল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, ইত্যাকার বোধ অবলম্বনে কার্য্যবান্ হইলে সেই কার্য্যের দ্বারা বাসনা (সংস্কার) জন্মে না। যিনি বাসনাবর্জ্জিত অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান-বিহীন হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমার বিবেচনায় তিনি মুক্ত[১]। কোন কোন ব্যক্তি দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়াও নিরাসঙ্গক্রিয়ায় রত থাকিতে পারে না। তাহারা মোহের প্রেরণায় কামপরতন্ত্র হইয়া কাম্য কর্ম্মই করে। করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গ ও নরক ভোগ বা অনুভব করে[২]। কেহ কেহ সৎকর্ম্মে বিরত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে রত হইয়া নরক হইতে নরকান্তর, দুঃখ হইতে দুঃখান্তর ও ভয় হইতে ভয়ান্তর প্রাপ্ত হয়[৩]। কেহ কেহ বাসনাতন্তুনিবদ্ধ হইয়া স্বকর্ম্মানুসারে তির্য্যক্ হইতে স্থাবর ও স্থাবর হইতে তির্য্যক্ দেহ প্রাপ্ত হয়[৪]। আবার কোন কোন বিচারিতমনা আত্মজ্ঞ ও ধন্য পুরুষ সংসারনিগড় ছেদন পূর্ব্বক সেই উৎকৃষ্ট পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[৫]। যাহারা কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়াই মুক্ত হন তাঁহাদিগের জন্ম রাজসসাত্ত্বিক। তাঁহারা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণিমা শশাঙ্কের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও প্রাবৃট্‌কালীন কুটজের ন্যায় সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। (সৌভাগ্য=সাধন সমূহ। কুটজ পক্ষে শোভা বা সৌন্দর্য্য)। যিনি ঐরূপ জন্ম প্রাপ্ত হন, বিমলা ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাতেই বেণুতে মুক্তার ন্যায় আবির্ভূত হয়[৬।৮]। যেমন অঙ্গনাগণ সর্ব্বদা অন্তঃপুরে অবস্থান করে, তদ্রূপ, আর্য্যতা, হৃদ্যতা, মৈত্রী, সৌম্যতা, করুণা ও প্রাজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণ তাঁহারই অন্তরে অনুক্ষণ অবস্থান করে[৯]। যে ব্যক্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলের প্রতি লক্ষ্য না করে ও তজ্জনিত হর্ষ শোক অনুভব না করে, দিবসে অন্ধকারের ন্যায় ও শরৎকালে মেঘ-মণ্ডলের ন্যায় গুণ সমুদায় (সত্ত্বাদিগুণ) তাহাতেই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাহাদেরই সেই সেই মালিন্য দূরীভূত হয়[১০।১১]। যেমন মধুরধ্বনিযুক্ত বেণু বনস্থ মৃগগণের অভিলষণীয়, তদ্রূপ, সদাচার পরায়ণ

ব্যক্তি জনগণের বাঞ্ছনীয়। যাহাদের সাত্ত্বিক জন্ম হয় গুণশ্রী সমুদায় তাহাদেরই অনুগমন করে। পরে তিনি গুণসম্ভূত হইয়া গুরুর অনুগামী হন এবং স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে বিবেক পথে নিয়োজিত করেন। বিবেকবৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বীয় গুণশালী চিত্তের দ্বারা আত্মাকে অনাময় ও আনন্দময় দেবরূপে অবলোকন করিতে পারক হন (অধিকার প্রাপ্ত হন)[১২।১৫]। অনন্তর সেই শান্তচেতা সাত্ত্বিক পুরুষ বিচার সহকারে প্রবোধ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ মনকে আন্তর পুরুষের (আন্তর পুরুষ=শরীরস্থ আত্মা।) মননে নিয়োজিত করেন। গুণবান্ নর যেমন গুণহীনকে প্রবোধিত করেন তদ্রূপ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ মনকেই প্রবোধিত করেন। সাত্ত্বিকজন্মবান্ মানব প্রযত্ন সহকারে জীবন্মুক্ত গুরুর সেবা করিয়া স্বীয় নির্ম্মলা বুদ্ধির দ্বারা চিত্তের অন্তর্গত প্রত্যগাত্মরূপ রত্নের বিচার করতঃ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন[১৬।১৮]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন! অদ্য তোমার নিকট দেহিগণের সামান্য ক্রিয়াক্রম কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর বিশেষ ক্রম কহিতেছি, শ্রবণ কর[১]। এই সংসারসংরম্ভে জন্মবান্ দেহধারী দিগের অপবর্গজনক ক্রমদ্বয় আছে। তন্মধ্যে গুরূপদিষ্ট অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ এক বা বহু জন্মে সিদ্ধিপ্রদ একটী ক্রমের বিষয় পূর্ব্বে উদাহৃত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় ক্রম—যে ক্রমে অল্পব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরা স্বয়ং স্ব-বুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—সেই দ্বিতীয় ক্রমের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২।৪]। অতর্কিতভাবে আকাশ হইতে ফল পতনের অনুরূপ সহসা জ্ঞান প্রাপ্তির যে ক্রম আছে, সেই ক্রমের বৃত্তান্ত তোমার জ্ঞান পরিপোষণের জন্য বর্ণন করিব। হে রামচন্দ্র! হে সুভগ! চরমজন্মা মহানুভাব শুভাশুভমুক্ত সাত্ত্বিক মহাপুরুষেরা উত্তম জন্ম প্রাপ্তে যেরূপে অতর্কিতভাবে ফলপতনের দৃষ্টান্তে বিবেক ফল অনুভব করেন—বক্ষ্যমাণ বৃত্তান্তে তাহাই সুব্যক্ত হইবে[৫।৬]।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

—○•○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিদেহনগরে জনক নামে এক মহাধীসম্পন্ন বীর্য্যশালী মহীপাল ছিলেন। তাঁহার আপদ্ সমুদায় অস্তগত ও সম্পদ্ সমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল[১]। তিনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ, মিত্ররূপ পদ্মের দিবাকর, বন্ধুরূপ কুসুমের বসন্ত, নারীবৃন্দের মকরকেতন, দ্বিজরূপ কৈরবের শীতাংশু, শত্রুরূপ মহাতিমিরের ভাস্কর ও সৌজন্যরূপ রত্নের জলধিস্বরূপ ছিলেন। এই মহীপাল ভূতলে বিষ্ণুর ন্যায় অবস্থিতি করিতেন[২।৩]। ইনি একদা বসন্তকালে বিবিধ পুষ্পোপশোভিত ও কোকিলাদি পক্ষিগণে পরিকূজিত কোন এক রমণীয় উপবনে গমন পূর্ব্বক স্বীয় অনুচরবর্গকে দূরে স্থাপিত করিয়া একাকী বাসবের ন্যায় সেই নন্দনবনতুল্য পরম রমণীয় বনে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। সেই সময়ে তত্রত্য কোন এক তমাল বন প্রদেশে সিদ্ধগণের গাথা তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। হে কমলপত্রাক্ষ! যাহা শ্রবণ মাত্রেই পরমাত্মভাবনা সমুপস্থিত হয়, আমি তোমার নিকট সেই শৈলকন্দরচারী বিবিক্তবাসী সিদ্ধগণের মনোহর গীতগাথা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[৪।৮]।

কতিপয় সিদ্ধ বলিতেছেন—দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যোগ হইলে বুদ্ধি যে দৃশ্যাকারতা প্রাপ্ত হয়, সেই দৃশ্যাকার বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত যে আনন্দরূপ আত্মতত্ত্ব, আমরা সমাহিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অন্তঃকরণ চাঞ্চল্য নিরাস করতঃ সেই আত্মতত্ত্বের উপাসনা করি। অর্থাৎ ভূমাত্মানন্দ অনুভব করি[৯]। *

---

* চক্ষুরাদির দ্বারা বিনির্গত অন্তঃকরণ বৃত্তিতে যে আত্মচৈতন্য অনুরঞ্জিত হয় তাহা এতৎ শাস্ত্রের দ্রষ্টা। উক্ত প্রকারে দৃশ্যে অন্তঃকরণ সংযোগ হওয়ার পর অন্তঃকরণে দৃশ্যের আকার অঙ্কিত হয়। তাহা এতৎ শাস্ত্রে দর্শন ও জ্ঞান। নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে অন্তঃকরণ স্থির হয়, তখন কোনও বৃত্তি থাকে না। সুতরাং তখন আত্মার প্রকৃত রূপ স্থির থাকে, কোন কিছুতে প্রচ্ছাদিত বা অনুরঞ্জিত হয় না। তৎকালের সেই অনাবৃত অবস্থাই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব।

তৎ শ্রবণে অন্য সিদ্ধগণ বলিলেন, দ্রষ্টৃ, দর্শন, দৃশ্য, এই ত্রিপুটী ও তৎসংস্কার, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া উক্ত চতুষ্টয়ের সাক্ষীস্বরূপ যে আত্মা (শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ চৈতন্য), আমরা তাহারই উপাসনা করি, অর্থাৎ সমাধিযোগে নিরন্তর অনুভব করি[১০]। *

অনন্তর অপর সিদ্ধগণ বলিলেন, অস্তি—আছে, নাস্তি—নাই, যাহা এই দুই পক্ষের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ উক্ত উভয় পক্ষের সাক্ষী, এবং যাহা প্রকাশ্যমাত্রের প্রকাশক, আমরা সেই আত্মার উপাসনা করি[১১]। †

অন্যে কহিল—যাহা সর্ব্বাধার, সর্ব্বস্বামী, সমুদায়ের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, সম্প্রদানাদি ভাবের নির্ব্বাহক, মায়ার দ্বারা জগদ্ব্যবহার নিষ্পাদক ও সর্ব্বাত্মক, সেই পরমার্থ সত্য ব্রহ্মের সহিত আমরা অভিন্ন অর্থাৎ আমরা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া আছি[১২]।

অপরে কহিল—যাহা অকারাদি হ-কারান্ত শব্দের অর্থাৎ অহং এই শব্দের (পদের) লক্ষ্য স্থান, অশেষ জগতের আকার যাহা ছাড়া নহে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই যাহাতে ভাসমান, এবং প্রত্যেক ব্যবহারে যাহা উচ্চারিত বা প্রকটিত হয়, সেই অহং, যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাধি, আমরা সেই উপাধি পরিত্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করি। অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনা করি[১৩]।

অন্যে কহিলেন, যে ব্যক্তি হৃদ্‌পদ্মস্থ ঈশানকে অর্থাৎ নিয়ন্তাকে অন্তর্যামী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবের অনুগত হয়, সেই ব্যক্তি স্বহস্তস্থিত কৌস্তুভ মণি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রত্ন বাঞ্ছা করে[১৪]।

অপর সিদ্ধ কহিলেন, যাহার দ্বারা বাসনারূপা বিষবল্লী সমূলে বিলূনা হয়, সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সেই ঈশানকে লাভ করা যায়[১৫]।

অন্যে কহিলেন, যে দুর্ম্মতি বিষয়ের বৈরস্য জ্ঞাত হইয়াও তাহার কামনা করে, সেই ব্যক্তি নরগর্দ্দভ[১৬]।

---

* ইঁহারা অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মানুভব বর্ণন করিতেছেন। জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু, জ্ঞানকর্ত্তা, এই তিনেরই প্রকাশক ও অস্তিত্বসাধক চেতনা পদার্থই আত্মা।

† ইঁহারা আরও সরল পথে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহারা বুঝাইতেছেন যে, যে পদার্থ বা বস্তু অস্তি ও নাস্তি এই পক্ষদ্বয় বুঝিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে সেই সর্ব্বসাক্ষী পরম বস্তুই আত্মা।

অন্তে কহিলেন, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত হনন করেন, তদ্রূপ, বিবেক দণ্ডে অজস্র সমুত্থিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিহনন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাহ্য ও আন্তর উভয় বৃত্তি প্রশান্ত করিয়া পরম পবিত্র উপশম সুখ আহরণ করা কর্ত্তব্য। যে হেতু, তাদৃশ উপশম সুখ লাভ করিতে পারিলে চিত্ত প্রশমিত হয় এবং পরে সেই প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি অচিরাৎ স্বীয় পারমার্থিক উৎকৃষ্ট স্থিতি প্রাপ্ত হয়[১৭।১৮]। *

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

---

* ঋষিবর বশিষ্ঠ এই সিদ্ধগীতাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আত্মতত্ত্বের উপদেশ ও তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভের উপায় বা যৎকিঞ্চিৎ সাধন কথা বলিয়াছেন। ঋষির মতে আত্মা অজড় অর্থাৎ চেতনা পদার্থ। তাহা নির্গুণ, নিরাকার ও ব্যাপী পদার্থ। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী বা পরিপূর্ণ, তাহার ন্যায় চেতনা সর্ব্বব্যাপী ও পরিপূর্ণ। আকাশ যেমন বাহিরে আছে, দৃশ্য পদার্থের মধ্যেও আছে, তাহার ন্যায় চেতনাও শরীরে ও শরীরের বাহিরে আছে সুতরাং তাহা এক অখণ্ড দণ্ডায়মান বস্তু। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত পদার্থই পরিচ্ছিন্ন। আকাশ অপরিচ্ছিন্ন সত্য; পরন্তু আত্মার নিকট পরিচ্ছিন্ন। আকাশ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেও ব্যবহারে অপরিচ্ছিন্ন। আকাশ প্রকৃত নিরাধার না হইলেও ব্যবহারে নিরাধার। পণ্ডিতেরা সেই অপরিচ্ছিন্নতা ও অনাধারতা গ্রহণ করিয়া শিষ্য দিগকে আত্মা বুঝাইয়া থাকেন। তাই বলা হইয়াছে, যে, অন্য বস্তু পরিচ্ছিন্ন, পরন্তু আকাশ অপরিচ্ছিন্ন। সেইরূপ, আকাশের আধার নাই, পরন্তু আকাশই সর্ব্বাধার। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা বিধায় আত্মা আকাশের ন্যায় নিরাধার পরন্তু অপূর্ণতা বিধায় পদার্থান্তর সাধার। পদার্থান্তরের কথা দূরে থাকুক, আত্মা আকাশেরও আধার। এতাদৃশ আত্মা শরীররূপ উপাধিতে অভিব্যক্ত, অন্যত্র অব্যক্ত। শরীরে অভিব্যক্ত বলা যায় বটে; পরন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত নহে। শরীরে বুদ্ধি প্রভৃতি নানা ক্রিয়ার ও গুণের উদ্ভব আছে। সে সকলের সঙ্গে তিনি মিশিয়া থাকেন। অথবা তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্নভাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাহার প্রকৃত স্বরূপ সুব্যক্ত হয় না। যদি শরীরের সেই সকল ক্রিয়া ও গুণ উদ্রিক্ত না হয় অর্থাৎ স্থগিত থাকে, তাহা হইলে অবশ্য তদ্দশায় আত্মার স্বরূপ অনাবৃত ও প্রথমান থাকে। তৎকালের সেই প্রথমানতাই মোক্ষ ও আত্মলাভ। তাদৃশ মোক্ষের বা আত্মলাভের উপায় বিবেক, বৈরাগ্য ও চিত্তবৃত্তিবিনাশ।

নবম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহীপতি ঐ সিদ্ধগীতা * শ্রবণ করিয়া রণধ্বনি শ্রবণে ভীরুগণের বিষাদ প্রাপ্তির ন্যায় সহসা বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। যেমন সরিৎ সমূহ তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণের আশ্রয় লাভ করিয়াও অর্ণবের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার ন্যায় তিনি পরিবারগণে পরিবৃত থাকিয়াও গৃহ গমনার্থ নিতান্ত সমুৎসুক হইলেন১।২। পরে স্বীয় পরিবারগণকে স্ব স্ব আলয়ে রাখিয়া একাকী সূর্য্যদেবের উদয়াচলারোহণের ন্যায় স্বীয় প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন এবং দেহাদি পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতা আলোচনা করতঃ নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বক্ষ্যমাণরূপে পরিতাপ করিতে লাগিলেন৩।৪।

হা! কি কষ্ট! আমি এই অতি কঠোর কষ্টপ্রদ ভঙ্গুর লোকদশায় নিপতিত থাকিয়া পাষাণের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতেছি৫। কাল অনন্ত, আমার জীবন তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ। তাহাতেই আমার আশা? ধিক্ আমাকে! অহো! আমি কি অধম ও চেতনাবিহীন৬! আমার জীবন যাপনের জন্য রাজত্ব অতি যৎসামান্য ও তুচ্ছ। আমি যদি ভাবিদুঃখপ্রতিকার চেষ্টা না করিয়া অবোধের মত অবস্থান করি, তাহা হইলে এই রাজ্যে আমার কি হইবে? আমি দেহমাত্র নহি। আমি অনাদি ও অনন্ত, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত এই ভঙ্গুর দেহকে আমি আমিত্বে গ্রহণ করিয়া বালক যেমন চিত্রিত চন্দ্র দেখিয়া হাস্য করে, তাহার ন্যায় আমি ক্ষণধ্বংসী দেহাদিতে সুখ দর্শন করিতেছি৭।৮। আমি কি কোন ঐন্দ্রজালিক কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াছি? তাহা না হইলে আমার এত পরিমুগ্ধতা কেন৯? জগতে এমন কিছু নাই—যাহা সত্য, রম্য, অপরিচ্ছিন্ন ও অজন্য। সমস্তই অসত্য, অরম্য, অনুদার ও জন্য।

---

* গীতাশব্দের অক্ষরার্থ গানযোগ্য; পরন্তু তাৎপর্য্যার্থ স্মার্ত্ত উপনিষদ্। যেমন প্রসিদ্ধ উপনিষদ্ সকল বেদের উপনিষদ্, তেমনি, গীতা সকল স্মৃতির উপনিষদ্। উপনিষদ্ শব্দের অর্থ—রহস্য বা গুপ্তবিদ্যা।

সুতরাং আমার মতি কিসে বিশ্রাম করিবে? কি পাইয়া শান্ত হইবে[১০]? তাহা দূর দেশেও নাই। যাহাকে দূর বলা যায় তাহাও আমার মনোমধ্যে। অতএব, দূরনিকটাদি কল্পনাও অন্তঃস্থ এবং সে সমস্তই অসত্য। কাল্পনিক বলিয়া অসত্য। সুতরাং আত্মতত্ত্বের বাহিরে যে কোন ভাবনা, যে কোন চিন্তা, সে সমস্তই আমার পরিত্যাজ্য[১১]। লোক সকল যে সুখ ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত আছে, আমি দেখিতেছি, তাহা কেবল জন্মমরণাদি দুঃখেরই কারণ। তাহাতে সুখের প্রত্যাশা কি[১২]? প্রতিবৎসর, প্রতিমাস, প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ যাহা ভোগ করিতে হয় তাহা সুখ নহে, সুখগন্ধি দুঃখ সুতরাং তাহা দুঃখই, সুখ নহে[১৩]। কি মূর্খতা! আমার এই রাজ্যাদি যে ক্ষণস্থায়ী ও নষ্টপ্রায়, আমি তাহা ক্ষণকালও চিন্তা করি না। এই সংসারে এমন পদ কিছুই নাই যাহাতে সজ্জনের স্থিতি হইতে পারে[১৪]। রে হতচিত্ত! মহৎ গণের মস্তকোপরিস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণও যখন অধঃপতিত হইতেছেন তখন তোমার এই সামান্য মহত্ত্বে আস্থা কেন[১৫]? আমি রজ্জু নাই অথচ বদ্ধ, পঙ্ক নাই অথচ কলঙ্কিত, এবং উপরিস্থ হইয়াও নিপতিত হইতেছি[১৬]। এরূপ কলঙ্কিত যে, সৎস্বভাব হইতে পরিচ্যুত হইয়াছি। আমার বুদ্ধি আছে, তবে যে কেন আমার এরূপ মোহ জন্মিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ভাস্করের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ[১৭]? আমার এই মহাভোগ কি? এই সমস্ত বন্ধুবান্ধবগণই বা কি? আমি কেবল ভূতশঙ্কিত বালকের ন্যায় মিথ্যা ব্যাকুলিত হইতেছি[১৮]। আমি নিজেই জরামরণের প্রিয়সখী উদ্বেগকারিণী সাংসারিক আস্থাকে বাঁধিয়া রাখিতেছি[১৯]। সংসার থাক্ আর থাকুক, ইহার প্রতি আমার আর আগ্রহ বা আস্থা নাই। আমি বেশ্ বুঝিয়াছি, ইহা জলবুদ্বুদের ন্যায় মিথ্যা[২০]। পৃথু প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের সেই সেই মহা ঐশ্বর্য্য, মহাভোগ ও বন্ধুবান্ধব; সমস্তই আমার স্মরণ হইতেছে। এখন আর আমার বর্ত্তমান বিভবে আস্থা কি? মহীপালদিগের প্রাক্তন অতুল সম্পত্তি ও ব্রহ্মার প্রাক্তন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এখন কোথায়? যখন পূর্ব্ব ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়াছে তখন আর আমার এই সামান্য ঐশ্বর্য্যে বিশ্বাস কি[২১।২২]? বুদ্বুদ যেমন বারি রাশিতে জন্মিয়াই লয় প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র জন্মিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, হে বলে! জীবনের প্রতি যে

তোমার সমাদর তাহা তুমি পরিত্যাগ কর। নচেৎ সাধুগণ উপহাস্য করিবেন[২৩]। কোটি কোটি ব্রহ্মা, অনন্ত স্বর্গ ও অসংখ্য প্রাণিগণ পাংশুর ন্যায় অহরহ গত হইয়াছে ও হইবে। তুমি কেন জীবনের প্রতি এত শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছ? জীবিতশ্রদ্ধা সংসার রাত্রির দুঃস্বপ্ন। তাহার প্রতি যদি তুমি আস্থা রাখ ত তোমাকে ধিক্[২৪।২৫]। আমি, তিনি, উনি, এ সকল কল্পনামাত্র সুতরাং অসৎ। আমি "আমি" এই অহঙ্কারপিশাচের গ্রাসগত হইয়া বৃথা অজ্ঞজনের ন্যায় মুগ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতেছি[২৬]। শত শত ও লক্ষ লক্ষ দিনযামিনী গমনাগমন করিতেছে। তন্মধ্যে অবিনাশী সত্তাযুক্ত একটী দিনও দেখিলাম না। একটী রাত্রিও নয়নপথে সমুপস্থিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে আয়ুঃ বিনষ্ট হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। ওহে আস্থে! তোমার এত বৃদ্ধি কেন? তুমি কি দেখিতেছ না? যাহারা জগতের ঈশ্বর—শিব বিষ্ণু প্রভৃতি—তাহারা কালকাপালিকের ক্রীড়া কন্দুক[২৭।২৯]? সরোবরে সরসিজের ন্যায় জনগণের কেবল ভোগেরই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। পরন্তু আত্মদৃষ্টির অল্পমাত্রও স্ফুরণ হইতেছে না[৩০]! অহো! কি কষ্ট! আমি কষ্ট হইতে কষ্টতর ও দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি বিরক্ত হইতেছি না। অতএব অধমাশয় আমাকে ধিক্[৩১]। আমি এতাবৎ কাল যে যে বস্তুতে অনুরক্ত ছিলাম, যাহা যাহা রমণীয় বোধ করিতাম, সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব, সংসারে এমন আর কি আছে—যাহাকে আমি উত্তম বলিতে পারি[৩২]? প্রথমে হউক, মধ্যে হউক, অথবা শেষে হউক, যাহা যাহা মনোরম ভাবিয়াছি সে সমস্তই অপবিত্র। কেনন্য তাহারা সকলেই বিনাশ দোষে দূষিত[৩৩]। মানবেরা যে যে পদার্থে আস্থা স্থাপন করে সে সমস্তই জন্মবিনাশাদি দোষে দুষ্ট[৩৪]। জড়াকার জনগণ উত্তরোত্তর দিন দিন অধিক পাপদশা, ক্রূরদশা ও দুঃখময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়[৩৫]। জীবেরা বাল্যকালে অজ্ঞান কর্ত্তৃক হতপ্রায় থাকে, পরে যৌবন কালে মদন কর্ত্তৃক বিনষ্টচিত্ত হইয়া অবস্থান করে, তদনন্তর বৃদ্ধকালে অশেষচিন্তায় নিপীড়িত হইয়া তনু পরিত্যাগ করে। অতএব জড়প্রকৃতি মানবগণ কবে কি করিবে[৩৬]? কেন যে তাহারা এই আগমাপায়ী ও বিরস অনন্তদুর্দ্দশাদূষিত অসার সংসারকে সারময় দর্শন করে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না[৩৭]। রাজসূয় ও অশ্বমেধ

প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও কদাচ কল্পান্তকালাধিক স্বর্গলাভে সমর্থ হওয়া যায় না[৩৮]। তেমন স্বর্গই বা কোথায়? পাতাল, ভূমি ও প্রদেশান্তর, যে স্থানই বল, এমন স্থান দেখা যায় না—যে স্থানে ভ্রমের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না[৩৯]। নিজ চিত্তরূপ গর্ত্তের সর্পরূপ আধিকে ও শরীররূপ বৃক্ষের পল্লবরূপ ব্যাধিকে কোথায় থাকিয়া কি দিয়া নিবারণ করা যায়? যাহা বর্ত্তমানে আছে তাহার নাশ হইবে। যাহা এখন রমণীয়, পরে তাহা অরম্য হইবে। এবং যাহা বর্ত্তমানে সুখ, তাহারই মস্তকে দুঃখ। অতএব আমি কাহার আশ্রয় লইব[৪০।৪১]? প্রাকৃত ক্ষুদ্র জীব সকল অজস্র জন্মিতেছে ও মরিতেছে। এই পৃথিবী তাহাদেরই দ্বারা পূর্ণ। সাধু সজ্জন দুর্লভ। নীলোৎপলনয়না ভ্রমরনয়না প্রেমভূষণা বিলাসিনীরা কেবল হাস্যেরই আস্পদ[৪২।৪৩]। যাহাদের নিমেষে ও উন্মেষে জগতের প্রলয় ও উদয় হইতেছে, সেই সমস্ত ধন্য পুরুষেরাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তখন আর মাদৃশ মূঢ়গণের কথাই বা কি? গণনাই বা কি? রম্য হইতেও রম্যতর ও স্থির হইতেও সুস্থিরতর আছে, পরন্তু সমস্তই চিন্তার আস্পদ। পদার্থশ্রীর বাসনায় প্রয়োজন কি? বিচিত্র সম্পদ্ সকল চিত্তসম্মত ও মহারম্ভযুক্ত এবং বিচিত্র আপদ্ সমুদয়ও চিত্তসম্মত ও মহারম্ভযুক্ত[৪৪।৪৬] জগতের এতাদৃশী স্থিতি কাকতালীয়-ন্যায়ে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে সুতরাং তাহাতে হেয়োপাদেয়কল্পনা ব্যর্থ ও মূর্খকৃত[৪৭।৪৯]। অর্থাৎ যাহারা ভোগলম্পট—তাহারাই ইহ জগতে হেয় ও উপাদেয় অন্বেষণ করে এবং কল্পনা করে। পতঙ্গ যেমন বহ্নি শিখায় অনুরক্ত হয় তাহার ন্যায় আমিও বৃথা আত্মনাশক পদার্থে অনুরক্ত হইতেছি। দেশ, কাল, বস্তু, এ সকল যাহাকে পরিচ্ছিন্ন করে ও যাহা তাপত্রয়ে প্রতপ্ত হয়, তাদৃশ সুখনামক বোধের প্রতি আমি কি জন্য অনুরক্ত হইতেছি? বরং রৌরবাগ্নি মধ্যে অবস্থান করা ভাল ত সুখদুঃখপরিবর্ত্তিত সংসারে অবস্থান করা ভাল নহে। *

* অভিপ্রায় এই যে, নিরন্তর দুঃখভোগ ঘটনা হইলে ক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং অভ্যাসের প্রভাবে তাহা স্বভাবগত ও সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু সংসারে সেরূপে দুঃখ ভোগ হয় না। সংসারের সুখ দুঃখমিশ্র। পরন্তু সুখানুভব শেষ না হইতে না হইতে দুঃখ আগমন করে সুতরাং সে রূপের দুঃখ অনভ্যস্ত বিধায় নিতান্ত অসহনীয়। এ সকল রহস্যকথা পরপংক্তিতেও সুব্যক্ত হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, দুঃখের চরম সীমা সংসার। দেহ তন্মধ্যপাতী। সুতরাং সুখের সম্ভাবনা কি[৫০।৫২]? এই সংসার অকৃত্রিম মহাদুঃখ। যাহারা এতন্মধ্যে অবস্থান্ করে তাহাদের নিকট তদন্তর্গত ক্ষুদ্র দুঃখ সকল সহনীয় বিধায় মধুর হয় অর্থাৎ সুখ বলিয়া গণ্য হয়। (যেমন খড়্গাঘাতের নিকট বেত্রাঘাত সুখ)[৫৩]। সহস্র সহস্র শাখাঙ্কুরাদি সম্পন্ন ফলপল্লবশালী এই সংসারবৃক্ষের মূল মন এবং তাহাও আবার সঙ্কল্পময়। অতএব, আমি সঙ্কল্পের উপশম দ্বারা এই সংসার বৃক্ষের মূল এরূপে বিনষ্ট করিব যাহাতে ইহা সর্ব্বাবয়বে শুষ্ক হইয়া যায়[৫৪।৫৬]। (মানস সঙ্কল্প সকল অঙ্কুর, দেহাদি শাখা, আত্মা ইহাতে শাখাঙ্কুরাদি-সমষ্টিধারী অবয়বী, অর্থাৎ বৃক্ষস্থানীয়। সুখ দুঃখ তাহার ফল এবং অনুরাগ ও লোভ প্রভৃতি তাহার পল্লব।) অদ্য আমি এই আকার-মাত্ররম্য মনোমর্কটের বৃত্তি জানিতে পারিয়াছি, অতঃপর ইহাতে আর আমি রত নহি[৫৭]। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত শত শত আশাপাশে বদ্ধ ও পতন উৎপতন আপদে জড়িত থাকিয়া তাদৃশী সংসারবৃত্তি ভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি। বহু কাল পরে আজ্ আমি বিশ্রাম লাভ করিব[৫৮]। অহো! আমি এ কাল পর্য্যন্ত শত শত বার "মরিলাম" "হত হইলাম" "বিনষ্ট হইলাম" বলিয়া রোদন করিয়াছি, অদ্য হইতে আর আমায় রোদন করিতে হইবে না[৫৯]। আজ্ আমি আত্মচোর মনকে চিনিয়াছি, দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিয়াছি। আজ্ আমার আনন্দের দিন। আজ্ আমি মনোনামধারী আত্মচোরকে নিহত করিব—যে আমার আত্মরত্ন অপহরণ করিয়াছিল[৬০]। এতকাল আমার মনোরূপ মুক্তাফল অবিদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এতকাল পরে তাহা গুণসংযোগের উপযুক্ত হইয়াছে[৬১]। এতকাল পরে আজ্ বিবেক তপনের তাপে আমার মনোরূপ তুষারপিণ্ড চিরকালের নিমিত্ত দ্রবত্ব প্রাপ্ত হইবে[৬২]। আমি আজ্ বিবিধ প্রকারে সিদ্ধ ও উত্তমরূপে প্রবোধিত হইয়াছি। অতএব, এখন আমি পরমানন্দসাধন পরমাত্মার অনুগমন করিব[৬৩]। আজ্ হইতে আমি আমার হারা ধন আত্মরূপ মণিকে একান্তে অবস্থাপিত করতঃ দেখিতে থাকিব ও সুখে অবস্থান করিব। হে বিবেক! আমি তোমারই প্রসাদে আজ্ বলপূর্ব্বক অহঙ্কারময় মনকে বিনাশ করিতে পারক হইয়াছি, সে নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার করি[৬৪।৬৫]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ জনক ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক প্রতিহারী তদীয় পুরে প্রবেশ করতঃ কহিল, হে দেব! ভবদীয় ভুজস্তম্ভে বসুধামণ্ডল সুখে বিশ্রাম করিতেছে। এক্ষণে দিবসোচিত ব্যাপার সম্পাদনার্থ গাত্রোত্থাপন করুন[১।২]। হে দেব! ভবদীয় স্নানভূমিতে স্ত্রীগণ কর্পূরকুঙ্কুমাদিবাসিত জলে পরিপূর্ণ সলিল ঘট সমুদয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন[৩]। স্নানমণ্ডপ সুসজ্জিত ও অপর যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহা তাহাও আয়োজিত হইয়াছে। চামর রথ অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সমস্তই সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছে[৪।৫]। দেবার্চ্চন গৃহ পুষ্পাদির ও পল্লবাদির দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জীকৃত হইয়াছে[৬]। হে দেব! অঘমর্ষণ-মন্ত্রজপকারী দ্বিজগণ আপনার প্রতীক্ষায় স্নানভূমিতে অবস্থান করিতে-ছেন[৭]। হে প্রভো! চামরধারিণীগণ চামরহস্তে অবস্থান ও কান্তাগণ আপনার সুশীতল ভোজনভূমি সজ্জীকৃত করিয়াছেন। সত্বর গাত্রোত্থাপন করুন, ভবাদৃশ মহাজনগণ বৃথা কালাতিপাত করেন না[৮।৯]।

প্রতিহারপতি ঐরূপ কহিলেও রাজা পূর্ব্ববৎ বিচিত্রা সংসারস্থিতি চিন্তা করিতে লাগিলেন[১০]। রাজত্ব কি? তাহাতে সুখ কি? আমার এই ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যে প্রয়োজন নাই[১১]। আমি এই সংসার নামক মায়িক আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তবারিধির ন্যায় একান্তে অবস্থান করিব[১২]। এ সকল অসৎকল্প ও বৃথা ভোগের বিজৃম্ভণ, সুতরাং এ সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি নিরুপাধি সুখে অবস্থান করিব[১৩]। অহে চিত্ত! তুমি ভোগাভ্যাসরূপ কুভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। তুমি যে যে অবস্থায় বা যখন যখন এই ভ্রম দর্শন করিবে তখন তখনই তুমি পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইবে[১৪]। অরে চিত্ত! বার বার বহুবার ভোগাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেও তুমি তৃপ্তি লাভ করিবে না। সেই জন্যই বলিতেছি, তুচ্ছ ভোগচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাহা অকৃত্রিম তৃপ্তি, তাহারই জন্য তুমি তদভিমুখী হও[১৫]।

ভূপতি ঐরূপ চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল শান্তচিত্ত হইলেন এবং চিত্রলিখিতের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন[১৬।১৮]। রাজচিত্তজ্ঞ প্রতিহারী গৌরব ও ভয় প্রযুক্ত তৎকালে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না[১৯]। জনজীবন ভূপতি জনক কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, সংসারে এমন উপাদেয় কি আছে, আমি যত্নপূর্ব্বক যাহার সাধনা করিতে পারি? এমন অবিনাশী বস্তু কি আছে, যাহাতে আমি আস্থা নিবদ্ধ করিতে পারি[২০]? আমার কার্য্যপরতায় প্রয়োজন কি? নিষ্ক্রিয়তায়ই বা প্রয়োজন কি? জগতে বিনাশবর্জ্জিত* কিছুই নাই। আমার এই দেহ—যাহা মিথ্যা উদয় লাভ করিয়াছে—ইহা সক্রিয় হউক আর নিষ্ক্রিয় হউক—তাহাতে শুদ্ধচিৎস্বরূপ আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি আর অপ্রাপ্ত বস্তুর বাঞ্ছা বা প্রাপ্ত বস্তুর পরিত্যাগ করিব না। আমি স্বস্থ হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করিব। আমার যাহা আছে, তাহাই থাকুক, আমি আর তাহা পরিত্যাগ করিব না[২১।২৪]। আমা কর্ত্তৃক কোন কিছু কৃতও হয় না, অকৃতও হয় না। ক্রিয়ার দ্বারাই হউক আর অক্রিয়ার দ্বারাই হউক, আমি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সন্ময়; অবশিষ্ট সমস্তই অসন্ময়। আমি কার্য্য করি বা না করি, আমা কর্ত্তৃক কার্য্য কৃত হউক বা না হউক, আমার কোন কিছুতে ইচ্ছা নাই—যাহাকে আমি উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমার দেহ স্পন্দিত ও উত্থিত হইয়া যথোপস্থিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে করুক। কর্ম্মকৃত ফল সমুদয়ে মনোবৃত্তি প্রশান্ত হইলেই নরগণের সে কর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া গণনীয় হয় না। পুরুষের অন্তরস্থ নিশ্চয়ই কর্ম্মফল প্রেরণ করে। অতএব, আমি আমার বুদ্ধিকে অনাময় পদে উন্নয়ন করিয়া অন্তরস্থ অধীরতাকে পরিত্যাগ করিব[২৫।৩০]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজর্ষি জনক মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করতঃ অনাসক্তচিত্ত (নিষ্কামী) হইয়া উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গাত্রোত্থাপন করিলেন[১]। ইহা ইষ্ট, ইহা অনিষ্ট, এরূপ বিচার বা চিন্তা না করিয়া সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বাসন চিত্তে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[২]। তদ্দিবসীয় কার্য্য ঐরূপে সম্পন্ন করিয়া সমাগত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি দিগকে যথাগত স্থানে গমনের আদেশ দিলেন এবং শর্ব্বরী আগতে পুনর্ব্বার ধ্যানপরায়ণ হইলেন[৩]। মন সমাধিনিমগ্ন হওয়ায় বিষয়চিন্তা হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইল। শর্ব্বরী অতিবাহিত হইলে পুনঃ প্রবুদ্ধ হইলেন এবং পুনর্ব্বার স্বচিত্তকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪]।

অরে চিত্ত! এই চঞ্চলস্বভাব সংসার আত্মার সুখের উপকরণ নহে; তুমি শমতা প্রাপ্ত হও। তুমি শান্ত হইলেই আত্মা সারতম সুখ প্রাপ্ত হইবেন[৫]। তুমি যে যে বিকল্পের সঙ্কল্প করিবে, তোমার সেই সঙ্কল্পে (চিন্তায়) তাহা তাহাই স্ফীত হইবে[৬]। বৃক্ষ যেমন শতশাখান্বিত হয়, তদ্রূপ তুমিও একমাত্র ভোগেচ্ছায় অনন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে[৭]; বস্তুতঃই চিন্তার বিলাসসকল জন্মাদি অনন্ত সংসার সৃষ্টির কারণ। অতএব, তুমি শীঘ্র বিবিধ চিন্তাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উপশম প্রাপ্ত হও[৮]। শান্তি সুখের সহিত সংসার সুখের তুলনা করিয়া দেখ, যদি ইহাতে (সংসারসুখে) কিঞ্চিৎ সার প্রাপ্ত হও, তবে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিও[৯]। দৃশ্যদর্শনলালসা অসার। ইহার প্রতি যে আস্থা তাহা পরিত্যাগ কর, করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহরণ কর। ইহার প্রতি আস্থাও করিও না, অনাস্থাও করিও না, উদাসীন ভাবে থাক[১০]। এই দৃশ্য সৎ হউক, আর অসৎ হউক, উদিত হউক আর অস্তমিত হউক, হে সাধো! তুমি ইহার গুণাগুণে বিকৃত হইও না[১১]। দৃশ্যের সহিত তোমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অবিদ্যমান বস্তুর সহিত আবার সম্বন্ধ কি[১২]? তুমি অসৎ, তোমার এই দৃশ্যও অসৎ, সুতরাং অসদ্বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ অসম্ভব।

যদি এমন ভাব যে, যাহা দোষ তাহা অসৎ, যাহা দৃশ্য তাহা অসৎ, কিন্তু আমি সৎ, তাহা ভাবিলেও সদসতের সম্বন্ধ ভ্রান্তির ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মৃতের ও জীবিতের সম্বন্ধ যদ্রূপ, সদসতের সম্বন্ধও তদ্রূপ[১৩,১৪]। অরে চিত্ত! যদি তুমি ও দৃশ্য উভয়ই সন্ময় হও, তাহা হইলেও হর্ষবিষাদের প্রসক্তি নাই[১৫]। তাই তোমাকে বার বার বলিতেছি, তুমি বিষাদরূপ মহা আধি হইতে পরিমুক্ত হইয়া মৌনরূপ সৎ ও নির্ব্বিকল্প আত্মা অবলম্বন্ কর। দৃশ্যের মধ্যে এমন কিছু নাই যদবলম্বনে তুমি পরিপূর্ণ হইতে পার। অতএব, ঈদৃশ অমঙ্গলাবহ অবষ্টম্ভকে পরিত্যাগ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। যেমন কন্দুক, যেমন অলাত, তাহার ন্যায় বৃথা চঞ্চল ও প্রজ্বলিত হইও না। মোহের বশ্য হইয়া অধোগামী হইও না। তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি বৈরাগ্যবলে ধীরতা অবলম্বন ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ কর[১৬,১৮]।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।
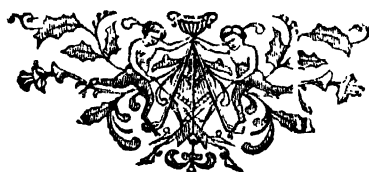
দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, জনক রাজা ঐরূপ বিচার করতঃ শান্তবুদ্ধি ও মোহবিহীন হইয়া স্বরাজ্যের কার্য্য নিচয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[১]। কোন প্রকার আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইলে তদীয় মন উল্লাসযুক্ত হইত না এবং নিরানন্দ ঘটনাতেও তদীয় মন বিক্ষুব্ধ হইত না। তিনি সদা সর্ব্বদা সুষুপ্তের ন্যায় আসক্তি বিধুর থাকিতেন[২]। তদবধি তিনি আর দৃশ্য বিষয়ের গ্রহণ করিতেন না (আমার বলিয়া মনে করিতেন না), অথবা অগ্রহণও করিতেন না, দুএর কিছুই করিতেন না, সুতরাং নিঃশঙ্ক হইয়া যথোপস্থিত ব্যবহারে উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেন[৩]। অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের দ্বারা তিনি শীঘ্রই নির্ম্মল সনাতন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনঃ আর কলঙ্কিত হন নাই[৪]। অবিরত বিবেকানুসন্ধানে তাঁহার জ্ঞান সম্যক্ বিমল হইয়াছিল[৫]। তাঁহার হৃদয়াকাশে চিৎসূর্য্য মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় বিগতাময় হইয়াছিল[৬]। সমস্ত ভাবকেই তিনি আত্মতত্ত্ব চিৎশক্তিতে অবস্থিত দর্শন করিতেন এবং স্বয়ং অনন্তাত্মা ও সর্ব্বভূতাত্ম-কোবিদ হইয়াছিলেন[৭]। তদবধি তিনি প্রহৃষ্ট বা দুঃখিত হইতেন না। অথচ সর্ব্বদাই কার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। সর্ব্বত্র সমতাপ্রাপ্ত, লোকপারাবারজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও সর্ব্বকালদর্শী হইয়া স্বীয় বিদেহ রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারিত না[৮।১০]। মন থাকিলেই তাহাতে গুণদোষাদি থাকে সত্য; পরন্তু তদ্দ্বারা তিনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেন না[১১]। রাজ্যসমুত্থিত অর্থে ও অনর্থে সন্তোষ বা ম্লান হইতেন না। সুতরাং তিনি কোন কিছু করিলেও করিতেন না বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ তিনি সর্ব্বক্ষণই অন্তশ্চৈতন্যে অবস্থান করিতেন[১২]। সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করাতে তাঁহার চিত্ত হইতে সমুদায় বিষয়ভাবনা বিগলিত হইয়াছিল[১৩]। তিনি ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের চিন্তা না করিয়া প্রফুল্লভাবে বর্ত্তমান কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন[১৪]।

হে রামচন্দ্র! ভূপতি জনক ঐরূপ বিচার দ্বারাই প্রাপ্য বস্তু পাইয়াছিলেন, অন্য কোনরূপ চেষ্টায় নহে[১৫]। তাই তোমাকে বলিতেছি, যত দিন না সিদ্ধান্ত লাভ কর, অর্থাৎ বিবেক বিচারের চরম প্রান্ত দেখিতে পাও, তত দিন বিচার করিবে[১৬]। বিচারনির্ম্মলহৃদয় সাধুদিগের সংসর্গে যাহা লাভ করিতে পারা যায়, শাস্ত্রালোচনা ও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব, বিচাররূপ উৎকৃষ্ট পদবী যে স্বীয় সৎসঙ্গদায়িনী বুদ্ধি উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। তদ্দারা যে পদ পাওয়া যায় সে পদ কোন প্রকার পুণ্যকার্য্যে পাওয়া যায় না। পুণ্যকার্য্য সে ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহে। প্রজ্ঞারূপিণী অতিসুন্দরী নিজ সখীর দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়—ক্রিয়ায় সে ফল পাওয়া যায় না। যাঁহার অগ্রে (সম্মুখে) সূক্ষ্মাগ্র বিচারবতী প্রজ্ঞা প্রজ্বলিত থাকে, সে কখনই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন হয় না[১৭।১৯]। রাম! প্রজ্ঞারূপ তরণী ব্যতীত দুঃখকল্লোলসঙ্কুল অপার বিপৎসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই[২০]। যেমন অত্যল্প সমীরণে অসার তৃণরাশি বাহিত হয়, তাহার ন্যায় প্রজ্ঞাবিহীন মানবেরা অল্পমাত্র আপদে অবসন্ন হইয়া থাকে[২১]। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য সহায়হীন বা শাস্ত্রশূন্য হইলেও স্বীয় জ্ঞানবলে এই ভবার্ণব পার হইতে পারেন। কিন্তু দুষ্প্রজ্ঞ মানব সসহায় ও সশাস্ত্র হইলেও কার্য্য শেষ করিতে পারেন না, অধিকন্তু মূলবিনাশী হন[২২।২৩]। সৎশাস্ত্রের আলোচনা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রজ্ঞা পরিবর্দ্ধিতা হইলে তবে তাহা অনাময় পদ প্রাপ্তির কারণ হইবে[২৪]। অতএব, জনগণ ব্যাহার্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত যেরূপ যত্নবান্ হয়, প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাদের সেইরূপ যত্নবান্ হওয়া উচিত[২৫।২৬]। প্রজ্ঞা যদি মন্দ বা কলুষিত হয়, তবে তুমি জানিবে যে, তাহাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের সীমা, দুরবস্থার ও আপদের কোষ, এবং সংসার বৃক্ষের বীজ। অতএব, যাহাতে প্রজ্ঞার মন্দতা বিনষ্ট হয় অগ্রে তাহাই করা কর্ত্তব্য[২৭]। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই রাজ্য ত্রয়ের দ্বারা যাহা যাহা পাওয়া যায়, একমাত্র প্রজ্ঞারূপ ভাণ্ডারে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে[২৮]। দান, তীর্থ, তপস্যা, কেহই প্রজ্ঞার ন্যায় ভবসাগর উত্তীর্ণ করিতে পারে না[২৯]। জগতে যদি কেহ কোনপ্রকার দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহা তিনি

প্রজ্ঞার দ্বারাই লাভ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাই পুণ্যলতার উত্তম ফল এবং সেই প্রজ্ঞা ফলই উত্তম সুস্বাদু[৩০]। আরও দেখ, প্রজ্ঞাবলে বারণগণ প্রবলপরাক্রম সিংহাদি জন্তুকে ছিন্ন ভিন্ন ও জম্বুকগণ সিংহকেও জয় করিতে সমর্থ হয়[৩১]। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সামান্য কুলোদ্ভব হইলেও ভূপত্ব ও স্বর্গাপবর্গ লাভ করিতে পারে[৩২]। প্রজ্ঞা চিন্তামণিসদৃশী। ইহা বিবেকিগণের হৃৎকোষস্থ হইয়া কল্পলতার ন্যায় ফল প্রদান করে। ভব্য নর প্রজ্ঞার দ্বারা সংসার সমুদ্রের পার গমন করে কিন্তু অধম নর প্রজ্ঞার অভাবে তাহা পারে না। শিক্ষিত ব্যক্তিই নৌকার দ্বারা নদী পার হয়, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা পারে না। প্রজ্ঞা সম্যক্ প্রকারে বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্মার্গে নিয়োজিতা হইলে নৌবিদ্যাশিক্ষিত ধীবরের ন্যায় অনায়াসে জনগণকে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ করে, আর রাগ-দ্বেষাদি অসম্মার্গে নিয়োজিত হইলে জনগণকে বিবিধ আপদে নিক্ষিপ্ত করে। ইহ জগতে প্রজ্ঞার দ্বারাই বস্তুনিষ্ঠ গুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আপদ্ বা সম্পদ্ দর্শনে কদাচ সমর্থ হয় না। সূর্য্যের আচ্ছাদনকারী; মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা প্রবাধিত ও বিতাড়িত হয়, তদ্রূপ, প্রজ্ঞার দ্বারাই আত্মজ্ঞানবিরোধী জড়ত্ব অপনীত হইয়া থাকে। হে রাঘব! যদ্রূপ কৃষকেরা ধান্যাদি ফলের প্রত্যাশায় ভূমিকর্ষণ করে, তদ্রূপ, উত্তম পদলাভে সমুৎসুক ব্যক্তিরা প্রজ্ঞারই লালন করিয়া থাকেন[৩৩।৪০]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! জনক যেমন আপনা আপনি আত্মবিচারে নির্ব্বিঘ্নে তত্ত্বজ্ঞদিগের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার ন্যায় তুমিও আত্ম-বিচার দ্বারা বিদিতবেদ্য দিগের পদ প্রাপ্ত হও[১]। যাহারা রাজস-সাত্ত্বিক জন্মবান্ ও প্রাজ্ঞ, তাহারা জনকের ন্যায় আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হন[২]। যাবৎ না আত্মা আপনা আপনি প্রসন্ন হন, তাবৎ ইন্দ্রিয়াখ্য অরি বিজিত হয় না[৩]। সেই পরাবর সর্ব্বগ দেবদেব পরমাত্মা স্বয়ং দৃষ্ট হইলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখদৃষ্টি দূরীভূত হয়[৪]। পরাবর আত্মার দর্শন মাত্রেই মোহ বীজের মুষ্টি, ও আপদ্ সমূহের বৃষ্টি স্বরূপ কুদৃষ্টি পরিক্ষীণ হইয়া থাকে[৫]। হে রাঘব! তুমি জনকের ন্যায় আপনাতে সর্ব্বদা জগদুৎপত্তির অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মাত্ম-ভাব স্থাপন করিয়া (ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন, এইরূপ অনুভব করিয়া) পরম পুরুষার্থরূপিণী লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হও[৬]। তুমি জনকের ন্যায় আত্মবিচারপরায়ণ ও জগচ্চাঞ্চল্যদর্শী হইলে অবশ্যই তোমার আত্মা প্রসন্ন হইবেন[৭]। দেখ, কি কর্ম্মকাণ্ড, কি ধন, কি বান্ধব, কেহই ভবভীত মানবের শরণ্য নহে। একমাত্র আত্মবিচাররূপ প্রযত্নই তাহা-দের শরণ্য অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা[৮]। হে তাত! যাহারা দৈবভক্ত, কৃত্যাদি ভক্ত, (কৃত্যাদি=ক্রিয়া প্রভৃতি) ও কুবিকল্প পরায়ণ, তাহাদের মতি ভাল নহে। সেজন্য তাহাদের মতির (বুদ্ধির) অনুগামী হওয়া উচিত নহে[৯]। যার পর নাই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশানুযায়ী বুদ্ধির দ্বারা আত্মাবলোকন করিতে পারিলেই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়[১০]। বৎস! আমি তোমার নিকট জ্ঞানপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপিণী সুখদায়িনী ও অজ্ঞানতরুনাশিনী জনকাখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তুমি সদ্বুদ্ধিশালী জনকের ন্যায় আত্মাকে অবলোকন করিতে পারিলে, আমি সফল মনোরথ হই। যাহারা স্বয়ং আত্মাবলোকনে সমর্থ, তাহাদেরই দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা প্রাতঃকালীন অম্বুজের ন্যায় বিকসিত হয়[১১।১২]।

হে রাঘব! যেমন সূর্য্যকিরণে হিমের দ্রবত্ব জন্মে তাহার ন্যায় বিচার দ্বারা সংসারকল্পনা বিলীন হইয়া যায়[১৩]। অহন্তাবরূপ নিশা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বগত-আত্ম-দর্শন-রূপ আলোক স্বয়ংই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে[১৪]। অহন্তাবই সর্ব্বব্যাপী আত্মার সঙ্কোচক, তাহার পরিক্ষয় হইলে কেননা তাঁহার অনন্তভুবনব্যাপিনী বিভূতি উপস্থিত হইবে? যেমন জনক কর্ত্তৃক অহঙ্কার বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, হে সদ্বুদ্ধে! তদ্রূপ, তুমিও বিচারদ্বারা উহা পরিত্যাগ কর। অহঙ্কাররূপ মেঘ ক্ষীণ ও চিৎস্বরূপ আকাশ নির্ম্মল হইলে পরমাত্মরূপ ভাস্কর নিশ্চই প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইবে[১৫।১৭]। অহন্তাবই ঘোর অন্ধকার। উহা শমতা প্রাপ্ত হইলে প্রকাশ অবশ্যই উপজাত বা উপচিত হইবে[১৮]। আমি নাই, অন্যেও নাই, এইরূপ ভাবনার দ্বারা মন উপশম প্রাপ্ত হইলে তখন আর কে বিষয়ে নিমজ্জিত হইবে[১৯]? অতএব হে রাঘব! হেয়োপাদেয় বুদ্ধিকেই তুমি বন্ধন বলিয়া জানিবে[২০]। সেই কারণে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি হেয়োপাদেয় দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বচ্ছ হও[২১]। যাহারা ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এ ব্যবস্থায় অবস্থান করে না, তাহারা কখনও কুত্রাপি কোন কিছু প্রার্থনা করে না এবং কোন কিছুর প্রতি বিদ্বিষ্টও হয় না[২২]। যাবৎ না চিত্ত হইতে হেয়োপাদেয়বুদ্ধিরূপ কলঙ্ক দূরীভূত হয় তাবৎ যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রিকার অপ্রকাশ, তাহার ন্যায়, হৃদয়ে পরব্রহ্মের নিরঙ্কুশ প্রতিভা অপ্রতিভাত থাকে[২৩]। এ সকল অবস্তু, এইরূপ ভাবনার দ্বারা যাঁহার মনশ্চাঞ্চল্য (ভোগবুদ্ধি) দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারই মন পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারে[২৪]। যে পুরুষে লাভালাভবিলাসিনী ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে তাহাতে বৈরাগ্যভাসিনী স্বচ্ছ সমতার সম্ভাবনা কি[২৫]? একই ব্রহ্মতত্ত্বে আবার নানাত্ব, অনানাত্ব, যুক্তত্ব, অযুক্তত্ব কি[২৬]? যে চিত্তরূপ পাদপে ইহা আমার প্রতিকূল ও ইহা আমার অপ্রতিকূল, এতদ্বিধ মনোবৃত্তিরূপিণী দুইটী মর্ক্কটী বাস করিতেছে সে চিত্তের আবার স্বচ্ছতা কোথায়[২৭]? অতএব, যদি হেয়োপাদেয় বুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সেই জ্ঞানিপুরুষে নিরাশতা, নির্ভয়তা, নিত্যতা, নিরীহতা, সমতা, সৌম্যতা, জ্ঞানিতা, নিষ্ক্রিয়তা, নির্ব্বিকল্পতা, ধৃতি, মৈত্রী, সুমতি, তুষ্টি, মৃদুত্ব ও মৃদুভাষিত্ব, এই সকল উত্তম গুণ বীজশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে থাকে[২৮।২৯]। কৃষক লোকেরা যেমন

নিম্নে ধাবমান সলিলরাশিকে সেতুর দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত করে তাহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষ নিম্নে অর্থাৎ বিষয়ে ধাবমান চিত্তকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত করিবেন[৩০]। এই মহোপকারী উপদেশের অনুগামী হইয়া তুমি শয়নে ভোজনে উপবেশনে গমনে, অধিক কি বলিব, সর্ব্বদাই এই সকল বাহ্য বস্তু পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বান্তর পরমাত্মার বিচার বা চিন্তা কর[৩১]। এই যে তৃষ্ণারূপ অমা নিশায়, মোহশৈবালে আবিল্ সংসাররূপ বারি রাশিতে চিন্তারূপ তন্তুর দ্বারা নির্ম্মিত বাসনালক্ষণ জাল বিস্তৃত রহিয়াছে এ জাল তুমি মদুপদিষ্ট জ্ঞানলক্ষণ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন কর[৩২।৩৩]। হে ভব্য! তুমি ধীরতা সহকারে এই সংসার বৃক্ষের মূল বাসনাযুক্ত অজ্ঞ-তাকে বিনাশ কর[৩৪]। বৃক্ষাবয়বসংযুক্ত (বৃক্ষাবয়ব=কাষ্ঠ। কুঠারের বাঁট।) কুঠার দ্বারা লোক যেমন বৃক্ষকে ছেদন করে তাহার ন্যায় তুমিও মনের দ্বারা মনকে ছেদন করতঃ সেই পরম পাবন পদ লাভ করিয়া সুস্থির হও[৩৫]। তুমি বাসনাবিনাশরূপ বিস্মরণ দ্বারা ভবিষ্যৎ মনোবৃত্তিকেও বিনষ্ট করিতে পার। তাই বলিতেছি, তুমি মনের দ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনোবৃত্তি বিনাশ করিয়া ছিন্নসংসার হও[৩৬]। যদি এক বারও সংসার বিস্মৃত হইতে পার তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোহ আর সংসারাঙ্কুর প্রসব করিবে না। অথবা চিত্ত বিচ্ছিন্ন হইলেও আর সংসারাঙ্কুর জন্মাইবে না। তুমি শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্ব্বদা "এ সকল অসৎ" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ এ সকলের আস্থা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিবে। হে রামচন্দ্র! তুমি সাম্য (সমব্রহ্ম) অব-লম্বন করতঃ প্রাপ্ত বস্তুর আহরণ ও অপ্রাপ্ত বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিহরণ কর[৩৭।৩৯]। দেখ, মহাদেব ক্ষিত্যাদি মূর্ত্তি ধারণ করেন, অথচ তাহা শুদ্ধ চৈতন্য দৃষ্টিতে নহে। * তোমারও যদি শুদ্ধ চৈতন্য দৃষ্টি হয়

* শিবের ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, চন্দ্র ও সূর্য্য, এই আট মূর্ত্তি। এতদনুসারে তাঁহার নাম—শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান। মহাপ্রলয়ে ঐ সকল মূর্ত্তি থাকে না অর্থাৎ শিব (ব্রহ্ম) ঐ সকল মূর্ত্তি ধারণ করেন না অর্থাৎ সংহার করেন। কারণ এই যে, তিনি তখন আপনার বিশুদ্ধ চিন্মাত্রতায় থাকেন। শিব ও ব্রহ্ম একই অর্থের শব্দ। অতএব, ব্রহ্মকে বা শিবকে মায়াবিশিষ্ট বলিয়া জানিলে তিনি তাদৃশ সাধকের নিকট সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ও মায়াতীত বলিয়া জানিলে সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিরহিত বলিয়া প্রকটিত হন।

তাহা হইলে দেখিবে ও বুঝিবে, তুমিই বেত্তা, তুমিই অজ, তুমিই আত্মা ও তুমিই মহেশ্বর। কেননা, তুমিই অপ্রচ্যুতস্বভাব হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছ[৪০।৪১]। পরমার্থ চিন্তার দ্বারা যাহার অন্য ভাবনা (ভেদ বুদ্ধি) পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ জনিত-দোষ আক্রমণ করিতে পারে না[৪২]। যিনি রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত, লোষ্ট্রে, প্রস্তরে ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানী, এবং যিনি সংসার বাসনা পরিত্যাগী, তিনিই মুক্ত[৪৩]। সেই মুক্তধী যোগী ভোজন, দান, হনন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন্ আর না করুন্ তাঁহার তাহাতে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান[৪৪]। যিনি ইষ্টানিষ্ট ভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাপ্ত কার্য্যে (উপস্থিত কার্য্যে) কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া প্রবর্ত্তিত হন, তিনি কদাচ তৎকার্য্যে অভিভূত হন না[৪৫]। হে মহামতে! মন ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করতঃ সমস্ত বস্তুতে চিৎসত্তা ব্যতীত অন্য সত্তা নাই, এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইলে সমতা প্রাপ্ত হয়। যেমন কোন মার্জ্জার স্বয়ং মাংস আহরণে অসমর্থ হইয়া আত্মভরণার্থ মাংসের নিমিত্ত মৃগপতির অনুগমন করে, তদ্রূপ, মনও স্বভাবতঃ অক্ষম হইয়া আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তত্ত্বের অনুধাবন করিয়া থাকে[৪৬।৪৭]। যেমন সিংহের বীর্য্যে মাংস লাভ করিবার জন্য শৃগালাদি ক্ষুদ্র পশুরা সিংহের অনুগামী হয়, তাহার ন্যায় মনও মৃতকল্প (নিষ্ক্রিয়) চিৎশক্তির প্রভাবে দৃশ্য লাভ করে বলিয়া তাহার অনুগামী হয়[৪৮]। মন অসৎ, পরন্তু চিতের প্রকাশে জীবিতপ্রায় অর্থাৎ সতের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। তাই সে এই নানাভাব ভাবনা করিতে সমর্থ হয়। সে জড় হইয়াও চিৎপ্রদীপের প্রভায় স্পন্দিত হইতে থাকে। চেতনাবল ব্যতীত শবতুল্য মনের স্পন্দতা কোথায়? তাই শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণ, চিত্তাবাপন্না স্পন্দশক্তিকে কলনা ও চিত্ত এই দুই নাম প্রদান করিয়াছেন[৪৯।৫১]। ফলতঃ চিৎফণীর ফুৎকাররূপ যে অসন্ময়ী স্পন্দশক্তি, তাহাই কলনা এবং এই কলনা "আমি চিৎ" এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা চিত্ত, এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়[৫২]। অতএব, যে চিৎ চেত্য-রহিত সেই চিৎ-ই সনাতন ব্রহ্ম কিন্তু যাহা চেত্যসম্পন্ন তাহা কলনা বা কল্পনা। কল্পনা সতের ন্যায় সমুপস্থিত হইলেও বাস্তব কল্পে অসৎ। সেই কলনানাম্নী সঙ্কল্পবিধায়িনী হেয়োপাদেয়ধর্ম্মিণী চিৎ স্বয়ং স্বশক্তি-প্রভাবে জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, এবং যাবৎ প্রবোধিতা না হয়, তাবৎ

স্বরূপ অববোধে (জ্ঞানে) সমর্থ হয় না[৫৩-৫৭]। সেইজন্য শাস্ত্রবিচার, বৈরাগ্যাভ্যাস ও ইন্দ্রিয় বিজয়াদির দ্বারা উক্ত কলনাকে প্রবোধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য[৫৮]। কলনা, বিজ্ঞান (প্রগাঢ় ধ্যান) ও শমদমাদি সাধন দ্বারা প্রবোধিতা হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্যথা জগদ্ভাবে ভ্রমণ করে[৫৯]। ব্যামোহ মদে মত্ত ও বিষয়গর্ত্তে লুণ্ঠিত ও আত্মজ্ঞানে প্রসুপ্ত অর্থাৎ হতচেতন কলনাকে অর্থাৎ চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবেক। না করিলে সে সততই এই দেহাভ্যন্তরে প্রতিভাত হইতে থাকিবে[৬০,৬১]। যেমন পুষ্পে গন্ধশক্তি বিরাজ করে তাহার ন্যায় কলনাও জীবের অন্তরে সর্ব্বদা অবস্থান করে। শরীর না থাকিলেও তাহার স্বভাব বা স্বধর্ম্ম এই যে, সে স্বকীয় চৈতন্যের সাহায্যে সঙ্কল্পের দ্বারা যাহা যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছ তাহাই বিজ্ঞাত হয়। হে রামচন্দ্র! যেমন পৃথিবী আতপ দ্বারা প্রফুল্লা হয় তাহার ন্যায় কলনাও পরব্রহ্মের সাহায্যে জ্ঞান-ধর্ম্মিণী হয়। যেরূপ শিলাময়ী কন্যা শতবার প্রবোধিতা হইলেও জীবনাভাবে নৃত্য করিতে সমর্থা হয় না, সেইরূপ, এই জড়রূপিণী কলনাও পরমালোক ব্যতিরেকে প্রবোধিতা হয় না[৬২,৬৫]। চিত্রলিখিত যুদ্ধ কি কখন ঘর্ঘর রব করে? মনঃকল্পিত চন্দ্রকিরণে কি কখন ওষধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে[৬৬]? রুধিরাক্ত মৃত দেহ কি কখন প্রধাবিত হয়? বনস্থ প্রস্তরখণ্ড কি কখন মধুর স্বরে গান করে[৬৭]? সঙ্কল্পসূর্য্য কি নিশান্ধকার ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হয়? ব্যোমকানন কি কখন ছায়া বিস্তার করে? মৃগতৃষ্ণা নদী কি কখন দূরে প্রবাহিতা হয়[৬৮,৬৯]? অতএব, মধ্যাহ্নমরীচিকাস্থ মৃগতৃষ্ণা নদী যদ্রূপ, উক্ত কলনাও তদ্রূপ[৭০]। এই যে, স্পন্দনাদি ক্রিয়া, যাহা মনের অনুভাব্য, তাহা শরীরমধ্যস্থ প্রাণাকারে অবস্থিত বায়ুভূতেরই প্রভাব[৭১]। যাহাদের সম্বিদ্ সঙ্কল্পদ্বারা আক্রান্তা না হয়, তাঁহাদের সম্বিদ্ই পারমার্থিকী প্রজ্ঞা[৭২]। "আমি" "তুমি" "ইহা" "তাহা" ইত্যাদি কলনার দ্বারা কলুষিত যে চিত্তত্ত্ব ও স্পন্দাত্মক প্রাণতত্ত্ব তদুভয়ের সংমেলনের নামই জীব[৭৩]। ধী, চিত্ত, জীব, এ সকল সঙ্কল্পেরই কল্পিত সংজ্ঞামাত্র। সুতরাং মন, মতি, বুদ্ধি, শরীর, এ সকলের পারমার্থিকী অস্তিতা নাই। যাহা আত্মা তাহাই সর্ব্বদা ও সর্ব্বাবস্থায় আছে, অন্য কিছু নাই[৭৪,৭৫]। অধিক কি বলিব, আত্মাই এই জগৎ এবং আত্মাই কাল ও তৎসমুদায়ের ক্রম। এই

আত্মা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম[৭৬]। আত্মা নিতান্ত স্বচ্ছ বলিয়া তদাধারে যে অসতের প্রতিভাস (বিভ্রম বা কল্পনার প্রতিফলন) হয় তাহাও সংবিদ্রূপী। এবং সম্বিৎরূপী অর্থাৎ চৈতন্যব্যাপ্ত বলিয়া সেই অসৎও সৎ বলিয়া গণ্য হয়। সেই সর্ব্বপদাতীত আত্মা স্বনিষ্ঠ চিৎশক্তির প্রভাবে আপনা আপনি প্রকটীকৃত হন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহার প্রাকট্য বা উপলব্ধি হয় না[৭৭]। আত্মা স্বকীয় অনুভূতি স্বভাবে পরিদৃষ্ট হন, মনের দ্বারা নহে। যেমন অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ, জড়স্বভাব মনের দ্বারা আত্মদর্শনের সম্ভাবনা নাই। অন্ধকার আলোকের নিকটস্থ হইতে না হইতেই সে নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানপ্রভব মনও আত্মদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। কাযেই বলিতে হয়, মন আত্মার দ্রষ্টা নহে[৭৮]। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, যখন বা যে অবস্থায় নিতান্ত স্বচ্ছ আত্মারূপ সংবিৎ বাহ্য বিষয়ের কল্পক (কল্পনার কারণ) হইয়া সে সকলের প্রকাশক রূপে আবির্ভূত হয় তখন বা সে অবস্থায় পারমার্থিক আত্মরূপের বিস্মরণ প্রযুক্ত চিত্তজন্যা বাহ্যবিষয় সকল মনের গোচর হইয়া থাকে[৭৯]। আরও বিশদ কথা এই যে, সঙ্কল্পের উদয় প্রযুক্ত সম্বিদ্ আত্মবিস্মৃত হওয়াতেই চিত্ত আবির্ভূত হইয়া স্বকল্পিত বিষয় সকল সন্দর্শন করিতে থাকে। অতএব, পুরুষের বা আত্মার সঙ্কল্পময়তাই চিত্ত ও বন্ধন এবং তাহার অসঙ্কল্প অবস্থাই অচিত্ত ও মোক্ষ[৮০]। সংসার উৎপত্তির প্রধান কারণ চিত্ত কথিত প্রকারে জন্ম গ্রহণ করে। যাহা বলা হইল সেই প্রণালীতেই চিত্তের ও চিতের জন্ম বা উৎপত্তি হয় বলা যায়। আরও বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, আত্মা যে সংকল্পোন্মুখ হইলে আপনার চিৎস্বভাবতার ব্যতিক্রমে পরিদৃষ্ট হন, তাহাই আমাদের মতে চিতের বা চিত্তের জন্ম। তিনি নিজ নির্ব্বিকল্পস্বভাব হইতে প্রচ্যুত, সুতরাং কলঙ্কী এবং সেই কারণেই তাঁহার কলনা অর্থাৎ কাল্পনিকী উৎপত্তি হয়[৮১।৮২]। * হে রাম! প্রাণশক্তি নিরুদ্ধ হইলে মন বিলীন হয়। কেন হয়? না মন ও প্রাণ মূলতঃ একই বস্তু[৮৩]। যেমন দ্রব্য

* কোন পুরুষ যদি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া জানে, তাহা হইলে সে কিছু কাল পরে আপনাতে স্ত্রীর কোন না কোন কিছু লক্ষণ দেখিতে পাইবে। এইরূপ নারীও

গেলে তাহার ছায়াও যায়, বিম্ব গেলে প্রতিবিম্বও যায়, সেইরূপ, প্রাণের নিরোধে মনেরও নিরোধ হইয়া থাকে। জীব সকল স্বীয় অন্তরস্থ প্রাণ স্পন্দন ও বেদন দ্বারা হৃদয় মধ্যেই দূরপ্রদেশ অনুভব করে[৮৪]। ইহারও দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দশক্তি ও অনুভবশক্তি এই দুএর সংযোগে মনের জন্ম বা আবির্ভাব। অতএব, প্রাণায়ামের অভ্যাস, ব্যসনের ক্ষয় অর্থাৎ বহুবিষয়িণী চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও পরমার্থের অবরোধ, এই সকলের দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে[৮৫]। বরং প্রস্তরে প্রজ্জ্বলনশক্তি থাকা সম্ভব ত মনের স্পন্দন ও অনুভবসামর্থ্য থাকা সম্ভব নহে[৮৬]। চঞ্চলস্বভাব মরুৎশক্তিরূপ প্রাণকে স্পন্দশক্তি বলা যায়, তাহাও জড়। আত্মার যে স্বচ্ছ চিৎশক্তি তাহা সর্ব্বগা ও সর্ব্বকাল-স্থায়িনী। ঈদৃশী চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি হইতে মন প্রকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং মন মিথ্যাসমুৎপন্ন ও মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ[৮৭।৮৮]। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ মনই অবিদ্যা ও মায়া নামে উদাহৃত হয়। এই মন পরম অজ্ঞানস্বরূপী ও সংসারবিষ উদ্গীরণকারী[৮৯]। যদি চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি একযোগ হইয়া সঙ্কল্প কল্পনা না করে, তাহা হইলে এই দৃশ্য সমূহের সমস্তই পরিক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং ভবভয়ও থাকে না[৯০]। প্রাণবায়ুর যে স্পন্দশক্তি, তাহা যখন চিৎ বা চেতনা কর্তৃক চেতিত (অর্থাৎ চেতনা-কার প্রাপ্ত) হয় তখন তাহা সঙ্কল্পময় ও চিত্ততাপ্রাপ্ত হয়। অতএব এক অখণ্ড চিৎই যখন চিত্ততার পরমার্থ মূল হইল, তখন এই চিত্ততা যে নিতান্ত অসৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি[৯১।৯২]? যাহার অস্তিত্ব, স্থিতিত্ব, বা উৎপত্তিত্ব চিৎশক্তির অধীন, তাহার বাধ বা খণ্ডন অন্য কোন কিছুর দ্বারা সম্ভবে না। কে অখণ্ড শক্তি ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে[৯৩]? এ স্থলে বলা বা উপদেশ এই যে, মন কোন পৃথক্ বা স্বতঃ সিদ্ধ পদার্থ নহে। তাহা চিৎও নহে, জড়ও নহে, তাহার সিদ্ধিও সত্যরূপা নহে। উহা যৎকিঞ্চিৎ তুচ্ছ অনির্ব্বাচ্য পদার্থ। অপর যুক্তি এই যে, সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধও থাকে না। অথচ বিনা সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধ হয় না। এই যুক্তি পথ অবলম্বন

পুরুষ ভাবে ভাবিত হইলে আপনাতে পুরুষের লক্ষণ (গোঁফ দাড়ি) দেখিতে পায়। পরন্তু তাহা দীর্ঘকাল পরে।

ক্রমতঃ ভাবিয়া দেখ, মন কি? এবং তাহার উৎপত্তিই বা কিংবিধ[৯৫]?
* চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি উভয়ের একতায় বা মেলনে মন, এ কথা যুক্তি সম্মত নহে। কেননা, একতা বা মেলন পক্ষ দুএর সাধ্য অর্থাৎ তাহাতে দুএর মধ্যে একের অপহার (বিলোপ বা লুকান) অঙ্গীকার করিতে হয়। যখন চিতের ও স্পন্দের দুএর কাহার অপলাপ (বিলোপ) সম্ভবে না, তখন অবশ্যই অভিহিত পক্ষ (চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি এক হইয়া যাওয়ায় মন, এই কথা) সঙ্গত নহে। হয় হস্তী প্রভৃতির অপহার হইলে কিম্বা রাজার সঙ্গ পরিত্যক্ত হইলে কি সেনাত্ব থাকে[৯৫]? অতএব, হে রামচন্দ্র! দুষ্টস্বভাব (দোষোৎপন্ন) চিত্ত তত্ত্বতঃ কোথাও বিদ্যমান নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তখনই উহার নাস্তিত্ব নিশ্চয় হয়, তৎপূর্ব্বে নহে[৯৬]। হে অনঘ! অনর্থের মূল ও মিথ্যা সমুদিত মন পরমার্থতঃ না থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে বিশেষ অনর্থপ্রদ[৯৭]।

হে মহামতে! হে অনঘ! যেহেতু মন সঙ্কল্পসমুৎপন্ন, সেই হেতু আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি অন্তরে কোন কিছুর সঙ্কল্প করিও না[৯৮]। হে মুনে! (মননশীল!) সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা তোমার হৃদয়মরুভূমিস্থ অজ্ঞানসম্ভূতা কল্পনারূপিণী মৃগতৃষ্ণিকা প্রশমিতা হউক[৯৯]। মন জড়ত্ব ও নিঃস্বরূপত্ব এই দুই কারণে সর্ব্বদাই মৃত। সে যে মৃত হইয়াও অন্যকে মারিতেছে ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে[১০০]! যাহার আকার নাই, আত্মা নাই, আধার নাই, দেহ নাই, তাহারই কর্তৃক সমুদয় ভক্ষিত হইতেছে, ইহাই বিচিত্রা মৌর্খ-বাগুরা[১০১]। নিরাকার অনাত্মা ও সর্ব্বসামগ্রবিহীন মন কর্তৃক যে ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, সে নীলোৎপল দলঘাতেও বিদলিত (ভগ্নমস্তক) মস্তক হইতে পারে[১০২]। যে ব্যক্তি জড় অন্ধ ও মূক মন কর্তৃক নিহত হয়, সেই মূঢ় শীতলতাপূর্ণ চন্দ্রকিরণেও দগ্ধ হয়[১০৩]। লোক সকল বিদ্যমান হইয়াও অবিদ্যমান মনের দ্বারা অভিভূত হইতেছে ইহা সামান্য মুগ্ধতার নিদর্শন নহে[১০৪]। যে মিথ্যা সঙ্কল্পজন্মা, এবং যাহার স্থিতিও মিথ্যা, অন্বেষণে যাহাকে পাওয়া যায় না, তাহার আবার শক্তি কি[১০৫]? অহো! জনগণ অতি

* ভাবার্থ এই যে, জড় স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহার সত্তাদি সমস্তই অন্যের অর্থাৎ চিতের বা চেতনার অধীন। কাযেই তাহাকে চেতনারই অন্তর্গত করিয়া বিদিত হইতে হয়।

লোপস্বভাব মিথ্যা চিত্তের দ্বারা অভিভূত হইতেছে। যে মূর্খ হয়, আপদ্ সকল তাহাকেই অন্বেষণ করিয়া লয়। তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তে কাহারও ব্যাঘাত দিবার শক্তি নাই। কারণ এই যে, মূর্খতা হইতেই অজ্ঞানের সাহায্যে এই কুদৃষ্টি সমুৎপন্না হইয়াছে[১০৬।১০৭]। হা ধিক্! আহা কষ্ট! এই সৃষ্টি মনোদেহাদি বুদ্ধির সাহায্যে মূর্খগণেরই বশীভূত রহিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ জীব সকল মূর্খতা কর্ত্তৃক নিরন্তর পীড্যমান হইতেছে অথচ অসৎ পথ ছাড়িতেছে না। অধিকন্তু দুঃখপ্রদ সৃষ্টিরই অনুবর্ত্তন করিতেছে[১০৮]। কিন্তু আমি দেখিতেছি, মনের এই মৌর্খময়ী সৃষ্টি অতি পেলবা (অবিচার মাত্র সিদ্ধা)। বারি যেমন স্বজনিত প্রবাহ তরঙ্গাদির দ্বারা পিষ্যমান হইয়া ক্রম ক্রমে কণায় কণায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বিশীর্ণ হয় তাহার ন্যায় জীবেরাও আপনার মূর্খতায় দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে[১০৯]। জলরাশি প্রবাহতরঙ্গাদির দ্বারা পেষিত হইয়া কণায় কণায় শীর্ণ হইতেছে। যে স্থানে আবর্ত্ত, সেই স্থানটাকে যেন কৃষ্ণবর্ণ পেষণ যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে দেখা যায়। যে স্থানে জলের কম্পন, সে স্থানটাকে যেন পূর্ণ-চন্দ্রমণ্ডল চ্যুত কিরণে মুগ্ধ হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইতে দেখা যায়। ইত্যাদি ভ্রান্তি যদ্রূপ, সৃষ্টিভ্রান্তিও তদ্রূপ[১১০]। শত্রুর কটাক্ষরূপ রজ্জুতে বদ্ধ হওয়া ও মনোরথ সৃষ্ট সেনার দ্বারা অভিভূত হওয়া যদ্রূপ, অসৎ মনঃকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া তদ্রূপ[১১১]। যে ব্যক্তি অবিদ্যমান বা অত্যন্ত অসৎ পেলব (বিচারমাত্রের বিনাশ্য) মনকে বিনষ্ট করিতে না পারে সে উপদেশের পাত্র নহে। যাহা কোথাও নাই, তেমন মন যাহাকে বিনষ্ট করে, সে কৃপণের ন্যায় কল্পিত ধান্যের কারণে বিনষ্ট হয়। অসৎকল্প মনকে ও মূর্খকল্পিত সৃষ্টিকে যে বশীভূত করিতে না পারে সে কিরূপে উপদেশের পাত্র হইবে[১১২।১১৩]? তাহার প্রজ্ঞা বিষয় সমূহে নিরূঢ়া হইয়া রহিয়াছে, সে জন্য সে মনোনিগ্রহাদি কষ্টজনক বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম সুতরাং উপদেশ বাক্যের সূক্ষ্মার্থ বিচারে অসমর্থ হেতু উপদেশের নিতান্ত অযোগ্য[১১৪]। উহারা বীণাযন্ত্রের মধুর ধ্বনি শ্রবণেও ভীত হয়। অধিক কি, সুষুপ্ত বন্ধুর বদনদ্যুতি সন্দর্শনেও ভীত হইয়া পলায়ন করে[১১৫]। মনোনিগ্রহ দূরে থাকুক, অধিকন্তু উহারা স্বীয় অসৎ মনঃকর্ত্তৃক বিবশীকৃত হয়[১১৬]। উহারা স্বীয়

হৃদয়গত চিত্ত কর্ত্তৃক ভোগবিষয়ে বিকর্ষীকৃত ও বিষম সন্তপ্ত হয় এবং বিবেক পরিশূন্য হইয়া সত্য বিস্মৃত হয়। ঈদৃশী ব্যক্তি বুদ্ধিবিপর্য্যয় কারণে ও মোহের প্রচ্ছাদনে সত্য বিস্মৃত হইয়া বৃথা অজ্ঞান গহ্বরে নিমগ্ন হইয়া থাকে[১১]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।
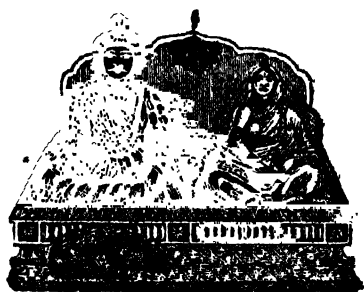
চতুর্দ্দশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মানদ! জনগণ সংসার সাগরের কল্লোলে নিরন্তর উহ্যমান হইতেছে অথচ পণ্ডিতগণের নিকট বৈরাগ্য প্রাপ্তির উপায় প্রশ্ন না করিয়া মূকের ন্যায় বৃথা অবস্থিতি করিতেছে। কেন? তাহা আমি এই শাস্ত্রে বর্ণন করিব। ইহাতে যে সকল বিচারোক্তি বিন্যস্ত আছে সে সমস্তই আত্মলাভের উত্তম উপায়[১।২]। যে ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ অথচ দুরদৃষ্ট বশতঃ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, কোন্ দুর্ম্মতি তাহাকে বিচিত্র মঞ্জরীপূর্ণ পুষ্পকানন প্রদর্শন করায়[৩]? কোন্ নির্ব্বুদ্ধি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ঘর্ঘরঘ্রাণ পুরুষকে আমোদ বিষয়ে নিয়োজিত করিতে উদ্যোগী হয়? কোন্ মন্দধী মদিরাঘূর্ণিতলোচন বিপর্য্যস্তেন্দ্রিয় উন্মত্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মসাক্ষিত্বে প্রমাণীকৃত করে[৪।৫]? কোন্ মূঢ়ধী শ্মশানস্থ মৃত দেহকে শত শত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে? তাহা করে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পণ্ডিতগণ মূর্খকে শাসন করেন না। আশারূপ বিলস্থ মনোরূপ সর্প মূক ও অন্ধ। যে লোক তাহাকে জয় করিতে অক্ষম, সে কিরূপে তত্ত্বোপদেশের পাত্র হইবে[৬।৭]? যে দুর্ব্বুদ্ধি স্বীয় মনোরূপ সর্পকে জয় করিতে না পারে, সে ভোগরূপ বিষগ্রস্ত হইয়া অচিরাৎ বিষমূর্চ্ছা প্রাপ্তে মৃত্যুগ্রস্ত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু রাম! তুমি ইহাও অবগত হইবে যে, মনোজয় বিবেকীর অশক্য নহে। যাহার বস্তুতা বা সত্তা কোনও কালেও নাই, তাহা ত চিরবিজিত? নিকটে থাকিলেও তাহা তাঁহাদের দূরে ও অপ্রাপ্ত[৮।৯]। যাঁহারা ঐ রহস্য জানেন তাঁহারা দেখেন—বা জানেন—মনের কোন কৃত্য নাই। (কায্ প্রয়োজন নাই)। প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও আত্মা, এই তিনের দ্বারাই অর্থজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। (প্রাণের প্রেরিত ইন্দ্রিয়গণ অর্থ গ্রহণ করে, সাক্ষী চৈতন্য সে সকলকে প্রকাশ করে।) যাঁহারা তদ্রূপ জ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট মন অতিতুচ্ছ[১০]। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, আত্মা, এই তিনের মিলিত শক্তিই সমস্ত ব্যবহারের নিষ্পাদক। তজ্জন্য মন আছে বলিবার ও ভাবিবার প্রয়োজন কি? যাহাই হউক,

সমস্তই সেই সর্ব্বশক্তি পরমাত্মার অংশ, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোন শক্তি নাই[১১।১২]। এমন ভাবিওনা যে মন না থাকে না থাকুক, জীব ও চিত্ত আছে। বিবেকীর দৃষ্টিতে তাহাও নাই। জগৎ যে জীব জীব করিয়া অন্ধ, তাহা কি? তাহাও আত্মাতিরিক্ত নহে, ইহা জানিবে[১৩]। হে রামচন্দ্র! নিজ কল্পিত মনের দ্বারা দগ্ধদৃষ্টি জনগণের দুঃখপরম্পরা দেখিয়া আমার মতি নিতান্ত করুণাক্রান্ত ও মূঢ়ের ন্যায় পরিতপ্ত হইতেছে[১৪]। মূর্খেরা যে কিসের জন্য খেদ প্রাপ্ত হয় বলিতে পারি না। গর্দ্দভেরা যেমন দুঃখ ভোগ করিতেই জন্মে তাহার ন্যায় মূর্খেরাও বৃথা দুঃখ ভোগ করিতে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করে[১৫]। নির্ব্বুদ্ধি মূঢ়গণ সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় নিরন্তর কেবল বিনাশের নিমিত্তই জড়দেহে আবির্ভূত হইতেছে। দেখ পশুহিংসকগণ প্রত্যহ প্রতিদেশে কত শত জীব সংহার করিতেছে কে তাহার জন্য খেদ করে[১৬,১৭]? অনিল অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ দংশ মশক বিনাশ করিতেছে, পুলিন্দাদি জনগণ লক্ষ লক্ষ মৃগ বিনাশ করিতেছে, মৎস্যদেশবাসীরা ভক্ষণার্থ অসংখ্য জলচর ধ্বংস করিতেছে, অতএব বিনাশে পরিবেদনা কি[১৮।২০]? আরও দেখ, মক্ষিকাগণ ক্ষুধিত হইয়া অণুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূকডিম্ব ভক্ষণ করিতেছে, কোষকার কীট আবার ক্ষুধিত হইয়া সেই সমুদয় মক্ষিকাদি ভোজন করিতেছে, দংশগণ আবার সেই মক্ষিকাকে, দর্দ্দুরগণ সেই দংশগণকে, সর্প দর্দ্দুরগণকে, পক্ষিগণ সেই সর্পগণকে, বভ্রুগণ সেই পক্ষিগণকে, মার্জ্জারগণ সেই বভ্রুগণকে, কুক্কুরগণ মার্জ্জারগণকে, ঋক্ষগণ কুক্কুরগণকে, ব্যাঘ্র ঋক্ষগণকে, সিংহ ব্যাঘ্রগণকে ও শরভ * আবার সেই সিংহগণকে ভক্ষণ করিতেছে। শরভগণ গর্জ্জনশীল মেঘগণকে পরাভব করিবার নিমিত্ত আকাশে উৎপতিত হইয়া শিলাতলে নিপতিত ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়। সেই মেঘ বায়ুকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত, সেই বায়ু গিরিকুল কর্ত্তৃক রুদ্ধ, সেই গিরিসমূহ বজ্রদ্বারা নিষ্পেষিত, সেই বজ্র ইন্দ্র কর্ত্তৃক বশীকৃত, ইন্দ্রও বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিবশীকৃত হয়। সেই বিষ্ণু আবার প্রয়ো-

* শরভ—এক প্রকার অষ্টপদযুক্ত জন্তু। এ জন্তু এখন নাই। ইহাদের বংশ এখন লোপ প্রাপ্ত। আধুনিক জুয়ালজিষ্টগণ বলেন, ভূগর্ভে এক প্রকার অষ্টপদ পশুর বা জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে সে কঙ্কাল দৃষ্টে তাঁহারা অনুমান করেন, পুরাতন যুগে ঐ জন্তুর অত্যন্ত প্রচার ছিল।

জন বশতঃ এই সমুদয় সুখ দুঃখ দশাগ্রস্ত জরামরণ পালিত জন্তুভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতির আকারে অবতীর্ণ হন[২১।২৬]। সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, বৃহৎকায় জন্তুসকল গাত্রলগ্ন ক্ষুদ্র কীটের উপ-জীব্য হইতেছে।

জীবরূপ বন এইরূপে অনারত বিশীর্ণ হইতেছে এবং মোহ বশতঃ ভক্ষিত ও রক্ষিত হইতেছে। অজস্র জাত ও বিনষ্ট হইতেছে। জল-কোষে মৎস্য, জলহস্তী ও মকর প্রভৃতি, ভূমিগর্ভে বৃশ্চিকাদি কীটগণ, এবং অন্তরীক্ষেও এক প্রকার পক্ষী ও বনোদ্দেশে ব্যাঘ্রমৃগাদি পশুগণ জন্মিতেছে ও মরিতেছে[২৭।৩১]। * প্রাণিগণের অঙ্গে কৃমি ও যুক প্রভৃতি জন্মে। কাষ্ঠে ঘুণ এবং প্রস্তরেও জঘনাদি নামক কীট, ভেক ও ঘুণ জন্মে। বিষ্ঠাতেও নানা কীট জন্মগ্রহণ করে[৩২।৩৩]। অধিক কি বলিব, পত্র ফল পুষ্প প্রভৃতিতেও নানা জীব জন্ম মরণ অনুভব করিতেছে। সুতরাং জীবের জন্ম মরণ অসঙ্খ্যেয়। ঐরূপ জন্ম মরণ অজস্র প্রবাহে চলিতেছে, তন্মধ্যগতদিগের তাদৃশ সুখ অথবা তাদৃশ দুঃখ দেখিয়া সুখী অথবা দুঃখী হওয়া অনুচিত, উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য অবলম্বন করাই উচিত[৩৪।৩৫]। যদ্রূপ বৃক্ষের পত্র উৎপন্ন ও বিশীর্ণ হয় তদ্রূপ ভূত-সত্বও সর্ব্বদা উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়[৩৬]। এমন অনেক লোক আছে যাহারা দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া দুর্ম্মতিদিগকে উপদেশ দান দিতে অপরাঙ্মুখ। পরন্তু তাঁহাদের সেরূপ দয়ার্দ্রতা ব্যর্থ। দয়াবান্ হইয়া কুবুদ্ধিদিগের দুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত হওয়া আর স্ব মস্তকোপরি ধার্য্যমান ছত্রের দ্বারা নিখিল আকাশ ছায়াযুক্ত করিতে যাওয়া সমান[৩৭]। পাশবধর্ম্মী পামর মনুষ্য উপদেশ্য নহে। তাহাদিগকে উপদেশ কথা বলা আর বনস্থ স্থাণুদিগকে উপদেশ কথা বলা সমান[৩৮]। পশুদিগের সহিত তাহাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। পশুগণ রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট হয়, কুবুদ্ধিরাও বিষয়-লম্পট মনঃ কর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট হয়[৩৯]। স্ববিক্ষেপ পঙ্কে মগ্ন ও স্ববিনাশে প্রবৃত্ত মূর্খদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া পাষাণখণ্ডও রোদন

---

* অন্তরীক্ষ—আকাশ। এক শ্রেণীর পক্ষী আছে তাহারা নিরন্তর আকাশে পরিভ্রমণ করে ও আকাশেই প্রসব করে। প্রসূত অণ্ড ভূপতিত না হইতে তন্মধ্য হইতে শাবক নির্গত ও তাহাদের তৎক্ষণাৎ পক্ষোদ্ভব হয়।

করে৩০। যাহারা আপনার চিত্ত জয় করে নাই বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদিগের সেই সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে ও সার্ব্বকালিক দুর্দ্দশাকে সমস্ত পৃথিবীর ধূলি প্রমার্জ্জন যদ্রূপ অশক্য তদ্রূপ অশক্য মনে করেন৩১।

হে রঘুনন্দন! যাহারা স্বচিত্ত জয় করিয়াছে, বশীভূত করিয়াছে, তাহাদিগেরই দুঃখ সুবিচার্য্য অর্থাৎ উপদেশাদির দ্বারা অনায়াস নাশ্য। অতএব, হে সাধো! যাঁহারা জ্ঞেয় তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা তাঁহাদিগেরই দুঃখ প্রমার্জ্জনার্থ প্রবৃত্তিমান্ হইয়া থাকেন৩২। হে মহাবাহু রামচন্দ্র! প্রসঙ্গাগত কথা ত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত পূর্ব্বকথা পুনঃ বলিতেছি, প্রণিহিত হও।

মন নাই, ইহা স্থির করিয়া কল্পনা পরিত্যাগ কর। না করিলে উহা তোমাকে বেতালের ন্যায় অভিভূত করিবে৩৩। যাবৎ তুমি আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া মূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিবে তাবৎ মনোরূপ সর্প তোমার অন্তরে অসত্য হইলেও সত্যবৎ বিরাজমান থাকিবে৩৪। হে অরবিন্দম্! সঙ্কল্প দ্বারাই চিত্ত পরিবর্দ্ধিত হয়, এ রহস্য তুমি জ্ঞাত হইয়াছ। সুতরাং এখন তুমি শীঘ্র সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারক৩৫। যদি তুমি দৃশ্য আশ্রয় কর, তাহা হইলে সচিত্ত হইয়া চিত্ত কর্তৃক বদ্ধ হইবে এবং পরিত্যাগ করিতে পারিলে অচিত্ত হইয়া অচিরাৎ মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে৩৬। চিত্তের আশ্রয় গ্রহণই বন্ধন ও তাহার পরিত্যাগই মোক্ষ৩৭। তুমি "আমি কিছু নহি, এ সকল কিছু নহে, সমস্তই মায়িক," এইরূপ ধ্যান করতঃ অনন্ত হৃদয়াকাশসকাশ হৃদয়েশ্বর আত্মায় অচলের ন্যায় অবস্থান কর৩৮। হে রামচন্দ্র! তুমি দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দ্রষ্টৃ, দৃশ্য ও দর্শন এ সকলের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় আত্মাকে ভাবনা করতঃ সুস্থির হও৩৯। স্বাদ্যও নাই, স্বাদকও নাই, অনুভবের অতীত যে স্বাদ, তাহারই ধ্যান করতঃ আত্মময় হও৪০।৪১। হে রাঘব! যাহা অনুভবেরও অনুভবিতা (জ্ঞানের দ্রষ্টা বা সাক্ষী। যাহার দ্বারা "আমি জানিয়াছি" এইরূপ বোধ সমাপ্তি, শেষ সীমা, পূর্ণতা, বা তৃপ্তি প্রকাশপ্রাপ্ত হয় তাহা) অবলম্বন করিয়া তুমি নিরাবলম্ব হও। ভাবনা বিহীন হও, ভাবাভাব দশা সমুত্তীর্ণ হও, আত্মভাবনাপর ও আত্মস্থ হও৪২,৪৩। তুমি যদি মদুপদিষ্ট 'আত্মস্থিতি পরিত্যাগ করিয়া চেত্য ভাবনায় অবস্থান কর তাহা হইলে নিশ্চিত

তুমি অতিদুঃখদায়িনী চিত্ততা দশা প্রাপ্ত হইবে[৫৪]। হৃদয় গর্ত্তে আত্মারূপ সিংহ চিত্তরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, তুমি শীঘ্র সেই সিংহকে ঈদৃশী জ্ঞান যোগ দ্বারা চিত্তরূপ শৃঙ্খল ভগ্ন করতঃ মুক্ত কর[৫৫]। তুমি যখন যখনই পরমাত্মদশা ত্যাগ করিয়া চেত্যের অনুসরণ করিবে তখন তখনই তুমি সঙ্কল্পের প্রভাবে চেত্য দর্শনই করিবে। হে অনঘ! চিত্ত যখন পূর্ব্ব সঙ্কল্পের বলে দৃশ্য দর্শনে উন্মুখ হয় চিৎ তখন যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও স্থূল হয়। পরন্তু যদি তৎসঙ্গে তাহার আত্মব্যতিরিক্ততা বোধ উদিত না থাকে, তাহা হইলে আর মনন জন্মে না। মননবিশিষ্টতাই মনের জন্ম এবং তাহাই দুঃখের কারণ। কিন্তু যদি আত্মাতিরিক্ত সত্তার বোধ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে ক্রম ক্রমে মনন পরিত্যাগ হওয়ায় মনের ক্ষয় হইয়া যায়[৫৬।৫৭]। "এ সমস্তই আত্মা" এইরূপ সম্বিদ্ সমুদিত হইলে তখন চিত্তই বা কি, চেত্যই বা কি, আর চেতনাই বা কি[৫৮]? আমি জীব, যাবৎ এই ভাবের উদয় তাবৎ চিত্তের অবস্থিতি। যাবৎ চিত্তের অবস্থিতি তাবৎ দুঃখের বিস্তার[৫৯]। আমি ব্রহ্মই, জীব আমা অতিরিক্ত নহে, এই ভাবের উদয় পরিষ্কাররূপে স্থায়ী হইলে চিত্তের উপশম বা বিনাশ হয়। চিত্তের উপশমই পরম সুখ[৬০]। হে রাঘব! আত্মাই এই সমুদায় জগৎ, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বোধ জন্মিলে চিত্তের অস্তিতা বিলুপ্ত হয়[৬১]। যেমন সূর্য্যের প্রকাশে অন্ধকারের বিলোপ, তাহার ন্যায় "আত্মাই এই সমস্ত" এই সত্য জ্ঞানের উদয়ে মনের বিলোপ[৬২]। যত দিন শরীরে মনোরূপ সর্প, তত দিনই ভয়। যোগবলে তাহাকে উৎসারিত করিলে ভয়ের অবসর কোথায়[৬৩]? চিত্তবেতালকে তুমি মিথ্যাজ্ঞান সমুত্থিত জানিয়া সম্যক্‌জ্ঞানরূপ মহামন্ত্রদ্বারা শীঘ্র বিনষ্ট কর[৬৪]। চিত্তযক্ষ যদি দেহ গৃহ হইতে পলায়ন করে তাহা হইলে নিরুদ্বেগ থাকিবে। তুমি "আমি নীরাগ, বাহ্যসুখসাধনোপার্জ্জনশূন্য, নিরাধি, নিরুপদ্রব হইয়াছি" এইরূপ বিবেচনা করতঃ অনুদ্বেগ হইয়া আত্মাতে অবস্থান কর। তাহা হইলে তোমার চিত্তসত্তা বিগলিত হইবে। তখন তুমি পরম পদেচ্ছু হইয়া পরম পদেই অবস্থান করিতে পারিবে। তখন তোমার কোনও ভয় থাকিবে না[৬৫।৬৬]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

—:():—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বর্ণিত প্রকার চিত্তসত্তাই সংসারের বীজ, জীববন্ধনের বাগুরা ও অতি অপাবনী। আত্মা তাহারই অনুসারী হওয়ায় স্বীয় ব্রহ্মত্ব বিলুপ্ত করিয়া অতি মলিন জ্ঞানের অধীন হইয়াছেন এবং চিত্তেরই পরিকল্পিত দেহাদিতে অহম্ভাব স্থাপন করতঃ চিত্তগত রাগদ্বেষাদি মলে মলিন হইয়াছেন[১।২]। তাহাতেই মহামোহপ্রদায়িনী ভয়ঙ্করী তৃষ্ণারূপা বিষ-লতা পরিবর্দ্ধিতা হইয়া মূর্চ্ছা প্রদান করিতেছে[৩]। বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনী যেমন নির্ব্বিকার আকাশে অসংখ্য বিকার প্রদর্শন করায় তাহার ন্যায় তৃষ্ণাও নির্ব্বিকার আত্মায় অসংখ্য ভাবের আবির্ভাব করায়[৪]। কল্পাগ্নিশিখার অত্যুগ্র দাহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি আছে (হরিহরাদি) কিন্তু তৃষ্ণাগ্নিদাহের যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি কৈ? অর্থাৎ নাই[৫]। তৃষ্ণারূপ অসি অতিতীক্ষ্ণ, অতিদীর্ঘ ও অতিভয়ানক। এ অসি নিজ আশ্রয়কেই ছেদন করে এবং পরিণামে অতিশয়িত ক্লেশপ্রদ হয়[৬]। রাম! যে কিছু দুরন্ত দুঃখ সমস্তই তৃষ্ণা বল্লীর ফল[৭]। এই তৃষ্ণা বনকুক্কুরী। এ মনুষ্যের মনোরূপ গর্ত্তে বসতি করতঃ অদৃশ্য ভাবে তাহাদের অস্থি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করে[৮।৯]। তৃষ্ণা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় কখন উল্লাসযুক্তা কখন বা স্তব্ধপ্রায়া থাকে এবং কখন মলিনা, কখন শীতলা ও কখন বা প্রস্তর ও কাষ্ঠাদি বহন করে। (স্পৃহা চরিতার্থ হইলে তাহা শীতলা বলা যায়। স্পৃহাই মানুষকে কার্য্যে পরিচালিত করে, সেইজন্য বলা যায়— স্পৃহা কাষ্ঠাদি বহন করে।) তৃষ্ণায় অভিভূত হইলে দীন হয়, হীন হয়, হতজ্ঞান ও হততেজ হয়, মুগ্ধ হয়, রোদন করে, পতিত হয়। যিনি এই তৃষ্ণারূপিণী কৃষ্ণসর্পীর গর্ত্তে প্রবেশ না করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়রন্ধ্রগত প্রাণবায়ু স্বস্থ। যে স্থানে এই তৃষ্ণারূপা কৃষ্ণা নিশা অস্তগত হইয়াছে, সেই স্থানেই পুণ্যরূপ চন্দ্র দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে[১০।১১]। যে পুরুষরূপ বৃক্ষে তৃষ্ণারূপ ঘুণ লাগে নাই, সেই পুরুষবৃক্ষই পুণ্যপুষ্পে

সুশোভিত হয়[১৩]। যাহাদের বিবেক দৃষ্টি নাই তাহাদের নিকট তৃষ্ণা নদীর ন্যায় প্রবাহিতা হইতে থাকে[১৪]। এই সমস্ত লোক তৃষ্ণার দ্বারাই সূত্রবদ্ধ পতত্রির ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রান্ত, বিশীর্ণ ও সংহার দশা প্রাপ্ত হইতেছে[১৫]। তৃষ্ণা কুঠারের ন্যায় ধর্ম্মতরুর ও জ্ঞানবৃক্ষের মূল ছেদন করে। তৃষ্ণার অনুগামী হইয়া লোক হরিণ শাবকের ন্যায় গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে[১৬।১৭]। লোক ভূতাবেশে তত শীর্ণ হয় না, তৃষ্ণায় যত জীর্ণ হয়[১৮]। অমঙ্গলভূতা তৃষ্ণার দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুও বামনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৯]। দেবভোগ্য সুখকণা বিষয়ক তৃষ্ণায় রজ্জু বদ্ধের ন্যায় থাকিয়া সূর্য্যদেবও প্রতিদিন নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, শৈল অচল ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ও ধরিত্রী ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে। যেমন সর্পকে দূরে পরিহার করে তাহার ন্যায় তৃষ্ণাকে পরিহার করিবেক[২০।২২]। যে ব্যক্তি তৃষ্ণারজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হয়, সে কদাচ মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। বরং রজ্জুবন্ধন মুক্তি করা যায় ত তৃষ্ণাবন্ধন মোচন করা যায় না। অতএব, হে রাঘব! তুমি সঙ্কল্প বর্জ্জন পূর্ব্বক সত্বর তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ কর। সঙ্কল্পরহিত মনের অবিদ্যমানতা যুক্তির দ্বারাও নির্ণীত হইয়াছে। অতএব সঙ্কল্প দ্বারা মন বিনষ্ট হইলে তৃষ্ণা কিরূপে ও কোথায় বিদ্যমান থাকিবে? হে রামচন্দ্র! তুমি যখন এই দুঃখপ্রসবিনী অনাত্মভাবনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তত্ত্বজ্ঞ মধ্যে গণনীয় হইবে। হে ভব্য! তুমি অনিহম্ভাবরূপ শলাকার দ্বারা অপুণ্য (অমঙ্গলদায়ক) অহম্ভাবকে বিদ্ধ ও বিশীর্ণ করতঃ ব্রহ্মে অবস্থান কর[২৩।২৭]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

—()○()—

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য স্বভাবগম্ভীর অর্থাৎ নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। কারণ এই যে, আমাকে আপনি অহঙ্কারতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু হে প্রভো! অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হইলে আমার এই দেহ নামক সন্নিবেশকেও (সাজান আকৃতিকেও) ত্যাগ করিতে হইবে১।২। কেননা, অহঙ্কারই এই দেহকে শিফার (বৃক্ষের শিকড়ের) বৃক্ষ ধারণের ন্যায় ধারণ করিতেছে। সুতরাং অহঙ্কার ক্ষয় হইলেই ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় এই দেহ অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে৩।৪। অতএব আমি ভবদ্বচনে এইরূপ সন্দিহান হইতেছি যে, ঐ আদেশ কিরূপে সমঞ্জস হইতে পারে। হে মুনে! হে বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ! অহঙ্কার ত্যাগ ও জীবিত থাকা এই উভয় যে প্রকারে সাধ্য হইতে পারে; তাহা আমাকে উপদেশ করুন৫।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! রাজীবলোচন! অহঙ্কার ত্যাগ দ্বিবিধ। এক ধ্যেয় নামক, অপর জ্ঞেয় নামক৬। আমি দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টি, এই সমষ্টি বা এই সংঘাত আমার, ইহা পান ভোজনাদির দ্বারা নিষ্পন্ন, এবং এই সকল পদার্থ আমার জীবন অর্থাৎ স্বরূপ নিষ্পত্তির কারণ, সেই জন্য আমি এ সকল ব্যতীত কোনও কিছু করিতে পারি না, এবং এ সকলও আমা ব্যতিরেকে অবস্থিত থাকিতে পারে না৭, অন্তঃস্থ এইরূপ নিশ্চয়ের (বুদ্ধির) সত্যাসত্য বিচারান্তে যে সংঘাত ভাবের অসত্যতা ও চিদ্রূপের সত্যতা প্রতীত হয়, এবং তদনুসারে যে আমি এ সকল নহি, এবং এ সকলও আমার নহে, ইত্যাকার অবধারণ জন্মে, এবং তাহার দৃঢ়তায় যে দেহাদিবিষয়ক অহং পরিত্যক্ত হয়, আমি তোমাকে সেই ভাবনাপরিপাকজাত অহং পরিত্যাগের কথা বলিয়াছি৮। পণ্ডিতগণ তাদৃশ অহঙ্কার পরিত্যাগকে ধ্যেয়অহংত্যাগ সংজ্ঞা দিয়াছেন। (ধ্যানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ধ্যেয়)৯। জ্ঞেয় নামক অহং ত্যাগের কথাও বলি, শ্রবণ কর। সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বুদ্ধি জন্মিবার পর যে অহং মমতার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই অহংপরিত্যাগ দেহত্যাগান্তে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক

জ্ঞেয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। (ইহা জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া জ্ঞেয়)[১০]। * যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারময়ী বাসনা পরিহার পূর্ব্বক মাত্র লোক যাত্রা নির্ব্বাহার্থ দেহধারণাদি ব্যবহারে অবস্থিতি করেন, সেই ব্যক্তিকে আমরা ধ্যেয়বাসনাত্যাগী ও জীবন্মুক্ত বলি[১১]। যিনি মূল অজ্ঞান সহ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে আমরা জ্ঞেয়বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলি। ঐরূপ মুক্ততা জ্ঞেয়ত্যাগময় অর্থাৎ চিন্মাত্রপ্রধান। মহাত্মা জনকাদি ধ্যেয়বাসনাত্যাগী ও জীবন্মুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বাসনা জ্ঞানবাধিত হইয়াছিল[১২।১৩]। যাঁহারা জ্ঞেয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই সকল বিদেহমুক্ত পুরুষ পরাবর ব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছেন[১৪]। হে রাঘব! উক্ত উভয় প্রকার ত্যাগই সমান ও মুক্তিপদে অবস্থিত এবং উক্ত উভয়বিধ অহংত্যাগীরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত ও গতজ্বর[১৫]। যে অনবরত সুখ দুঃখে নিপতিত হইয়াও হৃষ্ট বা ম্লান হয় না, তিনি মুক্ত[১৬।১৮]। যিনি ইচ্ছা দ্বেষ বিহীন হইয়া সুষুপ্তের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনিও মুক্ত বলিয়া কথিত[১৯]। এই দেহের প্রতি যাহার অহংমম বুদ্ধি নাই, ইহা হেয় ও ইহা উপাদেয়, এ বুদ্ধিও যাহার তিরোহিত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত[২০]। যাহার অন্তঃকরণ হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কার্পণ্য প্রভৃতিতে আক্রান্ত না হয়, সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত[২১]। যে পুরুষ সুষুপ্তের ন্যায় প্রশমিতভাববৃত্তি হইয়া (প্রশমিতভাববৃত্তি=আত্মাতিরিক্ত পদার্থের প্রতি তুচ্ছতা বোধ) অবস্থিতি করেন এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকেন, তিনি জীবন্মুক্ত[২২]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কথা কহিলে দিবাবসান হইল। তখন সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে যথাযথ অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিলেন এবং সায়ংকালকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্য সাধনার্থ যথাগত স্থানে গমন করিলেন। পরে নিশা অবসান হইলে রবিকিরণের সহিত পুনর্ব্বার আপন আপন স্থানে আগমন করিলেন[২৩]।

একাদশ দিবস।

* তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম অবস্থার অহংত্যাগ ও দ্বিতীয় অবস্থার অহংত্যাগ, উভয় অহং পরিত্যাগই অহংএর অভাব নহে। অর্থাৎ ঐ কথায় জড় পদার্থের ন্যায় হইবার উপদেশ করা হয় নাই; পরন্তু অহং বৃত্তিকে অজ্ঞানের অবস্থা বিশেষ এবং তাঁহার অবলম্বনকে ব্রহ্মের অনতিরিক্ত মাত্র বলা হইয়াছে।

সপ্তদশ সর্গ

—০*০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাঁহারা বিদেহমুক্ত তাঁহারা বাক্যাতীত। (অর্থাৎ তাঁহারা একরূপ একরস নিরতিশয় ও স্বপ্রকাশভূমানন্দ মাত্রে অবশেষিত হন, সুতরাং তাঁহারা গুণগুণিভাব না থাকায় তাহাদের সে অবস্থা গুণাতীত। বর্ণনার অতীত। আরও বিশদ কথা—তাঁহাদের সে অবস্থা বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দ বা কথা নাই)। অতএব, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদেরই কথা বলি, শ্রবণ কর[১]। যিনি বিষয়াস্বাদ গ্রহণে অনুৎসাহিত অর্থাৎ বাঞ্ছা বিরহিত হইয়া প্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত[২]। জীবগণ যে সংসারসত্যতা বোধে বহিঃ পদার্থে (রূপরসাদি বিষয়ে) বদ্ধমনোরথ হইয়া অবস্থান করে, আচার্য্যগণ বলেন, তাহাই তাহাদের বন্ধন ও সুদৃঢ় সংসার শৃঙ্খল[৩]। ভোগ্যবর্গ মিথ্যা ও অনর্থমূল, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যাহারা অন্তর হইতে ভোগসঙ্কল্প দূরীভূত করিয়াছে, অথচ লোকদৃষ্টিতে ব্যবহার পরায়ণ, তাহাদের সেই শরীরমাত্রাশ্রিত বাসনা বা ভাব তাহাদের জীবন্মুক্ততার সাক্ষী বা লক্ষণ[৪]। হে রাঘব! বিষয়-ব্যসন-যুক্ত তৃষ্ণাই বন্ধন এবং সর্ব্ববিষয়ব্যসননির্ম্মুক্ত তৃষ্ণাই মুক্তি[৫]। বিষয় প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা বিষয়ভোগ সময়ে অথবা বিষয়—বিনাশের পরে অনুরাগের বা দুঃখের উদয় হয় না, ইহা পণ্ডিতগণের মতে জীবন্মুক্ততার লক্ষণ[৬]। আমার ইহা হউক, তাহা হউক, ইহা আমার, তাহা আমার, অন্তরে যে ঐরূপ ঐরূপ ভাবনা, তাহাই তৃষ্ণা-নামের নামী অর্থাৎ তৃষ্ণা শব্দের অর্থ। হে মহামতে! সেই তৃষ্ণাকেই তুমি সংসার বন্ধনের শৃঙ্খল বলিয়া জানিবে[৭]। যিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পরমোদার, মহামনা ও পরম পদ প্রাপ্ত। অতএব, হে রঘুনাথ! তুমি বন্ধ, মোক্ষ, আশা, নিরাশা, সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত থাক[৮।৯]। তুমি আত্মাকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া জরামরণ শঙ্কায় কলুষিত ও কাতর হইও না[১০]। এই সকল দুঃখের কিছুই তোমার নহে। এমন কি

তুমিও তোমার নহ। সেই পরমার্থ সত্য ব্যতীত যে কিছু, সমস্তই তুচ্ছ ও মিথ্যা। তুমিই এ সকলের অতীত ও পরমার্থ সত্য[১১]। অসৎ স্বরূপে সমুদিত এই বিশ্ব থাকুক আর না থাকুক, তাহাতে তোমার কি? তুমি সে সকলের অতীত সুতরাং তোমার আবার তৃষ্ণা কি[১২]? হে রামচন্দ্র! বিচারশীল পুরুষের মনে চারি প্রকার নিশ্চয় সমুদিত হইয়া থাকে[১৩]। তন্মধ্যে, আপাদমস্তক আমি পিতৃমাতৃ বিনির্ম্মিত, এই এক নিশ্চয়। মিথ্যাজ্ঞানবিধায় এ নিশ্চয় বন্ধনের কারণ[১৪]। আমি দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদায় পদার্থেরই অতীত, কেশাগ্র অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, এই এক নিশ্চয়। এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সাধুগণের হৃদয়ে মোক্ষের নিমিত্তই উদিত হয়[১৫]। হে রঘুপতে! আমিই এই জগজ্জালস্থ পদার্থ সমূহের অক্ষয় আত্মা; সুতরাং আমিই সমস্ত এবং আমিই একমাত্র অক্ষয় অব্যয়। এই এক নিশ্চয়। এই তৃতীয় নিশ্চয় মোক্ষের পরম কারণ[১৬]। আমি অথবা জগৎ সমস্তই সদা ব্যোমসদৃশ নিরাকার। এই এক নিশ্চয়। এই চতুর্থ নিশ্চয় মোক্ষ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ[১৭]। * এই চারি প্রকার নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথম প্রকার বন্ধের কারণ এবং বিশুদ্ধ ভাবনাসম্ভূত অবশিষ্ট তিন প্রকার মোক্ষের উপযোগী[১৮।১৯]। হে বুদ্ধিমন্! যদি তোমার "আমিই সর্ব্বাত্মা" ইত্যাকার নিশ্চয় সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি আর কখন জন্মমরণাদি বিষাদে অভিভূত হইবে না[২০]। আত্মার মহিমা তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; এইরূপ নিশ্চয়বান্ ব্যক্তি বদ্ধ থাকে না[২১]। শূন্যবাদীরা যাহাকে শূন্য বলে, অন্যে তাহাকেই প্রকৃতি, মায়া, বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম বলেন এবং তিনিই শিব, পুরুষ ও আত্মা, এ কথাও বলেন[২২]। এ সমস্তই সদা সৎ। সদা সৎ পরমাত্মায় কোনও সময়ে দ্বিত্বাদি নাই এবং তাঁহাতে ভেদাভেদ ঘটনাও নাই। সমুদায় জগৎ পরমার্থভূত স্বরূপ-দৃষ্টিতে

* আমি ব্যোমের ন্যায় অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত, এক ও মহান্ ব্যাপী পদার্থ। অহং, এই, এবং আমি, তাহারই আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ আত্মক্ষুদ্রতার কারণ। এবং জগৎ, এই ভাব তাঁহার বাহিক পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ঐ ভাবও অসীম আত্মাকে সসীম করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জগদ্ভাবও তাঁহাতে উপাধি বিশেষ। উপরিউক্ত চতুর্থ নিশ্চয় যাহাদের জন্মে তাহাদের জ্ঞান এইরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় যে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা। এক দৃক্তত্ত্বই সত্য এবং তাহাই আমি।

পরিব্যাপ্ত, কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে তাহা নহে[২৩]। যেমন অগাধ সমুদ্র পাতাল পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ, তাহার ন্যায় আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎও আত্মায় পরিপূর্ণ[২৪]। সমুদায় অম্বুনিধিই জল, তরঙ্গাদি কিছুই নহে। তদ্রূপ সত্যই নিত্য বিদ্যমান্, কুত্রাপি অসত্য বিদ্যমান নাই[২৫]। যেমন কটক, কেয়ূর ও নূপুরাদি কাঞ্চন হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি, তরু তৃণ প্রভৃতিও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে[২৬]। জগন্নির্ম্মাণ-লীলা প্রসঙ্গে দ্বৈতাদ্বৈত প্রকট হইলেও পরমাত্মময়ী অদ্বৈতশক্তি বিজৃম্ভিত হইতেছে[২৭]। অতএব হে রঘুনাথ! আত্মীয় বা পরকীয় কার্য্য বিনষ্ট হউক আর বর্দ্ধিত হউক তুমি সে সমুদায়ের নিমিত্ত সুখ দুঃখ ভাগী হইও না[২৮]। তুমি সত্তাদ্বৈতময় হইয়াও ব্যবহার কালে ভাবাদ্বৈত অবলম্বন করিবে. এবং কর্ম্মাদ্বৈত অনাদর পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতময় হইবে[২৯]। * তুমি এই উৎপাত পরিপূর্ণ অতিভীষণ ভবভূমিতে ভাবভাবনারূপ বাত্যার দ্বারা নিপতিত হইও না। (ভাবভাবনা=দৃশ্যসত্যতা বুদ্ধি)[৩০]। দ্বৈতের পরমার্থ সত্তা অসম্ভব। কারণ [illegible], তাহা চিত্তময় অর্থাৎ চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার পরিণাম বিশেষ সুতরাং তাহা কল্পিত। আত্মা একত্বযোগী নহে। অর্থাৎ এক বলিলে যেমন একত্ব সংখ্যাযুক্ত বস্তু বুঝায়, আত্মা সেরূপ একত্বসংখ্যান্বিত নহে। অতএব, একত্বরহিতই অদ্বৈত। যাহা স্বতঃ সিদ্ধ ও সন্মাত্র, তাহাই তোমার স্বরূপ ও তাহাই ব্রহ্ম[৩১]। হে মহাত্মন্! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আমি ও তুমি এই দুই বিভাগের মধ্যে যাহা আমি-বিভাগে তাহা নাই অর্থাৎ তাহা মিথ্যা।—অবশিষ্ট তুমি-বিভাগ, তাহাতে এই সমুদায় জগৎ বিনিবিষ্ট। (যাহা আমা ছাড়া, তাহাই তুমি কথার অর্থ। জগতের প্রত্যেক পদার্থকে তুমি বলা যায়। সুতরাং সমুদায় জগৎ তুমি এই বিভাগের অন্তর্গত) তুমি-বিভাগে অবস্থিত যে জগৎ তাহাও নাই। অর্থাৎ তাহাও মিথ্যা।

* সত্তাদ্বৈত অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈত। এই অদ্বৈতই পারমার্থিক। ভাবাদ্বৈত অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা অদ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবনায় সিদ্ধ হওয়া। ব্যবহার কালেও ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নাই, এইরূপ ভাবিয়া ব্যবহার করা। কর্ম্মাদ্বৈত অর্থাৎ কর্ম্মকালীন অদ্বৈত। কর্ম্মকালেও কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া এ সকল নাই ভাবিবেক। অর্থাৎ ঐ কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতি অল্প পরিমাণে আস্থা রাখিবেক। তাহা না রাখিলে কর্ম্ম হইবে না। ভাবার্থ—কর্ম্মকালে কিঞ্চিৎ দ্বৈত অঙ্গীকার করিবে। তাহাতে দোষ হইবে না।

তবে আছে কি? আছে, কেবলমাত্র এক নির্ব্বিকার বিজ্ঞান। তাহাই এ সকল। যখন তোমার উক্ত নির্ব্বিকার বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হইবে তখনই বুঝিবে যে, সদা ও সর্ব্বত্র শান্ত পরমাত্মাই বিদ্যমান, পরন্তু জগদ্ভাব সদা অসৎ বা অবিদ্যমান[৩২।৩৩]। আমি আশির্ব্বাদ করি, তোমার অন্তরে যেন বক্ষ্যমাণবিধ নিশ্চয় (অবধারণ) জন্মে। সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রকাশক পদার্থদিগেরও প্রকাশক, অজর, অমর, অজ, অনাদি, অচিন্ত্য, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, কারণরহিত, জীবশক্তির জীবন, প্রাণের প্রাণ, কলনাবর্জ্জিত, কারণের কারণ, সদা সমুদিত, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ব-প্রকার অনুভবের বীজ, স্বাত্মভাবে উপদেশ্য, * আনন্দৈকরস, ঈদৃশ চিৎপ্রকাশ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই। তুমি, আমি, জগৎ, সমস্তই সেই চিৎপ্রকাশ ব্রহ্ম[৩৪]।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

---

* স্বাত্মভাবে উপদেশ্য অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সৎ ব্রহ্ম, এখনও সেই সৎ ব্রহ্ম, সুতরাং তুমি সেই সৎ ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে উপদেশ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে ঐ কথা লিখিত আছে। উদ্দালক ঋষি শ্বেতকেতুকে দশ বার ঐরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! যাহারা সমাহিতমনা ও কাম লোভাদি কুদৃষ্টির দ্বারা হতচিত্ত নহে, যাহাদের আহার বিহার লীলাস্বরূপ, সেই সকল মহাত্মাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[১]। জীবন্মুক্ত মুনিগণ এই সংসারে বিচরণ করিলেও আদি মধ্য ও অন্ত বিরস জাগতী গতি উপহাস করতঃ বিহার করিয়া থাকেন[২]। তাঁহারা সমুচিত কার্য্যে রত, শত্রু মিত্রের প্রতি সমদৃষ্টি ও পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন[৩]। তাঁহারা উদ্বেগবিহীন হন, কাহার অপ্রিয়কারী নহেন এবং বিবেকবলে দৃষ্টাত্মা হইয়া প্রবোধরূপ উপবনে অবস্থিতি করেন[৪]। যিনি সর্ব্বাতীত পদ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হন, উদ্বেগ ও অন্যসন্তোষ রহিত হন, তাঁহাকে কদাচ সংসারে অবসন্ন হইতে হয় না[৫]। এই সকল মহাত্মারা শত্রুর ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দয়াদাক্ষিণ্যাদি প্রকাশ করেন ও গুরুপ্রভৃতির প্রতি সমুচিত ব্যবহার করেন অথচ সংসারে অবসন্ন হন না[৬]। যাঁহারা অভিনন্দন, দ্বেষ, শোক, ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত মিতভাষী ও আবশ্যক কার্য্যে অলসশূন্য হন কদাচ তাঁহারা সংসারে অবসন্ন হন না[৭]। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন ও জিজ্ঞাসিত না হইলে স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করেন। যাঁহারা সতত ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে বিমুক্ত থাকেন, তাঁহারা কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না। যিনি সকলের প্রিয় ও হিত কথা বলেন, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উৎকৃষ্ট সমাধান করেন এবং সকল ভূতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হন, তিনি কদাচ সংসারে অবসন্ন হন না[৮।৯]। ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত, এইরূপ বিবেচনাশীল ব্যক্তিই স্বীয় করস্থিত বিল্বফলের ন্যায় লোকদৃষ্টান্ত সকল উত্তমরূপে অবগত হইতে পারেন[১০]। ইহারা পরম পদে অধিরূঢ় হইয়া হাস্য সহকারে সুশীতল বুদ্ধির দ্বারা এই ভঙ্গুর জগৎ নিরীক্ষণ করেন মাত্র[১১]।

হে রাঘব! তোমার নিকট আমি জিতচিত্ত ও পরাবরদর্শী মহাত্মাদিগের স্বভাবের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমরা ভোগকর্দ্দমনিমগ্ন অজিতচিত্ত মূর্খদিগের অভিমত বিষয় কথনে সমর্থ নহি[১২।১৩]। সেই সকল মূর্খগণের নরকাগ্নিশিখাস্বরূপিণী নারী ও বিবিধ অনর্থের মূলীভূত ধনই অভিলষিত বস্তু[১৪]। তাহাদিগের মদমাৎসর্য্য প্রভৃতি নানা আচারময় ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্ম সমুদয় সুখদুঃখদ্বারা পরিপূর্ণ। আমরা তাহাদিগের কর্ম্মের গতি বলিতে সমর্থ নহি[১৫।১৬]। অতএব হে রাঘব! তুমি জীবন্মুক্তদিগের ন্যায় স্বস্থ হইয়া পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি কর[১৭]। হে রাঘব! তুমি অন্তরে আশাপরিত্যাগী, বীতরাগ ও বাসনাবিহীন হইয়া বাহিরে সমুদায় আচারের অনুষ্ঠান কর[১৮]। হে রাঘব! তুমি বাহিরে উদার, মনোজ্ঞাচার ও কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্তরে সর্ব্বপরিত্যাগী হইয়া বিহার কর[১৯]। হে রাঘব! যাহা অতুচ্ছ পরম পদ, তুমি অন্তরে তাহাই অবলম্বন করতঃ লোক মধ্যে বিহার কর[২০]। হে রাঘব! তুমি অন্তরে নৈরাশ্য ও বাহিরে আশা যুক্তের ন্যায় হইয়া এবং বাহিরে সন্তপ্তের ন্যায় ও অন্তরে শীতল হইয়া লোকমধ্যে বিহরণ কর[২১]। হে রাঘব! তুমি বাহিরে অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে কৃত্রিম আড়ম্বর সম্পন্ন ও অন্তরে আড়ম্বর বর্জ্জিত এবং বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া বিচরণ কর[২২]। হে রাঘব! তুমি বহিঃ পদার্থের ও অন্তঃ পদার্থের সারাসার ও সারাসারের তারতম্য বিদিত হইয়াছ। এক্ষণে তুমি যথা জ্ঞানে ও স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে পারগ[২৩]। তুমি কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ, এবং কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা, কৃত্রিম কার্য্যাড়ম্বর প্রদর্শন করতঃ লোকব্যবহারে অবস্থিত হও[২৪]। হে রাঘব! তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্বস্তমতি, ও আকাশ-শোভন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় হইয়া লোক সমাজে অবস্থান কর[২৫]। হে রাঘব! তুমি শত শত আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সর্ব্ববৃত্তিতে সমদর্শী ও বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যে অবস্থিত থাক[২৬]। হে রাঘব! দেহী দিগের বাস্তব বন্ধ বা মোক্ষ নাই। যাহা দেখিতেছ সমস্তই ইন্দ্রজাল ও পরিবর্ত্তনশীল সংসার[২৭]। যেমন তীব্র আতপে সলিলরাশি দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় ভ্রান্তির মহিমায় জগৎ দৃষ্ট হইতেছে[২৮]। অবদ্ধ স্বভাব, এক, একরূপ ও সর্ব্বত্রাবস্থিত আত্মার আবার বন্ধন কি? অতএব, যাহার বন্ধন নাই

তাহার আবার মোক্ষই বা কি[২৯]? এই সংসারভ্রান্তি কেবল অতত্ত্ব-জ্ঞানের প্রভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান হইলে ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেক। রজ্জু জ্ঞানের উদয় হইলে তখন কি আর তাহাতে সর্প জ্ঞান স্থিতি লাভ করে[৩০]? তুমি তত্ত্ব বিদিত হইয়াছ, অহঙ্কারশূন্য হইয়াছ, এক্ষণে তুমি নির্ম্মল ব্যোমের ন্যায় অবস্থিতি কর[৩১]। তুমি এই সংসারের দ্রষ্টা মাত্র, তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সুহৃদ্ ও বান্ধব প্রভৃতির মমতা পরিত্যাগ কর। যাহাদের স্বরূপ শূন্য অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রজাল কল্পনার ন্যায় কল্পিত বা মায়াবিরচিত, তাহাদের জন্য চিন্তা কেন[৩২]? আমি যে প্রণালী বলিলাম, সেই প্রণালীতে বাসনা পরি-ত্যাগী হইলে বুঝিতে পারিবে, তুমি এ সকল হইতে ভিন্ন ও এ সক-লের সাক্ষীর ন্যায় দ্রষ্টা মাত্র। বাসনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাহা পাইবে বা দেখিবে সে সমস্তই অসত্য[৩৩]। ভোগ, বন্ধু, জগদ্ভাব ও শুভাশুভ কর্ম্ম, কিছুরই সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই। তবে কেন তুমি ঐ সকলের নিমিত্ত অনুশোচনা করিবে[৩৪]? একমাত্র আত্মতত্ত্বই আমি, যদি তোমার ঐরূপ বুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে তোমার আর জগদ্ভয়ও থাকিবে না। কারণ এই যে, ভয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নাই[৩৫]। তোমার বন্ধুরা তোমার নিমিত্ত শোক করে করুক, তাহাদের সুখ দুঃখের সহিত তোমার সম্পর্ক পর্য্যন্তও নাই। অথবা তুমি যাহাদের জন্য শোক করিবে তাহাদের সহিত তোমার আদৌ সম্বন্ধ নাই। যখন সমস্তই অসৎ তখন অবশ্য সম্বন্ধও অসৎ[৩৬]। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, আমি পূর্ব্বজন্মে ছিলাম, ভবিষ্যৎ জন্মেও থাকিব, এবং বর্ত্তমান জন্মেও আছি, তাহা হইলে তোমার সেই সেই জন্মের বান্ধব দিগের জন্য শোক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা তুমি কর না। না কর কেন[৩৭।৩৮]? যদি এমন বুঝিয়া থাক যে, আমি এ জন্মের এক, অন্য জন্মের অন্য, তাহা হই-লেও তোমার শোক করা অনুচিত। কেননা, সে পক্ষে স্থায়ী বস্তু না থাকায় শোকের কারণের অভাব[৩৯]। যদি এমন বুঝিয়া থাক যে, আমি এই হইয়াছি, আর হইব না, দেহ নাশের সঙ্গেই বিনষ্ট হইব, তাহা হইলে ত আদৌ শোক করিতে পার না। যখন কেহই থাকিবে না তখন আর কাহার বা কি জন্য শোক[৪০]? অতএব হে রাঘব! প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতের ক্রমে (প্রণালীতে) সুখ দুঃখ দুএর কিছুই

করা কর্ত্তব্য নহে, বরং মুদিতা (অনুমোদনাত্মক হর্ষ) ও যথোপস্থিত কার্য্যের অনুগমন করা কর্ত্তব্য[৪১]। হে রামচন্দ্র! তুমি অনুভব করিও না, দুঃখকেও অবসর দিও না, সমান নিশ্চল নিষ্কম্প ভাবে থাক। পরমাত্মা সর্ব্বগামী, অর্থাৎ সর্ব্বত্রাবস্থিত, এই নিশ্চয় করিয়া সাম্য আশ্রয় কর[৪২]। তুমি অনন্ত সৎস্বরূপ, ও আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, মহান্ ও স্বপ্রকাশ। জ্বালা কোটরে যেরূপ অন্ধকার অবস্থিতি করিতে পারে না, তদ্রূপ তোমাতেও দুঃখাদি অবস্থিতি করিতে পারে না[৪৩]। তুমি জগৎ পদার্থ সমূহের হারসূত্র স্বরূপ। অর্থাৎ তোমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে। যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই দেখে, সংসার আছে, এবং লোক সকল জন্মিতেছে ও মরিতেছে! হে রামচন্দ্র! যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাহারা সংসারের স্থিতি দেখে না। তুমিও জ্ঞানী, তাই তোমাকে বলি, সুখী হও[৪৪।৪৫]। কষ্টই এই সংসারের স্বরূপ, তাহা অজ্ঞান বশতঃ বৃদ্ধি পায়। হে সদ্বুদ্ধিশালিন্! তুমি অজ্ঞান নহ, প্রত্যুত জ্ঞানবান্[৪৬]। ভ্রমের আবার রূপ কি? ভ্রান্তিই ভ্রমের রূপ। যেমন স্বপ্নের রূপ স্বপ্ন, তাহার ন্যায় ভ্রমেরও রূপ ভ্রম (মিথ্যা প্রতীতি)[৪৭]। রাম! জগৎ নিস্তত্ত্ব হইলেও মূলে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকায় সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। এরূপ ভাব হওয়া অর্থাৎ এতদ্রূপ জগতের এতদ্রূপে প্রকাশ হওয়াও সেই সর্ব্বশক্তি পরমাত্মার অন্যতম শক্তি[৪৮]। তাই আমি বলিতেছি, কে কাহার বন্ধু? কেই বা কাহার শত্রু? সকলেই সকলের সব[৪৯]। যেমন জলে সততই তরঙ্গ ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতেছে, তেমনি, জগৎও অবিশ্রান্ত গমনে যাইতেছে ও আসিতেছে[৫০]। কখন অধঃ ঊর্দ্ধ হইতেছে, আবার ঊর্দ্ধও কখন অধঃ হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল সংসার চক্রের অধঃ ঊর্দ্ধ নাই। কখন স্বর্গবাসী নরকে ও কখন বা নরকবাসী স্বর্গে যাইতেছে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তর গমনের ন্যায় জীব এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে[৫১।৫২]। ধীর কৃপণ হইতেছে, আবার কৃপণও ধীর হইতেছে। ভূত সকল অসংখ্য প্রকারের উৎপতন নিপতনে বিচলিত হইতেছে[৫৩]। যেমন অগ্নিতে হিমের কণামাত্রও পাওয়া যায় না, তেমনি, ইহাতে এমন কোনও কিছু পাওয়া যায় না —যাহা একরূপ, স্থির ও সন্তাপ পরিশূন্য[৫৪]। মহাভাগ ও বান্ধব কতিপয় দিনের জন্য[৫৫]। হে বাহুশালিন্ রাম! আত্মীয়তা, পরতা, অন্যত্ব,

তুমিত্ব, আমিত্ব, এ সমস্তই দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা[৫৬]। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এই আমি, ঐ তুমি, এ মিথ্যা প্রতীতি তোমা হইতে বিগলিত হউক[৫৭]। তুমি ব্যবহারে থাক ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন তোমার তদ্রূপ দৃষ্টি ছিন্নমূল হইয়া থাকে[৫৮]। এই সংসার পথে বিচরণ কর, ক্ষতি নাই। কিন্তু দেখিও, যেন তুমি বাসনাভারে শ্রান্ত ক্লান্ত হইও না[৫৯]। তোমার যেমন যেমন বাসনা নাশক বিচার উদিত হইবে তেমনি তেমনি বাসনা ক্ষয় হইতে থাকিবে[৬০]। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এ গণনা লঘুচেতা দিগের। পরন্তু যাহারা উদার, তাহাদের কুত্রাপি ঐরূপ জ্ঞান, আচরণ ও বিভাগ গণনা নাই[৬১]। এমন কিছু নাই, যাহাতে আমি নহি, এমন কিছু নাই, যাহা আমার নহে। ধীরগণ এইরূপ বুদ্ধিরই সাহায্যে বিগতাবরণ অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা যে আচ্ছন্নতা, সে আচ্ছন্নতা পরিবর্জ্জিত হন[৬২]।

হে রাঘব! বহুশত জন্ম দ্বারা বদ্ধমূল ভ্রমযুক্ত জগতে বন্ধু এবং অবন্ধু এইরূপ দর্শন হইয়া থাকে, বস্তুত এই ত্রিভুবন বন্ধুবিহীন হই-লেও ভ্রমদৃষ্টিদ্বারাই চিরবন্ধু স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। হে রাঘব! সমুদায় ভূতই তোমার বন্ধু অথচ অত্যন্ত অসংযুক্ত[৬৩,৬৪]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই বিষয়ে তোমার নিকট ভাগীরথী তীরস্থিত মুনিপুত্রদ্বয়ের এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, এতৎ প্রসঙ্গে আমার সেই আশ্চর্য্য পুণ্যজনক মুনিপুত্রসংবাদ নামক ইতিহাস স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে[১।২]।

এই জম্বুদ্বীপের কোন এক প্রদেশে গিরিসমূহমধ্যে বনসমূহে পরিবৃত মহেন্দ্র নামক এক অতি উন্নত পর্ব্বত আছে[৩]। তত্রত্য কল্পদ্রুম সোদর দ্রুম রাজির ছায়ায় মুনি ও কিন্নর প্রভৃতি বিশ্রান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সেই পর্ব্বতের বিস্তৃত শৃঙ্গসমূহ আপন ঔন্নত্যের দ্বারা অকাশকেও পরাভূত করিতেছে[৪]। যখন শৃঙ্গকন্দরচারিমুনিগণ সামবেদ গান করেন, তখন বোধ হয়, যেন ব্রহ্মলোকে সাম ধ্বনি শুনা যাইতেছে। নীলবর্ণ মেঘমণ্ডল সেই শৃঙ্গস্থিত লতাকুঞ্জে সংলগ্ন হইয়া কেশের ন্যায় শোভা বিস্তার করে[৫।৬]। এই পর্ব্বতের তটপ্রদেশে শরভ পশুর বিজৃম্ভণ যেন কল্পান্ত মেঘের গর্জ্জনকে উপহাস করে! এই পর্ব্বতের এক বিশেষ শৃঙ্গের কোন বিস্তৃত প্রদেশস্থিত রত্নসানুতে মুনিগণের স্নানপানার্থ ভগবতী আকাশগঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। তত্রস্থ সেই ত্রিপথগামিনী ভাগিরথীর তীরে বিকসিত দ্রুমে পরিপূর্ণ সুমেরুতটসদৃশ কনপ্রভ এক প্রদেশ (স্থান বিশেষ) আছে। তথায় পরমাত্মবোধসম্পন্ন উদারধী মূর্ত্তিমান্ তপঃস্বরূপ দীর্ঘতপা নামক এক মুনি বাস করিতেন। যেমন বৃহস্পতির পুত্র কচ, তাহার ন্যায় সেই মুনির পুণ্য ও পাবন নামে দুই পুত্র ছিল[৭।১২]। মহর্ষি দীর্ঘতপা ঐ পুত্রদ্বয় ও এক ভার্য্যার সহিত তত্রস্থ ফলপাদপসম্পন্না দেবনদীর তীরে পরম সুখে বাস করিতেন[১৩]। কিয়ৎকাল পরে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠপুত্র পাবন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইলেন। অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার মূর্খত্ব মাত্র দুরীভূত হইল। পাবন অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ বশতঃ পরম বস্তু অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দোলায়মানচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১৪।১৫]। ক্রমে এক শত

বৎসর জীর্ণ হইলে দীর্ঘতপা মুনির আয়ুঃ শেষ হইল এবং তদীয় দেহ-লতাও জীর্ণ হইল। অনন্তর তিনি ভারবাহীর ভার পরিত্যাগের ন্যায় সেই গিরিগুহামধ্যে বৃত্তান্তশতপূর্ণ জীর্ণ শীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিলেন [১৭।১৮]। রাম! পুষ্প বিনষ্ট হইলে তাহার গন্ধ যেমন আকাশ আশ্রয় করে তাহার ন্যায় তিনিও দেহ বিনাশে চিদাস্পদ পরম পদ আশ্রয় করিলেন (ব্রহ্মপদে লীন হইলেন)[১৯]। অতঃপর তদীয় ভার্য্যা মুনি-বরের দেহ প্রাণবিবর্জ্জিত দর্শন করতঃ নালবিহীন পঙ্কজের ন্যায় বিলু-ষ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং ভ্রমরী যেমন পদ্মকে পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় তিনিও আপনার চিরসমাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভর্ত্তাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট যোগদ্বারা রোগজরাদিগ্লানিরহিত স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে, উডুপতি চন্দ্র অস্তগমন করিলে যেমন গগনকোষস্থ তৎপ্রভা জনগণের অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার ন্যায় সেই মুনিভার্য্যাও আজ্ ভর্ত্তৃ-অনুগমনের পর জনগণের অদৃশ্যা হইলেন[২০।২২]। অনন্তর পুণ্য, শোকাদির বশবর্ত্তী না হইয়া সেই মৃত পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পাবন, শোকোপহত-চিত্তে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া কাননবীথিতে বিলাপ করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২৩।২৪]। পরে উদারমতি পুণ্য পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিপিনে আগমন করিলেন এবং পাবনকে সাতিশয় শোকাক্রান্ত দেখিয়া উপদেশ কথা সকল বলিতে লাগিলেন[২৫]।

বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! * যে শোক অন্ধতার প্রধান কারণ, তাহাকে কি নিমিত্ত তুমি প্রশ্রয় দিয়া বিবৃদ্ধ করিতেছ? যদ্রূপ বর্ষা-কালের মেঘ পদ্মকে জলধারা বহন করায়, তদ্রূপ শোকও তোমার নেত্র পদ্মকে বাষ্পধারা বহন করাইতেছে[২৬]। তোমার পিতা মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি তোমার মাতার সহিত মোক্ষ নামক পরমাত্মপদে গমন করি-য়াছেন[২৭]। সেই পরমাত্মপদ সমুদায় জননধর্ম্মী জন্তুর উৎপত্তির, স্থিতির ও লয়ের মূল ও আধার এবং বিজিতাত্মা (তত্ত্বজ্ঞানী) দিগের স্বরূপ। অতএব তুমি স্বভাবপ্রাপ্ত পিতার জন্য শোক করিতেছ কেন[২৮]? ইনি

---

* জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। পুণ্য সেই ভাবে পাবনকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছেন।

মাতা, ইনি পিতা, এই সাংসারিক ভাব মোহ হইতেই জন্মে। সুতরাং যাহা বস্তুতঃ শোকস্থান নহে, মোহপ্রযুক্ত তুমি তাহার জন্য শোক আরোপ করিয়া লইতেছ[২৯]। তিনি তোমার মাতা নহেন, এবং তিনিও তোমার পিতা নহেন, তুমিও তাঁহাদিগের পুত্র নহ। যদি জন্ম উপলক্ষিত পুত্রতার কথা বল, তবে, ভাবিয়া দেখ, তাঁহাদিগের ত্বদ্বিধ পুত্র অসংখ্য[৩০]। তোমার এই যেমন পিতৃমাতৃ বিয়োগ হইল, এরূপ পিতৃমাতৃ বিয়োগ অসংখ্য বার হইয়া গিয়াছে[৩১]। তাঁহাদেরও তুমিমাত্র পুত্র নহ। তাহাদেরও তোমার ন্যায় অসংখ্য পুত্র অতীত, জন্মিয়া মৃত, হইয়াছে। অন্য নরেরও এইরূপ বহুপুত্র ও বহু পিতামাতা গত হইয়াছে[৩২]। আমাদিগের পিতা মাতার এমন লক্ষ লক্ষ পুত্র অতীত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় জানিবে[৩৩]। প্রত্যেক ঋতুতে মহাতরুর ফলের ন্যায় জন্তুগণের জন্মে জন্মে মিত্র ও বান্ধব আগমন ও গমন করিয়া থাকে (হয় আর যায়)[৩৪]। হে সুত! যদি মাতা, পিতা ও পুত্রাদির নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে অতীত সহস্র সহস্র মাতা পিতার নিমিত্ত কি জন্য শোক না কর[৩৫]? হে মহাভাগ! এই জগৎপ্রপঞ্চ ভ্রান্তির মহিমায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে অর্থাৎ ইহা কেবল মোহের কল্পনা। বস্তুতঃ ইহাতে মিত্র, সুহৃদ্ ও বান্ধবাদি নাই[৩৬]। হে ভ্রাতঃ! যেমন চিরপ্রতপ্ত মহামরুতে জলবিন্দু থাকিতে পারে না, তদ্রূপ, পরমার্থ দৃষ্টিতে কোন কিছুর নাশ নাই[৩৭]। হে ভ্রাতঃ! ঐ যে ছত্রচামরচঞ্চলা রাজলক্ষ্মী, যাহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, উহা স্বপ্ন বিশেষ। উহা তিন বা পাঁচ দিনের জন্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে[৩৮]। হে পুত্র! এক্ষণে তুমি পারমার্থিকী দৃষ্টি অবলম্বনে সত্য বিচার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। ইনি গত, ইনি মৃত, এরূপ কুদৃষ্টি স্বীয় সঙ্কল্পজনিত উপতাপ হইতে সমুত্থিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানরূপ আতপে উপতপ্ত অতিবিস্তীর্ণ আত্মরূপ মরুভূমিতে স্বীয় বাসনারূপ মরীচিবারি শুভাশুভ তরঙ্গ সহকারে অনন্ত আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে মাত্র[৩৯।৪১]।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

পুণ্য কহিলেন, ভ্রাতঃ! পিতাই বা কে? মাতাই বা কে? মিত্রই বা কে? এবং বান্ধবই বা কে? বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে—সমস্তই কল্পনাময় বিভ্রমে সমুত্থাপিত[১]। ফলতঃ বন্ধু, মিত্র, পুত্র ও স্নেহ, দ্বেষ, মোহ, অবস্থা ও আময়, এ সকল কেবল নামে বিস্তৃত। অর্থাৎ ঐ ঐ নামের নামী বস্তু নাই। ভাবিয়া দেখ, বন্ধুভাবে ভাবিত হইলেই বন্ধু, শত্রুরূপে ভাবিত হইলেই শত্রু। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে—সংসারস্থিতি কেবল ভাবমূলক ও বিষমিশ্র অমৃতের অনুরূপ[২।৩]। একাদ্বয় আত্মার আবার ইনি বন্ধু ইনি শত্রু কি[৪]? হে পুত্র! এই রক্ত, মাংস ও অস্থি প্রভৃতির সংঘাত রূপ দেহের মধ্যে আমি কে, তাহা বিচার করিয়া দেখ[৫]। পরমার্থ দৃষ্টিতে তুমি আমি এ সকল নাই। পুণ্যই বল, আর পাবনই বল, সমস্তই দেহাত্মবিভ্রমের প্রথা (প্রসিদ্ধি)[৬]। তোমার আবার পিতা কে? সুহৃদ্ই কে? মাতাই কে? পরই বা কে? বল দেখি, অনন্ত বিলাস আকাশের আবার আত্মীয় ও পর কি[৭]? যদি তুমি একটা কিছু থাক, তবে তাহারই জন্ম জন্মান্তর ঘটনা কথা বলিতে পার। সে পক্ষে আমি বলি—তবে তুমি সেই সেই জন্মের বান্ধবের ও বিভবের জন্য শোক প্রকাশ কর না কেন? হে পুত্র! পূর্ব্বজন্মে তোমার বনস্থলীতে, বহুবিধ পুষ্প ও মৃগাদি ছিল, তুমি তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[৮।৯]? পূর্ব্বে তোমার পদ্মশালিনী তটিনীতে অনেক হংস বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১০]? পূর্ব্বে বিচিত্র বনভূমে বৃক্ষবন্ধু ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১১]? পূর্ব্বে উন্নত শৈলকন্দরে বহুতর সিংহ বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১২]? পূর্ব্বে সান্তোজসরোবরে তোমার অনেক মৎস্য বন্ধু ছিল, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক করিতেছ না কেন[১৩]? তুমি দশার্ণদেশে কপিল নামে বানর, তুখার দেশে

রাজপুত্র, পুণ্ড্রদেশে বনবায়স, হৈহয় দেশে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, শাল-দেশে কুক্কুর, সরলবৃক্ষে পক্ষী, বিন্ধ্যপর্ব্বতে পিপ্পলবৃক্ষ, মহাবটে ঘুণ-কীট ও মন্দরে কুক্কুট, পরে মন্দরপর্ব্বতগুহায় বিপ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[১৪।১৬]। অপিচ, পূর্ব্বে কোশলদেশে ব্রাহ্মণ হইয়া বঙ্গদেশে তিত্তির ও পুনঃ তুখার দেশে অশ্ব হইয়াছিলে। পরে অধ্বর প্রদেশে (অথবা যজ্ঞভূমে) ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[১৭]। যে তুমি পূর্ব্বে তাল বৃক্ষের মূল মধ্যে কীট ও উড়ুম্বর ফল মধ্যে মশক ও বিন্ধ্যবনে বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ[১৮]। যে তুমি হিমালয়কন্দরে ভূর্জপত্রের মধ্যে ছয়মাস পিপীলিক হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ[১৯]। পূর্ব্বে যে তুমি এতদ্দেশসীমান্তে কুগ্রামে গোময়রাশিতে সার্দ্ধসংবৎসর বৃশ্চিকরূপে অবস্থিতি করিয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ[২০]। পূর্ব্বে যে তুমি বনবাসিনী পুলিন্দীর স্তনপীঠে পদ্মে ষট্‌পদের ন্যায় নিলীন থাকিতে (অর্থাৎ পুলিন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল) সেই তুমি এক্ষণে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা[২১]।

হে পুত্রক! তুমি পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে অন্যান্য বহুযোনিতে বহু শত সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[২২]। বৎস! আমি তত্ত্বজ্ঞান বিশোধিত সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা তোমার ও আমার প্রাক্তন বাসনাক্রম সকল (জন্ম-পরম্পরা) দর্শন করিতেছি[২৩]। অদ্য সমুদিত জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা আমারও অতীত জন্মপরম্পরা স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে[২৪]। আমি ত্রিগর্ত্তে শুক, সরিত্তটে ভেক, পরে বনমধ্যে ক্ষুদ্রপক্ষিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি এই কাননে এতৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছি[২৫]। আমিও বিন্ধ্যাচলে পুলিন্দ, বঙ্গে বৃক্ষ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতে উষ্ট্র জন্ম ভোগ করিয়া এই কাননে ব্রাহ্মণকুলে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি[২৬]। হে পুত্র! পূর্ব্বে যে আমি হিমপর্ব্বতে চাতক, পৌণ্ড্রমণ্ডলে রাজা ও সহ্যপর্ব্বতে ব্যাঘ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই আমি এক্ষণে তোমার অগ্রজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি[২৭]। যে দশবর্ষ গৃধ্র, পঞ্চমাস গ্রাহ (জলজন্তু) এবং শত বৎসর সিংহজন্ম ভোগ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি আজ তোমার অগ্রজ ভ্রাতা[২৮]। বৎস! আমি অন্ধ্রগ্রামে চকোর ও শ্রীপর্ব্বতে আচার্য্য-পুত্র ও তুখার দেশে মাণ্ডলিক হইয়াছিলাম। সে কথা আজ আমি তোমাকে বলিলাম[২৯]। আমার পূর্ব্বজন্মের বিবিধাচারচেষ্টিত

সংসারপরম্পরা সমস্তই স্মরণ হইতেছে[৩০]। আমারও শত শত বান্ধব, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও সুহৃদ্ অতীত হইয়াছে; এক্ষণে আমি সেই প্রাক্তন কোন্ বন্ধুর নিমিত্ত শোক করিব? কোন্ বন্ধুর নিমিত্তই বা অতিশয় ক্রন্দন করিব? জগতের গতিই এইরূপ, সুতরাং সমস্তই অশোচ্য[৩১।৩২]। হে পুত্র! যেমন বৃক্ষের পত্র অসংখ্য ও সে সকল উৎপন্ন, শীর্ণ, নিপতিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে সেইরূপ সংসারী জীবেরও অসংখ্য পিতা মাতা ভ্রাতা ও বন্ধু অতীত হইতেছে আবার আসিতেছে[৩৩]। তাহাতে যে সুখ দুঃখ আছে তাহার প্রমাণ কি? সেইজন্য বলিতেছি, আইস, আমরা শোক হর্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ অবস্থায় থাকি[৩৪]। গতিকোবিদগণ অহম্ভাবসম্বলিত প্রপঞ্চভাবনা পরিত্যাগ করিয়া যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, আইস, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হই[৩৫]। ভ্রাতঃ! ভবভাবনাবিমুক্ত হইয়া অব্যগ্রভাবে সেই জরামরণবর্জ্জিত আত্মার স্মরণ কর, বিমূঢ় হইও না[৩৬।৩৭]।

বৎস! তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই, মাতা নাই ও পিতা নাই। হে সদ্বুদ্ধে! তুমি যে আত্মা সেই আত্মাই আছ, অন্য কিছু নহ[৩৮]। এই সংসারযাত্রায় অজ্ঞ নরেরাই নানা অভিনয় প্রদর্শন করে ও রসভাবসমন্বিত হয়[৩৯]। কিন্তু যাহারা মধ্যস্থ বা উদাসীন অর্থাৎ যাহারা কেবল দর্শক মাত্র, তাহারা স্বস্থ থাকিয়া যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহা দেখে মাত্র, তাহাতে হৃষ্ট বা তুষ্ট হয় না[৪০]। নিশাগমে দীপ যেমন আলোকের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, সেইরূপ, লোকস্থিতি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞগণও অকর্ত্তা[৪১]। কার্য্য সকল আত্মাতে অধ্যস্ত, এবং আত্মাই সে অধ্যাসের কর্ত্তা, এ কথা সত্য; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। কেননা তাঁহারা জানেন, অধ্যস্ত মাত্রেই মিথ্যা[৪২]। হে পুত্র! ইচ্ছাকলঙ্কবিবর্জ্জিত ও মননশীল আত্মার (বুদ্ধির) দ্বারা স্বস্থস্বভাব আত্মার (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সংসার ভ্রম পরিত্যাগ করতঃ পরিতোষ প্রাপ্ত হও[৪৩]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, তখন পাবন পুণ্য কর্ত্তৃক অভিহিত প্রকারে প্রবোধিত হইলে, যেমন প্রভাত কালে ভূতল প্রকাশ প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তদীয় বোধ (জ্ঞান) সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইল[১]। পরে তাঁহারা উভয়ে পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন[২]। তৎপরে যথাকালে দেহ পরিত্যাগ করতঃ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইলেন। দীপ যেমন তৈল দগ্ধ করিয়া নির্ব্বাপিত হয় তাহার ন্যায় তাঁহারাও প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিয়া নির্ব্বাপিত হইলেন[৩]। হে অনঘ! পূর্ব্বভুক্ত দেহের সুহৃদ্ ও বন্ধু অসংখ্য, কে কবে সে সকলের গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিয়াছে[৪]? হে রঘুনন্দন! তাই আমি তোমাকে বলিতেছি, অনন্ত শোকাদি দুঃখের মূলীভূত বিষয় বৃদ্ধি করা উচিত নহে; হ্রাস করাই উচিত[৫]। যেমন ইন্ধন দ্বারা পাবকের বৃদ্ধি হয় ও ইন্ধন অভাবে তাহার অভাব হয়, তাহার ন্যায় চিন্তার দ্বারা চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অচিন্তার দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়[৬]। রাম! তুমি ধ্যেয়ত্যাগরূপ রথে সমারূঢ় হইয়া সকরুণ ও উদার দৃষ্টিতে দুঃখময় লোক অবলোকন করণার্থ উত্থিত হও[৭]। হে মহাবাহো! তাহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাই শুদ্ধ স্বচ্ছ ও বিগতাময়। তাহা প্রাপ্ত হইলে বিমূঢ় ব্যক্তির মোহ অপগত হয়[৮]। বিবেকরূপ সুহৃদ্ ও পরমার্থবুদ্ধিরূপিণী সখী সহ বিচরণ করিলে জনগণের সংসার সঙ্কটে বিমুগ্ধ হইতে হয় না। আপনার ধীরতা ব্যতীত আর কেহ সঙ্কটত্রাতা নহে[৯]। অতএব, আপদ বিঘাতার্থ বৈরাগ্য, শাস্ত্র ও মহত্বাদি গুণ আহরণ করতঃ যত্নপূর্ব্বক মনকে উন্নত করিবেক[১০।১১]। মহত্বাদিগুণে উন্নীত মনের দ্বারা যে ফল লব্ধ হয়, ত্রিভুবনের ঈশ্বরত্ব বা বহুযত্নসংগৃহীত রত্নপূর্ণ কোষ দ্বারা সে ফল পাওয়া যায় না[১২]। যাহারা উত্তম মধ্যম অধম মধ্যে জন্মপরম্পরা ভোগ করতঃ জগৎকুক্ষি মধ্যে পরিভ্রমণ করে, তাহা-

দের মন সদা সন্তৃপ্ত থাকে[১৩]। মনের পূর্ণতা (মন যখন কিছুই চাহে না তখনই মনের পূর্ণতা) হইলে এই জগৎ তখন সুধাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহার পদদ্বয় চর্ম্মপাদুকায় আবৃত, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত ভূপ্রদেশ চর্ম্মাবৃত[১৪]। মন বৈরাগ্যদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার দ্বারা নহে। আশা তাহাকে রিক্তই করে, পূর্ণ করে না[১৫]। যাহার চিত্ত আশার বশ্য, তাহাদের হৃদয় অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় শূন্য কোটর (জলশূন্য সমুদ্রের ন্যায় ভয়াবহ ও বৃথা গভীর)[১৬]। যাহার চিত্তরূপ বৃক্ষে তৃষ্ণা মর্কটী লম্ফ ঝম্প না করে, তাহারই হৃদয়বল মহৎ। যাহাদের চিত্ত স্পৃহাশূন্য, তাহাদের নিকট ত্রিজগৎ পদ্মবীজের ন্যায় ক্ষুদ্র, যোজন সমূহ গোষ্পদ এবং মহাকল্প নিমেষার্দ্ধ[১৭।১৮]। নিস্পৃহ মনে যেরূপ শীতলতা (নিস্তাপ বা আহ্লাদ) বিরাজ করে, কদলীত্বকে, হিমাংশুতে বা হিমাচলে তাদৃশী শীতলতা নাই[১৯]। যে শোভা বা যেরূপ কমনীয়তা নিস্পৃহ মনে বিরাজ করে সে শোভা সে কমনীয়তা পূর্ণচন্দ্রে, সমুদ্রে ও কমনীয় লক্ষ্মীবদনেও নাই[২০]। আশাপিশাচী নরগণের অন্তরকে যেরূপ দূষিত করে, মেঘলেখা চন্দ্রকে ও কজ্জলরেখা সুধাধবলিত গৃহভিত্তিকে সেরূপ দূষিত করে না[২১]। চিত্তরূপ বৃক্ষের আশারূপ শাখার দ্বারা সমুদয় দিক্‌তট সমাচ্ছন্ন হয়। সেই শাখা ছিন্ন হইলে চিত্তরূপ মহাদ্রুম স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্ততরু যখন তৃষ্ণাশাখাবিহীন হইয়া স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একরূপে অবস্থিতি করে, ধীরতা তখন শতশাখা হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে[২২।২৩]। হে রাম! যখন চিত্ত অনস্তমিতধৈর্য্যদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন সেই পদ পাওয়া যায়—যে পদের আর বিনাশ নাই[২৪]। যদি তুমি বিশুদ্ধাশয় হও, আর আশা নাম্নী চিত্তবৃত্তিকে অঙ্কুরিত হইতে না দাও, তাহা হইলে তোমার আর ভয় কি[২৫]? তোমার চিত্ত যখন বৃত্তিবিহীন প্রযুক্ত অচিত্ত হইবে তখনই তুমি মোক্ষনাম্নী সুবিস্তীর্ণা সত্তায় স্থিত হইবে[২৬]। তৃষ্ণারূপিণী উলূকী যদি তোমার চিত্তগৃহে বাস করে তাহা হইলে তোমার অমঙ্গল দিন দিন বৃদ্ধিই পাইবে[২৭]। যাহাকে চিন্তন বা চিন্তা বলা যায়, তাহাকে আমরা মনোবৃত্তি বলি এবং আশাও বলি। তুমি সেই আশারূপা চিত্তবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হও[২৮]। যে যে বৃত্তিতে জীবিত থাকে তাহার সে বৃত্তি বিনষ্ট

হইলে অবশুই সে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি চিত্তকে বিনাশ করিবার জন্ত তাহার বৃত্তি বিনাশ কর[২৯]। হে মহানুভাব! তুমি সমুদায় এষণা (ইচ্ছা বা আশা) প্রশমিত কর, করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হও। কু আশারূপ বন্ধনরজ্জু ছিন্ন হইলে কেনা মুক্ত হয়[৩০]?

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবংশরূপ আকাশের পূর্ণচন্দ্র! আমি তোমাকে উদ্ধারের অন্য উপায় বলি, শ্রবণ কর। যেরূপ মহারাজ বলি আত্মসমুদিত বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও তদ্রূপে জ্ঞান প্রাপ্ত হও[১]।

বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে রাম বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত ও অমল পদে বিশ্রান্ত হইয়াছি। শরৎকালের আকাশ যেমন মেঘমুক্ত হয় তাহার ন্যায় আমার হৃদয়াকাশ তৃষ্ণাবিমুক্ত হইয়াছে[২।৩]। আমি এখন সায়ংকালীন জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ উড়ুরাজের ন্যায় স্বস্থ, সুশীতল ও আনন্দময় হইয়াছি[৪]। পরন্তু আপনার বচনাবলি শ্রবণে আমার তৃপ্তির অন্ত হইতেছে না। অতএব হে বিভো! আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত বলিরাজার বিজ্ঞান প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করুন। আমি জানি, সাধুগণ অবনত শিষ্যকে উপদেশ বাক্য বলিতে ক্লেশ বোধ করেন না[৫।৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট বলির সেই উত্তম বৃত্তান্ত বর্ণন করি। তাহা শুনিলে তুমি শাশ্বত তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইবে[৭]।

এই জগৎ-কোশের কোন এক দিকে ভূমির অধোভাগে পাতাল নামে এক বিখ্যাত লোক আছে[৮]। এই পাতাললোকের কোন কোন প্রদেশ ক্ষীরোদসমুদ্রজাতা ও অমৃতনির্ম্মিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণে পরিসেবিত এবং উহার কোন স্থান উদ্দামরব ও লোলজিহ্ব সহস্রফণ ফণিগণে আকীর্ণ[৯।১০]। কোন স্থানে সুমেরুতুল্য বৃহদাকার দানবগণ, এবং কোন প্রদেশে গর্জ্জনকারী দিগ্‌দন্তিগণ স্তম্ভের গৃহচ্ছদ ধারণের ন্যায় উপরিতন ভূ-বিভাগ বহন করিতেছে। কোন প্রদেশে নারকী জীবের স্বকৃত কর্ম্ম ফলের দুর্গন্ধময় প্রতিভাস, এবং কোন প্রদেশ অধোনরক হইতে পৃথিবীর উপরিতন মণ্ডল পর্য্যন্ত সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরির

শিফাতুল্য (শিফা=শিকড়) পাদ সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং কোন কোন প্রদেশ সঙ্কুচিত বিবরতুল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতালাবয়ব (পাতালের অংশ বিশেষ) দ্বারা সুসঙ্কট[১১।১২]। * যাঁহার পাদপদ্মরজঃ সুরাসুরগণের মস্তকে সর্ব্বদা অবস্থান করে, সেই ভগবান্ কপিলদেব কর্ত্তৃক কোন স্থান পবিত্রিত হইতেছে এবং কোন স্থানে অসুররমণী পরিপূজিত ভগবান্ হাটকেশ † অবস্থান করিতেছেন। বিরোচন পুত্র বলি ঈদৃশ পাতাললোকের মহাপরাক্রান্ত রাজা[১৩।১৭]। সুররাজ ইন্দ্র ইহার পাদসম্বাহন বাঞ্ছা করেন। অধিক কি বলিব, ভূতগণের পালন কর্ত্তা ভগবান্ হরি স্বয়ং ইহার রক্ষক[১৮।১৯]। ইনি কুপিত হইলে তদীয় কল্পাগ্নিসদৃশপ্রতাপের উগ্র প্রভাবে সপ্ত সমুদ্রও শোষ প্রাপ্ত হইত[২০।২১]। যেমন ময়ূরের শব্দে সর্পদিগের হৃদয় নাড়ী শুষ্ক হয় তাহার ন্যায় ইহার নাম শুনিলে ঐরাবতের গণ্ড শুষ্ক হইয়া যাইত। (গণ্ড অর্থাৎ মদস্রাব স্থান)। তদীয় যজ্ঞধূমজাত বারিদ গণের বারিবর্ষণে সপ্ত সমুদ্র পরিপূরিত করতঃ ব্রহ্মাণ্ডবিবরস্থ জনগণের রক্ষা করিত[২২]। তাঁহার কোপদৃষ্টির প্রভাবে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ফলভারাবনত লতার ন্যায় নত হইয়াছিল[২৩]। এই বলি ভুবনভূষণ ইন্দ্রাদিদেবগণকে

---

* পৌরাণিক বর্ণনা অনুসারেও পাতাল ভূছিদ্র অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী বৃহৎ বিবর বা বহুযোজনব্যাপী অবকাশময় স্থান বিশেষ (ফাঁক)। সর্ব্বদিকে মৃত্তিকাবরণ, মধ্যে ফাঁক, এইরূপ এক একটী পৃথিবীর মধ্যগত স্থানের নাম পাতাল। এরূপ পাতাল উপর্য্যুপরি সাতটী। এবম্বিধ পাতাল সপ্তকের প্রত্যেক পাতালে অর্থাৎ প্রত্যেক বহুযোজনব্যাপী ফাঁকের মধ্যে মধ্যে স্তম্ভের (পিল্‌পার) ন্যায় পদার্থ আছে, সে গুলি দিগ্‌গজ নামে প্রসিদ্ধ। লৌহশলাকায় ৭টী অপূপ (চিতি পিঠা) পর পর সাজাইয়া বিদ্ধ করিলে যেরূপ সংস্থান হয়, সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের শিকড়ে উক্ত সপ্ত পাতাল পর পর সেইরূপে গ্রথিত হইয়া আছে। তাহাতে সেই সেই বৃহৎ বিবরের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বিবর থাকা সজ্ঘটন হইয়া আছে। সর্ব্ব নিম্ন ছিদ্রে নরক ও নারকী জীবের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণকারেরা বলেন, এই সপ্ত পাতাল পৃথিবীর মধ্যে বটে, পরন্তু সর্ব্বত্র নহে। পৃথিবীর যে প্রদেশে জম্বুদ্বীপ বা জম্বুখণ্ড, তাহারই মধ্যবিভাগে অবস্থিত। পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। অন্যান্য দ্বীপের অধোভাগে পাতাল নাই। সে সকল দ্বীপ নীরেট্।

† পুরাণে ইহা স্বর্ণলিঙ্গাত্মা শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ।

পরাজিত করিয়া দশ কোটি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন[২০]। উক্ত প্রকারে সেই দানবপতি বলি দেবদানবগণের গমনাগমনযুক্ত তাদৃশ পাতাল-লোকে আবর্ত্তনশীল বহুযুগ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্য ভোগে অতিবর্ত্তিত করিলেন। পরে সহসা বিষয় ভোগে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইলেন। একদা তিনি রত্ননির্ম্মিত হর্ম্ম্যের বাতায়ন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে সংসারগতি চিন্তা করিতে লাগিলেন[২৫।২৭] অহো! আমি আর কত কাল এরূপ অক্ষুণ্ণশক্তি থাকিয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিব এবং আর কত কালই বা বিহার করিব[২৮]। এই অদ্ভুত সাম্রাজ্য ভোগে আমার কি হইতেছে[২৯]? এই ভোগ যদিও আপাত মধুর, কিন্তু অবশ্যই ইহা ক্ষয়শীল, অতএব ইহাতে সুখ কি[৩০]? পুনঃ পুনঃ দিনের উৎপত্তি ও শর্ব্বরীর সংস্থিতি এবং পুনঃ পুনঃ শয়ন ভোজন প্রভৃতি কর্ম্ম, ভাবিয়া দেখিলে পরিতোষের বিষয় নহে, প্রত্যুত লজ্জারই বিষয়[৩১]। কাল্ কান্তালিঙ্গন, আজ্ও আবার কান্তালিঙ্গন। কাল্ ভোগ ও ভোজন, আজ্ আবার সেই ভোগ ও সেই ভোজন। একি অদ্ভুত শিশুক্রীড়া! যাহারা মহৎ, অবশ্যই ইহা তাহাদের লজ্জাজনক[৩২]। প্রতিদিবস একই প্রকার ভুক্তবিরস ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, বুদ্ধিমান্ লোক ইহাতে লজ্জিত না হয় কেন[৩৩]? আবার দিন, আবার রাত্রি, আবার কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান, এ কি অদ্ভুত বিড়ম্বনা! বুদ্ধিমান্ লোক বুঝিয়াও বুঝে না[৩৪]। জল যেমন উর্ম্মিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিরূর্ম্মি হয়, তেমনি এই সমস্ত জনগণও পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ারত হইতেছে[৩৫]। জনগণের এরূপ সংসারচেষ্টা উন্মত্ত-চেষ্টার অনুরূপ ও বাললীলার ন্যায় উপহাস জনক[৩৬]। নিত্য নিত্য কৃতকার্য্যের অনুষ্ঠানে ফল কি? এমন কার্য্য কি আছে, যাহার অনুষ্ঠান করিলে পুনর্ব্বার আর কর্ম্ম করিতে হয় না[৩৭]? উপহাস জনক এই মহাড়ম্বর আর কত কাল? এবং ইহাতে লাভই বা কি[৩৮]? এই বস্তুশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক শিশুক্রীড়ার ন্যায় ক্রীড়া কেবল দুঃখপরম্পরার নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার অনুষ্ঠানে কোনও প্রকার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে পাই না[৩৯।৪০]। ইহাতে অতি যৎসামান্য ও ক্ষণিক বিষয় সুখ ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অতএব, নিরতিশয় সুখ কোথায় ও কিসে আছে, এক্ষণে তাহাই আমার অনুসন্ধানীয়[৪১]।

হে রাঘব! মহারাজ বলি আপনা আপনি ঐরূপ চিন্তা করতঃ ধ্যাননিরত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ওঃ আমার স্মরণ হইয়াছে[৪২]। পূর্ব্বে আমার আত্মতত্ত্বজ্ঞ পিতা বিরোচনকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে মহামতে! যাহাতে সর্ব্ব প্রকার দুঃখ ও সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার সুখের শান্তি বিদ্যমান আছে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে সংসার সীমার অন্তস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এরূপ বস্তু কি? হে তাত! কোন্ বস্তুতে মোহ প্রশমিত হয়, কোন্ বস্তু সর্ব্ব প্রকার বাসনার অতীত, কোন্ বস্তু পুনরুৎপত্তিরহিত ও কাহাতেই বা চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারা যায়[৪৩।৪৫]। অপিচ, কি প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণ এই দেহে সকল সুখ লাভ অপেক্ষা সমধিক তৃপ্তি লাভ করেন[৪৬।৪৭]? এবং কোন্ বস্তু দর্শন করিলে দর্শনের সম্যক্ তৃপ্তি হয়? এই সমস্ত ভোগপরম্পরা সুখাবহ নহে, ইহা শিশুগণকেও ক্ষুব্ধ ও মনোমোহে নিপাতিত করে। হে তাত! যাহা সুন্দর আনন্দজনক ও যাহাতে অবস্থিত হইলে আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারি, তাহাই আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[৪৮]। আমার পিতা এই প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ নিশাকর করস্পর্শে দ্বিগুণিত সৌন্দর্য্য অমৃতরসসম্পূর্ণ কল্পতরুতলে উপবিষ্ট হইয়া মদীয় অজ্ঞানভ্রম নিবারণার্থ যে জরামরণ নিবারণ মধুর বচনাবলি বিন্যাস সহকারে বলিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে সমাগত হইয়াছে[৪৯]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

-০()০()০-

বিরোচন আমাকে সস্নেহ সম্বোধনে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! এক অতি বিস্তীর্ণ দেশ আছে—যাহাতে এমন বহুসহস্র ত্রৈলোক্য পর্য্যাপ্ত হয় (অর্থাৎ স্থিতি প্রাপ্ত হইতে পারে)[১]। তথায় সাগর, পর্ব্বত, বন, তীর্থ, নদী, সরোবর, পৃথিবী, পবন, চন্দ্র, সূর্য্য, লোকেশ ব্রহ্মা, দেব, দানব, ভূত, যক্ষ, রাক্ষস, গুল্ম, বনশ্রী,[*] কাষ্ঠ, তৃণ, ভূত, স্থাবর, জঙ্গম, জল, অনল, দিক্, ঊর্দ্ধ, অধঃ, স্বর্গ, আতপ, কিছুই নাই। আমি তুমি, এমন কি, হরিহর প্রভৃতিও নাই[২।৫]। সেই দেশে এক মাত্র রাজা আছেন—তিনি মহান্, মহাদ্যুতি, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বগ ও সর্ব্বময়[৬]। (এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ সন্দর্ভে পরমাত্মাকে রূপক বর্ণনায় রাজা বলা হইয়াছে)। এই রাজা এক মন্ত্রী কল্পনা করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রী সমস্ত মন্ত্রণায় দক্ষ, অঘটন ঘটনে এবং ঘটন অঘটনে সমর্থ[৭]। সে নিজে কোন কিছু ভোগ করিতে পারে না ও জানে না। যে কিছু করে—সমস্তই রাজার নিমিত্ত এবং যাহা কিছু জানে—সমস্তই রাজার সাহায্যে। এই মন্ত্রীই সেই মহীপতির সর্ব্বকার্য্যের এক মাত্র কর্ত্তা। রাজা সর্ব্বক্ষণই একান্তে অবস্থান করেন[৮।৯]। (রূপক বর্ণনায় মনকে মন্ত্রী বলা হইয়াছে)।

বলি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামতে! আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত সে দেশ কি? বা কোথায়? কি প্রকারেরই বা সে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন্ ব্যক্তি সে দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন। আর সেই রাজাই বা কে? মন্ত্রীই বা কে? তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন। যে আমরা অবলীলাক্রমে সমস্ত জগৎ বিশীর্ণ করিতে সমর্থ হই, আমরা তাঁহাকে জয় করিতে পারি না, এরূপ বলবান্ মন্ত্রী কে? আমরা তাঁহাকে জয় করিতে পারি না, তাহার কারণ কি? মর্ম্মই বা কি? এই সকল বিষয় বিষদরূপে কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়াকাশস্থ সংশয়রূপ অম্বুদমণ্ডল তিরোহিত করুন[১০।১২]।

বিরোচন বলিলেন, পুত্র! লক্ষ লক্ষ দেব ও অসুর সমবেত হইয়াও সেই বলবান্ মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে পারে না। সে যদি ইন্দ্র, যম, কুবের, অমর বা কোন অসুর হইত তাহা হইলে তুমি তাহাকে জয় করিতে পারিতে[১৩।১৪]। প্রস্তরে উৎপলাঘাত করিলে প্রস্তরের কিছুই হয় না, অধিকন্তু উৎপলই শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহার ন্যায়, সেই মন্ত্রিপুরুষে অসি, মুষল, প্রাস, বজ্র, চক্র, গদা প্রভৃতি বিফলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৫]। সে অস্ত্রশস্ত্রাদির বধ্য ও সৈনিকগণের গ্রাহ্য নহে বলিয়া সমুদায় দেবাসুর তাহার বশ্য[১৬]। যেমন প্রলয়বায়ু সুমেরু প্রভৃতি নিপাতিত করে তাহার ন্যায় সেই মন্ত্রীই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি মহাসুর দিগকে বশীভূত করিয়া বিষ্ণুর দ্বারা বিনিপাতিত করিয়াছিল[১৭]। নারায়ণাদি দেবগণ সকল লোকেরই জ্ঞানোপদেষ্টা, পরন্তু সেই মন্ত্রী তাঁহাদিগকেও ভৃগুশাপাদি নিমিত্ত উপস্থিত করিয়া গর্ভরূপ গর্ত্তে নিবেশিত করিয়াছিল[১৮]। পঞ্চশর স্মর তাহারই প্রসাদে এই লোকত্রয় সগর্ব্বে আক্রমণ করতঃ সম্রাটের ন্যায় বিরাজ করিতেছে[১৯]। যাহার আকৃতি অতি কদর্য্য, যাহার প্রভাবে সুর ও অসুর সকলেই অস্বাধীন বা অধৈর্য্য, সেই গুণহীন দুর্ম্মতি ক্রোধ সেই মন্ত্রিবরের প্রসাদেই সগর্ব্বে বিহার করে[২০]। সহস্র সহস্র দেবাসুরগণের যে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম হইয়াছে তাহাও সেই মন্ত্রীর ক্রীড়া[২১]। হে পুত্র! সেই মন্ত্রী যদি তাহার সেই প্রভু কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তবেই সে সুজেয়; নচেৎ সে অচলোপম[২২]। যে কালে তাহার সেই প্রভুর ইচ্ছা হয় যে আমি আমার মন্ত্রীকে জয় করিব সেই কালে সে সেই প্রভু কর্ত্তৃক অতি যৎসামান্য যত্নে (অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রে) জিত হইয়া থাকে[২৩]। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন লোকে যত বলবান্ আছে, উক্ত মন্ত্রী সে সমস্তেরই মল্ল অর্থাৎ জেতা। এই যে তিন্ জগৎ, এ সমস্তই তাহার নিকট ম্রিয়মান। তোমার যদি তাদৃশ মন্ত্রীকে জয় করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তদপেক্ষা অধিক পরাক্রমী[২৪]। উক্ত মন্ত্রীরূপ সূর্য্য উদিত হইলে এই ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মসরোবর বিকাশপ্রাপ্ত ও অস্তগত হইলে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৫]। হে সুব্রত! যদি তুমি একমাত্র ব্যামোহ বিহীন (ব্যামোহ বিহীন বুদ্ধি=বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবির্ভাব যুক্ত জ্ঞান) বুদ্ধির দ্বারা উক্ত মন্ত্রীকে

জয় করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ধীরপদবাচ্য হইতে পার[২৬]। উক্ত মন্ত্রীকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় অজেয় লোক জয় করিতে পারা যায়। তোমার লোকত্রয় জয় আর উক্ত মন্ত্রীর জয় সমান কথা নহে। যদি উক্ত মন্ত্রী অজিত থাকে তাহা হইলে তোমার সমুদায় জয় বৃথা। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ সিদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে কষ্টচেষ্টায় দ্বারাও উক্ত মন্ত্রীকে জয় করিবার জন্য যত্নশীল হও। উক্ত অতিবলশালী মন্ত্রী কর্ত্তৃক সুর, দানব, নাগ, যক্ষ, নর, মহোরগ ও কিন্নর এতৎ সমবেত এই ত্রিজগৎ বিবশীকৃত হইয়া রহিয়াছে[২৭।২৯]।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ সর্গ।

বলি কহিলেন, কোন্ উপায়ে উক্ত মহাবল মন্ত্রীকে জয় করিতে পারা যায় এবং সেই মহাবীর্য্যশালী মন্ত্রীই বা কে? তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[১]। বিরোচন বলিলেন, হে তনয়! সেই অজেয় ভাবে অবস্থিত মন্ত্রীকে যে প্রকারে জয় করিতে পারা যায়, তাহা বলি, শ্রবণ কর[২]। হে পুত্র! যদি তুমি তাহাকে যুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। কিন্তু যুক্তি ত্যাগ করিলে সে তোমাকে উদ্ধত আশীবিষের ন্যায় দগ্ধ করিবে[৩]। যাঁহারা তাহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন করিয়া অবশেষে যুক্তির দ্বারা নিয়মিত করিতে থাকেন, (নিয়মিত=নিয়মে রাখা। নিয়ম=মধ্যে মধ্যে অল্প বিষয় প্রদান করা ও অধিক সময় বিষয়ের প্রতি দোষার্পণ করতঃ বিষয় হইতে বিমুখ হওয়া,) তাঁহারা তদীয় প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সেই রাজার দর্শন লাভ করিয়া তৎপদ প্রাপ্ত হন[৪]। পূর্ব্বোক্ত রাজা দৃষ্ট হইলেই মন্ত্রী বশীভূত ও মন্ত্রীকে আক্রম করিতে পারিলেই রাজা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন[৫।৬]। রাজা যদি অদর্শন গোচরে থাকেন, তাহা হইলে সেই দুর্মন্ত্রী অত্যন্ত দুঃখ ফল প্রদান করে এবং মন্ত্রী যদি নির্জ্জিত না হয় তাহা হইলে রাজাও দুর্লভদর্শন হইয়া থাকেন[৭]। সেইজন্য, একই সময়ে রাজদর্শনের ও মন্ত্রী-জয়ের চেষ্টা অভ্যস্ত করিতে হইবে[৮]। হে পুত্র! যদি তুমি পুরুষকার ও উৎকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা অল্পে অল্পে উক্ত উভয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পার তাহা হইলে তুমি অনায়াসে সেই শুভ দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবে[৯]। উক্ত উভয় অভ্যস্ত হইয়া যখন ফল প্রসব করিবে তখন তুমি সেই দেশে যাইবে এবং সে দেশে গেলে তখন আর তোমার অল্পমাত্রও শোক থাকিবে না[১০]। সে দেশে এমন সকল সাধু বাস করেন যাঁহা-দের আয়াস নাই, যাঁহাদের অন্তর নিত্য প্রমুদিত, এবং সংসার উপশম প্রাপ্ত[১১]। হে পুত্র! সে কোন্ দেশ তাহাও বলি, শ্রবণ কর। পুত্র! দেশ নাম দিয়া যাহার কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত দুঃখবিনাশন মোক্ষ।

আর রাজা নাম দিয়া যাহাকে বলিয়াছি, তিনি ভগবান্ সর্ব্বপদাতীত আত্মা। হে মহামতে! তিনি যে মন্ত্রী কল্পনা করিয়াছেন সে মন্ত্রী মন[১২।১৩]। যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড ঘটভাবে ও ধূম মেঘরূপে পরিণত হয় তেমনি উক্ত মন এই বিশ্বাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব, উক্ত মন বিজিত হইলে সমস্তই জিত হয় সত্য; পরন্তু সে অতিশয় দুর্জ্জয়। তাহাকে জয় করিতে হইলে একমাত্র যুক্তি অবলম্বন করা আবশ্যক[১৪।১৫]।

বলি কহিলেন, পিতঃ! যে যুক্তিতে মন পরাজিত হয়, তাহা আমাকে বলুন। বিরোচন কহিলেন, পুত্র! বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি[১৬।১৭]। উক্ত যুক্তি অবলম্বন করিলে মনোরূপ উন্মত্ত মাতঙ্গ ঝটিতি অবনত হয়, কিন্তু অভ্যাস ব্যতিরেকে কদাচ অনাস্থা প্রবর্ত্তিত হয় না, স্থিতি লাভও করে না। হে পুত্র! ঐ যুক্তি দুষ্প্রাপ্যও বটে, সুপ্রাপ্যও বটে। অভ্যস্ত না হইলে দুষ্প্রাপ্য, অভ্যস্ত হইলে সুপ্রাপ্য[১৮।১৯]। হে তনয়! উক্ত যুক্তি ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা দৃঢ় হইলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিষয়ের প্রতি অরতি অর্থাৎ নিস্পৃহতা দিন দিন প্রকট প্রাপ্ত হইতে থাকে[২০]। আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও বিনা অভ্যাসে উহা উপার্জ্জিত হয় না[২১]। এই সংসার গর্ত্ত মধ্যে দেহীরা তত-কাল দুঃখে পরিভ্রমণ করে যতকাল বিষয়ারতি প্রাপ্ত না হয়[২২]। এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি বিনা অভ্যাসে বিষয়ারতি লাভ করিতে পারেন নাই[২৩]। অতএব, দেহধারী দিগের কর্ত্তব্য—তাহারা পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয়ত্যাগী হইয়া অজস্র অভ্যাস করতঃ ভোগারতিকে বিবৃদ্ধি করিতে থাকিবেন[২৪]। হে পুত্র! পুরুষকার অর্থাৎ দৃঢ়তর শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন (চেষ্টা) ব্যতীত শুভ লাভের সম্ভাবনা নাই[২৫]। লোকে যে দৈবের কথা বলে তাহা অন্য কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ নহে। যাহার নাম ভবিতব্য, যাহার নাম নিয়তি, তাহাই দৈব শব্দের অভিধেয়। উক্ত দৈবও পুরুষার্জ্জিত। যাহা যাহার যে সময়ে সম্পন্ন হয়, হর্ষ বা অমর্ষ বিনাকারণে অথবা অদৃষ্ট কারণে উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থলে লোকে দৈব শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকে। দৈব নিয়তিরই রূপ বিশেষ এবং তাহাও পুরুষকারের ফল। পুরুষকার প্রয়োগ পূর্ব্বক পুরুষ যাহা সঙ্কল্প করে, দৃঢ়তা জন্মিলে প্রায় তাহা তাহাই হইয়া থাকে, ইহা প্রায়ই লোক মধ্যে দৃষ্ট হয়[২৬।২৭]। অমুক কর্ম্মের অমুক ফল, ইত্যাদি নিয়মের নাম নিয়তি। তাহাও মনোজন্মা। অতএব,

মনই সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা। মন সুদৃঢ় সঙ্কল্পে যাহা কল্পনা করে তাহা নিয়তি নামে গণ্য হইয়া যোগ্য কালে সেই সেই ফলে পরিণত হয়। এতদনুসারে স্থির হয় যে, চিত্তই কর্ম্মনিয়তির ও ফলনিয়তির যোজক। হে রাঘবেন্দ্র! আমাদের বিবেচনায় চিত্তই জীব, তাহা এই জগৎকোষে আকাশে বায়ুর প্রস্ফুরণের ন্যায় স্ফুরিত রহিয়াছে। তাহারই উপার্জ্জিত নিয়তি তাহাকে বিহিত কর্ম্ম করায় এবং কখন বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায়[৩০]। [৩২]। অতএব, যাবৎ মন তাবৎ দৈবই বল আর নিয়তিই বল, বিদ্যমান থাকে। হে সাধো! মন অস্তমিত হইলে তখন আর কি নিয়তি কি দৈব সমস্তই অস্তমিত হয়।

যে সকল জীব ইহ লোকে কর্ম্মজ্ঞানাধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সে সকল জীবের সঙ্কল্প অব্যাহত। তাহারা স্বাধীন পুরুষকার অবলম্বনে বৈরাগ্যাদি আহরণ করতঃ ব্রহ্মাত্মভাবেই নিমগ্ন থাকে। হে পুত্র! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, ইহ লোকে পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছু নাই[৩৩।৩৬]। অতএব, অত্যুৎকৃষ্ট পুরুষকারের (শাস্ত্রোক্ত যত্নের) আশ্রয়ে থাকিয়া ভোগের প্রতি অনাস্থা অর্জ্জন করিবে; যাবৎ না ভোগের প্রতি অনাস্থা জন্মে তাবৎ পরমা শান্তি লাভ হয় না। মোহদায়িনী বিষয়রতি যতকাল থাকিবেক ততকালই সংসারদোলায় দোলায়িত হইবে। হে পুত্র! অভ্যাস ব্যতীত দুঃখদায়িনী ভোগদুরাশার নিবৃত্তি হয় না[৩৭।৪০]।

বলি বলিলেন, হে অসুরেশ্বর! সেই ভোগবৈরাগ্য যেরূপে স্থিতি লাভ করে তাহা আমাকে বলুন[৪১]। বিরোচন বলিলেন, দানবরাজ! কেবল মাত্র আত্মদর্শন দ্বারা উহা নিরূঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকে। আত্মদৃষ্টি লতা স্থানীয়া, তাহা মোক্ষ ও ভোগবৈরাগ্য, এই দ্বিবিধ ফল প্রদান করে [৪২]। যেমন পদ্মগর্ভে শোভা অবস্থিতি করে তাহার ন্যায় আত্মসাক্ষাৎকারে উত্তম বিষয়বিরতি অবস্থিতি করে[৪৩]। অতএব হে মহামতে! তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা পরিচালিত বিচার দ্বারা আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করতঃ বিষয় বিরতি প্রাপ্ত হও[৪৪]। অব্যুৎপন্ন চিত্তকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগ ভোগাদিতে, এক ভাগ শাস্ত্রাদি শ্রবণে ও অপর এক ভাগ গুরুশুশ্রূষাদ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ব্যুৎপত্তি জন্মিলে এক ভাগ ভোগ দ্বারা, দুই ভাগ গুরুশুশ্রূষাদ্বারা ও

এক ভাগ শাস্ত্রার্থচিন্তন দ্বারা পূর্ণ করিবে। যখন ব্যুৎপন্ন হইবে তখন দুই ভাগ শাস্ত্র ও বৈরাগ্যাভ্যাস এবং অপর দুই ভাগ ধ্যান ও গুরু-পূজার দ্বারা পূর্ণ করিবে[৪৬,৪৭]। ক্রমে সাধুতা প্রাপ্ত ও জ্ঞানকথা শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র হইবে। ধীরে ধীরে চিত্ত বালককে যুক্তিপূর্ণ পবিত্র কথা শ্রবণ করাইবে এবং শাস্ত্রার্থের দিকে পরিণামিত ও সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিতে থাকিবে[৪৮,৪৯]। ঐরূপ করিলে চিত্ত দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করিবে, উৎকৃষ্ট জ্ঞানে পরিণত হইবে এবং স্ফটিক মণির ন্যায় শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া বিরাজ করিবে[৫০]। এই অবস্থায় ভোগ কি? ভোক্তা কে? দেহ কি? সমস্ত তত্ত্বই দৃষ্ট হয়[৫১]। অতএব হে পুত্র! তুমি ইহাই মনে রাখিবে যে প্রজ্ঞাবিচারে পরায়ণ হইয়া ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শমতা ও আত্মদৃষ্টি গ্রহণ করিবে[৫২]। পরমাত্মা দর্শন তৃষ্ণানাশের মূল এবং তৃষ্ণানাশ পরমাত্মদর্শনের বীজ। যেমন দীপ ও দশা (পলিতা) পরস্পর পরস্পরের সহায়, তাহার ন্যায়, ঐ দুই দৃষ্টি পরস্পর পরস্পরের সহায়[৫৩]। ভোগাস্বাদ বিনষ্ট ও পরাৎপর দেবের দর্শন হইলে অনন্ত ও নিত্য বিশ্রাম উদিত হয়। আত্মবিশ্রান্তি ব্যতীত জীবের নিবৃত্তি লাভের ও প্রবৃত্তি বিনাশের সম্ভাবনা নাই[৫৪,৫৫]। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থপর্য্যটন, কিছুতেই নিবৃত্তি বা অনন্ত সুখ লাভ হয় না এবং বিনা আত্মজ্ঞানে ভোগবিরতিও হয় না। যদি নিজের সঙ্কল্পযত্ন না থাকে তবে কোনও যুক্তি আত্মদর্শনে সমর্থ হয় না[৫৬,৫৭]। হে পুত্র! প্রযত্ন বিশেষ অবলম্বন ব্যতীত শ্রেয়োলাভ ও ভোগত্যাগ জনিত পরমার্থ বিজ্ঞান এবং ব্রহ্মপদ বিশ্রান্তি ব্যতীত পরম সুখ লব্ধ হয় না[৫৮,৫৯]। সেইজন্য বলিতেছি—তোমার মতি যাহাতে সেই পরম কারণে নিবিষ্ট হয় তাহা কর। তুমি পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে বিদূরিত কর[৬০]। পণ্ডিতগণ বলেন, ভোগই মোক্ষ দ্বারের অর্গল; সেই জন্য তাঁহারা ভোগের নিন্দা করেন। ভোগ অতি গর্হিত পদার্থ, এতদ্রূপা বুদ্ধি স্থির হইলে বিচাবপ্রবৃত্তি জন্মে। ভোগগর্হণায় বিচার, আবার বিচারে ভোগগর্হণা, পরস্পর পবস্পরের অভাব পূরণ করে। যেমন সমুদ্র ও মেঘ। ভোগগর্হা, বিচার ও আত্মানুসন্ধান, এই তিন্ সমবেত হইলে অর্থসিদ্ধি হয়। প্রথমে পুরুষকার অবলম্বনে দৈবকে পরাভূত করতঃ ভোগে অরুচি উৎপাদন করিবেক, তথা দেশ, আচার

ও বান্ধবগণের অবিরোধে ও মতে ধন উপার্জ্জন করিবেক। পরে সেই ধন দ্বারা দ্রব্য ও সদ্‌গুণশালী বান্ধব অর্জ্জন করিবেক[৬১।৬৬]। তাহাদের সংসর্গে ভোগগর্হার প্রবৃত্তি, তৎপরে বিচার, তৎপরে শাস্ত্রার্থ-বোধযোগ্য জ্ঞান, তৎপরে শাস্ত্রার্থের অবধারণ, তৎপরে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি। যখন তুমি বিষয়বৈরাগ্যবান্ হইবে সেই কালে বিচারের ফল পরম পদ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সেই ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তিই অতিপবিত্র সর্ব্ববিশ্রান্তি[৬৭।৬৯]। ব্রহ্ম পদে বিশ্রান্ত হইলে তখন আর কল্পনাপঙ্কে ও দুঃখে নিপতিত হইবে না। হে শুদ্ধস্বভাব! হে ব্রহ্ম! তোমাকে আমার নমস্কার হউক[৭০]। * বৈধরূপে ধন উপার্জ্জন, অল্প পরিমাণে ধনের নিন্দা, ধনের দ্বারা সাধু সজ্জন সংগ্রহ, তৎ সংসর্গে ধনের অবহেলা, তৎপরে বিচার, তৎপরে আত্মলাভ[৭১]।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* চিত্ত সহজে বশ্য হয় না এবং বৈরাগ্যও সহজে হয় না। অতিকষ্টে ও অল্পে অল্পে অভ্যাস বিশেষ দ্বারা ঐ দুই বিষয় আয়ত্ত করিতে হয়। তাহারই ক্রম বা প্রণালী "চিত্তস্য ভাগৌ দ্বৌ" ইত্যাদি শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভোগের দ্বারা চিত্তের দুই ভাগ, শাস্ত্র চর্চ্চার দ্বারা এক ভাগ এবং গুরুসেবার দ্বারা এক ভাগ, এ কথার তাৎপর্য্য—প্রথমে দিবসের একার্দ্ধ মাত্র দেহ রক্ষার উপযোগী চেষ্টা করিবেক। অপরার্দ্ধের অর্দ্ধেক শাস্ত্রানুশীলনে ও অর্দ্ধেক গুরু সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার সেবাদিতে মন নিবিষ্ট রাখিবেক। তাহাতে অনেক প্রশ্ন ও সন্দেহ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা। ক্রমে দিবসের চারিভাগের এক ভাগ দেহ রক্ষার উপযোগী চেষ্টা, দুই ভাগ গুরুসেবায় ও এক ভাগ শাস্ত্রার্থ চিন্তা। তৎপরে দিবসের দুই ভাগ শাস্ত্রার্থ দর্শনে ও বৈরাগ্যে ও দুই ভাগ ধ্যানে ও গুরুসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিবেক। এ অবস্থায় দেহযাত্রা নির্ব্বাহের দিকে দৃষ্টি রাখিবেক না, তাহা যথোপস্থিত নিয়মে সম্পন্ন হইবেক। এই অবস্থা যখন স্থায়ী বা অবিচাল্য হয় তখনই জীব শ্রবণাধিকারী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের যোগ্য পাত্র হয়, পরে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারান্তে জীবন্মুক্তি রূপ স্থিতি লাভ করে। বিরোচন এইরূপ বলিয়া শুদ্ধস্বভাব আত্মার স্মরণ করিয়া তদুদ্দেশে নমস্কার করিলেন এবং তাদৃশ চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

-◌()◌()◌-

বলি পিতৃসকাশে শ্রুত ঐরূপ ঐরূপ পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে বিচারজ্ঞ পিতা আমাকে যে সকল কথা বলিয়া ছিলেন, ভাগ্যক্রমে সেই সকল কথা আজ্ আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছে এবং ভাগ্যক্রমেই আজ্ আমি উৎকৃষ্ট প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি[১]। এত দিন পরে আজ্ আমার ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে বিনিবৃত্ত হইল। এত দিন পরে আজ্ আমি সুন্দর, স্বচ্ছ ও অমৃতশীতল শান্তি সুখ প্রাপ্ত হইলাম[২]। এত দিন আমি পুনঃ পুনঃ আশার অনুগমন, ধন আহরণ ও কান্তার প্রার্থনা পূরণ করিয়া বৃথা কষ্ট পাইয়াছি[৩]। অহো! শান্তি স্থান কি রম্য ও কি সুশীতল! এস্থানে আগমন করিলে সমুদায় সুখ দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এখন আমি সমান অর্থাৎ এক রসে অবস্থিত সুতরাং শান্তি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। চিত্ত চন্দ্রার্পিত হইলে যেরূপ হৃষ্ট হয়, আজ্ আমার চিত্ত তদপেক্ষা অধিক হৃষ্ট হইতেছে[৪।৫]। বিভব অর্জ্জন করিতে মনকে দেশে দেশে পাঠাইতে হয়, তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিতে হয়, কত উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে হয়, কত ক্লেশ অনুভব করিতে হয়, সুতরাং বিভব অর্জ্জন সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখই[৬]।। ইতিপূর্ব্বে আমি যে স্ত্রীর অঙ্গে অঙ্গযোজনা ও মাংসের দ্বারা মাংস পীড়ন করিয়া প্রীত হইতাম, তাহা আমার মোহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭]। পণ্ডিতগণ যাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন, সেই উৎকৃষ্ট বৈভব আমি দৃষ্ট ও স্ববশীভূত করিয়াছি, অব্যাহত রাজ্যভোগাদি ভোগ করিয়াছি, সমুদায় প্রাণীকে স্বসামর্থ্যে নত করাইয়াছি, তাহাতে আমার কি সুখ হইয়াছে? যাহা সুখ, শাশ্বত সুখ, তাহা সংসারে নাই তাহা সংসারের অতীত[৮]। সংসারে আজ্ যে ভোগ, কাল্ও সেই ভোগ। আজ্ যে কার্য্য, কাল্ও সেই কার্য্য। সুতরাং কি ঐহিক কি পারত্রিক, কোনও ভোগের সারতা ও চমৎকারিতা নাই। সমস্তই চর্ব্বিতচর্ব্বণ মাত্র[৯]। অতএব, আজ্ হইতে আমি সমস্ত পরিহার করিয়া আপনি আপনার

বুদ্ধি মাত্র অবলম্বনে স্বস্থ থাকিব[১০]। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ, কুত্রাপি সারবৎ সুখ নাই। স্ত্রী বল, রত্ন বল, সমস্তই অসার, তুচ্ছ এবং সমস্তই কালের ভক্ষ্য[১১]। এত কাল আমি যে তুচ্ছ জগৎ রাজ্যের জন্য অমর দিগের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছি, তাহা আমার মূর্খতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১২]। মনের বিনির্ম্মিত জগৎ অজ্ঞ লোকের পক্ষে ব্যাধিবিশেষ। ইহার পরিত্যাগে মহাত্মাদিগের ক্ষতিই বা কি? অনুরাগই বা কি[১৩]? অহো! কি কষ্ট! এত কাল আমি অজ্ঞানান্ধ ছিলাম! যাহা অনর্থ—তাহাকেই আমি অর্থ মনে করিয়া সেবা করিয়াছি[১৪]। আমি অজ্ঞানান্ধ হইয়া কি না করিয়াছি? যাহা করায় আমি এখন অনুতপ্ত[১৫]। যাহাই হউক, গত বিষয়ের চিন্তায় প্রয়োজন নাই। যাহা বর্ত্তমান, তাহারই চিন্তা আবশ্যক। পুরুষকার বর্ত্তমান চিকিৎসাতেই সফল হইয়া থাকে[১৬]। আজ্ আমি অপরিমিতাকার ও সর্ব্বকারণ আত্মায় (ব্রহ্মে) আত্ম-অভেদে অবস্থান করায় সর্ব্বত্র সুখ পূর্ণ দেখিতেছি[১৭]। আমি অদ্যই অজ্ঞান শান্তির নিমিত্ত কুলগুরু উশনসকে অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিব—এই প্রপঞ্চ চক্র কি? আমি কে? এবং কি উপায়ে অহং-জ্ঞান-জ্ঞেয় জীবতত্ত্ব ও তদতীত পরমাত্মতত্ত্ব জানা যায়[১৮]? অপিচ, আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রভু ও প্রসন্নস্বভাব শুক্রকে চিন্তা করিব এবং চিন্তার দ্বারা আহ্বান করিব। অনন্তর তাঁহার উপদিষ্ট অনন্ত বিভবে (আত্মায়) অবস্থান করিব। যাঁহারা মহান্, তাঁহাদের উপদেশ বিফল হইবার নহে; প্রত্যুত অক্ষয় ফলের হেতু হইয়া থাকে[১৯]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাবলশালী বলি ঐরূপ চিন্তা করিয়া অল্প নিমীলিত নেত্রে আকাশবাসী ভগবান্ ভার্গবের ধ্যান করিতে লাগিলেন[১]। কিছু ক্ষণ পরে প্রভু শুক্র বলিকে গুরুপ্রার্থী জানিয়া আপন দেহকে বলির সেই রত্নবাতায়ন সমীপে উপনামিত (আনয়ন) করিলেন[২]। তখন বলি গুরুদেহপ্রভায় পরিমৃষ্ট হইয়া প্রভাত কালের অম্বুজের ন্যায় প্রবুদ্ধ অর্থাৎ হৃষ্ট হইলেন[৩।৪]। এবং রত্নাসন প্রদান, পাদবন্দন ও মন্দারকুসুম সমূহে তাঁহার পূজা করিলেন[৫]। ভগবান্ শুক্র বলি প্রদত্ত রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, বলি কহিলেন[৬], ভগবন্! যেমন সূর্য্যরশ্মি জনগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করে, তদ্রূপ, ভবদীয় অঙ্গপ্রভা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিয়োজিত করিতেছে[৭]। হে প্রভো! আমি মোহপ্রদ ভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছি। যে তত্ত্ব মহামোহাপহারী, এক্ষণে আমি সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি[৮]। হে তত্ত্বজ্ঞ! হে গুরো! এই ভোগজাল কি, আমি কে, আপনি কে, এবং এই সমস্ত জনগণই বা কি? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত তত্ত্ব সত্বর আমাকে উপদেশ করুন[৯]।

শুক্র বলিলেন, দৈত্যরাজ! আমি গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত আছি, এ সময়ে সবিস্তরে বলিতে পারি না। সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর[১০]।

চিৎই আছে, এ সমস্ত চিন্ময় ও চিৎ। তুমি চিৎ, আমি চিৎ, সমস্ত লোকই চিৎ[১১]। যদি তোমার মদুক্ত বাক্যে শ্রদ্ধা, অর্থাৎ বিশ্বাস থাকে এবং যদি তুমি বিবেকী হও, তাহা হইলে তুমি ঐ নিশ্চয়ে সর্ব্বাত্মক বা সর্ব্বপ্রাপ্ত (ব্রহ্মপ্রাপ্ত) হইবে। অন্যথা আমি বহু বলিলেও সে সকল ভস্মে আহুতি প্রক্ষেপের ন্যায় বৃথা হইবে[১২]। চিৎ ও চেত্য উভয়ের সম্বলন (চিৎপদার্থে কল্পনার উদয়) হওয়াই বন্ধ এবং চেত্যনির্ম্মুক্ত (কল্পনাহীন) চিৎ হওয়াই মোক্ষ। কেননা, চেত্যাকারবিমুক্ত চিৎই পরমাত্মা। এই তিন্ কথা সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার[১৩]। যদি তুমি

ঐরূপ নিশ্চয় বা অবধারণ করিয়া আপনাকে দর্শন কর, তাহা হইলে আপনা আপনি আপনাতে অনন্ত পদ প্রাপ্ত হইবে[১৪]। গগনকোষে সপ্তর্ষিগণ অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আমি তথায় গমন করিব; দেবগণের কোন কার্য্য সাধনার্থ তথায় কিছু কাল আমাকে বাঁস অর্থাৎ অবস্থান করিতে হইবে[১৫]। দৈত্যরাজ! যত কাল দেহ থাকে তত কাল মুক্ত পুরুষেরাও কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না[১৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! জলরাশি যেমন প্রবলবেগে গ্রাহগণাকুলিত সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায়, মহামতি ভার্গব ঐ কথা বলিতে বলিতে গ্রহগণমণ্ডিত নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন[১৭]।

ষড়বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভৃগুতনয় শুক্র আকাশে গমন করিলে, ধীমান্ বলি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শুক্র যাহা কহিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। যাহা অহং শব্দের লক্ষ্য তাহাও চিৎ, যাহা লোক-শব্দের বোধ্য তাহাও চিৎ, দিক্ সমুদায়ও চিৎ এবং ক্রিয়া-কলাপও চিৎ[১।২]। কি বহিঃ কি অভ্যন্তর সমস্তই চিৎ। চিদ্ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তু কুত্রাপি নাই[৩]। চিৎ যদি "ঐ আদিত্য" ইত্যাকারে বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ বা ব্যক্ত না করিত তাহা হইলে আদিত্যের সহিত অন্ধকারের কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না। চিৎ যদি "এই পৃথিবী" এইরূপে ইহাকে চেত্য (চিতের বিষয় বা প্রকাশ্য) না করিত তাহা হইলে এই পৃথিবীর পৃথিবীত্ব থাকিত না[৪।৫]। চিৎ যদি "এই দিক্ অর্থাৎ ইহা পূর্ব্ব ও ইহা পশ্চিম" ইত্যাদিপ্রকারে চেতিত (চেতনার দ্বারা প্রকাশ) না করে, তাহা হইলে কি দিকের দিক্ত্ব থাকে? চিৎ যদি "ইহা পর্ব্বত" এইরূপে উদিত বা প্রকটিত না হয় তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে পর্ব্বত আছে? চিৎ যদি জগৎকে "এই জগৎ" এইরূপে অভিব্যক্ত না করে তাহা হইলে জগৎ কোথায় থাকে? চিৎ আকাশাদির আকারে উদিত না হইলে আকাশাদিরও অস্তিতা অসিদ্ধ হয়। এই পর্ব্বতাকার দেহও চিতের অনধিষ্ঠানে অপ্রসিদ্ধ হয়[৬।৮]। ইন্দ্রিয়, শরীর, মন, ইচ্ছা, বাঞ্ছা বা চেষ্টা, সমস্তই চিৎ। অন্তরেও চিৎ, বাহিরেও চিৎ, কার্য্য গুণ ক্রিয়া, উৎপত্তি স্থিতি লয়, সমস্তই চিৎ[৯]। ভোগেচ্ছা ও ভোগ, সমস্তই চিতের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। শরীর কিছু করে না[১০]। চিৎ যদি কিছুই কল্পনা না করে, তাহা হইলে কিছুই উপলব্ধি হয় না। অতএব, এরূপ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠলোষ্ট্রসম শরীরে প্রয়োজন কি? এই অশেষ জগতে আমি একমাত্র চেতনাত্মা[১১]। আকাশে, আকাশস্থ সূর্য্যাদিতে, ভূত সমূহে, সুরবৃন্দে, অসুর সমূহে, স্থাবর ও অস্থাবর পদার্থে, সর্ব্বত্র চিদ্রূপী

আমিই বিদ্যমান। দ্বিতীয়ভাব চিত্তেরই কল্পিত, সুতরাং তাহা অসত্য। যখন দ্বিভাব পরমার্থতঃ অসম্ভব, তখন আর শত্রুই বা কে? মিত্রই বা কে[১২।১৩]? "বলি" এই নামটী শরীরের, আমার নহে। অর্থাৎ চিত্তের নহে। সুতরাং ইহার ছেদ ভেদে চিতের ক্ষতি কি[১৪]? চিৎ-ই দেহাদি রূপে উদিত হইয়া দেহাদি আখ্যা ধারণ করে। ভাব অভাব সমস্তই ঐরূপ। সুতরাং সে সমস্তকে চিৎ বৈ আর কি বলিতে পারি[১৫]? উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলাম, ত্রিভুবনে চিতের অতি-রিক্ত বা চিৎ ছাড়া কিছু নাই[১৬]। দ্বেষ, রাগ, মন, মনোবৃত্তি, কিছুই নাই। শুদ্ধস্বভাব চিতের আবার বিবিধত্ব কি[১৭]? আমি সর্ব্বগ, সর্ব্ব-ব্যাপী, নিত্য, আনন্দময়, বিকল্পকল্পনাতীত, দ্বিতীয়বর্জ্জিত চিদাত্মা[১৮]। "চিৎ" এই নামটী শব্দমাত্র ও কল্পিত। কেননা চিৎ স্বভাবতঃ নির্নাম পদার্থ। তবে, চিতের শক্তি সর্ব্বগামিনী, সে ভাবে তিনি শব্দাত্মিকাও বটে[১৯]। আমি দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্ত অমলরূপবান্ নিত্যোদিত, নিরাভাস, দ্রষ্টা পরমেশ্বর[২০]। চিতের স্বরূপ নিরাকার। তবে তাহাতে যে কল্পিত আকার প্রকট হয় তাহা আভাস মাত্র। অর্থাৎ যেমন্ জলে চন্দ্র-বিম্বের আকার প্রকট হয় তাহার ন্যায়। (যে হেতু জীবত্বাদিভাব কল্পিত ও প্রতিবিম্বস্থানীয়, সেই হেতু সে সকল মিথ্যা বা অবাস্তব)। অতএব, চেত্যানুরঞ্জনারহিত সুতরাং বিমুক্ত ও কেবল ভারূপী চিৎ যাহা আমার স্বরূপ—তাহার জয় হউক[২১।২২]। হে প্রত্যগাত্মন্! চেতনরূপিন্! হে চিৎ! তোমাকে নমস্কার। সমস্তবস্তুপ্রকাশক চেত্যবিমুক্ত চিৎস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমিই আমি সুতরাং আমাকেও নমস্কার। আমি অচেত্য, সৎ, চিন্মাত্র, মহৎ, আকাশবৎ অনন্ত, অণু হইতেও সূক্ষ্ম[২৩।২৪]। সুখ দুঃখাদি দশা (অবস্থা) জ্ঞানের জ্ঞাতা ও চেতনের চেতয়িতা আমাকে স্পর্শও করে না। জগৎ পদার্থের কি শক্তি যে আমাকে পরিচ্ছিন্ন করে? করে করুক, পরন্তু আমি দেখিতেছি, সে সকল মদ্‌ব্যতিরিক্ত নহে[২৫।২৭]। আদান প্রদান ধনাদি সমস্তই পরিচ্ছিন্নস্বভাব। তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি সর্ব্বকালবর্ত্তী সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপী[২৮।২৯]। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে আমি চেত্যভাবাক্রান্ত ছিলাম বটে,; পরন্তু তাহা ভ্রমেরই মহিমা। চিৎ যখন একিকা, অর্থাৎ অদ্বিতীয়া, তখন ভ্রমাত্মক সঙ্কল্প বিকল্প উদিত হইয়া তাহার কি করিবে[৩০]? অতএব, আমি এ

সমস্ত লয় করিয়া পরম পবিত্র পরমাত্মায় উপশান্ত হই। পরম কোবিদ বলি এইরূপ চিন্তা করতঃ ওঁকারস্থ অকারাদি মাত্রাত্রয় ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধমাত্রায় মৌন (অর্দ্ধমাত্রা শব্দের প্রতিপাদ্য তুরীয় ব্রহ্ম। মৌন অর্থাৎ সমাহিত) হইলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প ও কল্পনাশূন্য শঙ্কা-বিহীন ত্রিপুটী লীন সুতরাং নির্ম্মল ও শান্তবাত দীপের ন্যায় নিস্পন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। * বলি এবম্প্রকারে শান্তচিত্ত হইয়া সেই রত্ন-বাতায়নে বহুক্ষণ প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তির ন্যায় নির্ম্মল ও নিস্পন্দ ভাবে অতিবাহিত করিলেন[৩১।৩৪]। শরৎকালের আকাশ যেমন মেঘাভাবে নির্ম্মল হয় তাহার ন্যায় এষণাত্যাগী বলি (এষণা=ইচ্ছা প্রভৃতি) মনো-দোষের অভাবে যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল সত্তায় বিরাজ করিতে লাগিলেন[৩৫]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

* অ উ ম্=ওম্। ম্ এই হসন্ত চিহ্নের পরিবর্ত্তে ঁ এইরূপ চিহ্ন দিয়া অর্দ্ধ-মাত্রা বুঝান হয়। অর্দ্ধমাত্রা একটা বর্ণের সঙ্গে ব্যতীত স্বতন্ত্র উচ্চারণ করা যায় না। ব্রহ্মও উপাধিযোগ ব্যতীত পৃথক্ ভাবে উপদিশ্যমান্ হন না। অতএব ঐ অর্দ্ধমাত্রার দ্বারা তুরীয় ব্রহ্ম সঙ্কেতিত হন। উচ্চারণের বা ধ্বনির বিরাম বা লয় স্থান অর্দ্ধমাত্রা এবং জাগ্রতাদি অবস্থার বিরাম বা অতীত স্থান তুরীয় ব্রহ্ম।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দানবেন্দ্র বলি উক্ত প্রকারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইলে তদীয় অনুচরগণ সেই স্ফটিকনির্ম্মিত রত্নখচিত সৌধে আগমন করিল[১]। ডিম্ভ প্রভৃতি বিজ্ঞ মন্ত্রী, কুমুদ প্রভৃতি সামন্ত, সুরাদি রাজা, বৃত্তাদি সেনাপতি, হয়গ্রীবাদি সৈন্য, চক্রজাদি বান্ধব, লড্ডুকাদি সুহৃদ্‌, বল্লুকাদি লালকগণ এবং উপায়নহস্ত কুবের, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর, নাগ প্রভৃতি দেবযোনিগণ, চামরধারিণী রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণ ও ত্রৈলোক্যোদরবাসী সিদ্ধগণ ও অন্যান্য সাগরবাসী, নদীবাসী, শৈলবাসী ভূতগণ নানা দিক্‌ বিদিক্‌ হইতে সেবাবসরাকাঙ্ক্ষী হইয়া বলির সেই কর্পূরধবল সুন্দর গৃহে আগমন করিলেন[২।৩]। দানবেন্দ্রগণ কিরীট অবনত করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে পরমাদরে সেই ধ্যানমৌন সমাধিস্থ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাপ্রায় অচল নিশ্চেষ্ট দানবেন্দ্র বলিকে প্রণাম করিল পরন্তু তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তাঁহার তদবস্থা দর্শন করিয়া উদাসীনগণ বিস্ময়ে, তত্ত্ববিদ্‌গণ আনন্দে ও অনভিজ্ঞগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া জড়ীভূত হইতে লাগিল[৭।৮]। তখন মন্ত্রিগণ "কি করা কর্ত্তব্য" "ইনি এ কি দুর্ব্বোধ্য দশা প্রাপ্ত হইলেন" এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে সর্ব্ববিদ্‌ কুলগুরু ভার্গবের স্মরণ করিলেন[৯]। ভাস্বরবপু ভার্গব চিন্তিত হইবামাত্র কল্পিত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন[১০]। (কল্পিত গন্ধর্ব্বনগর=ভ্রান্তি দৃষ্ট নগরাকার আকাশ। তাহা যেমন মনোবৃত্তির উত্থান মাত্রে দেখা যায় বিলম্ব হয় না, তেমনি অবিলম্বে অসুর গুরু শুক্র অসুর দিগকে দেখা দিলেন।) অনন্তর তিনি অসুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করতঃ ধ্যানমৌনস্থ দানবেশ্বর বলিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি বিতরণ পূর্ব্বক তিনি দেখিলেন, দানবরাজ বলি ক্ষীণসংসারভ্রম হইয়াছেন। পরে তিনি হাস্য সহকারে সেই সভাস্থ জন

সমূহকে অমৃতময় বাক্যে বলিলেন[১১।১৩], হে সভ্যগণ! এই ভগবান্ বলি অত্যন্ত আত্মবিচারদ্বারা সিদ্ধ হইয়া নির্ম্মল পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে দানবসত্তমগণ! ইনি এক্ষণে এই স্থানে এইরূপেই অবস্থান করতঃ অনাময় পদ সন্দর্শন ও আত্মাতে অবস্থান করুন। হে দানবগণ! ইনি এক্ষণে বিশ্রান্ত, ক্ষীণচিত্ত, বিগতভ্রম ও বিমুক্ত হইয়াছেন। নানা সম্ভ্রম-দায়িনী যামিনী পরিক্ষীণ হইলে যেমন সূর্য্যের আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ন্যায়, সমস্ত সম্ভ্রম সংশান্ত হওয়ায় ইঁহাতে পরমালোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অঙ্কুর যেমন কাল প্রাপ্তে বীজ হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায়, ইনি উপযুক্ত কালে আপনা আপনি প্রবুদ্ধ হইবেন[১৪।১৮]। অতএব হে দানবনায়কগণ! তোমরা সকলে আপন আপন অধিকারানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। ইনি সহস্রবর্ষ অতীত হইলে সমাধি হইতে সমুত্থিত হইবেন।

অসুরগুরু ভার্গব এই বলিয়া গমন করিলে, দৈত্যগণ চিন্তাপরায়ণ হইয়া প্রাপ্ত্যবস্থাক্রমে বৈরোচনী সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে রত হইলেন। তখন নরগণ ভূতলে, গ্রহগণ নভোমণ্ডলে, ত্রিদশগণ ত্রিবিষ্টপে, বনচরগণ বনে ও নভশ্চরগণ আকাশে এবং অন্যান্য সমাগত সকলে যথাগত স্থানে গমন করিলেন[১৯।২২]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বলি দৈবপরিমাণের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে দেবদুন্দুভিনির্ঘোষ (দেবদুন্দুভি=স্বর্গীয় বাদ্যবিশেষ) উপলক্ষ্যে প্রবুদ্ধ হইলেন[১]। সূর্য্য উদিত হইলে পদ্মসরোবরের যদ্রূপ শোভা হয়, বলি প্রবুদ্ধ হইলে, তদীয় নগর সেইরূপ শোভা ধারণ করিল[২]। যাবৎ দানবগণ তাঁহার সমীপবর্ত্তী না হইয়াছিল, প্রবুদ্ধ হইয়া তাবৎ তিনি সেই সমাধি স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন[৩]।

অহো! পারমার্থিকী পদবী (পথ) কি সুশীতল। আমি এই পদবীতে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া পরমা বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম[৪]। আমি এই পদবী অবলম্বন করিয়া বিশ্রান্তিলাভই করিব। প্রাপ্তির পথে যাইব না। উপভুক্ত বাহ্য ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন কি? সমাধিসম্ভূত আনন্দরাশি যেরূপ আমার অন্তঃকরণকে সন্তোষ প্রদান করে, চন্দ্রবিম্বও আমার অন্তঃকরণকে তদ্রূপ আনন্দিত করিতে পারে না[৫,৬]।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্রান্তিলাভ ইচ্ছা করিলে, অম্বুদমণ্ডল যেমন চন্দ্রকে বেষ্টন করে, তাহার ন্যায়, দৈত্যগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল[৭]। মহাত্মা বলি তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার চিৎ ক্ষীণবিকল্প হইয়াছে। এখন এমন কি উপাদেয় আছে, আমার মন পুনর্ব্বার যাহার অনুপাতী হইতে পারে? আমার মন পরমসত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে, মৌর্খতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি বুঝিয়াছি যে, বন্ধ বা মোক্ষ দুএর কিছুই নাই। এখন আর আমার ধ্যানে প্রয়োজন কি? ধ্যানশূন্য হইবারই বা প্রয়োজন কি? আমি এখন গতজ্বর হইয়া যথাগত ধ্যান, অধ্যান, ভোগ, অভোগ, সমস্তই সম্পাদন করতঃ সর্ব্বত্র সমতাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিব। আমার পরম তত্বেও বাঞ্ছা নাই, জগৎস্থিতিতেও বাঞ্ছা নাই, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্যেও প্রবৃত্তি নাই এবং বিভবেও ইচ্ছা নাই[৮।১০]। আমি মৃত নহি, জীবিত নহি, সৎ নহি, অসৎও নহি। আমি সর্ব্বত্র সমভাবে বা একরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিতেছি। ঈশ্বরও আমি,

সুতরাং নমস্কারও আমাকে। আমার রাজকার্য্যাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই। রাজলক্ষ্মী গমন করিতে ইচ্ছা করেন, গমন করুন। আমারও কিছু নহে, আমিও কিছুর নহি। আমার কোন কিছু কর্ত্তব্য নাই। যখন আমার কর্ত্তৃত্বে আস্থা নাই, তখন আমার রাজকর্ম্মেও আগ্রহ নাই। কার্য্যসম্পাদন ও অসম্পাদন আমার পক্ষে উভয়ই সমান। এখন যথোপস্থিত কার্য্যে অবস্থান আমার পক্ষে দুষ্কর সুকর কিছুই নহে[১৫।১৮]।

জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য পূর্ণাত্মা বলি এইরূপ নির্ণয় করিয়া দিবাকরের পদ্মিনীদর্শনের ন্যায় সেই অসুর সভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভায় তদীয় কটাক্ষপাতমাত্রে দনুজগণ অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন[১৯।২০]।

দানবেন্দ্র বলি এই দিবস হইতে ধ্যেয়ত্যাগময়াত্মা (ধ্যেয়ত্যাগ কি তাহা বলা হইয়াছে।) সবিকল্প মনোদ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পূজাদ্বারা ব্রাহ্মণ, দেব ও গুরুগণকে, সম্মানদ্বারা সুহৃদ্, বন্ধু, সামন্ত ও সজ্জনগণকে, অর্থদ্বারা ভৃত্য ও অর্থিগণকে, বিচিত্র বিভবদ্বারা পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন[২১।২৩]। এইরূপে কিছুকাল রাজ্য শাসন করতঃ একদা তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন[২৪]। পরে তিনি শুক্রাদি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সাহায্যে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে দেব ও ঋষিগণ পূজিত ও নিখিল ভুবন তর্পিত হইয়াছিল[২৫]। সিদ্ধিপ্রদ মাধব বলি ভোগপ্রার্থী নহে জানিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত সুসিদ্ধ করিতে তদীয় মহামখে (অশ্বমেধযজ্ঞে) গমন করিয়াছিলেন। এবং ভোগকামুক স্ববয়োজ্যেষ্ঠ (কশ্যপপুত্র ইন্দ্র কশ্যপ-পুত্র বামনের অনেক পূর্ব্বে জন্মিয়া ছিলেন) ইন্দ্রকে এই অশেষ ভুবন প্রদান করিবার জন্য মায়াবলে ত্রিবিক্রম * হইয়াছিলেন। ভগবান্ হরি সেই প্রকার কৌশলে বলিকে পাতালকুহরে প্রেরণ ও ইন্দ্রকে ভুবন প্রদান করেন। বলি অদ্যাপি তথায় জীবন্মুক্ত অবস্থায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পুনঃ ইন্দ্র হইবার প্রারব্ধ (অদৃষ্ট) থাকায় বলি নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইতেছেন না, জীবন্মুক্ত অবস্থায় আপদে সম্পদ

* ত্রিবিক্রম—পদত্রয়ে লোকত্রয় আক্রম। নাভি দেশ হইতে এক পদ আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা লইয়া ত্রিপদ গণনা করা হয়। উক্ত পদত্রয়ে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিন্ লোক স্পর্শ বা আক্রম করায় তাঁহাকে ত্রিবিক্রম বলা হয়।

সম দৃষ্টি করতঃ অবস্থিতি করিতেছেন[২৯,৩০]। সুখ বা দুঃখ তাঁহার প্রজ্ঞাকে অভিভূত করিতে পারে না[৩১]। জীবদ্দেহে থাকিলে সহস্র সহস্র ভাব অভাব দৃষ্ট হয়, পরন্তু সে সমস্তই মনের বিলাস। বলি এই রহস্য বিজ্ঞাত হইয়া ভোগবিরত ছিলেন[৩২]। দশ কোটী বর্ষ জগত্রয় শাসনান্তে বলির মন ভোগবিরত ও ক্রমে উপশান্ত হইয়াছিল[৩৩]। বলি জীবৎ জীবগণের সহস্র সহস্র ভাব অভাব দর্শন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি ভোগ বিষয়ে বিরতি ও পরম উপশম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই পাতাল কোটরে ভোগস্পৃহা বর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য আত্মারাম ও পরিপূর্ণ মানসে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন[৩৪,৩৫]। এই বলি পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্ব পদে আরূঢ় হইয়া ত্রিজগৎ শাসন করিয়াছিলেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহার পরিতোষ এবং পুনঃ স্বপদ ভ্রংশে তাঁহার অপরিতোষ দুএর কিছুই হয় নাই[৩৬,৩৭]। তিনি স্বীয় অন্তরে আমি নিত্যনিরঞ্জন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে মুদিতাশয় হইয়া অবস্থান করিতেন[৩৮]।

বৎস! আমি তোমার নিকট বলির বিজ্ঞান প্রাপ্তি বিষয় বর্ণন করিলাম। তুমিও বলির ন্যায় জ্ঞান আহরণ করিয়া উন্নত হও[৩৯]। বলির ন্যায় বিবেক অবলম্বনে "আমি নিত্য, আমার ক্ষয়োদয় নাই" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ পুরুষকার দ্বারা অদ্বৈত পদ প্রাপ্ত হও[৪০]। অসুররাজ বলি দশকোটি বর্ষ ত্রিজগৎ শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাহার বৈরাগ্যই অনুভূত হইয়াছিল। অতএব তুমিও বিরস ভোগকে হেয়জ্ঞান করিয়া আনন্দময় সত্য পদ গ্রহণ কর[৪১,৪২]। তোমার মন যখন যে পদার্থে বালবৎ নিপতিত হইবে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথা হইতে আহ্বান পূর্ব্বক তত্ত্বে নিযুক্ত করিবে। দৃশ্য দৃষ্টি নানাকার ও নানা বিকার জনক। সেজন্য এ সকলকে কমণীয় দৃষ্টিতে দেখিবে না। ঐরূপ করিতে করিতে তোমার উন্মত্ত মন অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া সে সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ংই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেক, তাহাতে তুমি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে[৪৩]। মন যখন ঐহিক পারত্রিক ভোগে ও লোকযাত্রায় অত্যন্ত ধাবমান হইবে তখন তাহাকে হৃদয় কোটরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে[৪৪]। তুমি চিদ্রূপ সূর্য্য, তোমার স্থিতি সর্ব্ব জগতে, তোমার আবার আত্মীয় পর কি? তুমি বৃথা মুগ্ধ হইও না[৪৫]। হে মহাভুজ! তুমি অনন্ত ও পুরুষোত্তম। তুমি নিজেই মায়িক বিবিধ

পদার্থের আকারে বিরাজিত হইতেছ[৪৬]। এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ তোমাতেই প্রোত[৪৭]। তুমি জন্মবান্ নহ, মরণধর্ম্মীও নহ। তুমি অজ ও পূর্ণ পুরুষ। তুমি বিশুদ্ধ চেতনা। জন্ম মরণাদি ভ্রম; তাহা যেন তোমার না হয়। সমুদায় জন্ম নামক রোগের বলাবল বিচার করিয়া তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর[৪৮।৪৯]। তুমিই আছ, তাই তোমাতে সংসারস্বপ্ন দৃষ্ট হইতেছে[৫০]। তুমি বৃথা বিষাদ পরিত্যাগ কর। দুঃখানুভব ও সুখচেষ্টা বস্তুতঃ তোমাতে নহে। তুমি শুদ্ধ, চেতনা, সর্ব্ববস্তুর আত্মা ও অবভাসক[৫১]। তুমি প্রথমে ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট জ্ঞান করিতে শিখিবে। অভ্যস্ত হইলে উক্ত উভয় পরিত্যাগ করিবে। ঐরূপ করিলে ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ সহজ হইবে। ইষ্টানিষ্ট ত্যাগে সাম্য দৃষ্টির উদয় হয়। তাহা স্থায়ী হইলে জীব জন্মরহিত হয়[৫২।৫৩]। মন যে যে প্রদেশে নিমগ্ন হইবে সেই সেই প্রদেশ হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাহরণ করিবে। করিয়া বুদ্ধি তত্ত্বে নিমগ্ন করিবে। এইরূপ করিতে শিখিলে অর্থাৎ উহা অভ্যস্ত হইলে তখন তুমি মনোরূপ মত্ত হস্তীকে নিবদ্ধ রাখিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে[৫৪।৫৫]। যাহারা দেহকে সত্য জ্ঞান করে, যাহাদিগের আশয় মিথ্যা দৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তুমি সেই সমস্ত সঙ্কল্পবিক্রীত মূঢ়গণের সমতা প্রাপ্ত হইও না[৫৬]। বৎস! আত্মতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে বিবেকবৈরাগ্যাদির অভাবই মূর্খতা ও তদ্বচনে আস্থা স্থাপন করাও মূর্খতা। এই মূর্খতাই অধিক দুঃখদ[৫৭]। অতএব তুমি হৃদয়াম্বরে সমুদিত অবিবেকরূপ মেঘমণ্ডলকে বিবেক পবনদ্বারা আশু দূরীভূত কর[৫৮]। যাবৎ তুমি আত্মবলোকনার্থ আত্মপ্রযত্ন অবলম্বন না করিবে, তাবৎ তোমার যথোচিত বিচার সমুদিত হইবে না। আত্মা যাবৎ না বিচার সমুত্থিত জ্ঞানে পরিদৃষ্ট হন, তাবৎ বেদ বেদান্ত প্রভৃতি দৃষ্টি তাঁহাকে কদাচ বিরাজমান করিতে পারে না[৫৯।৬০]।

বৎস রাম! তুমি এক্ষণে আত্মপ্রসাদে অবস্থান পূর্ব্বক আমার বাক্যে পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার অন্তর হইতে সর্ব্বসম্ভ্রম বিগলিত হওয়াতে তুমি শান্ত ও বিগতজ্বর হইয়াছ। তুমি এখন যাহা গ্রহণ, যাহা বিনষ্ট ও যাহা ভোগ করিতেছ, তৎসমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অনাদি অক্ষয় ব্রহ্মের ন্যায় অবস্থান কর[৬১।৬২]।

ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

—○*○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিজ্ঞান প্রণালী আরও বলি, শ্রবণ কর। অর্থাৎ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ যেরূপে আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও কীর্ত্তন করি, প্রণিহিত হও[১]।

পাতালকুহরে সুরাসুরবিদ্রাবণ নারায়ণবিক্রম হিরণ্যকশিপু নামে এক অসুরেন্দ্র বাস করিতেন[২]। তিনি স্বীয় পরাক্রমে ইন্দ্রের ত্রিজগৎ হরণ করতঃ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একেশ্বর হইয়াছিলেন[৩।৪]। সেই অসুরেশ্বর কিছুকাল এই বিশাল রাজ্যভোগে অতিবাহিত করিলে তাঁহার কতকগুলি পুত্রসন্তান হইল[৫]। তাহারা বয়সে বালক হইলেও তেজে সূর্য্য অপেক্ষাও তেজীয়ান্। এমন কি তাহারা যেন শৈশবেই সূর্য্যের ন্যায় ব্যোমাক্রমণ বিলাসী। হিরণ্যকশিপুর ঈদৃশ পুত্রেরা (দশ পুত্র) তদীয় গৃহে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রহ্লাদ নামা তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন[৬]। মণিসমূহমধ্যে কৌস্তুভ মণির ন্যায় তদীয় সমস্তপুত্ররত্নের মধ্যে প্রহ্লাদ নামক পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ ও সাধুস্বভাব ছিলেন[৭]। দৈত্যেশ্বর সেই সর্ব্বগুণভূষিত পুত্ররত্নে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বসৌন্দর্য্যযুক্ত বসন্তকালের ন্যায় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই পুত্রসহায়সম্পন্ন বলকোষসমন্বিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৈত্যরাজ মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় * মদোদ্ধত হইয়া দেবগণকে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যেন্দুপ্রমুখ সুরগণ সেই কল্পান্তসূর্য্যসদৃশ অসুররাজের প্রচণ্ড আক্রমণজনিত তাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া তদীয় বিনাশ কামনায় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* ষষ্টিবর্ষ বয়স হইলে মাতঙ্গের অর্থাৎ হস্তীর গণ্ডদ্বয় হইতে মদ (এক প্রকার জলবৎ পদার্থ) ক্ষরিত হইতে থাকে। তখন তাহারা উন্মত্তপ্রায় হয়। হস্তী যেমন উন্মত্ত হইয়া দেশবাসী দিগের উৎপীড়ন করে, তাহার ন্যায় হিরণ্যকশিপু সুরগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারাও দুর্বৃত্ত লোকের পুনঃ পুনঃ দুষ্ক্রিয়া ক্ষমা করিতে পারেন না। সুতরাং অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা ভগবান্ মাধবের নিকট হিরণ্যকশিপুর বধ প্রার্থনা করিলেন[৮।১২]। মাধব হিরণ্যকশিপুর প্রত্যহ নূতন নূতন দুষ্ক্রিয়া অবগত হইয়া কোপে প্রজ্বলিত হইলেন, এবং তদীয় বিনাশের নিমিত্ত অবিলম্বে ভীষণ নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তদীয় ঘর্ঘর রবে ও জৃম্ভণে ত্রিজগৎ প্রলয় বিধ্বস্তের ন্যায় হইল। দিগ্ দন্তিদন্তাকার নখর সমূহের ধ্বনি যেন বজ্র নিষ্পেষ উত্থাপিত করিল। স্থির বিদ্যুৎসম দন্তের প্রভায় দিঙ্মণ্ডল প্রজ্বলিত প্রায় হইল। সমস্ত দিক্‌কোটরে তদীয় কর্ণকুণ্ডল অলাতবৎ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল[১৩।১৪]। ইহার উদর যেন সমুদায় কুলপর্ব্বতের পীঠভূমি (অর্থাৎ বৃহৎ পিণ্ডাকার)। ইহার বাহু পরিবর্ত্তন ব্রহ্মাণ্ড খর্পরের কম্পজনক[১৫]। ইহার বদন ও উদর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত বায়ু পর্ব্বতশ্রেণী বিকম্পিত করিতে লাগিল এবং নেত্র হইতে ত্রিজগৎদহনক্ষম কল্পাগ্নি-সদৃশ অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল[১৬]। তাহার সটার আন্দোলনে ভাস্কর দেব বিচলিত হইলেন এবং তদীয় লোমকূপ হইতে বহ্নিকণা নিঃসৃত ও পুঞ্জীভূত হইয়া পর্ব্বতাকার হইল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে পট্টিশ প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহার উদ্যোগ বা আড়ম্বর যেন কুলাচল উৎপাটন পূর্ব্বক মহাকুণ্ড সমূহ প্রস্তুত করিতে উদ্যত[১৭]।

মাধব এবম্বিধ নরসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাসুর হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন এবং তাহার পুরবাসী অসুরগণকে নেত্রসম্ভূত ক্রোধাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন[১৯।২০]। এই নৃসিংহরূপ মারুত বেগবান্ হইলে জগৎ একার্ণবাকুল জগতের ন্যায় হইয়াছিল এবং অন্যান্য দানবগণ মশকের ন্যায় তদীয় ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল। অনেক দানব ভয়ে পলায়নপর হইয়াছিল[২১।২২]। মাধব এইরূপে সেই পাতালতলে সমস্ত দৈত্যগণ বিনষ্ট ও বিদ্রাবিত ও সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেই সুরবিপদ্‌নাশন ভগবান্ বিষ্ণু উক্ত প্রকারে সুরারিপতিকে রবিসুতসদনে প্রেরণ করিয়া দেবগণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অসুর-

নায়কগণ দৈত্যরাজ বিহনে হা হতোস্মি করিয়াছিল। হতাবশিষ্ট অসুরেরা স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিল। প্রহ্লাদ পিতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া হিমক্লিষ্ট অম্বুরুহের ন্যায় পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল বিলাপ করিয়া অবশেষে মৃত বন্ধু-বান্ধব গণের ও স্বীয় পিতার সময়োচিত ঔর্দ্ধদেহিক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শোকসন্তপ্ত বন্ধুবান্ধবগণকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিয়াছিলেন[২৩।২৮]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।
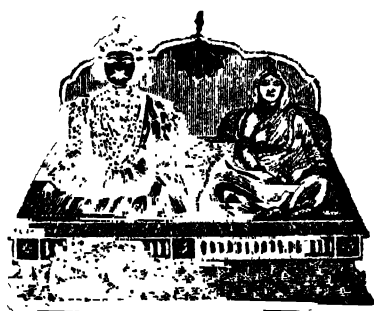
একত্রিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর দুঃখকাতর প্রহ্লাদ সেই অসুরশূন্য পাতাল-কুহরে একাকী অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১], হায়! যখনই অসুরাঙ্কুর তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া সমুদিত হয়, তখনই হরিরূপ শাখামৃগ উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে[২]। যেমন হিমাচলশিরে পদ্মের চিরাবস্থান অসম্ভব, তাহার ন্যায় এই পাতাল প্রদেশে প্রতাপশালী অসুরগণের স্থায়িতা অসম্ভব[৩]। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপন্নবিনাশী, তাহার ন্যায় অসুরেরাও উৎপন্নবিনাশী। ইহাদের উত্থান স্থায়ী হয় না। পরক্ষণেই ইহাদের পতন দৃষ্ট হয়[৪]। কি খেদের ও কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজ্যাদি বাহ্য সম্পদরূপ আলোক ও উৎসাহ হর্ষ প্রসাদ সুখ ও বিভ্রান্তিরূপ আভ্যন্তর সম্পদরূপ আলোক প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতে তদপহারক অদ্ভুত তিমির প্রেঢ়িত্তা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শত্রুস্থানীয় দেবতাদের জয় হয়[৫]। নিশীথে কমল বন ম্লান, কমলগণের হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ, তাহাদের পত্র (পাবড়ি) সকল সঙ্কুচিত হয়। তাহার ন্যায় সুহৃদ্‌রূপ পদ্ম খেদ প্রাপ্ত, তাহাদের হৃদয় দুঃখান্ধকারে পরিপূর্ণ, এবং সম্পদ্‌রূপ পত্র (পাবড়ি) সংকুচিত[৬]। পিতার পাদ সেবক অত্যন্ত নিকৃষ্ট সুরগণ যে তাহার বিষয় অধিকার করে তাহা মৃগগণের মহাবন অধিকারের অনুরূপ। গ্রীষ্ম প্রতাপে দগ্ধফল যেমন শ্রীহীন ও অশোভনীয়, তাহার ন্যায় নিরুদ্যম, শ্রীহীন ও ভীতমনা বান্ধব অশোভনীয়[৭।৮]। হা! অসুরবীর-দিগের গৃহ ধূলিধূসরিত ও মরকতমণিভূষিত সমুজ্জ্বল অসুরগৃহ সকল ভস্ম ও নবজাত তৃণাঙ্কুরে সমাবৃত হইল[৯।১০]। অহো বিধির অসাধ্য কিছুই নাই! যাহারা সুমেরু দর্শনে সক্ষম, তাহারাও দেবতাদের ন্যায় দীন হীন হইল[১১]। গ্রামগত মৃগীরা যেমন পত্র শব্দেও ভীত হয় তাহার ন্যায় আজ্ অসুরবধূগণ পত্র শব্দেও ভীত হইয়া স্রস্তবস্ত্রাভরণ হইতেছে[১২]। যে সকল দিব্য বৃক্ষ আসুরীদিগের কর্ণ ভূষার্থ রত্নগুচ্ছ প্রসব করিত সে সকল বৃক্ষ আজ্ নরসিংহ করে শূন্য হইয়াছে[১৩]।

যে কল্পপাদপ পিতৃদেব কর্তৃক আহৃত হইয়াছিল সেই কল্পপাদপ পুনর্ব্বার নন্দনে আরোপিত হইয়াছে[১৪]। যাঁহারা মন্দারমালাবিভূষিতা সুরবধূগণকে বলপূর্ব্বক বন্দীকৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই পুরন্ধ্রীগণ সেই সমস্ত সুরগণ কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছে[১৫]। আমার মনে হইতেছে যে, শৈলসানু হইতে নদী নিস্রাবের ন্যায় সুরহস্তী দিগের গণ্ড হইতে মদস্রাব আরব্ধ হইয়াছে এবং আমাদের মত্ত হস্তীর গণ্ডস্থ মদ-শুষ্ক হইয়া মরুভূমি সম হইয়াছে[১৬,১৭]। পারিজাতগন্ধবাহী সুখস্পর্শ অনিল আজ্ দানবগণের দুর্লভ[১৮]। দানবদিগের অন্তঃপুরযোগ্য দেব গন্ধর্ব্ব বধূরা আজ্ সুমেরু পর্ব্বতে (স্বর্গে) স্থিতি লাভ করিল[১৯]। অধিক কষ্ট এই যে, সুরবধূরা আজ্ অসুরবধূদিগের শুষ্কপদ্মসম নীরস বিলাসকে (অঙ্গপরিচালনকে) উপহাস করিতেছে। বিশেষ কষ্টের বিষয় এই যে, যাহারা যে চামরে পিতাকে বীজিত করিত আজ্ তাহারাই সেই চামরে সহস্রনয়নকে বীজিত করিতেছে[২০,২১]। আমাদের এই যে দুর্দ্দশা, এ দুর্দ্দশা কেবল মাত্র সেই এক মহাপ্রভাব হরি হইতে[২২]। তাঁহারই ভুজবলছায়ায় বিশ্রাম করায় সুরগণ তাপ হইতে নিস্কৃতি পায়। তাহারা শৌরীর শৌর্য্যের আশ্রিত থাকে বলিয়াই আমাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়[২৩,২৪]। সেই জন্যই অসুরবধূদিগের মুখপদ্মে হিম বর্ষণ হইয়া থাকে[২৫]। অসুরেরা এই জগৎরূপ গৃহ শীর্ণ ভিন্ন করিতে না পারে, এই জানিয়াই যেন হরি ইহার বিধারক স্তম্ভ হইয়া আছেন[২৬]। যেমন ক্ষীরোদার্ণবনিমগ্ন মন্দরাচল একমাত্র কচ্ছপ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ এই অসুররণার্ণবে নিমগ্ন সুরগণ একমাত্র হরি কর্তৃকই বিধৃত অর্থাৎ পরিরক্ষিত হয়। অতএব, হরিই সুরগণের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা[২৭]। পিতৃ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অসুরেরা উক্ত হরি কর্তৃকই নিপাতিত হইয়াছেন[২৮]। কেবল হরিই একমাত্র অসুর বল সংহারের দাবানল এবং দেবতাদের কার্য্য গুরু। হরি বিষম অর্থাৎ নিতান্ত দুর্জ্জেয়[২৯]। হরি দৈত্য দোর্দ্দণ্ডের পরশু, তদবলম্বনেই সহস্রাক্ষ দানবদিগকে পরাভূত করেন[৩০]। ইনি আয়ুধ প্রহারে পরাভূত হন না। এবং অস্ত্র প্রয়োগে বিদীর্ণ হন না। এতদীয় শরীর বজ্র অপেক্ষাও সুদৃঢ়। আমার পিতামহের সহিত যুদ্ধ করিয়া শৌরি এরূপ সমর কৌশলে অভ্যস্ত হইয়াছেন যে, পর্ব্বত নিক্ষেপেও পরাভব প্রাপ্ত হন না[৩১,৩২]।

পূর্ব্বে সেই সেই মহারণে যে ভীত হয় নাই সে যে এখন ভীত হইবে, তাহা কখনই নহে[৩৩]। আমার মনে হইতেছে, হরির আক্রমণে অর্থাৎ হরিকে বশীভূত করিবার এক মাত্র উপায় আছে, অন্য উপায় নাই[৩৪]। কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত জনগণের গত্যন্তর নাই[৩৫]। লোকত্রয় মধ্যে তাঁহার অধিক (তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যতীত) নাই এবং তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল কারণ[৩৬]। অতএব, আমি এই নিমেষ হইতে অজ নারায়ণকে সর্ব্বভাবে প্রপন্ন (প্রাপ্ত বা শরণাগত) হইলাম। আমিই সমুদায় দেশ, কাল ও বস্তুতে নারায়ণময়[৩৭]।

তদীয় "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সর্ব্বার্থসাধক। যেমন আকাশ হইতে মারুতের অপগমন হয় না, তাহার ন্যায় আমার হৃদয় হইতে উক্ত মন্ত্রের অপগতি হইবে না[৩৮]। * অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন, ও দেখিতে পাইলেন, সাক্ষাতে আকাশ হরি, দিক্ সকল হরি, পৃথিবীও হরি, জগৎ-ই হরি এবং আমিও ইদানীং অপ্রমেয় বিষ্ণুময়[৩৯]। †

---

* প্রহ্লাদ সর্ব্বভাবে হরি প্রতিপত্তির সঙ্কল্প করিলেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা হরি সাধনের প্রতিজ্ঞা করিলেন। দেশ বিশেষে কাল বিশেষে বস্তু বিশেষে হরি দর্শন করা তাঁহার সঙ্কল্পবহির্ভূত। অর্থাৎ হরি এক শরীর ধারী দেবতা, তিনি পূজা গৃহেই আছেন। অথবা অন্য স্থানে ছিলেন। বা আছেন, পূজা কালে আসিবেন, এরূপ পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষুদ্র ভাবের হরি দর্শন বাঞ্ছা করেন না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব বস্তুতে তিনি হরি দর্শন করিবেন। এমন কি তিনি আপনাকেও হরিরূপে দেখিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা। উক্ত প্রতিজ্ঞা পরিপালনের একমাত্র উপায় বা অবলম্বন সর্ব্বদা মন্ত্র জপ। সেইজন্য শ্রুত্যুক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু প্রণবটী ছাড়িয়া দিলেন। কারণ এই যে, শুদ্ধ দেশ অর্থাৎ স্থানে শুচি হইয়া সপ্রণব মন্ত্র জপ করাই বিধেয়। প্রণবযুক্ত মন্ত্র শুচি অশুচি সর্ব্ব সময়ে জপ করার শাস্ত্র নাই। অথচ তাঁহার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থানে জপ করা। তাই তিনি প্রণব বর্জ্জিত নমো নারায়ণায় মন্ত্র জপিবার সঙ্কল্প করিলেন। সে জপ মানস জপ। সঙ্কল্পের পরক্ষণেই তাঁহার জপারম্ভ এবং জপারম্ভ মাত্রেই তাঁহার সর্ব্বত্র হরি দর্শন আত্ম-অভেদে আবির্ভূত হইয়াছিল।

† বিষ্ণুময় শব্দের অর্থ—ভাবনাবলে বিষ্ণুপ্রায় বিষ্ণু সদৃশ হওয়া। যে নিরন্তর যাহা ভাবে সে যোগাকালে তাহাই বা তৎপ্রায় হয়। অর্থাৎ তাহার অন্তরে তদ্বস্তুমাত্র প্রতিফলিত হইতে থাকে। কোন কোন সময়ে কোন কোন কামুকের

এই স্থানে বলা আবশ্যক—"প্রহ্লাদ" যে সেব্যসেবক ভাব ত্যাগ করিয়া বিষ্ণ্বদ্বৈত জ্ঞানে আপনাকেও বিষ্ণুত্বে আরোপিত করিলেন, ইহা অশাস্ত্রীয় নহে। শাস্ত্রের আদেশ—"দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবেক" "বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করিবেক" "শিব হইয়া শিবপূজা করিবেক" ইত্যাদি। * অবিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণু পূজার প্রধান ফল মোক্ষ, তদ্‌ভাগী হওয়া যায় না। সুতরাং বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুপূজা করা বিধেয়। তাই প্রহ্লাদ আপনিও বিষ্ণুভাবে ভাবিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই আমি বিষ্ণু[৪০]। যে প্রহ্লাদ সেই হরি। সুতরাং আমি হরি; আমা হইতে পৃথক্ হরি নাই। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে অবস্থিত[৪১]। প্রহ্লাদ অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনাতে হরির বাহন ও আয়ুধ প্রভৃতির কল্পনা করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ বর্ণ গরুড় আমার আসন। আমার ভুজপল্লবে শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি আয়ুধ, আমার ভুজচতুষ্টয় কেয়ূরাদি অলঙ্কারে সুশোভিত, ক্ষীরোদসম্ভবা লক্ষ্মী আমার পার্শ্বদেশে চারু চামর হস্তে অবস্থান করিতেছেন[৪২।৪৫]। আমার অপর পার্শ্বে কীর্ত্তি, জগন্নির্ম্মাণকারিণী মায়া, ও লক্ষ্মীসখী জয়া বিরাজ করিতেছে[৪৬।৪৮]। শশী ও ভাস্কর আমার চক্ষুঃ। আমার দেহকান্তি উৎপলের ন্যায় বা নবজলধরের সদৃশ[৪৯।৫০]। আমার হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ[৫১]। আমার নাভি কুহরে ও হস্তে পদ্ম, নাভিকুহররূপ পদ্মে ব্রহ্মা অবস্থিত[৫২]। এই আমার দৈত্যদানবদলনী

মন বুদ্ধি অভিলষিত শ্রীমূর্ত্তিতে সর্ব্বদা ভাসমান হইতে থাকে। যেমন কাম জনিত ভাবনায় লোকে তন্ময় হয় তেমনি ভয়াদি জনিত ভাবনাতেও হয়। কাচপোকা কীটের স্পর্শে তৈলপায়িকা পতঙ্গের ভয় জনিত ভাবনায় তন্ময়তা ঘটনা হইতে দেখা যায়। প্রহ্লাদের পূর্ব্ব সাধন ছিল, তাই তাহার মন অতি অল্পকালের চিন্তায় হরিময় হইয়াছিল।

* "দেবোভূত্বা যজেদ্দেবং" "নাহবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং নাহশিবঃ পূজয়েচ্ছিবম্" পাঠকগণ অবশ্য দেখিয়াছেন, পূজা কালে পূজকগণ প্রথমে স্ব মস্তকে ফুল দেন, পরে পূজ্য দেবতাকে ফুল দেন। তাহার মর্ম্ম—প্রথমে আপনাতে মানসী পূজা, পরে বাহিরে বাহ্য পূজা। প্রথমে আত্মায় দেবতার আরোপ ও পূজা, পরে প্রতিমায় তাহার আরোপ ও পূজা। এ প্রণালী প্রত্যেক পূজায় বিহিত বা প্রত্যেক পূজা উপরোক্ত বিধানের অনুগামী।

শার্ঙ্গ ধনুঃ, আমি এই জঠরান্তরে অনন্ত জগৎ ধারণ করিতেছি[৫৬।৫৭]। এই আমার সুদর্শন চক্র, এই আমার কুঠারাস্ত্র, এই আমার গদা। পৃথিবী আমার চরণ, গগন আমার শির, জগত্রয় আমার শরীর, দিক্-সকল আমার কুক্ষি[৫৮], আমি শঙ্খচক্রগদাধর গরুড়বাহন নীল মেঘদ্যুতি বিষ্ণু[৫৯]। দুষ্টচেতাগণ আমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে। আমি পিতাম্বর গদাপাণি অচ্যুত[৬০।৬১]। আমি লোকত্রয় বিনাশে সক্ষম; অতঃপর কে আমার বিদ্বেষ্টা হইতে পারে[৬২]? আমার সম্মুখস্থ এই সকল সুর ও অসুর আমারই তেজে সৃষ্ট[৬৩]। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, হর প্রভৃতি সুরগণ আমার স্তুতি করিতেছেন। আমি পরম মহিমাদ্বারা সর্ব্বদ্বন্দ্বপদাতীত, ত্রিভুবনমূর্ত্তি ও সকল ভয়ের অপহারক, অতএব আমাকে আমার নমস্কার[৬৪।৬৬]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ উক্তপ্রকার চিন্তার বা ভাবনারদ্বারা আপনার শরীরকে নারায়ণশরীররূপে কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার পূজার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন১। * আমি যে বৈষ্ণবী মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছি ইহার অন্যথা করা হইবে না। কিন্তু আমার হৃদয়াবস্থিত মদ্রূপ বিষ্ণু যতক্ষণ প্রাণপ্রবাহ (শ্বাসপ্রশ্বাস) রূপ পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা শরীর বহির্ভাগে আরোহিত হইয়া পূজিত হইবেন ততক্ষণ আমি ভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় থাকিব। অর্থাৎ "আমি যেন অন্য এক বিষ্ণু" এই ভাবে থাকিব। তাহা হইলে বিষ্ণু আমার বহির্ভাগেও বৈনতেয়সমারূঢ়, শক্তিচতুষ্টয়সম্পন্ন, শঙ্খচক্রগদাপাণি, শ্যামলাঙ্গ, চতুর্ভুজ, চন্দ্রার্কনেত্র, শ্রীমান, পদ্মপাণি, বিশালাক্ষ, ও মহাদ্যুতি দেহধারী হইয়া অবস্থিত থাকিবেন, তাহা হইলে আমি প্রথমে মনোময় সর্ব্বসংবর্দ্ধযুক্ত রম্য সপর্য্যাদ্বারা সপরিবার বিষ্ণু পূজা করিতে পারিব। পশ্চাৎ নানাবিধ বাহ্য বস্তুদ্বারা পূজা করিতে পারিব২।৩।

প্রহ্লাদ মনে মনে ঐরূপ স্থির করিয়া পূজার দ্রব্য সমুদায় কল্পনা করিয়া লক্ষ্মীপতি মাধবকে মনোদ্বারা পূজা করিলেন। রত্নপাত্রে চন্দনাদি বিলেপন, ধূপ, দীপ, বিচিত্র রত্নভূষণ মন্দারমালা, হেমাব্জরাজি, উৎপলনিকর, কল্পবৃক্ষলতাগুচ্ছ, রত্নস্তবকসমূহ, দিব্যবৃক্ষপল্লবসমূহ, নানা-

---

* অদ্বৈত দৃষ্টিতে পূজ্য পূজক ভেদ না থাকায় পূজা অসম্ভব হয়। অতএব সমাধি ব্যতীত অন্য অবস্থাতেও অদ্বৈত দৃষ্টি বজায় রাখা আবশ্যক। তাহা রাখিতে হইলে পূজা, ধ্যান, জপ, এ সকল অবশ্য অবলম্বনীয়। অর্থাৎ অদ্বৈত বিজ্ঞান সুপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল ক্রিয়া আবশ্যক। তাই প্রহ্লাদ পূজাদি প্রক্রিয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সমাধি কালে অদ্বৈত, তাই সে সময়ে প্রসিদ্ধ পূজা থাকে না। তদ্ভিন্ন কালে তুমি আমি তিনি ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধি থাকে, কাযেই আমি পূজক, তিনি পূজ্য, ইত্যাদি ভাব থাকায় পূজাদির ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়। তদ্বিধ দ্বৈতজ্ঞান কালেও সোঽহং জ্ঞানের অভ্যাস জন্য পূজাদি করা বিধেয়। তৎ প্রভাবে অর্থাৎ পূজাদির প্রভাবে ভেদ বুদ্ধি ক্রমে বিদূরিত হইতে থাকে এবং অদ্বৈত বুদ্ধি ঘনীভূত হইতে থাকে।

প্রকার কুসুম, আম্রপল্লব, কিংশুক, বিল্বপত্র, * তুলসী, গুগ্‌গুল্‌, দূর্ব্বা, কুঙ্কুম, নৈবেদ্য, তাম্বুল, দর্পণ, ছত্র, চামর, নীরাজনা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার প্রভৃতি ও সম্মানোপচার কল্পনার দ্বারা লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দনকে পুনঃপুনঃ পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। এবং উৎসাহ সহকারে নানাবিধ বাহ্য উপচার দ্বারা ভক্তিসহকারে প্রত্যহ হরি পূজা করিতে লাগিলেন[১৭।১৯]।

প্রহ্লাদ হরি পূজায় প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় পুরস্থ দৈত্যগণ ক্রমে পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। কারণ এই যে, রাজাই আচার ব্যবহার প্রচারের হেতু। অর্থাৎ রাজা যদাচারী, প্রজাদিগকেও প্রায় তদাচারী হইতে দেখা যায়[২০]। হে অরিসূদন! এই বৃত্তান্ত কালক্রমে দেবলোকে গমন করিল। দেবতাগণ শ্রবণ করিলেন, যে অসুরগণ বিষ্ণুদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম বৈষ্ণব হইয়াছে। শক্রাদি দেবগণ উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! যাহারা বিষ্ণুর চিরবিদ্বেষী, তাহারা অকস্মাৎ বৈষ্ণবী ভক্তি প্রাপ্ত হইল? কি আশ্চর্য্য!

দেবগণ ঐরূপে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরোদোদরে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুসমীপে গমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৈত্যবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন[২১।২৪]। কহিলেন, হে ভগবন্! একি! যাহারা সর্ব্বদা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিত, এক্ষণে সেই সমস্ত দৈত্য ত্বন্ময় হইয়াছে। বোধ হয় ঐ ব্যাপার মায়া (কোন এক প্রকার ছল)। কেননা অতিদুর্বৃত্ত দানবেরাই বা কোথায়? আর পশ্চাত্যজন্মলভ্য (পাশ্চাত্যজন্ম=চরম বা মোক্ষের উপযুক্ত জন্ম) জনার্দ্দনভক্তিই বা কোথায়? দৈত্যদিগের তদ্রূপ বিষ্ণুপরায়ণতা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে না[২৫।২৬]। প্রথিত আছে, প্রাকৃত ব্যক্তি গুণশালী হইলে অকালপুষ্পের ন্যায় দুঃখ ও উদ্বেগ উভয়কেই উৎপাদন করে। তাই আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি[২৭]। কাচের মধ্যস্থলে মহামূল্য মণি শোভা পায় না। জন্তু সকল যাদৃশ গুণযুক্ত, তাদৃশ গুণসম্পন্ন বস্তুতেই সংস্থিতি লাভ করাই উচিত এবং তাহাই হইয়া থাকে। অজগণ সদৃশ হইলেও কুকুরগণ তাহাদিগের মধ্যে সন্তোষ ভাবে থাকিতে পারে না[২৮।২৯]।

* এই বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের মতে এবং অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রের মতে বিষ্ণুকে বিল্বপত্র দেওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বিষ্ণু সেবকেরা বিল্বপত্রের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন না।

বজ্রসূচী অঙ্গমধ্যে নিমগ্ন তাদৃশ দুঃখপ্রদ হয় না অসদৃশ ঘটনা যদ্রূপ দুঃখপ্রদ৩০। যাহা যে স্থলের উপযুক্ত, তাহাই সেই স্থলে শোভমান হয়। পদ্ম জলেই উৎপন্ন হয়, স্থলে নহে। অধম, হীনকর্ম্মরত, প্রাকৃ-তারম্ভ, তুচ্ছ দানবগণই বা কোথায়? আর শাশ্বতী বৈষ্ণবী ভক্তিই বা কোথায়? হে দেবেশ! "কমলিনী উতপ্ত উষরভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে" এই নীচজনোক্তি যেরূপ কর্ণের সুখার্থ নহে, তদ্রূপ "দিতিসুতগণ মাধবে ভক্তিমান্ হইয়াছে," এই বাক্যও আমাদিগের সুখদায়ক নহে৩১।৩৩।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

—(⋊(*)⋉)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেবগণ দৈত্যগণের হরিভক্তিতে দুরভিসন্ধি থাকা বিবেচনায় শঙ্কিত ও প্রকুপিত হইয়া মাধবকে প্রাগুক্ত বাক্য সকল কহিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে বিবুধগণ! তোমরা বিষণ্ণ হইও না। প্রহ্লাদ সত্য সত্যই আমাতে ভক্তিমান্। প্রহ্লাদের এই শেষ জন্ম, সুতরাং সে মোক্ষলাভের উপযুক্ত[১।২]। যেমন দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, তেমনি, প্রহ্লাদও আর গর্ভগামী হইবে না[৩]। ক্রান্তদর্শী (ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞানী) পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে, গুণবান্ যদি নির্গুণ হয় তবে তাহাই অনর্থের হেতু। কিন্তু নির্গুণের গুণবান্ হওয়া অনর্থের কারণ নহে। বুঝিতে হইবে যে, তাহা সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মের ক্রম। হে অমরোত্তমগণ! তোমরা স্ব স্ব বিচিত্র ভবনে গমন কর। প্রহ্লাদের ঐ গুণ তোমাদিগের অসুখের কারণ হইবে না[৪।৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ ঐরূপ কহিয়া সেই ক্ষীরোদ লহরীমালায় অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও বিষ্ণুর পূজা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন[৬]। অতঃপর দেবতাগণ প্রহ্লাদের প্রতি প্রীত হইলেন। কারণ এই যে, মহদ্ব্যক্তিরা যাহা হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত না হন, তাঁহাদের মন তৎপ্রতি বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকে[৭।৮]। এ দিকে ভক্তিমান্ প্রহ্লাদ প্রত্যহ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা দেবদেব-জনার্দ্দনের পূজা করিতে লাগিলেন[৯]। উক্তপ্রকারে পূজারত থাকায় প্রহ্লাদের বিবেক আনন্দ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল[১০]। তদীয় চিত্ত ক্রমে ভোগানন্দ বা বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করিল। এখন তাঁহার মন আর জনাকীর্ণ স্থান ভাল বাসে না এবং কমনীয়া কান্তা প্রভৃতিতে সস্পৃহ হয় না[১১]। শাস্ত্রকথা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার মন প্রধাবিত হয় না। তিনি অশাস্ত্রীয় লোকব্যবহারে ও সভা সমিতি উৎসবে ও কৌতুক দর্শনাদি বিষয়ে বিরত হইলেন[১২]। এত দূর অগ্রসর হইয়াও তাঁহার চিত্ত ভোগকল্পনা রূপ রোগ হইতে বিযুক্ত না

হওয়ায় সময়ে সময়ে দোলায়মান হইতে লাগিল। ক্ষীরোদমন্দিরস্থ অন্তর্যামী সকলের আনন্দকারী ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের সেইরূপ চিত্তস্থিতি অবগত হইয়া তদীয় পাতাল কুহরস্থ পূজাগৃহে প্রবেশ করতঃ প্রহ্লাদের সম্মুখীন হইলেন[১৩।১৬]।

দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ পুণ্ডরীকাক্ষের আবির্ভাব জ্ঞাত হইয়া পরম সমাদরে ও দ্বিগুণ উপচারে তাঁহার পূজা করিলেন[১৭]। বাঞ্ছাসিদ্ধিকারী হরি ইষ্টদেব পূজাগৃহে ও প্রত্যক্ষে অবস্থিত, ইহা দেখিয়া প্রহ্লাদের হর্ষের আর সীমা রহিল না। তিনি যথাযোগ্য প্রীতিকর বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন[১৮]। প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, যিনি আপনিই আপনার অন্তরস্থ ভুবনত্রয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, যিনি বাহিরের ও অন্তরের কলঙ্ক বা তমঃ বিনাশ করেন, যিনি সূর্য্যাদি অপেক্ষাও অধিক প্রকাশশীল অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশরূপী, যিনি অনন্যশরণ জীবের রক্ষাকর্ত্তা বা ত্রাণ কর্ত্তা, সেই অজ ঈশ ঈশ্বর অচ্যুত হরিকে শরণাগত আমি প্রণাম করি[১৯]। যাঁহার কান্তি ইন্দীবরের ও নীল মণির সহিত তুলিত ও নির্ম্মল শারদ আকাশের সহিত উপমিত হয়, যদীয় দেহের আভা ভ্রমরাদির দেহের আভা অপেক্ষা অনেক গুণ উৎকৃষ্ট, আমি সেই পদ্মহস্ত চক্রপাণি গদাধরের শরণাগত[২০]। যাঁহার অঙ্গসকল নিতান্ত কোমল, যাঁহার শঙ্খ শ্বেত শতদলপদ্মের কোরক সদৃশ, যাঁহার নাভিপদ্মে বিরিঞ্চিরূপ ভ্রমর বেদরূপ গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করেন, যিনি ভক্তহৃদয়পদ্মে বাস করেন, আমি তাঁহার শরণাগত[২১]। যাঁহার শুক্লবর্ণনখররাজি তারকাগণের ন্যায় সমুজ্জ্বল, যাঁহার বদন-চন্দ্র সর্ব্বদা হাস্যপ্রভায় প্রদীপ্ত, কৌস্তুভমণির উজ্জ্বলকান্তি যাঁহার হৃদয়ে মন্দাকিনীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে, আমি সেই শরদাকাশতুল্য কান্তিমান্ বিষ্ণুর শরণাগত[২২]। যিনি অজাত ও অবর্দ্ধনশীল, যাঁহাতে সৃষ্টিপরম্পরা সন্নিবিষ্ট, যিনি সত্ত্বাদি মায়াগুণদ্বারা অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট দেহ প্রকাশ করেন, যিনি অতিবিরূপ (রূপ রহিত) হইলেও বালকস্বরূপী; যে বালক প্রলয়কালে বটপত্রশায়ী, আমি সেই বালকরূপী বিষ্ণুর শরণাগত[২৩]। যিনি বিকশিত পদ্মরেণুর ন্যায় গৌরবর্ণ, যাঁহার অঙ্কে কমলাদেবী বিরাজিতা, যাঁহার বসন সায়ংকালীন দিবাকরের ন্যায় অরুণবর্ণ, আমি সেই কনকরুচি ভাস্বর ও সুন্দর বিষ্ণুর শরণাগত[২৪]। যিনি দানবরূপ নলি-

নীর তুষার, সুররূপ নলিনীর সূর্য্য, পদ্মজরূপ নলিনীর মহান্ জলাশয়, হৃদয়রূপ নলিনীর হৃদয়, ত্রিভুবনরূপ নলিনীর শ্বেতারবিন্দ ও যিনি মোহান্ধকার বিনাশের উৎকৃষ্ট প্রদীপ, যিনি স্বয়ং অজড় হইয়াও জড়-রূপে ভাসমান ও অজড় চিদাত্মতত্ত্ব, আমি সেই জগদার্ত্তিহর হরির শরণাগত[২৫]।[২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ অসুরনাশন শ্রীনিষণ্ণাঙ্গ কুবলয়দলশ্যাম হরিকে এই প্রকার বাক্যসমূহ দ্বারা স্তব ও অভ্যর্চ্চনা করিলে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং জলদ যেমন গম্ভীরনিঃস্বনে ময়ূরকে আশ্বাসিত করে, তদ্রূপ, তাঁহাকে গম্ভীরনিঃস্বনে বক্ষ্যমাণ বাক্যে আশ্বাসিত করিলেন[২৭]।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

—○()*()○—

ভগবান্ বলিলেন, হে গুণনিধে! হে দৈত্যকুলের অমূল্যরত্ন! এক্ষণে তুমি স্বীয় জন্মদুঃখশান্তির নিমিত্ত অভিলষিত বর গ্রহণ কর[১]। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সঙ্কল্পফলপ্রদ! হে ভগবন্! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে বিভো! আপনি যাহা উত্তম বিবেচনা করেন তাহাই আমার প্রতি আদেশ করুন। অর্থাৎ আপনিই বিচার করিয়া আমার উপযুক্ত বর প্রদান করুন[২]। ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, আত্মতত্ত্ব বিচারোৎপন্ন ব্রহ্মাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার (আমার আত্মা ব্রহ্ম, এরূপ অসন্দিগ্ধ বোধ) ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আত্যন্তিক কার্পণ্য নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। * অতএব, প্রহ্লাদকে তদনুরূপ বর দেওয়াই কর্ত্তব্য। পরে বলিলেন, হে অনঘ! তোমার আত্যন্তিক অনর্থনিবর্ত্তক ও নিরতিশয় আনন্দ লাভের কারণীভূত বিচার—যে বিচারে তোমার ব্রহ্মে বিশ্রাম হয়—সেই বিচার উপস্থিত হউক[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন পয়োনিধির লহরী নির্ঘোষ করণান্তে বিলীন হইয়া যায় তাহার ন্যায় ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যেন্দ্রকে ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন[৪]। দেবদেব বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে প্রহ্লাদ মণিরত্নপুরস্কৃত শেষ কুসুমাঞ্জলি তদুদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন[৫]। পরে সেই উৎকৃষ্ট

---

* আমি ছাড়া সমস্তই ব্রহ্ম, এ বোধ হইলেও "আমি ব্রহ্ম নহি, ব্রহ্ম বহির্ভূত" এ বোধ থাকিতে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের ও তজ্জনিত বোধের বাধ হয় সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান অপূর্ণ থাকে। পূর্ণতা ব্যতীত অভয় পদ লব্ধ হয় না এবং পূর্ণতা অদ্বৈত ব্যতীত দ্বৈতে সিদ্ধ হয় না। দ্বৈতে সেব্য সেবক, পতি পত্নী প্রভৃতি ভাব বিরাজ করে। তাদৃশ ভাবে ও উপাসনায় যাহা লব্ধ হয় তাহা পরিচ্ছিন্নতা কারণে স্বর্গবিশেষ, মোক্ষ নহে। কারণ এই যে, তল্লব্ধ পদ অভয় নহে। ভগবানের নিত্য পার্ষদ জয় বিজয় প্রভৃতিরও শাপ গ্রস্ত হইয়া দানবাদি জন্ম ভোগ করিতে হইয়াছে। অতএব, অদ্বৈত ব্যতীত দ্বৈতে অভয়পদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ নাই, ইহা বশিষ্ঠের অভিপ্রেত।

আসনে পদ্মাসন নিবদ্ধ করিয়া কিয়ৎকাল স্তোত্র পাঠ করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[৬], সংসারক্লেশবিনাশন দেবদেব আমাকে আত্ম-বিচারপরায়ণ হইতে আদেশ করিলেন, অতএব এক্ষণে আমি আত্মার বিচারই করিব[৭]। আমি এই যে ভুবনাড়ম্বরে আছি ও কথা কহি-তেছি, গমন করিতেছি, অবস্থান করিতেছি, যত্নসহকারে দ্রব্যাদি আহ-রণ করিতেছি, এ আমি কে বা কি[৮]? তৃণপর্ব্বতসঙ্কুল জগৎ আমি নহি; কেননা ইহা আমার বাহিরে প্রতিভাত হইতেছে[৯]। এই যে দেহ, ইহাও আমি নহি। কারণ ইহা ছিল না, অভিনব বা উৎপন্ন পদার্থ, অচেতন, এবং বায়ু প্রবহনে ক্ষণকাল মাত্র প্রস্ফুরিত হয়, আবার নাশ প্রাপ্ত হয়[১০]। কর্ণদ্বারা গৃহীত যে শব্দ, তাহাও আমি নহি। কারণ উহা কর্ণ শুষ্কুলি উপলক্ষে কল্পিত, শূন্য আকাশ সঞ্জাত, আকা-শাকৃতিও অচেতন[১১]। ত্বগিন্দ্রিয়প্রাপ্য স্পর্শ, তাহাও আমি নহি। কারণ তাহা, উহা ক্ষণবিনাশী, ত্বঙ্মাত্রগ্রাহ্য ও অচেতন। যাহার অস্তিতা তুচ্ছ ও লোল, অল্পপ্রসর ও জিহ্বার অধীন, সেই তুচ্ছ, লোল, ক্ষণধ্বংসী ও অচেতন রস কি প্রকারে অহমাস্পদ হইবে[১২।১৩]? যাহার সিদ্ধি অর্থাৎ অস্তিতা অনিত্য দৃশ্য দ্রব্যের ও চক্ষুর অধীন, যাহা কেবল মাত্র দর্শকের উপভোগ জন্মাইয়া উপক্ষীণ হয়, অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা অহমাস্পদ নহে। অর্থাৎ রূপও আমি নহি[১৪]। অন্ধ জড় ক্ষয়শীল নাসিকার দ্বারা পরিকল্পিত অনিয়তাকার গন্ধও আমি নহি[১৫]। এইরূপ, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার মন বুদ্ধি চিত্তাদি শব্দবাচ্য অন্তঃকরণও আমি নহি। যখন ঐ সকলের কিছুই আমি নহি তখন অবশ্যই পরিশেষ ন্যায়ে যে মমতাবিহীন, শান্ত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত ও কল্পনা-বর্জ্জিত শুদ্ধ চেতন নিত্য প্রাপ্ত আছে, সেই নিত্য প্রাপ্ত চেতনা নামক পদার্থই আমি[১৬]। আমি চেত্যাতীত, চিন্মাত্রবাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী, কল্পনাবিহীন, সৎ ও সমস্ত বস্তুর প্রকাশক[১৭]। যেমন উত্তমালোক প্রদীপ বস্তু প্রকাশ করে তাহার ন্যায় আমি চেতনার দ্বারা এই সমস্ত লোক ও সূর্য্যাদি বস্তু প্রকাশ করিতেছি[১৮]। অহো! এত কাল পরে আজ্ আমি সত্য অবগত হইলাম। এ সমস্তই চিদাভাস মাত্র। অর্থাৎ চিদ্রূপ আত্মাতে ভ্রমবিশেষের বিম্ব কল্পনাবিশেষ[১৯]। যেমন সচ্ছিদ্র অপবরকের অন্তর্গত আলোক ছিদ্র পথে নিঃসৃত হইয়া ঘটাদি

বস্তু প্রকাশ করে তাহার ন্যায় দেহান্তঃ প্রবিষ্ট চেতনা বহির্গত ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা বাহ্য জগৎ প্রকাশ করিতেছে[২০]। যেমন প্রদীপ্তি-শালী বস্তুর দ্বারা বস্ত্রের শুক্লাদি বর্ণ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় চেত-নার দ্বারাই সমস্ত বস্তু প্রতিভাত হয় এবং নানা প্রকার ইন্দ্রিয় বৃত্তিও উক্ত চেতনার দ্বারা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়[২১।২২]। মুকুর যেমন বস্তুপ্রতিবিম্বের আধার, তাহার ন্যায় এই চেতনাই দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদি সমস্ত অনুভবযোগ্য বস্তুর ও ভূতবর্গের আধার[২৩]। সেই বিকল্পবর্জ্জিত (অর্থাৎ একরূপ, এক বা অদ্বয়) চিদ্রূপের প্রসাদেই সূর্য্য উষ্ণ, চন্দ্র শীতল, অদ্রি স্থূল ও নিবিড় ও সলিল তরলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে[২৪]। জগৎস্থিতির ও ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিরও আদি কারণ চেতনা, কিন্তু চেত-নার কারণ নাই। যেমন গ্রীষ্মার্কতাপে সমুদায় বস্তুই প্রতপ্ত হয় তাহার ন্যায় এক নিত্য চেতন দ্বারাই পদার্থের পদার্থতা সিদ্ধ হয়[২৫-২৭]। আমি চিৎ, চেত্য, দৃশ্য, ও দ্রষ্টা প্রভৃতি কল্পনার অতীত (অর্থাৎ সর্ব্বত্রানুস্যূত এক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড পদার্থ) স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা; অতএব আমাকেই আমার নমস্কার[২৮।২৯]। এক নির্ব্বিকল্প ভূতেশ মৎস্বরূপ চিদাত্মায় এই সমস্ত প্রবেশ ও অবস্থান করিতেছে[৩০]। এই অন্ত-রাত্মভাবে অবস্থিত চৈতন্য যাহা করে তাহাই কৃত হয়; যাহা না করে তাহা কৃত হয় না। সুতরাং অন্তঃস্থ চেতনা যাহা কল্পনা করে, যাহাতে আপনার অস্তিতা অর্পণ করে, তাহাই আছে বলিয়া গণ্য হয়[৩১।৩২]। ঘটপটাদি আকারে অবস্থিত এই সকল পদার্থ সুবৃহৎ দর্পণ স্থানীয় উক্ত চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। (অর্থাৎ প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা ভাবে দৃষ্ট হইতেছে)[৩৩]। এই চিদাত্মাই বৃদ্ধের বৃদ্ধতা ও ক্ষয়িষ্ণুর ক্ষয়শীলতা, সতে সত্তা ও অসত্তে অসত্তা সম্পাদন করিতেছে[৩৪]। এই চেতনা সকল ভূতের অদৃশ্য অথচ বিগলিতমনাদিগের ইহা প্রাপ্য। বিগলিতচিত্ত আত্মবিদ্গণ ইহাকে নির্ম্মল ব্যোমের সমান সন্দর্শন করেন[৩৫]। এই এক চিদাত্মাই নানাপ্রকার চঞ্চরীক (ভ্রমর) যুক্ত অসঙ্খ্য দৃশ্যমঞ্জরীর মহান্ বৃক্ষ[৩৬]। ইহা হইতেই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের রচনা নিষ্পন্ন হইয়াছে[৩৭]। এই ত্রৈলোক্যোদরে যাহা যাহা আছে, কি ব্রহ্মা কি তৃণ, ইনিই সে সমুদায়ে এক বা অভিন্ন ও সে সকলেরই আত্মা ও প্রকাশক[৩৮]। সুতরাং আমাতেও অভিন্ন ও আমার (অহং

এই মূল মনোবৃত্তির) বা ব্যবহারিক আত্মার প্রকাশক। অতএব, আমি আদিরহিত অন্তবর্জ্জিত সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাকৃতি এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমুদায় পদার্থের অন্তরে স্বানুভূতিরূপে (আমি আমি ইত্যাকারে) অবস্থান করিতেছি[৩৯]। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় আমারই এই সমস্ত (অসঙ্খ্য) স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহ[৪০]। আমি যখন এক, স্বপ্রকাশ ও স্বানুভূতি স্বরূপ, তখন আমিই আধারভেদে বিবিধাঙ্গ ও সেই সেই অনুভূতিরূপে রাজমান। অর্থাৎ সে সকল অনুভূতিও আমি। অতএব, আমিই সর্ব্বদ্রষ্টা ও সহস্রকরলোচন[৪১]। আমি সুন্দর সূর্য্যদেহ দ্বারা নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছি ও বায়ুদেহদ্বারা সকল স্থানে অবস্থান করিতেছি[৪২]। এই যে সৌভাগ্যের প্রসিদ্ধ বিশ্রাম স্থান ও শঙ্খচক্রগদাধর নীলকান্তকান্তি বপুঃ, এ বপু আমারই বপু[৪৩]। আমিই এই বপুতে উৎপন্ন অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়া পদ্মাসনগামী হইয়া থাকি[৪৪]। আমিই গৌরীর বদনপদ্মের ষট্‌পদস্বরূপ ত্রিনেত্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি[৪৫]। আমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, জীর্ণ, যুবা, বালক ও জাত এবং অজাত এবং আমিই ইন্দ্ররূপে এই ত্রৈলোক্য পালন করিতেছি[৪৬।৪৭]। আমি তৃণ গুল্ম তরু ও লতা প্রভৃতিতে রসরূপে অবস্থান করি এবং আমিই বালকের ক্রীড়াপুত্তলিকা নির্ম্মাণের ন্যায় এই জগদাড়ম্বর পুনঃ পুনঃ কল্পনা করিয়া থাকি[৪৮।৪৯]। এই সমস্ত আমার এবং এ সকল আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমাতেই অবস্থান পূর্ব্বক আমাতেই আমা কর্ত্তৃক বিলীন হয়। অতিবিস্তৃত ও যৎপরোনাস্তি স্বচ্ছ আদর্শস্থানীয় চিদ্রূপ আমাতে যখন যাহা প্রতিফলিত হয়, তখন তাহা আমাতেই উপস্থিত থাকে, অন্যথা তাহা থাকে না[৫০।৫১]। আমিই পুষ্পে সুগন্ধ, পত্র পুষ্পে ছবি, ছবিতে রূপ, রূপে অনুভব[৫২]। যে কিছু স্থাবর বা জঙ্গম দৃশ্য, সমস্তই আমি অর্থাৎ সমস্তই পরম চিৎতত্ত্ব[৫৩]। যেমন আদ্যা রসাত্মিকা শক্তি প্রসৃতা হইয়া সমস্ত তৃণ গুল্মাদিতে অবস্থান করে তাহার ন্যায় আমিই সমস্ত বস্তুতে অবস্থান করিতেছি[৫৪]। আমিই স্বেচ্ছামত সর্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রাগুক্ত শক্তি অবলম্বনে সম্বিৎ বৈচিত্র্য বিস্তার করিতেছি। (ইহা কটু, ইহা কষায়, ইহা তিক্ত, ইত্যাদিবিধ জ্ঞানবৈচিত্র্য)[৫৫]। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, জলে রসশক্তির ন্যায় ও সর্ব্বভূতে চিৎশক্তির ন্যায় আমিই সকলের অন্তরে

অবস্থান করিতেছি[৫৬]। যেমন অবনীতে তৃণ কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি, তেমনি, চিদ্রূপ আমাতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিকালস্থ জগৎ[৫৭]। আমি অপ্রার্থিত অশেষ জগৎ প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গদ্বারা অশেষ দিক্‌কুক্ষি পরিব্যাপ্ত করতঃ সর্ব্বসঙ্কোচবিভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরাট, সম্রাট্ ও একমাত্র কর্ত্তা স্বরূপে অবস্থান করিতেছি[৫৮]। আমার এই বিস্তৃত জগৎ রাজ্য অপূর্ব্ব ও অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত। ইহা অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা বিদলিত হয় না, বিনষ্ট হয় না, এবং ইহাতে ইন্দ্রেরও আধিপত্য নাই[৫৯]। কল্পান্ত-কালীন অর্ণবের একার্ণবত্ব প্রাপ্তির ন্যায় আমিই স্বয়ং আমাতে একাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিততাত্মা হইয়াছি[৬০]। আমি আপনিই আপনার নিরতিশয়ানন্দরূপতার অন্ত পাইতেছি না। সর্প যেমন ক্ষীর সমুদ্র জলে সন্তরণ করিয়া তাহার অন্ত পায় না তাহার ন্যায়[৬১]। এই ব্রহ্মাণ্ড অতিক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত। যেমন বিল্বফলে হস্তীর সমাবেশ হয় না তাহার ন্যায় ইহাতে আমার সমাবেশ হইতেছে না[৬২]। বিরিঞ্চিভবনের (ব্রহ্ম-লোকের) পারে ও স্যাংখ্যাদি পরিকল্পিত তত্ত্বের উপরেও আমার স্বরূপ বিরাজ করিতেছে[৬৩]। আমি অসীম। তথাপি আমি ইতিপূর্ব্বে কেন যে "এই আমি" এইরূপ ভাবিতাম তাহা এখন অবক্তব্য। সেই ভাবনা বা কল্পনা নিরবলম্বনা। অর্থাৎ বস্তুশূন্য বিকল্পজ্ঞানতুল্য মিথ্যা। অপিচ ঐ অহং কল্পনাই আমাকে এত কাল পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়া ছিল[৬৪]। "অহং, অয়ং, ভবান্" ইত্যাদি কল্পনা অন্যান্য কল্প-নার ন্যায় অলীক। বস্তুতঃ কি দেহ অদেহ মৃত ও জীবিত, সমস্তই অলীক[৬৫]। আমার পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত মলিনবুদ্ধি ছিলেন। কেননা তাঁহারা এই উৎকৃষ্ট সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভব-ভূমিতে রত ছিলেন[৬৬]। এই ব্রহ্মবৃংহিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ মহাদৃষ্টিই বা কোথায়? আর অনর্থশতসঙ্কুল মিথ্যা রাজত্বই বা কোথায়[৬৭]? যত প্রকার দৃষ্টি (অনুভব বা বোধ) থাকুক, তন্মধ্যে শুদ্ধা চিন্ময়ী দৃষ্টি অনন্তানন্দসম্ভোগিনী পরোপশমশালিনী ও জয়যুক্তা। অতএব সৃষ্ট্যন্তঃস্থ, চেত্যবর্জ্জিত, চিদাত্মা ও প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপ আমাকে আমার নমস্কার[৬৮।৬৯]। আমি অজাত, সংসারভ্রমশূন্য ও মহান্ আত্মা, আমার জয় হউক। আমিই একমাত্র জীবিত ও জয়যুক্ত। আমি এই উত্তম রমণীয় শাশ্বত বোধরূপ সাম্রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদাচ অরণ্যরাজ্যে

দুঃখাদি বিভূতি সমুদায়ে রতি প্রাপ্ত হইব না[১০।১১]। যাহারা কেবল তুচ্ছতম কাষ্ঠ, জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তরের জন্য ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে সেই সকল অনাত্মজ্ঞ ক্ষুদ্র দানবকীট দিগকে ধিক্[১২]। দ্রব্যও অবিদ্যাত্মক, দেহও অবিদ্যাময়। অজ্ঞান পিতা অবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার তর্পণ করিয়া কি করিলেন[১৩]। হিরণ্যকশিপু কিছু দিন এই ত্রৈলোক্য বিভব প্রাপ্ত হইয়া কশ্যপকুলোচিত পরম পুরুষার্থ ভোগ করিলেন না, ইহা কি আক্ষেপস্থানীয় নহে[১৪]? একমাত্র আত্মাই আনন্দ। শত শত জগৎরাজ্য সে আনন্দ উদ্বোধে সমর্থ নহে। যে ব্যক্তি এ আনন্দের স্বাদ না পাইয়াছে সে শত শত রাজ্য ভোগ করিলেও বলিতে পারি, সে অল্পমাত্রও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করে নাই[১৫]। যে বাহিরে কিছুই পায় নাই অথচ অন্তরে এই পরমামৃত পানে পূর্ণান্তঃকরণ হইয়াছে, আমি বলিতে পারি, সে অখণ্ডিত সমস্ত সুখই প্রাপ্ত হইয়াছে[১৬]। মূঢ়বুদ্ধিরাই উক্ত পরম পদ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র সুখের আশায় প্রধাবিত হয়, পণ্ডিতগণ নহে। উষ্ট্রগণ ভিন্ন অন্য কোনও জন্তু সুলতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্টক বনে গমন করে না[১৭]। কোন্ প্রাজ্ঞ এই পরমা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া দুঃখদগ্ধ রাজ্যের কামনা করে? কোন্ অভিজ্ঞ ইক্ষু রস পরিত্যাগ করিয়া কটু বা নিম্ব রস পান করে[১৮]? আমার পিতৃপিতামহগণ নিতান্ত মূর্খ ছিলেন, তাই তাঁহারা আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যসঙ্কটে তৎ তাবৎ কাল বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন[১৯]। কোথায় প্রফুল্ল নন্দনবনস্থলী, আর কোথায় দগ্ধ মরুভূমি! কোথায় বোধ দৃষ্টি! আর কোথায় ভোগ বুদ্ধি[২০]! ত্রৈলোক্যে এমন রাজ্যই নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞের বাঞ্ছিত হইতে পারে। কারণ—একমাত্র চিত্তত্ত্বে সমুদয় রাজ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে[২১]। সর্ব্বব্যাপিনী নির্ব্বিকারস্বভাবা নির্ম্মলা চিতিশক্তিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমস্তই অনায়াস লভ্য[২২]। তেজের প্রকাশকারিণী শক্তি তৈজসী শক্তি, চন্দ্রের অমৃতদায়িনী ঐন্দবী শক্তি, ব্রহ্মার মহতী ব্রাহ্মী শক্তি, ইন্দ্রের ত্রিলোকরাজতা শক্তি, শক্তির পূর্ণতাপ্রদায়িনী শৈবী শক্তি, জয়লক্ষ্মীর বর্দ্ধিনী বৈষ্ণবী শক্তি, মনের শীঘ্রগতিরূপা মানসী শক্তি, বলবতী বায়বী শক্তি, দাহকারিণী আগ্নেয়ী শক্তি, রসনির্ব্বৃতিরূপিণী পাথসী (পাথস্=জল) শক্তি, মহাতপঃসিদ্ধিপ্রদা মৌনী (মুনিসম্বন্ধীয়া) শক্তি, বিদ্যারূপিণী বার্হস্পতী শক্তি, ব্যোমগতিরূপা বৈমানিকী শক্তি, স্থিরতা-

রূপিণী পার্ব্বতী (পর্ব্বতসম্বন্ধীয়া) শক্তি, গভীরতারূপিণী সামুদ্রী শক্তি, মহোন্নতিরূপা মৈরবী (মেরুসম্বন্ধীয়া) শক্তি, শান্তিরূপিণী সৌগতী শক্তি, (সুগতিসম্বন্ধীয়া) পুষ্পময়ী মাধবী (মাধব-বসন্ত) শক্তি, মদলোচনা মাদিনী (উন্মত্তাকারিণী) শক্তি, ঘননিনাদিনীরূপা বার্ষিকী (বর্ষাসম্বন্ধীয়া) শক্তি, মায়াপ্রচুরা মায়ী (ময়=এক দানব) শক্তি, নিষ্কলঙ্কা নাভসী (নভস্=আকাশ) শক্তি, সুশীতলা তৌষারী (তুষার=বরফ) শক্তি, আতপতপ্তা নৈদাঘী (নিদাঘ=গ্রীষ্মকাল) শক্তি, এবং দেশকালক্রিয়াত্মিকা ত্রিকালোদরস্থিতা বিবিধা বিচিত্রা শক্তি স্বভাবতঃই পরম নির্ম্মল নির্ব্বিকার কল্পনামুক্ত (সৃষ্ট্যুন্মুখী মায়ার উদ্রেক যুক্ত) চিদ্ব্রহ্ম হইতেই সমুত্থিত হইয়া থাকে[১৮।২০]। অতএব, সেই চিদাত্মাই চিত্পরিকল্পিত শত শত বিভিন্ন পদার্থে প্রভাকরের প্রভার ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন রূপে আকারে ও নামে ব্যবহৃত হন[২১]। যেমন প্রভাকরের প্রভা যে যে বস্তু স্পর্শ করে সেই সেই বস্তু তৎক্ষণাৎ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ, উক্ত চিৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে চিত্পরিকল্পিত সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হন। এবং এই নানা অবস্থান্বিতা জগৎশ্রীও তদ্দ্বারা চেতিত হয়[২২।২৩]। প্রকাশ্য পদার্থেরই কল্পনানুসারী ভেদ আছে, পরন্তু সে ভেদে চিতের (চেতনার) অভিন্নতা বা একত্ব অথবা অপরিচ্ছিন্নত্ব বিনষ্ট হয় না। কারণ, কল্পনা অভাবে তাহার পূর্ণতা ও শুদ্ধতা স্পষ্টতঃই প্রকাশমান হয়[২৪।২৫]। যত বার হউক, মধুর রস কিম্বা তিক্ত রস আস্বাদন করিবে তত বারই মধুর রস অথবা তিক্ত রস একই (চৈতন্যের) অনুভূতির গম্য হইবেক। সে সকল যুগপৎ আস্বাদন করিলেও সেই একই অনুভূতির (চৈতন্যের) গম্য বা বিষয় হয়। ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, মধুর বা তিক্ত এই দুই বিষয় এক নহে; কিন্তু বিভিন্ন; পরন্তু যাহা অনুভূতি অর্থাৎ গ্রাহক চৈতন্য, তাহা অভিন্ন। অপিচ, সঙ্কল্প বা কল্পনা দ্বারা বিরচিত পদার্থ রাশি সংখ্যাগণনার অতীত; কিন্তু তৎসমুদায় পদার্থে অবগাহিত বা তৎ সমুদায়ের প্রকাশক চিৎ পদার্থের সত্তা ও রূপ এক বা একই প্রকার। যে হেতু প্রকাশ্য পদার্থরাশি অসংখ্য প্রকার; সেই হেতু পদার্থ রাশির ভেদ উপলক্ষ্যে মূঢ় দিগের দর্শনে একাদ্বয় চিতের ভেদ (ঔপাধিক ভেদ) ভ্রান্ত অনুভবে সমারূঢ় হইয়া থাকে। অতএব, যদি কল্পিত

ভেদ পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে আর দুঃখ শোক কি? সে সকল কোথায় থাকে[৯৬।৯৮]? চিত্ত যদি বিচার দ্বারা দৃশ্য বস্তুর অভাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই চিত্ত শোক মোহাদি পরিণাম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বিচার পরিষ্কৃত চিত্ত যখন দৃশ্য জগতের অভাব অবধারণ করে, তখন সে পরমার্থ সৎ অদ্বৈত পরমানন্দ স্বরূপ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখপ্রদ বাসনাও প্রলুপ্ত হইয়া যায়[৯৯]। কালত্রয়ে ভেদ দর্শন করে না, এরূপ চেত্যবন্ধনশূন্য চিৎ বস্তু এক সুতরাং সমান অর্থাৎ বৈষম্যবর্জ্জিত। এই চিৎ বাক্যের অগম্য অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উহার স্বরূপ বুঝান যায় না। যে হেতু কথায় বুঝান যায় না, সেই হেতু, যেন তাহা কোনও কালে নাই, এইরূপ মূঢ় প্রত্যয়ে (জ্ঞানে) সমারূঢ় হওয়ায় কখন কখন নাস্তিক সিদ্ধান্ত উদিত হইয়া থাকে[১০০।১০১]। উক্ত চিৎ আত্মা নামে ও ব্রহ্ম নামে পরিভাবিত। এবং কোন কোন শাস্ত্রে মোক্ষ নামেও অভিহিত হয়[১০২]। সর্ব্ব দৃশ্যের উপশমে মোক্ষ এবং সঙ্কল্প কল্পনায় জগৎ ও বন্ধন। বন্ধন কালে উক্ত সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টি বা বিশুদ্ধ প্রকাশ প্রতিরুদ্ধ থাকে[১০৩]। ফলতঃ ইষ্টানিষ্টসঙ্কল্পময় মালিন্যের দ্বারাই উক্ত চিতের বন্ধন দশা ঘটিয়াছে। যেমন পাশবদ্ধা পক্ষিণী নভোমণ্ডলে উড্ডয়ন করিতে পারে না, তেমনি, এই চিৎ উক্ত দশায় আপনার সর্ব্বব্যাপিতা প্রথিত করিতে সমর্থা হয় না। আমার মূঢ়াশয় পিতামহগণ ভোগসুখার্থী ও হতাশয় হইয়াই ভাবাভাবরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিলেন। হায়! হায়! ইচ্ছা দ্বেষ ও সুখ দুঃখাদি মোহ দ্বারা জীবগণ ধরাবিবরমগ্ন কীটের দশা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এবং এই সকল জীবগণ যদি উক্ত তত্ত্ব জানিতেন ও জানিত তাহা হইলে কদাচ তাঁহারা ভোগসুখ নামক দুঃখের প্রার্থী হইয়া ভাবাভাবময় অন্ধকূপে নিপতিত হইতেন না[১০৪।১০৯]। এই ভূমণ্ডলে তাহারই জীবন সার্থক বা সেই ব্যক্তিই জীবিত, যাহার অন্তরে সত্য আত্মার অববোধ (জ্ঞান) রূপ মেঘ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান রূপ মেঘ উদিত হইয়া কল্পনারূপ মৃগতৃষ্ণিকা উপশম করিয়াছে[১১০]। সেই বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন চিতের নৈর্ম্মল্যের কথা কি বলিব! তাহার তুলনায় চন্দ্রের কিরণ মলিন[১১১]। আমি অবিচ্ছিন্ন চিৎ ও আত্মা। অতএব, হে

শোকাশোকমণে! হে দেব! হে আত্মন্! তোমাকেই আমি নমস্কার করি। আমি বহু কাল পরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ও জানিয়াছি[১১২]। তুমি বিচারে পরিজ্ঞাত, লব্ধ, ও চির কালের নিমিত্ত উদিত ও বিকল্প জাল হইতে উদ্ধৃত বা মুক্ত হইয়াছ। তুমি যাহা তাহাই আছ। সুতরাং তোমাকে নমস্কার[১১৩]। তুমিই আমি; এক ও অনন্ত। আমি তুমি অভিন্ন ও শিবময়। আমি তুমি অধিদেব ও পরমাত্মা, আমাকে তোমাকে নমস্কার[১১৪]। নির্ম্মেঘ আকাশে নিম্মল বস্ত্রের ন্যায় এই যে দেহাকাশে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আনন্দময় ও নিরাধার পরমাত্মা আমি আপনারই স্বরূপে বিরাজ করিতেছি। অতএব, আমিই আমাকে নমস্কার করি[১১৫]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—(✕(*)✕)—

প্রহ্লাদ বলিলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ওঁই ব্রহ্ম এবং ওঁই বিকার সমূহের অতীত নিত্য ও নির্ব্বিকার বস্তু। * জগতে যাহা কিছু, সে সমস্তই ওঁ বা আত্মা[১]। ওঁকারের বাচ্য আত্মা মেদ, অস্থি, মাংস ও রুধিরাদিময় শরীরের অতীত অথচ অন্তরস্থ। দীপ যেমন গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া আপনাকে ও গৃহস্থিত বস্তু সকলকে প্রকাশ করে তাহার ন্যায় চেতন আত্মাও এই শরীরকে, শরীরস্থ রক্ত মাংসাদিকে এবং শরীরবহির্ভাগে ঘটপটাদি ও সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতিকে প্রকাশ করিতেছেন[২]। অগ্নিকে উষ্ণ ও জলকে শীতল করিতেছেন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অনুভাব্য পদার্থ নিচয়কে সেই সেই স্বভাবে (যেমন পৃথিবীর স্বভাব কঠিনস্পর্শ ও বিচিত্র রূপ প্রভৃতি) সম্পন্ন করিয়া রাজার ন্যায় উপভোগ করিতে-ছেন[৩]। ইনি অবস্থিতি করিতেছেন অথচ উপবিষ্ট নহেন। (অবস্থিতি=নিশ্চল অবস্থায় থাকা)। গমন করিতেছেন আবার গমন করিতেছেন না। (বায়ু প্রভৃতিরূপে সদাগতি এবং মহাকাল রূপে গতিরহিত)। শান্ত স্বভাব অথচ ব্যবহারস্থ। তিনি কার্য্য করেন অথচ সে সকলে অলিপ্ত। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ, এক্ষণেও সেইরূপ, পরেও সেইরূপ। ইহকালে যেরূপ, পরকালেও সেইরূপ, ইহ পর উভয় কালের সন্ধি স্থানেও সেই রূপ। (ইহ-পর উভয় কালের সন্ধি—মরণের পর জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত। এবং জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থার সন্ধিস্থল বলিলেও বলা যায়) তথা বিহিতও ইনি, নিষিদ্ধও ইনি। ইনি সমুদায় পরিবৃত্তিতে সমান[৪]।[৫]। (পরিবৃত্তি=পরিবর্ত্তন)। আমি দেখিতেছি, ইনি সর্ব্বদা অভয়, এবং

---

* ব্রহ্মের নাম ওঁ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে সম্বোধন করিতে, ডাকিতে ও ভাবিতে (ধ্যান করিতে) হইলে ওঁ এই নাম অবলম্বন করিতে হয়। ওঁ এটী নাম, ব্রহ্ম তাঁহার নামী। নাম ও নামী যখন অভেদ উপাসনায় এক হইয়া যায়, ভেদ জ্ঞান থাকে না, তখন ব্রহ্মের নাম হইলেও ওঁকারকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলা যায়। প্রহ্লাদের তাহাই হইয়াছিল, তাই তিনি ওঁকারকেও সর্ব্বময় বলিলেন।

ইনিই অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার স্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়রূপে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত জগতের বিধান করিয়াছেন ও করিতে-ছেন[৬]। এই আত্মা বায়ুদেব অপেক্ষা অধিক স্পন্দনকারী, স্থাণু অপেক্ষা নিশ্চল এবং আকাশ অপেক্ষা নির্ম্মল[৭]। সারথি যেমন অশ্ব পরিচালন করে তাহার ন্যায় এই দেব সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণকে ও তদ-ধিপতি দেবতাদিগকে (যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতা সূর্য্য) পরিচালিত করিতেছেন[৮]। যেমন কোন সম্রাট্ স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে দুর্দ্দশাপন্ন অনুভব করে তাহার ন্যায় এই বিভু আত্মা সদা স্বাত্মতৃপ্ত ও স্বস্থ স্বভাব হইলেও অজ্ঞানপ্রবল অতিদুর্দ্দশাগ্রস্থ দেহরূপ গৃহে কর্ম্মরত হওয়ায় আপনাকে কর্ম্ম কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতেছেন এবং সে সকলের কল্পিত ফল ভোগও করিতেছেন[৯]। অতএব, আমি দেখি-তেছি, উক্ত দেবই আমাদের অন্বেষ্য, স্তুত্য ও ধ্যাতব্য। কেননা উহারই প্রসাদে আমরা জন্ম মরণ সম্ভ্রম (সংসার ভ্রান্তি) হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারি[১০]। ইনি আমাদের অত্যন্ত সুলভ, সুজেয় ও আপ্ত বান্ধবের ন্যায় সুপ্রিয়। ইনিই সমুদায় জীবের দেহ পদ্মের মধ্যগত ভ্রমর; সুতরাং সুলভ[১১]। ইঁহাকে উচ্চৈঃ রবে ডাকিতে হয় না বা আহ্বান করিতে হয় না। কেননা ইঁহাকে আপনার দেহ-মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণ করিবা মাত্র ইনি অভিমুখীন হন[১২]। সর্ব্বসম্পত্তিশালী এই বিভুর সেবকেরা ধনেশ্বর দিগের সেবকের ন্যায় গর্ব্বিত ও বিস্মিত হন না[১৩]। যেমন পুষ্পে সৌগন্ধ, তিলে তৈল এবং রসমান পদার্থে রস বা স্বাদ থাকে, সেই-রূপে, এই দেব এই দেহে বিরাজ করিতেছেন[১৪]। যেমন পূর্ব্ব পরি-চিত ব্যক্তি কালব্যবধানের দোষে অর্থাৎ বহুকালের পর সম্মুখে সমাগত হইলে, তদীয় পুত্রাদি তাহাকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ, এই আত্ম-দেব সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে থাকিলেও আমরা তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী অজ্ঞান অন্ধকারের দোষে চিনিতে পারি না[১৫]। এই ঈশ্বর বিচার-পরিজ্ঞাত হইলে প্রিয়জনপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হওয়া যায়[১৬]। এই আনন্দপ্রদ পরম বন্ধুর দর্শনে এরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় যে, যে জ্ঞান জন্মমরণাদির অপহার করিতে সমর্থ[১৭]। তখন কামক্রোধাদি শত্রুগণ স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত ও আশাপাশ সকল সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন হইয়া যায়[১৮]।

ইনি দৃষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ দৃষ্ট হয়, শ্রুত হইলে সমুদায় শ্রোতব্য শ্রুত হয়, স্পৃষ্ট হইলে স্পৃষ্ট হয় এবং ইনি আছেন বলিয়াই এই জগৎ আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়[১৯]। ইনি সুপ্ত দিগকে জাগরিত করেন, অবিবেকী দিগকে বিবেক দান করেন, আর্ত্ত দিগকে ত্রাণ করেন এবং দেবোপাসক দিগকে বর প্রদান করেন[২০]। ইনিই চৈতন্যরূপে সমস্ত পদার্থের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অপিচ, ইনিই জীব হইয়া জগতের স্থিতি বিধান করিতেছেন। ইহপরলোকে বিচরণ করিতেছেন, ভোগ বিলাসে বিরাজ করিতেছেন এবং উৎসবাদিতে শোভা পাইতেছেন[২১]। যেমন মরিচে তীক্ষ্ণতা অবস্থিত, তেমনি, ইনি সমুদায় দেহে আপনিই আপনার শান্তিতে অবস্থিত। ইনিই জীবের চেতনা এবং ইনিই জীবের কলনা। (ভূত ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান যদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম চেতনা এবং বর্ত্তমান জ্ঞান যদ্দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহার নাম কলনা।) উক্ত উভয় রূপে তিনি অন্তরে ও বাহিরে রহিয়াছেন এবং বিশেষ সত্তার পরিনিষ্ঠায় (সঙ্কলনে) যে সামান্য সত্তা, তদ্রূপেও তিনি জগৎ আড়ম্বরের মূলে রহিয়াছেন[২২।২৩]। আকাশের শূন্যতা, বায়ুর গতি, তেজের প্রকাশ, জলের রস, মৃত্তিকার কাঠিন্য, অগ্নির উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, জগতের অস্তিতা, এ সমস্তই আত্মা। যেমন অঞ্জনে কৃষ্ণতা, হিমপিণ্ডে শৈত্য, পুষ্পে গন্ধ, তেমনি, এই দেহে দেহপতি আত্মা[২৪।২৬]। যেমন সর্ব্বগত কাল ও সত্তা নিত্য প্রকাশিত, তদ্রূপ, আত্মাও নিত্য প্রকাশিত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে তথা মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপারে বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে কিছু প্রকাশিত, সে সমস্তই আত্মা অথবা আত্মার দ্বারা প্রকাশিত। আত্মাই প্রকাশস্বভাব। সেই এই আত্মাই মহাদেব এবং সর্ব্বদেবের প্রকাশক। অতএব, একমাত্র আমি—আত্মাই আছি, অপর কিছু নাই। আর সব আমার কল্পনা মাত্র। আমি এই সমুদয় কল্পনা করিলেও আমি পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ত রহিয়াছি[২৭।২৯]। যেমন প্রস্তরের ভয় কম্পাদি নাই তেমনি আমারও ভয় কম্পাদি নাই। আমি অভয়। সুখ দুঃখাদি সমুদায় দেহে আপতিত হউক বা না হউক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই[৩০]। জল অলাবুপাত্রাকাশের কি ক্ষতি করিবে? (অলাবুপাত্রাকাশ অর্থাৎ তন্মধ্যস্থ ফাঁক) তৈলাদি অতিক্রমকারী দীপের আবার বদ্ধতা

কোথায়[৩১] ? সর্ব্ব পদার্থের অতীত আমি কিসে আবদ্ধ হইব ? কামের সহিত, ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ভাব অভাবের সহিত আমার সম্পর্ক কি ? ব্যোম কি কথন কোন কিছুর দ্বারা বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয় ? মনঃও ব্যোমের ন্যায় অবদ্ধ স্বভাব। অতএব, শরীর শত খণ্ড হইলে তাহাতে অশরীরী আত্মার ক্ষতি কি ? ক্লেশ কি[৩২।৩৩] ? কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভাকাশের কি ক্ষতি হয় ? মন পিশাচের ন্যায় অদৃশ্য ও মিথ্যা সমুদিত; তাহার বিনাশে আমার ক্ষতি কি ? যাহার সুখদুঃখময়ী বাসনা আছে তাহাই মন। তাহা অজ্ঞানকালেই ছিল, এখন আর তাহা নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা ছিলাম এখন তাহাই হইয়াছি। এখন এক হইয়াছি এবং সুখ দুঃখাদির বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি। কি আশ্চর্য্য! অপরে করে, অন্যে গ্রহণ করে, এবং অপরে সঙ্কটদশা অনুভব করে, অথচ আমি তজ্জন্য সুখ দুঃখ ভাগী হই[৩৪।৩৬]। অহো! ইহা কোন্ কুচক্রীর চক্র (পরিবর্ত্তনচাতুরী) ? বুঝিয়াছি, উহা মূর্খতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রকৃতির দোষে দূষিত হইয়া আমরা ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কটদশা দর্শন করিতেছি। কারণ, আমার ভোগ বাঞ্ছা নাই ও ভোগ বর্জ্জনের ইচ্ছাও নাই[৩৭।৩৮]। এখন যাহা আসিবার আসুক, যাইবার যাউক, হইবার হউক, সুখের স্পৃহাও নাই, দুঃখের উদ্বেগও নাই[৩৯]। সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হউক বা না হউক, আমার তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কি ? দেহ থাকিলে বাসনার উদয়ও হয়, অস্তও হয়, আমি তাহাতে লিপ্ত নহি। এবং আমাতেও সে সকল লিপ্ত নহে। আমি এ যাবৎ অজ্ঞান রিপু কর্ত্তৃক অভিভূত ছিলাম[৪০।৪১]; ঐ সকল রিপু আমার বিবেকরূপ ধন অপহরণ করিয়া আমাকে প্রতারিত করিয়া ছিল। এখন স্বয়ং সমুত্থিত বিষ্ণুর প্রসাদে আমি ঐ সকল কু চক্র বুঝিয়াছি। এখন আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি, আমার বিবেক ধন চোরিত হইয়াছিল। এক্ষণে একমাত্র বিবেক দ্বারা আমার দেহতরুকোটর হইতে অহঙ্কার পিশাচ দূরীকৃত হইয়াছে। আমার এই দেহদ্রুম হইতে অহঙ্কার যক্ষ পলায়ন করিয়াছে। দরিদ্রতা দোষ ক্ষয় হইয়াছে, বিবেক ধনে ধনী হইয়াছি। যে কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই পরিজ্ঞাত হইয়াছি, যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়াছি, প্রাপ্তব্য সকল পাইয়াছি। এখন আমিই পরমেশ্বর। ভাগ্য বশতঃই আজ্ আমার নিকট হইতে বিষয়রূপ সর্প দূরে পলায়ন করি-

য়াছে[৪৬।৪৭]। যে স্থানে মোহরূপ মিহিকা প্রশান্ত, আশারূপ মৃগতৃষ্ণিকা অপ্রবাহিত, দিক্ সকল নির্ম্মল, উপশম ক্রমাবলী শীতলছায়াযুক্ত, আমি সেই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। স্তুতি, নমস্কার, বিজ্ঞান, শম, দম ও নিয়ম দ্বারা আজ্ আমি ভগবান্ আত্মার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এখন আমার স্মরণ হইতেছে, আমি অহঙ্কারের অতীত[৪৮-৫০]। এত কাল আমি সেই অহঙ্কার শত্রু কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয় সর্পের গর্ত্তে, মরণ স্থানের কুহরে, তৃষ্ণাকরঞ্জের কুঞ্জে, কামের কোলাহলে, বাসনার অরণ্যে, জন্মকূপের উদরে, দুঃখদাবাগ্নির দাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত ছিলাম। পতন উৎপতন প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছি। বার বার মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়াছি। আবির্ভাব ও তিরোভাব ভোগ করিয়াছি। অহো! এত কাল আমি আশা রজ্জুতে বৃথা বদ্ধ হইয়া ছিলাম[৫১।৫৪]। অহঙ্কার পিশাচ আমাকে এত কাল ঘোর জঙ্গলে হতবীর্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। এখন আমি নিজ ক্রিয়াশক্তির ও জ্ঞানশক্তির সাহায্যে সুপ্রসন্ন ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপায় প্রবোধিত হইয়াছি। আমার অন্তরাত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ ঈশান বোধগম্য হওয়াতে আমার অন্তরস্থ অহঙ্কার রাক্ষস পলায়ন করিয়াছে। এখন আর তাহাকে দেখিতে পাই না। যেমন সূর্য্যের উদয়ে তিমিরের পলায়ন, তেমনি, ভগবানের দর্শনে অহঙ্কারের পলায়ন। যেমন নির্ব্বাপিত দীপের গতি জানা যায় না, কোথায় যায় কি হয় তাহা বুঝা যায় না, সেইরূপ মনোবৃক্ষস্থ অহঙ্কার যক্ষ এখন কোথায় গিয়াছে কি হইয়াছে তাহা জানিতেছি না। যেমন সূর্য্যোদয়ে চোরের পলায়ন, সেইরূপ ঈশানের দর্শনে অহঙ্কার যক্ষের পলায়ন। পিশাচ (ভূত) নাই; তথাপি তাহা ভ্রান্তির দ্বারা উদিত হয়। সেইরূপ নিঃস্বরূপ বা মিথ্যা অহঙ্কারও ভ্রান্তির কল্পনায় উদিত হইয়াছিল[৫৫।৫৯]। সে এখন গিয়াছে, এখন আমি সর্পপরিত্যক্ত (সাপ ছিল, এখন সে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে) বৃক্ষের ন্যায় নিরুপদ্রব। অহঙ্কার তস্কর আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এখন আমি সুখী ও নির্ব্বিক্ষেপ। যেমন জলবর্ষণে দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহার ন্যায় আমার অন্তঃস্থ আশামৃগতৃষ্ণিকা এখন নির্ব্বাপিত। এখন আমার মোহই বা কি? অমোহই বা কি? দুঃখ, আশা, আধি, নরক, স্বর্গ ও মোক্ষ ও বন্ধ প্রভৃতি ভ্রম এখন কোথায়? ঐ সকল কেবল অহঙ্কার দ্বারাই

প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। চিত্রক্রিয়া ভিত্তিতেই হয়, আকাশে নহে। অহঙ্কাররূপ পিত্তজ উন্মাদ দশাতেই ঐ সকল চমৎকার সংঘটিত হয়, স্বস্থ দশায় নহে। মলিন বস্ত্রে কুঙ্কুম্ রাগের অনুরঞ্জনা হয় না[৬৩।৬৪]। আমার চিত্তরূপ শরদাকাশ অহঙ্কারমেঘ ও তৃষ্ণারূপ আসার (অবিশ্রান্ত জলবর্ষণ) বিবর্জ্জিত হইয়াছে, এখন আমি নির্ম্মল প্রকাশে শোভা পাইতেছি[৬৫]। হে আত্মন্! হে অহঙ্কারপঙ্কপরিশূন্য, সুপ্রসন্নান্তর, আনন্দরসভরিত! পরমাত্মরূপ তোমাকে আজ্ নমস্কার[৬৬]। হে আত্মন্! হে ইন্দ্রিয়রূপ ঘোর জলদজাল রহিত, চিত্তরূপ বাড়বানল বর্জ্জিত ও আনন্দাব্ধিতুল্য তোমাকে আজ্ নমস্কার[৬৭]। আমার অহঙ্কার মেঘ বিগলিত ও আশারূপ দাবানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন আমি আনন্দে পরিপূর্ণ ও পরম বিশ্রান্ত[৬৮]। আজ্ আমার আনন্দপদ্ম প্রফুল্ল হইয়াছে ও চিন্তারূপ উর্ম্মী (তরঙ্গ) প্রশান্ত হইয়াছে। আজ্ আমার অন্তর দেব সরোবরের সমান[৬৯]। হে হৃদ্‌পদ্মবাসিন্, সম্বিদাভাসপক্ষসম্পন্ন (অহং মম এই দুই মিথ্যা জ্ঞান রূপ পাখা) ও প্রাণিগণের মানসহংস! হে প্রত্যগাত্মন্! তোমাকে নমস্কার করি[৭০]। হে কল্পনাকলঙ্করহিত, পীযূসময় ও সদা উদিতস্বভাব পরমাত্মরূপ পূর্ণ বস্তু! তোমার প্রতি আমার নমস্কার[৭১]। হে নিত্যোদিত গতিবর্জ্জিত মহান্ধকারনাশিন্ সর্ব্বব্যাপিন্ অদৃশ্য চিৎসূর্য্য! তোমার প্রতি আমার নমস্কার[৭২]। হে অতৈল চিৎপ্রদীপ! তুমি পরম প্রেমের উদ্দীপক, বুদ্ধির প্রকাশক ও সর্ব্বপ্রকার স্বভাবের আধার বা আশ্রয়, আমি তোমাকে নমস্কার করি[৭৩]। কৃষ্ণারস (ইস্‌পাত) সন্তপ্ত লৌহকে ভগ্ন করে, পরন্তু আমি আজ্ শীতল (শমদমাদিপরিশোধিত) মনের দ্বারা কামক্রোধাদি সন্তপ্ত মনকে ভগ্ন করিয়াছি[৭৪]। আমি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে অর্থাৎ শুদ্ধতার দ্বারা উহাদের অশুদ্ধতাকে, মনের দ্বারা মনকে ও অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কারকে ছেদন করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছি[৭৫]। শ্রদ্ধার দ্বারা অশ্রদ্ধাকে, অতৃষ্ণার দ্বারা তৃষ্ণাকে ও প্রজ্ঞার দ্বারা অপ্রজ্ঞাকে ছেদন ও নিষ্পেষণ করিয়া জ্ঞপ্তিস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ হইয়াছি, এ নিমিত্ত আমাকে আমার নমস্কার। মনের দ্বারা মন ছিন্ন ও নিরহঙ্কার হওয়ায় এবং ব্রহ্মাহংভাবের দ্বারা দেহাহং ভাব বিগলিত হওয়ায় আমি আজ্ কেবল, স্বচ্ছ ও স্বস্থ সদ্ভাবে স্থিতি করিতেছি[৭৬।৭৭]। আজ্ আমার এই বপুঃ ভাবনাশূন্য নিরহঙ্কার নির্ম্মনস্ক কেবল ও বিশুদ্ধ

পরমাত্মায় পদ্মপত্রে জলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে[৭৮]। ভক্তগণ যাঁহাদের অনুকম্পায় হেলাক্রমে (বিনা ক্লেশে) ঐশ্বর্য্য লাভ করে, আজ্ আমার তাঁহাদের অপেক্ষা অতিশয়িত নিবৃত্তি (নিরতিশয় সুখ বা বিশ্রান্তি)' জন্মিয়াছে[৭৯]। মোহবেতাল প্রশান্ত, অহঙ্কার-রাক্ষস পলায়িত ও কু-আশা-পিশাচী পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখন আমি বিজ্বর[৮০]। আমার এই দেহপিঞ্জরে দুরহঙ্কার পক্ষী ছিল, সে পক্ষী আজ্ তৃষ্ণারজ্জু ছিন্ন হওয়ায় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহা আর জানা যায় না[৮১]। এই দেহ বৃক্ষে যে অহম্ভাবরূপ বিহঙ্গ ছিল, অজ্ঞান কুলায় ভগ্ন হওয়ায় সে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে তাহা আর জানা যায় না[৮২]। কি সৌভাগ্য! ভয়রূপ সর্পের সহায় ও দুর্ব্বাসনা নিচয় যে আমার সমাধিতে ভস্মীভূত হইয়াছে ইহা আমার সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে[৮৩]? কি আশ্চর্য্য! এত কাল আমি কি হইয়া ছিলাম! কেন যে এত সুদৃঢ় অহঙ্কারে বদ্ধ ছিলাম তাহা আমি জানি না[৮৪]। আজ্ আমি তৃষ্ণারূপ ও অহঙ্কাররূপ মহামোহের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছি, সুতরাং আজ্ আমি মহামতি[৮৫]। আজ্ আমি ভগবান্ আত্মাকে দর্শন করিতেছি সুতরাং প্রাপ্ত' হইয়াছি। কেননা, তিনি আমার স্বীয় অনুভূতিতে নিয়োজিত রহিয়াছেন[৮৬]। আমার মন পরমাস্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। মনন, ঐষণ, (অর্থাৎ নানা প্রকার ইচ্ছা) অহঙ্কৃতি, ভ্রম ও রাগরঞ্জন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সমতায় অবস্থান করিতেছে। আমি সর্ব্বপ্রকার বিষয়রূপ মহাপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমার অন্তরস্থ সমাধিগত মহেশ্বর অক্ষয় এবং অদ্বয় চিৎ আমার অন্তরে স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছেন। অহো ভাগ্য[৮৭।৮৮]!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

—(⋞(*)⋟)—

প্রহ্লাদ বলিলেন, এত কালের পর ভাগ্য বশতঃই সর্ব্বপদাতীত আত্মা আজ্‌ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছেন। হে ভগবন্‌! তোমাকে আমি পাইয়াছি। সে নিমিত্ত তোমাকে নমস্কার[১]। আমি তোমাকে আজ্‌ সম্যক্‌ দর্শন, অভিবন্দন ও সমাধিতে তোমার আনন্দ-রূপের আলিঙ্গন (অনুভব) করিতে সমর্থ হইয়াছি। হে ভগবন্‌! এই ত্রিভুবনে তোমার ন্যায় প্রিয় বন্ধু আর কে আছে[২]? হে মিত্র! যাবৎ তুমি সম্যক্‌ পরিজ্ঞাত ও প্রাপ্ত না হও তাবৎ বিনাশ, গমন, প্রদান ও বিলাস প্রভৃতি করিয়া থাক। তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ, এখন তুমি কি বিনাশ করিবে? কোথায় গমন করিবে? এবং কি কার্য্যই বা করিবে[৩]? তুমি স্বসত্তায় অশেষ জগৎ পরিপূর্ণ করতঃ বিরাজিত ও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছ, এখন তুমি কোথাও পলায়ন করিতে পার না। অহে প্রিয়! এখন তোমার গমনের স্থান কোথায়? হে বন্ধো! আমি ভাগ্য বলে তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি। অজ্ঞান থাকায় এত দিন তুমি দূরে ছিলে, আজ্‌ অজ্ঞানের অভাবে সমীপস্থ হইয়াছ। (আত্যন্তিক অভেদ রূপ সামীপ্য প্রাপ্ত)[৪।৫]। তুমি নিত্যকৃতার্থ, অথচ তুমিই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা এবং তুমিই সংসারের বৃন্ত (বোঁটা)। তুমি নিত্য ও বিশুদ্ধস্বভাব। তোমাকে নমস্কার[৬]। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, এ সমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার[৭]। ব্যবহার চক্ষে দেখিতে গেলে তোমায় আমায় ভেদ, পরন্তু পারমার্থিক দর্শনে ভেদ নাই। ব্যবহার দৃষ্টি কল্পনামূলক সুতরাং জলতরঙ্গবৎ অসত্য[৮]। তুমি অনন্ত; অথচ তুমি অনন্ত নভোমণ্ডলে অনন্ত বস্তুবৈচিত্র্য ও ভাবাভাব বিলাসাদির দ্বারা নিয়তির সহিত বিজৃম্ভিত হইতেছ। তুমিই দ্রষ্টা, তুমিই স্রষ্টা, তুমিই অসঙ্খ্য স্বভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বগ। অতএব, হে সর্ব্বভাবাত্মন্‌! তোমাকে নমস্কার[৯।১০]। এত কাল আমি জীবিতাপন্ন হইয়া জন্ম জন্ম দুঃখভোগ করিয়াছি, তোমারই নিয়মে (অর্থাৎ নিজের নিয়তির দ্বারা)

অসৎ পথে পতিত হইয়া দগ্ধপ্রায় হইয়াছি, এবং ঈশ্বরভাব হারাইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছি। অপিচ, এই লোকত্রয়কে তোমা হইতে ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছি। অথচ এ যাবৎ তাহাতে কিছুমাত্র প্রাপ্ত হই নাই[১১।১২]।

হে দেব! এই মৃণ্ময়, বারিময়, কাষ্ঠময় ও পাষাণময় জগতে তোমা ব্যতীত কিছুই নাই। এমন কিছু নাই যে তোমা ব্যতীত সেই পদার্থের প্রাপ্তিতে পুরুষেচ্ছা পূর্ণা হয়। হে দেব! বহু কালের পর আজ্ তোমাকে লাভ করিয়াছি, দর্শন করিয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রহণ করিয়াছি। (ধরিয়াছি)[১৩।১৪]। অহো! কি মূর্খতা, যিনি দর্শনরূপে চক্ষুর কনীনিকাস্থ (কনীনিকা=চক্ষুর মণি বা তারা) রশ্মিজালে আবৃত হইয়া আছেন, অথচ তিনি দৃষ্ট হন না[১৫]। যিনি ত্বক্ ও স্পর্শ শক্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি কি না অনুভূতির গম্য হন না, ইহা সামান্য বিস্ময়াবহ নহে! যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে থাকিয়া শব্দশক্তি ও শব্দ গ্রহণ করিতেছেন, অঙ্গে পুলক উৎপাদন করিতেছেন, তিনি কেন দূরস্থের ন্যায় থাকেন[১৬।১৭]? যিনি জিহ্বাগ্রে আছেন, জিহ্বালগ্ন দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন, তিনি যে অজ্ঞাত থাকেন ইহা সমধিক আশ্চর্য্য[১৮]! যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ হস্তের দ্বারা পুষ্প গন্ধ গ্রহণ করতঃ স্বাশ্রয়ীভূত দেহ দেখিতেছেন তিনি ত করস্থই আছেন, তথাপি অবিজ্ঞাত। কেন যে তিনি অপ্রত্যক্ষ থাকেন তাহা জানি না[১৯]? যিনি বেদবেদান্তসিদ্ধান্তে, পুরাণে ও গীতিমালায় নিরন্তর গীত ও বিজ্ঞাত হইতেছেন, তিনি কেন জনগণের স্মৃতিপথাতীত হন? আমি আজ্ সৌভাগ্যবলেই সেই দেহপদ্মের ভ্রমর স্বরূপ ভগবান্‌কে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। হে বিশ্বভৃৎ! তুমি আমার অন্তরে আবির্ভূত হওয়ায় আমার অন্তর আজ্ ভোগাস্বাদে বিরত হইয়াছে। হে লোকনাথ! তুমি ঐ ভানুদেবেরও প্রকাশক বিমল দীপ এবং শীতকিরণ চন্দ্রও তোমার প্রভাবে শীতল[২০।২২]। তোমারই দ্বারা শৈল সকল গুরুভার, খেচর সকল বিধৃত, পৃথিবী স্থিরা এবং আকাশ অবকাশময়[২৩]। ভাগ্যক্রমেই তুমি মত্তাবাপন্ন এবং আমি ত্বত্তাবাপন্ন হইয়াছেন ও হইয়াছি। হে দেব! এক্ষণে আমিই তুমি এবং তুমিই আমি, আমাদের মধ্যে আর এখন প্রভেদ নাই[২৪]। "ত্বং ও অহং" তুমি ও আমি, এই দুইটী এখন পর্য্যায়শব্দ এবং তোমার অথবা আমার একপ্রকার রূপ মাত্র। অত-

এব, তৎসংযুক্ত তোমাকে আমাকে নমস্কার[২৫]। আমি অসীম ও অহং-পরিচ্ছেদ পরিশূন্য। আমি রূপাদিবিহীন আত্মা। সেই জন্য আমিই আমাকে নমস্কার করি[২৬]। তুমি যে আমাতে আছ, এ কথার অর্থ—আপনিই আপনাতে আছ। তুমি সমরস, স্বচ্ছ, সর্ব্বব্যাপী ও দিক্-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন[২৭]। মন তোমা কর্ত্তৃকই স্বকার্য্যে প্রেরিত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিমান্ হয়, জীবনী শক্তি প্রকটিত হয় এবং প্রাণ ও অপান্ বায়ু বহমান হয়[২৮]। আশাপাশ চর্ম্মমাংসাস্থিময় দেহযন্ত্র বহন করে, এবং মন তাহার সারথ্য করে[২৯]। তুমি আমি চিণ্ময়। আমরা কোন আশ্রয়ে নহি, অধিকন্তু সমস্তই আমাদের আশ্রিত। দেহ হউক বা না হউক, থাকুক বা যাউক, তাহাতে আমাদের যাওয়া আশা বা থাকা না থাকা হয় না বা নাই[৩০]। দীর্ঘকাল জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বহুকাল পরে আত্মলাভ করিয়াছি, ও দীর্ঘকাল পরে আবার উপশম প্রাপ্ত হইয়াছি[৩১]। দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ছিলাম, এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিয়াছি[৩২]। সর্ব্বাতীত অথচ সর্ব্বময় তোমাকে আমাকে নমস্কার। যাঁহারা তোমাকে এক বলিয়া উপদেশ করে সেই সকল গুরুদিগকে নমস্কার। পরমাত্মার সাক্ষিভাবকেও নমস্কার—যে হেতু নিখিল ভোগেও তাঁহাতে তৎসংক্রান্ত দোষ অদোষ কিছুই স্পৃষ্ট হয় না এবং এত আড়ম্বরেও তাঁহাতে কর্ত্তৃক্রিয়া জন্মে না[৩৩,৩৪]। তুমি পুষ্পে সৌগন্ধের ন্যায়, ভস্ত্রায় অনিলের ন্যায়, এবং তিলে তৈলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ। হে দেব! তুমিই হনন করিতেছ, তুমিই গমন করিতেছ, তুমিই দান ও হোম করিতেছ, তুমিই প্রকাশ পাইতেছ, তুমিই গ্রাস করিতেছ। তোমার মায়া অতীব বিচিত্র[৩৫]। হে ঈশ! আমিই সৃষ্টি কালে তোমা কর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত হইয়া জগৎ প্রকাশ করিয়া ও প্রলয় কালে তোমা কর্ত্তৃক অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছি[৩৬,৩৭]। হে দেব! তুমি পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম (দুর্লক্ষ্য) অথচ তোমারই অন্তরে এই বৃহৎ সংসার মণ্ডল অবস্থিত। এ সকল তোমারই অন্তরে ছিল, এখনও আছে, এবং পরেও থাকিবে। যেমন বট বীজে বট থাকে, তাহার ন্যায় তোমাতেই জগৎ থাকে। আকাশস্থ মেঘ যেমন অশ্ব, হস্তী ও রথাদির আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তাহার ন্যায় তুমিও শত শত পদার্থের আকারে দৃষ্ট হইতেছ[৩৮,৩৯]। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বহুবিধ

মিথ্যা বিকার বাধিত কর (অর্থাৎ ঐ সকল ভ্রম দূর কর), প্রচুর আনন্দ রসে পরিভাবিত হও, ভাবাভাব হইতে বিমুক্ত হও, আর বদ্ধ থাকিও না[৪০]। অভিমান, কোপ ও ক্রূরতা প্রভৃতি কালুষ্য পরিত্যাগ কর। মহাত্মারা কদাচ প্রাকৃতিক গুণে (বিষয়সঙ্কটে) নিমজ্জিত হন না[৪১]। প্রাক্তন দীর্ঘ দৌরাত্ম্যদশা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমি কে, কি ছিলাম, এই দুই বিষয়ের বিচার কর[৪২]। সে সকল দগ্ধ দিন গিয়াছে, সে সকল আড়ম্বর লুপ্ত হইয়াছে, যাহাতে তুমি চিন্তাজালে পরিবেষ্টিত ছিলে[৪৩]। এখন তুমি এই দেহনগরের সুবিচারজ্ঞ রাজা; তুমি এখন বিস্তৃত মনোরথে অবস্থান করিতেছ; এখন আর সুখদুঃখাদি তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে[৪৪]। তুমি ভোগরূপ শত্রুকে, মনোরূপ মাতঙ্গকে ও ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে জয় করিয়া, যার পর নাই বিশাল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ[৪৫]। তুমি অনন্ত ব্যোম মণ্ডলের পার প্রাপ্ত ও বাহ্যাভ্যন্তরের সূর্য্য[৪৬]। তুমি সর্ব্বদা সুপ্তস্বভাব; পরন্তু আবার আপন শক্তিতে প্রবুদ্ধ হও[৪৭]। ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ মক্ষিকাগণ যে সকল মধু আহরণ করে, সে সকল মধুর স্বাদ তুমি ইন্দ্রিয়রূপ বাতায়নে থাকিয়া গ্রহণ কর[৪৮]। তুমিই নিরোধাভ্যাসী যোগী দিগকে সুষুম্না পথ (ব্রহ্মরন্ধ্র=যে স্থান দিয়া যোগীরা শরীর ছাড়িয়া বহির্গত হয়) জ্ঞাত করাও[৪৯]। তুমিই দেহপুষ্পের সৌগন্ধ, দেহচন্দ্রের অমৃত, দেহবৃক্ষের রস ও দেহহিমপিণ্ডের শৈত্য[৫০]। যেমন দুগ্ধে ঘৃত, ঘৃতে স্নেহ; তেমনি তুমি শরীররূপ দুগ্ধে ঘৃত এবং তোমাতে চিন্ময়রূপ স্নেহ বিরাজ করিতেছে। কাষ্ঠে বহ্নির অবস্থান যদ্রূপ, এই শরীরে তোমার অবস্থান তদ্রূপ[৫১]। তুমিই অত্যুত্তম স্বাদ, তেজের প্রকাশক, পদার্থের অবগন্তা (বোধক) ও প্রভার অবভাসক[৫২]। তুমি বায়ুর স্পন্দন, মনোরূপ মাতঙ্গের মদ, প্রজ্ঞা-বহ্নির তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও প্রকাশক। তোমারই উপসংহারে (অর্থাৎ চৈতন্য সংযোগের অভাবে) তোমারই নাম নাস্তি হয় ও লয় প্রাপ্ত হয়। তথা মরণমূর্চ্ছায় ও সুষুপ্তিতে অহন্তা লুপ্ত থাকে। অপিচ, তোমারই উদয়ে দীপের ন্যায় সে সকল পুনরুদিত হয়। (ভাবার্থ—দেহান্তরে পুনরুদ্ভব অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়)। যেমন সুবর্ণে কটক, কেয়ূর, অঙ্গদ ও বলয় প্রভৃতির অবস্থিতি, তাহার ন্যায় তোমাতে সংসারস্থ অন্তঃপদার্থের ও বহিঃপদার্থের স্থিতি[৫৩।৫৫]। তুমি লীলাপ্রযুক্ত আপনার দ্বারা আপনাকে

তুমি, আমি, তিনি, অমুক, প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কর ও সেই সেই ভাবে স্থিতি কর[৫৬]। বায়ু মেঘ মণ্ডলকে ছোট বড় নানা আকারে খণ্ড খণ্ড করে; পশ্চাৎ সে সকলের কেহ হস্তীর আকারে, কেহ অশ্বের আকারে ও কেহ বা মনুষ্যাদির আকারে দৃষ্ট হয়। 'সেইরূপ, এক অখণ্ড তুমি স্বীয় অজ্ঞানের পরিচ্ছেদে ভূমির আকারে, জলের আকারে ও অন্যান্য ভূত ভৌতিকের আকারে দৃষ্ট হইতেছ। বহ্নির শিখাও হস্ত্যশ্বাদির আকারে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ তুমিও বিবিধ সৃষ্টির আকারে দৃষ্ট হও[৫৭।৫৮]। তুমি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ মুক্তামালার অচ্ছিন্ন তন্তু এবং প্রাণিরূপ শস্যের ক্ষেত্র[৫৯]। যেমন মাংসস্থ বিবিধ অনভিব্যক্ত স্বাদ পাকদ্বারা অভিব্যক্ত হয় তেমনি তোমারই দ্বারা অবিদ্যাবীজস্থ বিবিধ সৃজ্য পদার্থ সৃষ্টির আকারে অভিব্যক্ত হয়[৬০]। তুমি না থাকিলে—পদার্থশোভা থাকিলেও না থাকার ন্যায় হয়। বনিতার রূপ লাবণ্য কি অন্ধের নিকট আছে বলিয়া অবধারিত হয়[৬১]? যেমন মুকুরপ্রতিবিম্বিত মুখসৌন্দর্য্য কার্য্যকারী হয় না, অর্থাৎ কামশান্তির কারণ হয় না, তেমনি, বস্তু সমুদয় প্রতীয়মান হইলেও তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কার্য্য সাধনে সক্ষম হয় না। এই দেহ তোমা ব্যতিরেকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠিত হয়। বৃক্ষের ঔন্নত্য থাকিলেও রবি ব্যতীত অন্ধকারে তাহা আছে এ কথা কে বলিতে পারে? সুখ দুঃখের যে ক্রম তাহা তোমাকে পাইয়া বিনষ্ট হয়। আলোক পাইলে কি অন্ধকারের প্রভাব থাকে? না তেজ প্রাপ্তে হিমের প্রভাব থাকে [৬২।৬৪]? যেমন সূর্য্যের আলোকে শুক্লাদি বর্ণসমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ, তোমারই আলোকে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে[৬৫]। কিন্তু তোমাতে উৎপন্ন হইলেও সে সকলের সহিত তোমার সম্বন্ধ ক্ষণকালের নিমিত্ত। যেমন দীপদর্শন ক্ষণেই অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি, সুখ-দুঃখাদিও তোমা হইতে জন্ম গ্রহণ করে ও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ তোমাতে অবস্থান করিতে পারে না[৬৬]। তুমি উহাদিগকে অপ্রজ্ঞার দ্বারা দেখ বলিয়া আবির্ভূত হয়, আবার তুমিই উহাদিগকে প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা দেখ বলিয়া বিলীন হইয়া যায়[৬৭]। আময় (বিকার) বর্জ্জিত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সুখ দুঃখাদি জন্মে বটে; পরন্তু জন্মের পরেই আবার সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকলের স্বভাব ভঙ্গুর,

সেই কারণে তাহারা উৎপত্তি ক্ষণ ব্যতীত অন্য ক্ষণে থাকিতে পারে না। যেমন কলাত্মক কালের (নিমেষের লক্ষ ভাগের এক ভাগকে কলা বলে) স্থিতি নাই, সেইরূপ[৬৮।৬৯]। সুখদুঃখাদিভাবের যে স্ফুরণ তাহা গন্ধর্ব্বনগরের অনুরূপ। সে সকলের স্ফূর্ত্তিও তোমারই প্রসাদাৎ, এবং সে সকলের বিলয়ও তোমার নিজ তত্ত্ব সাক্ষাৎকার মূলক[৭০]। বস্তু সকল তোমারই অবলোকনক্ষণে উদ্ভূত, আবার তোমারই অনবলোকন ক্ষণে মৃত হয়। সুতরাং সুখদুঃখাদির গতি মৃত জাতের ও জাত মৃতের অনুরূপ[৭১]। যাহা ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থির, কিরূপে তাহা কার্য্যকারী হইবে? কল্পিত উৎপলে কি কখন মালা গ্রথিত হয়? জাতনষ্ট বস্তু যদি কার্য্যকারী হইত তাহা হইলে এই সকল লোক বিদ্যুতের মালা গাঁথিয়া উপভোগ করিতে পারিত[৭২।৭৩]। এই যে সুখাদি, এ সকল তুমি বিবেকী জনের চিত্তে থাকিয়াও গ্রহণ করিতেছ অথচ নিজের সাম্যস্থিতি ত্যাগ করিতেছ না। অর্থাৎ তুমি বিবেকী অবিবেকী উভয়েরই চিত্তে আছ পরন্তু বিবেকীর চিত্তে এক ভাবে আছ, এবং অবিবেকীর চিত্তে অন্য ভাবে আছ। বিবেকিচিত্তস্থ ভাব অবর্ণনীয়[৭৪।৭৫]।

হে দেব! তুমি নিশ্চেষ্ট, নিরবয়ব, ও অনহঙ্কৃত। এক ভাবে তুমি সৎ এবং অন্য ভাবে তুমি অসৎ। (স্থূল দেহে সৎ এবং সূক্ষ্ম দেহে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিধায় অসৎ বা অসৎকল্প)। এরূপ হইয়াও তুমি কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছ। হে অতিবিস্তৃতাকার ও শান্তিপরায়ণ! তোমার জয় হউক। হে সর্ব্বশাস্ত্রাতীত ও সর্ব্বশাস্ত্রের আস্পদ! তোমার জয় হউক। হে জাত এবং হে অজাত! হে ক্ষয়শীল! এবং হে অক্ষয়! তোমার জয় হউক। হেভাবজয়িন্! হে অভাবজয়িন! হে জয়স্বরূপ! হে দুর্জ্জয়স্বরূপ! তোমার জয় হউক[৭৬।৭৮]। তোমারই অবস্থানে আমি উপশম ও উল্লাস প্রাপ্ত এবং তোমারই অবস্থানে আমি স্থিত ও অধিগত। আজ্ আমি জয়ী, সুতরাং মৎস্বরূপ তোমাকে নমস্কার[৭৯]। আমি আজ্ বিগতজ্বর হইয়া পরম আত্মরূপে অবস্থান করিতেছি; অতএব আমাতে জন্মমরণাদি ও ভাবাভাব সমুদয় এবং বিপদ্, সম্পদ্, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি কিছুই নাই। সুতরাং আমি এখন বিগতরাগরঞ্জন হইয়া পরম শাশ্বত উপশম প্রাপ্ত হইয়াছি[৮০]।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রহ্লাদ ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে আনন্দরসে মগ্ন ও নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলেন[১]। তাঁহার দেহ প্রস্তর খোদিত অথবা চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইল[২]। মেরুর ন্যায় নিশ্চল অবস্থানে বহুবৎসর অতীত হইল[৩]। যেমন অকালের জলসেকে বীজ অঙ্কুরিত হয় না তাহার ন্যায় অনুচরবর্গের শত চেষ্টাতেও প্রহ্লাদের প্রবোধ জন্মিল না[৪]। একাবলম্বী প্রহ্লাদ সেই অসুর পুরে ঐরূপে অনধিক সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন[৫]। ব্রহ্মানন্দমগ্ন প্রহ্লাদ তখন পরিজনবর্গের দৃষ্টিতে নিরানন্দ মরণদশা প্রাপ্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন[৬]। ক্রমে সেই পাতাললোক অরাজকতায় পরিপূর্ণ হইল। বলবানেরা দুর্ব্বল দিগকে নিপ্পিড়িত করতঃ ধন লুণ্ঠনাদি অকার্য্য করিতে লাগিল[৭]। অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপু লোকান্তর প্রাপ্ত, তদীয় পুত্র প্রহ্লাদ সমাধিগত, অন্য কোন দানবও শাসন কর্ত্তা রাজা হয় নাই; কাযেই অরাজকতা উপস্থিত[৮]। অন্যান্য অসুরগণ যৎপরোনাস্তি প্রয়াস স্বীকার করিয়াও প্রহ্লাদের সমাধিভঙ্গ করিতে পারিল না[৯]। সুতরাং তাহারা নিরুৎসাহ ও উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিল। এ দিকে দস্যুগণ পরমানন্দে সেই অরাজক দৈত্যপুরে স্ব স্ব কদাচারপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহারা বলপূর্ব্বক অসুরপুরস্ত্রীগণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া রত্নাদি অপহরণ ও লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিতে লাগিল। অবলাগণ কদাচারিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িতা হইতে লাগিল। আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন প্রভৃতির মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়া পাতালকুহর পরিপূর্ণ করিল। অন্ত্যজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক সেই দৈত্যপুর লক্ষ্মীহীন ও উচ্ছিন্ন প্রায় হইল। দস্যুগণ এইরূপে পরস্বাপহরণ ও জনবিনাশ প্রভৃতি বিবিধ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে পুরবাসিগণের আর্ত্তনাদ, ক্রন্দনধ্বনি ও শোকধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সেই অসুরপুরে যুগান্ত কালের ন্যায় তুমুল ব্যপার উপস্থাপিত করিল। দেখিলে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ কলিযুগ শেষদশায় আসিয়াছে[১০।১৮]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর একদা ত্রিলোকপালক ক্ষীরোদশায়ী মধুসূদন শেষশয্যায় প্রাবৃট্ নিদ্রা * হইতে সমুত্থিত হইয়া দেবগণের মঙ্গলার্থ অন্তরে জাগতী গতি পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১।২]। প্রথমতঃ স্বর্গের, তদনন্তর পৃথিবীর আচার ব্যবহার মানস অনুসন্ধানের গোচর করিলেন, পরে পাতালের ব্যবহার দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন[৩]। দেখিলেন, দেবারি প্রহ্লাদ সমাধিগত ও ইন্দ্রপুরে সম্পদ প্রৌঢ়িতা (স্বর্গের আধিপত্য বৃদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়াছে[৪]। ক্ষিরোদার্ণববাসী শেষশয্যাশায়ী শঙ্খচক্রগদাপাণি বিষ্ণু ঐ প্রকার বিদিত হইয়া মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ পরম পদে বিশ্রান্ত হওয়াতে পাতাল লোক নায়কবিহীন হইয়া মহাকষ্ট-দশায় নিপতিত হইয়াছে। ঐ দশা নিরাকৃত না হইলে আমার সৃষ্টি নির্দৈত্য হইবার সম্ভাবনা। যদি দৈত্য জীবের অভাব হয় তাহা হইলে দেবগণ দৈত্যাভাবে জিগীষাশূন্য হইয়া দ্বেষাভাবে সাত্ত্বিকত্ব হেতু শমতা প্রাপ্ত ও ক্রমে মোক্ষাখ্য নির্দ্বন্দ্ব পরম পদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ মুক্ত হইলে দৈববিঘ্নাদির অভাব প্রযুক্ত ভূতলেও যজ্ঞক্রিয়াদি উৎপন্ন হইবে না। তপোযজ্ঞাদি ক্রিয়ার উপশমে বা বিনাশে ভূলোকেরও উপশম অর্থাৎ বিনাশ হইবে। ভূলোকের উপশমে বা বিনাশে সংসারের বিরাম অবশ্যম্ভাবী। তাহাও আমার ইষ্ট নহে[৫।১১]। আমি "কল্প-পর্য্যন্ত স্থায়ী হউক" এবম্বিধ কামনায় যাহা সৃজন করিয়াছি, দেখিতেছি, তাহা অসময়ে অর্থাৎ কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী না হইয়া মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে[১২]। যদি এরূপ অসময়ে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় প্রাপ্ত হয় আর আমি এই অপারপর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে

* প্রাবৃট্নিদ্রা অর্থাৎ বর্ষাকালীন শয়ন। হরিশয়ন আষাঢ় মাসে আরব্ধ হইয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপ্ত হয়। আষাঢ়ের শয়ন একাদশী ও কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশী, মধ্যগত ৪ মাস চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের অনুষ্ঠান কাল। এই ব্রত বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রশান্তবপু হইয়া স্বপদে স্থিতি প্রাপ্ত হই তাহা হইলে অবশ্যই আমি আমারই লীলার বিনাশকারী হইলাম। এবম্প্রকারে আপনিই আপনার লীলার ক্ষয়কারী হওয়া উচিত নহে। অথবা অসময়ে এরূপে জগতের উপশান্তি হওয়া শুভকরী নহে; কেননা, ইহাতে কিছুই শ্রেয়ো নাই। বরং যাহাতে দানবগণ জীবিত থাকে, তাহা করাই এক্ষণে শ্রেয়ঃ[১৩।১৫]। দৈত্যগণ জীবিত থাকিলে দেবগণও সোৎসাহী থাকিবেন, তাহাতে পৃথিবীতে তপোযজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত থাকিবেক। তদ্দ্বারা সংসারও যথাশৃঙ্খলে বিদ্যমান থাকিবে। নচেৎ সাংসারিক ক্রম (নিয়মাদি) নিশ্চিতই বিনষ্ট হইবেক[১৬]। অতএব, অদ্যই আমাকে পাতাল পুরে গমন করিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে প্রবোধিত ও দানবরাজ্যে পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত করিতে হইবেক[১৭]। যদি প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্য কোন দানবকে দানবাধীশ করি, তাহা হইলে, প্রহ্লাদের অনুরূপে সে হয় ত দেবকার্য্য সমুদয় সাধন করিবে না। যাহাই হউক, প্রহ্লাদকেই রাজা করা বিধেয় হইয়াছে[১৮]। প্রহ্লাদের ইহ জন্মের দেহ অতিপবিত্র ও পাশ্চাত্য (অর্থাৎ শেষ দেহ)। অতএব, তদীয় দেহ আকল্প বিদ্যমান থাকুক[১৯]। আমি আজ্ এই মুহূর্ত্তেই সমাধিস্থ প্রহ্লাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া গভীর গর্জ্জনে তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিব। আমার গম্ভীর ধ্বনিতে প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া অবশ্যই অসুররাজ্য প্রতিপালন করিবে। প্রহ্লাদ রাজকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইলে পূর্ব্ববৎ দেবাসুর দ্বন্দ্ব সমুত্থিত হইবে এবং তাহা হইলে আমার ক্রীড়া প্রচার বিচ্ছিন্ন হইবে না। এবং ব্রহ্মাণ্ডও বিনষ্ট হইবে না। যদিও এই সৃষ্টির ক্ষয় ও উদয় উভয়ই আমার পক্ষে সমান, তথাপি, যদি ইহা অন্য দ্বারা (অন্য = প্রহ্লাদ) যথাবৎ থাকে, অর্থাৎ আমার লীলার ও নিয়মের সাফল্য অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে বা স্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে ভাল বৈ মন্দ নহে। যখন ইহা থাকিবে না (আমারই নিয়ম অনুসারে) তখন সেই না থাকাও আমার পক্ষে ভাল। যাহাই হউক, আমি এখনই পাতালতলে গমন পূর্ব্বক দস্যুসমাক্রান্ত ও ভীষণাচারসম্পন্ন অসুরকুল প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যকর্ত্তৃক কমলবিকাশের ন্যায় পরিম্লান অসুর দিগকে প্রবোধিত করিয়া এই জগতের স্থিরতা সম্পাদন করিব[২০।২১]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, সর্ব্বাত্মা নারায়ণ ঐরূপ চিন্তা করিয়া সেই স্বকীয় ক্ষীরোদপুরী হইতে সপরিবারে সেই ক্ষীরোদের তলস্থ ছিদ্র পথে পাতাল যাত্রা করিলেন[১]। বিধাতার সঙ্কল্পে বিহিত বলিয়া ক্ষীরোদের জল রন্ধ্র দিয়া প্রহ্লাদের পাতালস্থ পুরী প্লাবিত করে না। জল সকল যথাস্থানেই স্তম্ভিত থাকে। ভগবান্ নারায়ণ সেই ছিদ্র পথে গমন করতঃ দ্বিতীয় শক্রলোকের ন্যায় রমণীয় পাতালস্থ প্রহ্লাদনগর প্রাপ্ত হইলেন[২]। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য হেমমন্দিরকোশস্থ অসুররাজ প্রহ্লাদকে সুমেরুগুহালীন সমাধিস্থ ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিলেন। প্রভু নারায়ণেব দিব্য দেহের তেজে তত্রত্য দৈত্যগণ বিকম্পিত ও দূরে পলায়মান হইল। অনন্তর আকাশে নক্ষত্রসহায় শশীর ন্যায় দুই তিন মুখ্য মহাসুরের সহিত অসুরগৃহে প্রবেশ করিলেন[৩।৫]। গরুড়াসন, লক্ষ্মীকর্ত্তৃক বিধৃতচামর, স্বীয় আয়ুধ ও পরিবার যুক্ত, এবং দেব, ঋষি ও মুনিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের সমীপস্থ হইয়া "হে মহাত্মন্! প্রবুদ্ধ হও" এই বলিয়া দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতঃ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদিত করিলেন[৬।৭]। কল্পান্তকালীন মেঘগর্জ্জনের ও পরিক্ষুব্ধসমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় পাঞ্চজন্যের মহাশব্দে অসুরগণ ভয় এবং মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণব তাহারা জলদাগমে প্রফুল্ল কুটজাবলীর ন্যায় মহা আনন্দিত হইলেন। অনন্তর দানবরাজ প্রহ্লাদ অল্পে অল্পে মেঘাপগমে কাননে উৎফুল্ল কদম্বের ন্যায় প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন[৮।১১]। ক্রমে গঙ্গার সমুদ্র আক্রমণের ন্যায় প্রহ্লাদের ব্রহ্মরন্ধ্রসমুত্থিত প্রাণশক্তি তাঁহার সর্ব্ব শরীর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল[১২]। যেমন উদয় মাত্র সূর্য্যকিরণ ভুবনান্তর আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, তদীয় প্রাণশক্তি ক্ষণমধ্যেই প্রহ্লাদকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিল। নবরন্ধ্রস্থ ইন্দ্রিয়ে প্রাণের সঞ্চার হইলে তাঁহারা চেত্যোন্মুখী হইল। চিৎ তখন তদীয় লিঙ্গদেহরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত

হইল[১৩।১৪]। হে রাঘব! উক্ত প্রকারে প্রহ্লাদের চিত্ত অঙ্কুরিত হইলে তদীয় নেত্রদ্বয় প্রাতঃকালীন উৎপলের ন্যায় ক্রমে বিকাশোন্মুখ হইল[১৫।১৬]। যেমন বায়ুর সঞ্চারে পদ্মের পত্র স্পন্দায়মান হয় তাহার ন্যায় প্রহ্লাদের শরীর প্রাণ অপানের সঞ্চারে স্পন্দায়মান হইল। অর্থাৎ তিনি চলিতাঙ্গ হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনঃও পরিপুষ্ট হইল[১৭।১৮]। এত ক্ষণ পরে তিনি বিকসিতনেত্র ও মনঃপ্রাণসম্পন্ন স্বস্থশরীরীর ন্যায় হইলেন[১৯]।

যখন প্রভু নারায়ণ প্রহ্লাদকে "প্রবুদ্ধ হও" এই কথা কহিয়াছিলেন তখনই তিনি মেঘরধে ময়ূরেব ন্যায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু তখনও তিনি উপদেশের অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। এতক্ষণ পরে প্রভু দেখিলেন, প্রহ্লাদের নয়ন প্রফুল্ল, মনঃ পরিপুষ্ট ও স্মৃতি প্রভৃতি অবস্থা সকল পূর্ব্বের ন্যায় উপচিত হইয়াছে। ত্রিলোকেশ ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার সেই উপদেশ যোগ্য অবস্থা দেখিয়া কহিতে লাগিলেন[২০।২১], হে সাধো! তুমি আপনার মহান্ ঐশ্বর্য্য ও আকৃতি স্মরণ কর। বৃথা কেন অকালে আপনার দেহের অবসান করিতেছ[২২]। তুমি যখন ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এরূপ সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়াছ, তখন তুমি শরীরগত প্রিয়াপ্রিয় বিষয়ে প্রয়োজন বিহীন হইয়াছ। এখন তুমি উঠ[২৩]। আমরা অনিন্দিত নিয়তি তত্ত্ব বিদিত আছি; সেইজন্য বলিতেছি, তুমি কল্পকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দেহে অবস্থান করিবে[২৪]। অতএব, জীবন্মুক্ত ও গতোদ্বেগ হইয়া দেহকে ব্যবহারে নিযুক্ত কর এবং যাবৎ না কল্প শেষ হয় তাবৎ এই রাজ্যে অবস্থিতি কর[২৫]। হে অনঘ! যেমন কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভাকাশ মহাকাশে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ, কল্পান্তে তোমার এই দেহ বিশীর্ণ হইলে তুমিও মহাকাশে (পরব্রহ্মে) অবস্থিতি করিবে[২৬]। তোমার এই বিশুদ্ধ, দৃষ্টলোকপরাবর ও জীবন্মুক্তবিলাসী শরীর কল্প পর্য্যন্ত স্থায়ী[২৭]। হে সাধো! এখনও দ্বাদশ আদিত্য উদিত হয় নাই, পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হয় নাই, জগৎও প্রজ্বলিত হয় নাই। তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[২৮]? এখনও বায়ু লোকত্রয়ের ভস্মে ধূসরবর্ণ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া দেবগণের শুষ্ক মস্তক বহন করে নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[২৯]? এখনও পুষ্কর ও আবর্ত্ত প্রভৃতি প্রলয়

মেঘ বিদ্যুৎ মালায় বিজড়িত হইয়া জগৎকোশে পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হয় নাই, অর্থাৎ বহুবিদ্যুৎ বিজড়িত কল্পমেঘ উদিত হয় নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[৩০]? এখনও পৃথিবী কল্পাগ্নিতে দহ্যমানা ও কল্পবাতে বিদীর্য্যমানা হয় নাই, পর্ব্বত সকল শব্দ সহকারে স্ফুটিত হয় নাই, দিঙ্মণ্ডল প্রজ্বলিত হয় নাই, তবে কেন মোহ প্রযুক্ত শরীর পরিত্যাগে উদ্যোগী হইয়াছ[৩১]? এখনও জগৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এই দেবত্রয়ে পর্য্যবসিত হয় নাই, তবে কেন বৃথা শরীর পরিত্যাগ করিতেছ[৩২]? এখনও দিক্ সকল জর্জ্জরিত হয় নাই, দ্বাদশাদিত্যের কিরণরাশি আকাশে পরিভ্রমণ করে নাই, কল্পাভ্র গর্জ্জন করে নাই, তবে তুমি কি জন্য শরীর পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছ[৩৩।৩৪]? হে অসুরেশ্বর! আমি এখনও চতুর্ব্বিধ প্রাণীর মধ্যে ও দিক্ সমুদায়ে বিহরণ করিতেছি, সুতরাং এখনও তোমার দেহ পরিত্যাগের সময় হয় নাই[৩৫]। এই শৈলরাজি, এই ভূত সমুদয়, এই তুমি, এই জগৎ, এই ব্যোমমণ্ডল, এই আমরা, সমস্তই বিদ্যমান আছে ও আছি, সুতরাং এখন তুমি দেহের প্রতি অবহেলা করিও না[৩৬]। যাহার মন অতিনিবিড় অজ্ঞানে পর্য্যাকুল থাকে, দুঃখরাশি যাহাকে নিরন্তর মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৩৭]। আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার ভাবনার দ্বারা যাহার মতিবিলোপ হয়, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৩৮]। যে ব্যক্তি আশারজ্জুর বন্ধনে ইতস্ততঃ নীয়মান হইতে থাকে, যাহার চিত্ত বৃত্তি স্থায়িরূপে নিতান্ত অস্থির হয়, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৩৯]। যাহার হৃদয় দুর্ভাবনাভরিত এবং তৃষ্ণা (লালসা) যাহার হৃদয় আলোড়িত করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪০]। যাহার সম্বন্ধে রাগাদিযোগে তাল বৃক্ষ অপেক্ষা উচ্চ মনোরূপ বনস্থ চিত্তবৃত্তিরূপ লতায় সুখ ও দুঃখ এই দ্বিবিধ ফল ফলে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪১]। যাহার কামাদি অনর্থপরম্পরারূপ মারুতপ্রবাহ দেহরূপ বিষবৃক্ষের রোমরাজিরূপ শাখা প্রশাখা আলোড়িত করে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪২]। আধিব্যাধিরূপ দাবাগ্নি যাহার দেহরূপ বিপিনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ চঞ্চলা লতা দগ্ধ করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪৩]। যাহার শরীরমধ্যে ক্রমকোটরস্থ

অজগরতুল্য কামক্রোধাদি নিরন্তর গর্জ্জন করিতে থাকে, তাহারই পক্ষে মরণ শোভা পায়[৪৪]। লোক সকল দেহের অবিদ্যমানতাকেই মৃত্যু বলে, পরন্তু বস্তু দৃষ্টিতে দেহের বিদ্যমানতা বা অবিদ্যমানতা দ্বারা মৃত্যু সম্পাদিত হইতে পারে না। কারণ, দেহজ্ঞানরাহিত্যই দেহের অবিদ্যমানতার কারণ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, যাহার মতি আত্মতত্ত্ব অবলোকন হইতে উৎক্রান্ত না হয়, সেই আত্মদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জীবনই জীবন এবং সেই জীবনই শোভমান[৪৫।৪৬]। যাহার অহং নাই, যাহার বুদ্ধি প্রিয় বা অপ্রিয় প্রার্থী নহে, তদুভয়ে লিপ্ত না হয়, যে সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাহার জীবনই জীবন এবং সেই জীবনই শোভমান[৪৭]। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষবিমুক্ত সুশীতল বুদ্ধির দ্বারা এই জগৎকে সাক্ষিবৎ অবলোকন করে, তাহারই জীবন শোভমান[৪৮]। যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক হেয়োপাদেয় পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তির চিত্তের অভ্যন্তরে পরমাত্মা কেবল সাক্ষী রূপে বিদ্যমান, কিম্বা যাহার চিত্ত পরমাত্মায় নিয়োজিত, অথবা যে ব্যক্তি পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভমান[৪৯]। যে ব্যক্তি শুক্তিরজতাদিতুল্য মিথ্যা পদার্থে চিত্তকে সমাসক্ত না করিয়া কল্পনারহিত পরমাত্মায় বিলীন করিয়াছে, তাহারই জীবন শোভমান[৫০]। যে ব্যক্তি সত্যদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ব্যবহাররূপ লীলায় অনুরক্ত হয়, তাহারই জীবন শোভমান[৫১]। যে ব্যক্তি দুঃখজনক হেয় বস্তু প্রাপ্তে উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখসাধন উপাদেয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হয় না, ঈদৃশ ব্যক্তির বেঁচে থাকাই শোভা[৫২]। যে স্বয়ং শুদ্ধ, এবং শুদ্ধস্বভাব তত্ত্বজ্ঞগণ যাহার পক্ষাবলম্বী, এবং যাহা হইতে শান্তি ক্ষমা ঔদার্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি আবির্ভূত হয়, তাঁহারই বেঁচে থাকা শোভা, মরণ তাঁহাদের শোভা নহে[৫৩]। জীব সকল যাহাকে দেখিলে, যাহার নাম শুনিলে, এবং যাহাকে স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাঁহার মরণ কি শোভা পায়? কদাচ নহে। তাঁহার জীবনই শোভা প্রাপ্ত হয়[৫৪]।

হে দনুজেশ্বর! যাহার উদয়ে জীবরূপ ভ্রমরবিশিষ্ট জনতারূপ কুমুদবৃন্দ আনন্দিত হয়, সেই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তত্ত্ববিদ্‌গণের জীবনই শোভমান, অন্যের নহে[৫৫]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

ভগবান্ বলিলেন, এই দৃষ্ট দেহ যে কিঞ্চিৎকাল স্থির ভাবে থাকে, লোক সকল সেই স্থিরভাবকে জীবন (বেঁচে থাকা) বলিয়া উল্লেখ করে এবং দেহান্তর গ্রহণার্থ এতদ্ দেহের যে পরিত্যাগ বা বিচ্ছেদ ঘটনা হয়, তাহাকেই লোকে মরণ বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু তুমি ঐ লোক প্রসিদ্ধ জীবন ও মরণ উভয় পক্ষ হইতে বিমুক্ত। হে মহামতে! সত্য সত্যই কি তোমার মরণ আছে? না জীবন আছে? (অর্থাৎ তোমাতে দুএর কিছুই নাই)[১।২]। হে অরিমর্দ্দন! আমি যে তোমার নিকট জীবন মরণের লোক প্রসিদ্ধ লক্ষণ বলিলাম তাহা কেবল উদাহরণ প্রদর্শন মাত্র; নচেৎ তুমি স্বভাবতঃ জীবন মরণের অতীত বস্তু। তুমি কস্মিন্ কালেও জীবিত নহ, মৃতও নহ[৩]। বায়ু যেমন ব্যোমসংস্থ হইয়াও ব্যোমে অনাসক্ত, তদ্রূপ, তুমিও দেহসংস্থ হইয়াও স্বরূপতঃ অদেহ[৪]। হে সুব্রত! যেমন আকাশ বৃক্ষাদির ঔন্নত্যের প্রতিরোধ করে না বলিয়াই লোকে আকাশকে উচ্ছায়াদির কারণ বলে, সেইরূপ, দেহে শীতোষ্ণাদি স্পর্শ জ্ঞানের নিমিত্তভাব আছে বলিয়াই লোকে বলে, দেহ আছে। পরন্তু বিচার দৃষ্টিতে তাহাও নাই। যাহারা বস্তু তত্ত্ব জানিয়াছে তাদৃশ প্রবুদ্ধ দিগের দ্বৈত বোধ উপশান্ত হওয়ায় দেহ দেহী বোধ থাকে না। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে দেহ কোথায়? তুমিও জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত প্রযুক্ত প্রবুদ্ধ, তোমারও দ্বৈতজ্ঞান উপশম প্রাপ্ত, সুতরাং তোমার সম্বন্ধে দেহ কোথায়? দেহ উক্ত প্রকারে অসম্ভব বা অসত্য হইলেও অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অবস্থিতি করে অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়[৫।৬]। কিন্তু তুমি কেবল চিৎপ্রকাশ হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ; সুতরাং এমন কোন কিছু নাই, যাহাকে তুমি অহংবুদ্ধির দ্বারা দেহভাবে গ্রহণ ও অনহং বুদ্ধির দ্বারা অদেহরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পার[৭]।

হে দানবপতে! বসন্তই উদিত হউক, আর প্রলয় বায়ুই প্রবাহিত হউক, ভাব অভাব অতীত আত্মার তাহাতে কি আইসে ও কি যায়[৮]? শৈলরাজি বিলুণ্ঠিত হউক, কল্পাগ্নি দাহ আরব্ধ হউক, প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হউক, কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করিবে না[৯]। ভূত সকল অবস্থিতি করুক, গমন করুক, বিনষ্ট হউক, বর্দ্ধিত হউক, কিছুই আত্মায় অবস্থিতি করিবে না[১০]। যিনি এই দেহের ঈশ্বর, তিনি দেহের ক্ষয়ে ক্ষীণ, বৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত ও স্পন্দনে স্পন্দিত হন না[১১]। দেহের আমি, অথবা আমি দেহী বা দেহবিশিষ্ট, এতদ্বিধ চিত্তপরিকল্পনা যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন আর ত্যাজ্য অত্যাজ্য কল্পনার অবসর (উদয়) থাকে না[১২]। হে তাত! ইহা করি, তাহা পরিত্যাগ করি, এরূপ সঙ্কল্প তত্ত্ববিদ্গণের নাই। অর্থাৎ ঐ সকল সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত[১৩]। প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন। তাঁহারা কার্য্যের অকরণে সর্ব্বদাই অকর্ত্তা হইয়া অবস্থিতি করেন। আবার অকর্ত্তৃত্ব হেতু অভোক্তৃত্ব স্বয়ং সমাগত হয়। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উভয়ের উপশমে কেবল শান্তিই অবশিষ্ট থাকে। সেই শান্তি যদি প্রৌঢ়িতা প্রাপ্ত হয়, (ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হয়), তাহা হইলে তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ মুক্তি বলেন[১৪।১৬]। প্রবুদ্ধ শুদ্ধ চিন্ময় ব্যক্তিরা সর্ব্ব বস্তু আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করেন বটে; অর্থাৎ ব্যবহারস্থ হন বটে; পরন্তু সে আক্রমণে ত্যাগ, বা গ্রহণ, উভয়ের সম্পর্ক থাকে না[১৭]। তত্ত্বজ্ঞানেব প্রভাবে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য গ্রাহ্যগ্রাহকভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শান্তির উদয় হয়, সেই শান্তি স্থিতি প্রাপ্ত হইলেই মোক্ষ নামে অভিহিত হয়[১৮।১৯]। পুরুষোত্তমগণ তাদৃশ মোক্ষে অবস্থিত হইয়া সুষুপ্তের ন্যায় আত্মসন্নিধানমাত্র দ্বারা বিচরণ করিয়া থাকেন[২০]। পরম বোধপ্রাপ্ত বাসনাবর্জ্জিত ব্যক্তিরা ইহ জগতে অর্দ্ধসুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই উভয়ের সন্ধিস্থলের ন্যায় অবস্থিতি করেন[২১]। যাঁহারা কেবল আত্মনিষ্ঠ ও যাঁহাদিগের আশয় সমস্ত আত্মাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারা রমণীয় বস্তুতে অনুরক্ত ও দুঃখদ বস্তুতে উদ্বিগ্ন হন না[২২]। মুকুর এমন ভাবেনা যে আমাতে প্রতিবিম্ব পড়ুক, অথচ তাহাতে বিম্ব পড়ে। মুকুর যেমন অবাঞ্ছা পূর্ব্বক প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে সেইরূপ নিত্য প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরাও কার্য্য সমুদয় অবাঞ্ছা পূর্ব্বক করিয়া থাকেন[২৩]।

তাঁহারা জাগ্রতে স্বস্থ ও সংসারস্থিতিতে সুপ্ত হইয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার পরায়ণ হন[২৪]।

হে মহাত্মন্! তাই আমার অনুরোধ—তুমি পরাৎপর ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া এক কল্প পর্য্যন্ত এই পাতালতলে গুণিগণ-প্রতিষ্ঠিত রাজলক্ষ্মী ভোগ পূর্ব্বক তদন্তে সেই অচ্যুত পরম পদ প্রাপ্ত হও[২৫]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! ভগবান্ পদ্মনাভ প্রহ্লাদকে ঐরূপ সুশীতল বাক্যে উপদেশ প্রদান করিলে প্রহ্লাদ বিকসিতনয়ন ও নিগৃহীত-মননক্রম হইয়া হর্ষসহকারে কহিতে লাগিলেন[১।২]। হে দেব! আমি হিতাহিত বিচার ও শত শত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাই ক্ষণকাল বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিতেছিলাম[৩]। আমি আপনার প্রসাদে স্বরূপস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি কি সমাধি কি অসমাধি, সর্ব্বদাই সমভাবে অবস্থিত[৪]। হে মহেশ্বর! আপনি আমার নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অন্তরে অনেক দিন দৃষ্ট হইয়াছেন, পরন্তু আজ্ বাহিরেও দৃষ্ট হইলেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়[৫]। যেমন ব্যোমে ব্যোমের অবস্থান, সেইরূপ, আমি সঙ্কল্পবিকল্প-রহিত অনন্ত দৃষ্টিতে (জ্ঞানে) অবস্থান করিতেছিলাম[৬]। শোক, মোহ, বৈরাগ্যচিন্তা, দেহপরিত্যাগ, অথবা সংসারভয়, অথবা অন্য কোন কারণে আমি তদবস্থ হই নাই[৭]। যখন আমি একই বিদ্যমান, তখন আর আমার শোক, ক্ষতি, দেহ, সংসার, ভয় ও অভয় প্রভৃতির সম্ভাবনা কি[৮]? আমি ইচ্ছানুসারে স্বয়ং সমুদিত অমল বিতত পরম পদে অবস্থান করিতেছিলাম[৯]। হে ঈশ্বর! "সংসার দুঃখময়, তৎ কারণে আমি সংসারে বিরক্ত, সেজন্য সংসার পরিত্যাগ করিব"। এরূপ চিন্তা অপ্রবুদ্ধ দিগেরই হইয়া থাকে[১০]। দেহ গেলেই দুঃখ যায়, দেহ থাকিলে দুঃখ থাকিবেই, অতএব দেহ ত্যাগই শ্রেয়স্কর, এ চিন্তা মূর্খ-দিগকে আক্রমণ করে[১১]। ইহা সুখ, ইহা দুঃখ, ইহা নাই, ইহা আছে, এবম্প্রকারে যে চিত্তের দোলায়মানতা তাহা মূঢ়গণ দিগকেই গ্রাস করে, পণ্ডিতদিগকে নহে[১২]। ইহা গ্রাহ্য, ইহা ত্যাজ্য, এরূপ ভাবনাও মনের ভ্রম। আমি এক ব্যক্তি, এ অন্য ব্যক্তি, এ কুসংস্কার অজ্ঞ ব্যতীত জ্ঞানীতে থাকেনা। ঐ সকল ভ্রম অজ্ঞকেই পাগল করে, জ্ঞানীকে নহে[১৩।১৪]। হে পদ্মপলাশলোচন! যখন তুমিই সৎ, এবং

তোমাতেই সব, তখন আর ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিষয়ক দ্বৈতের সত্যতা কোথায়[১৫]? এই নির্ম্মল জগৎ বিজ্ঞানের মালিন্য বিশেষ অর্থাৎ ভ্রান্তি মাত্র সুতরাং ইহা সত্য মিথ্যার মিশ্রণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার মধ্যে হেয়ই বা কি? উপাদেয়ই বা কি? যখন হেয়ও নাই, উপাদেয়ও নাই, তখন আর আমি কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব[১৬]? আমি পূর্ব্বেও হেয় উপাদেয় বর্জ্জিত ও ভাবাভাব বিমুক্ত ছিলাম, সম্প্রতিও তৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি[১৭।১৮]। এখন আমি আমার যথোক্ত প্রকার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাদেব! এখন আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, সে বিষয়ে সংশয় নাই[১৯]। আপনি ত্রিজগতের পূজ্য, সেজন্য আপনি আমার প্রদত্ত আমারই নিয়তির অনুরূপ পূজা গ্রহণ করিবার পাত্র[২০]। দানবাধীশ প্রহ্লাদ ঐরূপ উক্তি করিয়া ভগবানের সম্মুখে পূজোপচার পরিপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র আহরণ করিলেন[২১]। পরে আয়ুধ, অপ্সরোগণ, দেবগণ, খগপতি গরুড়, অধিক কি বলিব, লোকত্রয়ের সহিত ভগবান্ ভুবনেশ্বর কমলাপতির পূজা সমাপ্ত করিলেন। অতঃপর ভগবান্ তাঁহাকে নিম্ন লিখিত বচনাবলি বলিতে লাগিলেন[২২।২৩]। হে দানবাধীশ! উত্থিত হও, সিংহাসন আশ্রয় কর। আমি স্বয়ং তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। আমার পাঞ্চজন্য রব শ্রবণ করিয়া যে সকল সিদ্ধ ও সাধ্যগণ সমাগত হইয়াছেন, ইহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন[২৪।২৫]।

ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ হরি ঐ কথা কহিয়া দানবরাজ প্রহ্লাদকে সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। পরে গঙ্গাদি নদী সমুদায়কে ও ক্ষীরোদাদি সমুদ্র নিচয়কে আহ্বান করিলেন। পরে সেই সমুদায়ের ও অন্যান্য তীর্থ নিচয়ের জল দ্বারা বিপ্রগণ, ঋষিগণ ও লোকপাল সমন্বিত হইয়া মহাসুর প্রহ্লাদকে অভিষিক্ত করিলেন। এই সময়ে মরুদ্গণ স্তুতি পাঠ করিলেন। মরুদ্গণ ও সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক স্তুত ও অভিষিক্ত মহামতি প্রহ্লাদকে ভগবান্ মধুসূদন কহিলেন, হে দানবরাজ! যাবৎ সুমেরু, ধরা, চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুমি অখণ্ডগুণশালী রাজা হইয়া অবস্থিতি করিবে[২৬।৩১]। তুমি ইষ্টানিষ্ট ফল পরিত্যাগী থাকিয়া সমদর্শিনী বুদ্ধি অবলম্বন করিবে। রাগ ভয় ও ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক রাজ্য পালন করিবে। এই রাজ্যে স্বর্গে,

ভূলোকে, সর্ব্বত্রই তুমি নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিবে[৩২।৩৩]। তুমি রাগ, দ্বেষ ও বৈষম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন বিষয়ে দেশ, কাল ও ক্রিয়া অনুসারে বধদণ্ডাদি প্রয়োগ করিবে[৩৪]। আত্ম-নিষ্ঠ ও মমতাপরিত্যাগী হইয়া লাভালাভে সমজ্ঞান করিবে। এইরূপ কার্য্য তোমাতে কালুষ্য আনয়ন করিতে পারিবে না[৩৫]। হে প্রহ্লাদ! তুমি পরমার্থ কি ব্যবহার কি তাহা বিদিত হইয়াছ। সুতরাং তোমাকে আর আমি কি উপদেশ প্রদান করিব[৩৬]? তুমি ভয়, ক্রোধ ও রাগ শূন্য রাজা হইলে সুতরাং এখন হইতে আর দুঃখদারিদ্র্যাদি দোষ অসুর দিগকে আক্রমণ করিবে না[৩৭]। আজ্ হইতে আসুরী দিগের বাস্পবারি প্রতিরুদ্ধ হইল[৩৮]। আজ্ হইতে দেবাসুর সংগ্রাম বিনিবৃত্ত হউক এবং জগৎও স্বস্থ হউক। আজ্ হইতে দেবাসুরকুটম্বিনীগণ পরস্পর ভর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক অবন্দীকৃত হইয়া স্ব স্ব অন্তঃপুরে স্ব স্ব ভর্ত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক[৩৯।৪১]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

—(⋎(*)⋎)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ ঐ সকল কথা কহিয়া নর, অমর ও কিন্নর গণের সহিত অসুরমন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ তাঁহার পশ্চাৎ রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন১।২।

অনন্তর ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, স্বর্গে অমরগণ সহ ইন্দ্র ও পাতালে দানবাধীশ প্রহ্লাদ পদ্মে ষট্‌পদের ন্যায় অনন্তভোগ আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট প্রহ্লাদের চন্দ্রকিরণাপেক্ষা অধিক সুশীতল পাপনাশন উত্তম বোধ প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তন করিলাম৩।৫। যাঁহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রহ্লাদের এই পবিত্র উপাখ্যান বিচার করিবেন, তাঁহারা বহুদুষ্কৃতসম্পন্ন হইলেও পরম পদ লাভ করিতে পারিবেন। যখন সামান্যবিচারে দুষ্কৃতক্ষয় হয়, তখন যোগবাক্যবিচারে কেননা পরম পদের প্রাপ্তি হইবে? পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতাকেই পাপ বলিয়া থাকেন। সেই অজ্ঞানতা একমাত্র যোগ বিচার দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, পাপের মূল অজ্ঞানকে ছেদন করিবার মহাস্ত্র স্বরূপ বিচারকে পরিত্যাগ করা জনগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে৬।৮। যে সমস্ত নরগণ প্রহ্লাদের এই সিদ্ধিবিষয়ক বিচার অনুশীলন করিবেন, তাঁহাদিগের সপ্তজন্মকৃত পাপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে৯।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা প্রহ্লাদের মন পরম পদে প্রবিষ্ট বা পরিণত হইয়াছিল। সে মন পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিঃস্বনে কেন অথবা কিরূপে প্রবুদ্ধ হইল১০? মুক্ত মন কি পুনর্ব্বার বাহ্য বিষয়ে আইসে? বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পবিত্রমূর্ত্তি রাম! মুক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত। সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। উক্ত উভয় মুক্তির মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর১১। যাঁহার মতি অসংসক্ত অর্থাৎ কোন

কিছুতে ব্যাসক্ত হয় না, তাদৃশ ব্যক্তির যে ইষ্ট বিষয়ে রাগ ও অনিষ্ট বিষয়ে দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিতি, তুমি সেই স্থিতিকে জীবন্মুক্তি অথবা সদেহমুক্তি বলিয়া জানিবে[১২]। এই সদেহমুক্তিই দেহ নাশের পর বিদেহমুক্তিতে পর্য্যবসন্না হয়। এই মুক্তিকে তুমি পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত বলিয়া জানিবে। যাহারা বিদেহমুক্ত তাহারা আর দৃশ্যপথে আইসে না[১৩]। জীবন্মুক্ত মহাত্মগণের যে বাসনা (পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার) তাহা ভৃষ্টবীজের অনুরূপ। ভৃষ্টবীজে অঙ্কুর জন্মে না, জীবন্মুক্তের কর্ম্মাশয়ও দেহাদি জন্মায় না। তাঁহাদের বাসনানিচয় অতীব বিশুদ্ধা, অতীব পবিত্রা, অত্যন্ত উদার, প্রবলতম সত্ত্বগুণের অনুগামী ও আত্ম-ধ্যানময়ী। তাঁহাদের তাদৃশ বাসনাপুঞ্জ সুষুপ্তের ন্যায় তূষ্টিম্ভাবে থাকে, পরে দেহ পাতের সঙ্গে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব, হে রঘুনাথ! যেমন সুষুপ্তি কথন কথন ভজ্যমান হয় (ভাঙ্গিয়া যায়), হইয়া জাগ্রদ্দশায় আইসে, তাহার ন্যায় যত দিন দেহ থাকে তত দিন জীবন্মুক্তেরা সুষুপ্তি ভঙ্গের পর জাগ্রতের ন্যায় মধ্যে মধ্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এমন কি সহস্র সহস্র বৎসরের পরেও তাঁহাদের ব্যুত্থান হইতে পারে। (ব্যুত্থান=সমাধি হইতে বিচ্যুতি)[১৪।১৬]।

প্রহ্লাদ জীবন্মুক্ত; সেই কারণে তিনি শঙ্খশব্দ শ্রবণে স্বীয় অন্তরস্থ বিশুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনী বাসনার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ছিলেন[১৭]। আরও কথা এই যে, হরি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সত্যসঙ্কল্প। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করেন তখনই তাহা সুসম্পন্ন হয়[১৮]। "প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হউক" হরি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপ্রভাবেও প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া-ছিলেন[১৯]। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে নিজে কারণহীন অথচ ভূতনিচয়ের কারণ বিশুদ্ধ আত্মা আপ-নাতে জগৎ সৃজন করিবার জন্য বাসুদেবাখ্য শরীর পরিগ্রহ করেন[২০]। যখন বাসুদেব হরিই জীবের অন্তরাত্মা, তখন অবশ্যই জীবের আত্ম-দর্শনে মাধবদর্শন সম্পন্ন হয় এবং মাধবের আরাধনায় আত্মার আরা-ধনা সুসম্পন্ন হয়[২১]। হে রাঘব! তুমি আমার এই উপদেশ অব-লম্বনে আত্মাবলোকনে যত্নবান্ হও। আত্মদর্শন হইলে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে[২২]। এই সংসাররূপ প্রাবৃট্ (বর্ষা ঋতু) বিচাররূপ সূর্য্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া নিয়তই দুঃখরূপ বারিধারা বর্ষণ পূর্ব্বক জনগণের মূর্খতা-

রূপ বিষম ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। পিশাচ যেমন মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ, উক্ত বিষ্ণুমায়া ধীরব্যক্তিদিগকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারে না। সংসারজালরচনাকারিণী বৈষ্ণবী মায়া বিষ্ণুরই অপ্রসাদে ঘনতা ও তৎ প্রসাদে তনুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৭,২৮]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—○()*()○—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ভগবন্! যেমন ওষধি সকল শশাঙ্কের কিরণে পরম আপ্যায়িত হয় সেইরূপ আমরাও আজ্ শশাঙ্ক-তুল্য আপনার বচনরূপ কিরণে পরম আপ্যায়িত হইতেছি[১]। হে মুনে! সেই কারণে আমাদের শ্রবণেচ্ছা বিরাম প্রাপ্ত হইতেছে না। পুনর্ব্বার আমাদের জিজ্ঞাস্যের প্রত্যুত্তর বলুন। প্রোক্ত কারণে আমরা পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি, প্রতিবচন প্রদানে আমাদের শ্রবণেচ্ছা সফলা করুন। পুরুষ স্ব পুরুষকারের অর্থাৎ স্বকীয় প্রযত্নের দ্বারা সমুদয় সু-সম্পন্ন বা লাভ করিতে পারেন, ইহাই যদি নিয়মিত হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ কিজন্য বিনা মাধবের বরে প্রবুদ্ধ হইতে পারিলেন না? (প্রবুদ্ধ=তত্ত্বজ্ঞানী)[২।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাঘব! প্রহ্লাদ যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমস্তই পৌরুষদ্বারা, অন্য উপায়ে নহে[৪]। যেমন তিল ও তৈল, বস্ত্র ও বস্ত্রের শৌক্ল্য, অথবা পুষ্প ও গন্ধ অত্যন্ত প্রভিন্ন নহে, তাহার ন্যায় আত্মা ও নারায়ণ অত্যন্ত প্রভিন্ন নহেন[৫]। যিনি বিষ্ণু তিনিই আত্মা এবং যিনি আত্মা তিনিই জনার্দ্দন। আত্মা ও বিষ্ণু এই দুইটী শব্দ বিটপী ও পাদপ এই দুই শব্দের ন্যায় একই অর্থের প্রতিপাদক[৬]। অতএব প্রোক্ত বিষয়ে এইরূপ বুঝা উচিত যে, প্রহ্লাদ নামক আত্মা আপনিই আপনাকর্তৃক উদ্ভাবিত উৎকৃষ্ট যুক্তির দ্বারা (যোগের) অথবা আপনারই পরা শক্তির দ্বারা বিষ্ণুভক্তিতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অথবা প্রহ্লাদ স্বয়ংই আপন আত্মার দ্বারা উক্ত বর উপার্জ্জন এবং স্বয়ংই মনকে বিচারগামী করিয়া আপনাকে বিদিত হইয়াছিলেন[৭।৮]। এরূপ দেখা যায় যে, আত্মা কখন কখন আপনারই শক্তির সাহায্যে প্রবুদ্ধ হন এবং কখন কখন ভক্তিলভ্য বিষ্ণুদেহের দ্বারা প্রবুদ্ধ হন[৯]। মাধব চিরকাল আরাধিত হইলেও এবং আরাধকের প্রতি পরিতুষ্ট হইলেও বিচারবিহীন ব্যক্তিকে জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন না[১০]। যে জ্ঞানে

আত্মদর্শন হয় সে জ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি পুরুষ-প্রযত্নসমুত্থিত বিচারই মুখ্য কারণ, আর সব অর্থাৎ বরাদি গৌণ কারণ। অতএব, যাহা মুখ্য কারণ তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। অভ্যাস-সহকারে বলদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ ও ধ্যানদ্বারা চিত্তকে বিচারপরায়ণ কর[১১।১২]। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি যে কোন বস্তু প্রাপ্ত হউক না কেন, সমস্তই স্বশক্তিপ্রবর্ত্তন দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে অন্য দ্বারা নহে। তাই আমি বলিতেছি, তুমিও পৌরুষপ্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন কর ও সংসারজলধি উত্তীর্ণ হও, হইয়া সংসারের পরপারে পরম পদে গমন কর[১৩।১৪]। জনার্দ্দন যদি বিনা পুরুষকারে দৃশ্য হইতেন, অথবা উদ্ধার করিতেন, তাহা হইলে তিনি কি জন্য মৃগপক্ষিগণকে উদ্ধার করেন না[১৫]? শিষ্যের ভক্তিরূপ পৌরুষ ব্যতিরেকে গুরুও উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি তাহা পারিতেন, তাহা হইলে উষ্ট্র, রাসব ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতিরাও উদ্ধার লাভ করিত[১৬]। হে রাঘব! হরি হইতে, গুরু হইতে, ধন হইতে, লাভ করা যায়—যদি মনের উদ্যম থাকে। মনের আক্রমণ না থাকিলে হরি, গুরু, ধন, কেহই কিছু করিতে অথবা কেহ কিছু দিতে পারেন না। অভ্যাস, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়দমনাদি, এতত্ত্রিতয় যুক্ত আত্মা হইতে যাহা প্রাপ্ত না হওয়া যায়, তাহা ত্রৈলোক্য হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না[১৭।১৮]। অতএব, বৎস! তুমি পৌরুষ (শাস্ত্রীয় পুরুষকার বা প্রযত্ন) অবলম্বন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার আরাধনা কর এবং আত্মার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করতঃ আত্মাতেই অবস্থান কর[১৯]। যদ্যপি বিচারই জ্ঞান লাভের কারণ হয় তবে শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির বিধান কেন? এরূপ চিন্তা করিও না। মূঢ়েরা বিষয়াসক্তির প্রাবল্যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চা, ইন্দ্রিয় জয়, আত্মানাত্মবিচার, এই তিন্ শুভ বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে না। তাদৃশ মূঢ় দিগকে উক্ত শুভ পথে আকৃষ্ট করাইবার জন্যই শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ। নচেৎ বিষ্ণুভক্তি যে জ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ উপায় তাহা নহে[২০]। অতএব, অভ্যাস ও যত্ন, এই উভয় শুভ স্থিতি লাভের মুখ্য উপায়। পূজ্যপূজক ক্রম (নিয়মাদি) তদ্বিষয়ে গৌণ উপায়[২১]। যদি উপযুক্ত নিয়মে ইন্দ্রিয় জয়ী হওয়া যায় তাহা হইলে হরি পূজার প্রয়োজন কি? যদি ইন্দ্রিয় জয়ী না হওয়া যায় তাহা হইলেই বা হরি পূজার

ফল কি[২২]? বিচার ও রাগাদির উপশম ব্যতীত হরিকে পাওয়া যায় না। পরন্তু যাহারা বিচার ও উপশম দ্বারা মুক্ত হইয়াছে হরি তাহাদিগকে অতঃপর আর কি প্রদান করিবেন[২৩]? অতএব হে সাধো! তুমি বিচার ও উপশম এই দুএর আশ্রয় লও, এবং তদ্দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন কর। যদি তুমি তাহাতে সিদ্ধ হইতে পার ত স্বস্থ হইবে, নচেৎ বনগর্দ্দভের ন্যায় থাকিবে[২৪]। তুমি যেমন মাধবাদির প্রসন্নতা কামনা করিতেছ, তেমনি তুমি স্বচিত্তের প্রসন্নতা কামনা না কর কেন[২৫]? বিষ্ণু সকল প্রাণীরই অন্তরে অবস্থিত। যাহারা হৃদয়স্থ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে বিষ্ণুর অন্বেষণ করে তাহারা অপকৃষ্ট নর[২৬]। হৃদ্গুহাবাসী চিত্তই বিষ্ণুর মুখ্য দেহ, আর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তাঁহার (আত্মার) গৌণ শরীর[২৭]। যে মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গৌণের অনুগামী হয়, সে সিদ্ধ রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য (যাহা সাধন করিতে হইবে) সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অথবা অনায়াস লব্ধ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া আয়াসসাধ্য কার্য্যাদিদ্বারা অন্ন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়[২৮]। যিনি আত্মজ্ঞানে স্থিতি প্রাপ্ত, তাঁহার মনঃসংযমনকারী পূজাদিতে কি প্রয়োজন[২৯]? যাহারা আত্মবিবেক প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন, তাহারা সতত শঙ্খচক্রগদাপাণি পরমেশ্বরের আরাধনা করুক[৩০]। বৈরাগ্য বুদ্ধি অবলম্বনে ক্লেশসাধ্য হরিপূজা ও হরির উদ্দেশে ব্রতাদি ও তপস্যাদি করিতে করিতে কালে চিত্তনৈর্ম্মল্য উপস্থিত হয়। নিত্য নিত্য অভ্যাস ও বিবেক অনুশীলন করিলে চিত্ত শীঘ্রই প্রসন্ন হয়[৩১।৩২]। হরিপূজার রিতি ও নিয়মাদি উপলক্ষ্যে আমি যে সকল কথা বলিলাম, বুঝিতে হইবে, জীব আপনিই আপনার দ্বারা ঐ সকল ক্রম ও সে সকলের ফল লাভ করে[৩৩]। অর্থাৎ আত্মা স্বয়ংই আত্মার দ্বারা আত্মপূজা বা হরিপূজা জনিত ফল প্রাপ্ত হয়। লোক যে হরিপূজাদ্বারা হরির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহার নিজের অভ্যাস বৃক্ষের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৩৪]। একমাত্র মনোনিগ্রহই সর্ব্বসম্পত্তির মূল। সগরসুতগণ যে পৃথিবী খনন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুরগণ যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, মনের উদ্যমই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মনের একাগ্রতা ব্যতীত কোনও প্রকার মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যত-

কাল মনোরূপ উন্মত্ত সমুদ্র উদ্বেলিত থাকিবে, উপশান্ত না হইবে, জনগণ তাবৎ জন্মমরণতরঙ্গে উহ্যমান হইবে[৩৫।৩৭]। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ চিরপূজিত হইয়া দয়াবান্ হইলেও মনোব্যাধির উপপ্লব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন না। অতএব হে অঙ্গ! তুমি বাহ্যে-ন্দ্রিয়গম্য ও অন্তঃকরণগম্য বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মবিক্রিয়াদি-পরিশূন্য একমাত্র ও অখণ্ড সম্বিদ্ পরমাত্মার চিন্তা কর। তুমি বাহ্যা-ভ্যন্তরবিষয়ে নির্ম্মুক্ত নিরাময় অনন্তরূপ সর্ব্বসার সন্মাত্র একাদ্বয় সম্বিন্ময় আস্বাদ আস্বাদন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই জন্মনদীর পরপার (জন্ম-বর্জ্জিত মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে[৩৮।৪০]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

—০()০—
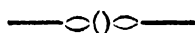
বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই যে সংসার নামিকা মায়া, ইহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কেবল আত্মচিত্তজয়দ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছুতে নহে[১]। এই জগন্মায়াপ্রপঞ্চের বৈচিত্র্য প্রবোধনার্থ একটী ইতিহাস বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর[২]।

এই বসুধাপৃষ্ঠে কোশল নামে এক মণ্ডল (গ্রামবিশেষ) আছে। তাহাতে গাধি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। গাধি ধীমান্, শ্রোত্রিয় (বেদবেদাঙ্গপারগ), এবং এরূপ ধার্ম্মিক যে, যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম[৩।৪]। বাল্যকাল হইতেই ইনি ভোগবিরক্ত ও তপোজপাদিতে রত থাকিতেন[৫]। একদা তিনি কোন অভিমত কার্য্য সাধনের মানসে বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ বনগমন করিলেন[৬]।

অনন্তর সেই বিপ্র গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোন এক অভিমত স্থানে তারারাজিবিরাজিত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় এক প্রফুল্ল কমল মণ্ডিত বিমল সরোবর প্রাপ্ত হইলেন[৭]। যত দিন না বিষ্ণুর দর্শন লাভ হইবে তত দিন তিনি তপশ্চরণ করিবেন, এই কামনায় সেই সরোবরসলিলে প্রাবৃট্ পদ্মের ন্যায় আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৮]। ঐরূপে অষ্ট মাস অতিক্রান্ত হইল। একদা হরি তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, বিপ্র! সলিল হইতে উত্থিত হও, অভিমত বর গ্রহণ কর। তোমার নিয়মরূপ বৃক্ষ অভীপ্সিত ফলে উপেত হইয়াছে[৯।১১]।

ব্রাহ্মণ স্বকীয় ইষ্টদেবকে বরদানোদ্যত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্তুতি সহকারে কহিলেন, হে জগত্ত্রয়ৈকনলিনীর সরোবর! হে অসংখ্য ভূতহৃদ্পদ্মকুহরের ভ্রমর! হে বিষ্ণো! তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্! আমি এই অশেষভ্রমদায়িনী সংসারনাম্নী কুহক বা মায়া সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি[১২।১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! ধীমান্ গাধি ঐরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ জনার্দ্দন তাঁহাকে "তুমি অগ্রে মায়া সন্দর্শন কর, পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে" * এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন[১৪]। তখন সেই ব্রাহ্মণ চন্দ্রদর্শনে কৈরবের ন্যায় জগৎপতি দর্শনে প্রফুল্লমনা হইয়া জলাশয় হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং হরিসন্দর্শনে আনন্দিত চিত্তে কিয়দ্দিবস সেই অরণ্যে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও অথিতিপূজনাদি শ্রোত্রিয়কর্ম্ম সমুদয় সম্পাদন করিলেন[১৫।১৭]।

একদা তিনি মনে মনে বিষ্ণুর সেই বর প্রদান বাক্য চিন্তা করিতে করিতে তত্রত্য বিকশিতকমল সরোনীরে স্নানার্থ গমন করিলেন[১৮]। অনন্তর স্নান বিধি অনুসারে জলমগ্ন হইয়া সকুশ হস্ত দ্বারা সেই সরোবরান্তর্গত জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হই লেন। অতঃপর যেমন তিনি অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠার্থ প্রণব উচ্চারণ করিলেন, অমনি বিপর্য্যস্তমতি হইয়া সমুদায় স্নান মন্ত্র ও অন্তরস্থ ধ্যান বিস্মৃত হইলেন। তখন তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সেই জলমধ্যে দেখিলেন, তাহার দেহ যেন অকস্মাৎ বাতবেগনিপাতিত দ্রুমের ন্যায় নিপতিত ও শবীভূত হইয়াছে। ত্বদীয় আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতেছে[১৯।২১]। তাঁহার দেহ প্রাণাপানপ্রবাহরহিত, অস্তকাল প্রাপ্ত, নিস্পন্দ এবং বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত[২২]। সেই শবীভূত দেহে ত্বদীয় বদনপঙ্কজ ছিন্ননাল অম্বুজের ন্যায় যার পর নাই ম্লান ও পাণ্ডুরবর্ণ হইয়াছে। বিপর্য্যস্ত নয়নের তারকাদ্বয় প্রাতঃকালীন তারকামালার ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালীন বৃক্ষপত্রের ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনাবৃষ্টিবর্ষিত গ্রামের ন্যায় ধূলিধূষরিত হইয়াছে[২৩।২৪]। তাঁহার বন্ধুগণ বাষ্পবিগলিতনেত্রে সেই মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে কুরর পক্ষীর ন্যায় রোদনপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে[২৫]। তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার পদতলাশ্রিতা হইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে[২৬]। তাঁহার জননী অতি উচ্চৈঃ রবে তাঁহার চিবুক

* জীব মায়াক্রান্ত হইলে বিনা সাধনে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভক্ততম গাধির সে দশা যেন না ঘটে, সেই ভাবে ভগবান্ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা বরপ্রদান দ্বারা অর্পণ করিলেন। সেই জন্যই গাধি মুহূর্ত্তান্তরে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

ধারণ পূর্ব্বক অসংখ্য বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে[২৭]। এবং অন্যান্য স্বজনগণ অশ্রু বিসর্জ্জন সহকারে অতি দীন ভাবে অবস্থান করিতেছে[২৮]। সেই শবীভূত দেহের হস্তপদাদি স্রস্ত, ওষ্ঠদ্বয় অসংলগ্ন, দন্ত বহিরাগত ও শ্বেতবর্ণ। এই শবীভূত দেহ ভূপতিত কর্দ্দম পুত্তলিকার সহিত উপমিত হইতে পারে। এই দেহ যেন এখন আপন প্রাক্তনী জীবিত দশাকে উপহাস্য করিতেছে, ধ্যানী মৌনীর ন্যায় তুষ্টিস্তাবে রহিয়াছে, জীবন-ভার বহনে যেন শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ সুষুপ্ত হইয়াছে, অথবা বন্ধুগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্নেহ, পরীক্ষা করিবার মানসে অতি-সাবধানে বন্ধুগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতেছে[২৯।৩২]। অনতি বিলম্বে তদীয় স্বজনগণ শোকাকুলিতচিত্তে বাষ্পবিগলিতনয়নে তাৎকালিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। তারস্বরে রোদন করিতে করিতে সেই মৃত দেহ গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিল। অনন্তর বন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক সেই দেহ দৃঢ়রূপে বন্ধন কবিয়া, যেখানে অসংখ্য গৃধ্রমণ্ডলী মেঘের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদক হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ মাংসাশী পক্ষী যে স্থানে সর্ব্বদা উড্ডীন, যেখানে শিবাগণের অশিব. বদন হইতে নিরন্তর অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে, যেখানে চিতানল ঘোর ঘর্ঘর শব্দে কল্পান্ত হুতাশনের ন্যায় অসংখ্য দেহ দহনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যেখানে বায়সগণ ঘোর ধ্বনিদ্বারা ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন করিতেছে, সেই মেদো-মাংসাস্থিসঙ্কুল-কঙ্কালবহুল শ্মশান ভূমিতে আনয়ন করিল এবং যত্ন সহকারে কাষ্ঠাদি দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক চিতা নির্ম্মাণ করতঃ প্রজ্বলিত করিল। পরে আত্মীয় হইয়াও অনাত্মীয়ের ন্যায় অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাতে সেই মৃত দেহ বিনিক্ষিপ্ত করিল। চিতানল সহস্রশিখ হইয়া চট চট ধ্বনি সহকারে সেই শব দহনে প্রবৃত্ত হইল এবং হস্তীর বেণুবন বিদলিত করণের ন্যায় অনতিবিলম্বে স্বীয় জটালশিখারূপ বহু দন্তদ্বারা কট কট শব্দে সেই কঙ্কাল বিদলিত করতঃ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল[৩৩।৪০]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর গাধি ব্রাহ্মণ সেই জলমধ্যে থাকিয়া তৎপরে যাহা দেখিলেন তাহাও বলি শ্রবণ কর। তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি ভূতমণ্ডল নামক কোন দেশের প্রান্তরবর্ত্তী কোন গ্রামে এক চণ্ডালিনীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন[১।২]। তথায় তিনি গর্ভবাসজনিত নিদারুণ ক্লেশে নিপীড়িত ও ক্ষুদ্রদেহ হইয়া শ্বপচীহৃদয়ে তদীয় বিষ্ঠার উপরে ব্যাকুলিত ও সুপ্তপ্রায় হইয়া রহিলেন[৩]। ক্রমে সেই চণ্ডালিনীর গর্ভ পরিপক্ক হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনী কর্ত্তৃক প্রসূত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন। অতঃপর চণ্ডালের নিতান্ত প্রিয় শিশু হইয়া কৃষ্ণবর্ণতা হেতু যমুনাপ্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন[৪।৫]। ক্রমে তথায় তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়স হইল, পরে তিনি কটঞ্জক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ক্রমে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তিনি জলধরসদৃশ পীবরতনু হইয়া কুক্কুরগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মৃগ বিনাশ করতঃ ব্যাধোচিত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন[৬।৭]। অনন্তর এক কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডাল কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। অদ্য হইতে তিনি সেই বাহুরূপ পল্লবসম্পন্না স্তনস্তবকশালিনী শ্যামা চণ্ডালিনীর সহিত পুষ্পবনে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণবর্ণা অলিনীর সহিত শ্যামল অলির ন্যায় তিনি সেই নব ভার্য্যার সহিত কখন বনকুঞ্জে, কখন গিরিনদীর তীরে ও কখন পদ্মকুঞ্জে বিহরণ, শয়ন ও অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি কানন ভ্রমণে ও মৃগ মারণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি উপযুক্ত কালে মৃগয়া ব্যাপারে অসাধারণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন[৮।১৪]। খদির বৃক্ষ যেমন কণ্টক প্রসব করে, তাহার ন্যায় তাঁহার কতকগুলি স্বকুলের অঙ্কুরস্বরূপ পুত্র প্রসূত (উৎপন্ন) হইল। এই সকল পুত্র অতিশয় বিষম, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্রূর চরিত্র[১৫]। এত কাল পরে এখন তিনি বহুকলত্রসম্পন্ন হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ক্ষীণযৌবন ও জরাজর্জ্জরিত

কলেবর হইয়া বৃষ্টিহীন স্থলীর (ভূমির) ন্যায় শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন[১৬]। যেমন মুনীন্দ্রগণ বনে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া বাস করেন তাহার ন্যায় তিনিও এত কাল পরে আপনার জন্মভূমি ভূতমণ্ডলের অনতিদূরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থান, করিতে লাগিলেন[১৭]। এই স্থানে তাঁহার পুত্রাদিও ক্রমে জীর্ণপ্রায় পত্রাদিহীন তমাল তরুর ন্যায় জরাক্রান্ত হইল। এইরূপে তাঁহার বহুবান্ধবসম্পন্ন চাণ্ডালগার্হস্থ্য বদ্ধমূল হওয়ার পর বৃদ্ধতা তাঁহার সেই শেষ দশায় বিলক্ষণ কষ্টপ্রদ হইয়া উঠিল এবং নানাবিধ ক্লেশ তাঁহার অনুভব গোচরে আসিতে লাগিল[১৮।১৯]।

অনন্তর ভ্রমভ্রান্ত গাধি দেখিলেন যে, তাঁহার জরাজর্জ্জরিত চণ্ডাল-দেহের সম্মুখে তদীয় পুত্রকলত্রগণ একে একে কালগ্রাসে নিপতিত হইল[২০।২১]। তখন তিনি পুত্রকলত্রবিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া যূথভ্রষ্ট সারঙ্গের ন্যায় একাকী সেই অটবীমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন[২২]। এবং অনবরত অশ্রুবারি বিসর্জ্জনদ্বারা তিনি অনতিবিলম্বে অন্ধপ্রায় হইলেন। ঐরূপে তিনি শোকপরীতচিত্ত হইয়া তথায় কিছু দিন অবস্থান করিলেন, পরে হংসগণ যেমন শুষ্ক সরোবর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনিও সেই জনশূন্য অটবী পরিত্যাগ করিলেন এবং আস্থাশূন্য ও চিন্তানিমগ্নচিত্ত হইয়া যেন অন্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাতক্ষিপ্ত অম্বুদের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২৩।২৪]।

একদা তিনি উক্তপ্রকারে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে কীরনামক এক মনোহর নগরে পাদপপংক্তি পরিশোভিত প্রশস্ত রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী ঐরাবতসদৃশ বৃহৎকায় মাতঙ্গ রাজ-বিয়োগবিধুর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে প্রচণ্ডবেগে আগমন করিতেছে। তখন তিনি সেই মাতঙ্গভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়নপর হইলেও সেই গজরাজ তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করতঃ অবিলম্বে তদীয় সমীপে সমাগত হইল এবং তাঁহাকেই রাজা জ্ঞান করিয়া স্বীয় গণ্ডস্থলে আরোপিত করতঃ রত্নরচিত রাজভবনা-ভিমুখে প্রস্থান করিল[২৫।৩০]।

অনন্তর করিরাজ রাজভবনে সমাগত হইলে জয়দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে "মহারাজের জয় হউক" এইরূপ ধ্বনি

উৎপন্ন হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল। বরাঙ্গনাগণ আগ্রহ সহকারে এই নূতন রাজাকে বরণ করিতে প্রবৃত্তা হইল। বান্ধবগণ আদর সহকারে তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ হর্ষোৎফুল্লনেত্রে গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ সিংহাসনে সমাবেশিত করিল। বিলাসিনী সুন্দরীগণ চামর আন্দোলন ও পরিচারকগণ স্ব স্ব সমুচিত ব্যবহার দ্বারা তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনে যত্নশীল হইল। ভৃত্যগণ হার কেয়ূর প্রভৃতি আভরণে তাঁহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধনার্থ চেষ্টান্বিত হইল। নানাপ্রকার সৌগন্ধ, নানাবিধ আলেপন, অশেষবিধ বসন ও ভূষণ তদীয় তৃপ্ত্যর্থ অর্পিত হইল[৩৯।৪০]। তিনি সেই সকল বসন ভূষণে বিভূষিত হইলে প্রকৃতিগণ (অমাত্য ও প্রজাগণ) তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া প্রোক্ত রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া ভ্রমণান্তে পুনর্ব্বার সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইল[৪১।৪৩]। এখন তাঁহার চরণ কীর রমণী-গণের করপদ্মে পরিমার্জ্জিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্পোপশোভায় সুশোভিত হইতে লাগিল। সিংহ যেমন কুসুমিত অরণ্যে সিংহীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় এই শ্বপচ কীর নগরে নাগরীগণে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল[৪৪।৪৬]।

রাম! উক্ত শ্বপচ (চণ্ডাল) বর্ণিত প্রকারে কীর নগরের রাজা হইলেন। পরে যেমন কোন ক্ষুধাতুর বায়স অকস্মাৎ একটী হৃষ্টপুষ্ট কলেবর মৃত হরিণ প্রাপ্ত হইলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ সেই চণ্ডাল হঠাৎ তাদৃশ বিভবসম্পন্ন বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে সেই অনুপম রাজভোগ ভোগে প্রবৃত্ত হইল। এখন তাঁহার দেহ মণিমুক্তামালায় খচিত। চিন্তা ও বিষাদ দূরী-ভূত। প্রাক্তন চাণ্ডালোচিত চিন্তাদি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তিরো-হিত। পৌরগণ বিশাল রাজ্যভার তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তথায় গবল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া স্বয়ং রাজ্যপালনে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন মন্ত্রিগণের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন[৪৭।৪৮]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

—(✕(*)✕)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গবলাভিধান গাধি রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে রাজকার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বিলাসিনীগণের সেবা, মন্ত্রিবর্গের পূজা, সামন্তগণের বন্দনা, ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নের শোভা, অনুশাসনের অর্থাৎ রাজ আজ্ঞার প্রভাব, এবং নিরন্তর অধীনস্থ জনগণের স্তব স্তুতি শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা স্বীয় চণ্ডালস্বভাব বিস্মৃত হইলেন। এখন তিনি শোক ভয় আয়াস বর্জ্জিত, সুখের অবস্থা প্রাপ্ত। আসব পানে উন্মত্তের ন্যায় নিরন্তর আনন্দ বৃত্তিতে অবস্থিত। তাঁহার শাসন প্রভাবে প্রজাবর্গও শোক দুঃখ ভয় প্রভৃতি বিস্মৃত হইল১.৩। এইরূপে তিনি সেই কীরপুরে অষ্টবর্ষ যাবৎ রাজ্যপালন করিলেন এবং ঐ কাল তিনি দয়া দাক্ষিণ্য ও শৌচ প্রভৃতি সদ্বৃত্তিতে অতিবাহিত করিলেন৪।

একদা সেই কীরপুরাধিপতি গাধির চিত্তে ভুক্ত বৈরাগ্যের কোন কোন লক্ষণ আবির্ভূত হইল। হার কেয়ূর ও বলয় প্রভৃতি আভরণ নিচয়কে তিনি আর বহু বলিয়া মনে করেন না, আহার্য্য শোভায় তাহার চিত্ত আর আনন্দ অনুভব করে না। এক দিন তিনি যদৃচ্ছা-ক্রমে রাজবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহিরঙ্গনে গমন করিলেন৫.৭। তৎ-কালে সেই অঙ্গনভূমিতে কৃষ্ণবর্ণ পীবরকায় কতকগুলি চণ্ডাল বীণাযন্ত্র লইয়া গান করিতে ছিল৮.৯। কীবরাজ তথায় গমন করিবামাত্র সেই চণ্ডালবৃাহ হইতে একটী রক্তলোচন স্থবির অকস্মাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "কি হে কটঞ্জক!" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। (কটঞ্জক তাঁহার পূর্ব্বের নাম) এবং হাস্য সহকারে কহিল, অহে কটঞ্জক! তুমি কত দিন এখানে এরূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ? এখানকার রাজা কি তোমার সুমধুর কণ্ঠে (গানে) সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সমাদর করেন? এবং তোমাকে কি তিনি গৃহ, আভরণ ও বস্ত্রাদি অর্পণ করিয়াছেন? বহুকাল পরে আমি আজ্ তোমাকে ফলপুষ্পপরিপূর্ণ রসাল বৃক্ষের ন্যায় সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম১০.১৩। যেমন

সূর্য্যোদয়ে পদ্মের আনন্দ ও চন্দ্রোদয়ে ওষধির তৃপ্তি, তেমনি, তোমার দর্শনে আজ্ আমার আনন্দ ও তৃপ্তি হইয়াছে। যত প্রকার লাভ আছে, তন্মধ্যে বন্ধু লাভই শ্রেষ্ঠ। বন্ধু দর্শনই বিশ্রান্তি সুখের অবধি।

চণ্ডাল কীরপতিকে ঐরূপ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কীরপতি তৎকালোচিত বাক্যে ও ভাবভঙ্গীতে (অর্থাৎ সঙ্কেত ক্রমে) প্রত্যুত্তর দিয়া উক্ত চণ্ডালকে আত্মগোপনের উপযুক্ত সারবান্ কথা সকল বলিলেও রাজপুরন্ধ্রীগণ ও অন্যান্য প্রকৃতিগণ [illegible] দিয়া সেই চণ্ডালের ও রাজার কথোপকথন [illegible] তখন তাঁহাকে তাঁহারা চণ্ডাল বলিয়া অবগত হইল। [illegible] সর্ব্বনাশ! রাজা চণ্ডাল!" ইহা ভাবিয়া তাহারা সকলেই অত্যন্ত [illegible] হইয়াছিল১৬। "রাজা চণ্ডাল" এই বাক্য ক্রমে সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ায় [illegible] তুষারবর্ষণে পদ্মের ন্যায়, দুর্ভিক্ষে গ্রামীণগণের ন্যায় ও [illegible] ন্যায় দুর্দ্দশান্বিত হইল১৭। ক্রমে তিনিও [illegible] তাঁহাকে শ্বপচ বলিয়া জানিতে পারিয়াছে১৮। [illegible] হইয়া দেখিলেন, পুরন্ধ্রীগণ বর্ষাকালীন পাদ্মিনীগণের ন্যায় [illegible] অবস্থান করিতেছেন১৯। তিনি নিকটে অবস্থান করিলেও [illegible] তাঁহাকে ঘৃণা চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং যেমন শুচি লোকে মৃত দেহ স্পর্শ করে না তাহার ন্যায় মন্ত্রি প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন না। ভৃত্যগণ তাঁহার সংকার [illegible] দূরে [illegible], তাঁহাকে দর্শন করিয়াই দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। [illegible] অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মৃতের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজা এই সমুদয় ব্যবহার দর্শন করিয়া সাতিশয় নিরুৎসাহ হইলেন। তদীয় রক্ষকগণও একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তাঁহার আজ্ঞাদ্বারা জনগণকে বশীভূত করিবারও উপায় রহিল না। যেমন ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস দেখিলে লোকে পলায়ন করে, তাহার ন্যায় তিনি জনতামধ্যে গমন করিলে জনগণ তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অতঃপর কেহই আর তাঁহার দানাদি গ্রহণ করিল না। তখন তিনি পুনর্ব্বার যে চণ্ডাল সেই চণ্ডাল হইলেন এবং অস্পৃশ্য আর্য্যবৃত্তিবর্জ্জিত ও ত্যক্তধনশ্রী হইয়া পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন২০।২১।

অনন্তর নগরবাসিগণ স্থির করিলেন যে, আমরা যেরূপ দীর্ঘকাল

চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করিয়াছি, তাহাতে আমরা সামান্য প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হইতে পারিব না। অতএব, চিতাপ্রবেশরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করাই আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। নগরবাসিগণ ও মন্ত্রি প্রভৃতি অমাত্যগণ ঐরূপ স্থির করিয়া সকলেই শুষ্ককাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব চিতা প্রস্তুত করিল[৩০।৩১]। যখন শত শত সহস্র সহস্র চিতা প্রজ্বলিত হইল তখন বালক, বালিকা ও রমণীগণের ক্রন্দনধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল[৩২]। রমণীগণের বিলাপে সুমেরু পর্য্যন্তও বিগলিত হইতে লাগিল। চিতা সকল প্রজ্বলিত হইলে সে সকলের স্ফুলিঙ্গ নভোমণ্ডলে তারকা মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অসংখ্য চিতার ধূমাভ্রপটল সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। সেই সকল চিতা সমূহ যেন চট চট্ শব্দে প্রবেশেচ্ছু জনগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। জনগণও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে চিতাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া চিরকালের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। চিতাসমূহ যেন সেই সমুদয় সজ্জনসংসর্গ লাভে আনন্দিত হইয়াই ঘোর রবে নভোমণ্ডল অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইল। চিতার চট্ চট্ ধ্বনি, মেদ বসাদির দুর্গন্ধ, প্রস্ফুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও মৃতধূমাভ্রপটল যেন কল্পান্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে চৌরগণ অস্বামিক গৃহে স্ব স্ব মনোরথ পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। নাগরগণ পুত্র কলত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই মরণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। তখন "আমি অগ্রে প্রবেশ করি," "আমি অগ্রে প্রবেশ করি" এই শব্দই অবশিষ্ট জনগণের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল[৩৩।৩৯]।

এ দিকে সাধুসঙ্গপরিশোধিতবুদ্ধি কীরপতি গবল মনে মনে চিন্তা করিলেন, হায়! আমারই নিমিত্ত অকালে এই মহাপ্রলয়দশা সমুপস্থিত। আমারই কারণে সমস্ত রাজ্য মরুপ্রায় হইল! অতএব, আমারই বা আর এই কুৎসিত জীবনে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমার পক্ষে মরণই মহোৎসব। নিন্দাভাজন হইয়া লোকমধ্যে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকে আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আমিও চিতাপ্রবেশদ্বারা এই সর্ব্বনাশ জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। কীরপতি গাধি এইরূপ স্থির করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া অনুদ্বেজিত চিত্তে পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে স্বদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। তিনি চিতা-

প্রবিষ্ট হইয়াছেন, হুতাশন তাঁহাকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত অবস্থা অনুভব করিয়া হটাৎ অঘমর্ষণকারী গাধি-ব্রাহ্মণ সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন[৪০।৪৫]।

বাল্মীকি কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিতেছেন ইত্যবসরে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভ্যগণ সায়ন্তন কার্য্য সাধনের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। পরদিন আবার সকলেই সূর্য্যকিরণের সহিত সেই সভায় সমাগত হইলেন[৪৬]। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর পুনর্ব্বার সকলে সমবেত হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অঘমর্ষণ মন্ত্র জপার্থ জলমধ্যে প্রবিষ্ট গাধিব্রাহ্মণ মুহূর্ত্ত দ্বিতয়ের পর প্রাগুক্ত মানস ভ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন পরন্তু তখনও তাঁহার ব্যাকুলতা নিঃশেষে বিদূরিত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি পূর্ণ বোধ প্রাপ্ত ও নিরাকুল হইলেন। যেমন কল্প শেষ হইলে জগৎ রচনাকারী ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হন, তাহার ন্যায়, গাধিও এক্ষণে প্রাগুক্ত মানস রচনার সম্মোহ হইতে বিরাম প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ সম্যক্ প্রবুদ্ধ হইলেন[১।২]। জনগণ যেমন নিদ্রান্তে স্বাত্ম বোধ প্রাপ্ত হয়, যেমন মদ্যপান জনিত উন্মত্ততার শান্তিতে চিত্তবৃত্তি সুস্থিরা হয়, তাহার ন্যায় তিনি অল্পে অল্পে স্বাত্মযাথার্থ্য বোধ প্রাপ্ত হইলেন[৩]। যেমন রাত্রের তমঃপট বিদূরিত হইলে লোক সকল স্ব স্ব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিন্তা করে, তাহার ন্যায় গাধিও এক্ষণে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যে আমি গাধি, স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া ছিলাম, সেই আমিই এক্ষণে তর্পণাদি স্নান শেষ নির্ব্বাহ করিব। আমি চণ্ডালও হই নাই এবং রাজত্বও করি নাই। গাধি এইরূপ চিন্তা করিয়া জল মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, সেই জল, সেই দিক্, সেই পৃথিবী, সেই ব্যোম। ভ্রম কালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপারে তিনি যার পর নাই বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমি ভ্রম সন্দর্শনই করিয়াছি। জল হইতে তট ভূমে উঠিলে পুনর্ব্বার তাঁহার চিত্তে চিন্তার আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যে মাতার ও প্রিয়ার সমক্ষে মরিয়া ছিলাম, সে মাতাই বা কে? প্রিয়াই বা কোথায়[৪।৯]? অতি শৈশবেই আমার পিতা মাতার মৃত্যু হয় এবং আমার বিবাহও হয় নাই। স্ত্রী কাহাকে বলে তাহাও আমি বিজ্ঞাত নহি। আমার জন্মস্থানস্থ বন্ধুগণও অতিদূরে রহিয়াছে। তবে আমি যাহাদের সম্মুখে মরিয়া ছিলাম তাহারা কে[১০।১২]? কি

অদ্ভুত! আমি এ কি দৃশ্য দর্শন করিলাম? অহো! আমার সেই জন্মমরণাদি গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অলীক হইলেও ক্ষণেকের জন্য সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যেমন শার্দ্দূলগণ যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে পরিভ্রমণ করে, দেহিগণের চিত্তও তদ্রূপ স্বেচ্ছানুসারে বিবিধ ভ্রমে বিচরণ করে[১৩।১৫]। গাধি এইরূপ চিন্তা সহকারে কিছু কাল সেই আশ্রমে কাল যাপন করিলেন[১৬]।

একদা এক মহাত্মা অতিথি গাধির আশ্রমে সমাগত হইল। গাধি পরম সমাদরে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন[১৭।১৮]। ক্রমে সায়ং-কাল সমাগত হইলে উভয়েই সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া মৃদু-পল্লবশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন গাধি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনাকে অতিশয় কৃশাঙ্গ ও পরিশ্রান্ত দেখিতেছি কেন? আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন[১৯।২১]?

অতিথি কহিলেন, ভগবন্! আমার কৃশতার ও শ্রান্তির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহা বলিব, সমস্তই সত্য, আমরা অসত্য-বাদী নহি[২২]। এই বসুন্ধরামণ্ডলের উত্তর দিকে কীর নামে এক বিখ্যাত জনপদ আছে[২৩]। আমি সেই কীর নগরে জনগণের বহুসম্মান ভাজন হইয়া এক মাস যাবৎ অবস্থান করিয়াছিলাম[২৪]। একদা তথায় আমাকে কোন এক ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে কহিল, এই দেশে এক চণ্ডাল অষ্ট বর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিতেছিল, ক্রমে সে কথা সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ায় সকলেই চণ্ডাল সংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণ মানসে অগ্নি প্রবেশের সঙ্কল্প করে, অনন্তর তদুপলক্ষ্যে এই দেশের শত শত ব্রাহ্মণ জ্বলন্ত হুতাশনে স্বদেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে সেই চণ্ডালরাজও হুতাশনপ্রবিষ্ট হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে[২৫।২৭]। আমি সেই কথা শুনিয়াই সেই কীরনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে গমন-পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের তিন দিবস অন্তে অদ্য পারণ করতঃ ভবদাশ্রমে সমাগত হইয়াছি। উপবাস ও পথ-শ্রান্তি উভয়বিধ কারণে আমি সাতিশয় ক্লিষ্ট ও শ্রান্ত হইয়া পড়ি-য়াছি[২৮।২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, গাধি সেই অতিথির মুখে নিজ অনুভূত বিষয়

শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সন্দেহক্রমে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে অতিথি ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ কথাই বলিল। আরও বলিল, যাহা বলিলাম তাহা অসত্য বা গল্প কথা নহে[৩০]। গাধি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বারম্বার কেবল সেই কীরনগর সম্বন্ধীয় কথারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই রজনী প্রভাতা হইল। তখন তাঁহারা উভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন। অতিথি যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলে গাধি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[৩১।৩২], কি আশ্চর্য্য! আমি ভ্রমপ্রযুক্ত যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি, ব্রাহ্মণ তাহা সত্য বলিয়া বর্ণনা করিল। এ যে কি কাণ্ড তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি স্নান করিতে করিতে আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে মরণ প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলাম। পরন্তু ভ্রমাবসানে যখন আপনাকে পূর্ব্ববৎ দর্শন করিয়াছি, তখন যে উহা আমার ভ্রম তাহাতে আর সন্দেহ কি? কি অদ্ভুত মায়া? যাহাই হউক, আমাকে উহার তথ্য অবগত হইতে হইবে, শেষ দেখিতে হইবে[৩৩।৩৪]। আমার যে চণ্ডাল হওয়া প্রভৃতি শেষ বৃত্তান্ত, তাহার তথ্য জানিবার জন্য আমি সেই ভূতমণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিব[৩৫]।

গাধি মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া ভূতমণ্ডল গ্রাম দেখিবার জন্য উত্থিত হইলেন[৩৬]। হে রাঘব! যাহারা প্রাজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল তাহারা মনের চিন্তা সফল করিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত—গাধি ব্রাহ্মণ স্বপ্নবৎ দৃশ্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ তাহা স্ব উদ্যোগে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন[৩৭]। যাহা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বিদিত, তাহাও অধ্যবসায় বা উদ্যোগ বলে পাওয়া যায়।[০] তাহার উদাহরণ—গাধি ব্রাহ্মণ জগৎ সম্বন্ধীয় মায়া অনুভব করিয়া সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। রঘুনাথ! অনন্তর ব্রাহ্মণোত্তম গাধি আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা জনপদ অতিক্রম করতঃ ভূতমণ্ডল নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন, এই গ্রামই তাঁহার ভ্রম দৃষ্ট। অনন্তর তিনি সেই ভূতমণ্ডলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তত্রত্য কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া চণ্ডালপুরী অবলোকন করিলেন[৩৮।৪১]। তথায় দেখিলেন, পাতালে নরকমণ্ডলীর ন্যায় সেই চণ্ডালগৃহমণ্ডলীর মধ্যে তদীয় সেই ভ্রমদৃষ্ট মূর্ত্তিমান দৌর্ভাগ্যস্বরূপ গো মেষ মহিষাদি জন্তুগণের কঙ্কাল সমূহে ধবলীকৃত গৃহ সমুদায় বিদ্যমান রহিয়াছে[৪২]।

গাধি ব্রাহ্মণ মনোমধ্যে যেরূপ চণ্ডালত্ব, যেরূপ বিস্তারের ও গঠনের চণ্ডালপুরী, ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া ছিলেন, ভূতগ্রামে আসিয়া অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন[৪৩।৪৪]। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহসকল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ভিত্তি সকল বর্ষা জলে গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, তদুপরি প্রভূত তৃণ উৎপন্ন হইয়াছে। এক খণ্ড কট (মাদুর) জীর্ণপ্রায় পতিত রহিয়াছে দেখিলেন। দেখিয়া স্মরণ হইতে লাগিল, যেন তিনি সেই কটে শয়ন করিতেন[৪৫]। তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট গৃহের ভিত্তি চিহ্নমাত্রে পর্য্যবশেষিত হইয়া রহিয়াছে, আর কিছু নাই। তাঁহার পান ভোজনের খর্পরও সেই স্থানে পতিত আছে দেখিলেন। গাধি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকল দৃষ্ট করিয়া অতীব বিস্ময়াকুলিত চিত্তে সেই চণ্ডাল পুরীর পার্শ্বে কোন এক ভদ্রগ্রামে অতি দ্রুতবেগে গমন করতঃ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! এই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী ঐ চণ্ডালপুরীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি আপনার স্মরণ হয়[৪৬।৫২]? আমি সজ্জনমুখে শ্রবণ করিয়াছি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে অবগত থাকেন। হে সাধো! ঐ স্থানে এক বৃদ্ধ চণ্ডাল বাস করিত তাহার বিষয় যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। হে প্রাজ্ঞ! আমি শুনিয়াছি, পান্থ ব্যক্তির সংশয় ছেদন করিলে মহৎ পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে[৫৩।৫৫]।

যেমন রুগ্ন ব্যক্তি চিকিৎসককে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে তাহার ন্যায় গাধি ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ গ্রামবাসীকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৫৬]। গ্রাম্য ব্যক্তি গাধিকর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, হে ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বটে। ঐ স্থানে কটঞ্জক নামে এক চণ্ডাল বাস করিত। সেই দারুণাকৃতি চণ্ডাল বৃদ্ধ হইলে তাহার পুত্র কলত্রাদি তাহার সম্মুখে একে একে কালগ্রাসে নিপতিত হওয়াতে সে শোকে অধীর হইয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কীরনগরে গমন করে। তথায় সে দৈবাৎ রাজা হইয়া অষ্টবর্ষ যাবৎ নিরুদ্বেগে আর্য্যজনের ন্যায় রাজত্ব করে[৫৭।৬০]। তৎপরে কীরবাসিগণ তাহাকে চণ্ডাল জানিয়া অনর্থরাশির ন্যায় ও বিষ বৃক্ষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেহ হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিয়া দীর্ঘকাল চণ্ডালসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। এবং সেই চণ্ডাল রাজাও আর্য্য সংসর্গের প্রভাবে

আর্য্যভাব প্রাপ্ত হওয়ায় সেও কর্ত্তব্য বোধে হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছিল[৬১,৬২]। অহে ব্রাহ্মণ্! আপনি এত যত্ন সহকারে তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? সে কি আপনার কোন বন্ধু? অথবা আপনি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি স্নেহাসক্ত[৬৩]?

গাধি ব্রাহ্মণ একে একে গ্রামের সমুদায় ব্যক্তিকে কটঞ্জকের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার এক মাস অতিবাহিত হইল। গ্রাম বাসীরাও গাধির পূর্ব্বানুভূত চণ্ডালত্বের বিষয়পরম্পরা যথা যথা বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে গাধি ব্রাহ্মণ নিজের অনুভূত চণ্ডালক্রমের সহিত গ্রামবাসীদিগের বর্ণিত চণ্ডালের ও চণ্ডালক্রমের ঐক্য বিদিত হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন[৬৪,৬৬]।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, গাধির মন সেই চণ্ডাল গৃহে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই অদ্ভুত ব্যাপারে তৃপ্তির বিশ্রাম না হওয়ায় তিনি তত্রস্থ স্থান, সদন ও গৃহদ্রব্যাদি পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন[১।২]। এবং সেই ভগ্ন গৃহে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন[৩]—এই সেই সকল হস্তিদন্ত—যে সকল দন্ত প্রাচীরোপরি জালবৎ প্রোথিত করতঃ বৃতি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সে সকল অদ্যাপি যথাযথ রহিয়াছে[৪]। পূর্ব্বে এই স্থানে আমি মদ্যপানোন্মত্ত চণ্ডাল বন্ধুগণের সহিত বংশাঙ্কুর-যুক্ত বানরীমাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলাম[৫]। হস্তিমদ মিশ্রিত সুতরাং তিক্তাস্বাদ মৈরেয় পান করিয়া কৃষ্ণবর্ণা চণ্ডালিনীর সহিত সিংহ চর্ম্মে শয়ন করিয়া ছিলাম। এই স্থানে প্রোথিত হস্তিদন্তে চর্ম্ম-দ্বারা কুক্কুরগণকে বাঁধিয়া রাখিতাম[৬।৭]। এই স্থানে তিনটী উখা প্রমাণ গজদন্ত নির্ম্মিত পাত্র ছিল, তাহা গজমুক্তায় খচিত ও কৃষ্ণবর্ণ মহিষ চর্ম্মে পিনদ্ধ ছিল[৮]। এই সকল স্থানে চণ্ডাল বালক দিগের সঙ্গে পত্র পুঞ্জে কোকিলের ন্যায় লুক্কায়িত হইয়া থাকিতাম। এই স্থানে গান ও বাদ্য করিয়াছি ও কুক্কুটের রক্ত পান করিয়াছি[৯।১০]। এই স্থানে বিবাহোৎসবে কুটুম্বগণের সহিত নৃত্য গীত ও উল্লাস কোলাহল করিয়াছি[১১]। এই স্থানে উড্ডয়ন লোল কাক ও ভাস পক্ষী সকল ধৃত করিয়া পরদিবসীয় ভক্ষণ কার্য্যের জন্য বাঁশের পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিতাম[১২]। হে রামচন্দ্র! গাধি পুনঃ পুনঃ এইরূপ এইরূপ প্রাক্তনী চণ্ডালক্রিয়া স্মরণ ও লোকমুখে তৎসমুদয় প্রত্যক্ষীকরণ করিয়া অত্যধিক বিস্ময় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভূতমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া কীরনগর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নদ, নদী, শৈল, অরণ্য, গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কীরনামক জনপদে সমুপস্থিত হইলেন[১৩।১৪]। দেখিলেন, সেই কীর নগরের মধ্য-ভাগে কীরাধিপতির নগসন্নিভ মহানগর এবং তথায় প্রাক্তনানুভূত

সমুদয় বস্তু রহিয়াছে[১৬,১৭]। সে সকল নিরীক্ষণ করিয়া তিনি আগ্রহ সহকারে তত্রস্থ জনৈক কোন অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধো! এই স্থানে চণ্ডাল রাজা ছিল তাহার বিষয় কি আপনি বিদিত আছেন? যদি বিদিত থাকেন, তবে উহা আমার নিকট শীঘ্র বর্ণন করুন, করিয়া আমার মহাসংশয় নিরাকরণ করুন[১৮]।

তৎশ্রবণে নগরবাসিগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই স্থানে এক জন চণ্ডাল অষ্টবর্ষ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিল। এখানকার রাজাসন শূন্য হইলে মঙ্গল হস্তী তাহাকে রাজত্ব অর্পণ করে[১৯]। অষ্ট বর্ষের পর তত্রস্থ অধিবাসিগণ তাহাকে শ্বপচ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়া প্রায় সকলেই প্রায়শ্চিত্ত করণ মানসে হুতাশনে দেহ ত্যাগ করেন। তদ্দর্শনে সেই চণ্ডাল রাজাও অগ্নিপ্রবেশদ্বারা অদ্য দ্বাদশ বর্ষ হইল দেহপরিত্যাগ করিয়াছে[২০]।

গাধি কৌতুকাক্রান্ত হইয়া যাহাকে যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা সকলেই ঐ একই কথা বলে, গাধি তাহা শুনিয়া অদ্ভুত রসের আস্বাদনে মুগ্ধপ্রায় হন[২১]। এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে একদা চক্রধর বিষ্ণু সৈন্য সামন্তাদি রাজচিহ্ন সহ রাজবেশে তন্নগরস্থ মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। গাধি তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও আপনার প্রাক্তন রাজত্ব স্মরণ করিয়া বিস্ময়াকুলিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। * "অহো! যাহাদের শরীরকান্তি পদ্মগর্ভের সহিত উপমিত হয় সেই সকল কীর রমণী এই। ইহাদের বর্ণ গলিত সুবর্ণের ও নেত্র নীলোৎপলের সদৃশ[২২।২৪]। যে সকল চামর সংপিণ্ডিত জ্যোৎস্না কিরণের, স্থির নির্ঝরের ও কাসকুসুমের অনুকরণ করে, সেই সকল চামরও ঐ। যে সকল ললনা ঐ সকল চামর বীজিত করিত সে সকল ললনাও ঐ। এই সকল ঐরাবৎ সদৃশ মাতঙ্গ পূর্ব্বে আমাকেও বহন করিয়াছিল[২৫।২৭]। এই সকল যম বরুণ কুবের সদৃশ সামন্ত রাজারাও আমার পূর্ব্বদৃষ্ট[২৮]। এই সকল সুন্দরী রমণী ও এই সকল

* নিজকৃত পুণ্য পুঞ্জের ফলে ও ভগবানের অনুগ্রহে গাধির রাজরূপী ভগবানের দর্শন লাভ হইল। কিন্তু গাধি ভগবৎ মূর্ত্তি দেখিলেও তাঁহাতে ভাবুক হইতে অথবা বিচার পরায়ণ হইতে পারিলেন না। তাহার চিত্ত পূর্ব্বানুভূত রাজচিহ্ন স্মরণ করিয়া কৌতুকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

সুসজ্জিত গৃহ পংক্তিও আমার পূর্ব্বানুভূত[২৯]। জাতিস্মর যোগীরা যেমন পূর্ব্বজন্মপরম্পরা স্মরণ করেন, তাহার ন্যায় আজ্ আমি আমার পূর্ব্বভুক্ত এই কীর রাজ্য প্রত্যক্ষগম্য করিতেছি[৩০]। নিশ্চয়ই আমি ইতি পূর্ব্বে যাহা স্বপ্নে সন্দর্শন করিয়াছি, অধুনা তাহাই আমার সম্বন্ধে জাগ্রৎ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এ যে কাহার মায়া, এ মায়ার উদ্যোগী কে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি[৩১]। অহো! শকুন্ত যেমন জালবদ্ধ হয় তাহার ন্যায় আমার মন আজ্ দীর্ঘ সম্মোহের পরবশ হইয়াছে[৩২]। ধিক্ আমাকে! আমার মনকেও ধিক্! যে হেতু আমি বা আমার অবোধ মন বাসনায় বিনষ্ট হইয়া শত শত ভ্রান্তি জালে আবদ্ধ হইয়াছি ও হইয়াছে[৩৩]। আমার বোধ হয় এই মহতী মায়া চক্রধর বিষ্ণু কর্ত্তৃকই প্রদর্শিত হইয়াছে। কেননা, এখন আমার সে কথা স্মৃতি পথে উদিত হইতেছে[৩৪]। অতএব আমি এক্ষণে গিরি-কন্দরে গমন করিয়া এরূপ যত্ন করিব যাহাতে এই সম্ভ্রমের উৎপত্তির ও স্থিতির স্বরূপ অবগত হইতে পারি[৩৫]।”

গাধি এইরূপ স্থির করিয়া কীর নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিকন্দরে সমাগত হইলেন এবং জলমাত্র পান করতঃ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন[৩৬।৩৭]।

মহাতেজস্বী গাধি সেই গিরিকন্দরে এক বৎসর ছয় মাস তদ্রূপ কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ নারায়ণ পরি-তুষ্ট হইয়া তাঁহার পুরোভাগে প্রসন্নমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; এবং কহিলেন, বিপ্র! তুমি আমার গরীয়সী মায়া দর্শন করিয়াছ। তুমি আমার মায়াপ্রভাবে বিরচিত জগজ্জালের চেষ্টিত সমুদায়ও পরিজ্ঞাত হইয়াছ[৩৮।৪০]। তবে আবার কোন্ কামনায় তপস্যা করিতেছ[৪১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, দ্বিজসত্তম গাধি শার্ঙ্গপাণি হরিকে (বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ।) দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অভিহিত বচনাবলি শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমা ভক্তি সহকারে তদীয় পাদ-পঙ্কজদ্বয়ে কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আমাকে যে অতি তমোময়ী মায়া দর্শন করাইয়াছেন, এক্ষণে তাহা দূরীভূত করিয়া আমার হৃদ্‌পদ্ম বিক-শিত করুন[৪২।৪৪]। অন্য প্রার্থনা এই যে, বাসনামলিন মন যে সকল

ভ্রম স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সন্দর্শন করে, সে সকল জাগ্রতের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় কেন? অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নাবসানে থাকে না বা দেখা যায় না; সেইরূপ, ভ্রমদৃষ্ট পদার্থও ভ্রম বিনাশের পর থাকে না বা দেখা যায় না, পরন্তু আমি কি প্রকারে ভ্রমদৃষ্ট পদার্থ ভ্রমবিনাশের পরেও দেখিলাম? হে অমলপদপ্রদ! আমি সলিলমধ্যে মুহূর্ত্তদ্বয় মধ্যে যে দীর্ঘ ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছি; সে সমুদায় আমার অন্তঃস্থ। অথচ আমি সে সমুদায়কেই আমার বাহিরেও দেখিলাম। কালের সেরূপ দীর্ঘতা, দেহের সেরূপ জন্মমরণ, এ সকল কিরূপে প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইল? (অর্থাৎ আমি মুহূর্ত্ত মাত্র ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, আট বৎসর রাজত্ব, বহু বৎসর চণ্ডাল), আমার উক্তবিধ দর্শন কেবল অন্তরে অবস্থিত নহে, বাহিরেও তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহার কারণ কি তাহা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন[৪৫।৪৭]।

ভগবান্ কহিলেন, হে গাধে! তুমি যে মহদ্ভ্রম সন্দর্শন করিয়াছ, উহা তোমার অদৃষ্টের ও বাসনারোগাভিভূত চিত্তের রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আকাশ বল, পর্ব্বত বল, পৃথিবী ও দিক্, এ সমস্তই অন্তরে, অঙ্কুরে পত্রপুঞ্জের ন্যায় চিত্ত মধ্যেই অবস্থিত, বাহিরে নহে[৪৮।৪৯]। ফলাদি যেমন পশ্চাৎ অঙ্কুর হইতে বহিঃপ্রকটিত হয় তাহার ন্যায় পৃথিব্যাদিও চিত্ত হইতে বহিঃপ্রকটিত হয়[৫০]। পৃথিব্যাদি চিরকালই চিত্তস্থ, কোনও কালে বহিঃস্থ নহে[৫১]। চক্ষুরাদির দ্বারা বর্ত্তমান বিষয়ের দর্শন, মনের দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষয়ের সমর্থন, অতীত বিষয়ের স্মরণ, ঐ সমুদায়ের নিরূপক কাল, কালের ব্যঞ্জক সূর্য্যাদির ক্রিয়া বা গতি, এ সমস্তই চিত্ত আপনাতে নির্ম্মাণ করে ও আবার আপনাতে উপসংহার করে[৫২]। এই রহস্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল লোকেই স্বপ্ন, ভ্রম, মদ্যপান, অত্যন্তাসক্তি, বিশেষ বিশেষ রোগ, অর্থাৎ দোষাবিষ্ট রোগীর দৃষ্টি উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিলে বুঝিতে সমর্থ হয়[৫৩]। বৃক্ষে যেমন ফলপুষ্পাদি অদৃশ্য আকারে অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায়, লক্ষ লক্ষ বৃত্তান্ত বাসনাপরিপূরিত চিত্তে অননুভূতরূপে বিদ্যমান থাকে[৫৪]। বৃক্ষ মৃত্তিকা ত্যাগ করিলে তখন আর ফল পুষ্প প্রসব করে না। তাহার ন্যায় চিত্ত বাসনা বর্জ্জিত হইলে তখন আর জন্ম মরণাদি দর্শন করে না। যাহাতে অনন্ত জগজ্জাল সূক্ষ্মাকারে

রহিয়াছে, যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে, সে যে চণ্ডালত্ব প্রকাশ করিবে তাহাতে তোমার বিস্ময় কি[৫৫।৫৬]? তুমি প্রতিভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি দ্বারা রচিত সেই সেই চণ্ডাল ভাবাদি অবলোকন করিয়াছ। হে সাধো! তোমার নিকট অতিথি সমাগত হইল, ভোজন করিল, শয়ন করিল, গমন করিল, কথাবার্ত্তা কহিল; তুমি ভূতমণ্ডলে গমন করিলে, শ্বপচালয় দর্শন করিলে, জনমুখে কটঞ্জকের বিষয় বিদিত হইলে, কীর নগর দর্শন ও কীরাধিপতির বিষয় শ্রবণ করিলে, এ সমুদায়ই তোমার চিত্তের বিভ্রম মাত্র। ঐ সমস্ত তোমার চিত্তই দর্শন করিয়াছে এবং ঐ সকল তোমার চিত্তমধ্যেই অবস্থিত ছিল। (দুর্লক্ষ্য বাসনারূপে)[৫৭।৬১]। হে দ্বিজোত্তম! তুমি মোহজালই সন্দর্শন করিয়াছ। এখন তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া কি সত্য কি অসত্য তাহাও অবগত হইয়াছ। বাসনাক্রান্ত চিত্ত কি না দেখে? লোক সকল স্বপ্নে নিমেষ কাল মধ্যে শত শত বৎসর অনুভব করিয়া থাকে। হে মহাবুদ্ধিধর! সেই অতিথি, সেই ভূতমণ্ডল, সেই সকল কীরবাসী, সেই কীর নগর, সমস্তই তুমি চিত্তব্যামোহ প্রযুক্ত সন্দর্শন করিয়াছ[৬২।৬৪]। সম্প্রতিও তুমি ভূতমণ্ডলে ও কীর নগরে আইস নাই। তুমি অতিথি বাক্য শ্রবণের পর ভূতমণ্ডল দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথিমধ্যে গিরিকন্দরে যখন বিশ্রাম করিতে ছিলে তখনই তুমি শ্রম বিমুক্তে স্বপ্ন সন্দর্শনের ন্যায় এই ভূতমণ্ডল, এই চণ্ডালনগর, এইরূপ এইরূপ দেখিয়াছ। তুমি যে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ কালে জল মধ্যে আত্মমরণাদি দেখিয়াছিলে তাহাও এইরূপ জানিবে। এক্ষণে উত্থিত হও; প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; মানবগণ কদাচ স্বকর্ম্ম ব্যতীত শ্রেয়ো লাভে সমর্থ হয় না। বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান পদ্মনাভ এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন[৬৫।৭০]।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

-০()০()০-

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে গাধি ভগবদ্বচন সত্য কি না অথবা দৃষ্ট ভূতমণ্ডলাদি মায়াময় কি না পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার ভূতমণ্ডলাদি স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার জনগণের মুখে আপনার সেই সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্দেহাকুলিত চিত্ত হইলেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার গিরিগুহা প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু এবার স্বল্পকাল মধ্যেই প্রসন্ন হইলেন। তাহার কারণ এই যে, মাধব তাহার পূর্ব্বের আরাধনায় বন্ধুতুল্য হইয়াছিলেন[১।৩]। গাধিকে সম্বোধন পূর্ব্বক ঘনগম্ভীরনিঃস্বনে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আবার কি প্রার্থনা, শীঘ্র বল[৪]?

গাধি বলিলেন, হে দেব! পুনর্ব্বার আমি ছয় মাস যাবৎ ভূতমণ্ডল ও কীরনগর পরিভ্রমণ করিয়াছি; পরন্তু সেই সেই স্থানের লোক যাহা বলে সে সমস্তই আমার ঘটনা, অর্থাৎ আমি ভ্রমে যেরূপ যেরূপ দেখিয়াছি, তত্রত্য জনগণের মুখে অবিকল সেইরূপ ঘটনাই শ্রবণ করিলাম। অতএব আপনি যে বলিলেন, তুমি যে ভূতগ্রাম প্রভৃতি দেখিয়াছ, সে সমস্তই তোমার ভ্রমদৃষ্ট। তাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনার ঐ উক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? হে প্রভো! আবার অসম্ভবও মনে করিতে পারি না। কেননা, আমি বিশ্বাস করি, মহদ্ব্যক্তিগণের বাক্য অস্মদাদির মোহের নাশক বৈ বর্দ্ধক নহে[৫।৬]।

ভগবান্ বলিলেন, হে গাধে! যেমন তোমার চিত্তে বর্ণিত প্রকার চণ্ডাল লোক অবস্থিত ছিল, (বাসনা রূপে) তেমনি প্রসিদ্ধ ভূতমণ্ডলবাসী ও কীরবাসী দিগের চিত্তেও ঐ প্রকার শ্বপচ বৃত্তান্ত প্রসুপ্ত ছিল। কাকতালীয় ন্যায়ে তাহাদেরও চিত্তে তৎকালে সেই প্রসুপ্ত বৃত্তান্ত প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাই

তাহারা তোমার নিকট ঐ বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়াছে। হে অঙ্গ! প্রতিভাসের (ভ্রমের) প্রভাব এই যে, যাবৎ বাধ জ্ঞান উপস্থিত না হয় তাবৎ কিছুতেই তাহার অপলাপ হয় না। অর্থাৎ সে সকল সত্যের ন্যায় হইয়া থাকে[৭,৮]। তুমি গ্রাম প্রান্তে কোন শ্বপচের ভগ্ন গৃহ দেখিয়া অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলে অর্থাৎ এই আমার বিরচিত গৃহ রহিয়াছে মনে করিয়াছিলে[৯]। কখন কখন বহুলোকের একাকার প্রতিভাস (ভ্রান্তিরূপ প্রতিভাস) সমুপস্থিত হয়। কারণ এই যে, মনের গতি অতীব বিচিত্রা[১০]। কখন বহু মানব একই সময়ে একই প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করে। পিত্তদোষাক্রান্ত, ভ্রমাক্রান্ত ও মদদোষাক্রান্ত বহুলোকে একই সময়ে একই প্রকার দিক্ সকলকে ঘূর্ণমানা হইতে দেখে। তোমার ও ভূতমণ্ডলবাসী দিগের দর্শন তাহারই অনুরূপ[১১]। একই ক্রীড়ায় (খেল্‌নায়) বহু বালক রমমান হয়, একই শাদ্বল ভূমে বহু হরিণ বিচরণ করে[১২]। সেইরূপ, সেই একই চণ্ডাল বৃত্তান্তের ভ্রম বহু লোকের চিত্তে সমারূঢ় হইতে পারে। অতএব, তোমার চিত্তে যেরূপ শ্বপচ-প্রতিভাস সেরূপ প্রতিভাস অনেক ব্যক্তির চিত্তে উদিত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? বধ, বন্ধন, জয়, পরাজয়, পলায়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা আকারের ফল আপন আপন প্রারব্ধ পরিণাম দ্বারা লভ্য। তথাপি বহুলোক অর্থাৎ শত শত সৈনিক পুরুষেরা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া একই সময়ে একই প্রকার জয়লাভাদি ভোগ জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ লোভ প্রযুক্ত যুদ্ধাদি কার্য্য করিতে সমুদ্যত হয়[১৩]। হে বিপ্র! দেশ কাল ক্রিয়া, সমস্তই যখন মানসকল্পনা ও তখন অবশ্যই সেই সমস্ত সকলের দৃষ্টিতে সমান। * লোক সকল যে কালকে উৎপত্ত্যাদি হওয়ার কারণ বলে, সে কালও মনঃকল্পিত। অর্থাৎ মনঃই সূর্য্যাদির অবস্থা দেখিয়া বৎসরাদি কালের কল্পনা করিয়াছে। পরন্তু যাহা অকল্পিত কাল তাহা পরমাত্মস্বরূপের অনতিরিক্ত। পরমাত্মরূপী কাল তিনি আপনাতে আপনি অবস্থিত এবং তিনি কিছু করেন না[১৪]। সেই ভগবান্ অমূর্ত্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড কাল ব্রহ্মেরই রূপ। তাঁহাকে তুমি জন্মাদি রহিত বলিয়া জানিবে।

* দিক্ বিশেষ ঘটিত সূর্য্যগতি দেখিয়া মাস ঋতু অয়ন ও বৎসরাদি কল্পনা করা যায় এবং সে কল্পনা একের নহে, সকলেরই সমান, সেইরূপ।

তিনি কাহার কিছু করেন না, কাহাকে কিছু দেন না। যাহা লৌকিক (লোক কল্পিত) কাল, যাহাকে বৎসর যুগ ও কল্প প্রভৃতি পরিচ্ছেদে (নামে) ব্যবহার করা হয়, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্র পিণ্ড প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনে কল্পিত এবং তাহা ক্রিয়াত্মক কালের ব্যবস্থা কারক মাত্র[১৫।১৬]। হে দ্বিজ! প্রাসঙ্গিক কথা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি, ভূতদেশবাসী ও কিরদেশবাসী, তোমরা সকলেই সমান ভ্রমসমুত্থিত প্রতিভাস দর্শন করিয়াছ। অতএব, বিস্মিত হইও না, সংশয় দূর কর, ব্রাহ্মণোচিত আচারে অবস্থিত হইয়া আত্মবিচারপরায়ণ হও। ব্যামোহ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি যথাগত স্থানে গমন করি[১৭।১৮]। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী জগদীশ্বর বিষ্ণু ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গাধি ভগবদাজ্ঞায় সেই স্থানে থাকিলেন, পরন্তু আরও অধিক চিন্তান্বিত হইলেন[১৯]।

অনন্তর গাধি সেই পর্ব্বতে কতিপয় মাস অতীত করিয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণু আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন[২০]। ভগবান্ এবার আরও শীঘ্র তাঁহার দর্শন পথে অবতীর্ণ হইলেন। গাধি তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কায়মনোবাক্যে পূজা করিয়া কহিলেন, হে নাথ! আমি স্বীয় শ্বপচস্থিতি ও সেই বিচিত্র সংসারমায়া স্মরণ করিয়া সাতিশয় খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব হে বিভো! যাহাতে শীঘ্র আমার ঐ মহামোহ উপশম প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় উপদেশ করুন এবং আমাকে কোন বিমল কার্য্যে নিযুক্ত করুন[২১।২৩]।

ভগবান্ কহিলেন, বিপ্র! এই জগৎই মহতী মায়া। এ মায়ার নিকট অসম্ভব কিছুই নাই[২৪]। তুমি যে ভূত পুরী ও কীর পুরী প্রভৃতি দেখিয়াছ সেই সমস্তই মোহের অর্থাৎ অজ্ঞান বিশেষের প্রভাবে দেখিয়াছ। যাহা অজ্ঞান বিশেষে দৃষ্ট হয় তাহার আবার অসম্ভাব্যতা কি? লোক মাত্রেই নিদ্রাদি অজ্ঞানগ্রস্ততা কালে অত্যন্ত অসম্ভাবিত দর্শন করিয়া থাকে[২৫]। তুমি যেমন ভ্রম দর্শন করিয়াছ, এইরূপ, ভূতমণ্ডলবাসীরা ও কীরবাসীরাও ভ্রম দর্শন করিয়াছে। উভয় পক্ষীয় দর্শন ভ্রমমূলক হইলেও, মিথ্যা হইলেও, কালাদির সমানতায় সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হইয়াছে। অর্থাৎ এক সময়ে ঐরূপ হওয়ায় তোমরা সকলেই ঐ ঘটনাকে সত্য মনে করিতেছ[২৬]। যাহাই হউক, তোমার

ভ্রম যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর[২৭]।

তুমি যেরূপ দেখিয়াছ, ঠিক্ তদনুরূপ আকৃতি, গৃহ, গ্রাম, স্ত্রী, পুত্র, ও চরিত্রযুক্ত কটঞ্জক নামা শ্বপচ পূর্ব্বকালে ছিল[২৮]। সেও পুত্র-দারাদি বিহীন হইয়া দেশান্তরে যায়. ও কীরনগরে গিয়া রাজা হয়, পরে হুতাশনে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করে[২৯]। তুমি যখন জলান্তর্ব্বর্ত্তী তখন আমারই ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পে তোমার চিত্তে সেই কটঞ্জকের সমুদায় অবস্থা ভ্রমরূপে প্রতিভাত হইয়াছে[৩০]। চিত্ত কখন কখন অনুভূত পদার্থও বিস্মৃত হয় এবং কখন কখন অননুভূত পদার্থও প্রত্যক্ষ করে। যেমন স্বপ্নে, যেমন মনোরাজ্যে, এবং যেমন সান্নিপাতিক রোগ কালে নানা প্রকার অনুভূত ও অননুভূত উভয়বিধ ভ্রম দর্শন করে, তেমনি, জাগ্রৎ অবস্থাতেও লোকে বিবিধ ভ্রম দেখিয়া থাকে[৩১।৩২]। হে অঙ্গ! যেমন ত্রিকালদর্শী যোগীদিগের চিত্তে অতীত বিষয় ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল আরূঢ় হয় তাহার ন্যায় তোমার চিত্তেও প্রাচীন কটঞ্জকচরিত প্রতীতিপ্রাপ্ত হইয়াছে[৩৩]। পরন্তু তোমার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; সেই কারণে তুমি সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াও উক্ত মনোভ্রম নিবারণ করিতে পারিতেছ না। যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা আমার, সেই আমি, এই সে, এ সকল ভ্রমে মগ্ন হন না। যাহারা অনাত্মজ্ঞ তাহারাই ঐ সকল ভ্রমে মগ্ন হয়[৩৪]। তত্ত্বজ্ঞেরা "সমস্তই আমি" মনোমধ্যে এইরূপ অবধারণ থাকায় অবসন্ন হন না[৩৫]। ভ্রম জাত সুখ দুঃখে তাঁহারা নিমগ্ন হন না। তুমিও এখন পর্য্যন্তও বাসনাগ্রস্ত আছ, সেইজন্য তোমার চেতনা সম্যক্ স্ফূর্ত্তিযুক্ত নহে। এবং ব্যাধি শেষের ন্যায় এখনও তুমি অস্বস্থ আছ[৩৬.৩৮]। সেই কারণে সহসা তোমার চিত্তে যাহা ভাসমান হয় বিচার না করিয়া তুমি তাহাতেই অভিহত হইতেছ[৩৯]। মায়াচক্রের নাভি অর্থাৎ মধ্যস্থল চিত্ত। যদি তুমি তাহা আক্রমণ (অবরুদ্ধ) করিয়া থাকিতে পার তাহা হইলে আর বাধা বা পীড়া (মায়াম্বড়ের কষ্ট) পাইবে না[৪০]। অতএব, তুমি উঠ, খেদ পরিত্যাগ কর, এই গিরিকুঞ্জে থাকিয়া দশ বর্ষ তপস্যা কর, পরে যাহা অনন্ত বিজ্ঞান তাহা প্রাপ্ত হইবে[৪১]। ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ এই সকল বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন[৪২]। অনন্তর গাধি ভগবদুপদিষ্টকালে বিবেক-

জনিত পরম বৈরাগ্য পদ লাভ করিলেন। তখন তিনি অদৃষ্ট চক্রের অসমঞ্জস কার্য্যকলাপকে অর্থাৎ চণ্ডালভাবপ্রাপ্ত্যাদি বিচিত্র চেষ্টিত'কে, নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মাভ্যাসের নিমিত্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন করিলেন[৪৩।৪৫]। তথায় তিনি দশ বর্ষ কাল তপস্যা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন এবং তখন তিনি শঙ্কাভয়রহিত জীবন্মুক্তরূপ প্রশান্ত ও পূর্ণচেতা হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন[৪৬।৪৭]।

গাধি ব্রাহ্মণের উপাখ্যান সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ

—(✕(*)✕)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! মোহময়ী মায়াকে তুমি ঐরূপ বিস্তৃত ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া জানিবে[১]। কোথায় মুহূর্ত্তদ্বয় ব্যাপক ভ্রম বা স্বপ্ন, এবং কোথায় বহুবর্ষভুক্ত চণ্ডাল রাজত্বাদি[২]। কোথায় ভ্রমলব্ধ রাজতা এবং কোথায় প্রত্যক্ষ দর্শন। কোথায় অসন্দিগ্ধতা ও অসত্যতা এবং কোথায় সত্যপরিণামিতা[২।৩]। হে মহাবাহো! তাই আমি বলিতেছি, এই সংসার মায়া যৎপরোনাস্তি বিষম। এ বিষয়ে যাহারা সর্ব্বদা অসাবধান, সংসার মায়া তাহাদিগকে সঙ্কটে নিপাতিত করে[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! অতিবেগে বহমান এই মায়া চক্রকে কি প্রকারে রোধ করা যাইতে পারে[৫]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্তই ভ্রমদায়ী মায়া চক্রের নাভি, (যাহাকে হাঁড়ি বলে), পুরুষকার ও বুদ্ধিকৌশল এই উভয় দ্বারা উক্ত নাভি অবষ্টব্ধ হইলে তখন আর মায়া চক্রের বহমানতা থাকে না। নাভির ঘূর্ণন স্থগিত হইলেই চক্রের ঘূর্ণন স্থগিত হইয়া থাকে[৬।৯]। হে রাঘব! তুমি চক্রযুদ্ধে বিশারদ। নাভি অবরুদ্ধ হইলে, চক্র পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহা কি তুমি জান না? তুমি জান বলিয়াই বলিতেছি, তুমি যত্নসহকারে মায়াচক্রের চিত্তরূপ নাভি অবরুদ্ধ করিয়া আত্মাকে সংসারচক্রভ্রমণ হইতে পরিত্রাণ কর[১০]। এ উপায় ব্যতীত আত্মার অনন্ত দুঃখ নিবারণের অন্য উপায় নাই। চিত্ত নিগ্রহই পরম ঔষধ; তদ্ব্যতীত সংসার মহারোগের উপশম হয় না[১১।১২]। হে রামচন্দ্র! তাই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি তীর্থাটন, দান, তপস্যা ও অন্যান্য ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ো লাভের উদ্দেশে চিত্তকেই বশীভূত কর[১৩]। যেমন কুম্ভমধ্যে কুম্ভাকাশ তাহার ন্যায় চিত্তমধ্যেই সংসার। যেমন কুম্ভনাশে কুম্ভাকাশের বিনাশ, তেমনি চিত্ত নাশে সংসার বিনাশ সিদ্ধ হয়[১৪]। যেমন কুম্ভমধ্যে নিরুদ্ধ মশকাদি তন্মাত্র আকাশে বদ্ধ থাকিয়া দুঃখে সঞ্চরণ করে, পরে দৈবাৎ কুম্ভ ভগ্নে তাহারা অসীম আকাশ প্রাপ্তে সুখসঞ্চারী হয়, তদ্বৎ তুমিও চিত্তকুম্ভ

ভগ্ন করিয়া আপনার তুলনা রহিত স্বরূপাকাশ প্রাপ্ত হও[১৫]। চিত্তকুম্ভ নাশের উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার পরে যাহা হইবে তাহার অনুসন্ধান করিও না। কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত বাহ্য বুদ্ধিতে বর্ত্তমান বিষয়েরই (উপস্থিত বিষয়েরই) চিন্তা করিবে। ঐরূপ করিতে করিতে তোমার চিত্ত ক্রমেই অচিত্ত হইবে। অর্থাৎ কল্পনা বিহীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে[১৬]। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে যাবৎ কল্পনা তাবৎ চিত্তসংরম্ভ ও যাবৎ চিত্ত তাবৎ কল্পনা। যদি তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে চিত্তের সঙ্কল্প অংশ বর্জ্জন করিতে পার তাহা হইলে তুমি জানিবে যে অচিত্ত হইয়াছ। যখন চিত্তবিহীন হওয়ায় সংসার থাকিবে না, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই চেতন পরমাত্ম চেতন নামে অভিহিত হইবে। সেই পরমাত্ম চেতন বস্তুতঃ নির্ম্মল স্বভাব; সুতরাং কল্পনামল বর্জ্জিত। অপিচ, তাহা সত্য, তাহাই শিব, তাহাই পারমার্থিকী অবস্থা ও তাহারই নাম বিমল জ্ঞানদৃষ্টি[১৭।২২]। হে রামভদ্র! যত্র মন তত্র আশা, যত্র আশা তত্র সুখ দুঃখ। যদি এমন ভাব যে, তত্ত্বজ্ঞদিগের মন থাকে, তাহা হইলে সেজন্য বলা আবশ্যক হইতেছে যে, তাঁহাদের মন থাকে সত্য; থাকিলেও তাঁহাদের আশা প্রভৃতি না থাকায় সংসার লতায় তাঁহাদের বাসনাময় বীজ জন্মে না, তত্ত্বজ্ঞানে দগ্ধকল্প হইয়া যায়[২৩।২৪]। হে রঘুপতে! শাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও অভ্যাস দ্বারা জগদ্ভাবের অবস্তুতা বোধগম্য করা যায়। অতএব, শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া দৃঢ় উদ্যম সহকারে চিত্তকে বল পূর্ব্বক শাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে যোজিত করিবেক[২৫।২৬]। পরমাত্মসাক্ষাৎকারের প্রতি আপন আত্মাই মুখ্য কারণ। অর্থাৎ আপনার অন্তঃস্থ স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতিই দৃশ্য দেখার হেতু বলিয়া বলা যায়—আত্মাই আত্মাবলোকনের হেতু। যেমন অগাধজলপতিত রত্ন নিজ জ্যোতিতে প্রস্ফুরিত হয় বলিয়া রত্নান্বেষণকারীরা তাহাকে প্রাপ্ত হয় ও বলে রত্নই রত্ন প্রাপ্তির মুখ্য উপায়; তেমনি আমরাও বলি, আপন আত্মাই আত্মপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। অপিচ, আত্মাই স্বানুভূত শোক দুঃখাদি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই নিমিত্ত আত্মবিদ্‌গণ আত্মাকেই আত্মবিবেকের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২৭।২৮]।

হে অনঘ! তুমি অবিবেক হইতে চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক আহরণ কর,

বলপূর্ব্বক সৎশাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে নিয়োজিত কর। আদান, প্রদান, গমন, নিমেষণ, উন্মেষণ, সকল অবস্থাতেই তুমি মনন রহিত ও সম্বিদ্‌মাত্র (সম্বিদ্‌মাত্র অর্থাৎ নিশ্চিন্ত চেতনমাত্র) হও[২৯]। আমি, আমার, প্রভৃতি ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একনিষ্ঠ ও সম্বিন্মাত্রপরায়ণ হও[৩০।৩১]। বর্ত্তমান অবস্থায় ও ভবিষ্যতে যে অবস্থা আসিবে তাহাতেও একাবলম্বী হইবে এবং স্বসম্বিৎ অনুসন্ধানার্থ সমাধি তৎপর হইবে[৩২]। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, সুখ, দুঃখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সকল সময়ে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকা উচিত[৩৩]। মলিন বেদ্য অর্থাৎ বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে নির্ম্মল করতঃ আশাপাশ ছেদন করিয়া চিন্মাত্রপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য[৩৪]। শুভাশুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশাবিষূচিকা রহিত ও ইষ্টানিষ্ট দৃষ্টিবিবর্জ্জিত হইয়া চিন্মাত্রপরায়ণ হওয়া আবশ্যক[৩৫]। যেমন কোন মণি নিকটস্থ বস্তু স্পর্শ করে না অথচ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে তাহার ন্যায় তুমিও অহঙ্কার প্রভৃতিকে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ও বহিঃস্থ বিষয় প্রভৃতিকে স্পর্শ না করিয়া কেবল মাত্র প্রতিবিম্ব গ্রাহীর ন্যায় থাকিয়া আত্মসম্বিৎ অনুসন্ধানে সমাহিত থাকিবে ও নির্ব্বিকল্প নিরালম্ব হইবার ইচ্ছা করিবে[৩৬]। জাগ্রৎ কালেও তুমি সুষুপ্তের ন্যায় থাকিবে। অর্থাৎ বিষয় সম্বেদনে নিরস্ত থাকিবে। অপিচ, আমিই সব, এই ভাবে মগ্ন থাকিয়া একাত্মবপুঃ হইবে[৩৭]। (একাত্মবপুঃ অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানী) তোমাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অথবা সৃষ্টি স্থিতি লয় কোনও অবস্থা নাই এক মাত্র তুমিই অসংখ্য দৃশ্য দর্শনের দীপ। সেই কারণে বলিতেছি, তুমি কেবল ও চিন্মাত্রপরায়ণ হও[৩৮]। তুমি আত্মতা পরতা প্রভৃতি দ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র আত্মাবলম্বী হও[৩৯]। ধৈর্য্যধর্ম্মিণী উদার বুদ্ধির দ্বারা আশারূপ মানস রজ্জু ছিন্ন করতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের পরপারে গমন কর[৪০]। যাহারা তত্ত্বের আস্বাদ পাইয়াছে তাহাদের নিকট হলাহলও অমৃত[৪১]। সংসার ভ্রমের কারণ মহামোহ সেই পর্য্যন্ত উদিত থাকে যে পর্য্যন্ত মনোবর্জ্জিত ও বিভাগরহিত আত্মসম্বিৎ বোধের বহির্ভূত থাকে[৪২] অর্থাৎ অদ্বৈত জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। আশাপাশরূপ মহার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ স্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বিদ্, সূর্য্যাংশুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়[৪৩।৪৪]।

রাম! যে সকল পুরুষ স্বতত্ত্বদর্শী, অদ্বয় আনন্দে স্থিতি প্রাপ্ত, সেই

সকল পুরুষ অতিসুস্বাদু রসায়নকেও বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (পাছে আত্মানন্দ ভোগের বিচ্ছেদ হয় সেই ভয়ে)[৪৫]। যে সকল পুরুষ প্রত্যগাত্মতত্ত্ব বিদিত সেই সকল পুরুষই ভজনীয়, অন্য সকল নাম মাত্রে পুরুষ, কিন্তু ফলে গর্দ্দভ[৪৬]। যেমন সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত প্রত্যন্ত পর্ব্বত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার ন্যায় যোগী বল, ঋষি বল, ও উপাসক বল, তত্ত্ববিৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইয়ত্তা বা সীমা নাই, এমন সম্বিৎ যাহার চক্ষুঃ; সূর্য্যাদির তেজঃ বা আলোক তাহার কি উপকার করিবে[৪৭।৪৮]? দীপ যেমন মধ্যন্দিনবর্ত্তি (মধ্যন্দিন=দিবসের মধ্য ভাগ) সূর্য্যের নিকট তুচ্ছ ও পরাভূত হয় তাহার ন্যায় সূর্য্যাদি তেজঃও তত্ত্বজ্ঞানের নিকট তুচ্ছ ও পরাভূত হইয়া থাকে[৪৯]। তেজে, বলে, প্রভাবে, ঐশ্বর্য্যে, মহত্ত্বায়, যিনি যতই উচ্চ হউন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত[৫০]। যেমন ঈশ্বরীয় প্রকাশে সূর্য্যাদি পদার্থের প্রকাশ সম্পন্ন হয়, তেমনি, রাশি রাশি জ্ঞেয় পদার্থ তত্ত্বজ্ঞের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। সেই কারণে নরশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞগণ ইহ জগতে ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বাবভাসক (সর্ব্বজ্ঞ) হইয়া বিরাজ করেন[৫১]। হে রামচন্দ্র! ধরাবিবরজাত কীট, ধরাপৃষ্ঠ জাত গর্দ্দভাদি ও তির্য্যক্ জাতি মূঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু অতত্ত্বজ্ঞগণ তাহাদের অপেক্ষা অধিক মূঢ়[৫২]। দেহিগণ যাবৎ অনাত্মজ্ঞ থাকে, তাবৎ তাহাদের সম্মুখে মোহবেতাল নৃত্য করিতে থাকে। যাহারা আত্মজ্ঞ তাহারাই সচেতন, আর সকলে অচেতন, ইহা তত্ত্ববিৎ দিগের উক্তি[৫৩]। তত্ত্বজ্ঞগণ যে আত্মজ্ঞদিগকেই সচেতন ও অন্যকে অচেতন বলেন তৎপ্রতি হেতু এই যে, অনাত্মজ্ঞগণের চেষ্টা দুঃখজনক। এবং আত্মজ্ঞগণের চেষ্টা দুঃখনাশক। সুতরাং অনাত্মজ্ঞগণ প্রস্ফুরণ (অঙ্গসঞ্চালন) করিলেও তাহারা শব তুল্য বা অচেতন[৫৪]।

অহে রামচন্দ্র! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, চিত্ত পীবরতা প্রাপ্ত হইলেই আত্মজ্ঞতা দূরে পলায়ন করে। তখন জগল্লক্ষ্মী মহামেঘের ন্যায় চিত্তাকাশে সমুদিত হইয়া সম্বিদ্রূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে[৫৫]। সেই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও বলিতেছি, বিষয় ভোগ তিরস্কার করিয়া চিত্তকে সর্ব্বথা কৃশ করাই শ্রেয়ঃ পথ। দেহকে আত্মভাবে ভাবিত করিলে ও পুত্র দারা প্রভৃতি কুটুম্বগণে স্নেহাসক্ত হইলে চিত্তের পীবরতা প্রকট প্রাপ্ত হয়[৫৬,৫৭]। অহঙ্কার, মত্ততা, পরমাত্মহেলন ও দ্বৈত

বিকার, এই সকলের দ্বারা চিত্ত পীবরতা প্রাপ্ত হয়[৫৮]। এই আমি, ইহা আমার, এ ভাবনাও চিত্ত পীবরতার কারণ। জরামরণাদি দুঃখের ক্রোড় গত থাকিয়া ও দোষসর্পের বিবরগত থাকিয়া, মিথ্যার উন্নতি কল্পে অবস্থান করিলে চিত্তপীবরতা দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে[৫৯]। সংসারের প্রতি আস্থা, আধিব্যাধির আনুকূল্য, ত্যাজ্যাত্যাজ্য প্রযত্ন, এই সমুদয়ের দ্বারাও চিত্ত পীবর হয়। স্নেহ, ধনলাভ, রত্নাদির ও স্ত্রী প্রভৃতির লাভ, এই সকল আপাত রম্য বিষয়ের দ্বারাও চিত্তের পীবরতা বৃদ্ধি পায়[৬০,৬১]। দুরাশা রূপ ক্ষীরপান, বিষয়বনে সঞ্চরণ ও ভোগগর্ত্তে অবস্থান, এ সকল দ্বারা চিত্তসর্প পীনতা প্রাপ্ত হয়[৬২]। উৎপত্তি-বিনাশ-স্বভাব ও মূর্চ্ছাদি বিষমপথবর্ত্তী ভোগাভোগ দ্বারাও চিত্ত পীনতা প্রাপ্ত হয়[৬৩]। অতএব হে বীর! তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া শীঘ্র শরীর-রূপ ভীষণ গর্ত্তে অবস্থিত চিন্তাপ্রভৃতিমঞ্জরীযুক্ত জরা মৃত্যু ব্যাধিপ্রভৃতি ফলের ভারে অবনত, কামোপভোগপ্রভৃতি বিকশিত কুসুমে সুশোভিত, আশারূপ প্রকাণ্ডকাণ্ডসম্পন্ন বিকল্পপত্রবহুল অদ্ভুত অদ্রিতুল্য চিত্তরূপ বিষবৃক্ষকে তত্ত্ববিচার দ্বারা ছেদন কর[৬৪,৬৫]। হে রামচন্দ্র! চিত্ত এক প্রকার মত্ত হস্তী। সে শাস্ত্র ও অনুমান এই দুই চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে সত্য; পরন্তু তাহার ঐ দুই চক্ষু সর্ব্বদা মদঘূর্ণিত থাকে, সেজন্য সে তদ্দ্বারা প্রায়ই বিবিক্ত দর্শনে অপারক। সে বহিঃস্থ সংসার অদ্রির তটে উপবেশন করিতে সর্ব্বদা ভাল বাসে। সুতরাং অন্তঃস্থ বিশ্রাম সুখ অনুভবে অসমর্থ। দ্বেষ, হিংসা, অসূয়াদি থাকায় সে অতীব উগ্র এবং সজ্জনানুষ্ঠেয় শম দম তিতিক্ষাদিরূপ পদ্মবন বিষয়ে অতীব প্রচণ্ড (অর্থাৎ ঐ পদ্মবন মর্দ্দন করিতে পটু, রক্ষা করিতে পটু নহে)। সুখ ও দুঃখ এই দুইটী তাহার দুই গণ্ড। ঐ দুই গণ্ড হইতে অনুক্ষণ শীতোষ্ণ বাষ্প মদ স্রবিত হয়। হে রাজেন্দ্র রাম! তুমি দেহ-রূপ কাননে অবস্থানকারী এতাদৃশ চিত্ত হস্তীকে শীঘ্র প্রভারূপ তীক্ষ্ণ করপত্র দ্বারা (করপত্র করাত) বিদীর্ণ কর[৬৬,৬৭]। চিত্তকে কাক রূপকেও বর্ণনা করা যায়। তাহার সৌসাদৃশ্য বলি, শ্রবণ কর। কাক কুৎসিত প্রদেশে ব্যাসক্ত, চিত্তও কুৎসিত স্ত্রীচিহ্ন প্রভৃতিতে আসক্ত। কাক মাংস ভক্ষণে পুষ্ট হয়, চিত্তও শরীররূপ মাংসখণ্ডকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া পরিতুষ্ট ও পুষ্ট হয়। কাক চঞ্চুর দ্বারা কর্কশ কার্য্য

করে, চিত্তও কু বৃত্তির দ্বারা পরমর্ম্মচ্ছেদনাদি দুষ্ক্রিয়া করে। কাকের দৃষ্টি স্বার্থের দিকে, চিত্তের দৃষ্টিও স্বার্থের অর্থাৎ লোভ্য পদার্থের দিকে। কাক মলিন, চিত্তও তামস বৃত্তিতে মলিন। কাক বৃক্ষ দিগের বৃথা বহনীয়, চিত্তও আত্মার বৃথা বহনীয়। কাক কর্কশ শব্দ করে, চিত্তও কঠোর শব্দ জিহ্বাদির দ্বারা বহিঃ প্রকটিত করে। কাক ভক্ষ্যের ঘ্রাণ পাইলেই উদ্যত ও উত্থিত হয়, চিত্তও দুর্ব্বাসনারূপ গন্ধে উদ্যত ও উত্থিত হয়। কাক কুলায়ে বাস করে, চিত্তও দেহ বিবরে বাস করে। এতাদৃশ চিত্তরূপ কাক যাহাতে তোমার দেহ কুলায় হইতে উৎসারিত হয় তুমি অচিরাৎ তাহা কর[৬৮।৬৯]। যাহাকে কাক রূপকে বর্ণনা করিলাম, তাহাকে পিশাচ রূপকেও বর্ণনা করা যায়। যাবৎ না তুমি বিবেক, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ ও প্রণবরূপ মন্ত্রদ্বারা সেই চিত্তপিশাচকে উৎসাদিত করিতে পারিবে, তাবৎ তোমার আত্মসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। হে রাজসিংহ! চিত্তকে সর্পরূপকেও বর্ণনা করা যায়। শুভ ও অশুভ, এই দুইটী উহার দন্ত, চিন্তা উহার বিষ, মানবগণ উহার দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত, এই শরীর উহার কঞ্চুক অর্থাৎ নির্ম্মোক (খোলোস্), প্রাণবায়ু উহার ভক্ষ্য, হৃদয়রূপ শিমূল বৃক্ষের কোটর উহার বাসস্থান। হে রামচন্দ্র! তুমি বর্ণিত প্রকার চিত্তরূপ মহাসর্পকে অমোঘ চিদ্‌গরুড় মন্ত্রের দ্বারা উৎসাদিত করিয়া নির্ভয় হও। * চিত্ত সর্পের ন্যায় গৃধ্র রূপেও বর্ণিত হয়। যদি তুমি পৌরুষ দ্বারা দেহবৃক্ষ হইতে অমঙ্গলরূপী অধীর চিত্তগৃধ্রকে উৎসারিত করিতে পার, তাহা হইলে তুমি উৎকৃষ্ট জয় লাভে সমর্থ হইবে[৭০।৭৫]। হে রঘুকুলপাবন রাম! চিত্তকে মর্কট বলিলেও বলা যায়। কেননা, চিত্তও বানরের ন্যায় চঞ্চল স্বভাব, চঞ্চলাঙ্গ, ফলাকাঙ্ক্ষায় বনে বনে ও দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ করে, এক জন্মস্থান হইতে অন্য জন্মরূপ স্থানে যায়, বন্ধন প্রাপ্ত হয়, জনসমূহের হাস্যাস্পদ হয়, দেহরূপ বৃক্ষে ক্রীড়া করে। হে অনঘ! যদি তুমি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর তবে ঐ চিত্তরূপ মর্কটকে অচিরাৎ বিনাশ কর। যে চিত্তকে নানা রূপকে বর্ণনা করিলাম,

---

* চিদ্‌গরুড়=চৈতন্য চিন্ময় ব্রহ্মরূপ গরুড় পক্ষী। তদ্বোধক মন্ত্র=ওঁ সত্যং জ্ঞান অনন্তং ব্রহ্ম।

সেই চিত্ত আবার মেঘেরও অনুরূপ। অর্থাৎ মেঘের সহিতও তাহার তুলনা হইতে পারে। মেঘ বাহ্যাকাশে অকালে উদিত হইয়া পক্ক শস্যের বিনাশ করে, চিত্তও অন্তরাকাশে পীবরতা প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থ সুখ বিনষ্ট করে। মেঘ বিদ্যুৎ প্রকাশে প্রকাশিত হয়, চিত্তও বহির্ম্মুখী বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের প্রকাশে প্রকাশিত হয়। মেঘ জল বর্ষণ করে, চিত্তও অনর্থ ধারা বর্ষণ করে। মেঘ বাত্যায় আন্দোলিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, চিত্তও বাসনাবায়ুর দ্বারা আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত হয়। তুমি এতাদৃশ চিত্ত মেঘকে সঙ্কল্পবর্জ্জনরূপ উগ্র মন্ত্রের দ্বারা অন্তরাকাশ হইতে দূরীভূত কর, তাহা হইলে তুমি পূর্ব্বসিদ্ধ মুক্তাত্মস্বভাবে স্থিতি লাভ করিবে[৭৬।৭৯]। চিত্তই জীবের মহাপাশ অর্থাৎ বন্ধন রজ্জু। ঐ রজ্জু আত্মসৃষ্ট, নানা সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের দ্বারা কৃতগ্রন্থি, অস্ত্রের অচ্ছেদ্য, অগ্নির অদাহ্য ও পরমাত্মার পীড়া দায়ক[৮০]। ঐ রজ্জুতে অসংখ্য শরীর মালাবৎ গ্রথিত রহিয়াছে, তুমি ঐ রজ্জুকে সঙ্কল্পত্যাগরূপ অস্ত্রে ছিন্ন কর, করিয়া পুনর্জ্জন্মশঙ্কাশূন্য হইয়া সুখে বিহরণ কর[৮১]। সঙ্কল্প এক ঘোর বিষধর, ইহার ফুৎকারে (সবিষ নিশ্বাসে) দেবযান পিতৃযান পথের পথিকেরা দগ্ধ ও চতুর্দ্দশ মহাভুবন সমস্তই সন্তপ্ত। এই বিষধর বিষয় ভোগের লোভে তৃষ্ণারূপ মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জীব কম্পিত[৮২]। তুমি ঐ অজগরকে কামনাবর্জ্জন অর্থাৎ পরবৈরাগ্যরূপ মহা অনলে দগ্ধ কর, করিয়া পূর্ণানন্দ হও। অস্ত্র যোদ্ধারা যেমন অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্র বিনাশ করে তাহার ন্যায় তুমিও চিত্তের দ্বারা চিত্তের বিনাশ করিবে। চিত্তের শোধন হইলেই চিত্তের দ্বারা চিত্ত বিনাশ সিদ্ধ হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের সংযম, সঙ্কল্পের অনুদয়ে চিত্তে সংশোধন, তৎপরে সমাধি, এবংক্রমে চিত্তের বিনাশ করিতে হয়। তুমি অভিহিত প্রকারে চিত্তকে বিশুদ্ধ ও নিস্তরঙ্গ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত পদার্থকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ এই ঘোর সংসারের পর পারে গমন কর এবং প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত সুখে বিহরণ কর[৮৩]।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

—◌()*()◌—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! তুমি ক্ষুরধার তুল্য তীক্ষ্ণ চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করিও না[১]। হে নীতিকোবিদ্ (পণ্ডিত)! অনেক কষ্টের পর ও অতি দীর্ঘ কালে এই শরীররূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধিলতা জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি উহাকে বিবেক বারির পরিসেকে বর্দ্ধিত কর। কাল যাবৎ না তোমার ঐ দেহলতিকাকে ম্লান ও ভূমিনিপাতিত করে তাবৎ তুমি ইহাকে উদ্ধার বা পরিপালন কর[২।৩]। হে তত্ত্বজ্ঞ! ময়ূর যেমন মেঘগর্জ্জন ভাবনাদ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, তুমিও মদীয়বাক্যার্থ ভাবনাদ্বারা পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে[৪]। এক্ষণে উদ্দালক মুনির ন্যায় ভূতপঞ্চককে বিশীর্ণ করিয়া ধীরতমা বুদ্ধির অবলম্বনে বিচার পরায়ণ হও[৫]। *

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ভগবন্! মহামুনি উদ্দালক কিরূপে ভূতপঞ্চক বিশীর্ণ করিয়া অন্তরে তত্ত্ববিচার করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! মহাত্মা উদ্দালক যে প্রকারে পঞ্চভূতবিচার দ্বারা পরমা দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর[৬।৭]।

এই অতি পুরাতন জগদ্গৃহের কোন এক কোণে ভূধরব্যাপ্ত কুসুমপরিশোভিত কর্পূরবৃক্ষসঙ্কুল গন্ধমাদন নামে এক শৈলেন্দ্র আছে[৮।৯]। সেই রত্নসঙ্কুল বিবিধবল্লীবিলাসী শৈলেন্দ্রের সানুতে এক বৃহত্তম ছায়াপ্রদ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে উদ্দালক নামে কোন এক মহামতি মুনি যৌবনের প্রারম্ভাবধি বাস করিতেন[১০।১৩]। তিনি প্রথমাবধিই অল্প প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বিচারপরায়ণ ও শুভাশয় ছিলেন, পরন্তু তৎকালে পরম পদ বিদিত ছিলেন না। পরে ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও শাস্ত্রার্থবিচার দ্বারা অল্পে অল্পে বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৪।১৫]।

---

* দেহের ও বাহ্য প্রপঞ্চের উৎপাদক পঞ্চ মহাভূত। বিশীর্ণ করা অর্থাৎ ঐ সকল মূল কারণ অবিদ্যার অনতিরিক্ত, ঐরূপ স্থির করা। তাহার ফল বা উদ্দেশ্য —অবিদ্যার বিষয় ও আশ্রয় পর ব্রহ্মের দর্শন। অর্থাৎ মায়ার আবরণ ভঙ্গ করিয়া ব্রহ্ম দর্শন করা।

একদা তিনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া নিভৃত প্রদেশে ব্যাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সেই প্রধান প্রাপ্য কবে পাইব, যাহা পাইলে শোকের বিরাম ও আত্মার বিশ্রাম লাভ হয়। অপিচ, পুনঃ পুনঃ এরূপ জন্মমরণ ভোগ করিতে না হয়[১৬।১৭]। কবে আমি সুমেরু শৃঙ্গে মেঘের ন্যায় পরম পাবন পদে বিশ্রাম লাভ করিব[১৮]? আর কবেই বা আমার অন্তরস্থ ভোগসম্বিদ উপশম প্রাপ্ত হইবে[১৯]? কবেই বা আমার চিত্তে পদ্মপত্রনিপতিত বারির ন্যায় ভোগকল্পনা সকল অলিপ্ত বা চিত্ত হইতে বিগলিত হইবে? কবেই বা আমি বিশ্রান্ত পদ বিদিত হইয়া "ইহা করিলাম, তাহা করিব" ইত্যাদি প্রকারে উদিত কল্পনা-জালের প্রতি উপহাস্য করিতে পারক হইব[২০।২১]? কবেই বা আমি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিরূপা নৌকার দ্বারা বহু কল্লোলসঙ্কুল তৃষ্ণাতরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইব? বৃদ্ধেরা যেমন বালকগণের খেলা দেখিয়া কৌতুক ও হাস্য করে, সেইরূপ, কবে আমি জগজ্জীবগণের সাংসারিকী গতি ও কার্য্য দেখিয়া কৌতুক ও হাস্য করিব[২২]? মন যে দোলা যন্ত্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত দুলি-তেছে, সে দোলন কত দিনে উপশম প্রাপ্ত হইবে? উন্মাদ-বায়ু-রোগীর চিত্ত সতত বিভ্রান্ত থাকে, পরন্তু বায়ুর উপশমে তাহা আবার প্রকৃতিস্থ হয়। আমি আর কত দিনে সেইরূপ প্রকৃতিস্থতা প্রাপ্ত হইব[২৩।২৪]? কবেই বা আমার পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশতা প্রকটিত হইবে এবং কবেই বা এই সকল বিভ্রমময় জগদ্গতি দেখিয়া উপহাস্য করিতে শিখিব? এবং কবেই আমার অন্তর অবিকৃত সন্তোষে পরিপূরিত হইবে[২৫]? কবে আমার অন্তর একরস ও একাকার ধারণ করিবে এবং কবেই বা সকল বিষয়ে স্পৃহা শূন্য হইয়া উপশম প্রাপ্ত হইবে? কত দিনে আমার চিত্ত সৌম্য ও মন্থনবিমুক্ত ক্ষীরার্ণবের ন্যায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে[২৬]? কবে আমি এই আশাশতাত্মিকা অনন্তদৃশ্যশ্রীকে স্বপ্নতুল্য দর্শন করিয়া বিততাত্মা হইব[২৭]? কবে আমি কি অন্তঃস্থ কি বহিঃস্থ সমুদায় পদার্থ চিন্ময়, এই ভাবে দর্শন করিয়া কল্পনাহীন হইব[২৮]? যেমন কোন জন্মান্ধ দৈবাৎ চক্ষুষ্মান্ হইয়া আলোক দেখিয়া সুখী হয় তাহার ন্যায় কবে আমি শান্তচিত্ত ও কেবল চিৎ হইয়া পরম আলোক লাভ করিব? কত দিনে আমি অভ্যাস ও যত্নলভ্য চিৎপ্রকাশ লাভ করিয়া দূর হইতে আমার অবশিষ্ট অপকৃষ্ট বুদ্ধিকে তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইব[২৯।৩০]?

কবে আমি হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত স্বপ্রকাশপদে স্থিতি লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইব[৩১]? কেবল কু-আশারূপ পেচক সঞ্চরণ করে, হৃদ্‌পদ্ম পরিম্লান হয়, এরূপ অন্ধকারময়ী দোষযামিনী যে কবে প্রভাতা হইবে তাহা জানিতেছি না। কবে যে আমি ধরণীধরকন্দরে শিলাতুল্য নিরস্তমনন হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইব? তাহাও বুঝিতেছি না। কবে যে আমার অভিমানমদাকুল অহঙ্কার মাতঙ্গ বোধরূপ সিংহ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে তাহা বিদিত হইতেছি না? কবে যে ব্রহ্মধ্যানৈক-পরায়ণ (ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ) ও মূকবৎ অবস্থিত (মূক=বোবা। সমাধির দ্বারা তত্তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত) হইব? এবং কবে যে মায়ার মস্তকে বৈরাগ্যাদিরূপ বিহগগণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুলায় নির্ম্মাণ করিবে? তাহাও আমার স্থির নিশ্চয় হইতেছে না। কবে যে আমি তৃষ্ণারূপ লক্ষ গুল্মে সঙ্কুলা জন্মমরণাদিরূপ কণ্টকে আকীর্ণা সংসার তরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিভবনে গমন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না[৩২।৩৭]?

দ্বিজবর উদ্দালক সেই বনে উক্ত প্রকার চিন্তার বশীভূত হইয়া অবশেষে উপবেশন করতঃ ধ্যানাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[৩৮]। কিন্তু তাঁহার মর্কট-তুল্য চঞ্চল-স্বভাব চিত্ত নানা বিষয়ে নীয়মান হওয়াতে তিনি প্রীতিদায়িনী সমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলেন না[৩৯]। কদাচিৎ অর্থাৎ এক এক বার তাঁহার বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ ও সত্ত্ব-গুণপ্রধান সমাধি হইবার উপক্রম হইতে লাগিল বটে; পরন্তু তন্মুহূর্ত্তে আবার রজোগুণের প্রেরণায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। অর্থাৎ ভয়, অরতি ও আলস্য প্রভৃতি উদ্বেগ আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল[৪০]। দুই এক বার এমন হইতে লাগিল যে, যন্মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্তমর্কট সমাধিগত হইল, তন্মুহূর্ত্তে সমাধি সুখের আস্বাদে স্ফীত হইয়া পুনর্ব্বার বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইতে লাগিল[৪১]। হে রাজীবলোচন রাম! উদ্দালকের মন এক এক বার আপন অন্তরে বালার্কসন্নিভ তেজঃ সন্দর্শন করে,* আবার বিষয়োন্মুখতা প্রাপ্ত হয়[৪২]। কখন কখন এরূপ

---

* শ্রুতি বলিয়াছেন, যোগীরা যোগ কালে নীহার, ধূম, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, চন্দ্র, এই সকলের অনুরূপ কোন কোন বস্তু দেখিতে পান। সে সকল দর্শন ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি বিশেষ, পদার্থান্তর নহে। ঐ সকল যোগ সিদ্ধির

হইতে লাগিল যে, ব্রহ্ম তাঁহার ধ্যানে এক এক বার অল্প অভিব্যক্ত হইতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তঃস্থ অজ্ঞানান্ধকার যেন অল্প পরিমাণে দূরীভূত সুতরাং অল্প পরিমাণে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিষয়লম্পট চিত্ত সে অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর গমনে উড্ডয়ন করিতে লাগিল[৪৩]। কখন এরূপ হইতে লাগিল যে, তাঁহার চিত্ত বাহ্যজ্ঞান ও আন্তরজ্ঞান উভয় পরিত্যাগী হইয়া অন্ধকারের ও আলোকের অর্থাৎ অজ্ঞানের ও আত্মজ্যোতির অন্তরালে (উভয়ের সন্ধিস্থলে) গিয়া নিদ্রিতপ্রায় বা বিলীনপ্রায় হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিতে লাগিল[৪৪]। হে রাঘব! যেমন কোন নদীতীরস্থ বৃক্ষ বাত্যা বেগে নদীজলে নিপতিত হইয়া জলের বেগে এক এক বার জলমগ্ন, এক এক বার জলোপরি ভাসমান, এক এক বার কম্পিতকলেবর হইতে থাকে, সেইরূপ, ধ্যানপ্রবৃত্ত উদ্দালক মুনিও উক্ত গিরিগুহামধ্যে উক্তরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়া উক্তরূপ সঙ্কট দশা অনুভব করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ তাঁহার মনঃ কোনও ক্রমে ধ্যানে স্থিতি বা বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিল না[৪৫।৪৬]। অনন্তর তিনি দিবসপতি সূর্য্যদেব যেমন মহামেরুতে বিচরণ করেন, তাহার ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে উক্ত শৈলের সানুদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা গন্ধমাদনশৈলেন্দ্রে মোক্ষদশাতুল্য দুর্লভ, প্রাণিসঞ্চারশূন্য, বাতদ্বারা অপর্য্যাকুলিত, দেবগন্ধর্ব্বগণেরও অদৃষ্টপূর্ব্ব, রত্নরূপ দীপসমূহে উদ্ভাসিত, স্নিগ্ধছায়, বনদেবীগণের অন্তঃপুরস্বরূপ, ব্রহ্মার বিশ্রামোপযুক্ত, পদ্মকোটরের ন্যায় সুকোমল ও উপশমপদবীর ন্যায় আহ্লাদপ্রদ একটী পরম রমণীয় কন্দর দেখিতে পাইলেন[৪৭।৪৮]।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পূর্ব্বরূপ। যথা—

"নীহারধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তীকরাণি যোগে॥"

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন কোন ভ্রমণকারী শ্রান্ত ভ্রমর পদ্মরূপ কুটির লাভে পরিতুষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে তাহার ন্যায় মহামুনি উদ্দালক বর্ণিত প্রকার গন্ধমাদন শৈলের কন্দর প্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টিধ্যানপরায়ণ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বিরাজ করিয়াছিলেন, সমাধিসাধনে সমুৎসুক উদ্দালক এই কন্দর প্রাপ্তে তন্মধ্যে সেই প্রকারে বিরাজিত হইলেন ১।২। অনন্তর তিনি সমাধি উন্মুখ হইয়া বৃক্ষপত্র সমূহ বিস্তার করতঃ তদুপরি সুন্দর মৃগচর্ম্ম প্রসারিত করিয়া আসন প্রস্তুত করিলে ঐ আসন সুমেরুপর্ব্বতের নীলরত্নবিরাজিত তটে তারানিকরশোভিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিল৩।৪। তখন তিনি সেই আসনোপরি কপিলদেবের ন্যায় বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং চিত্তকে বৃত্তিসমূহ হইতে আহরণ করতঃ নির্ব্বিকল্পসমাধির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন৫।৭। *

অরে মূর্খ মন! তোমার এই দুঃখদায়িনী সংসারবৃত্তিতে প্রয়োজন কি? যাঁহারা ধীমান্ কদাচ তাঁহারা দুঃখপ্রদ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন না। যে ব্যক্তি শমরূপ রসায়ন পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করে বা ভোগবাসনার অনুগামী হয়, সে সুরম্য কল্পবৃক্ষের কানন পরিত্যাগ করিয়া বিষজঙ্গলে গমন করিয়া বিনষ্ট হয়৮।৯। তুমি পাতালেই যাও, আর ব্রহ্মলোকেই যাও, ভোগোপশমরূপ অমৃত ব্যতীত দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে না১০। তুমি চিরকাল শত শত ও

---

* নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইতে গেলে কোন প্রকার রূপ চিন্তা না করিয়া প্রথমে বেদান্ত ও বাশিষ্ঠ শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে নিত্যানিত্য বিবেক প্রভৃতি বিচার এক মন এক চিত্তে নির্ব্বাহ করা ব্রহ্ম লাভের বা ব্রহ্ম দর্শনের সুগম পথ বা উপায়। অন্যান্য বৃত্তি অবরোধ করিয়া মনকে বিচার প্রবৃত্ত করিতে পারিলে শীঘ্রই সমাধি সমুৎপন্ন ও ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে।

লক্ষ লক্ষ ভোগাশা পরিপূরণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছ, পরন্তু সে সমস্তই তোমার দুঃখপ্রদ হইতেছে। তুমি যতই আশা বৃদ্ধি করিবে ততই তোমার দুঃখ বৃদ্ধি হইবে। অতএব, অতঃপর তুমি ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া যাহা যৎপরোনাস্তি মনোজ্ঞ ও পরম শ্রেয়ঃ, তুমি তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শীঘ্র অগ্রসর হও[১১]। এই সকল ভাবাভাবময়ী বিচিত্রকল্পনা তোমাকে দুঃখই প্রদান করিবে, কদাচ তুমি ইহাতে সুখের লেশও প্রাপ্ত হইবে না[১২]। অরে মূর্খ! কেন তুমি মেঘের মণ্ডূকিকার ন্যায় বৃথা পরিভ্রমণ করিতেছ? * তুমি কোন্ অনাদি অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছ তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাতে তুমি কি প্রাপ্ত হইয়াছ[১৩।১৪]? যাহাতে তুমি কিছু পাইবে, যাহাতে বিশ্রান্ত হইবে, তাহাতে তুমি অনুরক্ত হইতেছ না কেন[১৫]? অরে মূর্খ! তুমি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া শব্দানুসারিণী বুদ্ধির দ্বারা মৃগের ন্যায় বৃথা বিনষ্ট হইও না (মৃগেরা গীত ও বাদ্য বিশেষ শ্রবণে মুগ্ধ হয়, তদ্দশায় ব্যাধেরা তাহাদিগকে সহজে বিনষ্ট করে) তুমি ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত একলোল হইয়া স্পর্শসুখানুভব করিবার নিমিত্ত গজীলুব্ধ গজেন্দ্রের ন্যায় বৃথা বদ্ধ হইও না (শিকারীরা হস্তিনীর দ্বারা বন্য হস্তী ধরিয়া থাকে, ইহা সর্ব্বজন বিদিত)[১৬।১৭]। তুমি রসনায় আবিষ্ট হইয়া স্বাদ ভোগের লোভে মৎস্যের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। (মৎস্যেরা রসনার দোষে বড়িশ গিলিয়া মরে)[১৮]। তুমি চক্ষুঃসমাবিষ্ট হইয়া রূপ দর্শনের লোভে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইও না।

---

* মণ্ডূকিকা—নিরর্থক শব্দ। অথবা অর্থশূন্য অনুকরণ শব্দ। মেঘ কথা উপলক্ষ মাত্র, সমুদায় জড়ের শব্দ মণ্ডূকিকা। যেমন মেঘের বা জড়পদার্থের ধ্বনির কোনও অর্থ নাই, সেইরূপ, মনুষ্যকণ্ঠাভিব্যক্ত ধ্বনিরও বাস্তবতঃ কোন অর্থ নাই। ঘট একটী মনুষ্য কণ্ঠাভিব্যক্ত ধ্বনি বা শব্দ। তাহারও কোন অর্থ নাই। আমরা যে জলাধারকে ঘট বলি, বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে তাহা মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইরূপ মৃত্তিকাও গন্ধতন্মাত্রার অব্যতিরিক্ত, গন্ধতন্মাত্রাও প্রকৃতির অনতিরিক্ত এবং প্রকৃতিও মায়ার নামান্তর মাত্র। অতএব, জগৎ এই নাম ও তাহার নামী এই মৃত্তিকাস্তূপ সমস্তই মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা প্রসূত। সুতরাং বুঝা উচিত যে, ঘট, পট, গৃহ, ক্ষেত্র, নদ, নদী. পর্ব্বত, ইত্যাদি সমস্তই মণ্ডূকিকার ন্যায় শব্দ মাত্র, সুতরাং মিথ্যা।

(পতঙ্গেরা রক্তবর্ণ দীপ প্রভায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়)[১৯]। তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতারিত হইয়া ভৃঙ্গের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। (ভৃঙ্গেরা গন্ধে মুগ্ধ হইয়া পদ্মমধ্যে নিলীন হয়। তাহাতে তাহারা অনেক সময়ে বন্য হস্তীর পদে বিদলিত হয়)[২০]। অরে অজ্ঞ! যখন কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মাতঙ্গ, ও মীন, ইহারা এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হত হয় তখন যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বশ্য জীবেরা হত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি[২১]? অরে চিত্ত! আমি তোমাকে অনুনয় সহকারে বলিতেছি, তুমি আপনিই আপনার কল্পনা জালে বদ্ধ হইও না। যদি তুমি শরন্মেঘের ন্যায় রূপবিহীন ও নির্ম্মল হইয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার অনন্ত জয়লাভ হইবে[২২।২৩]। এই জগৎ, সৃষ্টি উৎপত্তি ও বিনাশ দোষে দুষ্টা ও পরিণামে তাপপ্রদা, ইহা জানিয়াও যদি পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমার বিনাশ বা চিরপতন অবশ্যম্ভাবী[২৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! হে রামচন্দ্র! উদ্দালক প্রোক্ত প্রকারে চিত্তানুশাসন করিয়া বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য মনে করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অরে চিত্ত! আমি আর বৃথা তোমার অনুশাসন করিব না। পুরুষ বিচারবান্ হইলে তাহার চিত্ত স্বয়ংই প্রশান্ত হয়[২৫]। অতএব তোমাকে অনুশাসন করা বৃথা। যাবৎ অজ্ঞান-তিমির ঘনীভূত থাকে, তাবৎ চিত্তবেতাল নৃত্য করে। কিন্তু যখন বিচার দ্বারা হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হয়, অজ্ঞানতিমির বিদূরিত হয়, তখন চিত্তরূপ মেঘ তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করে। বর্ষার মেঘ থাকিতে নীহারের নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু বর্ষার মেঘ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তখন নীহারও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে চিত্তও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে[২৬।২৮]। আমি বেশ বুঝিয়াছি, চিত্ত যেমন যেমন বিচারে পরিমার্জ্জিত হইবে, তেমনি তেমনি শরন্মেঘের ন্যায় তনুতা প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে অপর বিচার এই যে, অবি-বেকী দিগের চিত্ত নিতান্ত দুর্দ্দম্য সুতরাং অনুশাসনের অযোগ্য। বিবেকী দিগের চিত্তও অনুশাস্য নহে। কারণ এই যে, বিবেকীর চিত্ত বিবেক অনুসারে হয় বিনষ্ট না হয় বিনাশোন্মুখ। সুতরাং তাদৃশ চিত্তের আবার অনুশাসন কি? অতএব, আমি আমার বিনষ্টপ্রায়

মিথ্যাভূত চিত্তের অনুশাসন চেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম। পরন্তু তাহার যে মূর্খতা আছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতকৃত্য হইব[২৯।৩০]।

উদ্দালক ঐরূপ বিচার করিয়া চিত্তের মূর্খতা নাশক প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। হে চিত্ত! আমি চিৎপ্রদীপ; আমাতে অহং নাই, বাসনা নাই, সেজন্য আমি নির্বিকল্প। তুমিই আমাতে অহং আরোপ করিয়াছ, তাহা মিথ্যা। অতএব, তোমার সহিত আমার "আমি" এ ভাব বা এ সম্বন্ধ নিতান্ত অসন্ময়। অরে মূঢ়! তুমি কেবল আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই "এই, সে, আমি, আমার, আমরা" ইত্যাদি প্রকার বৃথা দুর্দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াছ। তোমার ঐ সকল দৃষ্টি বিষ-বিসূচিকার অনুরূপা[৩১।৩২]। মন অতি ক্ষুদ্র ও আত্মতত্ত্ব অসীম। তাদৃশ আত্মতত্ত্ব কি তাদৃশ ক্ষুদ্র মনের ক্রোড়ীকৃত হইতে পারে? যেমন বিল্বমধ্যে হস্তীর অবস্থান অনুপপন্ন, সেইরূপ, অহম্ভাব দ্বারা অপরিসীম আত্মতত্ত্বের পরিচ্ছেদ ঘটনাও অনুপপন্ন। অর্থাৎ অহংএর দ্বারা যে আত্মার মদীয়তা বা দেহাবচ্ছিন্নতা প্রতীত হয় তাহা ভ্রান্তি, বাস্তব নহে[৩৩]। অরে চিত্ত! তুই বহুকালের পুরাতন কূপের অনুরূপা, অতি গভীরা (যাহার তল দেখা যায় না তাহাকে গভীর বলা যায়।) দুঃখদায়িনী দুর্বাসনাকে নিজের বাসস্থান রূপে গ্রহণ করিয়া ছিলে, সেই কারণে আমি তোকে ত্যাগ করিয়াছি। আমি আর তোর অনুগামী হইব না[৩৪]। আমার, আমি, এই, সেই, এ সকল ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ। বালকের ন্যায় বিচার জ্ঞান শূন্য ব্যক্তিরা ঐ সকল পরি-কল্পনা করে করুক, তাহাতে আমার কি[৩৫]? আমি পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে মস্তককেশ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া দেখিয়াছি, অহং কোন স্থানে নাই। অতএব, অহং যে কোথায়? ও কিরূপে সমাগত? তাহা বলা যায় না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সর্বত্র সর্বদা একমাত্র সম্বেদনই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আমিও সেই সম্বেদনরূপী[৩৬।৩৭]। যাহার ইয়ত্তা নাই, যাহার কোন বিকল্প নাই, যাহাতে একত্ব দ্বিত্ব বহুত্বাদি নাই, যাহাতে অণুত্ব মহত্ত্ব নাই, সেই আত্মসম্বেদ্য একাদ্বয় পরম বস্তুই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তদন্য যে কিছু সে সমস্তই অসৎ বা অবিদ্যমান। তাই তোরে বলি, অরে রে মূর্খ চিত্ত! আমি এখন তোমাকেও সম্বেদন ও সাক্ষিরূপে দর্শন করিতেছি। তুমিই আমার

দুঃখের কারণ, তাই তোমাকে আমি বিবেক জাত প্রজ্ঞার দ্বারা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি[৩৮।৩৯]। আর তুমি এই দেহের কোন অংশে অহন্তার অবস্থান দেখিতে পাইবে না। খুঁজিতে গেলে ইহা মাংস, ইহা রক্ত, এ সকল অস্থি, তাহা শ্বাস প্রশ্বাস, এইরূপ এইরূপই পাওয়া যায়, পরন্তু অহং যে কোথায় তাহা পাওয়া যায় না। দেহের স্পন্দন, তাহা অধ্যাত্মবায়ুর শক্তি, এবং দেহে যে বোধের অধিষ্ঠান আছে, তাহা মহাচিতের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রভাব। তদ্ভিন্ন জরা মরণ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম্ম, পরন্তু অহং কোন কিছুতে নাই[৪০।৪১]। অরে অবোধ চিত্ত! মাংস এক পদার্থ, রক্ত এক পদার্থ, অস্থি অন্য পদার্থ, বোধ ও স্পন্দন অন্য পদার্থ। তবে তোমার অহং কোথায়[৪২]? ঐরূপ ঘ্রাণ, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রবণ, চক্ষু, ও স্পর্শ, এ সকলেরও কোন কিছুর মধ্যে অহং নাই[৪৩]। অতএব যেমন পরমার্থতঃ অহং বলিয়া কোন বস্তু নাই সেইরূপ তুমিও নাই, আমিও নাই এবং বাসনাও নাই। আছে কি? একমাত্র চিদাভাসই আছে, অন্য কিছু নাই[৪৪]। এখানে বল, সেখানে বল, সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা একমাত্র আমি-ই আছি, অথবা আমি কুত্রাপি নহি, এইরূপ দৃষ্টিই সম্যগী অর্থাৎ সাধ্বী[৪৫]। এত দিন আমি অজ্ঞানরূপ ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক অহন্তারূপ বঞ্চনার দ্বারা কষ্ট পাইয়াছি; সৌভাগ্য আমার এই যে, আমি আজ্ স্বরূপাপহারী অজ্ঞান তস্করকে পরিজ্ঞাত হইয়াছি। অতঃপর আমি আর ইহার সঙ্গ গ্রহণ করিব না[৪৬।৪৭]। আমি নির্দ্দুঃখস্বভাব; সুতরাং দুঃখ আমাতে হয় না, অহন্তাতেই হয়। এ সকল তাহারই, আমার নহে। মেঘ শৈলে থাকে, কিন্তু শৈলের নহে[৪৮]। ব্যবহার কালেও আমি সত্য সত্য অহং হই না, পরন্তু সেই সেই কালে সেই সেই ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য নটের ন্যায় অহং সজ্জায় সাজিয়া "আমি বলিতেছি" "আমি দেখিতেছি" ইত্যাদি প্রকারের বাক্য বলি, শ্রবণ করি ও অবগত হই, যাই ও আসি। পরন্তু আত্মাবলোকন দ্বারা এখন আমি নিরহঙ্কার[৪৯]। এই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এ সকল আমিই। আমার অতিরিক্ত নহে। অথবা যদি অতিরিক্তই হয় তা হউক্ সে সকল আমারই বিপরীত অর্থাৎ জড় বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব, পক্ষদ্বয়ের যে পক্ষই হউক, উহারা দেহে থাকুক আর যাক্, উহাদের থাকা না থাকায় আমার কিছু মাত্র বৃদ্ধি ক্ষতি নাই[৫০]।

যে অহং আমাকে এত কাল কষ্ট দিয়াছে সে যে কি? ও কোথা হইতে আসিল? তাহা এত কাল বুঝি নাই, ইহা বড়ই কষ্টের কথা। অহংএর আকৃতি বালক কল্পিত বেতালের আকৃতি অপেক্ষাও উত্তাল[৫১]। হায়! হায়! এত কাল আমি হরিণের তৃণশূন্য কূপে বিলুণ্ঠিত হওয়ার ন্যায় বৃথা লুণ্ঠিত হইয়াছি[৫২]। ইতি পূর্ব্বে চক্ষু আপনার বিষয় (রূপ) দেখিবার জন্য উন্মুখ হইত পরন্তু তৎসঙ্গে আমার মুগ্ধ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল[৫৩]? ত্বক্ স্পর্শ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত হইত, তৎসঙ্গে আমার উদয়ের কি প্রয়োজন ছিল[৫৪]? রসনা রসে ব্যাসক্ত হইত, তাহাতে আমি "আমি মিষ্ট বা তিক্ত ভোগ করিতেছি" এরূপ ভ্রান্ত হইতাম কেন[৫৫]? স্বার্থপর (শ্রবণতৃষ্ণায় কাতর) শ্রোত্র শব্দ গ্রহণ করে, তাহাতে অহংএর প্রসঙ্গ কেন ছিল? ঘ্রাণও আত্মম্ভরিতা ক্রমে গন্ধ গ্রহণ করিত, তাহাতে "আমি ঘ্রাতা" বলিয়া যে বৃথা অভিমান করিত সেই অহং নামক চোরকে আমি বিদিত হইয়াছি[৫৬।৫৭]। অভি-হিত স্থল সমূহে যে অহন্তার কল্পনা, তাহা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। অতএব, এই দেহ, ইহা আমার, আমি সেই, এ সকল ভ্রান্ত ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৫৮]। যদি বল, বাসনা ব্যতীত শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, আমি বলি, তাহাও হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব স্বভাবে বিষয় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই দেহের স্থিতি ও ক্রিয়া নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইবে। ভাবিয়া দেখ, প্রাগুক্ত দাম ব্যাল কট প্রভৃতির কল্পনা ছিল না (আত্মার বা অন্তকরণের ক্রিয়া জনিত সংকল্প জন্মিত না) অথচ তাহারা যুদ্ধাদি করিয়াছিল। অরে চিত্ত! বাসনাবর্জ্জিত কর্ম্মের গুণ এই যে, কর্ম্ম করণ কালে ক্ষণেকের নিমিত্ত ভোগাভাস প্রকটিত হয় মাত্র পশ্চাৎ তদনুযায়ী অহং সুখী অহং দুঃখী এ অভিমান হয় না। তাহা না হওয়ায়, তদ্‌ঘটিত শোক মোহ ভয় বিষাদ চিন্তা ও উদ্বেগ হয় না[৫৯।৬০]। অতএব, বাসনা ত্যাগ সহকৃত কর্ম্মে দুঃখের অনুদয় ও শান্তি হয়[৬১]। অরে মূর্খাদপি মূর্খতম ইন্দ্রিয়গণ! শিশুরা যেমন পুতুল গড়িতে ক্লেশ স্বীকার করে, পশ্চাৎ তাহার বিনাশেও দুঃখ অনুভব করে, সেইরূপ তোমরাও বিষ-য়ের অর্জ্জনে ও বিনাশে দুঃখী হইয়া থাক[৬২]। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ! বাসনাই বল, আর অন্য যে কিছু বল, (বাসনা=কার্য্যানুরাগ প্রবৃত্তি),

সমস্তই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মার অনতিরিক্ত। তরঙ্গ যেমন জলের অনতিরিক্ত, সেইরূপ৬৩। কিন্তু অজ্ঞগণ জানে, ঐ সকল পৃথক্ বস্তু। অহে ইন্দ্রিয়বালকগণ! তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা কোষকার ক্রমির স্থায় বৃথা বিষয় তৃষ্ণায় বিনষ্ট হইতেছ৬৪। পার্ব্বত্য পথিকেরা যেমন ভ্রান্তি ক্রমে অধঃ পতিত হয়, তোমরাও সেইরূপ, তৃষ্ণার দ্বারা জরা মরণ সঙ্কটে নিপতিত হইতেছ৬৫। তোমাদের বাসনাই বন্ধনের কারণ৬৬। ঐ বাসনা বাস্তবী নহে, উহাও কল্পনার দ্বারা সম্পাদিত৬৭। তাদৃশী বাসনাই তোমাদের ব্যামোহের ও বিনাশের কারণ৬৮।

অরে চিত্ত! তুমিই ইন্দ্রিয়তারকাগণের একমাত্র আকাশ। সেই জন্তই বলিতেছি, তুমি ইন্দ্রিয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া আপনাকে অসৎস্বরূপে দর্শন কর। তাহা হইলে পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়া সকল বস্তুর আলয় স্বরূপ নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে। তুমি নৈপুণ্য সহকারে বাসনা বিসূচিকাকে পরিহাররূপ মন্ত্রের দ্বারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার হীন হইয়া ভগবান্ পূর্ণানন্দাত্মা হও৬৯।৭০।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

—○()*()○—

উদ্দালক বলিলেন, তিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বস্তু ও পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল বস্তু পুষ্পাদি ও কস্তূরী প্রভৃতির দ্বারা বাসিত হইতে পারে। পরন্তু আত্মচেতনা অসীম, অবয়ব বর্জ্জিত ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। কিরূপে তাঁহা বাসনাক্রান্ত হইবে[১]? বাসনা কি? আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিতে অথবা অহংতত্ত্বে যে ইন্দ্রিয়ানীত বিষয়ের সুসূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি অবস্থান করে পণ্ডিতেরা তাহাকে বাসনা নামে উল্লেখ করেন। তাদৃশী বাসনা অসদ্রূপা অর্থাৎ মিথ্যারূপিণী। মিথ্যারূপিণী হইলেও তাহা বেতালগণের ন্যায় ভয়প্রদ ও মনোমাত্রের অনুভাব্য[২]। জাগ্রৎ কালে বিষয়ের নিরূপণ, বিচারণা ও অনুভব, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা সম্পন্ন হয়, স্বপ্নকালে মন সে সকলের বাসনা অর্থাৎ সুসূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি দর্শন বা অনুভব করে। অতএব, বুদ্ধ্যহঙ্কারাদি যাহা করে ও মন যাহা অনুভব করে, আত্মচিৎ তৎসমুদায়ে অলিপ্ত থাকে[৩]। অতএব, মনের দুশ্চেষ্টারচিত দেহাদি ইহ সংসারে স্থিত থাকুক আর না থাকুক, আমি সর্ব্বকাল বিশুদ্ধ চিৎ[৪]। আত্মচিতের জন্মও নাই, মরণও নাই। হেতু এই যে, আত্মচিৎ সর্ব্বদা সর্ব্বগা অর্থাৎ সর্ব্বরূপিণী বা পরিপূর্ণস্বভাবা। যে হেতু আত্মচিৎ পূর্ণস্বভাবা সেই হেতু সে মরেও না, কাহাকে মারেও না। জন্তুই অর্থাৎ জন্মবান্ পরিচ্ছিন্ন পদার্থই মরে ও মারে[৫]। যে চিৎ সর্ব্বদা সর্ব্ব জন্তুর জীবন সে চিতের আবার জীবিতাকাঙ্ক্ষা কি? জীবিতাকাঙ্ক্ষা থাকিলেই তৎসঙ্গে মরণ ভয় থাকে, পরন্তু জীবিতাকাঙ্ক্ষা না থাকায় চিতের মরণ ভয়ও নাই[৬]। এই ব্যক্তি জীবিত, এই ব্যক্তি মৃত, ইহা কেবল মনের কল্পনা সম্ভূত, আত্মসমুৎপন্ন নহে[৭]। যাহা অহন্তাব প্রাপ্ত হয় তাহাই ভাবাভাব দ্বারা পরিগৃহীত, ইহা নিয়তিরই নিয়ম। পরন্তু অহন্তাব না থাকায় আত্মার ভাবাভাব নাই[৮]। অহঙ্কার, মন, মোহ ও মৃগতৃষ্ণিকা, এ সমস্ত তুল্যানুতুল্য পদার্থ। অর্থাৎ অহঙ্কার ও মন উভয়ই অসৎ। সুতরাং দেহাহন্তাবের বাস্তব আশ্রয়

নাই[৯]। দেহ রক্তমাংসাদিময়, মনও বিচারের নাশ্য, চিত্ত প্রভৃতি আর সকল জড়, সুতরাং অহং-বাসনা নিরাশ্রয়[১০]। ইন্দ্রিয়গণ আত্মম্ভরি, তাহারা অহঙ্কারের পোষণ করে না। আর আর পদার্থও আপন আপন স্বরূপে অবস্থিত। গুণসকল (সত্ত্বরজস্তম) আপন আপন ব্যাপারে ও প্রকৃতি আপন সাম্য ও বৈষম্য অবস্থায় ও সৎ সত্তে অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাবে বিশ্রান্ত রহিয়াছে। তবে অহং এই ভাব কোথায় ও কাহার[১১।১২]? অতএব, এই দেহে যে চিদাত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকাল স্থায়ী, পরম মহৎ ও কেবল। তিনিও "পরমাত্মাহং" এই অভিসন্ধি যুক্ত। অর্থাৎ তিনিও বাস্তব প্রকারে অহঙ্কারাস্পদ নহেন[১৩]। অতএব, অহং-এর কোনরূপ আকৃতি, জাতি, সংস্থান (গঠন), রূপ, বিকার, নির্দ্দেশ যোগ্যতা, কিছুই নাই। উহা কাহার কৃতও নহে, অকৃতও নহে। সুতরাং আমি কেন তদ্ভাবাপন্ন হইয়া "আমি গ্রহণ করি" "আমি ত্যাগ করি" বলিয়া ব্যাকুল হইব[১৪]? অহং নামের কোন নামী নাই, এবং অনহং রূপে আমার সহিত তাহার সংযোগাদি সম্বন্ধও নাই[১৫]। যদি অহঙ্কার না-ই থাকে তবে আর কাহার সহিত কিসের সম্বন্ধ? যদি সম্বন্ধই না থাকে তবে আর দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি ভেদ কল্পনা কেন[১৬]? এত দিন পরে বুঝিয়াছি, এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং আমি যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই আছি, তবে কেন বৃথা শোক করি[১৭]? মনোবর্জ্জিত ও সর্ব্বত্রাবস্থিত একাদ্বয় ব্রহ্ম পদে কেন অহঙ্কার কলঙ্কের আরোপ করি[১৮]? এই যে পদার্থ শোভা, এ সকল কিছুই তত্ত্বতঃ নাই। অর্থাৎ সমস্তই মিথ্যা। কেবল এক সর্ব্বগামী আত্মাই আছেন, অন্য কিছু নাই। যখন পদার্থরাশি নাই, তখন কাহারও সহিত সম্বন্ধও নাই[১৯]। এমন কি, মনেরও বাহ্য বিষয় স্পর্শের ক্ষমতা নাই। মন ইন্দ্রিয় দিগকে আপনার বলিয়া কল্পনা করতঃ স্বপ্ন সঞ্চরণের ন্যায় আপনিই আপনাতে আপনার ব্যাপার (কার্য্য) উপক্ষীণ (সমাপ্ত বা সম্পন্ন) করে। তথা চিত্তও ইন্দ্রিয়গণে ও বহির্ব্বস্তুতে অলিপ্ত থাকে। অতএব, কাহার সহিত কি প্রকারে কাহার সম্বন্ধ থাকা প্রমাণিত হইবে[২০]? যেমন প্রস্তরের সহিত লৌহের সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ, চিদাত্মার সহিতও দেহের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের সম্বন্ধ নাই[২১]। অহং এই মহান্ ভ্রম বৃথা অভ্যুদিত। লোক সকল ইহা আমার, আমার অমুক, এইরূপ বিপর্য্যাসে

অর্থাৎ মহাভ্রমে বিনষ্ট হইতেছে[২২]। ঐ অহঙ্কার নামক চমৎকার তত্ত্ব-দৃষ্টির অভাবে সমুত্থিত, তত্ত্ব দর্শন হইলে উহা তাপসংযোগে হিমকণার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়[২৩]। কোনও পদার্থ আত্মাতিরিক্ত নহে, সমস্তই ব্রহ্মতত্ত্ব, আমিও ব্রহ্মতত্ত্ব[২৪]। অহং নামক ভ্রম আকাশবর্ণবৎ উদয় প্রাপ্ত রহিয়াছে। উহার বিস্মরণই শ্রেয়স্কর[২৫]। সেজন্য আমি ঐ অহং ভ্রমকে চিরকালের নিমিত্ত সমূলে পরিত্যাগ করিয়া শান্তাত্মা হইব[২৬]। অহম্ভাবের অনুসন্ধানও অনর্থজনক। অহন্তার উদ্রেক দুষ্কৃতি বিস্তার করে, সন্তাপ জন্মায় ও অন্যান্য অনর্থ আনয়ন করে[২৭]। হৃদয়াকাশে অহঙ্কার মেঘ উদিত হইলেই শরীররূপ কদম্বে দোষরূপ মঞ্জরী উৎপন্ন হয়[২৮]। এ কি সামান্য কষ্টের বিষয় যে, মরণের অন্তে জন্ম, আবার জন্মের অন্তে মরণ, এবং ভোগ্য সমূহ নাশের অনুগামী হয়[২৯]! আমি ইহা পাইয়াছি, আবার অমুক পাইতে হইবে, ইহা এক প্রকার রোগ। দুর্ব্বুদ্ধিদিগের ঐ দাহদায়িনী রোগের উপশম হয় না[৩০]। ইহা নাই, তাহা আছে, এ চিন্তা অহঙ্কারেরই অনুচরী[৩১]। যদি অহম্ভাব পরিক্ষীণ হয় তাহা হইলে সংসার পাদপ সমূলে শুষ্ক হইয়া যায়, আর অঙ্কুরোৎপাদন করে না[৩২]। যদি বিচাররূপ গরুড় উপস্থিত হয় তাহা হইলে এই দেহদ্রুমবাসী তৃষ্ণারূপ সর্প তন্মুহূর্ত্তে পলায়ন করে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ[৩৩]। যখন সমস্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা রূপে সমুদ্ভূত তখন আর এতন্মধ্যে তুমি আমি ব্যবস্থার প্রতি এত আস্থা কেন[৩৪]? এই জগৎ অকারণ ব্রহ্ম হইতে অকস্মাৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহাও অকারণ ও আকস্মিক। যাহা আকস্মিক তাহাকে আমরা সত্য ভাবি কেন[৩৫]? যেমন মৃত্তিকায় কুম্ভের আকৃতি উৎপন্ন হইয়া তাহা দীর্ঘ কাল তদাকৃতিতেই থাকে, তাহার ন্যায় সেই কোন্ অনাদি কালে দেহাদি আকৃতি উদিত হইয়া তাহা অদ্যাপি সেই আকৃতিতেই রহিয়াছে ও থাকিবে[৩৬]। জলে তরঙ্গ হয়, তরঙ্গের উপশমে আবার জল হয়। সেইরূপ ব্রহ্মে বিশ্ব (জগৎ নামক প্রতিভাস বা ভ্রান্তি) জন্মে, বিশ্বের উপরমে যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই ব্যবস্থিত থাকে[৩৭]। যাহারা এই তরঙ্গ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি[৩৮]। যাহার স্ফুটতা ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার প্রতি আস্থা করা আত্মবিনাশেরই কারণ[৩৯]। স্থূল দেহের ত কথাই নাই,

সূক্ষ্ম দেহও উৎপত্তির পূর্ব্বে চিন্মাত্র স্বভাবে ছিল। পরে আবার তাহাই হইবে। পূর্ব্বে ও পরে যাহার যে রূপ, মধ্যেও তাহার সেই রূপই অবধারণ করা কর্ত্তব্য[৩০]। স্বপ্নে, ভয়শঙ্কাদিকালে, মত্ততা দশায়, যান ভ্রমণ জন্ম ভ্রান্তিকালে, সান্নিপাতিকরোগ কালে, ইন্দ্রিয় বিপ্লব দশায়, হঠাৎ প্রচুর উল্লাস দশায়, কামাবেশ কালে, যে সকল বিষয় বিশেষ প্রতীয়মান হয় সে সকলও দোষ বিশেষের উপশমের পর উপশান্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রতীত হয় না। এই সংসার ভ্রান্তিও ঐ সকল দৃষ্টান্তের তুল্যরূপিণী। বিশেষ এই যে, স্বপ্নাদি পদার্থ অল্পকাল এবং জগৎভ্রম মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী। কালের ন্যুনাতিরেক ব্যতীত ভ্রম দর্শনের ন্যুনাতিরেক নাই[৩১।৪৩]। অরে চিত্ত! তুমিও ঐ ঐ ভ্রান্তিতে ভ্রমিত হইয়া আসিতেছ এবং তন্নিবন্ধন তুমি শত শত লক্ষ লক্ষ সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছ[৪৪]। তুমি যে মিথ্যা বস্তু তাহা আমি না জানিয়া তোমার প্রতি আমি, অহং অর্থাৎ আমি, এই ভাব অভ্যস্ত করিয়া আসিয়াছি, তাই তোমার কৃত কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফল আমাতে সম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ ভাবিতাম[৪৫]। দৃশ্য মণ্ডল অবস্তু, অর্থাৎ মিথ্যা, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় হইলে মন থাকে না, ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[৪৬।৪৭]। মন যদি আপনাকে চিদ্বস্তুর অনতিরিক্ত দেখে, তাহা হইলে মন মনন (নানা প্রকার প্রবৃত্তি) বিহীন, বিষয়ানুরাগ বর্জ্জিত ও স্বস্থ অর্থাৎ পরমাত্মময় হয়[৪৮]। পরমাত্মরূপ বহ্নিতে চিত্তরূপ সুবর্ণ নিক্ষিপ্ত হইলে চিত্তের শাশ্বতী শুদ্ধি আগমন করে (উৎপন্ন হয়)[৪৯]। যেমন কোন বীর দেহাদির বিনাশ লক্ষ্য করে না, তুচ্ছতা বোধে তাহা অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মলোকগামী হয়, সেইরূপ, মনও দেহাদির প্রতি ত্যাগ বুদ্ধি উৎপাদন পূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৫০]। স্পষ্টই দেখা যায়, মন দেহের শত্রু এবং দেহ মনের শত্রু; সুতরাং একের অভাবে উভয়ের অভাব সুসম্ভব। অতএব, পরস্পর বিরোধী উক্ত উভয়ের সমূলে বিনাশ শ্রেয়ঃকর। মরণে দেহ নাশ হয় সত্য, কিন্তু মন থাকে, তৎকারণে অন্য দেহ হয়[৫১।৫৩]। যে অধমাশয় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের আদর করে তাহাকে অনলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। কেননা, স্বভাব শত্রু দেহ ও মন একত্রিত হইয়া অনর্থ জন্মায়[৫৪।৫৫]। মনই সঙ্কল্প দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন

করতঃ তাহাকে অনন্ত দুঃখ প্রদান করে[৫৬]; আবার বহ্নি অপেক্ষা অধিক দুঃসহ সেই সকল দুঃখে উপতপ্ত হইয়া এই দেহই আবার মনের বিনাশ ইচ্ছা করে। পুত্র কি আততায়ী পিতার বিনাশ ইচ্ছা করে না[৫৭]? শত্রুতা মিত্রতা প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বাভাবিক নহে। যে সুখ দাতা, সেই মিত্র এবং দুঃখদাতা সেই শত্রু। অতএব, দুঃখানুভবকারী দেহও যোগ্য সময়ে স্বনিষ্ঠ মনকে শত্রু বিবেচনা করিয়া তাহার বিনাশ ইচ্ছা করে। আবার মনও দেহকে দুঃখায়তন স্থির করিয়া তাহার বিনাশ ও পরিত্যাগ কামনা করে। এরূপ বিরোধী পদার্থের সংসর্গে সুখ কি? সুখ ত না-ই অধিকন্তু দুঃখই হইয়া থাকে[৫৮।৬০]। যদি কোনও ক্রমে মনকে বিনষ্ট করা যায় তাহা হইলে এ দেহ দুঃখ ভাজন হয় না। কাযেই এই দেহ সে অবস্থার বিনাশে চেষ্টায় কখন কখন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়[৬১]। চেষ্টা সফলা না হইবার কারণ এই যে, মন অলব্ধাত্মবিবেক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানবিহীন[৬২]। যেমন মেঘ ও সমুদ্র সেই-রূপ দেহ ও মন পরস্পর পরস্পরের পোষক, এবং উভয়েই দুঃখোৎ-পত্তির হেতু[৬৩।৬৪]। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ক্ষয়শীল চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে দেহ নির্ম্মূল হয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহ বৃক্ষের ন্যায় শত শাখায় বর্দ্ধিত হয়। (শত শাখায় বর্দ্ধিত হয় কথার তাৎপর্য্য—নানা যোনিতে নানাকারের দেহ জন্মায়)[৬৫]। মন প্রক্ষীণ হইলে বাসনা ক্ষয় ক্রমে দেহের অভাব ঘটনা হয়, পরন্তু দেহের ক্ষয়ে মনের ক্ষয় হয় না[৬৬]। অতএব, মনোনাশই শ্রেয়স্কর। মন এক প্রকার অরণ্য। সঙ্কল্প এ অরণ্যের বৃক্ষ, তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগস্পৃহা লতা। আমি তাদৃশ মনোরূপ বন ছেদন করিয়া অতি বিশাল ভূমিতে বিহরণ করিব[৬৭]। যেমন বর্ষার অবসানে মেঘের প্রশমন, সেইরূপ, মনোনিষ্ঠ বাসনার বিনাশে মনের উপশম অবশ্যম্ভাবী[৬৮]। অপিচ, এই যে আমার দেহ নামা রিপু (শত্রু), ইহা কেবল অস্থিমাংসাদির সন্নিবেশ (সাজান) মাত্র। আমি যদি আমার মনকে বিনষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে ইহা থাকুক, যাউক, কিছুতেই ক্ষতি নাই[৬৯]। যাহার বা যে দেহের জন্য ভোগেচ্ছা, সে বা সে দেহ আমার নহে এবং আমিও তাহার নহি। যে কারণে আমি দেহ নহি সে কারণও বলিতেছি। স্পষ্টই দেখা যায়, শবীভূত দেহের স্পন্দন এক মাত্র আত্মসম্বন্ধের অভাবে নিবৃত্ত থাকে[৭০]-

১১। সুতরাং আমি দেহাদির অতীত[১২]। আমি নিত্য, স্বপ্রকাশ, এবং চেতনারূপী। আমাতে দুঃখ নাই, অনর্থ নাই, দুঃখাদির সম্বন্ধও নাই। শরীর যেরূপ হয় হউক, পরন্তু আমি অজর অমর স্বভাবে অবস্থিত[১৩]। আমার মন, ইন্দ্রিয়, বাসনা, কিছুই নাই। পামরেরা কি রাজার নিকটে থাকিতে পারে? আমি আজ্ সেই পদ (আত্মপদ) প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি কেবল, বিজয়ী, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, নিরংশ, নির্গুণ ও নিরীচ্ছ[১৪।১৫]। বাহ্য বস্তুর কথা দূরে থাকুক,—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, এ সকলেরও সহিত আমি অসম্বদ্ধ। যেমন নিষ্পীড়নের দ্বারা তৈল তিল হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, আমি এখন সেইরূপ পৃথক্ হই-য়াছি[১৬]। যদি কথঞ্চিৎ প্রারব্ধ বশতঃ আমার মতি এই শ্রেষ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠতম আত্মপদ হইতে অল্প বিচলিত হয় তাহা হইলেও এ সকল (দেহেন্দ্রিয়াদি) আমার লীলা স্থান বা পরিবারতুল্য বিনোদের কারণ হইবে[১৭]। আত্মজ্ঞ হওয়ায় আজ্ আমি মলশূন্য, মহান্, কৃতকৃত্য, সত্য, যথার্থজ্ঞানী, উপশমপ্রাপ্ত, সুন্দর, বিকল্পরহিত, পূর্ণ, উদার, সত্তা-লাভী, একজ্ঞাতা, সর্ব্বৈকতা, নির্ভয়তা, হৃদ্যতা ও দ্বৈতবিকল্পহীনতা এই ঊনবিংশতি নিত্যোদিতা সুন্দরী সুভগোদয়া হৃদয়বল্লভা কান্তা লাভ করিয়াছি। অতএব মোহহীন, নির্ম্মল ও বিগতকল্মষ হইয়া শরদাকাশে মেঘখণ্ডের ন্যায় শীতলাত্মায় বিশ্রাম করিতেছি[১৮।৮২]।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

—◌()*()◌—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বুদ্ধি যোগে উদ্দালক ঐ প্রকার নির্ণয় করিয়া বদ্ধ-পদ্মাসনে ও অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে উপবেশন করিলেন[১]। ওঁ এই অক্ষরটী পরব্রহ্মের প্রধান নাম ও অন্তরঙ্গ প্রতীক (পরব্রহ্ম উপাসনার প্রধান আলম্বন)। যে উপাসক উহা জানে ও জানিয়া ওঁ উচ্চারণ করে (ব্রহ্ম অভেদে ওঁকারের ধ্যান বা উপাসনা করে), সে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। মুনি উদ্দালক এই রহস্য বিদিত হইয়া তারস্বরে ও যথাযথ নিয়মে ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে ধ্বনি অর্থাৎ সেই ওঁকার ধ্বনি উর্দ্ধগামী ও ঘণ্টানিনাদতুল্য হইল[২।৩]। উদ্দালক তাবৎ কাল ওঁকার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যাবৎ না তাঁহার তাদৃশ প্রকারে উচ্চারিত প্রণব ধ্বনি মুলাধার হইতে উত্থিত ও ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় সংবিৎতত্ত্ব (সংবিৎতত্ত্ব=ওঁকারাকারা বুদ্ধিবৃত্তি) ও জীবতত্ত্ব (জীবাখ্য চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য) অর্দ্ধ মাত্রা উচ্চারণের উর্দ্ধে অর্থাৎ উপরমে যে নিরংশ কূটস্থ চৈতন্য (ব্রহ্ম-চৈতন্য) অনুভূতির পদে অভিব্যক্ত হয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যের অভিমুখীন হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁ উচ্চারণ করিয়া ছিলেন। ওঁ এই অক্ষর সার্দ্ধ ত্রি অবয়ব যুক্ত (অ, উ, ম, ৺) তন্মধ্যে প্রথম অবয়ব অ, তাহার উচ্চারণ উদাত্তস্বরে অর্থাৎ অতি তীব্র বা তারস্বরে করিতে হয়। উদ্দালক প্রাণপণ যত্নে উক্ত প্রথমাংশের উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত প্রতি-ঘাত করিয়া বহির্গমন করিল। তাহাতে তাঁহার প্রাণাবয়বের রেচক নামক যোগাংশ নিষ্পন্ন হইল। উক্ত রেচক যোগে তিনি ভাবিলেন, তাঁহার স্থূল দেহ অগস্ত্যপীত সমুদ্রের ন্যায় রিক্ত অর্থাৎ প্রাণশূন্য ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে[৪।৫]। অনন্তর পক্ষী যেমন নীড় পরিত্যাগ করিয়া আকাশে যায় তাহার ন্যায় তদীয় প্রাণবায়ু তদীয় তদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদা-কাশ অবলম্বন করিল। অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার অন্য জ্ঞান বিলুপ্ত, সুতরাং

কেবল মাত্র আত্মচেতনা অবশেষিত রহিল। পরে তিনি ভাবিলেন, প্রাণ বহির্গমন জনিত সংঘট্টে অগ্নি জ্বালা উৎপন্ন হইয়া তাঁহার সেই শুষ্ক দেহকে ভস্মসাৎ করিয়াছে। যেমন অরণ্যোৎপন্ন বহ্নি (দাবাগ্নি) অরণ্য দগ্ধ করে তাহার ন্যায় দগ্ধ করিয়াছে[৭।৮]।

প্রাণ বহির্গতি, শরীর শোষণ, শরীরে বহ্নির উৎপত্তি, তদ্দ্বারা শরীর দাহ, এ সকল ভাবনার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছিল, হঠের দ্বারা নহে। হঠের দ্বারা প্রাণ বহির্গত করিতে গেলে মরণমূর্চ্ছাদি হয়। হঠ যোগ বিশেষ কষ্টপ্রদ[৯]। এক্ষণে প্রণবের দ্বিতীয়াংশ (উকার) উচ্চারণ কালে উদ্দালকের যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর।

প্রণবের দ্বিতীয় অংশ উ, উচ্চারণ অনুদাত্ত অর্থাৎ মন্দ্র বা গম্ভীর। সুতরাং ঐ সময়ে অর্থাৎ মন্দ্র ধ্বনি কালে তাঁহার প্রাণায়ামের কুম্ভক নামক মধ্যমাংশ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কারণ এই যে, ঐ সময়ে প্রাণ-বায়ুর গতি না বাহ্যে, না অন্তরে, না ঊর্দ্ধে না অধোভাগে, অর্থাৎ স্তম্ভিত হইয়া সমস্থিতিতে রহিল। যেমন জলপূর্ণকুম্ভস্থ জলের চলন থাকে না, তাহার ন্যায় রহিল[১০।১১]। বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকাল বহ্নিজ্বালা প্রদর্শন করিয়া উপশান্ত হয়, তাহার ন্যায় উদ্দালকের সেই হৃদয়বহ্নিও ক্ষণেকের জন্য উৎপন্ন হইয়া তদীয় স্থূল শরীর দগ্ধ করতঃ উপশান্ত হইল। উদ্দালক এখন অনুভব করিলেন, তাঁহার শরীর শুভ্রবর্ণ ভস্ম-রাশিতে পরিণত হইয়াছে[১২]। পরে অনুভব করিলেন, সেই কর্পূরধবল ভস্মশয্যায় নিস্পন্দ নিপতিত শুক্লবর্ণ অস্থি সমূহ তদীয় উদ্ধবাহী প্রচণ্ড পবন দ্বারা ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে এবং ক্ষণমধ্যে সেই ভস্মরাশিও গগন-মণ্ডলে শরন্মেঘের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে[১৩।১৪]।

উদ্দালক প্রণবের দ্বিতীয়াংশ উচ্চারণ কালে এবম্বিধ অবস্থা অনুভব করিলেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে, ঐ সকল অবস্থাও তাঁহার ভাবনাময়[১৬]।

পরে প্রণবের তৃতীয়াংশ (ম) উচ্চারণ কালে ওষ্ঠপুটাদির সংবৃতি ও বায়ুর স্তম্ভিতত্ব প্রভৃতি কারণে তাঁহার পূরক নামক প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ সুসম্পন্ন হইল[১৭]। তাদৃশ পূরক যোগ কালে তাঁহার প্রাণ-বায়ু চিদমৃতের মধ্যগত হওয়ায় যেন হিমসংস্পর্শে শীতল হইল এবং ক্ষণমধ্যে ধূম ও বাষ্প প্রভৃতি যেমন গগনকোষগামী হইয়া মেঘে পরি-ণত হয় তাহার ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলাকারে পরিণত হইল[১৮।১৯]। উদ্দালকের

প্রাণবায়ু এবংক্রমে ষোড়শকলাপূর্ণ অমৃতময় চন্দ্রমণ্ডলতা প্রাপ্ত হইয়া সেই গগনগত ভস্মে অমৃত ধারা বর্ষণ করিল অমৃত নিপতিত হইলে উদ্দালকের সেই ভস্মীভূত দেহ চতুর্ব্বাহুসমন্বিত বিষ্ণু দেহের ন্যায় দেহে পরিণত হইল। তদবসরে তদীয় প্রাণাদি বায়ুগণ সলিলের বৃক্ষকোটরে প্রবেশের ন্যায় সেই আবির্ভূত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ কুণ্ডলিনী স্থান প্রভৃতি পরিপূরিত ও তদ্দেহকে প্রকৃতিস্থ করিল[২০,২৭]। * (যেমন শরৎ কালের চরম বৃষ্টির দ্বারা বর্ষাদোষদুষ্ট ভূতল ধৌত ও শীঘ্র শুষ্ক হইয়া চিত্ত প্রসন্নকর ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ, আজ্ উদ্দালকেরও সেই কলুষ সংস্পৃষ্ট দেহ দাহন প্লাবনাদি ভাবনার দ্বারা ধৌত অর্থাৎ নিষ্কলুষ হইল, তৎপরে তিনি অভিনব ভাবনা সম্পাদ্য বৈষ্ণব দেহ লাভ করিয়া সমাধি সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। ইহাই অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ বা অর্দ্ধমাত্রায় স্থিতি।)

অনন্তর পদ্মাসনোপবিষ্ট উদ্দালক সেই ভাবময় দেহে অবস্থান করতঃ যেমন বন্ধন দ্বারা মত্ত হস্তীর চাঞ্চল্য অবরোধ করে তাহার ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিরুদ্ধ করিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধির নিমিত্ত নিম্নোক্ত কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[২৮,২৯]। উক্ত প্রকার প্রাণায়াম দ্বারা তাঁহার প্রাণবায়ুগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত হইলে তখন আর তাহারা আশা তৃষ্ণা লোভ প্রভৃতিতে ধাবমান হইল না। এখন তিনি আপনার মত্তহস্তিসম মলিন ও বিষয়ারণ্যে ধাবমান মনকেও হৃদয় প্রদেশে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন[৩০,৩১]। মন সর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত গৃহ ক্ষেত্র পুত্র কলত্র ও মিত্রাদির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রণবার্থ (ব্রহ্ম) ধ্যানে রত হইল। অমনি তাঁহার নেত্রদ্বয়ের প্রশস্ত পত্রদ্বয় সন্ধ্যাকালীন পদ্মের ন্যায় অর্দ্ধমুদ্রিত ও স্থিরতারক হইল[৩২]।

অনন্তর সেই মৌনী মুনি নিশ্বাসবায়ুর ও কণ্ঠস্থ বায়ুর অবরোধ দ্বারা

---

* উদ্দালক প্রণব জপ প্রসঙ্গে প্রাণায়াম যোগ ও তদ্দ্বারা ভূতশুদ্ধির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শুদ্ধদেহ হইলেন অর্থাৎ সমাধি-সাধনের অধিকারী বা যোগ্য পাত্র হইলেন। অতঃপর তিনি নিজ অভীপ্সিত সমাধির অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপ ভাবনাময় দেহে সমুদায় দেবতার উপাসনা বা পূজা করার বিধান আছে এবং এতদনুযায়ী প্রথাও এতদ্দেশের উপাসক ও পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

প্রযত্ন সহকারে প্রাণ ও অপান বায়ু জয় করিয়া তিল হইতে তৈল পৃথক্ করণের ন্যায় ঐন্দ্রিয়ক ব্যবসায় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিলেন এবং ধীরতা সহকারে প্রথমতঃ বাহ্য দর্শন স্পর্শনাদি, তৎপরে আন্তর দর্শন স্পর্শনাদি (তৎসমূহের অনুভূতি) পরিত্যাগ করিলেন[৩৩।৩৭]। পার্ষ্ণির দ্বারা (পায়ের গোড়ালির দ্বারা) মূলাধার (মলদ্বার) রুদ্ধ করায় দ্বারান্তর সঞ্চারী প্রাণবায়ু তদীয় হৃদয় প্রদেশেই অবরুদ্ধ হইল। যেমন রুদ্ধমুখ জলপূর্ণ কুম্ভকে অধোমুখ করিলে ছিদ্রান্তর থাকিলেও তাহা হইতে জল নিঃসৃত হয় না, তাহার ন্যায় তদীয় প্রাণপবন ইন্দ্রিয় পথে গমনাগমন না করিয়া হৃদয় প্রদেশেই স্থগিত হইল। তখন বশীকৃত উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তদীয় মন হৃদয়াকাশে পরমা প্রশান্তি (স্থৈর্য্য) অবলম্বন করিল। মারুত যেমন মশকগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় তিনি তখন বিকল্প সমুদয়কে বিদ্রাবিত করতঃ নির্ব্বাত অম্ভোনিধির ন্যায় সৌম্যতা প্রাপ্ত হইলেন[৩৮।৪১]। তথাপি মধ্যে মধ্যে তদীয় অন্তরে বিকল্প প্রতিভাস (বিষয় প্রলোভনের পূর্ব্ব সংস্কার বা প্রতিচ্ছায়া) উদিত হইতে লাগিল। পরন্তু তিনিও শূরের খড়্গ দ্বারা রিপুকুল মর্দ্দনের ন্যায় মনোদ্বারা সমাগত সেই সকল বিকল্পপ্রতিভাস পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন[৪২]। এবংক্রমে সকল বিষয়ের সঙ্কল্প আলূন (নির্ম্মূল) হইলে, তিনি স্বীয় হৃদয়াকাশে বিবেকসূর্য্যের আচ্ছাদক স্বরূপ বিলোল অন্ধকার দর্শন করিলেন[৪৩]। অর্থাৎ পুনর্ব্বার তমোগুণের উদ্রেক হইল। তখন তিনি সত্ত্বগুণোদ্ভাসিত মনঃ সূর্য্য দ্বারা সেই অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নৈশিক অন্ধকারের উপশমান্তে প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আলোকের ন্যায় তেজঃ সন্দর্শন করিলেন[৪৪।৪৫]। তৎপরে তিনি হস্তীর পদ্মবন মর্দ্দনের ন্যায় সত্বর সেই তেজোদর্শনকেও নিবারণ করিলেন। সেই অসৃক্‌সন্নিভ তেজ অতিক্রম করিলে তদীয় মন কিঞ্চিৎ কাল মদিরামত্ত ব্যক্তির ন্যায় ঘূর্ণমান ও কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রা প্রাপ্ত হইল[৪৬।৪৭]। তিনি যত্নপূর্ব্বক বায়ুর মেঘমালা ছেদনের ন্যায় ও তিগ্মাংশুর যামিনী বিনাশের ন্যায় সেই নিদ্রাকেও নিরাকৃত করিলেন[৪৮]। অনন্তর নিদ্রার অবসান হইলে তাঁহার মন বিতত ব্যোম (নানাকার কল্পিত আকাশ) দর্শন করিল। (ইহা এক প্রকার ভ্রান্তি)। অনন্তর প্রযত্ন সহকারে দীপের অন্ধকার উন্মজ্জনের

ন্যায় সেই ব্যোমকেও তিনি উল্লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মন বিস্তৃত মোহ প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ এখনও তাঁহার মন অসন্দিগ্ধরূপে পরমার্থতত্ত্ব বুঝিতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাদৃশ মনোমোহের মার্জ্জনা করিলে তাঁহার মন তেজ, তম ও মোহাদি বিবর্জ্জিত হইয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা লাভ করিল[৫২।৫৩]। অনন্তর সেই উদ্দালকচিত্ত তাদৃশ অবস্থায় ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া চিরানুসন্ধানাভ্যাসের প্রভাবে ও উৎকৃষ্ট সম্বিদের আস্বাদন হেতু বিশ্বরূপিণী সম্বিদ্ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণের নূপুরতা প্রাপ্তির ন্যায় পুনর্ব্বার চিত্তত্বতা প্রাপ্ত হইল[৫৪।৫৫]। পুনর্ব্বার তিনি চিত্তত্ব পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভূত হইলেন, পরে সে ভাবও পরিত্যাগ করিয়া সামান্য চিৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেন। এই চিৎসামান্যতা প্রাপ্তির পরে তদীয় মন নিরবশেষে সর্ব্ব প্রকার বিষয় পবিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বম্ভর বোধ প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিদাকাশ স্বরূপ হইল। এতক্ষণ পরে তদীয় মন সেই অবস্থায় দৃশ্যদর্শনবর্জ্জিত হইয়া উত্তম রসায়নের ন্যায় অনন্ত উত্তমাস্বাদ স্বপ্নের ন্যায় হইল। অনন্তর সেই উদ্দালকচিত্ত দেহাদির অতীত হইয়া এরূপ কোন ভূমি (অবস্থা) প্রাপ্ত হইল যাহা আনন্দময় সাগর ও সত্তাসামান্য বলিয়া উদাহৃত হইতে পারে[৫৬।৫৯]। সেই দ্বিজচিত্ত তখন সরোবরে হংসের ন্যায় সেই সত্তাসামান্যরূপ আনন্দসাগরে অবস্থান করতঃ নির্ব্বাত দীপের অথবা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দতা প্রাপ্ত হইল[৬০।৬২]।

হে রামচন্দ্র! উদ্দালক সেই ভূরিপ্রকাশ সামান্যসত্তায় অবস্থান করিলে তদীয় সম্মুখে অমর ও সিদ্ধগণের সমাগম হইতে লাগিল[৬৩]। যাঁহারা ইন্দ্রত্বাদি পদ প্রদানে সমর্থ, তাঁহারাও সেই উদ্দালকের সম্মুখে সমাগত হইলেন[৬৪]। কিন্তু মহাত্মা উদ্দালক তাঁহাদিগকে অত্যল্পও সমাদর করিলেন না। যেমন গম্ভীর ও অক্ষুব্ধ ছিলেন, তেমনই থাকিলেন[৬৫]। সূর্য্যদেব যেমন ছয় মাস উত্তরায়ণে অবস্থিতি করেন তাহার ন্যায় মুনি উদ্দালক তাদৃশ প্রকারে ও তাদৃশ আনন্দ মন্দিরে ছয় মাস অবস্থান করিলেন[৬৬]। প্রোক্ত ছয় মাসে তিনি এরূপ জীবন্মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইলেন, যে পদে সিদ্ধ, দেব, সাধ্য, হরি, হর ও ব্রহ্মা প্রভৃতির আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। হে রাঘব! উক্ত পদ আনন্দ নিরানন্দ উভয়ের অতীত; কেননা উহা আনন্দস্বরূপ অথবা স্বরূপানন্দ[৬৭।৬৮]।

অর্থাৎ বিষয় উপলক্ষ্যে যে আনন্দের প্রাকট্য হয়, যাহা সেই আনন্দের মূল নিত্যানন্দ অর্থাৎ পরব্রহ্ম, এ পদ সেই আনন্দ। হে অনঘ! যাহারা এক বার স্বর্গ দর্শন করিয়াছে তাহারা যেমন আর পৃথিবীবাস মনোনীত করে না, তেমনি, যাহারা একবার মাত্র ক্ষণেকের জন্যই হউক, আর সহস্র বৎসরই বা হউক, উক্ত পদে স্থিতি লাভ করিয়াছে তাহারা আর ভোগরত হইবার বাঞ্ছা করে না[৬৯]। সেই পদই পদ, তাহাই সদ্‌গতি, তাহাই পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই শান্ত শাশ্বত ও শিবত্ব। ভ্রম উক্ত শান্ত শিব পদে বিশ্রামকারীর প্রতি কস্মিন্ কালেও কষ্ট প্রদান করিতে পারে না[৭০]। সাধুগণ উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াই পুনর্জ্জন্মকারিণী জাগতী দুর্দ্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন[৭১]। যেমন প্রাপ্তরাজ্য রাজা দীনতাকে হেয় জ্ঞান করে, তাহার ন্যায় উক্ত পদ প্রাপ্ত মহাত্মগণ এই দৃশ্যমণ্ডলকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন[৭২]। হে অনঘ! যাহার চিত্ত উক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করে, ও প্রবুদ্ধ হয়, তাহার চিত্ত অন্যের মহৎ প্রযত্নেও কদর্থিত হয় না এবং অনর্থেও আপতিত হয় না। অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ হইলেও তাহারা আর সংসারে অভিভূত হয় না[৭৩]।

অনন্তর উদ্দালক ছয় মাস কাল সেই আনন্দমন্দিরে বাস করতঃ সিদ্ধদিগকে তাদৃশ প্রকারে হতাদর ও বিদায় করিলে অর্থাৎ সিদ্ধগণ চলিয়া গেলে পর পুনর্ব্বার দেখিলেন, পরমা সুন্দরী রমণী, অস্মদাদি মুনি, এবং বিদ্যাধরী ও বিদ্যাধরপতিগণ তদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছে[৭৪।৭৭]। তাহারা বলিতেছে—হে ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের প্রণাম অবলোকন করুন। হে দেব! এই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রৈপিষ্টপ পুরে আগমন করুন। স্বর্গই জগৎসম্ভোগ সম্পদের একমাত্র সীমা। অতএব স্বর্গে আগমন পূর্ব্বক আকল্প ইষ্টভোগ করুন[৭৮।৮০]। হে বিভো! একমাত্র স্বর্গভোগের জন্যই অনন্ত তপঃক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। অতএব স্বর্গই জনগণের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। দেখুন, এই সমুদয় হারচামরধারিণী বিদ্যাধরবরাঙ্গনা আপনার উপাসনায় প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বর্গই ধর্ম্মার্থকামের ফলস্বরূপ, অতএব আপনি তাদৃশ পরম ফল যথাক্রমে ভোগ করুন[৮১।৮২]।

হে রঘুনাথ! সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ বার বার ঐরূপ কহিলেও উদ্দালক বিচলিতচিত্ত হইলেন না। বরং অতিথি জ্ঞান করিয়া

তাহাদিগের যথোচিত সৎকার করতঃ পুনর্ব্বার গতসম্ভ্রম অবস্থায় স্থিত হইলেন[৮৩]। সিদ্ধগণ তাঁহাকে স্বর্গে আগমন করিতে কহিলে, তিনি সেই বাক্যে অনাদর পূর্ব্বক কহিলেন, হে সিদ্ধগণ! তোমরা স্বস্থানে গমন কর, আমার স্বর্গসুখে প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার তিনি সেই স্বাত্মানন্দমন্দিরে নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ কিয়দ্দিবস সেই স্বধর্ম্মনিরত মুনির উপাসনা করিয়া তাঁহাকে ভোগবিষয়ে অতিশয় বিরতিপ্রাপ্ত দর্শন করতঃ অগত্যা স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। সিদ্ধগণ প্রতিগমন করিলে উদ্দালক জীবন্মুক্ত হইয়া যথাসুখে কখন অরণ্যে কখন মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে বিহার করিতে থাকিলেন। কখন ধ্যানাসক্ত হইয়া মাসান্তে প্রবুদ্ধ, কখন বর্ষান্তে ও কখন বা বহুবর্ষান্তে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন। সেই সমাহিত মুনি সেই অবধি ব্যবহারনিরত হইয়াও সমাধি অভ্যাসদ্বারা চিত্তত্ত্বের সহিত একীভূত, তৎপরে চিত্তত্বাভ্যাসদ্বারা মহাচিদ্রূপতা, তৎপরে মহাচিদভ্যাসদ্বারা চিৎসামান্যতা ও চিৎসামান্যের অভ্যাসদ্বারা সত্তাসামান্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার সেই সত্তাসামান্যস্বরূপ দেহ শমপদ প্রাপ্ত, সংশান্তচিত্ত, বিগলিতজনন, ক্ষীণসন্দেহ ও অমলচেতা হইয়া শরদাকাশের ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছিল[৮৪।৯৩]।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

—০()*()০—

রামচন্দ্র কহিলেন, প্রভো! আপনি আত্মজ্ঞানরূপ দিবসের সূর্য্য, সংশয়রূপ তৃণের অনল, অজ্ঞানদাহের শীতাংশু। হে ঈশ! তাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্তাসামান্য কি? বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! চিত্ত যখন ভাবনার (চিন্তনের) অভাব প্রযুক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন যে চিৎ পদার্থের স্বরূপ প্রকট প্রাপ্ত হয়, সেই সারূপ্য প্রাপ্ত চিৎপদার্থকে আমরা সত্তাসামান্য বলিয়া থাকি। সেই চেত্যাংশরহিত (চেত্য= পদার্থাকারতা) চিৎ যখন আত্মায় অবশেষিত হয়, তখন সেই চিৎ অতিশয় নির্ম্মল সামান্যসত্তা বলিয়া অভিহিত হন। (অর্থাৎ সে অবস্থা অবুদ্ধ লোকের দুর্জ্ঞেয়। অবুদ্ধ লোকে বুঝিবে, তাহা না থাকার ন্যায়।) যখন চিত্ত সমুদয় বাহ্যাভ্যন্তরস্থ দর্শন স্পর্শনাদি পরিত্যাগ করে, তখনই আমরা তাহাকে চিৎসামান্য ও সত্তাসামান্য সংজ্ঞা দিয়া থাকি। যখন অশেষ দৃশ্য বস্তু আত্মার দ্বারা আত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়, যখন চিত্তের কোন প্রকার ভাবনা থাকে না, চিৎ তখন সামান্যসত্তা নামে উদাহৃত হন। হে রামচন্দ্র! যখন সমুদায় দৃশ্য দৃশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া সত্তা-সামান্যরূপে পর্য্যবসিত হয় তখন সে ভাবকেও আমরা সত্তাসামান্য বলি[৭]। এই দৃষ্টি তুর্য্যাতীত পদের সহিত সমান। সুতরাং জীবন্মুক্তে ও বিদেহমুক্তের সহিত সমান। অপিচ, এই বোধভবা দৃষ্টি অজ্ঞ জনের সম্ভবে না[৮]। যাহারা জীবন্মুক্ত ও মহাশয়, তাহারাই উক্ত দৃষ্টিতে অবস্থান পূর্ব্বক বায়ু যেমন আকাশে নির্লিপ্ত ভাবে ও অব্যাহত গতিতে বহমান হয় তাহার ন্যায় এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমি, নারদ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি উক্ত দৃষ্টি অবলম্বনে অবস্থিত আছি[১০]। মহাত্মা উদ্দালকও উক্ত ভবভয়নাশিনী দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া যাবৎ ইচ্ছা তাবৎ এই জগতে বাস করিয়াছিলেন[১১]।

হে মহাবাহো! বহু কাল পরে উদ্দালকের এইরূপ বুদ্ধি সমুপস্থিত হইল যে, "আমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেহমুক্ত হইয়া অবস্থান

করিব"১২। অনন্তর তিনি এক পর্ব্বত গুহায় পল্লবাসনে বদ্ধপদ্মাসন ও নিমীলিতনেত্র হইয়া অবস্থান করতঃ নবদ্বার রোধ ও শব্দাদি বিষয় অবগাহিনী মনোবৃত্তির উপসংহার করিলেন; এবং আপনার চিন্ময়তা মাত্র চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ ও নিশ্চল, গ্রীবাদেশ অবক্র, জিহ্বাগ্র তালু মূলে অর্থাৎ কণ্ঠ ছিদ্রে প্রবিষ্ট, দন্ত দন্তান্তরের সহিত অসংলগ্ন হইল। তাঁহার মনের গতি ও নেত্রের দৃষ্টি বাহিরে অন্তরে অধঃ বা উর্দ্ধে এবং রূপ রস প্রভৃতি বিষয়ে অসংযোজিত হইল; তাহাতে তিনি এক অনির্ব্বাচ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন১৩।১৬। প্রাণের নিস্পন্দতায় তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ, এবং আনন্দাবির্ভাবের প্রভাবে মুখচ্ছবি স্বচ্ছ ও প্রসন্ন, এবং অঙ্গ সকল পুলকিত হইয়াছিল১৭। যে চিৎ তদীয় অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, সেই চিৎ অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য একণে তদীয় অন্তরে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বৃত্তিরূপ উপাধির বিলয়ে কেবল হইয়া রহিয়াছে। তৎক্রমেই তিনি মহান্ অখণ্ড আত্মসত্তামাত্রে স্থিতি লাভ করিলেন১৮।১৯। উদ্দালক তাদৃশ সত্তাসামান্যাবস্থানরূপ শান্তি ভোগ করিয়া যার পর নাই উৎকৃষ্ট বিশ্রাম লাভ করিলেন। এবং অতুলানন্দ প্রাপ্ত হওয়ায় অতুল সুখসৌন্দর্য্যও ধারণ করিলেন২০। চিরকালের নিমিত্তই তাঁহার মননাদি ও সংস্কারভাব পরিত্যক্ত হইল২১। তিনি অভিহিত ক্রমে মহাসত্ত্ব হইয়া চিত্রিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন২২। ঐরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইল। যেমন শরৎকালের অবসানে সূর্য্যতেজে তরুরসের ক্ষয় আরব্ধ হয় তাহার ন্যায় সেই মুনির বিমলাত্মায় জন্মদশাদি সমুদয় দশা প্রশান্ত হইল২৩। তিনি সকল বিকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প হইলেন, বিষয়ারাম পরিত্যাগে আত্মারাম হইলেন, মনন রূপ উপাধির বিনাশে নিরুপাধি হইলেন, বাহ্যসুখ বিগলিত হওয়ায় নিষ্কলঙ্ক মূলীভূত সুখ প্রাপ্ত হইলেন২৪। হে রামচন্দ্র! মহাত্মা উদ্দালক উক্ত প্রকারে অপরিমিত, ব্যোমব্যাপী, পূর্ণ, ত্রিভুবনতারণ, ভূরিভাব্য, জ্ঞানিজনোপসেব্য, বাগিন্দ্রিয়াদির অতীত, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, সুখস্বরূপ, ও আদিস্বরূপ পদ লাভ করতঃ সেই পর্ব্বত শৃঙ্গে ছয় মাস চণ্ডরশ্মির প্রচণ্ড কিরণে উপবিষ্ট থাকায় রবিকর তাপে তদীয় দেহ অল্পে অল্পে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল২৫।২৬।

রঘুনাথ! উদ্দালকের সেই শুষ্ক দেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই পর্ব্বত শিখরে সেই অবস্থায় ছিল। পরে একদা পার্ব্বতী দেবী মাতৃগণ সমভিব্যাহারে কোন ভক্তের অভিলাষ পূরণার্থ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিয়া উদ্দালকের সেই শুষ্ক কঙ্কাল দেখিতে পাইলেন। সমাগত মাতৃগণের মধ্যে চামুণ্ডা দেবী সেই কঙ্কালকে স্বীয় কিরীট শোভা বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিলেন। উদ্দালকের শুষ্ক কঙ্কাল আজ্ দেবীর শিরোগত কিরীটের প্রান্তস্থ হইল[২৭,২৯]।

হে রঘুপতে! যে ব্যক্তি উদ্দালক ঋষির এবম্বিধ বৃত্তান্ত নিরন্তর শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে অনুশীলন করে সে ব্যক্তিরও হৃদয় কাননে বিবেকবল্লী অঙ্কুরিতা হইয়া উপযুক্ত কালে তাহা নির্ব্বাণ ফল প্রসব করিয়া থাকে[৩০]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পদ্মপত্রাক্ষ! উদ্দালক যে প্রকারে আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে তুমিও আত্মবিচার করতঃ বৈরাগ্যাভ্যাস ও সমাধি প্রভৃতির দ্বারা বিতত পদে বিশ্রান্ত হও[১]। যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় ও পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাবৎকাল শাস্ত্রার্থ বিচার, গুরূপদেশ শ্রবণ ও স্ব-চিত্তসংশোধন করা কর্ত্তব্য[২]। বুদ্ধি, বিচার দ্বারা প্রবোধবতী ও সুতীক্ষ্ণা হইলেই শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[৩।৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! কোন কোন লোক অগ্রে জাত-সমাধিক, পশ্চাৎ সমাধি ত্যাগ করতঃ প্রবোধ প্রাপ্ত, তৎপরে ব্যবহারে রত হন অথচ তাঁহারা সাংসারিক ক্লেশাদিতে বিশ্রান্ত বা বিমুক্ত থাকেন। আবার ইহাও দেখা যায়, কোন কোন লোক একান্তে সমাধিরত হইয়াই থাকেন, ব্যবহার রত হন না। হে ব্রহ্মন্! এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাকে বলুন[৫।৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই মায়িক বিশ্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা যে অন্তঃ-শীতলতা জন্মে, সেই অন্তঃশীতলতাই উত্তম সমাধি। (তাহাই যোগ-শাস্ত্রোক্ত নিরোধ সমাধির উদ্দেশ্য বা ফল। এবং তাহাই এতৎশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানেরও ফল বা উদ্দেশ্য)। কোন কোন মহাত্মা অভিহিত লক্ষণ সমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহারা "আমার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ নাই, এ সকল মনেরই কল্পনা, সুতরাং মনের সহিতই এ সকলের সম্বন্ধ" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত থাকেন তাঁহারাও মহা-পুরুষ। তন্মধ্যে কেহ ব্যবহার রত ও কেহ বা ধ্যানরত থাকেন সত্য পরন্তু যখন উভয়েরই অন্তর শীতল, তখন উভয়েই সমান। * হে

---

* উভয়েই অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত সত্য; পরন্তু তদবস্থা লাভের উপায় ব্যক্তি ভেদে অসমান। কেহ কেহ দৃশ্য মিথ্যাত্ব বোধ নিশ্চল রাখিতে অক্ষম হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা দৃশ্য সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত হন, কেহ বা কেবল

প্রাজ্ঞ! অন্তঃশীতলতাকেই তুমি অনন্ত তপঃফল বলিয়া জানিবে। সমাধিস্থ ব্যক্তির চিত্ত যদি চঞ্চল থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই সমাধান উন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্যতুল্য হয়। আর যদি উন্মত্ত ব্যক্তির চিত্ত ক্ষীণবাসন হয় তাহা হইলে তাহার বাহ্যিক উন্মাদনৃত্যও ব্রহ্মসমাধির তুল্য হয়। প্রবুদ্ধ অরণ্যবাসী ও প্রবুদ্ধ সংসারস্থ ইহারা উভয়েই তুল্য; যে হেতু উঁহারা উভয়েই অসন্দেহ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[১১,১২]। যেমন দূরগতচিত্ত নিকটস্থ বাক্য শুনিতে পায় না, সেইরূপ, ক্ষীণবাসন ব্যক্তি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম করা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই কর্ম্মের ফলভাগী হয় না[১৩]। গভীর গর্ত্তে নিপতিত নহে অথচ স্বপ্নে যেমন গর্ত্তপতন অনুভূত হয়, তাহার ন্যায়, তদ্রূপ বাসনাবলিত ব্যক্তি কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মকর্ত্তা হয়[১৪]। চিত্তের যে অকর্ত্তৃত্ব তাহাই উত্তম সমাধি, তাহাই অদ্বৈতভাব ও তাহাই পরমা নির্ব্বৃতি (সুখ)[১৫]। চলাচলত্ব প্রযুক্ত চিত্তই সকল পদার্থের কারণ। অতএব, তুমি ধ্যান ও অধ্যান প্রভৃতি বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে অঙ্কুরশূন্য করিবে[১৬]। বাসনাশূন্য ও স্থিরত্ব প্রাপ্ত যে মন, সেই মন পরম ধ্যান ও পরম পদ প্রাপ্তির কারণ। অপিচ তাহাই কেবলীভাব, তাহাই শান্তভাব, তাহাই অত্যুচ্চ পদবী প্রাপ্তির সোপান এবং তাহা হইতেই অকর্ত্তৃ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৭,১৮]। যে হেতু বাসনাবৃত মন কর্ত্তৃত্ব পদের ভাজন ও সর্ব্বদুঃখ প্রদ, সেই হেতু বাসনা ক্ষয়ের জন্য সতত উদ্‌যুক্ত থাকিবে[১৯]। মুনিগণ বলিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা আত্মা জগতের প্রতি আস্থাশূন্য, শোকভয়াদিরহিত ও স্বস্থ হয় তাহাই উত্তম সমাধি[২০]। অতএব হে মননশীল রাম! তুমি জগৎ সম্বন্ধীয় সমুদয় ভাবাভাব পরিত্যাগ করিয়া শৈলে অথবা গৃহে যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই থাকিতে পার[২১]। সুসমাহিতচিত্ত ও অহঙ্কারশূন্য গৃহস্থের গৃহই অরণ্য[২২]। যাহারা তোমাদের ন্যায় সদা সমাহিত তাহাদের নিকট অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান[২৩]। শান্তচিত্ত ব্যক্তির নিকট নগরও জনশূন্য অরণ্য[২৪]। হে শত্রুনাশন রাম! যাহাদের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান, অরণ্যও তাহাদের নিকট বহুজনসমাকীর্ণ মহানগর[২৫]। রাগাদির দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমেই

মাত্র জ্ঞানশাস্ত্রোক্ত বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিয়া দৃশ্যমিথ্যাত্ব বোধ দৃঢ় করতঃ দৃশ্যাতীত হইয়া অন্তঃশীতলতায় স্থিতি করেন।

বৈষয়িক ভ্রমে নিমগ্ন হয় এবং বাসনাক্ষয়ী চিত্ত নির্ব্বাণ পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা হয় নির্ব্বাণ পদবী অবলম্বন কর, এবং ইচ্ছা হয়, ভ্রান্তি ভ্রমণের পথে অবস্থান কর[২৬]। যে ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বদা সর্ব্বভাবাতীত ও সর্ব্বাত্মক দর্শন করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সমাহিত[২৭]। যে পুরুষের অন্তরে রাগ দ্বেষ নাই এবং সমুদায় ভাব (পদার্থ) যাহার নিকট সমান, সেই পুরুষই প্রকৃত সমাহিত[২৮]। যে পুরুষের মন স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় কালে এ সমুদায়কে সদা সৎ পরমাত্মার বিকাশ বলিয়া বিজ্ঞাত, তাহারাও সমাহিত[২৯]। যেমন হট্টসমবেত বহুলোক আপন আপন কার্য্য করে অথচ পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকে তাহার ন্যায় ঐ সকল মহাপুরুষেরা বাহিরে ব্যবহার পরায়ণ হইলেও অন্তরে উদাসীন থাকেন। যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট গ্রামও অরণ্যের সমান। (অর্থাৎ যে জন্য অরণ্য গমন বিহিত সে উদ্দেশ্য তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ)[৩০]। যাহাদের মন অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ আত্ম-দর্শনরত, তাহারা নগর, জনপদ, গ্রাম, সর্ব্বত্রই অরণ্যতুল্য দেখেন[৩১]। যাহারা সর্ব্বদা অন্তর্ম্মুখা স্থিতি লাভ করিয়াছে (আত্মসংস্থ হইয়াছে) তাহাদের দৃষ্টি এই জনসঙ্কুল পৃথিবীকে আকাশ তুল্য দর্শন করে এবং তাহাদের অন্তরেও পরম শীতলতা অবস্থান করে সুতরাং তাহার নিকট সমুদয় জগৎ শূন্যস্বরূপ ও পরম শীতল হয়। কিন্তু যাহাদিগের অন্তর তৃষ্ণাগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত তাহাদিগের নিকট কি বন, কি সংসার, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই দাবাগ্নিতপ্ত।

অতএব হে রাজপুত্র! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী ও দিঙ্মণ্ডল প্রভৃতি দৃশ্যকে চিত্তের বাহ্য ভাগ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ যেন ঐ সকল, চিত্তের বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় বটে; পরন্তু সে বোধ অসত্য। ফলতঃ ঐ সকল চিত্তেরই অন্তর্গত, ইহাই সত্য[৩২,৩৩]। পুষ্পের অন্তর্গত গন্ধ পুষ্পবিকাশে বাহিরে প্রকটিত হয় এবং বটবীজের অন্তঃস্থ বটই বহির্ব্বিভাগে বিস্তৃত হয়। তাহার ন্যায় স্বীয় অন্তর্গত সৎ বস্তুতঃ আত্মাই এই সকল বহির্ব্বস্তুর আকারে চিত্তের দ্বারা প্রকটিত হই য়াছেন। এ সকল বহিঃস্থ নহে, অন্তঃস্থও নহে, স্বরূপতঃ এ সকলের অস্তিতাও নাই। চিত্তের দ্বারা বা চিত্তের কল্পনায় যাহা যখন যে বেশে উৎপন্ন বলিয়া স্থির হয় তাহার তত্ত্ব তখন সেই রূপেই গৃহীত হয়[৩৬,৩৭]।

অতএব, আত্মতত্ত্ব নামক আন্তর বস্তুই বাহিরে জগদ্রূপে দৃষ্ট হওয়ার বিষয় বেদে বর্ণিত হইয়াছে। সে বর্ণনার মর্ম্ম—আত্মাই অহং ও জগৎ এই দ্বি প্রকারে স্ফুরিত হইতেছে। আত্মা স্বসন্নিধানস্থ চিত্তকেই তত্তৎ বাসনানুসারে চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্জ্জগৎ এবং অন্তরে স্বপ্নাদিরূপ আন্তর জগৎ দর্শন করেন[৩৮।৩৯]। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বাহ্য ও আন্তর এই দ্বিবিধ জগৎ একই সদাত্মার দৃশ্য সুতরাং যদি উক্ত উভয় সদাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্কৃত হয় অর্থাৎ সদাত্মার অদৃশ্য হয় তাহা হইলে উক্ত দ্বিবিধ জগতের নাস্তিতা স্বতঃই প্রকটিত হইবে। অতএব, সৎস্বরূপ আত্মাই চিত্তরূপ আধির (অন্তরস্থ ব্যাধির) দ্বারা অভিহতপ্রভ (স্বপ্রকাশ ভাবের বিপরীতে অপ্রকাশভাব প্রাপ্ত) হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদ, নদী, সমুদ্র, ও কল্প প্রভৃতি কাল সুসম্পন্ন করিয়াছে। এই কারণে বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অন্তর সদা সৎস্বরূপ আত্মায় রত, তিনি লোক দৃষ্টিতে অঙ্গ পরিচালনাদির দ্বারা বাহ্য ক্রিয়া সমুদয় সম্পাদন করিলেও সমাধিস্থ ও হর্ষশোকাদির অবশীভূত[৪০।৪৩]। অপিচ, যিনি প্রশান্তবুদ্ধি হইয়া অন্তরে সর্ব্বগত আত্মা সন্দর্শন করেন, হর্ষশোকাদির অনুসন্ধান না করেন, তিনি বাহিরে কর্ম্ম করিলেও সমাহিত[৪৪]। যিনি এই জগতের পূর্ব্বাপর অবস্থা বুদ্ধিযোগে দর্শন করতঃ জগৎ দৃষ্টির প্রতি উপহাস করেন তিনিও সমাহিত[৪৫]। তাহার হাস্যের কারণ এই যে, তিনি দেখেন, অহন্তা মমতা এবং জগতের উৎপত্তি বিনাশ সমস্তই ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ। কেননা, ইহার কিছুই পরমাত্মায় স্থিত নহে[৪৬]। দ্রষ্টা অর্থাৎ জীব বিভিন্ন, এ বোধ অর্থাৎ তুমি আমি তিনি, এ সকল ভেদ ভ্রান্তির মহিমা বা ফল[৪৭]। এতদ্ভিন্ন যিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া শাস্ত্রের অবিরোধী কার্য্যে দেহপরিচালনাদি করেন, এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় হর্ষ শোক অমর্ষের অতীত হন, তিনিই যথার্থ শান্ত পুরুষ[৪৮]। যিনি সর্ব্বজীবে স্ব-স্বভাবে আত্মদর্শন ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী[৪৯]। যাহারা অজ্ঞ তাহাদেরই নিকট হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য অতনু অর্থাৎ অতিবিশাল। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের নিকট তাহা অতিতুচ্ছ[৫০]। তাদৃশ পুরুষ থাকুন, আর যাউন, মরুন আর বাঁচুন, ভোগ্য পূর্ণ গৃহে বসতি করুন, আর না করুন, জনপূর্ণ

গৃহে অথবা জনশূন্য অরণ্যে অবস্থান করুন, কামচেষ্টায় ও মদ্যাদি পানে নর্ত্তন করুন, বা তদতীত হউন, সসঙ্গী থাকুন, অথবা অসঙ্গ হইয়া গিরিগুহায় বাস করুন, চন্দনাদি অনুলেপন অথবা ভস্ম গ্রহণ করুন, পাপ কার্য্য অথবা মহাপুণ্য কর্ম্ম করুন, তিনি অদ্যই মৃত হউন, বা কল্পান্তজীবী হউন, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার নিকট সে সকল কিছুই নহে। তিনি কিছুই করেন নাই, করেন না ও করিবেন না। যেমন পঙ্কস্থ কনক মলিন হয় না, সেই প্রকার তিনি কোনও কিছুতে মলিন হন না[৫১।৫৬]। কলঙ্ক লিঙ্গশরীরকেই দূষিত করে সুতরাং তাহা লিঙ্গশরীরাভিমানী (অহং মম অভিমানধারী) অজ্ঞ পুরুষেই প্রকাশ পায়। অতএব, সর্ব্বমিথ্যাত্ব বোধের দৃঢ়তা ও সম্যক্ জ্ঞানের উদয় কলঙ্ক মার্জ্জনের প্রধান উপায়[৫৭।৫৮]। তুমি আমি ইত্যাদি ভেদবাসনা (সংস্কার) অনর্থ সমূহের প্রসূতি। বিচিত্র সুখ দুঃখ ও জন্ম প্রভৃতি ঐ সকল ভেদবুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন হয়[৫৯]। রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয় তাহা নিবৃত্ত হইলে তখন আর সর্প দর্শন হয় না। সেইরূপ, অহং ভাবের শান্তি হইলে তখন আর ভেদবুদ্ধি থাকে না[৬০]। কর্ম্ম করণ, ভোজন, দান, হোম, এ সকল তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে নিষ্কাম। তিনি ঐ সকল করুন বা না করুন, কিছুতেই তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না[৬১]। কর্ম্মে তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও তাহাতে তাঁহাদের কোনও ফলোদয় হয় না[৬২]। যেমন উপলখণ্ডে পত্রাঙ্কুরাদি জন্মে না সেইরূপ তাঁহাতে ইচ্ছার বা বাসনার উদয় হয় না। তিনি আত্মজ্ঞ, যৎপরোনাস্তি পবিত্র, দ্বৈতজ্ঞানহীন, মহাত্মা ও আত্মস্বরূপ হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ আত্মাতেই অবস্থান করেন[৬৩।৬৪]।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মরিচ যেমন স্বতঃই তীক্ষ্ণস্বভাব, তেমনি, আত্মাও স্বতঃ চিৎস্বভাব। সেই চিৎস্বভাব আত্মা আপন জ্ঞাততার অভাবে তুমি আমি ও জগৎ প্রথায় প্রথিত হইতেছেন[১]। যে আত্মচৈতন্য "মরিচ তীক্ষ্ণ—বড় ঝাল" এইরূপ বোধে বিবর্ত্তিত হইতেছে সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি জগৎ এবম্বিধ বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছে। যে চেতনা "ইহা লবণ" এইরূপ জ্ঞানে বিবর্ত্তিত হইতেছে সেই চেতনাই এই তুমি এই আমি এই জগৎ এবম্বিধ বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন[২]। "ইক্ষু মধুর" এই সংবেদন যে আত্মচৈতন্যের বিজৃম্ভণ, তুমি আমি জগৎ, এ সকল অনুভবও সেই আত্মচৈতন্যের বিজৃম্ভণ[৩]। যে চেতনা প্রস্তরানুগত হইয়া কাঠিন্য প্রথা বিস্তার করিতেছে, সেই চেতনাই তুমি আমি জগৎ ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে[৪]। যে আত্মচৈতন্য "পর্ব্বত গুরুভার" এইরূপ বুঝিতেছে, সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি ও জগৎ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিতেছে[৫]। ঐরূপ, যে আত্মা জলভাবান্বিত হইয়া দ্রবত্ব বোধের অধীন হইয়াছেন, সেই আত্মাই তুমি আমি জগৎ ও দেশ কালাদিরূপে প্রথিত হইতেছেন[৬]। যে আত্মচেতনা বৃক্ষের আকারে প্রকটিত হইয়া শাখা পল্লবাদি অনুভব করিতেছে, সেই আত্মচেতনাই তুমি আমি ইত্যাদি প্রকারে ভেদজ্ঞানবান্ হইয়া স্ফুরিত হইতেছেন[৭]। বহিরাকাশের শূন্যতা ও দ্রব্যান্তর্গত গগনের ছিদ্রতা, ঘটকুম্ভাদির নিবিড়তা, এ সমস্তই সেই আত্মচেতনার বিবর্ত্তন[৮।১০]। যে আত্মসত্তা সমাধ্যাদি কালে একত্বে পর্য্যবসিত হয় সেই আত্মসত্তা আবার সংসার দশায় বহুর ন্যায় অথবা বহু জীব হইয়া এই বিশ্বাগারে নৃত্য করেন[১১]। অন্তরাত্মার প্রকাশের যে নিরুপাধিক অবভাসন, তাহাই আজ্ সাংসারিক ভাব অর্থাৎ চিত্ত, অহং ও জীব প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেছে[১২]। অন্তরাত্মারূপ চন্দ্রের যে চিদ্রূপ অমৃত, সেই চিদ্রূপ অমৃতই আজ্ অহন্তাদি রূপে উদিত

হইয়া তদাস্বাদনে রত হইয়াছে। মণির দীপ্তি মণিতেই প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় অহন্তাদি সমুদয় পরমাত্মাতেই সমুদিত হয়। পরমাত্মাই আগে অহন্তাবে ভাবিত, পরে তাহাতে তাহার আস্বাদের উদয় (তাহাও পরমাত্মার উদয়), তৎপরে তাহার গ্রহণ বা অগ্রহণ (তাহাও পরমাত্মার প্রকারান্তরতা প্রাপ্তি)[১৩।১৫]। অতএব, চিত্তাদি সমুদায় পরমাত্মারই মায়িক আভাসমাত্র। সুতরাং বাস্তবতঃ আস্বাদ ও আস্বাদক এ সকল ভেদ নাই। স্বাদ্য স্বাদক না থাকায় বাস্তবতঃ কেহই কিছু আস্বাদন করে না। এইরূপ, বেদ্যের ও বেদকের (জ্ঞাতব্যের ও জ্ঞাতার) অসদ্ভাব প্রযুক্ত কেহ কিছুই বিদিত হয় না। চেত্যের অসদ্ভাব বশতঃ অর্থাৎ চেত্য না থাকায় কেহ কিছুই চিন্তা করে না[১৬।১৭]। ফলতঃ একমাত্র অসদাভাস উপাধিনির্ম্মুক্ত সর্ব্বব্যাপী আত্মাই অনন্তাকৃতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে রঘুনাথ! আমি কেবল তোমার বোধ বর্দ্ধনের নিমিত্তই নানাপ্রকার বাক্‌ভঙ্গীর দ্বারা তোমার নিকট অহং মম ও দুঃখাদির অসদ্ভাব বর্ণনা করিলাম। ফলতঃ অহং বল, চিত্ত বল, আর জগদাদি বল, নাম ব্যতীত বস্তু কিছু নাই। জলে দ্রবত্বের ন্যায় ও বায়ুতে স্পন্দতার ন্যায় অহন্তাদি জ্ঞপ্তিতেই অবস্থান করে। যেমন সেই দ্রবত্ব জলভিন্ন নহে, তদ্রূপ অহন্তাদিও জ্ঞপ্তিভিন্ন নহে[১৮।২২]। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নির্ম্মল ও অনাবরণ জ্ঞানী, সেই নিমিত্ত তিনি জ্ঞানের বিবৃদ্ধি বশতঃ সর্ব্বদা অভিহিত তত্ত্ব বিদিত আছেন। অহংমমাভিমানী স্থূলদেহধারীরা দেহাদির প্রতি অধ্যাস কারণে উক্ত রহস্য বিদিত নহে[২৩]। ভ্রান্তিমান্ জীব যেমন যেমন ভ্রমে নিমগ্ন থাকিয়া ভজনাদি ব্যাপারে লিপ্ত হয়, ঈশ্বরও তাহার নিকট সেই সেই প্রকারে প্রকটিত হন[২৪]। অতএব, যে হেতু ঈশ্বর ও জীব উভয়ই চিদ্রূপ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীব ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। জীবের কথাই বল, আর জীবভোগ্য বিষয়ের ও তদাধারভূত জগতের কথাই বল, চরমে (তত্ত্বজ্ঞান হইলে) সকলেরই চিদ্রূপতা পরিশেষিত হয়[২৫]। যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নাই, তেমনি, বেদান্তোক্ত প্রাজ্ঞ তৈজসাদি বিভাগেরও বস্তুতঃ ভেদ নাই। ভেদ বোধ উত্থাপনকারী অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে এক অখণ্ড পূর্ণানন্দ একরসরূপ সাম্রাজ্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে[২৬]। অতএব, বুঝা উচিত যে, সমুদায় জগৎ পূর্ণ স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, বিষয়রূপ চিহ্নবর্জ্জিত, সুতরাং মহৎ ব্রহ্ম[২৭]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি এই স্থলে কিরাতাধীশ সুরঘুর উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উপাখ্যানটী অতিপ্রাচীন ও বিস্ময়প্রদ[১]।

উত্তর দিকে হিমালয়নামক পর্ব্বতের কর্পূরধবল কৈলাস নামে এক শৃঙ্গ আছে। বিষ্ণুর ক্ষীরসমুদ্রের ন্যায়, শচীপতির স্বর্গের ন্যায় ও ব্রহ্মার নাভিপদ্মের ন্যায় সেই কৈলাসশিখর শশিমৌলীর গৃহস্বরূপ[২।৪]। এই কৈলাস রুদ্রাক্ষ বৃক্ষে সুশোভিত এবং অপ্সরোগণে পরিবৃত। এই স্থান প্রমথগণের ও তাহাদের নারী গণের বিহরণ ভূমি (প্রমথগণ=শিবপার্ষদগণ)[৫।৬]। ভগবান্ শঙ্কর ইহার যে বিভাগে সর্ব্বদা সঞ্চরণ (গতিবিধি) করেন, সেই বিভাগের উচ্চ স্থান হইতে নিরন্তর নির্ঝর বারি নিপতিত হয়[৭]। এই কৈলাস লতা বৃক্ষ ও গুল্ম প্রভৃতির দ্বারা, বাপী হ্রদ নদ ও নদীর দ্বারা এবং বিবিধ মৃগ ও অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা সর্ব্বদা সেবিত হয়[৮]। ঈদৃশ কৈলাস শৃঙ্গের পাদ দেশে হেমজটা নামে কতক গুলি কিরাত বাস করিত[৯]। তাহারা ঐ পর্ব্বতের পাদশৈলস্থ অরণ্য হইতে রুদ্রাক্ষ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ দ্বারা সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত[১০]। সুরঘু নামে এক ব্যক্তি তাহাদিগের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ অতিবলশালী রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য বিভবে গুহ্যকনায়ক কুবের অপেক্ষাও ধনশালী ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত। নৃপতি সুরঘু স্বীয় প্রতাপে সুরগণের ঘোর শত্রু অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির, কাব্যরসে ও নীতি বিষয়ে শুক্রের সদৃশ ছিলেন এবং পরাক্রমে মূর্ত্তিমান্ মারুতের ন্যায় ছিলেন[১১।১৩]। দিবাকর যেমন দিন প্রবর্ত্তনে অশ্রান্ত, তাহার ন্যায় সুরঘু রাজকার্য্যে অশ্রান্ত। রাজকার্য্য করিতে যে পরনিগ্রহ ও পরানুগ্রহ করিতে হইত তজ্জনিত দুঃখে ও সুখে সময়ে সময়ে তিনি অভিভূত হইতেন[১৪।১৫]। সুরঘু কিছু দিন ঐরূপে প্রজাপালন করিলে, একদা কোন দুষ্ট ব্যক্তিকে নিগ্রহ

(পীড়ন) করিতে গিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অহো! আমি কি নিমিত্ত ইহাকে পীড়ন করিতেছি! আমি যেমন পীড়নে দুঃখানুভব করি, অন্যান্য প্রাণীও পীড়নে সেইরূপ দুঃখানুভব করে[১৬]। অতএব, পীড়নে প্রয়োজন নাই। পীড়ন না করিয়া ইহাকে কিছু ধন দেওয়া যাউক। কেননা, আমি যেমন ধনে সন্তুষ্ট হই, সেইরূপ, সমস্ত ব্যক্তিই ধনে সন্তুষ্ট হয়। লোককে সন্তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। পরক্ষণেই মনে হইল, তাই করা উচিত? কি দুষ্ট নিগ্রহ করা উচিত? দুষ্টের নিগ্রহ না করিলে প্রজা পুঞ্জের কষ্টই বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুষ্ট দমন করা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ে তিনি সন্দিহান হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করা যায়? ইহাকে নিগ্রহ করিলেও কষ্ট ও অনুগ্রহ করিলেও কষ্ট। নিগ্রহ দ্বারা ইহার কষ্ট এবং অনুগ্রহদ্বারা প্রজাবর্গের কষ্ট[১৭।১৯]।

নৃপতির চিত্ত উক্ত প্রকারে দোলায়িত হইতে লাগিল। কোন এক পক্ষে সুস্থির হইল না। ঘূর্ণিতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির চিত্ত যেমন মহাসলিলাবর্ত্তে ভ্রমণ করে, বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ, তদীয় চিত্ত একবার নিগ্রহ বিষয়ে ও অন্যবার অনুগ্রহ বিষয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিল[২০]। একদা মাণ্ডব্য মুনি নারদমুনির ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নৃপতির বাসভবনে সমাগত হইলেন[২১]। সুরঘু সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ! হে মহামুনে! আপনিই আমার সর্ব্বসন্দেহবিষবৃক্ষের সুশাণিত পরশু। ভবদীয় সমাগমে আজ্ আমি পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। যখন ভবাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তির সদয় নেত্র আমাকে অবলোকন করিয়াছে, তখন আমি অদ্য অবশ্যই আমাকে ধন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণনা করিতে পারি[২২।২৪]। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সকল সংশয়ের বিনাশক। এক্ষণে আপনার শ্রমাপনোদন হইয়াছে। সেইজন্য আমি আপনাকে কিছু বলিতে চঞ্চল হইতেছি। অতএব আপনি অদ্য ভাস্করের তিমিরাপহরণের ন্যায় আমার সংশয় অপহরণ করুন[২৫]। হে সর্ব্বজ্ঞ! আর্ত্তিবিদ্ প্রাজ্ঞগণ সন্দেহকে মহতী পীড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি সেই সন্দেহরূপ আর্ত্তিদ্বারা অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়াছি।

তাই আমার প্রার্থনা—আপনি আমার আর্ত্তি নিরাকরণ করুন। হে মহাত্মন্! মহাত্মগণের সঙ্গমে সকল আর্ত্তিই সূর্য্যাগমে অন্ধকারের ন্যায় পলায়ন করে। হে মুনে! সিংহনখদ্বারা মাতঙ্গের ন্যায় নিগ্রহানুগ্রহ-সমুদিত চিন্তাদ্বারা আমি সাতিশয় আকৃষ্ট ও পীড়িত হইতেছি। অতএব, হে মান্য! যদ্দ্বারা আমার মতি হইতে সন্দেহ দূরীভূত ও তাহাতে সমতা সমুদিত হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার বিধান করুন[২৬।২৮]।

মাণ্ডব্য বলিলেন, ভূপতে! সন্দেহাদিরূপ মনোদৌর্ব্বল্য কেবল স্বীয় পৌরুষ, প্রযত্ন, ও আত্মবিজ্ঞান দ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৯।৩০]। অতএব, হে রাজন্! তুমি মনোদ্বারা স্বশরীরগত ইন্দ্রিয়গণের বিচার কর। "তোমার ইন্দ্রিয়গণ কি, তাহারা কিরূপ, তুমি কে, আমি কে, মৃত্যু কি, জন্মই বা কি, এই জগৎ কি, কি প্রকারেই বা ইহার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়" এই সমুদয় বিচার কর, আশু মহত্ত্বা প্রাপ্ত হইবে[৩১।৩২]। ঐ সকল বিষয় বিচার করিতে করিতে আত্মস্বভাব পরিজ্ঞাত হইবে, তাহাতে তোমার চিত্ত আর কদাপি হর্ষবিষাদাদি প্রাপ্ত হইবে না[৩৩]। তখন তোমার মন বিজ্বর ও সমতা প্রাপ্ত হইবে। হে অনঘ! তোমার মন সমতায় অবস্থিত হইলেই তুমি কল্পনাকলঙ্কবিহীন ও শমতা প্রাপ্ত হইবে। তখন তোমার চিত্ত মহত্ত্বা প্রাপ্ত হইয়া বারণ যেমন গোষ্পদে মগ্ন হয় না তেমনি তুমিও সংসারবৃত্তিতে নিমজ্জিত হইবে না[৩৪।৩৮]। মনঃই কার্পণ্য দোষে (কার্পণ্য=কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারা) গোষ্পদে মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র বৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়[৩৯]। চিত্ত আপনার দীনতার দ্বারা বাসনানুগা দৃশ্যে কীটের ন্যায় নিমগ্ন হয়[৪০]। অতএব হে মহাবাহো! মন যাবৎ না বিচার দ্বারা পরমাত্মা পরিজ্ঞাত হয়, তাবৎ সে এই সাংসারিক ভাবাভাব পরম্পরা গ্রহণ করিবেই করিবে। চিত্ত যখন তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের পর চরম সীমায় অদ্বয় পরমাত্মারই অস্তিতা ও দৃশ্যবিশ্বের অনস্তিতা (ভ্রান্তিময়ত্ব) দেখিতে সক্ষম হয় তখনই সে এই সকল মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঋষিগণ বলিয়াছেন, যাবৎ না সমুদয় কল্পনা পরিত্যক্ত হয়, তাবৎ আত্মলাভ হয় না। কেননা, সমুদয় কল্পনা পরিত্যাগে এক মাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। যখন সামান্য সাধক ত্যাগশীল না হইলে সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না, তখন পরমাত্মরূপ মহাবস্তু লাভ করিতে হইলে কি প্রকার

ত্যাগ অঙ্গীকার করা আবশ্যক তাহা তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিতে পার আত্মলাভের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগও শ্রেয়ঃ। সমুদয় দৃশ্য পরিত্যক্ত হইলে যে দ্রষ্টা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হইবে। হে রাজন্! এই কার্য্যকারণময় বিশ্ব যৎ কর্ত্তৃক ও যাহাতে বিজৃম্ভিত হইতেছে এবং মন স্বীয় দেহকে বিনষ্ট করিয়া, যে সন্মাত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সন্মাত্রতাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া জানিবে৪১।৪৮।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনন্দন! মাণ্ডব্য মুনি সুরঘুকে ঐরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় মণ্ডপে গমন করিলেন[১]। সুরঘু মাণ্ডব্য গমনের পর একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কে[২]? আমি মেরু নহি, মেরুও (মেরু সুমেরু পর্ব্বত) আমার নহে। জগৎও আমি অথবা আমার নহে। যেমন এই নগনাগেন্দ্রসঙ্কুল কিরাতমণ্ডল আমি নহি ইহা নিশ্চিত তেমনি উহা আমারও নহে। "কিরাত মণ্ডল আমার" "আমি রাজা" ইহা কেবল সঙ্কেত অর্থাৎ আমারই মলিন বুদ্ধির কল্পনা মাত্র[৪]। সত্য সত্যই কি আমি কিরাতপতি? তাহা নহে। এবং কিরাতগণও আমার নহে।[৫] "আমি, আমার"—এ সকল সঙ্কেত বাক্য ব্যর্থ কল্পনা প্রভব। অতএব, বলবাহনাদিযুক্ত রাজ্য যে আমা হইতে ভিন্ন ও মদীয় কল্পনা মাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই[৭।৮]। এক্ষণে দেখা যাউক, এই হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহ আমি কি না? ইহাকেই আমি এ যাবৎ আমি বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, এক্ষণে বিচারে কি দাঁড়ায় তাহা দেখা যাউক[৯]। এই দেহ মাংসাস্থিসঙ্কুল ও জড়, সুতরাং ইহার সহিত আমার লিপ্ততা কৈ[১০]? মাংস অচেতন, কিন্তু আমি তাহা নহি। ঐরূপ রক্তও অচেতন, অস্থিও অচেতন, অন্যান্য ধাতুও অচেতন। চেতন আমি ঐ সকল হইতে বিভিন্ন[১১]। আমি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও নহি, কেননা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ও জড়। এমন কি দেহে যে কিছু সে সমস্তই জড় কিন্তু আমি চেতন। ভোগ আমি নহি এবং আমারও নহে। সুতরাং বুদ্ধীন্দ্রিয়গণও ঐরূপ[১২।১৩]। সংসারের মূল মন, তাহাও জড় বলিয়া আমা হইতে ভিন্ন। বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই সঙ্কেতও মনের কার্য্য বিশেষের উপর কৃত হইতেছে[১৪]। অতএব, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, ভূত বা শরীর, ইহার কিছুই আমি নহি। আমি ঐ সকলের অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট। আমি

দেখিতেছি, যাহা ঐ সকলের অতীত, তাহার আখ্যা বা নাম জীব, তাহাও তত্ত্বতঃ আমি নহি। অর্থাৎ জীবও আত্মার তাত্ত্বিক রূপ নহে। কেননা, তাহাতেও দৃশ্যকলঙ্কের সম্পর্ক রহিয়াছে[১৫।১৬]। * যদি আমি দৃশ্যভাব পরিত্যাগী হই তাহা হইলে আমি বিকল্পবর্জ্জিত বিশুদ্ধ চেতনা মাত্রে অবশেষিত হই। অতএব, তাহাই আমি, বা তাহাই আমার প্রকৃত স্বরূপ[১৭]। কি আশ্চর্য্য! আমি যে এক মাত্র অনন্তাত্মা তাহা আমি এত দিন অবগত হইতে পারি নাই। একমাত্র তন্তু যেমন বহুসংখ্যক মুক্তার অন্তরে অবস্থান করে, সেইরূপ, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা আমি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় মহাভূত গণের অন্তরে অবস্থান করিতেছি। সেই ব্রহ্ম নামধারী পরমাত্মাই আমি অশেষ দিক্‌বিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমিই সেই ব্রহ্মচৈতন্য। যিনি ব্রহ্ম তিনি চেত্যাশয়বিবর্জ্জিত, সর্ব্বভাবগত, সূক্ষ্ম, সর্ব্বশক্তি ও সকলের অন্তরাত্মা। এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদয়ই মনঃস্পন্দন মাত্র, সুতরাং অনিত্য। সেই মনই আমাকে মিথ্যা নৃপবিভ্রম দর্শন করাইয়াছে[১৮।২৬]। মন উক্ত চিদাকাশের মহিমার দেহরথে থাকিয়া নটের ন্যায় জগদ্রূপ নৃত্য নির্ব্বাহ করিতেছে। কি কষ্টের বিষয়! এত কাল আমি বৃথা নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম। জানিতাম না যে, ঐ সমস্তই কেবল দেহনিষ্ঠ। অহো! এখন বুঝিয়াছি, দুর্দ্দর্শন বিনষ্ট হইয়াছে, যাহা দ্রষ্টব্য তাহা দেখিতে পাইয়াছি, যাহা প্রাপ্য তাহা পাইয়াছি[২৭।৩১]। জগতীস্থ যে কিছু দৃশ্য, সমস্তই অসার ও অনিত্য। এতদাধার চিদংশমাত্র নিত্য বা সত্য। এখন দেখিতেছি, বুঝিতেছি, নিগ্রহানুগ্রহই বা কি? হর্ষ অমর্ষই বা কি? সুখই বল, আর দুঃখই বল, সমস্তই বিরাট ব্রহ্ম। এতাবৎ কাল এ বিষয়ে বিমূঢ় ছিলাম, এক্ষণে সৌভাগ্যবলে উক্ত মোহ অপগত হইয়াছে[৩২।৩৪]। আত্মার একরস ও পূর্ণস্বভাব সাক্ষাৎকৃত হইলে শোক, মোহ, ক্রিয়া, কর্ম্ম, প্রেক্ষণ, অবস্থান, গমন ও আগমন; সমস্তই তখন অসম্ভব হয়। যে দিক্ দৃষ্টি করি, সর্ব্বত্রই দেখি, একমাত্র চিদাকাশ

---

* দৃশ্যকলঙ্ক অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় জড় ভাব। দৃশ্য পরিত্যাগী অর্থাৎ জড় ভাব পরিত্যাগী।

বিরাজিত। অতএব হে সুন্দর! হে চিদাকাশ! তোমাকে নমস্কার[৩৫]।[৩৬]। অহো! ভাগ্যক্রমে আজ্ আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, যাহা পরম সত্য তাহা বিদিত হইলাম। যে হেতু আমি অসীম অপরিচ্ছিন্ন এবং আমার যে এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, তাহাও আমি, সেই হেতু আমাকে আমার নমস্কার[৩৭]। আমি আজ্ নিরঞ্জন পরম পদ শান্ত আত্মায় স্থিতি লাভ করিলাম[৩৮]।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, কিরাতাধিপতি সুরঘু উক্ত প্রকারে বিবেকানুসন্ধান দ্বারা গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি লৌকিক বৈদিক কার্য্য পরম্পরা পরিত্যাগ না করিলেও তদ্দ্বারা খেদ প্রাপ্ত হইতেন না। তিনি গত-জ্বর অর্থাৎ চিন্তা বর্জ্জিত হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য সকল সম্পন্ন করি-তেন এবং উদারতা ও গম্ভীরতা দ্বারা প্রশান্ত অম্ভোনিধির শোভা ধারণ করিয়াছিলেন[১।৪]। তাঁহার চিত্ত অনর্থপ্রদ কার্য্যে দুঃখিত বা অর্থপ্রদ কর্ম্মে হৃষ্ট হইত না এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মৎসর ও নিরহঙ্কার হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি না দয়ালু, না নির্দ্দয়, না সুখী, না অসুখী, না অর্থী এবং না অনর্থী ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়াছিলেন[৫।৬]। সমদর্শন, চাপল্য বর্জ্জন ও অন্তঃশীতলতার দ্বারা তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিয়া-ছিলেন[৭]। সমস্ত জগৎ একমাত্র চিত্তত্বের কলনা, এইরূপ বুঝিয়া তিনি সুখ দুঃখের অতীত অর্থাৎ নির্ব্বিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার মতি প্রশান্তসুখদুঃখশ্রী হইয়া পূর্ণেন্দুশ্রী ধারণ করিয়াছিল। তিনি শয়নে ভোজনে গমনে কার্য্যকরণে সর্ব্বক্ষণই সমাধিস্থ থাকিতেন। এই রাজীব লোচন রাজা সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া যথোচিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন[৮।১০]। অনন্তর তিনি দেহ নামক সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইলে পরমাত্মায় অব-স্থান করিয়াছিলেন। তখন তিনি ঘট ভঙ্গে ঘটাকাশের মহাকাশে পর্য্যবশেষিত হওয়ার ন্যায় গতশোক ও স্বকীয় মহান্ আত্মায় পর্য্য-বশেষিত হইয়াছিলেন[১১।১৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তুমিও সুরঘুর ন্যায় বীতশোক আনন্দপদ প্রাপ্ত হও। তুমিও তাহার ন্যায় দেহাদির প্রতি আত্মদৃষ্টি পরিত্যাগী হও। শিশুদিগের মন যেমন গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে নানা প্রকার ভয় কম্পাদি দুঃখ অনুভব করে তাহার ন্যায় চিত্তও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন হইলে সংসার দুঃখ অনুভব করে[১।২]। অতএব, তুমি যদি সুরঘুর ন্যায় বিবেকী হইতে পার, তাহা হইলে তুমিও তাদৃশী নির্বৃতি লাভ করিবে এবং তোমার চিত্ত তখন আর মোহ কূপে নিমগ্ন ও ক্লেশপ্রদ হইবে না[৩]। তাই বলিতেছি, তুমি উক্ত প্রকার পবিত্রকারিণী দৃষ্টি (দর্শন্ বা বোধ) অবলম্বন করতঃ সদা একসমাধান হইবে[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনীশ্বর! একসমাধান কাহাকে কহে এবং কি প্রকারেই বা তাহা নিষ্পন্ন হইবে? আমি দেখিতেছি, মন বাতাহত ময়ূরপিচ্ছাগ্রের সমান চপল ও দুর্নিগ্রাহ্য[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। উক্ত সুরঘু ও রাজর্ষি পর্ণাদ উভয়ের অভিমত এক অদ্ভুত সংবাদ বলিব[৬]। হে রঘুনাথ! উক্ত রাজর্ষিদ্বয়ের একসমাধান বিষয়ে যে গল্প লোকপরম্পরায় বিশ্রুত আছে, তাহাই আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব[৭]। পারসিক দেশে পরিঘ (পর্ণাদ) নামে এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তিনি সুরঘুর মিত্র। একদা সেই দেশে দুর্ভিক্ষজননী মহতী অনাবৃষ্টি হইলে তদীয় বহুতর প্রজা ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল[৮।১১]। ক্ষুধানলে দগ্ধজঠর হইয়া প্রজাপুঞ্জ অকালে কালকবলে আত্মসমর্পণ করিতেছে দেখিয়া দয়াপ্রবণ নৃপতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সেই বিষম বিপদের প্রতিকারার্থ অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে বৈরাগ্য বশতঃ রাজ্যভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ অরণ্যগামী হইলেন এবং প্রজাবর্গের অবিজ্ঞাত এক গহন বিপিনে গমন করিয়া গলিত পর্ণ (পত্র) ভোজনে জীবন ধারণ ও

ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। পর্ণ ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শেষ জীবনে তিনি পর্ণাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন[১২,১৬]।

রাজর্ষি পর্ণাদ উক্ত প্রকারে সহস্রবৎসর যাবৎ তপস্যা করিলে তাঁহার আত্মপ্রসাদসম্ভূত পরম জ্ঞান সমুপস্থিত হইল[১৭,১৮]। অনন্তর তিনি সিদ্ধগণের ন্যায় যথেচ্ছ ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে একদা স্বীয় মিত্র হেমজটাপতি সুরঘুর সদনে সমুপস্থিত হইলেন। সুরঘু মিত্রসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিলেন[১৯,২২]।

অনন্তর সেই মিত্রদ্বয় পরস্পর আলিঙ্গন করতঃ একাসনে সমাসীন হইয়া পরস্পর মিত্রদর্শনজনিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সুরঘু কহিলেন, অদ্য আমার পুণ্যক্রিয়া কল্যাণফল প্রসব করিল। আমি যে বহুকাল পরে ভবাদৃশ পরম মিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি আছে[২৩,২৪]?

পরিঘ কহিলেন, বন্ধো! আমারও চিত্ত আজ্ ভবদ্দর্শনে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার চিত্ত আজ্ চন্দ্রমণ্ডল মগ্ন চিত্তের ন্যায় সুশীতল হইয়াছে। যেমন পল্ললতটে ছিন্নশাখ ও অচ্ছিন্নমূল বৃক্ষ শত শাখায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় বিচ্ছেদের পর সংযোগ হইলে অকৃত্রিম প্রেম ও সুখ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[২৫,২৬]। হে সাধো! আমাদের সেই সেই প্রাক্তন আলাপ, চেষ্টা ও ক্রীড়াদি স্মৃতিপথে যতই উদিত হইতেছে ততই আমি হৃষ্ট হইতেছি[২৭]। আপনি মাণ্ডব্য প্রসাদে যাহা জ্ঞাত হইয়াছেন আমিও ঈশ্বরপ্রসাদে সেই আত্মপ্রসাদ (জ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বন্ধো! এখন ত তোমার চিত্ত দোষনির্ম্মুক্ত হইয়াছে? তুমি ত এখন পরম কারণে বিশ্রান্ত[২৮,২৯]? এখন ত তোমার চিত্ত শরদিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল? এখন ত তুমি সমদৃষ্টির দ্বারা কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান করিতেছ[৩০,৩১]? তোমার প্রজাবর্গ ত আধিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছে[৩২]? ধরা ত তোমার প্রজাদিগের জন্য সন্তোষের সহিত ফলশালিনী হইতেছেন? তোমার সুযশ ত দিগন্তব্যাপী হইতেছে[৩৩,৩৪]? এই সকল দিক্ ত তোমার সদ্গুণে বিভূষিত হইতেছে? তোমার রাজ্যের শস্যক্ষেত্র সমূহ ত কৃষক দিগের অভিমত ফল প্রসব করিতেছে? গ্রামে গ্রামে কুমারীগণ ত তোমার গুণ গান করে[৩৫,৩৬]? ধান্য, ধন, বিভব, ভৃত্য, পুত্র, কলত্র ও নগর বিষয়ে ত

মঙ্গল[৩৭]? তোমার দেহ ত আধি ব্যাধি বিহীন হইয়া ঐহিক পারত্রিক পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইতেছে[৩৮]? তোমার মন ত আপাতরম্য অথচ পরম শত্রু বিষয় সর্পের প্রতি বিরক্ত রহিয়াছে[৩৯]? অহো! কি আশ্চর্য্য! দীর্ঘকাল আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম, আজ্ আবার কাল আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছে[৪০]। হে সখে! সংযোগ ও বিয়োগ এতদুভয় জনিত এমন সুখ দুঃখ দশা (অবস্থা) নাই, যাহা জীবিতাবস্থায় না দেখা যায়[৪১]। নিয়তির ব্যবস্থা অতি অদ্ভুত! কারণ এই যে, ভবাদৃশ অকৃত্রিম মিত্রের যে পুনঃ সঙ্গ লাভ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। ক্ষিতিতলে এমন ব্যক্তি নাই, যিনি মিলন ও বিচ্ছেদ জাত সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়াছেন[৪২]।

সুরঘু বলিলেন, ভগবন্! নিয়তির গতি সর্পগতির অনুরূপ অর্থাৎ কুটিল ও নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। দেখুন, আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইলেও অদ্য আমি ভগবৎ প্রসাদে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। আপনি মহাসত্ত্ব; অতএব আপনার আগমনে যে, আমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল, তাহা বলা বাহুল্য। আপনার আগমনে আমরা পবিত্র হইয়াছি, আমাদের তাপ পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, পুণ্যফল ফলিত হইয়াছে[৪৩।৪৬]। হে রাজর্ষে! আপনার সমাগমে মদীয় পুরস্থিত সম্পত্তি সমূহ আজ্ সফল ও শতশাখে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে[৪৭]। হে মহানুভাব! আপনার বচনাবলি ও দৃষ্টি যেন অমৃতবর্ষণ করিতেছে। অদ্য আমি জানিলাম, সাধু সমাগম সত্য সত্যই মোক্ষসুখের দাতা[৪৮]।

৬১তম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, মিত্রদ্বয় পরস্পর ঐরূপ ঐরূপ প্রাক্তন স্নেহগর্ভ বিশ্রম্ভালাপ করার পর পরিঘ (পর্ণাদ) বলিলেন, হে মিত্র! এই সংসার ক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয় সে সমস্তই সমাহিতচিত্ত পুরুষের সুখাবহ, পরন্তু অসমাহিতের সুখাবহ নহে[১।২]। সেই জন্য আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি সেই পরম বিশ্রামাশ্রয় শ্রেয়োজনক সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাক কি না[৩]।

সুরঘু কহিলেন, রাজর্ষে! সমাধি কিরূপ? সমাধি বিষয়ে আমি বুঝি, যাহা সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত, পরম বিশ্রান্তিস্থল ও পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই আমার মতে উত্তমা সমাধি[৪]। হে মহাত্মন্! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ব্যবহার বর্জ্জিত ও ব্যবহারে অবস্থিত, যে অবস্থাতেই থাকুন, কদাপি তাঁহারা অসমাহিত নহেন[৫]। নিত্যপ্রবুদ্ধ আত্মৈকনিষ্ঠ মহাত্মগণ কার্য্যকরণে নিযুক্ত থাকিলেও সমাধিযুক্ত[৬]। চিত্ত যদি বিশ্রান্ত না হয়, যদি চিত্তবিক্ষেপের শান্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বদ্ধপদ্মাসনোপবিষ্ট ও কৃতব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া কি করিবে? বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি কোথায়[৭]? হে ভগবন্! মহাত্মগণ বলিয়া থাকেন যে, আশারূপ তৃণের পাবক স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানই সমাধি; মৌনস্থিতি সমাধি নহে[৮]। হে সাধো! যাহারা নিত্যতৃপ্ত ও তত্ত্বদর্শী তাহারাই সমাহিত এবং তাহাদের তাদৃশী প্রজ্ঞাই সমাধি[৯]। যাহার দ্বারা পুরুষ অক্ষুব্ধ নিরহঙ্কার স্থির অর্থাৎ মানাবমানাদি দ্বন্দ্ব বিষয়ে অনুদ্বিগ্ন ও সুমেরু সদৃশ স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয় তাহাই আমার মতে সমাধি[১০]। নিশ্চিন্ত ও হেয়োপাদেয় বর্জ্জিত মনোগতিই শাস্ত্রে সমাধি বলিয়া বর্ণিত আছে[১১]। যেমন কাল অনন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কদাচ স্বীয় গতি বিস্মৃত হন না, সেইরূপ, জ্ঞানিগণও চিত্তব্যবহারে নিরত থাকিয়াও আপনার চিন্মাত্রতা বিস্মৃত হন না। চিত্ত যে দিন পরমাত্মবোধ প্রাপ্ত হইবে সেই দিন হইতেই সঞ্জাত সমাধি অচ্ছিন্ন বা অক্ষুণ্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে[১২]। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির

সমাধি (ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি) বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যেমন দিবসে সৌরালোকের বিরাম হয় না, সেইরূপ, প্রবুদ্ধ পুরুষের প্রজ্ঞাও (ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি) বিদেহ কৈবল্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিনিবৃত্ত হয় না[১৩।১৪]। যেমন অজস্র প্রবাহিতা নদীর স্রোত ক্ষণকালও রুদ্ধ থাকে না, সেইরূপ, প্রবুদ্ধ পুরুষের সম্যক্ বোধও ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থগিত থাকে না[১৫]। কাল যেমন স্বীয় কলা মুহূর্ত্ত ও সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতিকে বিস্মৃত হয় না, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ জনের বোধও স্বাত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয় না[১৬]। যেমন বায়ুর গতি অনবরুদ্ধ, সেইরূপ, প্রাজ্ঞ পুরুষের আপনার চিন্মাত্রতা বোধ অনবরুদ্ধ অর্থাৎ সদা অপ্রচ্যুত[১৭]। সূর্য্যাদিই কালের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। তাহাদের গতিও নিরন্তরিত। সেইরূপ, চিদাত্মার চৈতন্যস্ফূর্ত্তিও নিরন্তরিত[১৮]। জ্ঞানীর সম্বন্ধে এমন কাল নাই যাহাতে সে আত্মজ্ঞান বর্জ্জিত থাকে[১৯]। যেমন গুণীর গুণহীনতা অসম্ভব, তেমনি, আত্মসম্বিৎ বর্জ্জিত আত্মজ্ঞও অসম্ভব[২০]। অতএব, আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক আপনাকে সর্ব্বদাই সমাহিত বলিয়া "আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও শান্তাত্মা" এতদ্রূপে বিদিত থাকেন[২১]। অপিচ, তাঁহারা ইহাও মনে করেন, মদীয় উক্ত প্রকার সমাধির ভঙ্গ নাই[২২]। তথা মদীয় মন যাহা জানিয়াছে তাহাতে তাহার কোনও সময়ে অসমাধি নাই। যে হেতু একমাত্র আত্মতত্ত্বই আছে, অন্য কিছু নাই, সেই হেতু, আমার নিকট সমাধি অসমাধি উভএর কিছুই নাই। আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বগ, সর্ব্বরূপ, সুতরাং সমাধি ও অসমাধি তদন্তর্গত[২৩।২৪]। সতত সমদর্শী নিত্যোদিত আত্মার নিকট সমাধি প্রভৃতি বাক্য (কথা) প্রপঞ্চমাত্র। সুতরাং সমাধি অসমাধি রূপ ভেদ বস্তুতঃ অপ্রসিদ্ধ[২৫]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন! সুরঘু, ঐরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে মহাত্মা পরিঘ পরমানন্দিত হইয়া উদারগম্ভীর বাক্যে কহিলেন, রাজন্! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, এবং তৎ পদও প্রাপ্ত হইয়াছ। তাই তুমি শীতলান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছ[১]। পদ্ম যেমন মধুপূর্ণ, শোভান্বিত ও শীতল, তদ্রূপ, তুমিও মধুপূর্ণ, শ্রীসমন্বিত, স্নিগ্ধ ও সুশীতল। তোমার আনন্দই তোমাতে মধুস্থানীয়[২]। তুমি নির্ম্মল, মহান্, পূর্ণ ও গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় বিরাজিত[৩]। অহঙ্কার বিনষ্ট ও আনন্দপূর্ণ হওয়ায় তুমি শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল মূর্ত্তি হইয়াছ। তুমি এখন স্বস্থ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বগ পরিতুষ্ট ও বীতরাগ[৪।৫]। তুমি সার অসার ও দৃশ্য সংসারের স্থিতিরহস্য বিদিত হইয়াছ[৬]। হে ভাবাভাব বিভাগজ্ঞ! তোমার ঐ দেহ এখন ভোগ রাগিতাদি অবস্থা হইতে নির্ম্মুক্ত ও মুদিতাশয়যুক্ত হইয়াছে[৭]। অমৃত সাগর যেমন অমৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ সেইরূপ তোমার অন্তর আত্মা যার পর আর বস্তু নাই তাদৃশ বস্তুর (আত্মার) দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় আপনিই আপনার মহিমায় তৃপ্ত রহিয়াছ[৮]। সুরঘু বলিলেন, হে মুনে! এমন বস্তু নাই যাহা আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-কিছু দৃশ্য—সমস্তই নগণ্য অর্থাৎ তুচ্ছ[৯]। উপাদেয়ের অভাবে হেয়ও কিছু নাই[১০]। সমুদায় ভাব (উৎপত্তিমান্) তুচ্ছ। সুতরাং স্তুতি নিন্দাও দূরে পরিত্যক্ত[১১।১২]। অনুরাগ প্রযুক্তই স্তুতি ও নিন্দা, তাদৃশ অনুরাগ ইচ্ছারই মূর্ত্তি, যাঁহারা মহাবুদ্ধিধর তাঁহারা ঐ সকল তুচ্ছ বিষয় ইচ্ছা করেন না, মহোদার বস্তুই (আত্মার ব্রহ্মভাব) ইচ্ছা করেন[১৩]। শ্রী বল, স্ত্রী বল, শৈল বল, সমুদ্র বল ও অন্যান্য ভূত (জায়মান) সমস্তই অসার[১৪]। এই জর্জ্জরপ্রায় মাংসাস্থিময় ও কাষ্ঠাদিময় জগতের কিছুই সত্য নহে। ইহা বাঞ্ছনীয়

নহে[১৫]। বাঞ্ছনীয় না হওয়ায় সুতরাং বাঞ্ছাও বিনিবৃত্ত এবং তদনু-গামী রাগদ্বেষাদিও বিনষ্ট[১৬]। হে মুনে! এ সমুদায়ই আমার; যে হেতু আমিই এক মাত্র এই ভাবাভাবসঙ্কুল দৃশ্যের দর্শক। এ বিষয়ে আর অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, শেষ কথা এই যে, সর্ব্বত্র সমতা অবলম্বন করিলেই উত্তমা স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়[১৭]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, সুরঘু ঐরূপ কহিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা পর্ণাদ তাঁহাকে অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করিয়া এবং স্বয়ং অভিনন্দিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুরঘুও স্বকার্য্যে গমন করিলেন[১]।

হে রাঘব! জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় পরম্পরা শ্রবণ করিলে। এক্ষণে তুমি উক্ত প্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হও[২]।

হে রঘুপতে! জ্ঞানিগণ সহ তত্ত্ব বিচারে প্রজ্ঞা পরিমার্জ্জিত হয় এবং তদ্দ্বারা হৃদয়াকাশস্থ অহঙ্কার মেঘ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়[৩]। চিত্ত তখন শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল, বিস্তৃত ও সর্ব্বজীবের আহ্লাদকারী হয়। ঐরূপ হইলেই ধ্যেয়, শরণ্য ও আনন্দপ্রচুর পরমাত্মা নামক চিদাকাশে স্থিতি লাভ হইয়া থাকে[৪।৫]। যে ব্যক্তি সদা অধ্যাত্মময়, যাহার চিত্ত সদা অন্তস্তত্ত্বে ও সদা চিত্তত্ত্বানুসন্ধানে নিমগ্ন, দুঃখ শোক তাহাকে কদাচ বাধ্য করিতে পারে না[৬]। লোকের দৃষ্টিতে অর্থাৎ লোকে দেখে বটে তিনি ব্যবহার রত ও রাগদ্বেষাদিযুক্ত, কিন্তু তিনি অন্তরে নিষ্কলঙ্ক। জলগত পদ্ম যেমন জলে নির্লিপ্ত, সেইরূপ, তিনিও লোকদৃষ্ট ব্যবহারাদিতে অন্তরে নির্লিপ্ত[৭]। যিনি সম্যক্ জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাঁহার মন শান্ত ও শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি কদাপি মনের দ্বারা অনিষ্টভাগী হন না[৮]। বিজ্ঞের মন ভোগকৃপণ ও দীনভাবাপন্ন নহে[৯]। পত্নী মরণে কামুকের চিত্তই দুঃখানুভব করে, কিন্তু বিরক্ত পুরুষের চিত্ত তাহা করে না। যে চিত্ত এক বার অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বিজ্ঞাত হইয়াছে; সে চিত্ত নিত্য অদুঃখিত[১০]। হে সাধো! আকাশ যেমন ধূলায় ধূসরিত হয় না, তেমনি, যাহার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে সে'ও জন্মমরণাদি জগদ্ভাবে প্রলিপ্ত হয় না[১১]। যেমন অন্ধকারের প্রতিকার আলোক, তেমনি, অজ্ঞানব্যাধির ঔষধ জ্ঞান[১২]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জ্ঞান যে মুহূর্ত্তে উদয় প্রাপ্ত হয় সেই মুহূর্ত্তেই অবিদ্যা জাগ্রতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায়

শান্তি হইয়া যায়[১৩]। মৎস্যের চক্ষু জলে পিহিত হয় না, তাহার ন্যায় জ্ঞানীর দৃষ্টিও ব্যবহারে প্রলিপ্ত হয় না[১৪]। জ্ঞানীর বুদ্ধি অজ্ঞান নিশার অবসানে ও চিদালোকের প্রভায় আনন্দিত হইয়া বিরাজ করে[১৫]। যাহারা অজ্ঞান নিদ্রার অবসানে ও জ্ঞান সূর্য্যের উদয়ে প্রবুদ্ধ হয় তাহারা আর মোহ নিদ্রায় অবিভূত হয় না[১৬]। যে সকল দিনে হৃদয়াকাশে চিৎজ্যোৎস্না বিরাজ করে সেই সকল দিনই দিন[১৭]। তাহারাই মিত্র, সেই সকল শাস্ত্রই শাস্ত্র, এবং সেই সকল দিনই দিন, যে মিত্রের দ্বারা ও যে শাস্ত্রের দ্বারা ও যে দিনের দ্বারা আত্মচৈতন্য পরিস্ফুট হয়। চন্দ্র যেমন স্বীয় অমৃতে সুশীতল, তেমনি, স্বাত্মধ্যানে সন্ত্যক্তমোহ মনুষ্যও অন্তরে সুশীতল[১৮।১৯]। যাহাদের স্বাত্মাবলোকনে অবহেলা তাহারাই দরিদ্র এবং তাহারাই শোকে ও মোহে পরিপূর্ণ এবং তাহারাই পাপী[২০]। হে রামচন্দ্র! এই সংসার একটী দুরুত্তার বৃহৎ পল্বল। ইহাতে জীবরূপ বলীবর্দ্দ নিমগ্ন, তাহাকে যত্নসহকারে ও বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিতে হইবে। সংসারপল্বলনিমগ্ন উক্ত জীব বলীবর্দ্দটী আশা রজ্জুতে জড়িত, ভোগরূপ তৃণে লালস, শোক সন্তাপে জর্জ্জরিত ও ক্লেশে কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছে। সে দুঃখভার বহনকারী, জন্মরূপ জঙ্গলে জীবিত, কুকর্ম্মকর্দ্দমে প্রলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ, মোহগর্ত্তশায়ী, রাগরূপ দংশে (ডাঁশ পোকা) দষ্ট গাত্র, তৃষ্ণাবরত্রায় (চর্ম্মরজ্জুর দ্বারা) আকৃষ্ট, মনোরূপ বণিকের আজ্ঞাবহ, বন্ধুরূপ বন্ধনে নিশ্চল, জরাজীর্ণ, লোভরূপ গোময়-পঙ্কে মগ্নোন্মগ্ন, শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিশ্রাম বর্জ্জিত, গতায়াতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত, অলব্ধছায় (যে বিশ্রামার্থ শীতল ছায়া পায় না), তীব্র তাপে উপতপ্ত, আকারে সুদৃশ্য পরন্তু অন্তরে দীনতা প্রাপ্ত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আক্রান্ত (বশ্যতা প্রাপ্ত), কর্ম্মঘণ্টাধারী, দুষ্কৃতের তাড়নে ক্লান্ত, জন্ম মরণ চক্রের ধুরবাহী, অজ্ঞান অরণ্যে বিলুণ্ঠিত, সন্নগাত্র, আপনারই অনর্থে নিমগ্ন ও অবসন্ন এবং সদা কর্ম্ম ভার বহনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও রোরুদ্যমান হই-তেছে[২১।২৯]। হে রঘুবীর! চিত্ত তত্ত্ব দর্শনে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তদুপজীবী জীব পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত হয়[৩০]। যাঁহারা মহানুভাব, তাঁহাদেরই সংসর্গে নাবিক হইতে নৌকা প্রাপ্তির ন্যায় সংসারার্ণব লঙ্ঘনের যুক্তি (যোগ বা উপায়) পাওয়া যায়[৩১]। যে দেশে তত্ত্বজ্ঞ লোক নাই, সফল ও সচ্ছায় সজ্জন রূপ বৃক্ষ নাই, সেই দেশই মরু, বুদ্ধিমান্ লোক সে

দেশে বাস করিবেন না[৩২]। হে রামচন্দ্র! স্নিগ্ধ শীতল বাক্য রূপ পত্র ও ছায়া যুক্ত এবং ঈষদ্ধাস্য রূপ পুষ্প যুক্ত ও সজ্জন রূপ চম্পক পাদপে ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভও মঙ্গলাবহ। যাহাদের কিঞ্চিৎ মাত্র বিবেক জন্মিয়াছে, তাহারা স্বাত্মলাভ বা বিশ্রান্তি লাভ অভাবে ইহ সংসারে শয়ান থাকিতে ইচ্ছুক নহে[৩৩।৩৪]। রাম! আপনার বুদ্ধিই আপনার বন্ধু, অতএব, আপন বুদ্ধির দ্বারাই আপনাকে (সংসারপঙ্ক নিমগ্ন আত্মাকে) উদ্ধৃত করিবেক, কদাচ অহঙ্কারাদির (দেহাভিমানাদির) বশীভূত হইয়া জন্ম পঙ্কে নিক্ষেপ করিবেক না[৩৫]। এ সকল কি? কি প্রকারে ও কোথা হইতে এ সকল আসিল? ইহার মূল কোথায়? কি উপায়ে ইহার ক্ষয় হইবেক? এই সকল চিন্তা বা অনুসন্ধান করাই প্রাজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য[৩৬]। ধন, মিত্র, শাস্ত্র, বান্ধব, কেহই আত্মোদ্ধারের সাহায্য করে না[৩৭]। কেবল মাত্র সদা সহচর মন যদি সুহৃদ হয় অর্থাৎ বিচার পরিশোধিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা আত্মোদ্ধৃতি হইতে পারে[৩৮]। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও শাস্ত্রোক্ত যত্ন এই উভয়ের দ্বারা স্বাত্মধ্যানজন্মা তত্ত্বজ্ঞান রূপ মহানৌকায় আরোহণান্তে ভবসাগর সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়[৩৯]। দুরাশায় দহ্যমান ও শোকমগ্ন আত্মার উদ্ধারে অবহেলা করা অনুচিত[৪০]। অহঙ্কার যাহার আলান (বন্ধন স্তম্ভ), তৃষ্ণা যাহার রজ্জু, মন যাহার মদ, সেই জীবরূপ হস্তীকে জন্মরূপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য[৪১]। রাম! আত্মার উদ্ধার বা পরিত্রাণ কেবল মোহের পরিত্যাগ ও অহঙ্কারের প্রমার্জ্জন হইতেই হইয়া থাকে[৪২]। অহঙ্কারের বিচ্ছেদই আত্মজ্ঞান প্রাকট্যের কারণ[৪৩]। এই দেহের প্রতি যদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় তুচ্ছতা বোধ জন্মে তাহা হইলেই দেবদেব পরমাত্মার দর্শন সুসম্পন্ন হয়[৪৪]। মেঘ স্থানীয় অহঙ্কার যেমন যেমন ক্ষীণ হইবে তেমনি তেমনি চিদাদিত্যের প্রকাশ প্রকটিত হইবে[৪৫]। আলোক দেখিতে কোন দ্রব্যান্তর লাগে না। অন্ধকার বিনষ্ট হইলেই আলোক দেখা যায়। সেইরূপ, অহঙ্কারের বিরাম হইলেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে[৪৬]। অহঙ্কার বিলয়ের পর যে অবস্থার আবির্ভাব হয় সে অবস্থা নিত্য ও নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ তারতম্য বর্জ্জিত। সে অবস্থা নিত্যানন্দনামে বিশ্রুত[৪৭]। সে অবস্থার তুলনা নাই এবং বোধক কথাও নাই[৪৮]। তাহা কেবল, একরূপ বা একরস, এবং পরিপূর্ণ

চিৎসমুদ্র[৪৯]। তাহা বুঝাইবার জন্য সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত না থাকিলেও, সুষুপ্তির দ্বারা অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন সুখনিদ্রার দ্বারা শাস্ত্রকারগণ সে অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন[৫০]। যেমন ঘটাকাশই ঘটবিনাশে মহাকাশ হয় তেমনি মনও অহঙ্কার নামক উপাধির বিলয়ে তদুপহিত চিদাত্মায় (পরমাত্মায়) পরিশেষিত হয়[৫১]। হে রামচন্দ্র! তাহা বাক্যের গম্য নহে। তাহা কেবল স্বানুভূতিগম্য। কেননা, অনুভূতিই তাহার স্বরূপ [৫২।৫৩]। অতএব, হে রাঘব! চিত্ত বহির্ব্বিষয় ত্যাগ করিয়া যদি প্রত্যগাত্মায় ক্ষীর নীরের ন্যায় এক যোগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বসাক্ষী বা সর্ব্বপ্রকাশক আত্মা তখন স্বয়ং বা সাক্ষাৎ অনুভূতিরূপে আবির্ভূত হন[৫৪]। তাহারই পরে বিষয়সংস্কারের আত্যন্তিক বিনাশ হওয়ায় পরম শুভ রূপ স্বাত্মপ্রকাশ সুসম্পন্ন হয়। সে শুভ রূপটী ব্রহ্মাদিরও চিন্তার অবিষয়[৫৫]।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

—০()০—
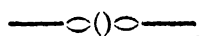
বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন! যদি মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ * অর্থাৎ অহঙ্কার মমকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মদর্শন না করা যায় তাহা হইলে যেমন চিত্রপটের সূর্য্য চিরকাল উদিত থাকে অস্ত-মিত হয় না সেইরূপ জগদ্দুঃখও চিরকাল ভোগ করিতে হয়, তাহার আর অবসান হয় না। অধিকন্তু অনন্ত মহদাপদ পুনঃ পুনঃ আগমন করে[১।২]। এই বিষয়ের উদাহরণে একটী পুরাতন ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইতিহাসটী ভাস ও বিলাস নামক তাপস দ্বয়ের কথোপকথন ঘটিত[৩।৪]।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগে সহ্য নামে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। ইহার উচ্চতা আকাশবিজয়ী। পীঠ দেশ ভূতলজয়ী ও তলপ্রদেশ পাতালবিজয়ী[৫]। এই গিরি অসংখ্যবিধ কুসুমে ও নির্ম্মল নির্ঝরে শোভমান এবং অত্রস্থ নিধি (গুপ্ত ধন) গুহ্যকগণের পরিরক্ষিত[৬]। ইহার নিতম্বদেশে সুবর্ণের ও সূর্য্যকান্ত মণি প্রভৃতির আকর রহি-য়াছে[৭]। কোথাও পত্র পুষ্পের নিকুঞ্জ, কোথাও গৈরিকাদি ধাতুর আসার (ধারা), এবং কোথাও ফুল্ল পদ্মে সুশোভিত সরোবর এবং কোথাও বা বিবিধ শস্যক্ষেত্রে পরিশোভিত কৃষকাবাস অবস্থিত রহি-য়াছে[৮]। কোন কোন প্রদেশে নিরন্তর নিপতিত নির্ঝরের ধ্বনি এবং কোন কোন স্থানে বায়ুবিতাড়িত বংশ সমূহের (বংশ=বাঁশ) শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। গুহা প্রদেশে বায়ুর গভীর গর্জ্জন, নিকুঞ্জ দেশে ভ্রমরের গুণ গুণ রব, সানুতে অপ্সরোগণের গান, বন বিভাগে পশু পক্ষীর রব, এবং অধিত্যকায় মেঘমালা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়[৯।১০]। অত্রস্থ গুহায় বিদ্যাধর গণের আবাস, পদ্মসরোবরে ভৃঙ্গগণের গীত, সীমান্ত

---

* মনের দ্বারা মনের উচ্ছেদ অর্থাৎ গুরু শাস্ত্রাদির দ্বারা পরিশোধিত অবস্থার দ্বারা অপরিস্কৃত অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবস্থার উচ্ছেদ।

প্রদেশে কিবাত ও বৃক্ষ নিচয়ে নানাবিধ বিহঙ্গম[১১], স্কন্ধদেশে দেবাবাস, পাদ দেশে মনুষ্যাবাস এবং তলদেশে নাগ গণের আবাস রহিয়াছে[১২]। সিদ্ধগণ ইহার কন্দর প্রদেশ, ভুজঙ্গগণ ইহার চন্দন দ্রুম এবং কিন্নরগণ ইহার শিখর প্রদেশ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে[১৩]। ইহার কোন কোন অঙ্গ পুষ্পে ও পুষ্পরেণুতে পাণ্ডর বর্ণ[১৪], কোন কোন অঙ্গ ধাতুদ্রবে ও ধাতুরেণুতে চিত্রিত[১৫]। এই গিরিরাজ সহ্যের খণ্ড শিলা সকল যেন অভিসারিকা নারীর অনুকরণে প্রবৃত্তা আছে। মেঘ খণ্ড তাহাদের নীলাংশুক, শব্দ রাহিত্যই তাহাদের মূকত্ব ও রত্নচিহ্নই তাহাদের ভূষণ[১৬]।

এবম্বিধ গিরিবর সহ্যের উত্তর সানুতে মহর্ষি অত্রির সিদ্ধাশ্রম বিরাজিত। এই আশ্রমের বৃক্ষ লতাদি পুষ্প ফলে বিনম্র, পুষ্করিণী ও নির্ঝর সমূহ রত্নলাঞ্ছিত, লতা সকল বিতান তুল্য। এই আশ্রম স্থানটী যেন অপর ব্রহ্মলোক। ইহা স্বর্গ অপেক্ষা সুরম্য অথবা দেবদেব শশি-শেখরের অন্যতম পুরী[১৭।২০]। এবম্বিধ অত্রি-আশ্রমে কোন তাপসদ্বয় বাস করিতেন। তাঁহারা উভয়েই কোবিদ অর্থাৎ সুপণ্ডিত। যেমন নভো-ভাগে শুক্র ও বৃহস্পতি, তেমনি, উক্ত আশ্রমে উক্ত তাপসদ্বয়[২১]। পরস্পর সৌহার্দ্দ শৃঙ্খলে বদ্ধ উক্ত তাপস দ্বয়ের বিলাস ও ভাস নামে দুইটী পুত্র হইয়াছিল। ভাস ও বিলাস পরস্পর ঈদৃশ সৌহার্দ্দ যুক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পৃথক্ দেহসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের মন যেন একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলেন এবং স্থিরভাবে মুনির ন্যায় মৌনা-বলম্বন পূর্ব্বক সেই আশ্রমে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা তাঁহাদিগের পিতৃদ্বয় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। তখন সেই পিতৃহীন মিত্রদ্বয় শোকে অধীর, দীন-বদন ও উৎসাহশূন্য হইয়াও অগ্রে সেই পিতৃশবদ্বয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর শোকে অধীর হইয়া পরিদেবনা করিতে লাগিলেন। অহো! লোকমর্য্যাদা কি দুঃরক্ষণীয়।

উক্ত প্রকারে সেই অল্পবয়স্ক অপ্রাপ্ত বিমলজ্ঞান পিতৃহীন মিত্রদ্বয় ক্রমবর্দ্ধিত শোকানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া বিরাগ (বৈরাগ্য) অবলম্বন পূর্ব্বক আশ্রম ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো! শোক

কি বিষম! যাহারা ক্ষণকাল পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারিত না, অদ্য পিতৃশোকে অধীর হইয়া সেই অকৃত্রিম মিত্রদ্বয় অনায়াসে সেই সুদৃঢ় সৌহার্দ্দবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় কে কোথায় গমন করিল তাহার সন্ধানও থাকিল না[২২।৩১]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন গ্রীষ্মতাপে ছিন্নমূল বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই তাপসদ্বয় অতি শোকে সেইরূপ শুষ্কসর্ব্বাঙ্গ হইয়া বিজন বিপিনে যূথভ্রষ্ট সারঙ্গের ন্যায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন[১।২]। ক্রমে দিন মাসে ও বর্ষাদির পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের জরা বা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল[৩]। পরে বহুকালের অন্তে তাদৃশ বার্দ্ধক্যাবস্থায় সেই অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞান তাপস দ্বয়ের একদা আকস্মিক সন্দর্শন ঘটনা হইল। তাহাতে হৃষ্ট হইয়া তাঁহারা পরস্পর বক্ষ্যমাণ প্রকারের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

বিলাস বলিলেন, হে মদীয় জীবনবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল! হে হৃদয়াবাস অমৃত সাগর! হে জগদেকবন্ধো! হে ভাস! তোমার শুভাগমন হউক। বল, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এত কাল কোথায় ছিলে? তোমার তপস্যা ফলবতী হইয়াছে কি না[৪।৬]? তোমার বুদ্ধি মলশূন্যা হইয়াছে কি না? তুমি আত্মলাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছ কি না? এবং কুশলী আছ কি না[৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অপ্রাপ্ততত্ত্বজ্ঞান সুতরাং সংসারক্লেশে সমুদ্বিগ্ন ভাস চিরসুহৃদ বিলাস কর্ত্তৃক উক্ত প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সাধো! আমার আগমন অদ্যমাত্র শুভ। যে হেতু বহুকাল পরে আজ্ আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম সেই হেতু অদ্য মাত্র শুভ। পরন্তু কুশল কোথায়? যাহারা সংসারে অবস্থিতি করে তাহাদের আবার কুশল কি[৮।৯]? আমি যাবৎ না যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিব, যাবৎ না চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ করিতে পারিব, যাবৎ না সংসার উত্তরণে সমর্থ হইব, তাবৎ আমার কুশল কোথায়[১০]? যাবৎ না চিত্তসম্ভূতা আশা নির্ম্মূলা হয়, তাবৎ আমাদের কুশল কোথায়[১১]? যাবৎ না জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাবৎ না সমদর্শন উদিত হয়, যাবৎ না বোধের উদয় হয়, তাবৎ আমাদের কুশল কোথায়[১২]? হে সাধো! আত্মলাভ না হওয়ায় এবং আত্মজ্ঞানরূপ মহৌষধ প্রাপ্ত না

হওয়ায় সংসার বিষূচিকা রোগ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছে[১৩]। সংসার একটী বৃক্ষ। ইহার অঙ্কুর শিশুত্ব, শাখাপল্লবাদি যৌবন, পুষ্প জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য, মরণ ইহার পুনঃ পুষ্পোদ্‌গমের মঞ্জরী। এই বৃক্ষ সর্ব্বদাই বান্ধবরূপ ষট্‌পদের আক্রন্দে প্রকম্পিত[১৪,১৫]। অন্য বৃক্ষ যেমন ঋতু বিশেষে বিরস হয়, সেইরূপ, এ বৃক্ষও কর্ম্মফল ভোগে (নরকাদিভোগে) বিরস হয়[১৬]। অথবা, এই দেহ এক প্রকার পর্ব্বত গুহা। এ গুহা সহস্র সহস্র তৃষ্ণাকণ্টকে সমাক্রান্ত ও ক্রিয়াফলভোগরূপ সর্প সমূহে পরিব্যাপ্ত[১৭]। ইহাতে সুখ নাই অথচ সুখের আশা মাত্র করা যায়। ইহাতে দুঃখের রাত্রি পুনঃ পুনঃ আসিতেছে আর যাইতেছে, অথচ তাহার অবসান বা বিরাম হয় না। কেবল কতকগুলি মিথ্যা ফলের মিথ্যা কর্ম্মের দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে। অন্য কিছু হইতেছে না[১৮।১৯]। আমাদের মনোরূপ মত্ত হস্তী পরমাত্মা রূপ আলান উন্মূলিত করিয়া তৃষ্ণারূপ করেণুর (করেণু=হস্তিশাবক) পোষণার্থ সতত উন্নিদ্র রহিয়াছে ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে[২০]। আমি দেখিতেছি, এই কায়রূপ বৃক্ষে অবস্থিত অভিলাষরূপ গৃধ্র ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আদৌ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে না। যে সকল দিন যাইতেছে, সে সমস্তই বৃক্ষের জীর্ণ পত্রের ন্যায় নীরস, নিঃসার, লঘু ও সুখবর্জ্জিত[২১।২২]। পদ্ম যেমন হিমের দ্বারা আহত হইয়া শুষ্ক ও পাণ্ডুর বর্ণ হয় তাহার ন্যায় এই দেহশোভাও দিন দিন ম্লান হইতেছে এবং মুখশ্রীও অবসাননাদি রূপ রজোদ্বারা ধূসর বর্ণ হইতেছে[২৩]। এই দেহসরোবরের যৌবন সলিল নিতান্ত অস্থায়ী। অতি অল্পকাল মধ্যে শুকাইয়া যায়। অত্রস্থ আয়ু-হংস তখন পলায়ন করে[২৪]। জর্জ্জরতা প্রাপ্ত এই দেহদ্রুম হইতে কাল বায়ুর আঘাতে ভোগপুষ্প সকল অনবরতই অধঃপাতিত হইতেছে[২৫]। মন যে ভোগ সর্পের আশ্রয়ীভূত মোহান্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহারই চিন্তায় আমরা সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত[২৬]। যেমন কোন চৈত্যের অগ্রভাগে পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাহার ন্যায় তৃষ্ণা অদ্যাপি উড্ডীন হইতেছে[২৭]। অন্তকরূপ আখু (মূষিক) আমাদের অলক্ষ্যে আয়ু রূপ তন্তু ক্ষয় প্রাপ্ত করিতেছে[২৮]। আমাদের এই জীবন একটী কুৎসিত নদীর অনুরূপ। যৌবন এ নদীর কল্লোল, ক্রোধাদি ফেন, লোভ ও তৃষ্ণাদি আবর্ত্ত[২৯]। আমাদের ক্রিয়াপ্রবৃত্তিও

নদীবিশেষ অথবা ক্রিয়াপ্রবৃত্তি উক্ত জীবন নদীর বেগ। ইহা বক্ষ্যমাণঃ রূপে জন্মমরণাদির স্রোত বহন করিতেছে। শিল্প তর্ক নীতি প্রভৃতি কৌশলময় কার্য্যবৃন্দ ও বিবিধ জগদ্ব্যবহার এই প্রবৃত্তি নদীর প্রধান কল্লোল[৩০]। শত শত বন্ধুবর্গ রূপ উৎকর (জঞ্জাল) বাহিনী এই নদী নিরন্তর কামরূপ সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হইতেছে[৩১]। মতিরূপা পক্ষিণী (হংসী) এই নদীতে থাকিয়া তাহা করিয়াছি, ইহা করিতেছি, উহা করিব, ইত্যাদিবিধ কল্পনা জালে বদ্ধ ও জড়িত হইয়া রহিয়াছে। হে তাত! এই যে দেহরূপ রত্নশলাকা, (শলাকা=শলা। দেখিতে সুন্দর বলিয়া রত্ন) ইহা যে বিনাশরূপের কোন্ প্রান্তে নিমগ্ন হইয়াছে ও হইতেছে তাহা জানা যায় না অর্থাৎ কবে ইহা বিনষ্ট হইবে তাহা জানা যায় না। সমুদ্র পতিত তৃণ যেমন তত্রস্থ আবর্ত্তে ভ্রাম্যমাণ হয় তাহার ন্যায় কুক্রিয়া ও কদাচার রত চিত্ত চিন্তারূপ চক্রে নিয়তই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। চিত্ত শত শত লক্ষ লক্ষ অসংখ্য কার্য্য তরঙ্গে উহ্যমান হইতেছে; ক্ষণকালের নিমিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না [৩২।৩৫]। ইনি আমার সুহৃদ্, তিনি আমার শত্রু, ইত্যাদিবিধ দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যুগলভাব নিরন্তরই আমার মর্ম্ম নিপীড়ন করিতেছে[৩৬]। মনোরূপ মীন উক্ত চিন্তানদীর মহান্ আবর্ত্তে অবস্থান করতঃ দিন দিন উচ্ছূনতাই প্রাপ্ত হইতেছে[৩৭]। এইরূপ আরও অনেক মনুষ্য অনাত্মায় আত্মতাবুদ্ধি ও দুঃখে সুখবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া আমার ন্যায় দীনতা ভোগ করিতেছে[৩৮]। বহুবিধ সুখ দুঃখের মধ্যপাতী ও জরা মরণ ঝটিকায় আহত ও উদয় গিরিগুহায় বিলুণ্ঠিত হওয়ায় এই সকল লোক শুষ্ক পত্রের ন্যায় লুণ্ঠিত হইতেছে সুতরাং কুশল কোথায়[৩৯]?

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিলাস ও ভাস, এই দুই দ্বিজ পরস্পর উক্ত প্রকার প্রশ্ন ও প্রতিবচন করিয়াছিলেন। পরে যোগ্য কালে বিমল জ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া ছিলেন[১]। হে মহাবাহো! তাই আমি বলি, জ্ঞান ব্যতীত সংসার তরণের অন্য উপায় নাই[২]। যে সকল দুঃখের বর্ণন করিলাম সে সকল বিবেকীর পক্ষে সুখচ্ছেদ্য[৩]। যিনি দেহাতীত (দেহাভিমান ত্যাগী), স্বাত্মচৈতন্য মাত্রে অবস্থিত ও মহাত্মা, তিনি দেহকে দর্শক ব্যক্তির দূর হইতে জনতা (মনুষ্যসমবায়) দর্শনের ন্যায় দর্শন করেন[৪]। দুঃখের দ্বারা দেহ আলোড়িত হয়, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? রথ ভগ্ন হইলে সারথির কি[৫]? হে অঙ্গ! মন বিলোড়িত হয় হউক, তাহাতে চিত্তত্ত্বের (আত্মার) কি হয়? সমুদ্র তরঙ্গালোড়িত হইলে তদ্দ্বারা তাহার পূর্ণতার হ্রাস হয় না[৬]। হংসগণ জলের কে? উপল সকলই বা কাষ্ঠের কে? কেহই নহে। সেইরূপ ভোগও পরমাত্মার নহে[৭]। হে শ্রীমন্ রাঘব! উত্তর পর্ব্বতের সহিত দক্ষিণ সমুদ্রের সম্পর্ক কি? সেইরূপ, সংসারের সহিতও পরমাত্মার সম্পর্ক বা সংশ্লেষ নাই[৮]। পদ্ম ক্রোড়ে ধার্য্যমাণ হইলে তাহাতে সরিতের কি হয়? সেইরূপ, দেহ ধারণেও পরমাত্মার কিছুই হয় না[৯]। যেমন কাষ্ঠের সহিত সংঘট্ট হইলে জল হইতে কণা উৎপন্ন হয় তেমনি আত্মা ও দেহ উভয়ের যোগে এই সকল চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি জন্ম লাভ করে[১০]। জলসন্নিধানেই জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ, আত্মাতেই দেহের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ অতিসান্নিধ্য প্রযুক্ত আত্মায় দেহাধ্যাস এবং দেহে আত্মাধ্যাস হইয়া থাকে[১১]। দর্পণপ্রতিবিম্বিত মুখাদি যেমন অসত্য; আত্মাতে দেহও সেইরূপ অসত্য[১২]। কাষ্ঠ কাষ্ঠের তাড়নে ও প্রস্তর প্রস্তরের আঘাতে দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ, দেহাকারে পরিণত পঞ্চভূত সকল পরস্পর সংযুক্ত থাকুক, আর বিযুক্ত হউক, তাহাতে আত্মার কোনরূপ ক্ষতি হয় না

১৩। জলে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে জল হইতেই শব্দাদি জন্মে, সেইরূপ, চিৎপ্রতিবোধিত দেহ হইতেই বিবিধ বোধ (চিত্তবৃত্তি) উৎপন্ন হয়। (চিৎপ্রতিবোধিত কথার অর্থ—চৈতন্যের সন্নিধানরূপ অধিষ্ঠান)[১৪]। সে সকল সংবিৎ (বোধ) কেবল জড়েরও নহে এবং কেবল শুদ্ধ চেতনারও নহে। কেননা, ঐ সকল বোধ আত্মাশ্রিত অজ্ঞানেরই পরিণতি। সুতরাং অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ঐ সকলের অভাব ও চিন্মাত্রের অবস্থিতি স্থিরীকৃত হয়[১৫]। অপিচ, দেহাভিমান হইতেই সুখ দুঃখের অনুভব প্রকাশ পায়। অতএব, যথাদৃষ্ট সংসার অজ্ঞদৃষ্টিতে সত্য; এবং তত্ত্বজ্ঞদৃষ্টিতে অসত্য[১৬,১৭]। ভাবিয়া দেখ, জল ও প্রস্তর একত্র সমাহৃত হইলেও জল প্রস্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। তাহা না পারায় জল প্রস্তরকে মৃত্তিকাদির ন্যায় সিক্ত করিতে (ভিজাইতে) পারে না। তেমনি, বাহ্য ভোগের অনুভূতিও অন্তঃসঙ্গবিহীন অর্থাৎ নিরভিমান মনকে অনুরঞ্জিত করিতে পারে না[১৮]। জল ও কাষ্ঠ একত্র সমাহৃত হইলে তদ্দ্বয়ের যদ্রূপ সম্বন্ধ ঘটে, দেহ দেহীর সমাহারে (একত্র সম্মিলনে) অসঙ্গস্বভাব দেহীরও তদ্রূপ সম্বন্ধ ঘটমান হয়[১৯]। অথবা জল ও জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্র উভয়ের যদ্রূপ সম্বন্ধ, দেহ ও দেহীর এতদুভয়ের তদ্রূপ সম্বন্ধ[২০]। সুখসম্বিৎ, দুঃখসম্বিৎ, ইত্যাদি প্রকারের সবিশেষ সম্বিদ্ হইতে বিশেষণ ভাগ অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিশেষণ অংশ নির্গলিত হইলে যে বিশুদ্ধা বা কেবলা সম্বিদ্ অবশেষিত হয়, সে সম্বিৎ অপরিচ্ছিন্না অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপীনী[২১]। বেতাল নহে এরূপ দৃশ্য বেতালত্বে ভাবিত হইলে বেতালই হয়। সেই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, নির্দ্দুঃখ পরমাত্মা দুঃখিত্বে ভাবিত হইয়াই দুঃখী হইতেছেন[২২]। স্থাণু পিশাচ না হইলেও, স্বপ্নাঙ্গনা অঙ্গনা না হইলেও, অন্তঃকরণের নিশ্চয়ে পিশাচের ও অঙ্গনার কার্য্য করিয়া থাকে। সেইরূপ, আত্মা অসঙ্গস্বভাব হইলেও সঙ্গীর ন্যায় হন[২৩]। কাষ্ঠের সহিত জলের সম্বন্ধ যদ্রূপ মিথ্যা, দেহের সহিত দেহীর (পরমাত্মার) সম্বন্ধও তদ্রূপ মিথ্যা[২৪]। জল অনুপ্রবিষ্ট না হইলে শুষ্কস্বভাব কাষ্ঠ কদাপি সিক্ত হয় না, সেইরূপ, অন্তঃকরণের কল্পনা না হইলে অসঙ্গস্বভাব আত্মাও দুঃখী হন না[২৫]। আত্মা দেহভাবে ভাবিত হইয়াই দৈহিক দুঃখে দুঃখিতের ন্যায় হন আবার সে ভাব পরিত্যাগে মুক্তি লাভ করেন[২৬]। পত্র, জল, মল,

কাষ্ঠ, এ সকল যদি অসম্বদ্ধ থাকে তাহা হইলে কেহ কাহার দোষে বা গুণে দোষী বা গুণী হয় না। সেইরূপ, যদি অহম্ভাবের অধ্যাস বিনষ্ট হয় তাহা হইলে দুঃখের অভাবও স্থায়ী হয়[২৭]। আত্মা, মন, দেহ ও ইন্দ্রিয়, এ সকল এক সমাহারে আছে সত্য; পরন্তু যদি আমি, আমার, এ অধ্যাস না থাকে তাহা হইলে দুঃখের সম্ভাবনা কি[২৮]? হে রামচন্দ্র! আমি সেই কারণে বলিতেছি, অন্তঃসঙ্গই (আমি, আমার, ইত্যাদি অধ্যাসই) দেহী দিগের জরা, মরণ ও মোহ প্রভৃতির বীজ[২৯]। ঐরূপ সঙ্গবান্ জীবই সংসারে মগ্ন হয়, তদ্ব্যতীত জীব সংসার হইতে বিমুক্ত হয়[৩০]। অন্তঃসঙ্গী চিত্তই (আমি আমার ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়কারী চিত্তই) শত শত শাখায় বিস্তৃত হয় এবং সঙ্গরহিত চিত্তই ক্রমে বিলীন হইয়া যায়[৩১]। সঙ্গযুক্ত মনকে তুমি ভগ্ন স্ফটিকের ন্যায় অপবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং অসংসক্ত মনকে অভগ্ন স্ফটিকের ন্যায় পবিত্র বলিয়া জানিবে[৩২]। অসংসক্ত মনকে তুমি নির্ম্মল ও মুক্ত এবং সংসক্ত মনকে তুমি বদ্ধ বলিয়া জানিবে[৩৩]। আসক্তি ও অনাসক্তি ব্যতীত বন্ধ মোক্ষের অন্যবিধ হেতু নাই[৩৪]। আসক্তিশূন্য নর কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তা নহে এবং আসক্তি যুক্ত নর কর্ম্ম না করিলেও কর্ত্তা। যেমন স্বপ্নকালে কিছু না করিলেও তত্তদুপলক্ষিত সুখ বা দুঃখ হয় তাহার ন্যায়[৩৫।৩৬]। চিত্তের কর্তৃত্বেই দেহের কর্তৃত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন[৩৭]। মন কর্তৃভাবরহিত হইলেই তাহাকে অকর্ত্তা বলা যায়। অতএব, শূন্যচিত্ত নর দেহের দ্বারা কোন কিছু করিলেও তাহা তাহার করা হয় না[৩৮]। তুমি চিত্তের দ্বারা যাহা করিবে তাহারই ফল পাইবে, রিক্তচিত্তে করিলে তাহার ফলভাক্ হইবে না। (রিক্তচিত্তে করা এ কথার তাৎপর্য্য—অভিসন্ধি রহিত হইয়া করা) অতএব, দেহ মুখ্য কারণ নহে, চিত্তই কর্তৃত্বের মুখ্য কারণ[৩৯]। যে হেতু অসংসক্ত মন অকর্ত্তা, সেই হেতু তাদৃশ নরের প্রতি কর্ম্মফলভোগের নিয়ম নাই[৪০]। ব্রহ্মহত্যাই বল, আর অশ্বমেধই বল, অসংসক্ত নর তত্তৎ কর্ম্মে অলিপ্ত[৪১]। যে জীব অন্তরাসক্তি বর্জ্জিত হইয়াছে তাহার বৃত্তি (ব্যবহার) অতিমধুর। তিনি বাহিরে অর্থাৎ লোক দৃষ্টিতে কোন কিছু করিলেও কর্ত্তা নহেন এবং ফলভাগীও নহেন[৪২]। সঙ্গমুক্ত সুতরাং অকর্ত্তা মন নিতান্ত প্রশান্ত ও নির্লিপ্ত[৪৩]। অতএব,

সর্ব্বদুঃখকরী অতি ক্রূরা অন্তরাসক্তিকে সর্ব্বতঃ প্রযত্নে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥। হে রাঘব! অন্তরাসক্তিরহিত নির্ম্মল নভঃ সদৃশ সুতরাং আত্মগামী হইলে তাদৃশ চিত্ত আত্মার সহিত মিলিয়া একীভূত হইয়া যায়। স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল জল তাদৃশ জলান্তরে নিক্ষেপ করিলে এক বা অভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ। (আত্মাও নির্ম্মল নভস্তুল্য; এবং অন্তরাসক্তিবর্জ্জিত চিত্তও নির্ম্মল আকাশ তুল্য; সুতরাং তাদৃশ চিত্ত তাদৃশ আত্মায় নিবিষ্ট মাত্রে তাহা আত্মার সহিত এক হইয়া যায়)॥।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

—০()০—
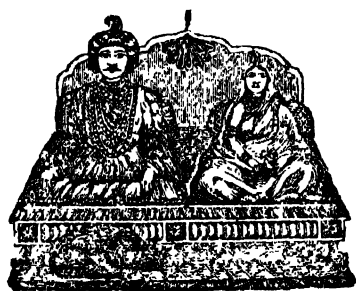
রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সঙ্গ কত প্রকার? তন্মধ্যে কোন্ প্রকার সঙ্গ বন্ধেব কারণ? এবং কোন্ প্রকার সঙ্গই বা মোক্ষের কারণ? যাহা বন্ধকারণ ও দুঃখপ্রদ তাহার প্রতিকারই বা কি? এই কয় বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন[১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, দেহ জড় এবং দেহী অজড় অর্থাৎ চিৎ, সুতরাং এ বিভাগ পর্য্যালোচনা না করিয়া দেহের উপর আত্মতাবিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক জীব যে আমি আমার করে, তাহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রে সঙ্গ এবং বন্ধ কারণ বলিয়া উক্ত হয়[২]। আত্মতত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন, অথচ জীব তাহার পরিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া সুখার্থী হয় তাহাও বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ[৩]। জগৎ কিছুই নহে, যে কিছু দৃশ্য সমস্তই আত্মা, অর্থাৎ আমি, সুতরাং আমার হেয়ও নাই উপাদেয়ও নাই, এতদ্রূপ বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া জীব যে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ ও আত্মতত্ত্বে আসক্তিমান্ হয়, তাহাই তাহার মোক্ষকারণ সঙ্গ[৪]। যে নর "আমি অহংপরিচ্ছিন্ন নহি, মদতিরিক্ত কিছুই নাই, দৃশ্য দেহাদি মিথ্যা; সুতরাং সে সকলে সুখের উদ্রেক হউক বা না হউক, আমি তাহাতে নির্লিপ্ত" এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছে সেই নর মোক্ষভাগী[৫]। নির্লিপ্ততা কথার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মে অনুরক্তও নহে, কর্ম্ম ত্যাগেও অভিনন্দিত নহে, অর্থাৎ উক্ত উভয়ে উদাসীন। আরও বিশদ কথা—ফলানুসন্ধান রহিত। তাদৃশ ব্যক্তিই যথার্থতঃ নির্লিপ্ত বা অসংসক্ত[৬]। যাহার চিত্ত হর্ষের ও অমর্ষের বশ্য হয় না সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত[৭]। যাহার মন সমুদায় কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই নর প্রকৃত অসংসক্ত[৮]। অসংসক্ত ব্যক্তির দুশ্চেষ্টা থাকে না। শ্রবণ মননাদি সুচেষ্টাই থাকে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) জন্মে[৯]। অনাসক্তির কথা বলিলাম, এক্ষণে আসক্তির ফলাফল শ্রবণ কর।

আসক্তির দ্বারাই দুঃখরাশি শত শাখায় বিস্তৃত হয়[১০]। গর্দ্দভ জীব যে ভার বহনে ক্লান্ত হয় তাহা তাহার আসক্তির বিজৃম্ভণ (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের

কৃত কর্ম্মের ফল)[১১]। বৃক্ষাদি স্থাবর জীব যে শীত বাত প্রভৃতি ভোগ বা সহ্য করে তাহাও তাহাদের পূর্ব্বজন্মীয় আসক্তির ফল[১২]। কীটাদি জীব যে ভূ-ছিদ্র বাসে ক্লেশ পায়, সে ক্লেশ তাহাদের পূর্ব্বসংসক্তির ফল[১৩]। বৃক্ষাগ্রশায়ী পক্ষজন্মও আসক্তির বিজৃম্ভণ এবং পশু দেহও প্রাগ্‌ভবীয় আসক্তির তাড়না[১৪,১৫]। আসক্তি পরিত্যাগে অক্ষম জীবেরা পুনঃ পুনঃ নানা যোনি পরিভ্রমণ করে। কখন কীট হয়, কখন পতঙ্গ হয়, কখন বা মনুষ্য হয়, এবং কখন বা যোন্যন্তর পরিভ্রমণ করে[১৬]। নদীতে অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত হয়। তাহার ন্যায় এই যে অসংখ্য দেহী জন্মিতেছে ও মরিতেছে ইহাও তাহাদের সংসক্তির বিজৃম্ভণ (কার্য্য)[১৭]। এই যে মনুষ্য জীব, ইহারাও সংসক্তির প্রভাবে সঙ্কারহীন তৃণ লতাদি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৮]। তৃণ গুল্ম ও লতা প্রভৃতিরা ভূমির অন্তর্গত রস পান করিয়া যাহা জন্মায় তাহাও সংসক্তির মহিমা[১৯]। অনর্থ পরম্পরায় পরিপূর্ণ ও অনন্ত পদার্থে সঙ্কুল (ব্যাপ্ত) এই যে সংসার নদী বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা সংসক্তির ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২০]।

হে রাম! সংসক্তিকে তুমি দুই প্রকার বলিয়া জানিবে। এক বন্দ্যা, অপর বন্ধ্যা। বন্দ্যা অর্থাৎ প্রশংসনীয়া এবং বন্ধ্যা অর্থাৎ পুরুষার্থ ফল শূন্যা। মূঢ় দিগের যে সংসক্তি তাহা বন্ধ্যা এবং তত্ত্ববিৎ দিগের যে সংসক্তি তাহা বন্দ্যা[২১]। আত্মতত্ত্ববোধবর্জ্জিত সংসক্তিকে (সংসারের সারতা জ্ঞানকে) তুমি বন্ধ্যা বলিয়া এবং আত্মতত্ত্ববোধদ্বারা নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক জাত সংসক্তিকে তুমি বন্দ্যা বলিয়া জানিবে[২২,২৩]। শঙ্খ-চক্রগদাহস্ত দেবদেব যে জগত্রয় পালন করিতেছেন, তাহা ঐ বন্দ্য সংসক্তির প্রভাব। রবিও বন্দ্য সংসক্তির মহিমায় অবিরত ব্যোম ভ্রমণ করিতেছেন, ব্রহ্মারও আবির্ভাব বন্দ্য সংসক্তির প্রভাব, শঙ্করের অবস্থিতিও বন্দ্য সংসক্তির মহাফল, সিদ্ধ ও লোকপাল গণের অবস্থানও বন্দ্য সংসক্তির কার্য্য[২৪,২৮]। শাস্ত্রে যে যমলোক, অপ্সরোলোক ও মহর্লোক প্রভৃতির বর্ণনা আছে, সে সকল লোকও বন্দ্য সংসক্তির মহাফল।

রাঘব! গৃধ্র যেমন মাংস খণ্ডে আপতিত হয় তাহার ন্যায় জীবগণ বন্ধ্যা সংসক্তির প্রেরণায় বৃথা ও ব্যর্থ আপাত রমণীয় সংসারে নিপ-

তিত হইয়া থাকে[২৯।৩০]। বায়ুর প্রবাহ, ভুত পঞ্চকের স্থিতি, জগতের নিয়মিত ভাব, সমস্তই সংসক্তির ফল। অর্থাৎ কর্ম্মরত জীব দিগেরই শুভাশুভ অদৃষ্টের জন্য ঐ সকল শৃঙ্খলা হইয়াছে ও রহিয়াছে। যেমন পক্ক উড়ুম্বর ফলের মধ্যে এক প্রকার মশক অবস্থান করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডরূপ উড়ুম্বরের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, তন্মধ্যে দেব নর ও নাগ সকল মশকতুল্য অবস্থান করিতেছে[৩১।৩২]। প্রাণী সকল নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করিতেছে, আবার মরিতেছে, এবং কখন উর্দ্ধগামী ও কখন বা অধঃপতিত হইতেছে[৩৩]। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ, এবং হ্রাস বৃদ্ধি সাম্য, সমস্তই সংসক্তির ফল। জীব সকল মাৎস্য বৃত্তি অবলম্বনে * জর্জ্জরীভূত হইয়া গলিত বৃক্ষপত্রের ন্যায় এই আকাশোদরে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবিয়া দেখ, আকাশে নক্ষত্রচক্র, বৃক্ষে মশক বৃন্দ ও কীটাদি কিরূপে বিস্ফুরিত হইতেছে[৩৪।৩৬]। ঐ যে চন্দ্র, উনিও কালরূপ শিশুর ক্রীড়া কন্দুক হইয়া পতন উৎপতন দশা ভোগ করিতেছেন। মন এক প্রকার দুষ্ট ব্রণ; (ছেদন ব্যতীত যাহার চিকিৎসান্তর নাই); তাহা নিতান্ত দুঃখপ্রদ হইলেও সংসক্তির বশ্য থাকায় দেবতা পর্য্যন্ত জীবেরা তাহার ছেদন করিতে পারিতেছে না। হে রামচন্দ্র! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই জগচ্চিত্রটী কেবল মাত্র আকাশে বাসনা মাত্রের দ্বারা চিত্রিত[৩৭।৩৯]। এ চিত্রের উপকরণীভূত রং কেবল জীব সমূহের সংসক্তি (মনের বাসনা) ও তাহার আধার পট আকাশ। সুতরাং ইহা অসত্য বৈ সত্য নহে[৪০]। এই সংসারে যাহারা সংসক্তি পূর্ব্বক বিচরণ করে, তৃষ্ণা (ভোগস্পৃহা) তাহাদের শরীর নিরন্তরই দগ্ধ করিতে থাকে[৪১]। যাহাদের মন সংসক্তিযুক্ত, বরং সমুদ্রের বালুকা সঙ্খ্যা করা যায় ত তাহাদের দেহপরম্পরা সঙ্খ্যা করা যায় না[৪২]। গঙ্গার তরঙ্গ গণনা করা যায়; পরন্তু সংসারাসক্ত দিগের দেহ গণনা করা যায় না। রমণীয় স্বর্গ, সুখাবাস অন্তঃপুর, তথা রৌরব, অবীচি ও কাল সূত্রাদি নামক নরক, সমস্তই সংসক্ত চিত্ত দিগের জন্য রচিত। তাহারা প্রজ্বলিত নরকাগ্নির ইন্ধন অর্থাৎ শুষ্ক কাষ্ঠ[৪৩।৪৫]। অধিক কি বলিব, জগতে

---

* মাৎস্যবৃত্তি অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করে তাহার ন্যায় অন্যান্য জীবেরাও জীবান্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহ সংসারে দেখা যায়, বলবান্ দুর্ব্বলের ভক্ষক অথবা পীড়ক। ইহাই মাৎস্য ন্যায় ও মাৎস্য বৃত্তি কথার অর্থ।

যে কিছু দেখা যায় সমস্তই দুঃখের জাল; এ জাল সংসক্ত চিত্ত দিগের জন্য কল্পিত[৪৬]। সংসক্তচিত্ত নরেরাই দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত হয়, অসংসক্তেরা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হয়[৪৭]। এই যে ভারভূত দেহ, ইহা জন্ম মরণাদি দশা গ্রস্ত ও অনন্ত দুঃখের আধার। ইহা সেই আসক্তিরূপিণী অবিদ্যার দ্বারা বিস্তৃত[৪৮]। অতএব হে রামচন্দ্র! সংসক্তি ত্যাগ ব্যতীত অর্থাৎ ভোগাসক্তি বর্জ্জন ব্যতীত নির্ব্বিকার শান্তি সুখের প্রত্যাশা নাই। হে রাম! তুমি অন্তঃসঙ্গ পরিত্যাগকে পরম রসায়ন বলিয়া জানিবে[৪৯।৫০]। লতা সকল স্বাবলম্বিত তৃণাদির দাহে দগ্ধ হইয়া থাকে। সেইরূপ, অন্তঃসঙ্গের দ্বারা প্রকৃতি কার্য্য দেহাদির দ্বারা প্রকৃতিভূত জীবও দগ্ধ হয়[৫১]। যাহাদের চিত্ত কিছুতেই ব্যাসক্ত নহে, তাহাদিগেরই চিত্ত সুখের কারণ[৫২]। অতএব যে পুরুষ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত করিয়া সংসক্তিবর্জ্জিত হইয়াছে সেই পুরুষই মুক্ত পুরুষ[৫৩]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিবেকী নর যদৃচ্ছা ন্যায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অবস্থান করেন সত্য; পরন্তু তাহারা চিত্তকে বক্ষ্যমাণ লক্ষণান্বিত করিয়া রাখেন[১]। যথাসাধ্য বিষয়ে চেষ্টা, অতীত বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ ও বর্ত্তমান বিষয়ে ভাবানুবন্ধ (রম্যারম্য বিচার পূর্ব্বক রম্যেরই[২] অনুসন্ধান) বর্জ্জন করেন। ঊর্দ্ধ বা অধঃ, অগ্র বা পশ্চাৎ, দিক্ অথবা বিদিক্, এ সকল গণনা করেন না। কি বহির্ব্বস্তু, কি ভোগ সুখাদি অন্তর্ব্বস্তু, কি ইন্দ্রিয় বৃত্তি, কি প্রাণ, কুত্রাপি ব্যাসক্ত চিত্ত হন না। মুর্দ্ধা, তালু, ভ্রূমধ্য, নাসাগ্র, মুখ, চক্ষুর তারা, এ সকলের কোনও কিছুতে তাঁহাদের মনে আসক্তি থাকে না। অন্ধকার বা আলোক গণনা করেন না এবং তাঁহাদের মন কোন কিছুতে আসক্তি পূর্ব্বক সংস্থাপিত হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা যোগশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াতেও অলোলুপ[৩।৪]। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন্ অবস্থা, সত্ত্ব রজ স্তমঃ, এই তিন্ গুণ, কিম্বা শ্বেত পীতাদি বর্ণ, চলত্ব ও স্থিরত্ব, আদি মধ্য ও অন্ত, দূর ও নিকট, সমুখ ও পশ্চাদ্ভাগ, এ সকল বিষয়েও তাঁহাদের চিত্ত উদাসীন[৫।৬]। শব্দ স্পর্শ রূপ, মোহ বা আনন্দ, তাঁহাদের লক্ষ্য মধ্যে থাকে না। গমনাগমনের ও দিন পক্ষ মাস ঋতু সম্বৎসর প্রভৃতি কালের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয়[৭]। তাঁহাদের চিত্ত কেবলমাত্র চিদাত্মায় বিশ্রাম করে, করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আভাস দৃষ্টির অনুরূপে বিষয়াবলম্বী হইয়া বিদ্যমান থাকে[৮]। তাঁহাদের চিত্তের সে অবস্থা আত্মরসে পরিপূর্ণ ও বিষয় রসের দূরে অবস্থিত। উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত জীব অজীব হয়, অজীব হইলে তখন তাহার এই সকল লৌকিক বৈদিক ব্যবহার করা ও না করা সমান হয়[৯]। মেঘ যেমন আকাশে বিচরণ করে অথচ আকাশে অসংশ্লিষ্ট, সেইরূপ, আত্মারাম নর লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম করিলেও তৎফলে অসংশ্লিষ্ট থাকেন[১০]। অথবা তিনি

কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র তৎসাক্ষিস্থানীয় হইয়া থাকেন[১১]। হে রামভদ্র! ফলেচ্ছা শূন্য জীবের বাসনা না থাকায় তাহাদের কৃত কর্ম্ম বন্ধ্যা হইয়া যায়, অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্ম হইতে ভবিষ্যৎ শুভাশুভের বীজ বা অঙ্কুর জন্মে না। তাঁহারা কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত (দেহ পাত না হওয়া পর্য্যন্ত) দেহ ভার বহন করে[১২]।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা অসঙ্গসুখাভ্যাসী তাহাদের আত্মা অতি বিস্তৃত অর্থাৎ মহান্। ব্যবহারে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের অন্তর বিশোক ও নির্ভয়[১]। তাঁহাদের বাহ্যিক চিহ্ন এইরূপ—পুত্র মিত্র ধন বিনাশাদিতে তাঁহাদের চিত্ত অচঞ্চল বা অক্ষুব্ধ থাকে। ও পরমার্থ সুখে পরিপূর্ণ থাকায় তাঁহাদের মুখশ্রী পূর্ণচন্দ্রাপেক্ষাও সুশোভনা[২]। যাহার মন চেত্যাবলম্বী নহে, চিন্মাত্র অবলম্বী, তাহাদের মন কতক-পরিস্কৃত জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বিজ্বর (কতক=নির্ম্মলীফল) হয়। লোকদৃষ্টিতে তাহারা চঞ্চলকল্প হইলেও অন্তরে সুমেরুর ন্যায় অটল অচল[৩।৫]। যেমন অত্যন্ত মসৃণ স্ফটিকে রং লাগে না, তেমনি, আত্মত্বপ্রাপ্ত চিত্তেও সুখ দুঃখের অনুরঞ্জনা হয় না[৬]। জীবেশ্বরতত্ত্বসাক্ষাৎকারী নরই চিত্তজয়ী ও নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত[৭]। জীব যত দিন না অন্তঃসক্ত হয় অর্থাৎ অধ্যানে বা অসমাধি কালেও সমাধি কালের ন্যায় ও ধ্যান কালের ন্যায় নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে না পারে, তত দিন বাহ্য বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ হয় না। অতএব, যে নর প্রবোধ প্রাপ্তে ধ্যানমগ্নতা ব্যতীত অন্য সময়েও (অর্থাৎ সর্ব্বদা) আত্মধ্যায়ী অর্থাৎ আত্মসুখে মগ্ন থাকে, সেই নর স্বসক্ত আখ্যায় অভিহিত হয়[৮]। আত্মসুখমগ্নতা অভ্যস্ত হইলে তখন অসংসক্তি আপনা হইতেই সিদ্ধ হয় (অভ্যস্ত বা স্বায়ত্ত হইয়া যায়)। কারণ এই যে, আত্মজ্ঞান বাহ্যাসক্তি দাহের বহ্নিস্বরূপ[৯]। হে রামচন্দ্র! আত্মদৃষ্টি প্রাপ্ত জীব জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্ত, প্রিয়াপ্রিয়ের অতীত, কালবর্জ্জিত ও উদয়াস্তরহিত[১০]। ক্রমে উক্ত অবস্থা দৃঢ় হইলে চিত্ত বাহ্যবৃত্তি পরিত্যাগী ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহাই জাগ্রৎসুষুপ্তি শব্দের অর্থ[১১।১২]। তাদৃশ সুষুপ্তি দশার ব্যবহার সুখ দুঃখের উৎপাদক নহে[১৩]। যে ব্যক্তি জাগ্রত সুষুপ্ত হইয়া ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করে সে ব্যক্তি বৈষয়িক সুখ দুঃখে অভিভূত হয় না। তাহার সেই ব্যবহার কার্য্য (গমনাগমনাদি) যন্ত্র পুত্তলিকার গমনাদি কার্য্যের অনুরূপ[১৪]। চিত্তের যে অহং আমি, ইত্যাকারে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য আছে, তাহাই

জনগণকে তাপ প্রদান করে। চিত্ত যদি আত্মমগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার তাপদায়ক সামর্থ্য থাকে না। অর্থাৎ অহং জ্ঞান না থাকিলে কে কাহাকে তাপ প্রদান করিবে[১৫]? সুষুপ্তবুদ্ধি পুরুষ কর্ম্ম করিলেও তদ্দ্বারা অবদ্ধ। হে রাম! তাই আমার বক্তব্য, তুমিও সুষুপ্ত দিগের ন্যায় কার্য্যতৎপর হও। কর্ম্ম পরিত্যাগ বা কর্ম্ম প্রবৃত্তি দুএর কিছুই জ্ঞানীর অভিমত নহে। জ্ঞানীরা যখন যাহা উপস্থিত তখন তাহা করেন কিন্তু আত্মভাব পূর্ব্বক[১৬।১৮]। তুমি সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়া কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তা হইবে না (ফলভাগী হইবে না)[১৯]। রাম! শিশু যেমন অভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া মঞ্চ (মঞ্চ=মাঁচা। সঞ্চালন=নড়ান।) সঞ্চালন করে, সেইরূপ তুমিও অভিসন্ধি বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর[২০]। লব্ধাত্মা নর "আমি কর্ত্তা—আমি করিতেছি" এরূপ অভিমান সহকারে কোন কিছু করে না; সুতরাং তাঁহারা জাগ্রতে সুষুপ্ত এবং চিৎ পদ প্রাপ্ত ও স্বস্থ[২১]। চিত্ত সে প্রকার সুষুপ্তবৎ অবস্থায় বাসনা শূন্য হয়; সুতরাং তদীয় অন্তরও চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল হয়[২২]। অগ্নি যেমন ছয় ঋতুতেই সমান অর্থাৎ অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত থাকে, তাহার ন্যায় উক্তাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ সর্ব্ব প্রকার অবস্থায় সমান অর্থাৎ বিকারশূন্য হন[২৩]। ধীর ও সুষুপ্তস্থ পুরুষ বাহিরে চঞ্চল হইলেও অন্তরে অচলের ন্যায় অচঞ্চল[২৪]। তুমি সুষুপ্তবৎ অবস্থা অর্জ্জন করিয়া দেহ পরিত্যাগ অথবা দেহ ধারণ যাহা ইচ্ছা করিতে পার[২৫]। রাম! পণ্ডিতেরা বলেন, উক্ত সৌষুপ্তি স্থিতি অভ্যাসযোগে দৃঢ়া হইলেই তাহা তুর্য্যাবস্থা[২৬]। উক্ত অবস্থা আনন্দময়, ক্লেশবর্জ্জিত ও নির্ম্মনস্ক[২৭]। জ্ঞানীরা ঐ অবস্থায় থাকিয়া এ সকলকে লীলা মাত্র অনুভব করেন এবং শোক ভয় আয়াস ও সংসার সম্ভ্রম হইতে সমুত্তীর্ণ হন। এই সকল তুর্য্যাবস্থা প্রাপ্ত নরের আর সংসারে পতন হয় না[২৮।২৯]। শৈলশিখরারূঢ় ব্যক্তি অধঃস্থ লোক দিগকে যে ভাবে দেখে ও দেখিয়া মনে মনে হাস্য করে, আত্মপদ প্রাপ্ত নরেরা সংসারমগ্ন লোক দিগকে তদনুরূপ ভাবে দেখেন ও দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন[৩০]। সেই তুর্য্যাবস্থা অবিনাশিনী, তৎপ্রাপ্ত নর আনন্দপূর্ণ। উক্তবিধ তুর্য্যপদের পরে তুর্য্যাতীত পদ, তৎপরে মুক্তি। মুক্তি হইলে সমস্ত জন্মবন্ধন পরিগলিত হয়। সকল প্রকার তমোময় অভিমান লয় প্রাপ্ত হয় ও জলগত সৈন্ধব পিণ্ডের ন্যায় পরমানন্দসত্তা এক রস হয়[৩১।৩৩]।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! কেবল চিন্মাত্র পদে অবস্থান করার নাম কৈবল্য পদ। ঐ পদ জীবন্মুক্ত দিগের অধিকৃত এবং শ্রুত্যাদি বাক্যের বিষয় অর্থাৎ বেদ বাক্যের প্রতিপাদ্য[১]। তৎপরে বিদেহ কৈবল্য, তাহাই বাক্যের অবিষয় অর্থাৎ বাক্য বিন্যাসের দ্বারা সে অবস্থা বুঝান যায় না[২]। হে রঘুপতে! বিদেহ মুক্ত দিগের সেই বিশ্রান্তি আকাশের ন্যায় দুরধিগম্য[৩]। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা অর্থাৎ সদেহ মুক্ত নরগণ কিঞ্চিৎ কাল সুষুপ্তের ন্যায় জগতে অবস্থান করেন (প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত), পরে চতুর্থ পদ প্রাপ্ত হন[৪]। রাঘব! যে প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ তূর্য্যাতীত পদ প্রাপ্ত হন, তুমিও সেই প্রকারে সেই নির্দ্বন্দ্ব পদ প্রাপ্ত হইবে[৫]। হে রামচন্দ্র! তূর্য্যপদের পূর্ব্বে সৌষুপ্ত পদ, তুমি তত্রস্থ থাকিয়া ব্যবহার পরায়ণ হইলে উদ্বেগাদি বর্জ্জিত হইবে। চিত্রিত চন্দ্রের কি ক্ষয় থাকে? না উদয় থাকে? তদ্বৎ তোমারও ক্ষয়োদয় নাই[৬]। এই যে শরীর, ইহারই ক্ষয় ও উদয় হইতেছে। তাহাতে "আমার বা আমি" জ্ঞান আরোপ করিও না[৭]। দেহ কি? দেহ মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ (কার্য্য) বিশেষ। সুতরাং ইহার বিনাশে ও অবস্থানে তোমার কোনও রূপ ইষ্টানিষ্ট নাই। অতএব, তুমি স্বাত্মবোধ স্থির রাখিবার জন্য যত্নবান্ থাক[৮]। তুমি সত্য কি তাহা জানিয়াছ, পরম পদ কি তাহাও বুঝিয়াছ, যাহা আপনার স্বরূপ তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছ। সম্প্রতি বিশোক অর্থাৎ শোকাদির অতীত হইয়াছ[৯]। আকাশ যেমন অন্ধকার ও মেঘ হইতে মুক্তি লাভ করিলে শোভা প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় তুমিও আজ্ ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগ করিয়া শোভমান হইয়াছ[১০]। তোমার মন এখন পরমাত্মভাবাপন্ন হইয়াছে, অতঃপর সে আর নীচগামী হইবে না। যেমন সিদ্ধগণ নভস্তল পরিত্যাগ করিয়া অবনীতল আশ্রয় করেন না, তাহার ন্যায় তোমার আত্মভাবাপন্ন মন যখন আর অনাত্মায় অভিবিষ্ট হইবে না[১১]। তারতম্য

বর্জ্জিত বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্বই আছে, অন্য কিছু নাই। ইহা তাহা সেই এই আমি তুমি, এ সমস্তই ভ্রম[১২]। আত্মা প্রভৃতি নামও ব্যবহারের নিমিত্ত কল্পিত। বস্তুতঃ নাম বা রূপ প্রভৃতি ভেদ উক্ত বিভুতে অন্তগত (অর্থাৎ নাই)[১৩]। সমুদ্র এই একটী নাম, তাহা জল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তত্রস্থ তরঙ্গাদিও জল হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। সেইরূপ, আত্মাই সমস্ত; জল ভূম্যাদিও অপৃথক্ অর্থাৎ তদতিরিক্ত নহে[১৪]। জলপূর্ণ সমুদ্র জলের অতিরিক্ত নহে। সেইরূপ, এই বিস্তৃতাকার জগৎও আত্মাতিরিক্ত নহে। হে প্রাজ্ঞ! এই, সেই, আমি, তুমি, এ সকল ব্যবস্থা দেহাদিভাবে ব্যবস্থিত। দেহাদিভাব ছাড়িলে ঐ সকল কি তাহা তুমি স্বয়ং অবধারণ কর। পরমার্থ ভাবে দ্বিত্ব বহুত্বাদিও নাই, দেহও নাই, দেহাদির সহিত সম্বন্ধও নাই। বরং সূর্য্যে কলঙ্কের অবস্থান সম্ভব হয় ত পরমাত্মায় ঐ সকলের অবস্থিতি সম্ভব হয় না[১৫।১৭]। হে শত্রুনাশন্! দ্বিত্ব বহুত্ব ও দেহাদি স্বীকার করিলেও বলিতে পারি, সে সকলের সহিত বিভু পরমাত্মার সম্পর্ক নাই[১৮]। যেমন আতপের সহিত ছায়ার ও আলোকের সহিত অন্ধকারের সম্বন্ধ অসম্ভব, তেমনি, দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ অসম্ভব[১৯]। যেমন শৈত্যের সহিত উষ্ণের সমাবেশ নাই, তেমনি দেহের সহিত আত্মার অসমাবেশ জানিবে। দেহাদি জড়, আত্মা অজড় অর্থাৎ চেতন। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিলেও স্বরূপতঃ সম্বন্ধশূন্য[২০।২১]। চিন্মাত্র, তাহার দেহ সম্বন্ধ, এ কথা অর্থশূন্য[২২]। যদি সত্য দৃষ্টি উদিত হয় তাহা হইলে ঐ সকল মিথ্যা দৃষ্টি তিরোভূত হইয়া যায়। সত্য দৃষ্টির অভাবেই ঐ সকল সৌর কিরণে জলধি দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[২৩]। চিদাত্মা নিতান্ত নির্ম্মল, নিত্য ও স্বপ্রকাশ, পরন্তু দেহ তাহার বিপরীত। অর্থাৎ সমল, অনিত্য ও পরাধীন প্রকাশ[২৪]। দেহস্থ বায়ুর দ্বারা ইহার স্পন্দন এবং ভূত পদার্থের দ্বারা ইহার স্থূলতা[২৫]। যদিও কোনও প্রকারে দ্বৈত থাকা সিদ্ধ করিতে পার তথাপি সম্বন্ধের সম্ভাবনা পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না। অহে বুদ্ধিমান্ রাম! যখন দ্বৈত পক্ষেও দেহ দেহীর বাস্তব সম্বন্ধ অসম্ভব হয়, তখন অদ্বৈত::পক্ষের কথা কি বলিব[২৬]? অতএব হে রঘুপতে! তুমি অন্তরে ইহাই অবধারণ করিবে যে, বন্ধও নাই এবং মোক্ষও নাই। বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা

অজ্ঞগণের জন্য সুতরাং কাল্পনিক[২৭]। (কাল্পনিক কথার অর্থ মিথ্যা জ্ঞানের রচনা। সুতরাং যাহা মিথ্যা জ্ঞানের রচনা তাহা অবস্তু)।

হে, রামচন্দ্র! বাহিরে অন্তরে সর্ব্বত্রই শান্ত আত্মা বিরাজিত, এই প্রত্যয়কে তুমি দৃঢ় করিতে চেষ্টা পাও। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, এ সকল দুর্দৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যা প্রত্যয়। ঐ সকল দৃষ্টিকে বস্তু অর্থাৎ সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলে তুমি চিরকালের নিমিত্ত দুঃখী হইবে[২৮।২৯]। শৈলের সহিত তৃণের ও কোশেয়ের সহিত পলালের যে অন্তর বা প্রভেদ, পরমাত্মার সহিত দেহাদির সেইরূপ প্রভেদ জানিবে[৩০]। যেমন তোমার সহিত তিমিরের সম্বন্ধ নাই এবং তুলনাও হয় না, তেমনি, আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বা তুলনা, দুএর কিছুই সম্ভাবনা হয় না[৩১]। যেমন শীতোষ্ণের ঐক্য কথাপ্রসঙ্গেও সম্ভব হয় না, সেইরূপ জড়দেহ ও অজড় আত্মা উভয়ের ঐক্য সর্ব্বথা অসম্ভব[৩২]।

দৈহিক শিরায় প্রশিরায় বিদ্যমান ও বিচরণকারী বায়ুর দ্বারা দেহের গতাগতি সম্পন্ন হইতেছে এবং তাহারই দ্বারা এই দেহ শব্দ করিতেছে (কথা কহিতেছে)। যেমন বেণু নির্ম্মিত বংশীর নিনাদ তত্রস্থ রন্ধ্র বিশেষের দ্বারা স রি গ ম প ধ নি প্রভৃতি ভেদানুভেদ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ দেহস্থ সমীরণও দৈহিক কণ্ঠাদি ছিদ্র পথ দ্বারা তদুত্থ ধ্বনিকে ক চ ট ত প প্রভৃতি বর্ণে বিভিন্ন করে[৩৩।৩৪]। চক্ষুঃস্পন্দন ও ইন্দ্রিয় গণের কার্য্যও উক্ত বায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য যে, উক্ত সমস্তই আত্মসংবিতের অনতিরিক্ত[৩৫]। আকাশ উপল ও কুড্য, সর্ব্বত্রই আত্মার রূপান্তর মাত্র দৃষ্ট হইতেছে[৩৬]। চিত্তরূপ পক্ষী দেহরূপ নীড় পরিত্যাগ করিয়া স্বোপার্জ্জিত বাসনা জালের প্রভাবে যে স্থানেই গমন করুক, আত্মা সর্ব্বত্রই স্বানুভূতির দ্বারা অনুভূয়মান হন[৩৭]। যে স্থানে পুষ্পসংবিৎ, সেই স্থানেই গন্ধসংবিৎ। এইরূপ, যে স্থানে চিত্ত সেই স্থানেই আত্মসংবিৎ (চৈতন্য)[৩৮]। আকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু যে স্থানে আদর্শ সেই স্থানে তাহার প্রতিবিম্ব। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, আত্মাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, পরন্তু যে স্থানে চিত্ত, সেই স্থানেই তাহার অনুভূতি[৩৯]। নিম্ন ভূমিই জলের আস্পদ। তাহার ন্যায় অন্তঃকরণই আত্মসংবিতের আস্পদ[৪০]। অতএব, হে রামচন্দ্র! এই

জগতের রূপ সত্যাসত্য বিমিশ্রিত। যেমন সূর্য্যের প্রভা আলোক বিস্তার করে তাহার ন্যায় অন্তঃকরণ এই সকল মিথ্যার বিস্তৃতি করিতেছে[৪১]। অতএব, অন্তঃকরণই অন্তরে আন্তর সৃষ্টির ও বাহিরে ভূত সৃষ্টির কারণ, সর্ব্বাতীত আত্মা কোন কিছুর কারণ নহেন। আত্মাকে কারণ বলা যায় বটে; পরন্তু তাহা সন্নিধান বশতঃ অয়স্কান্তের অনুরূপ নিমিত্ত কারণ মাত্র[৪২]। উক্ত অন্তঃকরণের কারণ অজ্ঞান, তাহার অন্য নাম অবিচার ও মৌর্খ্য[৪৩]। অসম্যক্ দর্শন হইতেই চিত্তের অস্তিতা জন্মে। সুতরাং সম্যক্ দর্শন দ্বারা তাহার অসত্তা স্থিরীকৃত হয়। অতএব হে রাঘব! সংসারের কারণীভূত চিত্তের বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীব, অন্তঃকরণ, চিত্ত, মন, এ সমস্তই সেই একেরই নাম, ইহা অবধারিত জানিবে[৪৪,৪৬]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ঐ সকল নাম বা সংজ্ঞা কি প্রকারে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন্[৪৭]।

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, এই সমস্ত জন্য বস্তু সেই আত্মতত্ত্বের রূপান্তর। অর্থাৎ চিত্তের দ্বারা আত্মতত্ত্বে জলে তরঙ্গোৎপত্তির ন্যায় এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে[৪৮]। যেমন সমুদ্রের জল কোথাও অতি লোল এবং কোথাও অচঞ্চল, সেইরূপ, জায়মান কোন কোন পদার্থে আত্মা স্পন্দরূপে অবস্থিত এবং কোন কোন পদার্থে স্পন্দবর্জ্জিত রূপে বিদ্যমান[৪৯,৫০]। সেই কারণে প্রস্তরাদি অলোল অর্থাৎ অচেতন এবং জীবাদি লোল অর্থাৎ স্পন্দায়মান বা চেতন[৫১]। অতএব, সর্ব্বশক্তি আত্মা যে যে শরীরে অজ্ঞান শক্তিতে আবিষ্ট, সেই সেই শরীর অজ্ঞ আখ্যায় অবস্থিত। অতএব, যে শরীরে তাদৃশ আত্মা স্বয়ং ও স্বকল্পিত অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, সেই শরীরে তিনি জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। এই জীবই এতৎ সংসারে মায়া পিঞ্জরের হস্তী[৫২,৫৩]। জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করেন বলিয়া জীব, অহং ভাব ধারণ করায় অহং, নিশ্চয় করেন বলিয়া বুদ্ধি এবং সঙ্কল্প করেন বলিয়া মন সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ[৫৪]। বলা বাহুল্য যে, সেই স্বকল্পিত স্বাত্মাজ্ঞান পদার্থই প্রকৃতি, এবং তাহারই হ্রাস বৃদ্ধি যোগে দেহ। অতএব দেহের প্রাকৃতিক অংশ জড়, আর তাহাতে স্বাত্মসত্তা চেতন। এইরূপে এই চরাচর বিশ্ব চেতনাচেতন বা জড়াজড়রূপী হইয়াছে। জড়বিপরীত চেতন

এবং চেতনবিপর্য্যয় জড়, এই দুএর মধ্যে পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যমান। সেই পরমাত্মতত্ত্বই উক্ত প্রকারে নানা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতেছেন[৫৫।৫৬]। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বেদান্তে জীবের স্বরূপ অভিহিত প্রকারে নির্ণীত হইয়াছে। হে অনঘ! যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই কুতার্কিক গণের নানা কুতর্কে জীবের স্বরূপ বোধে বিমুগ্ধ[৫৭।৫৮]। হে মহাবাহো! সংসারের কারণীভূত জীবত্ব যেরূপ তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ভাবিয়া দেখ, দেহ মূক এবং নিতান্ত তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর। দেহ ও আত্মা এই দুই পদার্থের মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন স্বরূপ সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহার একতর বিনাশে অন্যতরের বিনাশ হইবে কেন? যদি তাহা না হয়, তবে অবশ্যই শরীরের নাশে আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা সহজ বুদ্ধিরও গম্য হইবে[৫৯।৬০]। একটী বৃক্ষপত্রের রস শুষ্ক হইলে কি সমুদায় পত্রের রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়[৬১]? তাহা হয় না। তদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, শরীরের ক্ষয়ে শরীরীর ক্ষয় হয় না। শরীরী যদি বাসনা পরিবেষ্টিত থাকে তাহা হইলে সে, শরীরের নাশে বাসনা পুঞ্জে অবস্থান করে, পরন্তু বাসনাশূন্য হইলে সে, শরীব বিনাশের পর ব্রহ্মত্বে স্থিতি লাভ করে[৬২]। দেহ নাশে আমি বিনষ্ট হইব, এ বিভ্রম যাহাদের আছে, আমি মনে করি, তাহারা জননীর স্তনতটেও ভূত প্রেতের আশঙ্কায় ভীত হয়[৬৩]। অতএব, চিত্তের আত্যন্তিক বিনাশ ব্যতীত পুনর্জ্জন্মাদির ভয় নিবারিত হয় না। চিত্তের আত্যন্তিক বিনাশই মোক্ষ[৬৪]। তদ্ব্যতীত মরণ, তাহা দেহের তাৎকালিক অদর্শন মাত্র। কেননা, অন্য কালে পুনর্ব্বার দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইবে। অজস্র রূপে দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে। জন্তু সকল এই সংসারে তরঙ্গ পতিত তৃণের ন্যায় নিরন্তর উহ্যমাণ হইতেছে সুতরাং মরণ একটী ব্যপদেশ (কথা) মাত্র[৬৫।৬৬]। যেমন বানরেরা এক বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষে যায় তেমনি বাসনাবেষ্টিত জীবেরাও এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায় আবার সে দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে যায়[৬৭।৬৮]। চতুরা ধাত্রীগণ যেমন বালক দিগকে ইতস্ততঃ নীয়মান করে তাহার ন্যায় জীবের স্বোপার্জ্জিত বাসনাই জীব দিগকে ইতস্ততঃ নীয়মান করে[৬৯]। বাসনা জালে বিজড়িত হইয়াই জীব সকল পরস্পর পরস্পরের উপজীব্য হইতেছে ও দিন দিন জীর্ণ হইতেছে[৭০]। জীব সকল স্ব

হৃদয় নিহিত বাসনার অনুবর্ত্তনে জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া রোগ শোক দরিদ্রতা প্রভৃতি বিবিধ দুঃখের ভার নিরন্তর বহন করিতেছে, নানা যোনি ভ্রমণ করিতেছে, শত শত দুর্দ্দশায় গ্রস্ত হইতেছে, পরিণামে নরক বাসে নিযুক্ত বা প্রেরিত হইতেছে[১১]।

বাল্মীকি বলিলেন, মুনিপ্রবর বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিলে দিবা অবসান হইল। দিবা অবসান দেখিয়া সভাস্থ জনগণ সায়ং কর্ত্তব্য সাধনার্থ সভাস্থান পরিত্যাগ করিলেন। রজনী অবসানে পুনর্ব্বার তাঁহারা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ দিবস।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেহের জন্মে ও বিনাশে তুমি জাত ও নষ্ট হও না। তুমি বিশুদ্ধ আত্মা, দেহ তোমার কেহ নহে[১]। দেহে আত্মার অবস্থিতি কুণ্ডে বদরের অথবা ঘটে আকাশের অবস্থিতির অনুরূপ। যেমন কুণ্ডের অপচয়ে বদরের অপচয় হয় না, তাহার ন্যায় দেহের অপচয়ে আত্মার অপচয় হয় না[২]। এই নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইবে, তৎসঙ্গে আমিও বিনষ্ট হইব, এইরূপ ভাবিয়া যাহারা খেদ করে তাঁহাদিগকে ধিক্[৩]! রশ্মির (অশ্বের লাগাম) ও রথের যেরূপ সম্বন্ধ, দেহের সহিত চিত্তের ও ইন্দ্রিয়ের সেইরূপ সম্বন্ধ[৪]। হে রাঘব! সরোবর, পঙ্ক, নির্ম্মল জল, এই তিন যেমন পরস্পরাপেক্ষ, দেহ ইন্দ্রিয় আত্মা, এ তিনও সেইরূপ পরস্পরাপেক্ষ[৫]। পথিকেরা যাবৎ পথে থাকে তাবৎ তাহাদের আস্থা বা আত্মীয়তা। তৎপরে তাহারা কেহ কাহার প্রতি আস্থা রাখে না। দেহ ও আত্মা ঠিক্ সেইরূপ। যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ মোহ বশতঃ ইহার প্রতি আস্থা, তৎপরে এতদ্দেহের প্রতি আর আস্থা থাকে না[৬]। কল্পিত বেতাল (ভূত প্রেত) কল্পক দিগের ভয় উৎপাদন করে, কল্পিত স্নেহ মমতা ও সুখ দুঃখও কল্পক দিগকে স্নিগ্ধ, সুখী ও দুঃখী করে[৭]। একই বৃক্ষ (কাষ্ঠ) হইতে যেমন শিল্পীর দ্বারা বিবিধ পুত্তলিকা প্রস্তুত হয় তাহার ন্যায় সম্পিণ্ডিত পঞ্চ ভূত হইতে এই সকল বিবিধাকার জন্তু উৎপন্ন হইয়াছে[৮]। কাষ্ঠপুঞ্জে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ, দেহেও ভূত পঞ্চক ব্যতীত অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না[৯]। অহে জনগণ! তোমরা এই সম্পিণ্ডিত পঞ্চ ভূতের বিক্ষোভে বিনাশে ও উৎপত্তিতে হর্ষ বিমর্শ ও বিষাদ অনুভব কর কেন[১০]? স্ত্রীশরীর হউক, আর পুংশরীর হউক, উহাতে এমন কি অতিরিক্ত পদার্থ আছে—যাহার জন্য তোমরা পতঙ্গের বহ্নি পতনের ন্যায় বিষয় বহ্নিতে নিপতিত হইতেছ[১১]? যদি বল, সন্নিবেশের (অঙ্গের গঠনের) বৈচিত্র্য আছে; তাহাতে আমার বক্তব্য—

উক্ত বৈচিত্র্যে অজ্ঞের মনস্তুষ্টি হইতে পারে; পরন্তু বিজ্ঞের নহে।[৫] বিজ্ঞগণ জানেন, সে সমস্তই দৃশ্য ভূতপঞ্চকের অনতিরিক্ত[১২]। শিল্পীরা প্রস্তরে পুত্তলিকা প্রস্তুত করে, তন্মধ্যে কোনটী পুত্র এবং কোনটী মাতা, অথচ তাহাদের কেহ কাহার প্রতি স্নেহ মমতাপন্ন নহে। চিত্ত ও শরীর, এই দুএরও পরস্পর তদ্রূপ সম্বন্ধশূন্যতা নির্দ্ধারিত হয়[১৩]। মৃত্তিকারচিত প্রতিমা আর বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন, সমান (সম্বন্ধপক্ষে) জানিবে[১৪]। প্রস্তর পুত্তলিকা যতই একত্র থাকুক, কেহ কাহার সম্পর্কভাজন নহে। তাহার ন্যায় দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন, ইহারাও পরস্পর কোনরূপ বাস্তব সম্পার্কের ভাজন নহে[১৫]। যেমন বিভিন্ন দেশ জাত তৃণ জলতরঙ্গে একত্র মিলিত হয়, তাহার ন্যায় ভূত সকল দেহধারী জীব দিগের দেহের জন্য তাহাদের অদৃষ্ট বশে একত্র মিলিত হয়[১৬]। তরঙ্গে উহ্যমান তৃণ কখন সংযুক্ত কখন বা বিযুক্ত হয়। সেইরূপ দেহও কখন বা আত্মায় সংযুক্ত কখন বা তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে[১৭]। যেমন সমুদ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও তৃণ কাষ্ঠাদি যুক্ত হইয়া অবস্থান করে তাহার ন্যায় আত্মাই উপচিত অর্থাৎ চিত্তাকার প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন[১৮]। জল যেমন স্পন্দন পরিত্যাগে স্থির ও স্বচ্ছ হয় তাহার ন্যায় আত্মাও চেত্য (চিত্তের দৃশ্য) পরিত্যাগে স্বরূপাবস্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতি উচ্চস্থ বায়ুর স্তরে অবস্থিত জীব অর্থাৎ খেচরত্ব প্রাপ্ত দেবাদি জীব পৃথিবীমণ্ডলকে যে ভাবে দেখে, মুক্ত জীব দেহকে ঠিক্ সেই ভাবে দৃষ্ট করে[১৯।২০]। ভূতগণ পৃথক্ দৃষ্ট হইলেই অজ আত্মা দেহাতীত হন[২১]। তখন ক্ষীবতা পরিত্যাগে (মদের নেশা ছুটিয়া গেলে) আপনার স্বস্থ সংবিৎ অনুভবের ন্যায় আপনার জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতির অতীতত্ব অনুভব করেন[২২]। আত্মাই এই বিশ্ব ও বিশ্বস্থ ফলের বৃন্তরূপে প্রস্পন্দিত[২৩]।

হে মহাবাহো! যাঁহারা মহাবুদ্ধিধর, নিষ্পাপ, বীতরাগী, তাঁহারা উক্ত প্রকার বোধ সম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহারা জীবন্মুক্ত ও মহাত্মার পদ প্রাপ্ত[২৪]। তাঁহাদের বাসনা নাই তাঁহারা মণি রত্ন বিভূষিত থাকিলেও অনাসক্তি বশতঃ সে সকলের প্রতি প্রস্তর খণ্ডের অনুরূপ। কূলস্থিত কাষ্ঠে জলনিধি ও ধূলি পুঞ্জে নভস্তল যেমন মালিন্য প্রাপ্ত হয় না তাহার ন্যায় আত্মজ্ঞ লোক ব্যবহার কার্য্যে মালিন্য

প্রাপ্ত হন না[২৫।২৬]। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ভোগের ক্ষয়ে বিদ্বিষ্ট ও ভোগ লাভে সন্তুষ্ট হন না[২৭]। কেননা তাঁহারা জানেন, সমস্তই মনের মনন, অর্থাৎ মনের কল্পনা[২৮]। অন্তরের অহন্তা ও বাহিরের ভূতাদি ও কালাদি সমস্তই মনের বিজৃম্ভণ[২৯]। দৃক্ ও দৃশ্য সৎ অথবা অসৎ (অবিদ্যমান বা মিথ্যা) যাহা হয় হউক, সমস্তই হর্ষ শোকের অযোগ্য[৩০]। অহে জীবগণ! এ সকল যদি অসত্য হয় তবে অবশ্যই তন্নিমিত্ত হর্ষ শোক বৃথা এবং যদি সত্য হয় তাহা হইলেও হর্ষ শোক করা অপরিহার্য্য কারণে অবিধেয়[৩১]। অহে সুদৃষ্টি জীবগণ! তাই তোমাদিগকে বলি, তোমরা অসম্যক্ দর্শন পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ দর্শন অবলম্বন কর। যাহারা সম্যক্ দর্শী তাহারা কদাপি মোহের বশ্য হয় না[৩২]। যাহা পারমাত্মিক সুখ অর্থাৎ আত্মার সুখরূপিত্ব, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত জনগণ বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বাঞ্ছা করিয়া থাকে। সাধক বা জ্ঞানী যদি অনুধাবন বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারেন, সেই বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ জাত মনোবৃত্তি গুলি মিথ্যা পরন্তু সে সকলে অভিব্যক্ত যে অনুভূতি তাহা এক অখণ্ড ও সত্য এবং সেই অনুভূতিই ব্রহ্ম[৩৩।৩৪]। উক্ত অনুভূতিময় ব্রহ্ম অজ্ঞকে সংসার ও তজ্জ্ঞকে মোক্ষ প্রদান করে। দৃশ্যদর্শনে যে সুখ অভিব্যক্ত হয় সেই সুখ পরমাত্মার বপু বা শরীর। অতএব তাহার সহিত (দৃশ্যের সহিত) সম্বন্ধতাই বন্ধন এবং অসম্বন্ধতাই মোক্ষ। অপিচ সেই সুখসংম্বিদ্ যদি ক্ষয় ও অতিশয় (তারতম্যযুক্ত) যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে বন্ধন বলা যায় নচেৎ তাহাই মোক্ষ নামের নামী[৩৫।৩৭]। দৃশ্যদৃষ্টি বর্জ্জিত উত্তমাশয় পুরুষ অভিহিত প্রকার আত্মস্বরূপ অবলম্বন করিবা মাত্র আবরণ দৃষ্টি (মিথ্যা জ্ঞান) বিনষ্ট হয়। আবরণ দৃষ্টির বিনাশে স্বরূপ দৃষ্টি প্রকাশ পায়[৩৮]। দৃশ্যদর্শন মোচনের নামই মুক্তি ও তুর্য্যত্ব প্রাপ্তি[৩৯]। হে রাঘব! উক্তাবস্থা প্রাপ্ত আত্মাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, চেতন, জড়, সৎ, অসৎ, অহংগম্য, অনহংগম্য, এক, অনেক, দূর, নিকট, অস্তি, নাস্তি, প্রাপ্য, অপ্রাপ্য, সর্ব্ব, অসর্ব্ব, পদার্থ, অপদার্থ, পঞ্চাত্মা, অপঞ্চাত্মা, কোন কিছু বলা যায় না। মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত যে কিছু দৃশ্য, ঐ অবস্থা তৎ সমস্তের অতীত। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মা[৪০।৪১]। ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, সমস্তই

আত্মা। আত্মারই অস্তিত্বে ঐ সমুদারের অস্তিত্ব। আমি চৈতন্যাতিরিক্ত, এ উক্তিও উন্মত্তজল্পনা[৬৬]। হে রামচন্দ্র! তোমার মতি এইরূপে স্থিতি লাভ করুক যে, আমিই কল্পাদিকাল ও ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান গত পদার্থ নিচয়, আন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদি এবং বলা বাহুল্য যে, সমস্তই আমি আত্মা[৬৭]।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! উক্ত প্রকার বিচারজাত বিজ্ঞানের দ্বারা দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যক্ত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞগণ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১]। এক্ষণে অপর এক বিচার্য্য কথা বা জ্ঞানদৃষ্টির কথা বলি, তাহাও শ্রবণ কর। করিলে তোমার দিব্যজ্ঞান অচল অর্থাৎ স্থায়িতা প্রাপ্ত হইবে[২]।

আকাশ, আদিত্য, দিক্, অধঃ, ঊর্দ্ধ, দৈত্য, দেবতা, দিবা, রাত্রি, আলোক, অন্ধকার, মেঘ, পৃথিবী, সমুদ্র, রজঃ, বায়ু, অগ্নি, এ সমস্তই আমি[৩।৪]। ত্রিজগতের সর্ব্বত্রই আমি অর্থাৎ কেবল আত্মাই সর্ব্বত্র ব্যবস্থিত। যে হেতু সমুদায়ই আত্মা, সেই হেতু দ্বিত্ব বা একত্ব অসম্ভব[৫]। অতএব হে মহাবাহু রাম! তুমি অন্তরে ঐরূপ নিশ্চয় স্থির রাখিয়া জগৎকে আত্মময় সন্দর্শন কর, তাহা হইলে তুমি অতঃপর আর হর্ষ শোকের বশ্য হইবে না[৬]। হে অনঘ! এই আত্মময় জগতে আবার আত্ম পর প্রভেদ কি[৭]? হর্ষ আসুক, আর বিষাদ আসুক, তত্ত্বজ্ঞগণ তাহাতে অভিভূত হন না[৮]। তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্ম্মল ও পারমার্থিক দুই প্রকার মোক্ষপ্রদ অহং দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে। আমি অবস্থাত্রয়ের অতীত, দৃশ্য মাত্রের অতীত, আকাশের ন্যায় অস্থূলস্বভাব, এই এক প্রকার এবং আমিই সর্ব্বময় বা সর্ব্বত্রানুস্যূত এই এক প্রকার। আর এক প্রকার অহং আছে তাহা দেহঘটিত। দেহঘটিত অহঙ্কারই দুঃখের কারণ[৯।১১]। তুমি উক্ত ত্রিবিধ অহঙ্কার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ণ চিন্মাত্র ভাবের আশ্রয় লইবে[১২]। অসত্তার দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা জগতের বাধ বা অভাব স্থিরীকৃত হইলেই জগৎ আত্মায় পরিপূরিত হয় তদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না[১৩]। সেই কারণে বলিতেছি, তুমি যদি স্বীয় অনুভূতি মাত্র অবলম্বনে দেখ, দেখিতে পাইবে, তুমি যাহা তাহাই আছ, মধ্যেও তোমার বিকৃতি হয় নাই। হে তত্ত্ববিদ্ শ্রেষ্ঠ! তুমি যদি দেহাদিবাসনারূপ হৃদ্‌গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পার তাহা হইলে তোমার

স্বতঃই স্বাত্মপ্রকাশক স্বানুভূতি অনাবৃত হইবে, নচেৎ হইবে না। হে রামচন্দ্র ! অনুমান দ্বারা অথবা আপ্তবাক্য (আপ্তবাক্য=শাস্ত্রীয় উপদেশ) দ্বারা আত্মার অস্তিতা জানিতে হয় না, তাহা সর্ব্বদাই স্বানুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ। দর্শন, স্পর্শন ও স্পন্দন প্রভৃতি যে কোন বিষয় হউক না কেন, সে সকলে যে সম্বিদের অবগাহন দেখিতে পাও, সংবেদ্যবর্জ্জিত (প্রকাশ্য পদার্থের প্রকাশক) সেই সম্বিৎকে তুমি ভগবান্ বলিয়া জানিবে[১৪।১৬]। উক্ত ভগবান্ সৎ, অসৎ, অণু ও বৃহৎ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য নহেন। তিনিই বক্তা, পরন্তু বক্তব্য নহেন। বৎস রাম! এই বিশ্ব তাঁহার অতিরিক্ত নহে। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম সকল তাঁহারই আশ্রিত ও অজ্ঞানের পরিকল্পিত[১৭।১৯]। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব বস্তুতে স্থিতি করিতেছেন পরন্তু সূক্ষ্মত্ব ও নিরতিশয় মহত্ত্ব কারণে তিনি সকলের জ্ঞানে পরিমিত হন না[২০]। যদিও অসংখ্য পদার্থ আছে, তথাপি, পুর্য্যষ্টক রূপ * আদর্শে আত্মা প্রতিবিম্ব পাত দ্বারা জীবরূপে অভিব্যক্ত হন, প্রতিবিম্ব অভাবে অন্যত্র (শিলাদি পদার্থে) বিস্পষ্ট জীব ভাব প্রাপ্ত হন না। পুর্য্যষ্টকেই আত্মার বিস্পষ্ট উদয় এবং তাহাতেই তিনি অহং ইত্যাকারে অনুভূয়মান[২১।২২]। এই চিদাত্মা সর্ব্বগামী ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তিনি এক শরীরে আছেন, অন্য শরীরে নহেন, এরূপ নহে। যে যে দেহে পুর্য্যষ্টক, সেই সেই দেহে তাঁহার স্ফূর্ত্তি অধিক, অন্যত্র অর্থাৎ প্রস্তরাদি পদার্থে পুর্য্যষ্টক না থাকায় সে সকলে তাঁহার স্ফূর্ত্তির বা ব্যক্ততার সম্পূর্ণ অভাব[২৩।২৪]। তাঁহার ইচ্ছা শক্তি, সুখরূপিত্ব ও প্রীতিরূপিত্ব প্রভৃতি পুর্য্যষ্টকেই প্রতিফলিত হয়[২৫]। যেমন সূর্য্যের উদয় থাকাতেই জীবগণের ক্রিয়া ও ক্রিয়াকলাদি প্রবর্ত্তিত থাকে, অন্যথা সে সকল লুপ্তকল্প হয়, সেইরূপ, পুর্য্যষ্টকে আত্মার উদয় (প্রতিবিম্বপাত) থাকাতেই জীবত্ব ব্যবহার সম্পন্ন হয়। অতএব, উপাধির বা প্রতিবিম্বাধার দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ আশঙ্কনীয় নহে। প্রতিবিম্বাধার জলভাজনের (জল পাত্রের) বিনাশে কি সূর্য্যের বিনাশ আশঙ্কনীয়[২৬।২৭]? আত্মার জন্ম ও মরণ দুএর কিছুই নাই, তিনি কিছু করেন না, কিছু গ্রহণ করেন না, তিনি মুক্তও নহেন

* পুর্য্যষ্টক শব্দের অর্থ লিঙ্গ শরীর। উহাকে সূক্ষ্ম শরীরও বলে। কাম কর্ম্ম বাসনাযুক্ত মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সমষ্টিকেও পুর্য্যষ্টক বলে।

বদ্ধও নহেন[২৮]। তিনি অপ্রবোধে অর্থাৎ অজ্ঞানে উদিত (প্রতিবিম্বিত) থাকিলেই অনাত্মায় আত্মভ্রান্তি জন্মে এবং তন্নিবন্ধন তিনি নানাপ্রকার দুঃখ দর্শন করিতে থাকেন[২৯]। তাঁহার আদি অর্থাৎ কারণ না থাকায় জন্ম নাই, জন্ম না থাকায় মরণও নাই এবং তদতিরিক্ত পদার্থ না থাকায় তাঁহার বাঞ্ছাও নাই[৩০]। যখন বাঞ্ছনীয় নাই তখন আর বাঞ্ছা থাকার আশঙ্কা কি? দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা তিনি বিচ্ছিন্ন হন না, সঙ্কুচিত বা লঘুতা প্রাপ্ত হন না, সুতরাং তিনি বদ্ধও হন না। বন্ধন না থাকিলে মুক্তি বা মোচন নাই। অবশেষে স্থির হয় যে অমোক্ষই আত্মার স্বভাব বা স্বরূপ[৩১]।

হে রাঘব! সমুদায় জীবের আত্মা উক্ত প্রকার; পরন্তু বিবেক বুদ্ধি না থাকায় সকলেই শোক মোহে অভিভূত হইতেছে[৩২]। তুমি বিবেক বুদ্ধির অনুগামী হইয়া শোক মোহ হইতে উত্তীর্ণ হও[৩৩]। কামনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক ব্যবহার এরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিবে, যেমন কোন যন্ত্রের দ্বারা পুত্তলিকা দেহের চালনাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়[৩৪]। আকাশের উপরে, পাতালে, ভূতলে, কোথাও মোক্ষ নাই, মোক্ষ সম্যক্ জ্ঞান বিবোধিত নির্ম্মল চিত্তে। বিষয়াসক্তির অভাবে যে চিত্তের ক্ষয় হয়, সেই চিত্তক্ষয়কে তত্ত্বজ্ঞগণ মোক্ষ নাম দিয়াছেন[৩৫।৩৬]। হে রামচন্দ্র! যাবৎ না বিমল জ্ঞান জন্মে তাবৎ লোক সকল মূর্খতা প্রযুক্ত ভক্তিপূর্ব্বক মোক্ষ বাঞ্ছা করে কিন্তু বিমল জ্ঞান জন্মিলে এবং চিত্ত অচিত্ত হইলে তখন আর মোক্ষ কামনা থাকে না[৩৭।৩৮]। এই মোক্ষ, এই বন্ধন, এ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া মহাত্যাগী হও[৩৯]। হে জন্মাদিবর্জ্জিত! তুমি মুক্তের স্বভাব প্রাপ্ত হও, হইয়া এই সাগর মেখলা বসুধা পরিপালন কর। যে অনাসক্ত তাহার রাজ্য পালন দোষাবহ নহে[৪০]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ ।

—(⋊(*)⋉)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সুষুপ্ত কালের ন্যায় প্রলয় কালেও আত্মা অজ্ঞানাবৃত থাকেন, এবং সে অজ্ঞানে পূর্ব্বকল্পীয় কামকর্ম্মাদি বাসনা (সংস্কার) প্রসুপ্ত থাকে। পরে যেমন জাগ্রৎ সংস্কার প্রবল হইয়া সুষুপ্তির হ্রাস করতঃ স্বপ্নাকারে পরিণত হয় এবং তৎপরে তাহা জাগ্রতে আসিয়া বিস্পষ্ট হয়, সেইরূপ, পূর্ব্বকল্পীয় প্রসুপ্ত বা লীন বাসনাও কালপরিপাকে ও আত্মচেতনার প্রভাবে প্রবলা হইয়া স্বপ্নতুল্য সূক্ষ্ম আকারে পরিণত হয়। সেই পরিণাম পণ্ডিতগণের মতে প্রথমা সৃষ্টি। অর্থাৎ তাহাই স্থূল ব্যষ্টি সমষ্টি শরীরের কারণীভূত সূক্ষ্ম ব্যষ্টি সমষ্টি শরীরসমূহ। প্রিয়জনের অদর্শন বা বিচ্ছেদ দশায় হৃদয় মধ্যে যে নানা প্রকার চিন্তা ও দৌর্ম্মনস্যাদির কল্পনা জন্মে, সেই চিন্তাদৌর্ম্মনস্যাদি উক্ত প্রথমা সৃষ্টি বুঝিবার দৃষ্টান্ত[১]। ক্রমে তাহা হইতেই এই মহতী মায়া-সুরা হইতে মদশক্তির ন্যায় সম্পন্ন হইয়াছে[২]। মরুভূমিস্থ সূর্য্যকিরণে জলপ্রবাহ দর্শনের ন্যায় চিদাত্মাশ্রিত মায়াতেই তাহার বিকারে এই চরাচর বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে[৩]। যেমন অব্ধি নানা প্রকার জলবিকারে নানারূপে দৃশ্যমান হয়, তাহার ন্যায় আত্মাও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, বাসনা, ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি আকারে স্ফুরিত হইতেছেন[৪]। চিত্ত ও অহঙ্কার দুইটী শব্দতঃ পৃথক্, বস্তুতঃ নহে। যে চিত্ত সেই অহঙ্কার যে অহঙ্কার সেই মন[৫]। হিমানী ও তাঁহার শুভ্রতা বস্তুতঃ অভিন্ন; তাহার ন্যায় চিত্ত ও অহঙ্কার বস্তুতঃ অভিন্ন[৬]। সেইজন্য মন ও অহঙ্কারের একতর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে অন্যতর অক্ষত থাকে না[৭]। সেইজন্য উপদেশ—মোক্ষেচ্ছাপর্য্যন্ত বর্জ্জিত রাখিয়া বিবেক ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক মনঃক্ষয়ের চেষ্টা করিবেক[৮]। "মোক্ষ হউক" এ চিন্তায় সতত উত্থিত (উদ্যোগবিশিষ্ট) মনোমধ্যে যে এক প্রকার উৎকণ্ঠা জন্মে সে উৎকণ্ঠা বিশেষ দোষাবহ। আত্মা যখন সর্ব্বাতীত তখন তাঁহার বন্ধন কি? বন্ধন না থাকিলে মোক্ষই বা কি? অতএব, মনের মনন ধর্ম্ম যাহাতে নির্ম্মূল হয় তাহাই করা বিধেয়[৯।১০]।

চলনস্বভাব বায়ু দেহে অভিব্যক্ত থাকায় দেহই গত্যাগতি করে, সর্ব্ব-ব্যাপিনী চিৎ চলিত বা চালিত দুএর কিছুই হন না এবং কিছুই করেন না[১২,১৩]। উক্ত চিৎ সমুদায় পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া দীপের ন্যায় সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া রহিয়াছেন[১৪]। অতএব, বৃথা দুঃখদায়ী মোহ যাহাতে বিনষ্ট হয় তাহা করা অতীব কর্ত্তব্য। এই, সেই, আমি, আমার, আমার দেহ, আমার শরীর, আমার হস্তপদাদি, এ সকল দুর্ব্বুদ্ধির বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৫]। ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির দ্বারাই আমি জ্ঞানী, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা প্রভৃতি ক্রিয়া ও তৎ ফল উপলব্ধ হয়[১৬,১৭]। যেমন মৃগতৃষ্ণিকা জলপিপাসু মৃগদিগকে আকর্ষণ করে সেইরূপ অজ্ঞানও বিষয়কামুক মনকে আকর্ষণ করে[১৮]। যেমন কোন চণ্ডালকন্যা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ মধ্যে বাস করে পরন্তু যেমন বিজ্ঞাতা হইলে পলায়ন করে, তেমনি, অজ্ঞতাও সম্যক্ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীবমধ্যে বাস করে পরন্তু বিজ্ঞাত হইবামাত্র পলায়নপর হয়[১৯]। বিজ্ঞাত মৃগতৃষ্ণিকা তৃষ্ণাতুরকে আকর্ষণ করে না, বিজ্ঞাত অবিদ্যাও বিজ্ঞকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে না[২০]।

হে রামচন্দ্র! যেমন দীপ সন্নিধানে অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ, পরমার্থ জ্ঞানের নিকট বাসনাও থাকিতে পারে না[২১]। যে মুহূর্ত্তে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা "অবিদ্যা নাই, উহা মিথ্যা" এতদ্রূপ বিজ্ঞানের উদয় হয় সেই মুহূর্ত্তেই সে (অবিদ্যা) তাপে তুষার বিগলনের ন্যায় বিগলিত হইয়া যায়[২২]। দেহ একটা জড় পদার্থ, তাহার আবার ভোগ কি? এরূপ নিশ্চয় অর্থাৎ ভোগ মিথ্যা এতদ্রূপ অবধারণ উৎকট আশা-পিঞ্জর সিংহের পিঞ্জর ভগ্ন করণের ন্যায় ভগ্ন করিয়া থাকে[২৩]। হে রঘুনাথ! আশা অপহৃত হইলেই পুরুষ চন্দ্রের ন্যায় হ্লাদী, বৃষ্টি-ধৌত অচলের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী ও প্রাপ্তরাজ্য রাজার ন্যায় নিরুদ্বেগ ও সুখী হইয়া থাকে[২৪,২৫]। যেমন একার্ণব কালের অর্ণব অপরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞের আত্মাও সর্ব্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন। শরৎ কালের আকাশ যদ্রূপ শোভাযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের মুখশ্রীও সেইরূপ শোভাযুক্ত। তিনি সর্ব্বকালে প্রশান্ত সমুদ্রের ও বৃষ্টিবর্জ্জিত মেঘের ন্যায় আড়ম্বর শূন্য হন[২৬,২৭]। তিনি সুমেরুর ন্যায় ধৈর্য্যশালী ও নির্ধূম বহ্নির ন্যায় শোভাসম্পন্ন হন। দীপ যেমন আপনা আপনি আপনাতে নির্ব্বাপিত হয়

তাহার ন্যায় তিনিও আপনা আপনি আপনাতে উপশান্ত হন এবং অমৃতপায়ীর ন্যায় পরমা তৃপ্তি লাভ করেন[২৮।২৯]। ঘটমধ্যস্থ প্রজ্বলিত দীপবহ্নির এবং অপরিষ্কৃত মণির যেরূপ প্রকাশ, দেহান্তর্গত তত্ত্বজ্ঞ আত্মার সেইরূপ প্রকাশ। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ আপনাকে এক ভাবে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বগত, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনায়ক ও সর্ব্বাকার দেখেন, আবার অন্য ভাবে আপনাকে নিরাকার দৃষ্ট করেন[৩০।৩১]। তিনি জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া সতত হাস্য করেন[৩২]। তথা বিষয়িজনের সংসর্গ হইতে বিনিক্রান্ত, মনন জ্বর হইতে পরিমুক্ত, অধ্যাত্মতত্ত্বে রত, পূর্ণ ও পবিত্র মানস, কামপঙ্ক বিধৌত, ভ্রমরূপ স্পন্দন হইতে মুক্ত, দ্বন্দ্বদোষ ও ভয় হইতে উন্মুক্ত, সংসার সাগর উত্তীর্ণ[৩৩।৩৪], যার পর নাই উৎকৃষ্ট রূপে বিশ্রান্ত, দুর্লভ্য লাভে সন্তুষ্ট ও অপুনরাবৃত্তি পদ প্রাপ্ত হন। সেজন্য তিনি আর কোন কিছু বাঞ্ছা করেন না, বাঞ্ছার কারণীভূত কোন কার্য্যের আরম্ভ করেন না, সদানন্দ থাকায় কোন কিছুতে অনুমোদনও করেন না[৩৫।৩৬]। তিনি কিছু দেন না, গ্রহণ করেন না, কাহার স্তুতি বা নিন্দা করেন না, অস্ত বা উদয় প্রাপ্ত হন না, এবং তোষ, রোষ, শোক তাপ, কোনও কিছু করেন না[৩৭]। যাঁহারা এবম্বিধ, যাঁহারা সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, সর্ব্বোপাধিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্ব আশা পরিত্যাগী, তাঁহারা জীবন্মুক্ত[৩৮]।

হে রঘুকুলতিলক রাম! তুমি সমুদায় এষণা (বাঞ্ছা) পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বনকর। আশা পরিত্যাগে জনগণের যে সুখ হয়, সুন্দরী নারীর অঙ্গ সঙ্গে সে সুখ হয় না[৩৯।৪০]। নৈরাশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীতল, তাহাতে যে সুখ সে সুখ ও সে শীতলতা চন্দ্রেও নাই[৪১]। আশাত্যাগী মৌনী ও সমবুদ্ধি মনুষ্যের যে শোভা সে শোভা পুষ্পময় বসন্তে নাই[৪২]। আশাত্যাগী অন্তঃকরণ যেরূপ সুশীতল, সেরূপ সুশীতল অন্য কিছু নহে। সে শীতলতা হিম পর্ব্বতে নাই, মুক্তামালায় নাই, কদলীকাণ্ডে নাই, চন্দ্রে নাই এবং চন্দনেও নাই[৪৩]। রাজত্ব, স্বর্গ, চন্দ্র, বসন্ত ঋতু এবং কান্তা সমাগম, এ সকল অপেক্ষাও পরম সুখ আশা পরিত্যাগ[৪৪]। হে সাধো! আশা বর্জ্জনে এরূপ এক অনির্ব্বাচ্য নির্ব্বৃতি লব্ধ হয়—যাহার লাভে ত্রিভুবন লক্ষ্মীও তৃণ অপেক্ষা তুচ্ছ হইয়া থাকে[৪৫]। সেই পরমা নির্ব্বৃতি আপদ রূপ করঞ্জের কুঠার

এবং নৈরাশ্য ও শান্তিরূপিণী লতার পুষ্পগুচ্ছ[৪৬]। হে রামচন্দ্র! যাহার আকৃতি নৈরাশ্যে অলঙ্কৃত, তাহার নিকট পৃথিবী গোষ্পদ, সুমেরু সর্ষপ, দিক্ সকল ক্ষুদ্র পেটক, এবং ত্রিভুবন তৃণ[৪৭]। আশাত্যাগী শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা প্রাকৃত দিগের দান, আদান, সঞ্চয়, আহার, বিহার ও বিভবাদি বিষয়ক কার্য্য কলাপ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না[৪৮]। যাহার হৃদয়ে আশা স্থান পায় না, তাহার সহিত কাহার তুলনা হয় না। যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার রঞ্জনা নাই তাহার সহিত কাহার উপমা হয়[৪৯,৫০]? তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটের অতীত, এবং স্বয়ং অসঙ্কট। অপিচ, অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি ও বুদ্ধির সৌভাগ্য নৈরাশ্য, তাদৃশ নৈরাশ্য অবলম্বন কি অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, আত্মাচিৎ নর আশার বশ্য হন না, অর্থাৎ কোনও কিছু আশা করেন না। তাই তোমাকেও বলিতেছি, তুমিও এই জগৎকে মিথ্যা-ভ্রমবিশেষ রূপে বিদিত হইয়া আশার সম্পর্ক পরিত্যাগ কর[৫১,৫২]। হে মহাবাহু রাম! তুমি যখন বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ তখন তুমি কি জন্য মূর্খের ন্যায় মোহের বশ্য হইবে? "ইহা আমার" "তাহা এই" "সেই আমি" এ সকল ভ্রান্ত চিত্তের কার্য্য[৫৩]। আত্মাই এই দৃশ্যমান জগৎ, ইহাতে নানাত্ব নাই। ধীরগণ জগৎকে একাত্ম-রূপে বিদিত থাকেন বলিয়া খেদ প্রাপ্ত হন না[৫৪]। হে রাঘব! যতই পদার্থ থাকুক, সমুদায়কে আত্মরূপে দেখিতে পারিলে তখন আর আশা পাশ থাকিবে না[৫৫]। ইহা আছে, তাহা নাই, এরূপ এরূপ কল্পনা পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অবলম্বন করিয়া পদার্থের স্থিতি নিশ্চয় করিবে[৫৬]। তাহা করিলে মৃগী যেমন কেশরী দর্শনে পলায়নপর হয় তাহার ন্যায় মোহজননী মায়া বৈরাগ্য-বীর মনের নিকট হইতে পলায়ন করিবে[৫৭]। বৈরাগ্যবান্ ধীর পুরু-ষেরা বনলতা, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ও রমণী, এই তিন্‌কে সমভাবে দেখেন, অর্থাৎ তাঁহাদের কিছুমাত্র কাম দোষ থাকে না[৫৮]। ভোগ সকল তাঁহাদিগঁকে আনন্দিত করে না, আপদ্ সমূহও তাঁহাদিগকে খেদান্বিত করে না[৫৯]। কাম বাণ সকল তদীয় সকাশে প্রতিহত হইয়া যায়[৬০]। তত্ত্বজ্ঞ লোক কদাপি রাগদ্বেষাদিতে আকৃষ্ট হন না[৬১]। পান্থগণ যেমন মরুভূমিতে বিরক্ত, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ লোক ভোগে বিরক্ত। মনন

যেমন যদৃচ্ছাগত আলোক গ্রহণ করে তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ নর অযত্নাগত ভোগ অনাসক্ত চিত্তে অনুভব করেন। হে অঙ্গ! কাকতালীয় ন্যায়ে উপস্থিত ভোগ দ্রব্যের ভোগে তাঁহাদের দুঃখ সুখ অথবা তুষ্টি অতুষ্টি কিছুই হয় না[৬২।৬৪]। জল লহরী যেমন মন্দর পর্ব্বতের সংক্ষোভ জন্মাইতে অক্ষম, সেইরূপ, সুখ দুঃখ বুদ্ধি ও দৃষ্টতত্ত্ব জ্ঞানীর লোভ ক্ষোভ জন্মাইতে অক্ষম[৬৫]। মৃদুস্বভাব, দান্ত ও গতক্লেশ পুরুষ ভোগ সকলকে হেলা ক্রমে দর্শন মাত্র করতঃ আত্মপদে অব্যগ্র চিত্তে অবস্থান করেন[৬৬।৬৭]। পর্ব্বত যেমন বর্ষাদি ঋতুতে ক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, তাহার ন্যায় জ্ঞানী নর আপদ বিপদ সুখ দুঃখ, কোন কিছুতে ক্ষোভ প্রাপ্ত হন না[৬৮]। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানীর কর্ম্মেন্দ্রিয় গণকে কখন কখন অকার্য্যমগ্ন হইতে দেখা যায় বটে; পরন্তু তাঁহার মন তাহাতে আসক্ত বা মগ্ন হয় না[৬৯]। সুবর্ণকে বাহিরের কলঙ্কে কলঙ্কী বলে না, অন্তরে কলঙ্ক থাকিলেই কলঙ্কী বলে। সেইরূপ, ভাবাসক্তির দ্বারাই জীব সমাসক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। হস্তপদাদি সঞ্চালনের ব্যতিক্রম দেখিয়া সমাসক্ত বলা যায় না[৭০]। জ্ঞানী লোক আপনাকে শরীর ব্যতিরিক্ত সন্দর্শন করেন, সেই জন্য অঙ্গচ্ছেদে তাঁহারও ছেদন হইয়াছে এরূপ বলা যায় না[৭১]। বন্ধুজন একবার বন্ধু বলিয়া বিজ্ঞাত হইলে আর সে অবন্ধু হয় না। সেইরূপ, বিমল জ্ঞান একবার বিজ্ঞাত হইলে আর তাহা অবিজ্ঞাত হয় না[৭২]।

হে রঘুনাথ! ভাবিয়া দেখ, গিরিতটচ্যুতা নদী কি পুনর্ব্বার উদ্ভব স্থানে যায়? তাহা যায় না। এবং সর্পভ্রান্তি নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার রজ্জুতে কি সর্পবিভ্রম জন্মে? তাহা জন্মে না। অগ্নিশোধিত সুবর্ণকে কর্দ্দমমগ্ন করিলেও মলিন হয় না। এই সকল যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, হৃদ্‌গ্রন্থিও ত্রুটিত হইলে আর তাহা গ্রন্থিবদ্ধ হয় না। বৃন্তচ্যুত ফল কি কখন পুনঃ বৃন্তলগ্ন হয়[৭৩।৭৫]? পাষাণ ও মণি ছেদন করিলে আর কি তাহা যোজিত করা যায়? তাহা যেমন যায় না, তেমনি, বিচারাস্ত্রে ছিন্ন হৃদ্‌বন্ধনও পুনর্ব্বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। কোন্ ব্রাহ্মণ বিজ্ঞাত চণ্ডালের সংসর্গ করে? তাহা যেমন করে না, তেমনি, বিজ্ঞাত অজ্ঞানেও কেহ মগ্ন হয় না[৭৬।৭৭]। ক্ষীরনিষ্কৃষ্ট জলে যেমন পুনর্ব্বার ক্ষীরবুদ্ধি থাকে না, তেমনি, বিচারনিষ্কৃষ্ট বুদ্ধিতে বাসনা থাকে না[৭৮]।

ব্রাহ্মণ জল মনে করিয়া মদ্য পান করেন বটে; কিন্তু যখন জানেন তাহা জল নহে মদ্য, তখন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হন[৭৯]। রূপ লাবণ্যে পরিপূর্ণ নারীদেহ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে চিত্রলিখিত রমণীর তুল্য স্থানাক্রান্ত[৮০]। যেমন চিত্রিত রমণী মসী ও কুসুম্ভ প্রভৃতি রঞ্জন দ্রব্যের অনতিরিক্ত, তেমনি, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবিতা নারীর দেহও রক্তমাংসাদি ভৌতিক দ্রব্যের অনতিরিক্ত। গুড়ের মধুর স্বাদ অনুভূত হইলে সে অনুভব কিছুতেই অন্যথা করা যায় না। সেইরূপ, আত্মার তাত্ত্বিক আনন্দ অনুভব গোচর হইলে সে আনন্দকে আর অন্য কিছুতে অভিভব করা যায় না[৮১।৮২]। পরপুরুষ প্রসক্তা রমণী আপনার দেহকে গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা রাখে বটে; পরন্তু অন্তরে সে নিরন্তর পূর্ব্বাস্বাদিত পুরুষসংসর্গের আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। যাহারা আত্মানুভবের আনন্দ প্রাপ্ত, তাহারাও দেহকে লোকযাত্রায় ব্যাপৃত রাখে ও অন্তরে পূর্ব্বোক্ত নারীর ন্যায় আত্মানন্দ অনুভবে নিমগ্ন থাকে[৮৩]। যে ধীর ব্যক্তি পরম তত্ত্বে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দেরাও তাহাকে বিচালিত করিতে পারেন না। কবে কোন্ ভর্ত্তা বলের দ্বারা ব্যভিচারিণী নারীকে পরপুরুষাসঙ্গের সুখ বিস্মৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে[৮৪।৮৫]? কবে কোন্ মহাবুদ্ধি তত্ত্ববিদ্ পুরুষ পার্থিব সুখের দ্বারা স্বকীয় আত্মানন্দ বিস্মৃত হইয়াছেন[৮৬]? কবে কোন্ পরপুরুষব্যাসক্তা নারী ভর্ত্তার ও শ্বশুর প্রভৃতির তাড়নায় পরপুরুষপ্রসঙ্গ রসের স্বাদ ভুলিয়া গিয়াছে? তাহারা যেমন শত শত সহস্র সহস্র বাধা ও দুঃখবৃন্দ সহ্য করে তাহার ন্যায় যাহাদের অবিদ্যা দোষ বিনষ্ট হইয়াছে তাহারাও লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের বাধা ও ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করতঃ সম্যক্ দৃষ্টি বিষয়ে সদা অপ্রমত্ত (সাবধান) থাকে[৮৭।৮৯]। অস্ত্রে তাহাদের অঙ্গই কর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাঁহারা কর্ত্তিত হয় না। অশ্রুই বিগলিত হয় কিন্তু তাঁহারা রোদমান হন না। দেহই দগ্ধ হয়, তাঁহারা দহ্যমান হন না। দেহই বিনষ্ট হয় কিন্তু তাঁহারা বিনষ্ট হন না। অধিক কি বলিব, যাঁহারা সুখ দুঃখের অতীত, তাঁহারা সঙ্কটে থাকুন, সদনে থাকুন, পুরে থাকুন, কাননে থাকুন, তপোবনে থাকুন, সর্ব্বত্রই সুখ দুঃখের অতীত[৯০।৯১]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বিদেহরাজ জনক বহির্দৃষ্টিতে রাজত্ব করিতেন কিন্তু অন্তরে শোকসন্তাপাদি বর্জ্জিত ছিলেন[১]। তোমার পিতামহ দিলীপও সমুদায় ব্যবহার ও পৃথিবী পরিপালন করিয়াছিলেন অথচ অন্তরে বীতরাগী ছিলেন[২]। জ্ঞানিসত্তম মনু মহর্ষি রাগাদি দোষ রহিত ও জীবন্মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন[৩]। মান্ধাতাও বলবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছিলেন অথচ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৪]। অসুররাজ বলি পাতালে অবস্থান করতঃ আসুরী প্রজা পালন করিতেন, ইনিও সদা ত্যাগী সদা অনাসক্ত ও জীবন্মুক্ত ছিলেন[৫]। দানবপতি নমুচি সর্ব্বদাই দেববৃন্দের সহিত যুদ্ধাদি করিতেন পরন্তু তাঁহার অন্তর সে সকল কার্য্যে অলিপ্ত ছিল[৬]। যিনি বাসবের যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই বৃত্রাসুরও অন্তরে সংশান্ত ছিলেন[৭]। পাতাল রাজ্যের পালক মহাত্মা প্রহ্লাদ যে আক্রোশাদিদোষে অলিপ্ত ছিলেন তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ[৮]; হে রামচন্দ্র! বিখ্যাত সম্বরাসুরও সংসার মায়া পরিত্যাগী ছিলেন[৯]। কুশল নামে অন্য এক দানব ছিলেন, যিনি ভগবান্ হরির সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তিনিও তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তে এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১০]। এই যে বহ্নি দেব, ইনি সমুদায় দেবতার মুখস্বরূপ ও সতত ক্রিয়ারত; ইনিও মুক্ত স্বভাবে অবস্থান করতঃ যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছেন। এই যে চন্দ্রদেব, যিনি সমুদায় দেবগণ কর্ত্তৃক স্বদমান (দেবতারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃত পান করেন, তাই তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক স্বদমান) হইতেছেন, তিনিও আকাশের ন্যায় নির্লেপ[১১,১২]। দেবগুরু বৃহস্পতিও মুক্ত, অথচ বিবাহ করিয়াছিলেন ও দেবতাদিগের পৌরহিত্য করিতেন[১৩]। সেইরূপ অসুরগুরু তত্ত্বজ্ঞ শুক্র মুক্ত হইয়াও অসুর গণের উপদেষ্টা ও অম্বর পথে (আকাশে) উদিত থাকিয়া প্রাণিগণের কার্য্য করিতেছেন[১৪]। এই বায়ুদেব, যিনি সমুদায় জীবের জীবন, তিনিও মুক্ত। অধিক কি

বলিব, ব্রহ্মাও এই সমুদায় লোকের উত্তমাধমাদি গতি চিন্তায় দ্বি পরার্দ্ধবিস্তৃত (প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত) দীর্ঘতম কাল অতিবাহন করিবেন তাহাতে খেদ অনুভব করিবেন না[১৫।১৬]। সেইরূপ মুক্তাত্মরূপী ভগবান্ হরিও আপনার নিয়তির নির্দ্দিষ্টানুযায়ী যুদ্ধ প্রভৃতি নানা লীলা করিবেন[১৭]। বলা বাহুল্য যে, মুক্তাত্মা শিবও কামুকের কামিনী ধারণের ন্যায় স্বকীয় দেহার্দ্ধে গৌরীকে ধারণ করিতেছেন। ত্রিলোচন যেমন গৌরীকে ধারণ করিতেছেন তেমনি নিত্য মুক্তা গৌরীও ত্রিলোচনকে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গে ধারণ করিতেছেন। কার্ত্তিক বীরশ্রেষ্ঠ; তিনিও মুক্তস্বভাব হইয়া তারকাসুর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন[১৮।২০]। শিবপার্ষদ ভৃঙ্গীশ ধ্যানধৌতা ধীরা বুদ্ধি অবলম্বনে আপনার রক্ত মাংস মাতাকে বিতরণ করিয়াছিলেন[২১]। * নারদ মুনি মুক্ত, তথাপি তিনি কার্য্যতৎপর হইয়া লোকত্রয়ে বিচরণ করিতেছেন[২২]। মহামান্য বিশ্বামিত্র জীবন্মুক্ত হইয়া বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শেষ নাগ, দিবাকর সূর্য্য, যম, ইহারাও জীবন্মুক্ত অথচ পৃথিবী ধারণ, দিন মাস ও বৎসরাদি নির্ব্বাহ ও যমত্ব করিতেছেন[২৩।২৪]। এইরূপ, এই ত্রিলোকের মধ্যে আরও অনেক যক্ষ, অসুর, সুর ও নর আছেন, যাঁহারা মুক্তি পদ পাইয়াও সংসারে অবস্থিত আছেন[২৫]। নানা আচারে বিভূষিত ও ব্যবহারে অবস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে মুক্তি পদ প্রাপ্ত এবং কোন কোন ব্যক্তি অন্তরে প্রস্তরের ন্যায় মূঢ়[২৬]। কোন কোন মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য হইয়া বন আশ্রয় করিয়াছেন এবং কোন কোন মহাবুদ্ধিধর রাজত্বও করিয়াছেন। ভৃগু, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, শুকদেব, ইহারা বনচারী এবং জনক, শর্য্যাতি, মান্ধাতা, সগর, ইহারা রাজ্যধারী[২৭।২৮]। কেহ ব্যোমবীথিতে, কেহ বা সুরবর্ত্ম পদে (সুরবর্ত্ম=দেবত্ব পদ) যথাধিকার কার্য্য করিতেছেন।

* এই ভৃঙ্গীশ শিবের পার্ষদ। পুরাণে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে যে, ভৃঙ্গীশ শিব পার্ষদ হইবার পূর্ব্বে দেবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে দেবী কুপিতা হইয়া তদীয় মাতৃ পিতৃ জাত দেহের মাতৃ ভাগ তদীয় মাতৃরূপে দেখা দিয়া প্রত্যর্পণ কর বলিয়া আদেশ করেন। তচ্ছ্রবণে ভৃঙ্গীশ অকাতরে স্বদেহ হইতে রক্ত মাংস উৎকর্ত্তন করতঃ প্রার্থনাকারিণী মাতাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগস্ত্যাদি মুনিবৃন্দ ব্যোমবীথিতে ও অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি দেবত্ব পদে স্থিত আছেন[২৯।৩০]। কেহ বা জীবন্মুক্তি প্রাপ্তেও পাতাল তলে অবস্থিত আছেন। বলি, সুহোত্র, অন্ধক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন[৩১]। আমরা দেখিতেছি, তির্য্যক্ জীবের মধ্যেও জ্ঞানী আছে এবং দেবযোনিতেও মোহান্ধ আছে; অতি বিস্তৃত সর্ব্বাত্মভাব সম্ভব অসম্ভব দুই সমান জানিবে। নিয়তির নিয়মও বিচিত্র। সেজন্য একাত্মভাবেও উক্ত বৈচিত্র্য অসম্ভব নহে। সেই একই প্রত্যক্‌চেতন বিধি, দৈব, বিধাতা, ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, শিব, আত্মা, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইতেছেন[৩২।৩৫]। বস্তুর মধ্যেও অবস্তুর, আবার অবস্তুর মধ্যেও বস্তুর অবস্থান দৃষ্ট হয়। (বস্তু আত্মা, তাহাতে অবস্তু মায়ার আবরণ এবং অবস্তু মায়া, তদন্তরে আত্মার অবস্থিতি) বালুকার অভ্যন্তরে কাঞ্চনের, আবার কাঞ্চনের অভ্যন্তরে মলিনতা অবস্থিতি করে। যুক্তি বিশেষ অবলম্বনে অযুক্তও যুক্ত বলিয়া গণ্য হয় এবং পাপের ভয়েও লোক ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকে[৩৬।৩৭]। হে সাধো! অসত্যেও সত্য দর্শন হয় এবং শূন্য ধ্যানেও শাশ্বত পদ লব্ধ হয়। হে রঘুনাথ! যাহা নাই, কস্মিন্ কালেও নাই, তাহাও দেশ কালাদির বিলাসে উদিত হয়। ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টিতে শশকেরও শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে[৩৮।৩৯]। আজ্ যাহারা বজ্রসার ও সুদৃঢ়, কাল তাহারা বিনষ্ট হইবে, না হয় আরও কিছু দিন পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অধিক কি বলিব, ইন্দু, অর্ক, ধরা, সমুদ্র, দেবতা, সমস্তই কল্পশেষে লয় প্রাপ্ত হইবে[৪০]।

হে মহাবাহু রাম! তুমি ঐ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিয়া হর্ষামর্ষ বিষাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতা আশ্রয় কর[৪১]। যাহা দেখিতে পাও, সমস্তই অসৎ। সে জন্য বলি, আস্থা অনাস্থা উভয়ই পরিত্যাগ কর, এবং সাম্য অবলম্বন কর[৪২]। হে রাঘব! লোক সকল সংসার দশায় অজ্ঞানে মগ্ন থাকে, তাই তাহারা কোটী কোটী অনর্থ পরম্পরা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু মুক্তি দশায় অজ্ঞানের অভাবে অনর্থের লেশও থাকে না। মুক্তিতে নূতন কিছু পাওয়া যায়, তাহা নহে। মুক্তি আপনারই স্বরূপ সাক্ষাৎকার। যেমন গললগ্ন স্বর্ণ হার বিস্মৃতি বশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় থাকে, পরে স্মরণ হইলে তাহা পাওয়া বলিয়া গণ্য

হয়, মুক্তিকেও তুমি সেইরূপ জানিবে। মুক্তি বিবেক দ্বারা অনায়াস লভ্য হইলেও অবিবেক তাহাকে দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, যাহাতে মনঃক্ষয় ও বিবেকের উদ্দীপন হয় তুমি তাহাই করিবে[৩-৪৫]। যাহারা মোক্ষ কামনা করিবে তাহারা আত্মদর্শনে যত্নবান্ হইবেন। কেননা, আত্মা পরিদৃষ্ট হইলে সংসার দুঃখের শিরশ্ছেদ হয়। জনক ও সুহোত্র প্রভৃতি জনবৃন্দ জীবন্মুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাবুদ্ধিধর ও রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত[৪৬,৪৭]। তাই আমি বলি, তুমিও বৈরাগ্য ও বিবেক দ্বারা বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে কাঞ্চনে প্রস্তরে সমান বুদ্ধি অবলম্বন করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া বিরাজ কর[৪৮]। মুক্তি দুই প্রকার, এক বিদেহ মুক্তি ও অপর সদেহ মুক্তি। পদার্থের সহিত মনের অসংসর্গ ও তাহার উপশম মুক্তি বলিয়া গণ্য; তাহা দেহ থাকিতেও সম্ভবে[৪৯।৫০]। স্নেহমমতাদির বিলয় উত্তম মোক্ষ, তাহাও দেহ সত্ত্বে সম্ভবে[৫১]। অতএব, যে ব্যক্তি স্নেহ বর্জ্জিত অথচ জীবিত; সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত। আর যে ব্যক্তির জীবন স্নেহময়, সে ব্যক্তি বদ্ধ[৫২]। হে রামচন্দ্র! অনন্ত সংসার দুঃখ মোচনের নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই আদর সহকারে যুক্তিযুক্ত যত্নের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। তদ্ভয় বিহীন হইলে গোষ্পদও দুস্তরণীয় হয়[৫৩]। যত্নের অনাদরই দুঃখের কারণ বলিয়া জানিবে[৫৪]। অতএব, তুমি সাদর চিত্তে দৃঢ়তর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক পরিষ্কৃত বুদ্ধিতে আত্মবিচার করিবে।' যাহার অধ্যবসায় অতি তেজস্বী, জগৎ তাহাদের নিকট গোষ্পদ[৫৫]। অধিক কি বলিব, বুদ্ধ দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে আত্মতত্ত্বকে অধ্রুব বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল এবং পরম বিবেকী কপিল মহর্ষিও আত্মস্বরূপ অবধারণে অক্ষম হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রভৃতিকে প্রধান পদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তথা অর্হত নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা আত্মার মহত্ত্ব নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে দেহ পরিমাণ (প্রকারান্তরে অধ্রুব অর্থাৎ নশ্বর) বলিয়াছিলেন। পরন্তু যাঁহারা মহান্ত অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা যে পদ প্রাপ্ত হন সেই পদই বেদমার্গানুসারী প্রযত্নরূপ কল্প বৃক্ষের মহৎ ফল[৫৬]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অবিবেক দ্বারা তাঁহাতেই স্থিতি করে, এবং বিবেক দ্বারা আবার তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যে এ পর্য্যন্ত কত জগৎরূপ লহরী উৎপন্ন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই[১।২]। যেমন জগতের স্থিতির কারণ অজ্ঞান, তেমনি ইহার শান্তির কারণ জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব জ্ঞান)[৩]। এই সংসার সমুদ্র নিতান্তই দুস্পার। শাস্ত্রীয় যত্ন ও যুক্তি ব্যতীত ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না[৪]। এই সংসার সাগর অগাধ মোহ জলে ভরিত অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ইহাতে মরণ আবর্ত্ত, পুণ্য নামক শুভাদৃষ্ট ফেন, নয়ন ইহার বাড়বাগ্নি, তৃষ্ণা (বিষয়লোভ) ইহার ক্ষুদ্র লহরী, মন জলহস্তী, জীবন ইহার নদী, ইহা রোগ সমূহের পেটরা, ক্ষুদ্র রোগে আকীর্ণ, ইন্দ্রিয় ইহাতে জলজন্তু[৫।৬।৭]। রাম! এই সংসার সমুদ্রের অন্য এক প্রকার লহরী অবলোকন কর। এই যে অসংখ্য স্ত্রী নামক দেহ, এই স্ত্রী দেহ এই সংসার সমুদ্রের অন্যতম লহরী। এ লহরী মুগ্ধ জীবের মনোমহন, নিতান্ত চপল, এবং ইহারা পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও ধীর ব্যক্তি দিগকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ[৮]। ইহাদের ওষ্ঠে পদ্মরাগ মণির, নেত্রে নিলোৎপলের, দন্তে পুষ্পকোরকের, হাস্যে ফেনপুঞ্জের[৯], কেশে ইন্দ্রনীলের, ভ্রূভঙ্গীতে তরঙ্গের, নিতম্বে গিরিতটের, কণ্ঠে কম্বুর (শঙ্খের), ললাটে মণিপট্টের, বিলাসে অর্থাৎ অঙ্গবিক্ষেপে মকরের শোভা বিরাজিত রহিয়াছে। চঞ্চল কটাক্ষ থাকায় ইহারা দুরাসদ ও ইহাদের বর্ণ উক্ত সমুদ্রের স্বর্ণবালুকা[১০।১১]। এবম্বিধ লহরী যুক্ত যৎপরোনাস্তি ভীষণ সংসার সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তি যদি ইহা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে তাহা হইলে বড়ই পুরুষকারের কথা হইবে[১২]। প্রজ্ঞারূপিণী নৌকা ও বিবেকরূপ নাবিক থাকিতেও যদি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে না পারে তবে সে পুরুষকে ধিক্[১৩]! যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দৃশ্য প্রপঞ্চকে বাধিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে পর্য্যবশেষিত করতঃ সংসার

সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ পুরুষ[১৪]। আচার্য্যগণের সহিত এই সংসার সমুদ্রের রহস্যবিচার ও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি যোগে ইহার তত্ত্বদর্শন, তৎপরে যদি ইহাতে ক্রীড়া করা যায় তবেই ইহার শোভা নচেৎ ইহা কষ্টপ্রদ[১৫]। হে সাধো! তুমিও এই সংসারে ধন্য পুরুষ! কেননা তোমার বুদ্ধি বিচার নিবিষ্টা হওয়ায় তুমি এখন ইহার রহস্য বিচার করিতেছ[১৬]। অন্য লোকও যদি তোমার ন্যায় বিচার পরায়ণ হইয়া ইহাতে অবগাহন করে তাহা হইলে সেও এ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে না[১৭]। হে রামচন্দ্র! গরুড় অমৃত আহরণের পূর্ব্বে পন্নগ ভক্ষণ করে নাই, উপেক্ষা করিয়াছিল, পরে মাতৃশাপ মোচন করিয়া নিঃশঙ্কে পন্নগ ভক্ষণ করিয়াছিল। সেইরূপ, যে লোক পূর্ব্বে বিচার ও ভোগ্য ভোগে উপেক্ষা করিতে পারে সেই লোকই চরমে নিঃশঙ্কে (অনাসক্ত হইয়া) সাংসারিক ভোগে বিহরণ করিতে পারে[১৮]। বিচার ও তত্ত্ব দর্শনের পর যদি ঐশ্বর্য্য সেবা করা যায় তাহা সেই ঐশ্বর্য্য ভবিষ্যতে সুখ প্রসব করে অন্যথা কেবল দুঃখেরই কারণ হয়[১৯]। বল, বুদ্ধি, তেজঃ, এ সকল দৃষ্টতত্ত্ব ব্যক্তির বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় না[২০]। অতএব, হে রঘুনন্দন! তুমি যাহা উত্তম বেদ্য তাহা বিদিত হইয়াছ, তৎকারণে অমৃত পূর্ণের ন্যায় তাপশূন্য হইয়াছ, নির্ম্মলতম সমশোভায় (ব্রহ্মশ্রীতে) সুশোভিত হইয়াছ সুতরাং নির্ম্মল শীতরশ্মির ন্যায় বিরাজ করিতেছ[২১]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

——⌣(*)⌣——

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! তত্ত্বজ্ঞ দিগের বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বর্ণন করুন। আপনার বাক্যে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জীবন্মুক্ত দিগের লক্ষণ বা বৃত্তান্ত অনেক বার বলিয়াছি। আবার বলি, শ্রবণ কর[২]।

আত্মবান্ ব্যক্তি এই জগৎপ্রপঞ্চ সুষুপ্তের ন্যায় সন্দর্শন করেন। যাহা নাই তাহাতে যেমন লোকের আসক্তি জন্মে না, আত্মজ্ঞ পুরুষ এ সকলে সেইরূপ অনাসক্ত থাকেন[৩]। তাঁহারা যেন কেবল অর্থাৎ একক (ভেদ বুদ্ধি বর্জ্জিত), নির্ম্মনস্ক ও আনন্দে পরিপূর্ণ[৪]। তাঁহারা চক্ষুরাদির দ্বারা দর্শনাদি করেন ও হস্তাদির দ্বারা গ্রহণাদিও করেন, পরন্তু তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। অর্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য অন্যমনস্ককৃত কার্য্যের ন্যায়[৫]। তাঁহারা এই সকল মনুষ্যের সঞ্চরণাদি ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এ সকল মনুষ্যের সঞ্চরণাদি যন্ত্র পুত্তলিকার সঞ্চরণাদির অনুরূপ[৬]। জীবন্মুক্ত বা আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করেন না, বর্ত্তমানেও ব্যাপৃত হন না এবং অতীত বিষয়ও স্মরণ করেন না[৭]। তাঁহারা ব্যবহার কার্য্যে প্রসুপ্তের ন্যায় থাকেন এবং স্বাত্মতত্ত্বে সদা প্রবুদ্ধ থাকেন। লোকে দেখে বটে, তাঁহারা কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর কর্ত্তৃত্ববর্জ্জিত[৮]। তাঁহারা অন্তরে সর্ব্ব পরিত্যাগী ও অন্তরে নিরীচ্ছ হইয়াও বাহ্যিক কার্য্যে বিমুখ নহেন[৯]। বাহিরে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা দৃষ্ট হয় সত্য; পরন্তু তাঁহারা উপস্থিত কার্য্য ব্যতীত অনুপস্থিত কার্য্যের জন্য ব্যাপারবান্ হন না[১০]। আমি কর্ত্তা, আমি করি বা করিব, এ বোধ তাঁহাদের নাই। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ায় তাঁহাদের সুখ ভোগ ও আশা সমস্তই আত্মময়[১১]। তাঁহারা ঔদাসীন্য অবলম্বী, সেই জন্য তাঁহারা কৃত কর্ম্মের ইষ্টানিষ্ট ফলে অভিভূত হন না। তাঁহাদের বাঞ্ছা, দ্বেষ, শোক ও হর্ষ প্রভৃতি কোনও প্রকার মনোবিকার জন্মে না[১২]। কোন জীব তাঁহাদের প্রতি

অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ করিলে তাঁহারাও অনাসক্ত চিত্তে তাহাদের প্রতি যোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহারা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ, শঠের প্রতি নিগ্রহ, বালকের প্রতি বাৎসল্য, যুবার প্রতি যৌবনের কথা, দুঃখিতের প্রতি দুঃখ, এ সমস্তই করেন বটে; পরন্তু অনুরঞ্জিত হইয়া করেন না[১৩।১৪]। হে রঘুনন্দন! যাঁহাদের বাগিন্দ্রিয় পবিত্র কথায় পর্য্যাপ্ত, যাঁহাদের আশয় অর্থাৎ মনোবৃত্তি দীনতাবর্জ্জিত, যাঁহাদের বুদ্ধি উদার, যাঁহাদের আনন্দ অকৃত্রিম অর্থাৎ বাহ্যবিষয়জনিত মনোবৃত্তি বিশেষ নহে, যাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানী, প্রসন্নস্বভাব, প্রতিভাভরিত, অখিন্ন, অদুর্গত ও বন্ধুপ্রিয়, এবং যাঁহারা উদার চরিত্র, সমদর্শী, মনোজ্ঞ ও সুখের বা আনন্দের সাগর স্বরূপ ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, তাঁহাদের পুণ্য, ভোগ, কর্ম্ম, ও কর্ম্মত্যাগ, পাপমার্জ্জন, ভোগবর্জ্জন, বন্ধু প্রভৃতির পরিত্যাগ, কোনও কিছুতে প্রয়োজন নাই[১৫।১৮]। তাঁহাদের কার্য্যের আরম্ভে ও কারণের সংগ্রহে প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের নিকট বন্ধ, মোক্ষ, স্বর্গ, পাতাল, দিবা, রাত্রি, সমস্তই সমান[১৯]। যাঁহারা সমুদায় দৃশ্যে আত্মদর্শন করেন, তাঁহাদের মন বন্ধনের ও মোচনের জন্য চঞ্চল কদাচ হয় না[২০]। তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাবহ্নি যাঁহাদের দেহাদি সমস্তই দগ্ধকল্প করিয়াছে, আত্মাকাশে তাঁহাদের চিত্তরূপ বিহঙ্গ নিঃশঙ্কে উড্ডয়ন করে[২১]। যাহার মন ভ্রান্তিমুক্ত ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় উদয়াস্ত রহিত[২২]। সুখশয্যাশায়িত শিশু স্বানন্দ রসের আবির্ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করে। সেইরূপ আত্মানন্দের আবির্ভাবে তত্ত্বজ্ঞের শরীর চেষ্টাসম্পন্ন হইয়া থাকে[২৩]। যেমন মদমত্ত ব্যক্তি আনন্দের বা বিকারের উত্তেজনায় ফলাফল অনুসন্ধান না করিয়াই কার্য্য করেন ও কৃত কার্য্য সকল বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার ন্যায় জীবন্মুক্তেরাও ফলাফল অনুসন্ধান বর্জ্জিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন ও করিয়া স্মরণ করেন না[২৪]; যেমন শিশুর চেষ্টা অনভিসংহিত, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ দিগের চেষ্টাও অনভিসংহিত অর্থাৎ অভিসন্ধি বর্জ্জিত[২৫]। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কাল দেশ পাত্রাদি অনুসারে কার্য্য কলাপ করেন বটে; পরন্তু সে সকলের দ্বারা তাঁহারা সুখে অথবা দুঃখে লিপ্ত হন না[২৬]। তাঁহারা বাহিরে প্রয়োজনবান্ ব্যক্তির ন্যায় কিন্তু অন্তরে তাঁহারা প্রয়োজনশূন্য। অন্য লোকে যেমন ফল লাভের প্রত্যাশায় কর্ম্মপ্রবৃত্ত হয় তত্ত্বজ্ঞ লোক

সেরূপ ফল লাভের প্রত্যাশায় কর্ম্মপ্রবৃত্ত হন না[২৭]। তাঁহারা দুঃখের অবস্থায় খেদ করেন না, সুখের অবস্থা প্রার্থনা করেন না, কার্য্য সিদ্ধিতে হৃষ্ট হন না, কার্য্য নাশেও খেদ করেন না[২৮]। কদাচিৎ সূর্য্যের শীতলতা ও চন্দ্রমণ্ডলের উষ্ণতা সম্ভব হইতে পারে তথাপি তত্ত্বজ্ঞের বিস্ময় হওয়া সম্ভব হইতে পারে না[২৯]। চিদাত্মায় সকল শক্তি বিদ্যমান, এবং সে সকল শক্তি বিবিধ প্রকারে স্ফুরিত হয়, এই রহস্য বিদিত থাকায় তাহাদের কোন কিছুতে কৌতুক জন্মে না[৩০]। তাহারা দয়াও করেন না, দয়ার কার্য্য করিতে পারিলাম না ভাবিয়া দৈন্য অনুভব করেন না, ক্রূর কার্য্যেও তাঁহাদের মন ধাবমান হয় না, তাঁহারা লজ্জার অনুসন্ধান করেন না এবং নির্লজ্জও হন না[৩১]। দীনতা, ঔদ্ধত্য, মত্ততা, খেদ, উদ্বেগ, হর্ষ, এ সকল তাঁহাদিগকে আক্রম করে না এবং তাঁহাদিগের অতি বিস্তৃত ও শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল চিত্তে ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হয় না[৩২।৩৩]। জীব সকল অবিশ্রান্ত জন্মিতেছে ও মরিতেছে, এবং তাহাই জগতের স্বরূপ বা স্থিতি, তজ্জন্য আবার সুখ দুঃখ কি? তরঙ্গের সহচর ফেন, তাহাও ক্ষণিক, তাহার ন্যায় জন্ম মরণের সহচর সুখ দুঃখ এবং তাহাও ক্ষণিক। জীব জন্তুর অজস্র উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতি হইতেছে যাইতেছে বলিয়া বোধ হয় বটে, পরন্তু সে সকল দৃষ্টিসৃষ্টি (দেখাই সৃষ্টি অর্থাৎ উৎপত্তি। না দেখাই লয় বা বিনাশ) ব্যতীত বাস্তব নহে। অর্থাৎ বস্তুতঃ কোনও কিছু হয়ও না এবং যায়ও না। হওয়া যাওয়া থাকা প্রভৃতি সমস্তই আত্ম-নিষ্ঠ অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষ তৎসম্বন্ধে এই-রূপ জানেন যে, সমস্তই আমারই দৃষ্টির অর্থাৎ কল্পনার বিজৃম্ভণ[৩৪।৩৬]। যাহাতে অবিশ্রান্ত উৎপত্তি ও অবিশ্রান্ত বিনাশ অনিবার্য্য, তাদৃশ দগ্ধ সংসারে আবার সুখ দুঃখ কি[৩৭।৩৮]? শুভ কর্ম্মের অভাবে সুখের অভাব, এবং শুভ কর্ম্মের ফলে সুখ, এ নিশ্চয় অতত্ত্বদিগের মধ্যে। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞের শুভাশুভ না থাকায় সুখ দুঃখ তাঁহাদের পক্ষে অভাবগ্রস্ত। সুখের অনুভব হইতে দুঃখের বীজ জন্মে। অর্থাৎ সুখ ক্ষণমাত্র অনুভব গম্য হয়, তৎপরে আবার তাহার অবসান হয়। সেই অবসান দুঃখ-দায়ক। সুতরাং সুখানুভবই দুঃখদশার বীজ। তাদৃশ দুঃখবীজ সুখ যদি না থাকে তাহা হইলে দুঃখ কোথা হইতে আসিবে? যে প্রকারেই

হউক, যদি সুখ দুঃখ ক্ষীণ হয় তাহা হইলে ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, এ বোধও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। মূলে যদি শুভাশুভ বিভাগ না থাকে তাহা হইলে হেয় ও উপাদেয় ভাব থাকিবে কেন[৩৯।৪১]? ইহা রম্য, তাহা অরম্য, এ দৃষ্টির বিনাশ হইলে ভোগ বাসনা থাকিবে কেন[৪২]? তিল দগ্ধ হইলে তৈল কোথা হইতে আসিবে? তাহা যেমন আসে না তেমনি মনঃক্ষয় হইলেও সঙ্কল্পের উদয় হয় না। অতএব, আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই, সমস্তই আত্মা, এই ভাব ভাবনার দ্বারা ঘনীভূত (দৃঢ়) হওয়ায় সঙ্কল্প বিকল্পের অভাব হয়। তন্নিবন্ধন মহাত্মাগণ জীবিতাবস্থাতেই নিত্যতৃপ্ত হন[৪৩।৪৪]।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

হওয়ায় প্রাণের পূর্ণতা নিবন্ধন নিশ্চলতা জন্মে, সেই নিশ্চলতার নাম প্রাণনিরোধ। (ইহাতেও জীব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়)[২৩]। কেবল কুম্ভকেও প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। কুম্ভকের অভ্যাসে প্রাণ পবন শরীরের মধ্যে স্তম্ভিতত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই সঞ্চরণ রহিত স্তম্ভিত অবস্থায় প্রাণের স্পন্দন রহিত হইয়া যায়[২৪]। জিহ্বার দ্বারা তালুমূলস্থ ঘণ্টিকা (আল্‌জিহ্বা) আক্রম করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেও প্রাণ নিরোধ জন্মে। ঐ কার্য্যের দ্বারা প্রাণ পবন অধঃসঞ্চারশূন্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হওয়ায় প্রাণনিরোধাখ্য যোগ জন্মে[২৫]। ধ্যানের দ্বারা মনকে নির্ব্বিকার হৃদয়াকাশে লীন করিলেও প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়; অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি উৎপাদনও প্রাণ জয়ের অন্যতম উপায়[২৬]। নাসার অগ্রভাগ হইতে বার অঙ্গুল পরিমাণ বহিরাকাশের মধ্যে চক্ষুঃ ও মন স্থির রাখিতে পারিলেও প্রাণ স্পন্দনের অবরোধ হইতে পারে[২৭]। অভ্যাস দ্বারা কি না হয়? অভ্যাসের প্রভাবে প্রাণ উর্দ্ধগামী হইয়া গলিতপ্রায় হয়, তখন তাহার স্পন্দনও বিনিবৃত্ত হয়[২৮]। ভ্রূমধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে বদ্ধ করিলেও প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ হয় এবং চিন্ময় পরমেশ্বরই আত্মা, এরূপ বোধের পরেও কখন কখন প্রাণ ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া থাকে[২৯]। কখন কখন গুরুর প্রসাদে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে সহসা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ও চিত্তের সমুদায় কল্পনা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাতেও প্রাণ নিরোধ হইয়া থাকে[৩০]। দীর্ঘ কাল ব্যাপী হৃদয়াকাশের ধ্যানেও কখন কখন চিত্তত্ব বা জীবতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, এবং তৎ সাক্ষাৎকারে সর্ব্ব কল্পনার উপশমে প্রাণ নিরোধ যোগ জন্মে[৩১]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রাণিগণের হৃদয় কিং স্বরূপ? যাহাতে এই সকল প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৩২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! প্রাণিনিবহের হৃদয় দ্বিবিধ। এক উপাদেয়, অপর হেয়। কি হেয় কি উপাদেয় তাহাও বলি শ্রবণ কর[৩৩]। *

জীবদেহের বক্ষঃস্থলের মধ্যে যে অপূপাকার মাংস খণ্ড (অপূপ=

* হৃদয় শব্দ মনে, বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরস্থ মাংস খণ্ড বিশেষে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। তাই রামচন্দ্র সন্দিহান হইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে বশিষ্ঠ মাংসখণ্ড ও মন দু-ই অল্প পরিমাণ কারণে এক বলিয়া গণনা করতঃ বিভাগ দ্বয়ে হৃদয় শব্দের অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

পুলিপিঠা। তদাকার হৃৎপিণ্ড), তাহাও হৃদয়পদবাচ্য, পরন্তু তাহা হেয় বলিয়া গণ্য[৩৪]। আর তদুপলক্ষিত দেহে যে সম্বিতের (চেতনার) প্রকাশ আছে, তাহাও হৃদয় শব্দের বাচ্য। এই হৃদয়ই তত্ত্বজ্ঞ দিগের মধ্যে উপাদেয় বলিয়া গণ্য। তাহা দেহের অভ্যন্তর ও বাহ্য উভয়ত্রই অবস্থিত। সর্ব্বত্র বিরাজিত, এ কথা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না, আরও বলিতে হয়। এমন কি, অন্তর ও বাহ্য এই দুই কথার ব্যাখ্যায় যে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, প্রভৃতি পাওয়া যায়, সে সমস্তই উক্ত উপাদেয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব, তাহাই প্রধান, তাহাই আদর্শ, তাহাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোষ স্বরূপ। জীবগণের উক্ত সম্বিৎ নামক হৃদয়ই প্রকৃত হৃদয়, মাংসখণ্ডাত্মক হৃদয় হৃদয় নহে। মাংস খণ্ডাত্মক হৃদয় ক্ষুদ্র ও জড়[৩৫,৩৭]। অতএব, উক্ত সম্বিন্ময় হৃদয়কে হৃতবাসন ও বিশুদ্ধ করিয়া তাহাতে ধ্যানযোগে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে প্রাণস্পন্দন বিনষ্ট করা যায়[৩৮]। প্রাণ নিরোধের কতিপয় মাত্র উপায় বলিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও উপায় বা প্রণালী আছে, সে সকল নানা যোগগুরুর কল্পিত[৩৯]। সে সকল যোগ প্রথম অবস্থায় দুঃসাধ্য হই-লেও অভ্যাস দ্বারা সুসাধ্য হয়[৪০]। অন্য বাসনার নিরোধে মোক্ষ বাসনা বেগবতী হয়। মোক্ষ বাসনা বলবতী হইলে মোক্ষ ফল লব্ধ হয় পরন্তু বাসনান্তরের প্রাবল্যে প্রাণ সংযম দ্বারা সেই সেই বাসনার সাফল্য হইয়া থাকে[৪১]। যোগশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, ভ্রূমধ্য প্রভৃতি স্থানে ধারণা প্রয়োগ অভ্যস্ত হইলে প্রাণ নিরোধ হয়[৪২]। অপিচ, জিহ্বাগ্র দ্বারা তালু প্রদেশস্থ ঘণ্টিকা নামক স্থান আক্রম করতঃ অবস্থান করিতে পারিলে প্রাণ প্রবাহের অবরোধ হইয়া থাকে[৪৩]। হে রাঘব! যদিও অভিহিত প্রকারের সমাধি সমূহের ফল নানা প্রকার, তথাপি, নিষ্কাম যোগীর সম্বন্ধে ঐ সকল সমাধির ফল একই প্রকার অর্থাৎ একাদ্বয় তত্ত্ববিজ্ঞানই তাহার ফল। অতএব, যে কোন সমাধি হউক, সমাধি মাত্রেই নিষ্কাম যোগীর শান্তিপ্রদ[৪৪]। হে রামচন্দ্র! অভ্যাসের ক্ষমতার কথা অধিক কি বলিব, লোক সকল অভ্যাসের দ্বারাই আত্মরাম, শোকশূন্য ও সুখপরিপূর্ণ হইয়া থাকে। সেই জন্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি অভ্যাসবান্ হও[৪৫]। অভ্যাসের দ্বারা প্রাণস্পন্দন ক্ষীণ হইলে তখন মনঃও বিলীন হইবে। মন বিলীন

হইলে নির্ব্বাণ পদ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে[৩৬]। হে রাম! উক্ত বিষয়ের সংক্ষেপ উপদেশ এই যে, বাসনাবেষ্টিত মনের নাম জন্ম এবং বাসনা-বর্জ্জিত মনের নাম মোক্ষ। জন্ম গ্রহণের ও জন্ম বিনাশের যাহা মুখ্য কারণ তাহা বলিলাম, এখন যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার[৩৭]। আরও বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! এই যে প্রাণের স্পন্দন, ইহাকেই তুমি মনের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। সংসারভ্রম উহারই অধীন। সুতরাং উহার অবসানে সংসার জ্বরের অবসান হয়[৩৮]। জীবের যে বিকল্পনা, তাহার বিনাশে সেই বাক্য মনের অতীত পদ লব্ধ হয়[৩৯]। সমুদায় রহস্য যাহাতে ও যাহা হইতে এবং যাহা, তাহার আবার দৃষ্টান্ত কি? বস্তুতঃই নির্গুণ আত্মার দৃষ্টান্ত নাই[৪০।৪১]। তিনি বাহ্যিক রূপাদি বিষয়ের জ্ঞাতারূপে ও আন্তরিক কামাদি বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব রূপে নিত্য পরিচিত[৪২]। অধিক কি বলিব, সেই নির্গুণ আত্মা কল্পতরুস্বরূপ। তাহা হইতেই অজস্র নানা রসের অসংখ্য সংসার ফল জন্মিতেছে ও বিধ্বস্ত হইতেছে[৪৩]। যে ধীর পুরুষ তাহাকে জানিয়াছে, জানিয়া তাহাতেই স্থিতি করিতেছে, সেই ধীর পুরুষ ইহ সংসারে জীবন্মুক্ত নামে প্রখ্যাত[৪৪]। জীবন্মুক্ত দিগের চেষ্টা নাই, কোন বিষয়ে কৌতুক নাই, ইচ্ছা নাই, কল্পনা নাই, এবং তাহাদের ব্যবহার ও আশয় (চিত্তবৃত্তি) সর্ব্বত্র সমান[৪৫]।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

—○(*)○—

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! চিত্ত উপশমের অর্থাৎ মনোনাশের দ্বিবিধ ক্রম আছে। তন্মধ্যে বলবৎ ক্রম যোগ ও জ্ঞান। উক্ত ক্রম দ্বয়ের মধ্যে যোগ ক্রমের কথা বলিলেন, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞান ক্রমের কথা বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আদি নাই অন্ত নাই, এরূপ এক অপরিচ্ছিন্ন নিত্য স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই আছেন, আর কিছু নাই, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম সম্যক্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান[২]। ঘটপটাদি আকারে দৃশ্যমান এই জগৎ পদার্থ আত্মার অনতিরিক্ত, এইরূপ নিশ্চয়ের নাম সম্যক্‌জ্ঞান। তাদৃশ সম্যক্‌জ্ঞানে মোক্ষ, এবং উহার বিপরীত জ্ঞানে অর্থাৎ জগৎ জ্ঞানে সংসার। যেমন রজ্জু রূপের অজ্ঞানে সর্প এবং রজ্জু রূপের জ্ঞানে রজ্জু, সেইরূপ, আত্মরূপের অজ্ঞানে সংসার ও আত্মরূপের জ্ঞানে মোক্ষ হইয়া থাকে[৩।৪]। মোক্ষ দশায় সঙ্কল্প বর্জ্জিত বা সম্বেদ্য বর্জ্জিত সম্বিন্মাত্রই ভাসমান থাকে, অন্য কোন কিছুর বিদ্যমানতা বা ভাসমানতা থাকে না। বিশুদ্ধ ভাবে বিদিত সেই সম্বিৎ পরমাত্মা নামে গীত হন এবং অবিশুদ্ধ ভাবে বিদিত সেই সম্বিদের সংজ্ঞা অবিদ্যা[৫।৬]। পূর্ব্বে যে সম্বেদ্যের (সম্বিদের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের) কথা বলিয়াছি, সে সম্বেদ্যও সম্বিদের অনতিরিক্ত। অর্থাৎ তাহাও সম্বিদের রূপান্তর মাত্র[৭]। সুতরাং বস্তু দৃষ্টিতে এক বৈ দুই নাই। হে রামচন্দ্র! যাহার অভিহিত প্রকারের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে, ভাব অভাব বা বন্ধ মোক্ষ, এ সকল কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং শোকের দুঃখের বিষয়ও ত্রিজগতে নাই[৮।৯]। চেত্যই বল, আর চিত্তই বল, সমস্তই ব্রহ্মের বিলাস। যখন এক মাত্র পর ব্যোমই আছে, অন্য কিছু নাই, তখন বন্ধ মোক্ষ থাকিবে কেন? ঐ দুই কথা, কথা মাত্র[১০]। যেমন কোন নট আপনিই আপনার মায়ার দ্বারা আপনার আকারকে বিবিধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মও আপন মায়ায় আপনাকে

বিবিধ করেন অর্থাৎ জগৎরূপ দৃশ্যে বিবর্ত্তিত করেন। পূর্ব্বে যে সম্যক্‌জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, সে জ্ঞানের নিকট কাষ্ঠে, লোষ্ট্রে ও পাষাণে প্রভেদ নাই১১।১২। হে রাঘব! যাহার স্বরূপ অবিনাশী ও আদ্যন্তে শান্ত রূপ, তুমি তন্ময় হও। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সেই পর ব্যোমেরই রূপ, সুতরাং ইহাতে সুখ দুঃখের ক্রম নাই১৩।১৪। জল যেমন বিবিধ বিচিত্র বীচি ও বিম্বাদি রূপে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ, আত্মাও দ্বৈত অদ্বৈত ও তদন্তর্গত জরামরণাদি প্রতিভাসে অবভাসিত হইতেছেন১৫। যে ব্যক্তি অন্তর্ম্মুখী (আত্মাভিমুখী) বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ আত্মায় লীনা করিয়া অবস্থান করে, ভোগ সকল সেই তত্ত্বজ্ঞানীকে বন্ধন করিতে পারে না১৬। যেমন মৃদু বায়ু পর্ব্বত বিতাড়িত করিতে পারে না, সেইরূপ, ভোগের বেগ কৃতবিচার চিত্তকে বিতাড়িত করিতে পারে না। বক যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য দিগকে নিগীরণ করে, তেমনি, দুঃখ সমূহ অবিচারশীল অজ্ঞ মূঢ় আশাপাশজড়িত দিগকে নিগীরণ (গ্রাসগত) করে১৭।১৮।

অতএব, হে রাঘব! সমস্ত জগৎ-ই আত্মা, অবিদ্যাও নাই অর্থাৎ অবিদ্যা তুচ্ছ বা অসত্য, ঈদৃশ জ্ঞান অবলম্বন কর, করিয়া সুস্থির হও১৯। একত্ব নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞানের অংশ সেজন্য তাহা নাই। যেমন সকল সরোবরের জল জলরূপে এক, সেইরূপ, বিশ্বকল্পনাও আত্মরূপে এক, সেজন্য এক বৈ দুই নাই। যে পুরুষ ঐরূপ নিশ্চয় যুক্ত, সেই পুরুষই মুক্ত২০।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ।
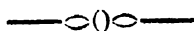
বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরুষ যে বিচারে লিপ্ত থাকিলে পুরোস্থিত ভোগ সকল তাহাকে স্পর্শ করে না, এক্ষণে সেই বিমর্শের অর্থাৎ বিচার বিশেষের কথা বর্ণনা করি, অবহিত হও[১]।

এই যে চক্ষু, ইহা কেবল আলোকনের নিমিত্ত এবং এই যে জীব, ইহাও কেবল সুখদুঃখভারবাহী মাত্র। গর্দ্দভ যেমন ভার বহন করে কিন্তু তদ্বাহিত দ্রব্যের ভোক্তা হয় না, সেইরূপ, চক্ষুরাদির কেহই ভোক্তা নহে, ভোক্তা অহন্তা[২]। অতএব, চক্ষু যদি রূপে নিমগ্ন হয় তাহাতে আত্মার কি? গর্দ্দভ কর্দ্দম মগ্ন হইলে সেনাপতির কি হয়[৩]? অরে অধম নয়ন! তুমি রূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইও না, হইলে উহা এই মুহূর্ত্তেই তোমার হিংসা করিবে[৪]। তুমি স্বভাব বশতঃ রূপে প্রধাবিত হও, হইবে, তাহাতে আত্মার কি হইবে? তাই তোমায় বলি, তুমি রূপে মগ্ন হও হইবে, পরন্তু যেন তাহার স্বাদ গ্রহণ করিও না। কেননা, তুমি যে অন্তর্গত চিদাত্মার দ্বারা বাহিরের ও অন্তরের পদার্থ প্রকাশ কর, সে চিদাত্মা যেন তোমার কৃত কার্য্যে বন্ধন দশা প্রাপ্ত না হয়[৫]। অহে নয়ন! তুমি উৎপন্নধ্বংসী আপাত হৃদ্য অসন্ময় রূপের আশ্রয় লইও না[৬]। রূপ আপনাতেই থাকুক, তুমি তাহাতে সাক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্ত থাক[৭]। অরে চিত্ত! তোমার এই বিশ্ব দর্শন সর্ব্বথা মিথ্যা। আকাশে যেমন পিচ্ছিকা দর্শন, জলে যেমন ফেন বুদ্বুদাদি দর্শন, তোমার এই বিশ্ব দর্শন ঠিক্ সেইরূপ[৮]। অরে অহঙ্কার! তোমা-কেও বলি, চক্ষু যাহা ইচ্ছা করে তাহা দেখুক, চিত্ত যাহা ইচ্ছা করে তাহা বুঝুক, তুমি আবার কোথা হইতে আসিলে? অর্থাৎ তুমি তাহাতে যোগ দেও কেন? (আমি দেখিলাম, এরূপ স্থির কর কেন)[৯]? রূপ সূর্য্যাদির আলোক অবলম্বন করিয়া প্রস্ফুরিত হয় হউক, আলোকও রূপাদি আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয় হউক, হে অহঙ্কার! তোমার তাহাতে সুখ দুঃখ কি? চিত্তের স্বভাব, সে নানা আকারে স্ফুরিত

হইবে। তুমি কেন তাহাতে ভাসমান হও[১০]? বাহিরের দর্শন ও তদুপলক্ষিত মনস্কার (চিত্তের স্ফুরণ), ইহাদের কাহার সহিত কাহার বাস্তব সম্বন্ধ নাই; তথাপি তাহারা যে স্ফূর্ত্তি পায় বা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা আদর্শ, মুখ ও প্রতিবিম্ব, এই তিনের অনুরূপে[১১]। অজ্ঞান এক প্রকার জন্তু, (কুম্ভীর প্রভৃতির ন্যায় হিংস্র), সে যখন জ্ঞানকে গ্রাস করে তখনই সেই অজ্ঞানগ্রস্ত জ্ঞান জীব হইয়া জন্মপরম্পরা ও তদুপলক্ষিত দুঃখপরম্পরা অনুভব করে। যখন সেই জ্ঞান অজ্ঞান হইতে পৃথক্ হয় তখন না জ্ঞান, না অজ্ঞান, না জন্ম না মরণ কিছুই থাকে না[১২]। রূপ, আলোক, মনস্কার, এই তিন্ পরস্পর অজ্ঞানেরই কল্পনায় সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে[১৩]। মন আপনারই আশ্রিত, তাহার যে মনন তাহা তত্ত্বস্থানীয়, বিচার দ্বারা তাহা যখন বিছিন্ন হয় তখন অজ্ঞানের কার্য্যও বিলুপ্ত হয়[১৪]। যদি কদাচিৎ অজ্ঞানের ক্ষয় হয় তাহা হইলে তখন দেখিবে যে, রূপ, আলোক ও মনস্কার এ তিনের আর সংঘট্ট হইতেছে না[১৫]। চিত্তই ইন্দ্রিয়গণের নেতা এবং তাহাই মন্দিরস্থ পিশাচের ন্যায় দুর্নিবার। অরে চিত্ত! তুই আর বৃথা আত্মগরিমা করিস্ না। আমি জানিয়াছি, তুই মিথ্যা; তুই পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে, সর্ব্বকালে তুচ্ছ অর্থাৎ অবস্তু[১৬।১৭]।

অরে চিত্ত! তুই বৃথা আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিস্। যাহারা তোমাকে "আমার বলিয়া" জানে তাহাদেরই সম্মুখে তোমার নৃত্য শোভা পায়। তোমার এই নৃত্য আমার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিতোষের কারণ নহে[১৮।১৯]। অরে চিত্ত! তুমি থাক আর না থাক, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট জীবিতের ন্যায় ছিলে বটে; কিন্তু এক্ষণে তুমি বিচার দ্বারা মৃত হইয়াছ[২০]। তুমি অতি নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ তুচ্ছ, তুমি জড় ও ভ্রান্তিময়, তুমি শঠ ও শব তুল্য হেয়। যাহারা মূঢ় তাহারাই তোমার বাধ্য কিন্তু যাহারা বিচার-বান্ তাহারা তোমার বাধ্য বা বশ্য নহে[২১]। তুই যে মৃত তাহা আমি পূর্ব্বে মুর্খতা বশতঃ জানিতে পারি নাই। এখন জানিয়াছি, তুই মৃত অর্থাৎ শব দেহের ন্যায় পরিত্যাজ্য[২২]। আমার এই দেহরূপ গৃহ অতিদীর্ঘকাল তোমার দ্বারা রুদ্ধ ও সৎসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া ছিল, এক্ষণে তোমার পলায়নে ইহা সাধুসেব্য হইয়াছে[২৩।২৪]। তুমি যখন ছিলে

তখন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি নাই। তুমি না থাকায় এখন জগৎও নাই[২৫]। অরে চিত্তবেতাল! তুই তৃষ্ণা পিশাচীর ও ক্রোধাদি গুহ্যক গণের সহিত আমার এই দেহ গৃহ হইতে শীঘ্র পলায়ন কর[২৬]। আমার সৌভাগ্য এই যে, বিবেকের উদয়ে প্রমত্ত চিত্ত বেতাল আমার এই দেহ মন্দির হইতে পলায়ন করিয়াছে[২৭]। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্ষণভঙ্গুর, জড় ও শঠ মনঃকর্ত্তৃক এই সমুদায় লোক বঞ্চিত ও বশীকৃত। অরে পামর! তুই যদি একাদ্বয় আমাকে আক্রম করিতে পারিস্ তাহা হইলে বুঝিতে পারি, তোর পরাক্রম আছে, বল আছে এবং আশ্রয় বা সহায়ও আছে[২৮।২৯]। অরে অবোধ! তুই কিছুতেই আমার নিকট থাকিতে পারিবি না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুই মৃত[৩০]। এত কাল তোকে আমি জীবিত পদার্থ জ্ঞান করিয়া সুদীর্ঘ সংসার রাত্রি যাপন করিয়া আসিয়াছি, পরন্তু আজ্ আমি জ্ঞাত হইয়াছি, তুই নাই[৩১।৩২]। ভাগ্য বশতঃই আমি "চিত্ত নাই" এই-রূপ বুঝিয়াছি। অতঃপর আর আমি মিথ্যা বিভীষিকায় ভুলিব না[৩৩]। এই মুহূর্ত্তেই আমি চিত্ত বেতালকে এই দেহ গৃহ হইতে বিতাড়িত করতঃ স্বস্থ ও সুখী হইব[৩৪]। আমি এতকাল চিত্ত বেতালের প্রতা-রণায় মুগ্ধ থাকিয়া যে সকল বিকার দর্শন করিয়াছি সে সকল স্মরণ করিয়া আজ্ আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না[৩৫]। আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, আমি আজ্ এই দেহ গৃহে অবস্থিত চিত্ত বেতালকে বিচাররূপ অসির দ্বারা নিপাতিত করিতে পারিয়াছি। চিত্ত বেতালের নিপাতনে আজ্ আমি এই দেহ নগরে সুখে অবস্থান করিব[৩৬।৩৭]। মন মৃত হইয়াছে, চিন্তাও মৃতা হইয়াছে, অহঙ্কার রূপ রাক্ষসও বিচার মাত্রে মৃত হইয়াছে[৩৮]। মন, আশা, অহঙ্কার, এ সমস্তই আজ্ বিনষ্ট বা পলায়িত। ইন্দ্রজালতুল্য স্ত্রী পুত্রাদিও আজ্ বিনষ্ট। আজ্ আমি একক, কৃতকৃত্য, মলশূন্য, নিত্য, নির্ব্বিকার ও কেবল চিৎ[৩৯।৪০]। আমি শোক, মোহ, অহঙ্কার এ সকলের অতীত ও ভেদাভেদ বর্জ্জিত[৪১]। আমার আশা, কর্ম্ম, সংসার, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, দেহ, কিছুই নাই, কেবল আমিই আছি, এতাদৃশ আমাকে নমস্কার[৪২]। আমি অহং নহি, অনহং নহি, অন্য কিছু নহি, পরন্তু আমিই সমুদায়; সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার[৪৩]। আদি অর্থাৎ মূল কারণ আমি,

ধাতাও আমি, চেতনাও আমি, ভুবনও আমি, পরন্তু আমার ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ আমার অভাব কুত্রাপি নাই। সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার[৪৪]। আমি নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরংশ, মহান্, সর্ব্বময়, সর্ব্বাধার ও সর্ব্বকাল[৪৫]। আমি জীবরূপ, নির্নাম, স্বপ্রকাশ, স্বয়ং বা স্বাধীন[৪৬]। আমি সর্ব্বগামিনী ও সর্ব্বপ্রকাশিনী সত্তা প্রাপ্ত হইয়াছি[৪৭]। অদ্রি, অব্ধি, উর্ব্বী, নদী, সমস্তই আমি, অধিক কি, নানা পদার্থে পরিপূর্ণ দেদীপ্যমান জগৎও আমি। অতএব, আমার নমস্কার আমাতেই পর্য্যাপ্ত। আমি আদ্য, নিরন্তমনন, বিশ্বপ্রকাশক, অজ, গুণাতীত, অচ্যুত ও ঈশ্বর; সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার[৪৮।৪৯]।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ।

—(*)○(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! মহাত্মা তত্ত্ববিদ্‌গণ জ্ঞেয় আত্মা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন[১]। যে চিত্ত জগতের জগত্তা মার্জ্জন করিয়া আত্মত্বে পর্য্যবসিত করে অর্থাৎ ইহা জগৎ নহে কিন্তু আত্মা, এইরূপ বোধ জন্মায়, সে চিত্ত যে উত্থিত হয় ও থাকে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। কেননা সে নিজেও বস্তু নহে; কেননা, সেও জগতের অন্তঃপাতী। সুতরাং সেও অবস্তু[২]। চিত্ত যে কোন বস্তু নহে, তৎপ্রতি হেতু এই যে, চিত্ত জড়। যে হেতু চিত্তের চিত্ত নাই, সেই হেতু সে জড়। অপিচ, উহার উৎপত্তি মায়িক। যে হেতু উহা মায়ার কার্য্য সেই হেতু উহা অবস্তু ও নাই। উহার উৎপত্তি ও স্থিতি খপুষ্পের সমান[৩]। যেমন নৌকারোহী অবোধ শিশুদিগের নিকট বৃক্ষের গতি সিদ্ধবৎ প্রতীত হয়, তেমনি, চিত্তও আত্মভ্রান্ত দিগের নিকট সিদ্ধবৎ হইয়া রহিয়াছে। অভ্রান্ত দিগের নিকট নহে[৪]। যে ভ্রমের দ্বারা চিত্তের স্থিতি সে ভ্রম অপগত হইলে চিত্তের অস্তিতা থাকে না[৫]। অতএব, চিত্ত নাই, কেবল ব্রহ্মই আছে[৬]। পূর্ব্বে যে চিত্তবিষয়ে সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ বিগলিত হইয়াছে, আমিও এক্ষণে গতজ্বর ও স্বস্থ হইয়াছি[৭]। চিত্তনাস্তিতা স্থির হওয়ায় বাল্যযৌবনাদি ও অন্তঃস্থ ইচ্ছাদির নাস্তিতাও অবধারিত হইয়াছে[৮]। চিত্ত মৃত, তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত, মোহও অপগত, অহঙ্কারও উপশান্ত, এবং আমিও প্রবুদ্ধ[৯]। যখন জগৎ নাই, কেবল এক মাত্র আত্মাই আছে, নানা ভাব যখন মিথ্যা, তখন আর বিচার কি? কে কাহার কি বিচার করিবে[১০]? যে পদ নিরাভাস, আদি অন্ত বর্জ্জিত, পরম পাবন, সে পদ সৌম্য, সূক্ষ্ম ও শাশ্বত। আত্মাই তাদৃশ শাশ্বত পদ। অন্য কিছু নহে[১১]। চিত্তাদি পদার্থ অনাত্মা, সে জন্য তুচ্ছ বা অবস্তু। যাহা আছে তাহাই আত্মা। এই আত্মা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম নির্ম্মল অনন্ত ও দুর্ব্বোধ্য[১২]। দেহান্তান্তরে চিত্ত থাকুক না থাকুক, মৃত হউক বা জীবিত থাকুক, আমার

সহিত তাহার সম্পর্ক কি? আমি নিত্যোদিত নিঃসঙ্গ আত্মা। এ যাবৎ কাল আমি মূর্খতা বশতঃ বিচার করি নাই। এক্ষণে বিচারে জানিতে পারিয়াছি, আমি অপরিমিত, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম[১৩।১৪]। মন যে দিন মৃত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বিশ্ববিকল্পও মৃত হইয়াছে। অতএব, অদ্য হইতে আমি সমুদায় অন্তঃস্থ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম এবং মৌনীর ন্যায় শান্তাত্মা হইয়া যাবৎ প্রারব্ধ (যাবৎ দেহ তাবৎ) থাকিব[১৫।১৬]।

হে রাঘব! আত্মজ্ঞগণ শয়ন ভোজন গমন উপবেশন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঐরূপ বিচার পরায়ণ হইয়া স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। তাঁহাদের মান, অভিমান, ও মদ মাৎসর্য্যাদি থাকে না, তাঁহাদের আশয় অতি নিৰ্ম্মল হয়। তাঁহাদের মোদ অর্থাৎ হর্ষ নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের লৌকিক বৈদিক ব্যবহারও সরল ভাবে সম্পন্ন হয়; সে জন্য তাঁহারা ইহ লোকে ও ইহ শরীরে পরম সুখে বিহার করিতে থাকেন[১৭।১৯]।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জ্ঞানিসত্তম সম্বর্ত্ত পূর্ব্বে ঐরূপ বিচার করিয়াছিলেন এবং বিন্ধ্য শৈলে তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন[১]। তুমিও সেইরূপ বিচারদৃষ্টি (জ্ঞান) অবলম্বন করিয়া সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হও[২]। হে রাঘব! অতঃপর রাজর্ষি বীতহব্যের জ্ঞান বর্ণন করি, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[৩]।

পূর্ব্বকালে মহাতেজস্বী বীতহব্য সাংসারিক কার্য্য কলাপে বিরক্ত হইয়া সমাধি সাধনার্থ দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিলেন, অবশেষে কোন এক রমণীয় প্রদেশে কদলীপত্র দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন[৪।৭]। অনন্তর তিনি তন্মধ্যে আসন প্রস্তুত করতঃ তদুপরি মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিলেন, এবং তদুপরি তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মে বদ্ধ পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার করাঙ্গুলি সকল পদতল মূলে ন্যস্ত ও গ্রীবা উর্দ্ধীকৃত হইল[৮।৯]। ক্রমে তিনি নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। ক্রমে তাঁহার মন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার মনে চাঞ্চল্যরূপ পাপ তাপ তিরোহিত হইল এবং তাদৃশ নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ মনে তিনি তখন প্রথম মনশ্চাঞ্চল্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১১]।

অহো! মন কি অনিবার্য্য ও চঞ্চল! পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলেও মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আইসে না এবং যদি দৈবাৎ কখন আইসে ত তৎক্ষণাৎ আবার বিষয়ে গমন করে। অতএব, মন তরঙ্গস্থ বৃক্ষ পত্রের ন্যায় নিতান্ত অস্থিরস্বভাব[১২]। উদ্দাম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উহাঁর নিকট সর্ব্বদাই রূপাদি অর্পণ করিতেছে আর মনও তাহাতে বা তদ্দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে[১৩]। মন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে বটে; কিন্তু আবার তদনুরূপ বৃত্তি লাভের জন্য উন্মুখ বা ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি ইহাকে যাহা হইতে

নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করি, মন অধিক উন্মত্ত হইয়া সেই বিষয়েই ধাবমান হয়[১৪]। ঘট ছাড়িয়া পটে যায়, পট ছাড়িয়া শকটে যায়, তদ্দণ্ডে আবার শকট ছাড়িয়া অন্যত্র যায়। অতএব, মনঃ মর্কট সমান চঞ্চল। এই চক্ষুরাদি, যাহাদিগকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় বলি, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই মনের প্রবেশ নির্গমনের দ্বার[১৫।১৬]। অরে দশেন্দ্রিয়গণ! আমার কি সমাধি দ্বারা আত্মদর্শনের অবসর নাই? আমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও জ্ঞান অর্জ্জনের অবসর পাইব না? দেখিতেছি, তোরাও তরঙ্গ তুল্য চঞ্চল। অরে চপল! অনর্থজনক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর, অতীত দুঃখজাল সকল স্মরণ কর[১৭।১৮]। অরে অধমগণ! তোরা জড় ও জড় মনের অংশ। জড়ের আবার গর্ব্ব কি? আমি জানিয়াছি, জড় সকল মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা[১৯]। তোরা অসার, তোদের রূপ বা স্বরূপ মিথ্যা, সেজন্য তোরা আত্মজ্ঞানশূন্য। সেজন্য তোদের অপথ গমন অন্ধের অপথ গমনের সহিত সমান[২০]। ভগবান্ চিদাত্মা অহঙ্কারের সাক্ষী মাত্র, অর্থাৎ তিনি তাহাতে অলিপ্ত। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ! তোদের ব্যাকুলতা বা চাঞ্চল্য ব্যর্থ[২১]। অরে নয়নাদি ইন্দ্রিয়! তোদের প্রাগল্‌ভ্য রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা[২২]। যে সর্ব্বাবভাসক সাক্ষী চিদাত্মা তোমাদিগকে চিনিয়াছে তাহার সহিত তোমাদের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ নাই[২৩]। পথিক যেমন সর্প ভয়ে দূরে অবস্থান করে, ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডাল হইতে দূরে অবস্থান করে, চিন্ময় পরমাত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ হইতে দূরে অবস্থিত আছেন[২৪]। কার্য্যবান্ জীবের কার্য্যের প্রতি সূর্য্যদেব যেরূপ কারণ, ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপারের প্রতি চিদাত্মা সেইরূপ কারণ। অর্থাৎ নির্লিপ্ত নিমিত্ত কারণ মাত্র[২৫]। অরে চিত্ত! তুই চারণ, তুই চার্ব্বাক, তুই ভিক্ষুক, তোর বিচরণ কুক্কুরের বিচরণের ন্যায় ব্যর্থ। * তুই যে ভাবিস্ আমি চেতনাবান্ বা চিন্ময়, তাহা তোর ভ্রান্তি। তুই জড়, তোর সহিত চিতের (চিদাত্মার) সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নাই[২৬।২৭]। তুই যে "আমি জীবিত" এতদ্রূপ অহঙ্কার বহন করিস্ তাহাও দুর্ম্মতি

* আত্মাকে ছাড়িয়া বাহিরে বাহিরে বিচরণ করে বলিয়া চারণ। দেহকে আত্ম ভাবে জানে বলিয়া চার্ব্বাক। কেবল উদর পূরণের জন্য ভ্রমণ করে বলিয়া ভিক্ষুক। চিত্তের উদর পূরণ এ স্থলে বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ। কুক্কুরের ভ্রমণ উদর পূরণার্থ পরন্তু তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না।

ব্যতীত অন্য কিছু নহে[২৮]। তোর একাংশে অহংএর উদয় হয়, তাই তুই ভাবিস্ সেই আমি এই। পরন্তু তুই উক্ত ভাবনা পরিত্যাগ কর্। তুই কিছুই না[২৯]। চিদ্বস্তুই বস্তু, তাহা আদি অন্ত বর্জ্জিত। তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অরে অবোধ! তুই এই দেহে বৃথা চিত্ত নাম ধারণ (চিৎ সম্পর্কে নাম চিত্ত, অথচ চিতের সহিত সম্পর্ক নাই) করিতেছিস্[৩০]। তোমাতে যে কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব, তাহা প্রথমতঃ অমৃততুল্য বটে; পরন্তু তাহা পরিণামে বিষ[৩১]। অরে মূর্খ মন! তুই আর ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া উপহাস্য হোস্ না। তুই কর্ত্তাও না, ভোক্তাও না, কিছুই না। কেননা তুই জড়, অন্যের বোধ্য[৩২]। তুই ভোগের কে? ভোগ সমূহই বা তোর কে? তুই যখন জড়, তখন ভোগের সহিত তোর কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই[৩৩]। যাহা জড় তাহা নাই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তুই যে ভাবিস্—আমি প্রত্যক্ চেতন তাহা মিথ্যা। কেন না তোর স্থিতি বা অস্তিত্ব, সত্য মিথ্যা এই দ্বিবিধ প্রকারে ব্যবস্থিত। তন্মধ্যে সত্য পক্ষ পরমাত্মা কর্তৃক নির্ব্বাহিত; সে জন্য তাহা তোর স্বরূপ বলিয়া গণ্য নহে[৩৪,৩৫]। তুই যে মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বহন করিস্ আজ্ আমি তাহা প্রমার্জ্জন করিব। যে যুক্তিতে করিব তাহাও বলি, শ্রবণ কর[৩৬]।

তুই যে নিজে জড়, সে পক্ষে সংশয় নাই। জড়ের আবার কর্ত্তৃত্ব কি? প্রস্তর খণ্ডের আবার নৃত্য কি[৩৭]? যদি এমন ভাবিস্ যে কাষ্ঠও চেতনের সাহায্যে নৃত্য করে, তবে তুই চিরকাল তাহাই কর্। তুই বৃথা ভাবিস্—আমি জীবিত, আমি করি, আমি হনন কারী ইত্যাদি। যাহার সামর্থ্যে কৃত হয় তাহাকে লোকে কর্ত্তা বলে। দাত্র পুরুষের শক্তিতে ধান্য ছেদন করে, সেই জন্য পুরুষকে লোকে লাবক (ছেদক) বলে। সেইরূপ, ঈশ্বরাংশ চিদাভাসের সামর্থ্যেই সমস্ত কার্য্য কৃত হইতেছে। তাহাতে তোর্ এত অভিমান কেন[৩৮,৩৯]? খড়্গাও পুরুষের সামর্থ্যে হত করে। তাই পুরুষ হন্তা হয় এবং পান পাত্রও পুরুষের কর্ত্তৃত্বে পান কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাই পুরুষ পানকর্ত্তা হয়[৪০-৪১]। তুই প্রকৃত পক্ষে জড়, সুতরাং তোর যে কিছু বোধ, সে সমস্তই চেতনার অধীন। পরম পিতা পরমেশ্বর আত্মা তোকে অবিশ্রান্ত বোধ প্রদান করিতেছেন, তাই তুই বুঝিতেছিস্—আমিই বোদ্ধা[৪২,৪৩]।

বোধরূপিণী একমাত্র আত্মসত্তাই স্ফূর্ত্তি পায়। সেই স্ফূর্ত্তিকে তুই "আমার স্ফূর্ত্তি" এইরূপ অঙ্গীকার করিস্। অরে চিত্ত! তুই উক্ত প্রকারে অজ্ঞানের প্রভাবে "আত্মা" এই শব্দের বিষয় বা গোচর হইয়া আসিতেছিস্। সেই জন্য তুই আজ্ জ্ঞানের দ্বারা রৌদ্রে হিমপিণ্ডের ন্যায় বিগলিত হইতেছিস্[৪৪।৪৫]। অতএব, তুই মৃত, মূঢ় ও পরমার্থ পক্ষে নাস্তি। তুই যে আমি আমি করিস্ তাহা ব্যর্থ। তোর জন্মাদি ইন্দ্রজালসৃষ্ট লতার ন্যায় অসত্য। যাহা ব্রহ্মের বিজ্ঞান, তুই ও তোর দৃশ্য (জগৎ) তাহাই, তদতিরিক্ত নহে[৪৬।৪৭]। যেমন সমুদ্রের জল, কণা ফেন বুদ্বুদ ও তরঙ্গাদির আকারে প্রকাশ পায়, তেমনি, সেই ব্রাহ্মী শক্তি এই সুর অসুর নর ও জগতের আকারে প্রকাশ পাই-তেছে[৪৮]। যদিও তর্কের অনুরোধে তুই চিন্ময়ই হোস্, তাহা হইলেও ত তোর শোক দুঃখাদি থাকে না। (বীতহব্য আপন চিত্তকে উপদেশ করিতেছেন) কেননা, সে ভাবে তুই পরম পদের অব্যতিরিক্ত। যাহা পরম পদ তাহা সর্ব্বগামী সর্ব্বপদার্থাবগাহী ও সর্ব্বরূপ। সুতরাং তৎ-স্বরূপ হওয়ায় শোকাদি পৃথক্ ভাবের অভাব হইয়া যায়[৪৯।৫০]। সে ভাবেও তুই নাই, দেহাদিও নাই, কেবল ব্রহ্মই আছেন[৫১]।

তুই যদি আত্মাই হোস্ তাহা হইলে তুই সর্ব্বব্যাপী ও তোর অতি-রিক্ত নাই। আর যদি তুই জড় হোস্ তাহা হইলেও জড়ের স্বাধীন সত্তা না থাকায় তোরও স্বাধীন অস্তিতা নাই[৫২]। জগত্রয়ের সমস্তই আত্মা, তদতিরিক্ত কিছুই নাই। যদি তত্ত্ব বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা আত্মা[৫৩]। অরে চিত্ত! তুই যে আমি এই, তাহা আমার, সর্ব্বদা এইরূপ করিস্ তাহা ব্যর্থ। কেননা তুই নিজেই অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বশূন্য[৫৪]। যেমন আলোক ও অন্ধকার এই দুয়ের অধিক তৃতীয় নাই, তেমনি, চিৎ ও জড় এই দুয়ের অধিক তৃতীয় কল্পনা নাই[৫৫]। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে ভ্রমকল্পিত জড়ের জ্ঞান তিরোহিত হয় তখন কেবলমাত্র আত্মচেতনা প্রতিষ্ঠিত থাকে[৫৬]। অতএব রে মূঢ়! তোর কর্ত্তৃত্বও নাই, ভোক্তৃত্বও নাই। তোর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, তুই মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবান্ হ[৫৭]। উপদেশ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই তোকে আমি পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ বা গণনা করি, নচেৎ তুইও আমার অনধিক[৫৮]। (ভেদ অবলম্বন ব্যতীত উপদেশ করা যায়

না অর্থাৎ বুঝান যায় না। সেইজন্য তোকে পৃথক্ করিয়া লইয়া এই সকল কথা বলিতেছি)। যে করণ অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ক্রিয়াফলের সাধন (প্রধান উপকরণ) সে জড়, সে জন্য সে কর্ত্তা নহে। ছেদক না থাকিলে দাত্র কি কখন ধান্য ছেদনের কর্ত্তা হইতে পারে? প্রহারকারী না থাকিলে খড়্গ কি কখন কাহার মস্তক ছেদন করিতে পারে? ৩০।৩১। অতএব হে সখে! হে চিত্ত! তুমি কোনও কিছু কর না, বৃথা কেন দুঃখভাগী হও? পরের ক্লেশ আপনাতে আরোপ করিয়া ক্লিষ্ট হওয়া মূর্খতার কার্য্য[৩২]। সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা ক্লেশভাগী নহেন। কেননা, তিনিও কিছু করেন না। আমি করিলাম, এ বুদ্ধি কেবল বৃথা গর্ব্বসম্ভূত। তিনি যেমন অকর্ত্তা, তেমনি অভোক্তা। তিনি নিত্যতৃপ্ত; সে জন্য তিনি নিরিচ্ছ[৩৩।৩৪]। অকৃত্রিম ও সর্ব্বগত একই চিদাত্মায় এ সকল পরিপূর্ণ, কোন কিছু তাঁহার অতিরিক্ত নাই[৩৫]। এই সমুদায় জগৎ তাঁহাতে ও তাঁহারই কল্পিত, সে জন্য তিনি সর্ব্বাত্মা। যে সর্ব্বাত্মা, তাঁহার আবার ইচ্ছা কি? কিসের অভাব যে তিনি তাহা পাইবার ইচ্ছা করিবেন[৩৭]? যে তোর মত মূর্খ সেই মোহবশতঃ অপ্রাপ্ত বোধে পাইবার ইচ্ছা করে[৩৮]। অরে অবোধ! তুমি আত্মার সম্বন্ধ প্রাপ্তে কর্ত্তৃত্ব অভিমানী হইতেছ, পরন্তু আত্মা তোমার সম্বন্ধ প্রাপ্ত নহে। পুষ্পেরই সম্বন্ধ প্রাপ্তে ফল, কিন্তু পুষ্প ফলের সম্বন্ধ প্রাপ্ত নহে[৩৯]। সম্বন্ধ কথার অর্থ কি? সম্বন্ধ কথার অর্থ বা লক্ষণ এই যে, একের সহিত অপরের কোন এক প্রকারে মিলন হওয়া। সুতরাং তাহা দ্বিতীয়ঘটিত (দুই পদার্থ ব্যতীত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না)। যত দিন তাহা ছিল অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত দ্বৈত ছিল, তত দিন তদনুরূপ সম্বন্ধও ছিল। অধুনা তাহা নাই অর্থাৎ দ্বৈত নাই; সে জন্য সম্বন্ধও নাই[৭০]। সম্বন্ধের যাহা মুখ্য লক্ষণ তাহা বলা হইল। তু-ই তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত সম্বন্ধের অহেতু। অর্থাৎ বিসদৃশ বিধায় তোর সহিত আত্মার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। তুই এক প্রকার নহিস্, তোর কার্য্যও এক-বিধ নহে, এবং তোর্ সুখ দুঃখ দশাও একবিধ নহে[৭১]। সমানের সহিত সমানের এবং অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ। * কিন্তু নিতান্ত বিলক্ষণের (বিসদৃশের) সহিত সম্বন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয়

---

* সম্বন্ধ শব্দ এখানে তাদাত্ম্যবোধক। সমানে সমানে সম্বন্ধ—দুগ্ধের দুগ্ধের;

না[৭২]। বিরুদ্ধ গুণের দ্রব্য একত্রিত হয় মাত্র, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্ত পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়াতেও এক ভূতের গুণ অন্ত ভূতে অনুক্রান্ত হয়। অতএব, তুই জড় হইয়া কিরূপে সম্বিদের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবি[৭৩]? যদি তুই এমন ভাবিস্ যে আমি সমাধির দ্বারা সম্বিদ্‌তাদাত্ম্য লাভ করিব, সম্বিদে মিলিত হইব, তাহা হইলে আমি তোকে বলি, তুই অচিরাৎ তাহাই কর্। অর্থাৎ নিরন্তর একাগ্রতা অবলম্বনে আত্মদর্শনে তৎপর হ[৭৪]। তুই ইহা নিশ্চিত জানিস্ যে, সমাধির দ্বারা সঙ্কল্প নিরোধ ব্যতীত সঙ্কল্পাবস্থায় অণুমাত্রও সুখ নাই। সঙ্কল্পাবস্থা দুঃখের অবস্থা[৭৫]। * যেমন আকাশে পুষ্পের অসম্ভাবনা, সেইরূপ তোমাতেও কর্ত্তৃত্বের অসম্ভাবনা। তবে কি আত্মার কর্ত্তৃত্ব? তাহাও নহে। আত্মাও কোন কিছু করেন না। তিনিও নিষ্ক্রিয়। সুতরাং কর্ত্তৃত্বের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যেমন ফেণ বুদ্‌বুদাদির দ্বারা সমুদ্রের স্ফুরণ সেইরূপ কর্ত্তৃত্বাদি কল্পনার দ্বারা আত্মারই স্ফুরণ মাত্র[৭৬।৭৮]। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কথা এই যে, একাদ্বয় ব্যতীত পরমার্থরূপী দ্বিতীয় পদার্থ নাই। তবে যে ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকার ভেদব্যবহার ও শুভাশুভ ব্যবহার দৃষ্ট হয় সে সমস্তই আত্মদৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। অতএব, সম্বেদ্য রহিত সম্বিৎই সার এবং তাহাই আছে আর কিছু নাই[৭৯।৮১]। আমি এই, তিনি নাই, এ সকল রূপাদি বিহীন মহান্ আত্মায় আরোপিত। সত্যভূত নহে। আকাশে ঋগ্বেদের মানসী কল্পনা ব্যতীত সত্য সত্যই কি কেহ লিখিয়া রাখিতে পারে[৮২]?

হে চিত্ত! তুই আপনাকে যাহা ভাবিস্ তুই তাহা নহিস্। তুই সেই নির্ম্মল চিন্মাত্র[৮৩]।

সম্বন্ধ (মেলন) এবং অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের সম্বন্ধ—দুগ্ধের সহিত জলের সম্বন্ধ অর্থাৎ মেলন।

* সঙ্কল্প মাত্রেই সম্বিদের প্রচ্যুতি হয়। যেমন নির্ঝর জল চ্যুত হইলে শিলাখণ্ডে পড়ে ও শতধা বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ, সঙ্কল্পের উদ্রেক মাত্র সংবিদ্ পদার্থের স্খলন, ও ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা বহু প্রকারে বিভক্ত হইয়া যায়। সম্বিদের নানা ভাব হওয়ার অপর নাম দুঃখ এবং সম্বিদের একীভাবের নামই সুখ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।
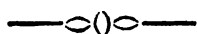
বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই মুনিবর পুনর্ব্বার নির্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনে ইন্দ্রিয় দিগকে প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলেন[১]। তাঁহার সেই সকল প্রবোধ বাক্য বলি, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। করিলে তুমিও নির্দ্দুঃখ পদ প্রাপ্ত হইবে[২]।

অহে ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা যে আপন আপন অস্তিতা বিশ্বাস করিতেছ সেই বিশ্বাসই তোমাদের দুঃখের কারণ। তাহাতেই তোমরা জীবিত কালে নানা দুঃখ ভোগ কর এবং মরণের পর নরকাদি দুর্গতি প্রাপ্ত হও। অতএব, তোমরা এখনই দুঃখদায়িনী আত্মসত্তা (আপনাদের বিদ্যমানতা জ্ঞান) পরিত্যাগ কর (আমরা নাই, আমরা ভোজ বাজীর ন্যায় মিথ্যা, এইরূপ অবধারণ কর)[৩]। আমি ভরসা করি, তোমরা যখন অজ্ঞানযোনি তখন আমার এই জ্ঞানোপদেশে তোমাদের অস্তিতা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে বা হইয়াছে[৪]। অরে চিত্ত! পক্ষীর পার্শ্বে অগ্নির ক্রীড়া পক্ষীকেই দগ্ধ করে। সেইরূপ তোমারও পার্শ্ববর্ত্তী তোমারই কল্পিত ইন্দ্রিয় গণের অস্তিতা তোমাকেই দগ্ধ করিতেছে[৫]। তোদের অস্তিতায় কত অনর্থ তাহা অবলোকন কর্। তোরা আছিস্ বলিয়াই শত শত প্রকারের সংসার নদী বহমানা হইতেছে[৬]। তোদেরই অহমিকায় (অহমিকা=অহঙ্কার) জয় পরাজয় পীড়নাদি বিবিধ প্রকারের দুঃখধারা আপতিত হইতেছে[৭]। তথা জীব সকল হৃদয়বিদারক সম্পদ বিপদ রূপ বিষূচিকায় আক্রান্ত হইতেছে[৮]। এই দেহ যেন এক একটী জীর্ণ বৃক্ষ। তোদেরই বিদ্যমানতায় এই সকল বৃক্ষে কাস ও শ্বাস রূপ ভৃঙ্গ শব্দ সহকারে আশ্রয় লইতেছে ও পুনঃ পুনঃ এই সকল বৃক্ষে জরা ও মরণ নামক পুষ্পাঙ্কুর জন্মিতেছে[৯]। তোরা আছিস্ বলিয়াই শরীর বৃক্ষে মনোরথ নামক সর্পবেষ্টিত কোটরে (হৃদয়ে) চিন্তা নাম্নী চঞ্চলা বানরী অথবা জাল রচনায় ব্যগ্র ঊর্ণনাভি কীট ভ্রমণ করিতেছে[১০]। লোভ নামক পক্ষী ইহাতে বাস করতঃ সুখ ও দুঃখ এতন্নামক চঞ্চুদ্বয় দ্বারা

ইহার সদ্‌গুণ সকল ছেদন করিতেছে (সদ্‌গুণ=ক্ষমা দয়া প্রভৃতি ধর্ম্ম)। অতি দুরাচার অপবিত্রস্বভাব ও ক্রূরতম কাম নামক কুক্কুট অত্রস্থ হৃদয়ভূমি উৎকীর্ণ করিতেছে[১১।১২]। অতি মহতী মোহরাত্রি প্রাপ্তে অত্যুল্বণ (উন্মত্ত) অজ্ঞান কৌশিক (কাল প্যাঁচা) অত্রস্থ হৃদ্‌বৃক্ষে আসিয়া শ্মশানে বেতালের ন্যায় নৃত্য করিতেছে[১৩]। হে চিত্ত! তুমি ও ইন্দ্রিয়গণ থাকাতেই অন্যান্য অনেক অশুভা পিশাচী ইহাতে আসিয়া নৃত্য করে এবং তুমি ও ইন্দ্রিয়গণ যদি না থাক ও না থাকে তাহা হইলে সমস্তই প্রভাত কালে পদ্মিনীর ন্যায় শুভময় ও শ্রীসম্পন্ন হয় [১৪।১৫]। মোহ কুজ্ঝটিকা থাকে না, হৃদয়াকাশ নির্ম্মল হয় ও জ্ঞানের আলোক প্রকট প্রাপ্ত হয়[১৬]। তখন ঝঞ্ঝাবাত সদৃশ বিকল্প সমূহের উৎপত্তি হয় না এবং পরম পাবনী করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি উল্লসিতা হইতে থাকে। যেমন হিমাগমে পদ্মবৃন্দ শোষ প্রাপ্ত হয় তেমনি চিন্তা তখন শোষপ্রাপ্ত হইতে থাকে[১৭।১৯]। অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানের ক্ষয়ে জ্ঞানের আলোক নিষ্প্রতিবন্ধকে রাজমান হইতে থাকে[২০]। যেমন ঝটিকা নিবৃত্তির পর সমুদ্রজল শান্ত ভাব ধারণ করে সেইরূপ চিন্তা নিবৃত্তির পরে হৃদয় প্রসন্ন ও স্থির গম্ভীর হয়। তখন আর কোন প্রকার সংক্ষোভ থাকে না[২১]। পুরুষ (আত্মা) তখন নিত্যানন্দময় ও পীযুষ পরিপূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অন্তঃশীতলতায় রাজমান হন[২২]। অজ্ঞানের অভাবে সম্বিদ্ তখন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং জগৎ তখন বাধিত অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে [২৩]। শরীর, আশা পাশ বিধায়ী (সৃজনকারী) ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গে সেরূপ আনন্দমন্থর হয় না, যেরূপ আনন্দমন্থর (আনন্দে পরিপূর্ণ) ইন্দ্রিয়গণের অসংসর্গে হয়। বর্ষাগমে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের অভিনব অঙ্কুরাদি জন্মিয়া থাকে। তাহার ন্যায় জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ সংসারী দিগেরও আরোগ্য তুষ্টি পুষ্টি ও শান্ত্যাদি গুণ জন্মিয়া থাকে[২৪।২৫]। অতঃপর তাহারা আর ভ্রমণ করে না, চিরকালই আত্মবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিতে থাকে। যে সকল গুণের কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য সদ্‌গুণ জন্মে[২৬]।

হে চিত্ত! তোমার থাকায় যাহা হয় এবং না থাকায় যাহা হয় তৎসমুদায় বলিলাম। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, কোন্ পথ শ্রেয়ঃ।

অহে সম্মানার্হ চিত্ত! আমার বিবেচনায় স্বাত্মভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ[২৭,২৮]। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি "আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই" ইহা অভ্যাস যোগে ভাবনা কর। যদি তুমি এমন ভাব যে চিৎশক্তি আমারই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ তাহা আমারই অভ্যন্তরে রহিয়াছে, এবং সেই চেতনা বা চিৎশক্তি সত্য; তাহা হইলে আমি তোমাকে অভাবগ্রস্ত হইতে বলি না। অর্থাৎ তুমি সেই চিৎশক্তিরূপে চিরকাল জীবিত থাক, কদাপি আমি তোমাকে মরিতে বলিব না। অতঃপর তুমি আশার প্রলোভনকে সুখ ভাবিও না। পূর্ব্বে তুমি ভ্রান্তির মহিমায় "আমি আছি" ভাবিতে, এখন বিচারে সে ভ্রম বিদূরিত হওয়ায় তুমি যৎস্বরূপ, তাহা বুঝিয়াছ। লোকে আলোকের অদর্শনে অন্ধকার দর্শন করে, তুমিও স্ববিচারের অভাবে আপনার বিদ্যমানতা দেখিতে ছিলে। এক্ষণে তুমি আর বিচারের উদয়ে সে অন্ধকার দেখিবে না অর্থাৎ আপনার অস্তিতা দর্শন করিবে না। হে সখে! এতকাল তুমি বিবেক পথে ছিলে না, তাই তুমি, আমি আমি করিয়া স্ফীত হইতে ও বালকের বেতাল দর্শনের ন্যায় আপনার অস্তিতা দর্শন করিতে এবং তাহাতেই তোমার সুখ দুঃখ মান অপমান প্রভৃতি ভোগ হইত। কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না; কেননা, এখন আর তোমার কোনরূপ সঙ্কল্প নাই। বিবেকের প্রসাদে তুমি এখন নিত্য নিরাময় ও স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থিত। ধন্য রে বিবেক! ধন্য তোমাকে, অদ্য তোমাকে আমার নমস্কার। হে চিত্ত! তুমি এখন নিজেও বুঝিতেছ এবং শাস্ত্রও তোমাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার যে ধর্ম্ম তাহা এক্ষণে প্রণষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ তুমি পূর্ব্বে যেরূপে স্থিত ছিলে সে রূপ মিথ্যাত্বে পরিণত হওয়ায় এখন তুমি পরমেশ্বর। তুমি এখন বাসনা নির্ম্মুক্ত, সুতরাং মহেশ্বর। নিয়ম এই যে, অবিবেক যাহাকে সৃজন করে বিবেক তাহাকে বিনাশ করে। যেমন আলোকের অভাব অন্ধকার সৃজন করে এবং আলোকের ভাব অন্ধকারকে বিনাশ করে। হে সাধো! হে চিত্ত! তুমি ইচ্ছা না করিলেও বিচারের দৃঢ়তা ও স্থায়িতা তামারই সুখের নিমিত্ত তোমার বিনাশ উপস্থিত করিতেছে। হে চিত্ত! এতকাল পরে আজ নির্ণীত হইল তুমি পৃথক্ ও সত্য বস্তু নহ[২৯,৩১]। হে ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর চিত্ত! তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে নমস্কার[৩২]। তুমি ত

পূর্ব্বেও ছিলে না, সম্প্রতিও নাই এবং ভবিষ্যতেও আর হইবে না। তোমার অনাস্থিতায় আমি এখন শান্ত ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত। আমি এখন আপনাতেই স্থিত ও তূর্য্য পদ প্রাপ্ত। চিত্ত নাই, চিত্ত নাই, চিত্ত নাই। কেবল আত্মাই আছেন, কেবল আত্মাই আছেন। আমি আত্মাই, আমা ছাড়া কোনও কিছু নাই[৩।৪৫]। সর্ব্বত্রই চিদাত্মা আমি বিরাজিত। এই আত্মা, এ কথাও এখন আর সম্ভবে না। কেননা, আমি "এই" শব্দের ব্যবচ্ছেদ্য নহি। "নাই" এ কথাও সম্ভবে না। কেননা, "নাই" শব্দের বিষয়ও নহি। আপন হৃদয়ের বেদ্য যে জড়াংশ অহং, আমি তাহারও প্রকাশক ও তাহারও অতীত[৪৬।৪৮]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতম সর্গ।

—○(*)○—
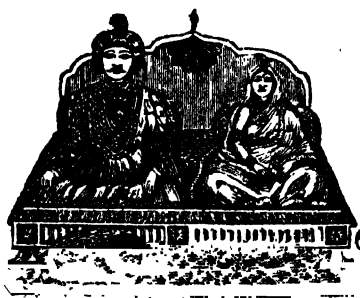
বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য অন্তরে ঐ প্রকার নিশ্চয় করিয়া সেই বিন্ধ্য গিরির গুহায় সমাধিস্থ হইলেন। ক্রমে তাঁহার মনোবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইল। তিনি এখন স্তিমিত সমুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তপ্ত শিলাস্থ জল যেমন অল্পে অল্পে অস্তগমন করে, দগ্ধাঙ্গারস্থ অগ্নি যেমন আপনা আপনি উপশম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তদীয় প্রাণ সমূহ অল্পে অল্পে উপশম প্রাপ্ত হইল[১।৩]। তদীয় নেত্রদ্বয় অত্যন্ত নিমীলিতও নহে, আবার উন্মীলিতও নহে, এরূপ অবস্থায় তদীয় নাসাগ্রভাগ লক্ষ্য করিতেছিল। সে শোভা অৰ্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভার অনুরূপ[৪।৫]। তাঁহার দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমান ও সমভাবে অবস্থিত ছিল। গিরিগুহাস্থ বর্ণিত প্রকারের তদীয় দেহ দেখিলে দর্শক গণের প্রস্তর খোদিত মূৰ্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিত[৬]। ঐ প্রকার অবস্থায় তিনি তিন শত বৎসর মুহূৰ্ত্ত কালের ন্যায় অতিবাহন করিলেন[৭]। ঐ কাল তিনি ঐরূপে অতিবাহন করিয়াছিলেন, অথচ শরীর পরিত্যাগ করেন নাই[৮]। তাঁহার মস্তকোপরি শত শত মেঘাস্ফোট ও সহস্র সহস্র বজ্র নিনাদ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বদেশে মৃগয়াকারী রাজা দিগের সৈন্য কোলাহল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কর্ণ বিবর সকাশে সিংহব্যাঘ্রাদি পশু ও ঘোর রব পক্ষী গর্জ্জন করিয়াছে। নির্ঝর পাতের ধ্বনি প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে, কত বার দাবানল উৎপন্ন হইয়া তদীয় সেই দেহ অবগাহন করিয়াছে, কত বর্ষা তাঁহার দেহ প্লাবিত করিয়াছে, কত গ্রীষ্ম ঋতু তদুপরি অত্যুষ্ণ রবিকিরণ বর্ষণ করিয়াছে, কিছুতেই তিনি প্রবুদ্ধ হন নাই। অনন্তর তিন শত বৎসর পরে তিনি আপনা আপনি প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন[৯।১১]। সহসা আপনা আপনি তাঁহার তাদৃশ দেহে সম্বিদের উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্তু সূক্ষ্মতা বশতঃ প্রাণবৃত্তি জন্মিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার জীবসম্বিদ্ (জীবচৈতন্য) ক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত ও মনোরূপে পরিণত হইয়াছিল। তদবস্থায় তিনি বৈষয়িক

পর্ব্বতের কানন প্রদেশে শত বর্ষ ব্যাপী মুনিত্ব, শত বর্ষ কাল বিদ্যাধরত্ব ও পাঁচ যুগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রত্ব অনুভব করিয়াছিলেন[১৮।২১]।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! মহাযোগী বীতহব্য যে প্রবুদ্ধ হইয়া মনোমধ্যে আপনার মুনিত্বাদি অবস্থা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কেন না তাঁহার প্রবোধের কাল অতি অল্প কিন্তু আপনি বলিলেন, ঐ সকল অনুভবের কাল বহু বর্ষ। (এক শত বর্ষ মুনিত্ব, এক শত বর্ষ বিদ্যাধরত্ব ও যুগপঞ্চক ইন্দ্রত্ব)[২২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিৎ শক্তি সর্ব্বাত্মিকা। সেই কারণে, যখন যে ভাবে ও যে স্থানে যে শক্তির উদ্রেক হয় তখন তিনি সেই স্থানে সেই ভাবেই পরিদৃষ্ট হন। চিতি শক্তি পরিচ্ছিন্না অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিনী নহে, ইত্যাকার জ্ঞান থাকিলে অল্প দেশ ও অল্প কাল স্থলে বিস্তৃত দেশের ও বহু কালের কল্পনা হইতে পারে না সত্য; কিন্তু সর্ব্বাত্মিকা রূপে বিদিত থাকিলে তাদৃশ কল্পনা উদয়ের বাধা কি? দেশ কাল অল্প বহু সমস্তই ত তিনি। অর্থাৎ দেশ কালাদি ও সে সকলের অল্পত্ব বহুত্ব সমস্তই বুদ্ধির দ্বারা অনুভূত হয়। বুদ্ধি যন্ময়া, অনুভূতিও তন্ময়া। সেজন্য প্রাগুক্ত কল্প অসম্ভব নহে। যে নিয়মে জীবগণ শয়ান হইবা মাত্র শত বর্ষ রাজত্বের শত বর্ষ অনাহারের ও ততোধিক বর্ষ ব্যাপী সাংসারিক কষ্টের স্বপ্ন সন্দর্শন করে সেই নিয়মেই বীতহব্য মুনি সমাধি ভঙ্গের পর অল্প কাল মধ্যে দীর্ঘ কাল ব্যাপী ঐ সকল ভোগের বিষয় অনুভব করিয়াছিলেন[২৩।২৪]। এমন ভাবিও না যে অনুভূয়মান ঐ সকল জন্মাদির দ্বারা তাঁহার মুক্তির অবরোধ হইয়াছিল। যেমন দগ্ধ বীজ বীজ নহে, তেমনি জ্ঞানদগ্ধ বাসনাও বাসনা নহে[২৫]। অতএব বীতহব্যের অনুভূয়মান ইন্দ্রত্বাদি বীতহব্যের মোক্ষ প্রতিবন্ধী নহে। যেমন কোন রাজার স্বপ্নদৃষ্ট দরিদ্রতা তাহার রাজত্বের নাশক নহে, সেইরূপ বীতহব্যের সেই সকল প্রতিভাস দর্শনও তদীয় জীবন্মুক্ততার নাশক নহে। কেবল ইন্দ্রত্বই যে তাঁহার অনুভবের পরিশেষ বা সমাপ্তি, তাহা নহে। তিনি এক কল্প ব্যাপিয়া চন্দ্রমৌলি শিবের গাণপত্য পদও অনুভব করিয়াছিলেন। যে যাহাতে সুদৃঢ় সংস্কারবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ তন্ময় হয় সে তাহা দেখিবেই দেখিবে। বীতহব্যেরও ঐ সকল পদ প্রাপ্তির উপযুক্ত সংস্কার

বা শুভাদৃষ্ট প্রারব্ধ অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইয়াছিল, তাই তিনি তৎ-প্রভাবে ঐ সকল ফল ক্ষণমধ্যে অনুভব করিয়া, সে সকল শুভ অদৃষ্টের ক্ষয় সাধনে বাধ্য হইয়াছিলেন[২৭,২৮]। *

রাম বলিলেন, তবে কি বীতহব্যের ন্যায় অন্যান্য জীবন্মুক্ত দিগেরও বন্ধন দর্শন (বন্ধন বিষয়ক জ্ঞান) হয়?[২৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন বস্ত্র খণ্ড দগ্ধ হইলেও কিছু ক্ষণ বস্ত্রাকারে অনুবৃত্ত থাকে, সূত্রদোলায়িত অঙ্গুরীয়কের সূত্র দগ্ধ হইলেও অঙ্গুরীয়ক এক ক্ষণ তাহাতে ঝুলিতে থাকে, জীবন্মুক্ত দিগের দেহাদি ও দৈহিক কার্য্যাদি প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেইরূপে অনুবৃত্ত হইতে থাকে তাহাতে তাঁহাদের জীবন্মুক্ততার বাধা হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদের জ্ঞান বদ্ধ জীবের জ্ঞানের সহিত সমান নহে। ইহা বন্ধন তাহা মোক্ষ তাঁহারা সেরূপ ভেদ জ্ঞান বৰ্জ্জিত। কেননা, তাঁহাদের জ্ঞান ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠা প্রাপ্ত। আরও বিশদ কথা এই যে, ব্রহ্মবিৎ জীবন্মুক্ত দিগের জন্ম কর্ম্মাদি সমস্ত প্রতিভাসই দগ্ধ বস্ত্রের অনুবৃত্তির ন্যায় নষ্টসংসারের অনুবৃত্তি মাত্র, সুতরাং সে সকল তাঁহাদের বন্ধন নহে। ঈশ্বর আমাদের এই জগৎ দেখিতেছেন, তাই বলিয়া তিনি কি ইহাতে বদ্ধ? যেমন অবদ্ধ অর্থাৎ সংসার দেখিলেও সংসার-মুক্ত, সেইরূপ জীবন্মুক্তেরাও নানা জগৎ দেখিলেও অবদ্ধ অর্থাৎ সে সকল হইতে বিমুক্ত[৩০]। অতএব, এ স্থলে তুমি ইহাই বিদিত হইবে যে, বীতহব্যের হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্য, অস্মদাদি সমুদায় জীবে সেই চৈতন্য। অস্মদাদির হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্য, বীতহব্যের হৃদয়ো-পলক্ষিত চৈতন্যও সেই চৈতন্য। প্রভেদ এই যে, অস্মদাদির বুদ্ধিতে তমোগুণের প্রচ্ছাদন থাকায় চৈতন্যেরও আবরণ ঘটনা হইয়া রহিয়াছে পরন্তু বীতহব্যাদি জীবন্মুক্ত দিগের বুদ্ধি রজস্তমঃশূন্য হওয়ায় চৈতন্যও নিরাবরণ হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদর্শী বা সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম বলা যায়[৩১,৩২]। অতএব, ইহা ব্যাখ্যা করা বাহুল্য যে, যে বীতহব্য পূর্ব্বে ইন্দ্র হইয়াছিল, সেই বীতহব্যই আজ্ দীন দেশের রাজা হইয়া মৃগয়া

---

* গঙ্গামরণ কাশীমরণাদি স্থলে ঐরূপ হয় অর্থাৎ ক্ষণকাল মধ্যে মনোবৃত্তির দ্বারা পুণ্য পাপের ভোগ হইয়া যায়, তৎপরে সে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। পাপ পুণ্যের ক্ষয় ব্যতীত মুক্তি হয় না।

বিহার করিতেছে। বীতহব্যের গাণপত্য কালে যে হংস কৈলাসে ক্রীড়া করিয়াছিল সেই হংস আজ্ কৈলাস পর্ব্বতে নিষাদ রাজ হইয়াছে। যে অতত্বজ্ঞ রাজা পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র দেশে রাজত্ব করিয়াছিল সেই আজ্ অন্ধ্র দেশে বাস করিতেছে[৩৩।৩৬]।

রাম বলিলেন, গুরো! আমি বুঝিলাম, বীতহব্যের ঐ সকল সৃষ্টি মানসী ভ্রান্তি। কিন্তু তাহাতে সচেতন ইন্দ্রাদি দেহ ও হংসাদি দেহ হইবার সম্ভাবনা কি[৩৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি বার বার বহু বার বলিয়াছি, সমুদায় জগৎ মনঃ কল্পিত; সুতরাং ভ্রান্তি বিশেষ। অতএব, যে প্রকারে বা যে প্রণালীতে এই প্রসিদ্ধ জগৎ চেতনাচেতনযুক্ত বলিয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে বীতহব্যের সেই সেই জগৎ সেই প্রকারে বা সেই প্রণালীতে প্রতিভাসিত হইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? যেমন এই প্রসিদ্ধ জগৎ মানস ও ভ্রমতুল্য, এবং পরমার্থে ইহা চিন্মাত্র, তেমনি বীতহব্যের দৃষ্ট জগৎও মানস ভ্রম তুল্য এবং পরমার্থে চিৎশক্তির অনতিরিক্ত[৩৮।৩৯]। রাম! এ জগৎ ও সে জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম বস্তু। কেননা, ব্রহ্মই এই সকলের ও সেই সকলের আকারে প্রকট প্রাপ্ত হন ও হইতেছেন। রজ্জু যেমন সর্পের প্রতিভাস প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই জগদাকারে প্রতিভাসিত হন্। অতএব, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যে কোন দৃশ্য সমস্তই সম্বিদ্ অন্য কিছু নহে[৪০।৪১]। কিন্তু যাবৎ না ব্রহ্মতত্ব বিদিত হওয়া যায় তাবৎ এ সকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় অবিচাল্য এবং বিদিত হইলে ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা। মনঃই অজ্ঞানের প্রভাবে সেই সেই মিথ্যা পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ করিতেছে[৪২।৪৩]। ফলতঃ, অবিকৃত চিদাকাশ স্বাশ্রিত স্বনিষ্ঠ মায়া শক্তির উদ্রেকে আপনাকে চেতন বা চেতয়িতা কল্পনা করতঃ চিত্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং পশ্চাৎ মনন শক্তির আবির্ভাবে মনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার বিচিত্র বিবিধাকার জগৎ দেখিতে থাকে সুতরাং পরমার্থ পক্ষে সেই জগৎ চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৪]।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

—○()*()○—

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! বীতহব্য যে প্রকারে বিদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বীতহব্য সমাধির দ্বারা আপনাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাকার ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। একদা চিদাত্মা ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শিবপার্ষদ হওয়ার ঘটনা স্মৃতিপথারূঢ় হয়। তৎকারণে তাঁহার পূর্ব্বজন্মাবলি জানিবার ইচ্ছা জন্মে[২।৩]। ইচ্ছা মাত্রেই তিনি সমুদায় পূর্ব্বদেহ ও তত্তৎ দেহের ঘটনা সমস্তই জানিতে পারেন। তন্মধ্যে বীতহব্য দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিয়া তদ্দেহ পরিত্যাগের ইচ্ছা করেন। তিনি দেখিলেন, বীতহব্য দেহ পঙ্কে কীটের ন্যায় ধরা কোটরে পড়িয়া রহিয়াছে। সে দেহ বর্ষার জলে ক্লিন্ন, ধূলিকর্দ্দমাদিতে প্রলিপ্ত, লতাজালে জড়িত ও সমাচ্ছন্ন ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মগ্ন[৪।৭]। আরও দেখিলেন, তদ্দেহে আর প্রাণের সঞ্চার নাই। রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক, গতি শক্তি বর্জ্জিত, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। দেখিয়া ভাবিলেন, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? এক বার ভাবিলেন, আমি এখন পরকায় প্রবেশন নামক যোগ অবলম্বনে সূর্য্যদেহে প্রবেশ করি। করিলে পিঙ্গলনামক সূর্য্যানুচরগণ (পিঙ্গল একটী নাম, তিনি সূর্য্যের অনুচর) ইহার উদ্ধার করিবে। অর্থাৎ ইহাকে শক্তিসম্পন্ন করিবে। আবার ভাবিলেন, প্রয়োজন নাই। দেহে প্রয়োজন কি? আমি এখন বিদেহ হই। পুনর্ব্বার ভাবিলেন, এখন আমার পক্ষে দেহের ত্যাগ ও গ্রহণ দু-ই সমান[৮।১২]। যত দিন না ইহা মৃত্তিকায় পরিণত হয় তত দিন ইহা থাকে থাকুক। মহানুভাব বীতহব্য এইরূপ চিন্তার পর স্থির করিলেন, সূর্য্যানুচর পিঙ্গলের দ্বারা এতৎ শরীর উদ্ধৃত করিয়া কিছু কাল ইহাতে বিহার করা যাউক। মুনিবর বীতহব্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে প্রবেশ করে, বায়ু যেমন ভস্ত্রাকাশ আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় বীতহব্যের সূক্ষ্ম দেহ ভগবান্ আদিত্য দেবের হৃদয়

আশ্রয় করিল। ভগবান্ আদিত্য স্বহৃদয় প্রবিষ্ট বীতহব্য জীবের কার্য্য ও অভিপ্রায় বিদিত হইয়া স্বীয় অনুচর দিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা যাও, মুনিবর বীতহব্যের দেহ বিন্ধ্য পৃষ্ঠে তৃণলতাদি সমাচ্ছন্ন হইয়া নিপতিত আছে তোমরা তথায় গমন করতঃ তদ্দেহের উদ্ধার কর। অনন্তর সূর্য্যহৃদয়াবিষ্ট বীতহব্য সংবিদ্ আদিত্যদেবের অনুজ্ঞায় পিঙ্গল গিয়া আবিষ্ট হইল এবং পিঙ্গল যথোক্ত স্থানে গিয়া যথোক্ত দেহ সন্দর্শন করিল ও মৃত্তিকামগ্ন বীতহব্যের দেহের উদ্ধার করিল। সারস যেমন পঙ্ক হইতে মৃণাল উত্থাপিত করে তাহার ন্যায় পিঙ্গল বীতহব্য দেহের উদ্ধার সাধন করিলেন। তখন বীতহব্যের সূক্ষ্ম শরীর পক্ষী যেমন কুলায়ে প্রবেশ করে তাহার ন্যায় সেই সমুত্থিত শরীরে প্রবিষ্ট হইল। বীতহব্য তখন মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া নিকটস্থ পিঙ্গলকে নমস্কারাদি করিলেন[১৩।২২]। অনন্তর সূর্য্যানুচর পিঙ্গল যথাগত স্থানে গমন করিলে বীতহব্য তন্নিকটস্থ এক সরোবরে গমন করতঃ স্নানাদি কার্য্য করিলেন। পরে দ্বিজদেহোচিত পূজাদি কার্য্য সমাধা করিয়া সে দিন সেই স্থানেই অতিবাহন করিলেন[২৩।২৮]।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য সমাধি পরিত্যাগের পর শরীর গ্রহণ করতঃ এক দিন মাত্র শারীরিক কার্য্যাদি করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিবসে পুনর্ব্বার সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছায় কোন এক পূর্ব্ব পরিচিত বিন্ধ্যগুহায় প্রবেশ করিলেন[১]। এই দৃশ্য প্রপঞ্চের সার কি অসার কি তাহা যিনি জানিয়াছেন সেই বীতহব্য মুনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন উভয়কেই পরিহার করিয়া আত্মানুসন্ধানতৎপর হইলেন[২]। ভাবিলেন, আমি পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয় দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি (ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ কথার অর্থ—ইন্দ্রিয়াভিমান পরিত্যাগ), এক্ষণে দেখিব, অস্তি নাস্তি কল্পনা (আছে ও নাই এই দুই কল্পনা) পরিত্যাগ করিলে কি থাকে। আমি বাহিরে পুনর্ব্বার বদ্ধ পদ্মাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় অটল অচল থাকিব এবং অন্তরে একাদ্বয় চিন্মাত্র হইয়া থাকিব। যোগিগণ যে অবস্থাকে প্রবুদ্ধ হইলেও সুষুপ্ত এবং সুষুপ্ত হইলেও প্রবুদ্ধ ও তুর্য্যাবলম্বন বলিয়া বর্ণনা করেন, আমি সেই অবস্থায় নির্জ্জন প্রদেশে স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিব[৩।৭]। মুনিবর বীতহব্য ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, এবং ছয় দিন পরে পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইলেন। মহাতপস্বী ভগবান্ বীতহব্য বর্ণিত প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় দীর্ঘকাল ছিলেন। তিনি কোনও কিছুর অভিনন্দন বা নিন্দা করিতেন না এবং শোক হর্ষ উদ্বেগের বশ্য হইতেন না[৮।১০]। শয়ন ভোজন গমনাগমন, সকল সময়েই তাঁহার হৃদয়স্থ চিত্তের সহিত নিম্নলিখিত কথা বার্ত্তা হইত[১১]।

অহে.. ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর মন! তুমি এখন শান্ত হইয়াছ, তাই বলিতেছি, এখন দেখ, কি অদ্ভুত ও কেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ আনন্দ। অতঃপর ইহা তোমার অপরিত্যাজ্য[১২।১৩]। অরে ইন্দ্রিয়চোর! অরে দুরাশাবৃন্দ! তোদের কেহই নাই এবং আমার অনুভূয়মান আত্মা তোদের কেহই নহে। তোরা এখন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিস্। আর

তোদের আক্রম সামর্থ্য নাই[১০।১৪]। পূর্ব্বে যে তোদের অভিমান ছিল, আমরাই আত্মা, তত্ত্ববিস্মরণ জনিত সে অভিমান এখন কোথায়? যেমন রজ্জু দর্শনে ভুজঙ্গের বিলয় হয়, সেইরূপ আত্মদর্শনে তোদের বিলয় হইয়াছে[১৬]। যত দিন অবিচারিত ছিলাম তত দিন অনাত্মায় আত্মভ্রান্তি ও বস্তুতে অবস্তু দর্শন ছিল, এক্ষণে বিচারে সে সকল তিরোহিত হইয়াছে[১৭]। বিচার দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, তোমরা আমরা, ব্রহ্ম, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, এ সকলের কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই এবং কাহার দোষ অথবা গুণ নাই। তক্ষা প্রভৃতি যে বন হইতে কাষ্ঠভারাদি আহরণ করে তাহা তাহারা নিজেরই উদর পোষণার্থ করে পরন্তু তাহাতেই এক জনের গৃহ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণও স্ব স্ব সামর্থ্যে স্ব স্ব প্রয়োজন বা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে পরন্তু তদ্দ্বারা কাকতালীয় ন্যায়ে অর্থাৎ আপনা আপনি ভোগাদি ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং তাহাতে কাহার কোন রূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই[১৮।২১]। আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ অবিদ্যা এখন দূরে পলায়ন করিয়াছে, স্মৃতি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এখন পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা সৎ তাহা সৎ-ই হইয়াছে এবং যাহা অসৎ তাহা অসৎ-ই হইয়াছে (অর্থাৎ এখন আর বিপর্য্যয় প্রতীতি নাই)[২২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! ভগবান্ বীতহব্য উক্ত প্রকার বিচার পরায়ণ হইয়া বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সেই শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা ছিল না, মূঢ়তা ছিল না, এবং কদাচিৎ ভ্রান্তি হইলেও তাহা স্থায়ী হইত না। ধ্যানই তাঁহার সার্ব্বকালিক অবলম্বন ছিল[২৩।২৪]। ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, ইহা গ্রহণ করিব, তাহা বর্জ্জন করিব, এ সকলের কিছুই ছিল না অর্থাৎ সেরূপ দৃষ্টি ছিল না এবং তাঁহার মন ইচ্ছা অনিচ্ছা উভয়াতীত হইয়া ছিল[২৬]। উক্ত প্রকারে তাঁহার জন্মের কারণীভূত কর্ম্ম বৃন্দের শেষ বা সমাপ্তি হইলে তাঁহার মন সংসারাতীত ব্রহ্মরসে তন্ময় হইবার জন্য উন্মুক্ত হইল[২৭]। তখন তিনি সহ্য গিরির কোন এক মনোরম গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধ পদ্মাসনে উপবেশন করতঃ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন। অহে রাগ! তোমরা এখন নীরাগ হও। অহে দ্বেষ! তুমিও নির্দ্বেষ হও। অনেক কাল আমি তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি। অহে ভোগ সকল! তোমাদিগকে নম-

স্কার। আমি কোটি কোটি জন্ম তোমাদিগকে পোষণ করিয়া আসিয়াছি[২৮]।[৩১] অহে বিষয় সুখ! তোমাকেও নমস্কার। পূর্ব্বে তুমি আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছিলে। অহে দুঃখ! আজ্ তুমি আমার উপদেষ্টা গুরু। কেননা, তোমা কর্তৃক উত্তপ্ত হইয়াই আমি আজ্ যত্নপূর্ব্বক আত্মান্বেষণতৎপর হইয়াছি এবং তোমারই দ্বারা আজ্ আমি সুশীতল পদ প্রাপ্ত হইব[৩২]।[৩৩]। অহে দুঃখনামক দুঃখাবসান ও সুখদাতা আত্মন্! তোমার কল্যাণ হউক। তুমিও আমার পরম মিত্র; সে জন্য তোমাকেও নমস্কার[৩৪]। হে দেহ! তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং তোমাকে ছাড়িয়া থাকাই আমার সনাতন স্বভাব; সেই স্বভাব আমি আজ্ পুনঃ প্রাপ্ত হইব, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। প্রাণী দিগের প্রয়োজন বুদ্ধির গতি অর্থাৎ রীতি এই যে তাহারা প্রয়োজন অনুসারে অত্যন্ত বন্ধু দিগকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়[৩৫]। যে আমি শত শত জন্ম দেহ ধারণ করিয়াছি, সেই আমি আজ্ তাদৃশ দেহকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। অহে চিরবান্ধব দেহ! তুমি চির বান্ধব হইলেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব[৩৬]। এই পরিত্যাগে আমি নিরপরাধী; তুমি আপনিই আপনার নাশ সজ্ঘটন করিয়াছ। কেননা তোমাতেই আমার স্বাত্মবিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে[৩৭]। অহে দেহ! তোমাকে কেহ ভগ্ন করিতেছে না বা করিবেও না, তুমি মদ্বিয়োগে একাকী হইবে, হইয়া আপনিই আপনাতে শুষ্ক হইবে[৩৮]। হে মাতঃ! তৃষ্ণে! তুমিও দুঃখ করিও না, আমি আপন পদে গমন করি। অহে কাম! আমি তোমাকে জয় করিব বলিয়া তোমার বৈপরীত্যে বৈরাগ্যাদির সেবা করিয়াছি, সে অপরাধ তুমি ক্ষমা করিবে[৩৯]। অহে দোষ সকল! (দোষ=প্রবৃত্তি বা ধর্ম্মাধর্ম্ম) আজ্ আমি তোমাদের আত্যন্তিক উপশম ভজনা করিব। হে মাতঃ! তৃষ্ণে! আমাদের উভয়ের আজ্কার এই বিচ্ছেদ নিত্যকালের নিমিত্ত। মা! ইহাতে আমার দোষ নাই, তুমি যোগের দোষেই বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছ। (প্রসিদ্ধিই আছে, সংযোগা বিপ্রয়োগান্তাঃ, বিয়োগই সংযোগের শেষ প্রান্ত।) অহে সংযোগদোষদুষ্ট বিয়োগ! তোমাকেও আমার শেষ প্রণাম। অহে সুকৃত দেব! তোমাকেও আমার নমস্কার। কেননা তুমিও আমাকে শত শত বার নরক হইতে উদ্ধৃত ও স্বর্গে

সংযোজিত করিয়াছ। কুকার্য্যরূপ ক্ষেত্রে যাহার উৎপত্তি, নরক যাহার স্কন্ধ (গুঁড়ি), যাতনা যাহার পুষ্প, সেই দুস্কৃত নামক বৃক্ষকেও আমার নমস্কার। এই বৃক্ষের তেজে আমি বহু বার বহু প্রাকৃত যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেই মোহময় অদৃশ্য অলক্ষ্মী আমার অবশ্য নমস্যা। অহে তপস্বিনী গিরিগুহা! তুমি আমার সমাধি কালের বয়স্যা (উত্তরসাধিকা)। তোমাকেও আমার নমস্কার। সুশ্রাব্য বংশনিস্বন (বংশ=বাঁশগাছ। নিস্বন=শব্দ) তোমার প্রিয় বাক্য এবং শীর্ণ পত্রাদি তোমার পরিধেয় বস্ত্র। বহু কাল পর্য্যন্ত তুমি আমার প্রিয় বয়স্যা ছিলে এবং বহু বার তুমি আমার সমাধি বিঘ্ন নিবারণ করিয়াছ[৪০।৪৬]।

অহে দণ্ড কাষ্ঠ (যষ্টি)! তুমিও আমার পরম সখা ছিলে। আমি ক্লেশ নিবারণার্থ তোমাকে অবলম্বন করিয়াছিলাম, তুমিও অনেক বার আমাকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছ। সর্প কুক্কুরাদির ভয় নিবারণ করিয়াছ, গর্ত্ত পতন কালে, গমন বিঘ্ন কারক লতাকুঞ্জাদি ও উচ্চ নীচ প্রদেশে ভ্রমণ কালে, তুমি আমার হস্তাবলম্বন ছিলে। বিশেষতঃ তুমি বৃদ্ধকালের অদ্বিতীয় সুহৃদ্। এই সকল কারণে তুমিও আমার নমস্য।

অহে দেহ! তুমি এখন আপন প্রকৃতিতে গমন কর। যে জল তোমার মল দৌর্গন্ধ্য ও স্বেদ অপনয়ন করিয়া আসিয়াছে, আমি আজ্ সেই জলকেও অর্থাৎ স্নানব্যবহারকেও নমস্কার করি। ভোজন, শয়ন, অভ্যঞ্জন, অলঙ্কার ধারণ প্রভৃতি তদীয় উপকরণ সমূহকেও আমার নমস্কার। অহে প্রাণ সকল! তোমরা আমার সহজাত সুহৃদ্ ছিলে। আজ্ আমি তোমাদিগকেও নমস্কার করিতেছি। তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সুখে থাক, আমি চলিলাম। আমি তোদের সহিত কত বিচিত্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি, কত বার গিরি কুঞ্জে বিশ্রাম করিয়াছি, লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়াছি, পুরনগরাদিতে ক্রীড়া করিয়াছি; পর্ব্বতোপরি লুঠিত হইয়াছি, বিবিধ কার্য্যে বিলাস করিয়াছি ও বিবিধ পথে প্রস্থিত হইয়াছি। এই জগৎকোষে এমন কিছু নাই যাহা তোমরা আমার সহিত এক যোগে না করিয়াছ! এখন তোমরা যথাগত স্থানে (অর্থাৎ আপন আপন প্রকৃতিতে) গমন কর, আমিও স্বপদে গমন করি[৪৭।৫৪]। সংসারবর্ত্মের নিয়ম এই যে, উপচয়ের শেষে অপচয়, বৃদ্ধির পরে ক্ষয়, উন্নতির চরমে পতন, সংযোগের শেষে

বিয়োগ হইবেই হইবে[৩]। এই যে চাক্ষুষ জ্যোতিঃ ইহা আদিত্য মণ্ডলে যাউক, এই যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ইহা পৃথিবীতে যাউক, এই যে প্রাণবায়ু, ইহা বায়ুতত্ত্বে গমন করুক, এই যে শ্রবণেন্দ্রিয় ইহা আকাশে মিলিত হউক, এই যে রসনেন্দ্রিয়, ইহা চন্দ্রমণ্ডলে যাউক, আমি এখন সূর্য্যশূন্য দিবসের, নির্ম্মন্দর সমুদ্রের, মেঘশূন্য আকাশের এবং মহা-প্রলয়ে জগৎ প্রপঞ্চের ন্যায় হইয়া থাকিব। আমি ওঁ এই উচ্চারণ যেমন উপশান্ত হয় সেইরূপ আমি আজ্ আপনা আপনি দগ্ধ কাষ্ঠ বহ্নির ও তৈল শূন্য দীপের ন্যায় উপশান্ত হইব[৩৬৩]।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরম মতিমান্ বীতহব্য নির্ব্বাণ পদ লাভের অধিকার প্রাপ্তে ওঁ এই শব্দ তার স্বরে উচ্চারণ করতঃ মনোবৃত্তির উপশমে ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, ওঁ এই শব্দ ব্রহ্ম ধ্যানের প্রতীক অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন। তাহার অ উ ম ঁ এই চার মাত্রা বা বিভাগ। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগের লক্ষ্য স্থূল প্রপঞ্চ, দ্বিতীয় বিভাগের লক্ষ্য সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ, তৃতীয় বিভাগের লক্ষ্য মূল কারণ, চতুর্থ বিভাগের লক্ষ্য তুরীয় অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমূহের অতীত বা উর্দ্ধ-বর্ত্তী ব্রহ্ম। তথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন্ কাল ও কালকল্পনার অতীত বা উর্দ্ধে ব্রহ্ম। এবং বিরাট্ হিরণ্য গর্ভ ঈশ্বর এই তিন্ ও উক্ত তিনের উর্দ্ধ বা অতীত ব্রহ্মও উক্ত বিভাগ চতুষ্টয়ের লক্ষ্য। যে ক্রমে এই তুরীয় ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি শৃঙ্খলায় দৃষ্ট বা প্রতীত হইতে থাকেন সেই ক্রমের নাম অধ্যারোপ এবং তাহার বিপরীত ক্রমের অর্থাৎ প্রলয় ক্রমের নাম অপবাদ। যতিবর বীতহব্য শ্রুত্যুক্ত তাদৃশ মহিমান্বিত প্রণবের উচ্চারণ সহকারে বিদ্যুৎ যোগে অধ্যারোপ ক্রম সন্দর্শন করিয়া. অপবাদ ক্রমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরবর্ত্তী স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমুদায় ত্রৈলোক্য ভাগ বিলয় করিয়া নিম্ন লিখিত প্রকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উচ্চারিত প্রণব ধ্বনি শেষ বা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই * তদীয় ত্রৈলোক্য ভাগ লয় প্রাপ্ত হওয়ায় স্বরূপ ভাগ যেরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল তাহা কথঞ্চিৎ উপমা দ্বারা বর্ণন. করি, তদবলম্বনে তাহা বুঝিয়া লও।১। চাঞ্চল্য রহিত মন, কলা পরিপূর্ণ চন্দ্র, মন্থন বিরত মন্দরাচল, কুম্ভকারের রুদ্ধগতি চক্র, স্তিমিত নির্ম্মল অসীম সমুদ্র, তেজঃ সম্পর্ক শূন্য তমঃ, চন্দ্রার্কতারকাবর্জ্জিত আকাশ, নির্ধূম বহ্নি ও নির্ম্মেঘ আকাশ দেখিতে যেরূপ, প্রণব উচ্চারণ সমাপ্তির পর

---

* সংক্ষেপ তাৎপর্য্য কথা এই যে, খুব উচ্চস্বরে ও প্রাণপণ চেষ্টায় লম্বা করিয়া মুখে প্রণব উচ্চারণ ও অন্তরে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়া তৎপরে প্রাণ ধ্বংশ করা। বাহ্য জ্ঞান লোপ ও প্রাণ ধ্বংশ প্রণব উচ্চারণের সমাপ্তিতে হইয়া থাকে।

বীতহব্য দেখিতে সেইরূপ হইলেন[৮]।[৯]। প্রণব ধ্বনির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা তদীয় ইন্দ্রিয়গণ বিচ্ছিন্ন হইলে তখন সাক্ষিচৈতন্যমাত্রের প্রকাশ্য তমো মাত্র তদীয় অন্তরাকাশে অবস্থিত রহিল বটে; পরন্তু নিমেষার্দ্ধ কাল পরে তাহাও থাকিল না, বিলীন হইয়া গেল। উক্ত না প্রকাশ না অন্ধকার অবস্থাও থাকিল না, নিমেষ মধ্যে তাহারও পরিবর্ত্তন হইল। ঐরূপ পরিবর্ত্তনকে যোগিগণ চিত্তের চেত্য দশা পরিত্যাগ ও অবিদ্যা নাশ বলিয়া থাকেন। ঐ সকল নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সমান বলিয়া সৌষুপ্ত পদ নামে উক্ত হয়। বীতহব্য তাদৃশ সৌষুপ্ত পদে কিছু কাল অবস্থান করিবার পরেই তুরীয় পদে প্রবেশ করিলেন। যদ্যপি উক্ত তুরীয় পদ বাক্যের অবর্ণনীয় ও মনের অতীত, তথাপি, তদ্বোধার্থ এই-রূপ বলা যায় বা উপদেশ করা যায়[৭]।[১৪]। বিষয়ানন্দ শূন্য হইলেও সে পদ সানন্দ অর্থাৎ সে আনন্দ নিজেরই স্বরূপান্তর্গত। তথা পদা-র্থান্তরের সত্তা বা অস্তিতা বর্জ্জিত স্ব সত্তা মাত্রের স্ফুরণ। তথা চেত্য না থাকায় সে পদ অচিন্ময় এবং স্বতঃ চিৎ বলিয়া চিন্ময়। উক্ত পদ বাক্‌পথের অতীত; সেইজন্য শ্রুতি ঐ পদকে "তাহা নহে তাহা নহে" এবম্প্রকার নিষেধ পথ অবলম্বনে বুঝাইবার চেষ্টা করেন[১৫]।[১৬]।

বীতহব্য অভিহিত প্রকারের পরম পবিত্র পদ প্রাপ্তে সর্ব্ব পদার্থের অতীত অথচ সর্ব্ব পদার্থের আত্মা হইলেন। বলিতে কি, যাহা শূন্য বাদীর শূন্য, ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান, সাঙ্খ্যের পুরুষ, যোগীর ঈশ্বর, শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কাল বাদীর কাল, আত্মবাদীর আত্মা, মাধ্যমিক দিগের নৈরাত্ম্য, তিনি তাহাই হইলেন [১৭]।[২০]। যাহা সমুদায় শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত, যাহা জীবের হৃদয়বাসী আত্মা, যাহাকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলা যায়, তিনি তাহাই হইলেন [২১]। যাহা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়, আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ ও কূটস্থ, তেজেরও ভাসক অর্থাৎ প্রকাশক, স্বানুভূতি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি তাহাই হই-লেন[২২]। যাহা একও বটে, অনেকও বটে, সাঞ্জনও বটে নিরঞ্জনও বটে, এবং সর্ব্ব বটে ও অসর্ব্বও বটে, তিনি তাহাই হইলেন[২৩]।

বীতহব্য অভিহিত প্রকারে স্বরূপে স্থিতি লাভ করতঃ মুক্ত দিগের দৃষ্টিতে অজর অমর অনাদি অনন্ত এক ও মলবর্জ্জিত হইলেন ও বদ্ধ জীবের দৃষ্টিতে ঈশ্বর হইয়া রহিলেন[২৪]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

-○()○()○-

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর বীতহব্য কথিত প্রকার উপশম লাভে সংসারের সীমান্ত ও দুঃখ সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সমুদ্রোত্থিত জলকণার সমুদ্র প্রাপ্তির ন্যায় স্বীয় পদ প্রাপ্ত ও যার পর নাই উৎকৃষ্ট নির্ব্বৃত্তি লাভ করিলে পর তাঁহার সেই দেহ অল্প কাল সেইরূপ নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থাতেই ছিল, পরন্তু হিম সমাগমে পদ্মের শোষ প্রাপ্তির ন্যায় দিন দিন পরিশুষ্ক ম্লান ও বিশীর্ণ হইতে লাগিল[১।৩]। তাঁহার সেই দেহবৃক্ষের মধ্যে যে প্রাণ পাখী বাস করিত, সে পক্ষী প্রথমে সর্ব্বাবয়ব ত্যাগ করিয়া নাড়ী স্থানে, নাড়ী স্থান ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ডে, হৃৎপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে, এইরূপ সার্ব্বজনীন ক্রমে বহিরাগত হয় নাই, পরন্তু সর্ব্বাঙ্গ পরিত্যাগের পর হৃদয়ে আগমন করতঃ হৃদয়েই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ত্বদীয় ভূত প্রকৃতি অর্থাৎ দৈহিক উপাদান ক্ষিতি তেজঃ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বীজ—যে সকল বীজে পুনর্ব্বার দেহাঙ্কুর জন্মিত সেই সকল বীজ মূল ভূত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইল, এবং মাংসাস্থিময় দেহ যন্ত্রটী কাষ্ঠাদির ন্যায় পৃথিবীতলেই পতিত রহিল [৪।৫]। রাম! দর্পণ প্রতিবিম্বিত মুখ দর্পণাপগমে বিম্বভূত মুখে পর্য্যবসিত হওয়ার ন্যায় তদীয় জীব চৈতন্য উক্ত প্রকারে ব্রহ্ম চৈতন্যে পর্য্যবসিত ও তদীয় দেহস্থ ধাতু সকল স্ব স্ব প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আমি তোমার নিকট শত শত বিচারের ফল স্বরূপ বীতহব্যের বিশ্রান্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম, তুমি প্রজ্ঞা অবলম্বন উক্ত কথার তত্ত্ব বা রহস্য বিচার দ্বারা অনুভব কর[৬।৮]। এরূপ বিচার্য্যবিধ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, অদ্যও বলিলাম এবং ভবিষ্যতেও বলিব[৯]। আমি ত্রিকালদর্শী ও দীর্ঘজীবী; তাই আমি ঐ সমস্ত বিদিত আছি[১০]। হে মহামতি রাম! তুমিও ঐরূপ দৃষ্টি বিচার অবলম্বন করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন কর। কেননা জ্ঞানই মুক্তির কারণ[১১]। জীব সকল জ্ঞানের দ্বারা নির্দ্দুঃখ হয়, জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক এবং জ্ঞান দ্বারাই উৎসিদ্ধি লাভ

হইয়া থাকে[১২]। মুনীশ্বর বীতহব্য জ্ঞানের দ্বারা আশা পাশ ছেদন করিয়াছিলেন এবং চিত্তরূপ বৃহৎ পর্ব্বতকেও বিশীর্ণ করিয়াছিলেন। অপিচ, মনঃই জগৎ, জগৎ তাহা হইতে ভিন্ন নহে[১৩।১৫]।

হে রাঘব! সেই বিবেকী বীতহব্য উক্ত প্রকারে রাগাদি দোষ শূন্য, পরম জ্ঞানী, মন আদি-উপাধি নির্ম্মুক্ত ও দীর্ঘ কাল আপন অন্তরে আপনার অনারোপিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শান্ত লোকে অনন্ত অমল পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৬]। (শান্তলোকে সপ্তম ভূমিকায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ অবস্থায়)

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোননবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! তুমি বীতহব্যের ন্যায় আত্মপ্রাপ্ত, বিদিতবেদ্য ও রাগ দ্বেষ ভয় উদ্বেগাদি শূন্য হইয়া অবস্থান কর[১]। বীতহব্য ত্রিশ সহস্র বৎসর শোক মোহাদি বর্জ্জিত হইয়া সুখে অবস্থিত ছিলেন, তুমিও সেইরূপ সুখে কাল হরণ কর[২]। হে মহামতে! হে রাজন্! মহাবুদ্ধিধর জ্ঞাতজ্ঞেয় (তত্ত্বজ্ঞানী) অন্যান্য মুনিগণ যেরূপে বাস করিতেন, তুমিও সেইরূপে রাজ্যে অবস্থান কর। কোনও কালে সর্ব্বগ আত্মা সুখ দুঃখে প্রলিপ্ত নহেন, সেজন্য শোক করা বৃথা[৩,৪]। এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক আত্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের কেহই দুঃখের বশ্য হন নাই[৫]। তুমি কেন হইবে? তুমিও আত্মস্থ হও, উদার হও, সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি হও। তুমি সর্ব্বগামী আত্মা, তোমার জন্ম মরণ নাই[৬]। তোমার ন্যায় জীবন্মুক্ত পুরুষেরা হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি মানস বিকারের বশীভূত হন না[৭]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! জীবন্মুক্তি প্রসঙ্গে আমার এক সংশয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা আপনি, শরৎ যেমন মেঘ অপনয়ন করে তাহার ন্যায় অপনয়ন করুন[৮]। হে শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্! জীবন্মুক্ত শরীরের আকাশ গমনাদি সামর্থ্য দেখা যায় না কেন[৯]?

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম! আকাশ গমনাদি সিদ্ধি সকল এক এক প্রকার প্রক্রিয়া মাত্র, সেজন্য সে সকল বস্তুধর্ম্ম অর্থাৎ বস্তুরই সামর্থ্য বিশেষ। অর্থাৎ তাহা সেই সেই বস্তুর ও সেই সেই যোনিজ দেহের স্বভাব। মশকাদি দেহ স্ব স্বভাবেই নভোগমনাদি করে। মনুষ্যাদি দেহ স্বস্বভাবে নভোগমনাদি করিতে পারে না। মনুষ্যদেহের যে নভোগমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা মণি মন্ত্র ঔষধ ও যোগাভ্যাস প্রভৃতি ক্রিয়া কৌশলের সামর্থ্য; আত্মার সামর্থ নহে। অধিক কি বলিব, যে কোন অদ্ভুত ক্রিয়া, সে সমস্তই দ্রব্যাদি পদার্থের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। সেইজন্য মুক্ত ও অমুক্ত মনুষ্যেরা কখন কখন দ্রব্য, মন্ত্র, কর্ম্ম, ক্রিয়া ও

কাল শক্তির আবেশে আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়ায় বিভূষিত হয়। (যেমন গ্রীষ্মকালের সামর্থ্যে পিপীলিকাদি কীটের পক্ষ জন্মে ও তাহারা আকাশে সঞ্চরণ করে, তাহার ন্যায় পূর্ব্বাভ্যস্ত ক্রিয়া কর্ম্মের পরিপাকে তদুপযুক্ত কাল আগত হইলে মনুষ্যেরাও সহসা আকাশ গমনাদি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে)[১০।১২]। অতএব, আকাশ গমনাদি ক্রিয়া সকল আত্মজ্ঞের বিষয় নহে। আত্মজ্ঞগণ আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত। সে জন্য তাঁহারা অবিদ্যার অনুধাবন করেন না[১৩]। যে কোন জগদ্ভাব, সমস্তই অবিদ্যার বিকার। যাঁহারা অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাহা গ্রহণ করেন না[১৪]। যাহারা অবিদ্যার সাধনা করে তাহারা অবিদ্যার সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা আত্মজ্ঞ, তাঁহারা অবিদ্যার সাধনা দূরে থাকুক, অবিদ্যার পরিত্যাগী হন[১৫]। আত্মজ্ঞ হউন, আর অনাত্মজ্ঞ হউন, যিনিই দ্রব্য ও কর্ম্ম প্রভৃতির ক্রম বিজ্ঞানে যত্নবান্ হইবেন তিনিই আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়া বিষয়ে সিদ্ধ হইবেন। ফল কথা এই যে, আত্মবান্ পুরুষ সঙ্গাতীত, নিরিচ্ছ, তাঁহারা আপন আত্মাতেই সন্তুষ্ট, সেজন্য তাঁহারা কোন কিছুর ইচ্ছাও করেন না, চেষ্টাও করেন না। তাঁহাদের নভোগমনেও প্রয়োজন নাই, সিদ্ধি লাভেও প্রয়োজন নাই, ভোগ প্রভাব (প্রভুত্ব), মান, খ্যাতি, পূজালাভ, দীর্ঘজীবন, কোন কিছুতে প্রয়োজন বুদ্ধি নাই[১৬।১৮]। তাঁহারা নিত্যতৃপ্ত, শান্তাত্মা, বীতরাগ, বিবাসন[১৯]। সুখ হউক, আর দুঃখ হউক, অতর্কিতরূপে উপস্থিত হইলেও তাহাতে তাঁহাদের তৃপ্তির বিচ্ছেদ হয় না। যেমন শত শত নদ নদী সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের উপচয় অপচয় কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ; যে কোন বাহ্যক বিকার উপস্থিত হউক, আত্মজ্ঞতার তিরোধান করিতে পারে না[২০।২১]। করা না করা, দুএর কোনও কিছুতে তাঁহাদের প্রয়োজন থাকে না[২২]। আত্মজ্ঞানের লেশও নাই এরূপ ব্যক্তিও সিদ্ধি সাধক দ্রব্যাদির দ্বারা সেই সেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে[২৩]। অমুক যোগে অমুক ক্রমে অমুক সিদ্ধি হয়, ইত্যাদি-বিধ দ্রব্যাদি নিয়তির যে ক্রম সেই সেই শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল অব্যর্থ[২৪]। যে সকলকে আমরা সহজাত সিদ্ধি বলি (যেমন দেবতাদির খেচরত্বাদি সিদ্ধি), সে সকলও বস্তুধর্ম্ম। শশাঙ্ক যেমন আপন শৈত্য পরিত্যাগ করে না, তেমনি দ্রব্যনিয়তিও আপন শক্তি

পরিত্যাগ করে না। সর্ব্বজ্ঞ, বহুজ্ঞ, মাধব, হর, কেহই নিয়তির অন্যথা করিতে পারেন না[২৫।২৬]। হে রামচন্দ্র! দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মন্ত্রপ্রয়োগ, এই সকলের সামর্থ্যে ব্যোম গমনাদি শক্তি উদ্রিক্ত হয়। যেমন বিষঘ্ন দ্রব্যাদির প্রয়োগে বিষ বিনষ্ট হয়, মদ্য মত্ততা জন্মায়, মাক্ষিক মধু ও মদনফল (এক প্রকার ফল) বমন করায়, তেমনি, যুক্তিযোজিত দ্রব্য কাল ক্রিয়া কৌশলও আপন আপন স্বভাবে সিদ্ধি সকল জন্মায়[২৭।২৯]। হে অনঘ! ঐ সকলের উপর আত্মজ্ঞানের কোনও রূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। দ্রব্য, স্থান বিশেষ, কাল, ক্রিয়াকৌশল, এ সকল পরমাত্মপদ প্রাপ্তির কারণ নহে। যাহার ইচ্ছা থাকে সে-ই সিদ্ধি সাধিতে পারে; পরন্তু পূর্ণ-কামতা বিধায় আত্মজ্ঞের ইচ্ছা সম্ভব হয় না। আত্মলাভ সর্ব্ব ইচ্ছার নাশক, সে জন্য আত্মলাভীর ইচ্ছা থাকে না। ইচ্ছার উদয়ে তৎ প্রযুক্ত প্রযত্নের দ্বারা লোক সকল যথাকালে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা নিয়তিরই ক্রম। বীতহব্য জ্ঞানের ইচ্ছায় বন গমনাদি প্রযত্ন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত কালে সে প্রযত্নের ফলও পাইয়াছিলেন। সেই রূপ, যাহারা সিদ্ধি-প্রার্থী তাঁহারাও মন্ত্র যোগাদি ক্রিয়াকৌশল বিষয়ে প্রযত্নবান্ হন, অনন্তর যোগ্য কালে তাঁহারা সিদ্ধি ফলও পান[৩০।৩৬]। যে-ই হউক, যে যখন যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় সে তাহা নিজেরই প্রযত্ন-বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত হয়[৩৭]। পরন্তু সিদ্ধি নামক ফল সমূহ মহান্ নিত্য-তৃপ্ত আত্মদর্শীর কোনও উপকার করে না[৩৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমার অপর এক সংশয় এই যে, বীত-হব্যের দেহ ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয় নাই, ভূতলোপরি ক্লিন্নাঙ্গ হয় নাই (ক্লিন্ন=পচিয়া যাওয়া)। তাহা না হওয়ার কারণ কি? এবং কি রূপেই বা তত শীঘ্র বিদেহমুক্ত হইলেন[৩৯।৪০]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! যাহা অজ্ঞসম্বিদ্, তাহা "দেহই আমি" এইরূপ সংস্কারে মালিন্য প্রাপ্ত থাকে এবং সেই দেহই ছেদ ভেদ বিশীর্ণতাদি দশা প্রাপ্ত হয় এবং তদনুরক্ত সম্বিদ্‌ও তদ্দেহের ছেদ ভেদ বিশীর্ণতাদি প্রযুক্ত সুখ দুঃখ দশা প্রাপ্ত হয়। বীতহব্যের সম্বিদ্ সেরূপ ছিল না; অর্থাৎ তদীয় সম্বিদে বাসনার মালিন্য ছিল না, তাহা না থাকায় তদাশ্রিত দেহও ছেদ ভেদাদির অযোগ্য হইয়াছিল[৪১।৪২]। হে মহাবাহো! যে যুক্তিতে যোগিদেহ অন্যের অনাক্রম্য হয়, সে যুক্তিও

বলি, শ্রবণ কর। নিয়ম এই যে, চিত্ত যখন যে পদার্থে নিপতিত হয়, তখনই তাহা তন্ময়তা ধারণ করে, করিয়া (সেই পদার্থের) তাহার সহিত সমান হইয়া যায়; অর্থাৎ সেই পদার্থে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় সে সেই পদার্থেরই তুল্য হইয়া পড়ে। (যেমন মুখের প্রতিবিম্বে দর্পণও মুখের মত হয় সেইরূপ)। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ অনেক আছে, তন্মধ্যস্থ একটী উদাহরণ শত্রুদর্শন অথবা মিত্রদর্শন। যে যাহার দ্বেষ্টা সে তাহার শত্রু। এক জন দ্বেষ করিলে অন্য জন ও যে তৎপ্রতি বিদ্বিষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ—কোন এক কারণে যাহার হৃদয়ে যৎ প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, সেও তাহাকে দেখিলে বিদ্বেষকারী হয়। কেন হয়? না তদীয় হৃদ্গত বিদ্বেষের সংসর্গে প্রতিবিম্ব নিয়মে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ মিত্র দর্শনেও মিত্রহৃদয়স্থ প্রীতি সৌহার্দ্দাদিও প্রতিবিম্ব নিয়মে মিত্রদ্রষ্টার চিত্তকে প্রীতিসৌহার্দ্দাদিময় করে; অতএব, শত্রুতা মিত্রতা যে উক্ত নিয়মেই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যেক্ ব্যক্তিরই স্বানুভবগম্য। উক্ত শত্রুতার ও মিত্রতার উৎপত্তি স্থিতি ও দূরীভবন একতর সাপেক্ষ। অর্থাৎ এক জন রাগ দ্বেষ শূন্য হইলে অন্য জনকে রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইতে হইবেই হইবে। যদি জন্মাবধি কেহ কাহার প্রতি বিদ্বিষ্ট বা অনুরক্ত না হয় তাহা হইলে তাহার কেহ শত্রুও হয় না, মিত্রও হয় না। রাগ দ্বেষ শূন্যের প্রতি রাগ দ্বেষ রাহিত্যের নিদর্শন পথিক অর্থাৎ উদাসীন প্রভৃতি। বৃক্ষ, লতা, গিরি, নদী প্রভৃতি অচেতন বর্গও বটে। পরন্তু ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় স্নানীয় প্রভৃতি অচেতন বর্গে যে অনুরক্তি বৈরক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, সে অনুরক্তি বৈরক্তি প্রভৃতিও সেই ভক্ষ্য ভোজ্যের ও পানীয় স্নানীয়ের গুণ দোষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই হয়[৪৩।৪৭]। এখন তুমি অভিহিত যুক্তি বা উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়া লও "বীতহব্যের শরীর ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষিত হয় নাই কেন?" যে মহাযোগীর দেহে অরাগ দ্বেষ প্রতিষ্ঠিত হয়, রাগ দ্বেষাদি বৈষম্যশূন্য সম্বিদ্ বিলাস করিতে থাকে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রের চিত্ত সে যোগীর তাদৃশ দেহে নিপতিত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিবিম্ব নিয়মে রাগ দ্বেষাদি বৈষম্যশূন্য হইয়া যায়। সেজন্য তৎ প্রতি তখন তদীয় হিংসাবুদ্ধি অনুদিত থাকে[৪৮]। হিংস্র দিগকেও সমদর্শী যতির সংসর্গে দ্বেষাদি শূন্য হইতে দেখা যায়।

পরন্তু যখন তাহারা যোগীদেহের সামীপ্য পরিত্যাগ করে, তখন তাহারা পুনর্ব্বার যে হিংস্র সেই হিংস্র হয়[৪৯।৫০]। হে রাঘব! প্রোক্ত কারণে বীতহব্যের দেহ ভূতলশায়ী থাকিলেও ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় নাই [৫১]। ক্লিন্ন হয় নাই কেন? তাহাও বলি, শ্রবণ কর। সম্বিৎ অর্থাৎ চেতনাপদার্থ সর্ব্বত্রাবস্থিত। তাহা কাষ্ঠ লোষ্ট্র প্রস্তরাদি পদার্থেও অবস্থিত আছে। পরন্তু অব্যক্ত রূপে। তাহার ব্যক্ততা বা কার্য্যকারিতা কেবল জীবশরীরে পুর্য্যষ্টকনামধেয় লিঙ্গ শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। বীতহব্যের পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গাত্মা তত্ত্বজ্ঞান ও সমাধি যোগ দ্বারা বৈষম্য বর্জ্জিত হওয়ায় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাবে পরিভাবিত হওয়ায় তদীয় দেহও নির্ব্বিকার ব্রহ্মসম্বিদে পর্য্যবসন্ন হইয়াছিল, সেজন্য তাহা ক্লিন্ন হইতে পারে নাই[৫২।৫৪]। হে রামচন্দ্র! ক্লিন্ন না হইবার অন্য কারণও আছে। বিনাশের মুখ্য কারণ স্পন্দন (বিকার ক্রিয়া)। তাহার মূল বা উৎপত্তিস্থান চিত্ত। চিত্তের অবান্তর কার্য্য প্রাণ ও প্রাণের প্রস্পন্দ (শ্বাস প্রশ্বাস রক্ত সঞ্চালনাদি বায়বীয় গতি); এই প্রস্পন্দের দ্বারা উপচয় অপচয় হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি ঘটনা হয়। উক্ত প্রস্পন্দ স্তম্ভিত হইলে কাজেই তদধীনময় দেহ প্রস্তরতুল্য হইয়া যায়। অতএব তাদৃশ প্রাণ ধারণার অধীনেই বীতহব্যের দেহ ক্লিন্ন হইতে পারে নাই [৫৫।৫৬]। বাহ্যিক হস্তপদাদি স্পন্দন ও আভ্যন্তরিক চিত্তচাঞ্চল্য যাহার স্থগিত হয় তাহার কি বৃদ্ধি কি হ্রাস [illegible] কিছুই হয় না। তাহার ত্বক্ প্রভৃতি শরীর ধাতু সমভাবেই থাকিয়া যায়, অর্থাৎ প্রণষ্ট হয় না। অধিকন্তু সে সকল মেরুর ন্যায় স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়[৫৭।৬০]। মেঘে জল থাকে, সে জল যেমন মেঘকে ক্লিন্ন করে না, মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তর থাকে, মৃত্তিকা যেমন তাহাকে পচাইয়া আত্মভাবাপন্ন করিতে পারে না, সেইরূপ যোগিদেহও যোগাবস্থায় কোনও কিছুতে ছিন্ন ভিন্ন ক্লিন্ন ও বিম্লান হয় না[৬১]। তিনি শীঘ্র বিদেহ হন নাই কেন? তাহাও বলি, শ্রবণ কর।

যাঁহারা বীতরাগ ও জ্ঞানী তাঁহারা অপরাধীন অর্থাৎ শরীর ত্যাগ বিষয়েও স্বাধীন[৬২।৬৩]। কোন প্রকার দৈব, প্রাক্তন বা ঐহিক কর্ম্ম, অথবা কোন রূপ বাসনা তাঁহাদের চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে না। বৎস রাম! তত্ত্বজ্ঞ দিগের মন কাকতালীয় ন্যায়ে বা যদৃচ্ছাক্রমে যখন

যে ভাব ধারণ করে, সেই ভাবই তখন তাহার সুসিদ্ধ হয়। অতএব, যাবৎ পর্য্যন্ত বীতহব্যের সম্বিদ্ জীবিত থাকা স্থির করিয়াছিল, তাবৎ তিনি জীবিত ছিলেন, পরে যে দিন তাহার প্রতিভা দেহ ত্যাগার্থ কাক-তালীয় ন্যায়ে উদিত হইয়াছিল, সেই দিনই তিনি বিদেহ হইয়াছিলেন[৬৪।৬৭]।

রাম! যাহারা ছিন্নপাশ তাহারাও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত এবং তাহারা মহেশ্বর। ইহারা যখন যাহা ইচ্ছা করেন তখনই তাহা করিতে পারগ হন[৬৮]।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ।

—০()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, আত্মবিচার করিতে করিতে বীতহব্যের চিত্ত প্রায় না থাকার মত হইয়া আসিলে তাঁহাতে মৈত্রী প্রভৃতি (মৈত্রী=সর্ব্ব প্রাণীর হিত কামনা) গুণের আবির্ভাব হইয়াছিল[১]।

রাম বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিলেন যে, বিচারের দ্বারা মুনি-বর বীতহব্যের চিত্ত আত্মরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল, আবার বলিলেন, তাঁহার মৈত্র্যাদি গুণ জন্মিয়াছিল। এই উভয় কথা কিরূপে সমঞ্জস হয়? চিত্ত যদি ব্রহ্মে অস্তগতই হইল, তাহা হইলে মৈত্র্যাদি কাহার জন্মিল[২।৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! চিত্তনাশ দুই প্রকার; এক সরূপ, অপর অরূপ। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তি জাত চিত্তনাশ সরূপ ও বিদেহ মুক্তি জনিত চিত্তনাশ অরূপ[৪]। * ইহ শরীরে চিত্তসত্তাই দুঃখকারণ ও চিত্ত নাশ সুখের হেতু। সেই জন্য সুখপ্রার্থী অর্থাৎ মুমুক্ষু চিত্তসত্তার ক্ষয় সাধন করিয়া চিত্ত নাশ অবস্থা আনয়ন করিবেন[৫]। যে চিত্ত অর্থাৎ যে মন তামস বাসনায় পরিব্যাপ্ত, সেই চিত্তই জন্মাদির ও দুঃখের কারণ[৬]। দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে যাহার মমতা ও অনুকূল বলিয়া অভিমান, সেই চিত্তই দুঃখ ভার বহন করে এবং তাহাকে আমরা জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করি[৭]। যাবৎ তাদৃশ মন বিদ্যমান তাবৎ দুঃখ ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। যদি কদাচিৎ তাদৃশ মনঃ অস্ত প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসঙ্গে সংসারও অস্তগত হয়[৮]। অতএব, বাসনাক্ষেত্রভূত বিদ্যমান মনঃই দুঃখ বৃক্ষের বীজ। উহা হইতেই নানা প্রকার দুঃখাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে[৯]।

---

* যেমন স্ফটিক নির্ম্মিত ভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুরুষান্তরের ভ্রম জন্মে, সেইরূপ, চিত্তে প্রতিফলিত স্বাত্মপ্রতিবিম্বে যে স্বাত্মভ্রান্তি, সেই স্বাত্মভ্রান্তির সহিত আর সেই প্রতিবিম্বের সহিত যে চিত্ত নাশ, সে চিত্ত নাশ অরূপ আর চিত্ত থাকিল অথচ তাহাতে স্বাত্মভ্রান্তি থাকিল না, এরূপ হইলে সেই স্বাত্মভ্রান্তির বিনাশকে সরূপ চিত্তনাশ বলা যায়।

রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! কাহার মন বিনষ্ট? বিনাশই বা কিরূপ? তাহার সত্তাই বা কিরূপ? এবং নাশ হইলে কিরূপ হয়? এই সকল কথা আমাকে বিশদ করিয়া বলুন[১০]।?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! চিত্তের সত্তা কি? তাহা বলিয়াছি। (অর্থাৎ তমোময়ী বাসনায় পরিপূরিত থাকাই চিত্তের থাকা, এ কথা বলা হইয়াছে) এক্ষণে তাহার নাশ কি? কাহার চিত্ত বিনষ্ট, এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলি, শ্রবণ কর[১১]।

বাহ্যিক আভ্যন্তরিক নানা প্রকার সুখ দুঃখের অবস্থা, যে ধীর পুরুষকে সাম্য হইতে বিচলিত করিতে পারে না, তাহারই চিত্ত বিনষ্ট বলিয়া গণ্য[১২]। এই আমি আছি, সেই আমি এখন এইরূপ; ইত্যাদি প্রকারের দুশ্চিন্তা যাহাকে খর্ব্ব করিতে পারে না, সেই শ্রেষ্ঠ নরের মন বিনষ্ট[১৩]। বিপদ সম্পদ কার্পণ্য উৎসাহ মত্ততা মূঢ়ত্ব উৎসব, এই সকলের দ্বারা যাহার মন বিকৃত বা বিচলিত না হয় তাহার মন মৃত[১৪]। হে সাধো! তাহারই নাম মনোনাশ। কেননা, মনোনাশ হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে। যাহারা জীবন্মুক্ত চিত্তনাশ তাহাদিগেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত[১৫]। যাহাকে মূঢ়তা বলা যায় তাহাকেই তুমি মনস্তা বলিয়া জানিবে। সেই মূঢ়তা বিনাশ প্রাপ্ত হইলেই মন বিনষ্ট হইয়াছে, বলা গিয়া থাকে। মূঢ়তার বিনাশে যে সত্ত্বের উদ্রেক হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সৎস্বভাব প্রকটিত হয়, সেই শুদ্ধ সৎস্বভাবকেও কেহ কেহ চিত্তনাশ সংজ্ঞা দেন[১৬।১৭]। অতএব, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের মন মৈত্রী করুণা প্রভৃতি গুণের আধার, সদ্বাসনায় বাসিত ও পুনর্জ্জন্ম বিবর্জ্জিত[১৮]। জীবন্মুক্ত দিগের তাদৃশ মন মাত্র ব্রহ্মবাসনায় বাসিত থাকে, সেই জন্য তাঁহাদিগের তাদৃশ মন সত্তা ও সত্ত্ব নামে ব্যবহৃত হয়[১৯]। যখন তাঁহারা সমাধি প্রচ্যুত হন, তখনও তাঁহাদের মনে দেহাদ্যভিমান থাকে না, সুতরাং তদবস্থায় তাঁহাদের চিত্ত থাকিলেও না থাকা বলিয়া গণ্য হয়[২০]। তাঁহাদের মন ব্রহ্মেই সমাসক্ত থাকে, প্রপঞ্চ বিষয়ে তাঁহাদের মন থাকে না, তাহা না থাকায় তাঁহাদের মন শরীরাদি পরিচ্ছিন্ন পদার্থজাত স্পর্শও করে না। সেই কারণে তাঁহাদের চিত্ত মৈত্রী ও মুদিতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে[২১।২২]। সরূপ মনোনাশ কি তাহা বর্ণিত হইল, এক্ষণে অরূপ মনোনাশ বর্ণনা করি, শ্রবণ কর। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! বিদেহ

মুক্তিকেই আমরা অরূপ মনোনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। তাহা নিষ্কল অর্থাৎ নিরাকার[২৩]। পরম পাবন অত্যন্ত বিমল বিদেহমুক্তি নামক পরম পদে মৈত্র্যাদি গুণের আধার পূর্ব্বোক্ত সত্তা বা সত্ত্ব প্রলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ জীবন্মুক্তি কালে মনের একটা প্রতিভাস (ছায়া) থাকে, বিদেহ মুক্তিতে তাহাও থাকে না। সেই জন্য সত্তাক্ষয় বা সত্ত্বক্ষয় নামক চিত্ত নাশ অরূপ অর্থাৎ নিরাকার এবং তাহা ব্রহ্ম স্বরূপের অন্তর্গত। তাহাতে গুণ অগুণ, শোভা অশোভা, চাঞ্চল্য অচাঞ্চল্য, উদয় অস্ত, তেজ তিমির, দিন রাত্রি, দিক্ বিদিক্, অধঃ ঊর্দ্ধ, অর্থ অনর্থ, বাসনা অবাসনা রচনা, রঞ্জনা, সত্তা অসত্তা, প্রভৃতি কোন প্রকার আপেক্ষিক সম বিষম ভাব থাকে না। সেই পরম পাবন পদ কৃতিসাধ্য বা উৎপাদ্য নহে অর্থাৎ নিত্য বিরাজিত। তমঃ, তেজ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভাব বর্জ্জিত ও যার পর নাই নিতান্ত নির্ম্মল[২৮।২৯]। আকাশ যেমন বায়ুর আস্পদ, উক্ত পদ তেমনি যাঁহারা বুদ্ধির অর্থাৎ প্রকৃতির পর পার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের আস্পদ[৩০]। যাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়াছে, সেই বিদেহ মুক্তেরাই প্রোক্ত জড়বিপরীত চিৎপ্রচুর পদে চিরকাল বাস করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তির দ্বারা তাদৃশ পদে স্থিরীভূত থাকেন[৩১]।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

-○()○()○-

রামচন্দ্র বলিলেন, এই সুবৃহৎ জগৎ একটী বন। চতুর্দ্দশ ভুবন * এই বনের বৃক্ষ। সে সকল বৃক্ষ পরমাকাশ কোষস্থ অব্যাকৃত পর্ব্বতে রূঢ় অর্থাৎ উৎপন্ন ও স্থিত। সুর অসুর নর উক্ত বনের বিহঙ্গ, তারকারাজি পুষ্প, বিদ্যুৎ মঞ্জরী, মেঘ পল্লব, সমুদ্রগণ তত্রস্থ বাপী বা দীর্ঘিকা, শত শত সরিৎ তাহার প্রণালী (জল পূরণের নালা)। এই বন বহুবিধ প্রাণীর উপজীব্য[১।৩]। এই বনে সংসার লতা বিস্তৃতা রহিয়াছে। সেই সংসার লতার পর্ব্ব (গাঁইট) জরা ও মরণ, ফল সুখ ও দুঃখ, এবং তাহার মূল মোহরূপ জলে সর্ব্বদা সিক্ত রহিয়াছে[৪।৫]। হে ব্রহ্মন্! আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এতাদৃশী সংসার লতার বীজ কি? সে বীজের বীজ কি? তাহারই বা বীজ কি? তথা তাহারই বা বীজ কি? আমার জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত সংক্ষেপ বিধানে উক্ত বীজপরম্পরা আমার নিকট বর্ণন করুন[৬।৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সংসার লতার বীজ শরীর, সেই বীজ হইতে শুভাশুভ নামক অঙ্কুর জন্মে, সেই সকল অঙ্কুর আবার উক্ত শরীর দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়[৮।৯]। শরীররূপ বীজের বীজ চিত্ত, যাহা অসংখ্য আশার বশ্য। যে হেতু চিত্ত হইতেই অতীত অনাগত বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হয় সেই হেতু চিত্তই শরীরের বীজ। চিত্তই শরীর সৃষ্টি করে। এই রহস্য স্বপ্ন সম্ভ্রমাদির (ভ্রান্তির) দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়[১০।১১]। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির চিত্ত উৎপাতময় সঙ্কল্পের দ্বারা গন্ধর্ব্বনগর সৃজন করে সেইরূপ শরীরসঙ্কল্পের দ্বারা শরীর সৃজনও করে[১২]। এই যে দৃশ্যতা প্রাপ্ত জগৎ, ইহার সমস্তই চিত্তের রূপান্তর। যেমন মৃত্তিকার রূপান্তর ঘটশরাবাদি, সেইরূপ, চিত্তের রূপান্তর দৃশ্য বস্তু[১৩]। বৃত্তিনাম্নী লতায় বিজড়িত চিত্তরূপ বৃক্ষের বীজ দ্বিবিধ। এক প্রাণ পরিস্পন্দ, অপর দৃঢ় ভাবনা[১৪]। প্রাণ যখন দেহস্থ শিরা প্রশিরাদি সংস্পর্শার্থ স্পন্দায়মান হয়

---

* পৃথিবী সহ সপ্ত পাতাল ও অন্তরীক্ষ সহ সপ্ত স্বর্গ।

তখনই তাহা হইতে সম্বেদনময় (চিদ্বিকারপ্রায়) চিত্ত জন্ম গ্রহণ করে। সেইজন্য, প্রাণ প্রস্পন্দনের অভাব কালে বাহ্য সংস্কারের অনুদ্রেক হেতু অন্তরে চিত্তপ্রাদুর্ভাবেরও অভাব দৃষ্ট হয়[১৬।১৭]। হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞক চেতনের জগদ্ভাব প্রাপ্তিও সমষ্টিপ্রাণস্পন্দন মূলক এবং তাহা নিজ চিত্তের দৃষ্টান্তে অনুমেয়। তাই বলিতেছি যে, আকাশে নীলিমার আবির্ভাব যেরূপ, সূত্রাত্মপ্রাণের প্রস্পন্দনে জগতের আবির্ভাবও সেইরূপ। এতদনুসারে সিদ্ধান্ত—সূত্রাত্মসংজ্ঞক প্রাণ (সমষ্টি প্রাণ) যদি স্পন্দনে উপরত হয় তাহা হইলে তদুপহিত চিৎও নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হয় সুতরাং শান্তিপদাভিধেয় হয় এবং তাহা জগতের প্রলয় ও মোক্ষ নামেও অভিহিত হয়[১৭।১৮]। যে সংবিৎ দেহাবচ্ছেদে বিদ্যমানা সেই সংবিৎ প্রাণ প্রস্পন্দের দ্বারা প্রবোধিতা হইয়া তদ্দেহে স্ফুরিত হয়[১৯]। যেমন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম গন্ধ বায়ুর সাহায্যে উপলব্ধিগোচর হয়, সেইরূপ, সর্ব্বত্রাবস্থিত সূক্ষ্মতম সংবিৎও প্রাণস্পন্দনের দ্বারা প্রবোধিতা হয়। যে আধারে প্রাণস্পন্দন নাই, সে আধারে সংবিৎ অব্যক্ত। (বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থে সংবিৎ অব্যক্ত) এবং যে আধারে প্রাণস্পন্দন আছে সে আধারে সংবিৎ সুব্যক্ত[২০]। (মনুষ্যাদি সচল পদার্থে সুব্যক্ত) হে রামচন্দ্র! উক্ত সংবিৎ চিত্তাকারে উদিত না হইলেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তাকারে উদিত হওয়ার যে কারণ সেই কারণকে আক্রম করিতে পারিলে সম্বিদের চিত্তাকার হওয়া নিরুদ্ধ হইতে পারে[২১]। চিত্তের উদয়ে সম্বিদের উদয় হয়। তৎক্রমে তাহার সংবেদ্যে (বিষয়ে) গমন, তৎপরে তাহা হইতে সুখ দুঃখের উদয় ও সে সকলের ভোগ নির্ব্বাহিত হয়[২২]। সম্বিদ্ যদি বাহ্য বিষয়ে সুপ্তপ্রায় থাকিয়া আত্মার অভিমুখে উদিত হয় অর্থাৎ স্বাত্মবোধার্থ চেষ্টিত হয়, তাহা হইলেই অমল পদ লব্ধ হয়[২৩]। অতএব, রাম! যদি তুমি প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ করতঃ বাসনাজাল অপনয়ন পূর্ব্বক সংবিদের স্ফীতভা (চিত্তাকারে প্রবৃদ্ধ হওয়া) নষ্ট করিতে পার তাহা হইলে তখন তুমি অজর অমর অনাদি অনন্ত হইবে[২৪]। সংবিদের উচ্ছূনতাকেই (স্ফীতিভাবকেই) তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে এবং চিত্তকেও তুমি জগৎ ও অনর্থ বলিয়া বিদিত হইবে[২৫]। যোগীরা চিত্ত বিনাশের জন্য প্রাণায়াম ও ধ্যান প্রভৃতি প্রাণনিরোধের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন[২৬]। প্রাণ

নিরোধের ফল নিতান্ত শুভাবহ। কেননা প্রাণ নিরোধ সংবিদের সাম্য সাধক ও স্বাস্থ্যের কারণ২৭। তাদৃশ চিত্তের বীজ অন্য প্রকারেও বর্ণিত হয়, তাহাও বলি, শ্রবণ কর। সে বীজ জ্ঞানিগণের বর্ণিত ও নিজের অনুভূত২৮।

চিত্তের জীবন বাসনা। যাহা প্রাক্তনী দৃঢ় ভাবনা তাহাই বাসনা। অর্থাৎ আমি আমার ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকারের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃঢ় সংস্কার পূর্ব্বাপর বিচার শূন্য হইয়া সেই সেই পদার্থের আকারে পরিণত হয়। সেই পরিণতি বাসনা নামের নামী২৯। হে মহাবাহো! আমি আমার ইহা তাহা ইত্যাদি প্রকার ভেদবতী বুদ্ধির দৃঢ় ব্যুৎপত্তি বা বাসনার তীব্র বেগ ইতর পদার্থের বিস্মরণ ও স্ব বিষয়ের সংস্মরণ উৎপাদন করে এবং তাহাই দেহাদির সত্তা প্রদর্শন করায়। কেবল দেহাদির সত্তা দেখায় এমত নহে; বাহ্য পদার্থেও স্বসত্তা অর্পণ বা আরোপ করে। পুরুষ বা আত্মা সেই সেই বাসনার বশ্য হইয়া তদ্রূপপ্রায় হয়, হইয়া ইহা সৎ তাহা অসৎ অর্থাৎ আছে ও নাই ভাবিয়া বিমুগ্ধ হয়৩০।৩১। জনগণ যেমন মদশক্তির বশ্য হইয়া ভ্রম সন্দর্শন করে সেইরূপ আত্মাও বাসনা বেগের বশ্য হইয়া আত্মবিস্মৃত ও বিবিধ প্রকার ভ্রম দর্শন করে৩২। অতএব, যাহারা ভ্রান্ত, সম্যক্‌জ্ঞান হইতে বিচ্যুত, তাহারাই অন্তঃস্থ বাসনারূপ বিষে দগ্ধ ও বিবশ হইতে থাকে ৩৩। হে রাঘব! তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান, বস্তুতে অবস্তু জ্ঞান, এ সমস্তই চিত্ত বলিয়া গণ্য৩৪। দৃঢ়াভ্যাস বশে পদার্থাকারে পরিভাবিত হওয়াকেও চিত্ত বলা যায়। তাহা জন্ম জরা ও মরণের কারণ৩৫। পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাসনার বিনাশ হইলেই চিৎ স্ব স্বরূপে স্থিত থাকে এবং চিতের স্ব স্বরূপে স্থিতিই মুক্তির লক্ষণ। তাই বলিতেছি যে, যখন দেখিবে যে কোনও কিছুর বাসনা নাই, তখনই জানিবে যে চিত্ত জন্মিতেছে না৩৬। যখন দেখিবে যে, বাসনাশূন্য হওয়ায় মন আর মনন করে না, বাহ্যভাবে অস্পৃষ্ট থাকে, তখনই জানিবে, সর্ব্বতাপপ্রশমনী অমনস্ক দশা জন্মিয়াছে৩৭। যখন দেখিবে সংবিত্তি নির্ম্মলা রহিয়াছে, তাহাতে কোনও প্রকার পদার্থ মল অবভাসিত হইতেছে না, তখনই জানিবে, অন্তরে চিত্তের প্রাদুর্ভাব নাই৩৮। যখন কোনও পদার্থের ভাবনা থাকে না, ভাসমানতা থাকে না, নিশ্চয়ই

তখন চিত্ত প্রাদুর্ভাব থাকে না[৩৯]। হে রাঘব! আমি চিত্তের রূপ সম্বন্ধে এইরূপ মনে করি যে, অন্তরে অনুরাগ পূর্ব্বক পদার্থ পরিভাবনের নাম চিত্ত[৪০]। অন্তর যখন আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ হয়, কল্পনা যোগের অভাবে দৃশ্য ভাবনার উদ্রেক থাকে না, তখন আর কোথায় বা কোন্ আধারে চিত্তজন্ম হইবে[৪১]? যখন নিরোধ যোগ অবলম্বনে বাহ্যার্থের বিস্মরণ জন্মে এবং কেবল মাত্র পরমার্থ দর্শনে আবির্ভূত থাকে, তখনকার সেই ভাবকে আমরা অচিত্ততা ও চিত্তনাশ বলিয়া গণ্য করি[৪২]। যদিও জীবন্মুক্ত দিগের চিত্তে বৃত্তির উদ্রেক থাকে, থাকিলেও তাহা দগ্ধকল্প। যেমন দগ্ধ বস্ত্রকে বস্ত্র বলা যায় না, কেননা তদ্দ্বারা বস্ত্রের কার্য্য চলে না, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ চিত্তকেও চিত্ত বলা যায় না। বিষয় রসের স্বাদ গ্রহণের নাম রাগ, তাহা যাহার নাই, তাহার চিত্ত অচিত্ত বলিয়া গণ্য। যেমন কুম্ভকার দণ্ড অপনয়ন করিলেও তদীয় চক্র পূর্ব্ব বেগের অনুবৃত্তি বশতঃ কিছু কাল ঘুরিতে থাকে সেইরূপ পুনর্জ্জন্মকারিণী বাসনার বিনাশ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগ বশতঃ জীবন্মুক্ত দিগের দেহাদি কিছু কাল অবস্থিত থাকে[৪৩।৪৪]। যাহাদের বাসনা রাগবর্জ্জিত, ভৃষ্ট বীজের অঙ্কুর জননশক্তি রহিতের ন্যায় জন্মাদি জননশক্তি রহিত, তাঁহারাই এ সংসারে জীবন্মুক্ত। তাঁহারা জ্ঞান পারগ, অচিত্ত, এবং দেহান্তে আকাশ তুল্য[৪৬।৪৭]। হে রামচন্দ্র! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্তের বীজ দ্বিবিধ। এক প্রাণস্পন্দন, অপর বাসনা। যদি ঐ দুই বীজের কোন একটী বীজ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎসঙ্গে অন্য বীজটীও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে[৪৮]। কেননা, চিত্ত প্রাদুর্ভাবের প্রতি ঐ দুইটী মিলিত কারণ। যে বাসনা বল পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম উপস্থাপিত করে সে বাসনা জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত বীজাঙ্কুর ন্যায়ে দেহাদি জন্মের কারণ ভাব প্রাপ্ত থাকে। যখন তাহা জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ হয়, তখন আর তাহা জন্মাদি হওয়ার কারণ হয় না[৪৯।৫০]। তৈল যেমন তিলের অন্তঃস্থ, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা পরস্পর পরস্পরের অন্তঃস্থ। বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির কাল সাপেক্ষে কারণ, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন ও বাসনা পরস্পর পরস্পরের সেইরূপ কালসাপেক্ষে কারণ[৫১]। প্রোক্ত কারণভাবের ক্রম এই যে, প্রথমে প্রাণ, পরে ইন্দ্রিয়, পরে তৎপ্রযুক্ত আনন্দ, মিলিত এই সমুদায়

চিত্তোৎপত্তির কারণ। আবার সম্বিদাত্মক চিত্তও কালান্তরে ঐ সকলের কারণ। ইহার বিবরণ এই যে, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ানন্দ তাৎকালিক জীবনাত্মক প্রাণস্পন্দন যখন বাসনায় পরিণত হয়, তখন, সেই তদ্দ্বয়ের বাসনা সংস্কার বা চিত্তাবির্ভাবের কারণ হয়[২২]। অতএব, পুষ্প ও গন্ধ, তিল ও তৈল, যেমন পরস্পর বাস্য বাসক ভাবে ব্যবস্থিত, সেইরূপ, প্রাণ ও বাসনা পরস্পর জন্য জনক রূপে ব্যবস্থিত। পূর্ব্ব সংস্কারের বলে প্রাণস্পন্দন, পরে তাহারই বলে বাসনার বা সংস্কারের জন্ম। পুনর্ব্বার তদনুবলে প্রাণস্পন্দন। হে রাঘব! এবংক্রমেই তদ্দ্বয়ের কার্য্য কারণ ভাব সম্পন্ন হয়। বাসনা সংবিৎকে সংক্ষুব্ধ (সঞ্চালিত) করে, তন্নিমিত্ত প্রাণের প্রস্পন্দন জন্মে, তদনুবলে চিত্তের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রাণ হৃদয়ান্তর্গত বাসনা স্পর্শ না করিয়া স্পন্দিত হয় না। সেইজন্য স্বীকার করিতে হয় যে, উক্ত উভয় চিত্তোৎপত্তির মিলিত কারণ। যে হেতু মিলিত কারণ সেই হেতু একের নাশে অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই তদুভয়ের বিনাশে চিত্তের নাশ সুসম্পন্ন হয়। যে চিত্তের কথা অবতারিত হইয়াছে সেই চিত্ত বৃক্ষরূপকেও বর্ণিত হইতে পারে। সুখে ও দুঃখে পরিণত মন তাহার (চিত্তের) স্পন্দন, শরীর তাহার বৃহৎ ফল, কার্য্যকলাপ তাহার পল্লব, কার্য্য চেষ্টা তাহার সমাশ্রিত লতা, তৃষ্ণারূপ সর্প এই বৃক্ষের অতিথি, ইহাতে রাগ ও রোগ রূপ বক আসিয়া বাস করে, অজ্ঞান ইহার মুল, ইন্দ্রিয়রূপ বিহঙ্গ ইহাতে নীড় প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে। যদি বাসনা বিনাশ করা যায় ত বর্ণিত চিত্ত বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ উন্মূলিত হইয়া যায়[৩৭।৩৯]।

চিত্তকে যেমন বৃক্ষরূপকে বর্ণনা করিলাম, এইরূপ, বাত্যারজো রূপকেও বর্ণনা করা যায়। (ঘূর্ণি বায়ু বা ঝটিকা যে ধূলি সজ্ঘাত উত্থাপিত করে। সেই ধূলি সজ্ঘাত বাত্যা রজঃ) চিত্তরূপ বাত্যারজঃ সমুদায় আশা পাণ্ডুর বর্ণ করে, চিদ্রূপ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে, মেঘের ন্যায় লোল হয়, (মেঘ আকাশে উদিত ও অস্তমিত হয় চিত্তও তদ্রূপপ্রায়ে উদিত ও অস্তমিত হয়), বাত্যারজঃ অবকর (জঞ্জাল) পুঞ্জীকৃত করে, চিত্তও অজ্ঞানরূপ অবকর পুঞ্জীভূত করে। বাত্যারজঃ উৎক্ষিপ্ত তৃণে পরিব্যাপ্ত থাকে, চিত্তও তৃষ্ণাতৃণে পরিব্যাপ্ত হয়। (জ্ঞানীর নিকট তৃষ্ণা তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, তদনুসারেই তৃষ্ণা তৃণস্থানীয়), বাত্যারজঃ দেখিতে

স্তম্ভাকৃতি, চিত্তও শরীররূপ ধারণ করায় গুম্ভাকৃতি। বাত্যারজঃ উত্থিত হইলে সৌরালোক দৃষ্ট হয় না, চিত্ত আবির্ভূত হইলেও ব্রহ্মা-লোক (ব্রহ্মের প্রকাশ) দৃষ্ট হয় না। বাত্যারজঃ বায়ুর উপশমে উপ-শম প্রাপ্ত হয়, চিত্তরূপ বাত্যারজঃও প্রাণ বায়ুর নিরোধে উপশম প্রাপ্ত হয়৩০।৩১। হে রামচন্দ্র! বাসনা ও প্রাণ স্পন্দন, এই দুএর আবার বীজও আছে, সে বীজ সংবেদ্য নামে প্রসিদ্ধ। সংবেদ্য অর্থাৎ প্রিয় অপ্রিয় শব্দাদি বিষয়। সেই সকল বিষয় স্ববিষয়িনী স্মৃতি উৎপাদন দ্বারা প্রাণস্পন্দন ও বাসনা উজ্জীবিত করিতে থাকে৩৪। সুতরাং যদি সংবেদ্য পরিত্যাগ হয় তবে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা নির্ম্মূল অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে রাঘব! তুমি সংবেদ্যকে পৃথক্ বলিয়া জানিও না। সংবিদ্ই সংবেদ্য, এইরূপ জানিবে। কেননা সংবিদ্ই আপনার ধীরত্ব স্থিরত্ব পরিত্যাগ করিয়া সংবেদ্যভাবাপন্ন হয়। যেমন তৈল হীন তিল অসম্ভব, তেমনি সংবিদ্ বিহীন সংবেদ্যও অসম্ভব। বাহি-রেই বল আর অন্তরেই বল, সংবেদ্য কুত্রাপি সংবিদ্ হইতে পৃথক্ নহে। আত্মমরণ ও দেশান্তরাবস্থান প্রভৃতি স্বাপ্নিক সংবেদ্য যেরূপ স্বচমৎকার মাত্র, জাগ্রৎ সংবেদ্যও সেইরূপ স্বচমৎকার মাত্র। (স্বচমৎ-কার কথার অর্থ—আত্মবিষয়ক অদ্ভুত প্রকাশ।) হে রঘুনাথ! পিশাচ আছে ও পিশাচ নাই, এই দুই ভাব যেমন সঙ্কল্প ও অসঙ্কল্প মূলক, সংবিদ্ পৃথক্ ও সংবেদ্য পৃথক্ এ ভাবও সেইরূপ সঙ্কল্প অসঙ্কল্প মূলক। স্থাণুতে পুরুষ দর্শন, বাতায়ন প্রবিষ্ট সৌর কিরণে দণ্ড ও ত্রাসরেণু দর্শন, ও উহ্যমান নৌকার অচলত্ব বোধ যেরূপ, সংবিদে সংবেদ্য বোধও সেইরূপ। অতএব, অবিচার দশায় যে সংবিদ্ ও সংবেদ্য এত-দ্রূপ ভেদ অবভাস প্রথমান হয়, তাহা দুর্দ্দৃষ্টি বা মিথ্যা জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইজন্য উহা বিচারসমুত্থিত সম্যক্ জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, এক শুদ্ধ সংবিদ্ই আছে, এবং তাহাই সত্য, ভ্রান্তির উদয়ে সেই শুদ্ধা সংবিদ্ই জগত্রয়াকারে ভাসমান হইতেছে, এই জ্ঞান যদি অন্তরে নিশ্চয়রূপে রূঢ় বা আরূঢ় হয়, তাহা হইলে তাহা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্বদৃষ্ট হউক বা না হউক, সম্বিদে কোন কিছু ভাসমান হইলে জ্ঞানী তৎক্ষণাৎ তাহা পরিমার্জ্জন করিবেন। তাহা না করিলেই সংসার ও করিলে

মোক্ষ। বেদ্য দর্শনই জন্ম মরণাদি সংসারের ও অনন্ত দুঃখের মূল। এবং তাহার অদর্শনই (অননুভবই) জন্মাদি বিনাশের ও অপরিসীম সুখের হেতু। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, জড়ের বেদ্য দর্শন নাই, তাই বলিয়া তাহারা যে মুক্ত, তাহা নহে। অজড় অথচ বেদ্য দর্শন হয় না, সেরূপ হইলে তাহা মুক্তিপদাভিধেয়। অতএব, হে রাম! তুমিও বেদ্য দর্শন পরিত্যাগী বিশুদ্ধাত্মরূপী হও৬৬।৭৭।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! যাহা অজড় অর্থাৎ জড়বিরোধী তাহা অসম্বেদন, এ কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? সর্ব্বত্রই দেখা যায়, জড়ই সম্বেদনশূন্য৭৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রস্তাবিত স্থলে সংবিদ্ শব্দের অর্থ—সত্য বলিয়া বাহ্যার্থ জানা। অতএব, যে জীব বাসনা বিনাশ হেতু সর্ব্বত্র বিদ্যমান বিষয়ে আস্থাশূন্য ও অতীত অনাগত বিষয়ের আস্থাও যাহার নাই, সেই জীবের পদার্থ ব্যবহার প্রকৃত ব্যবহার নহে, তাহা ব্যবহারাভাস। যাহারা তাদৃশ, তাহারা সেই সেই পদার্থ ব্যবহার বিষয়ে অসম্বিদ এবং স্বাত্মবিষয়ে পূর্ণচৈতন্যতা হেতু অজড়৭৯। অথবা বস্তুর প্রকারে অর্থাৎ সত্যতা বোধে চিত্তের যে বাহ্যার্থাবগাহন, তাহা সংবিদ্ শব্দের বাচ্য। তাদৃশ সংবিৎ যাহার নাই সে শত শত কার্য্য করিলেও অসম্বিদ্৮০। যাহার হৃদয়াকাশ সংবেদ্য দ্বারা রঞ্জিত হয় না (সংবেদ্য বাহ্য বস্তু), তাহারই সংবিদ্ অজড় এবং সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত৮১। বুদ্ধি যখন বাসনার অভাবে ভবিষ্যৎ ভাবনা বর্জ্জিত হয়, এবং বিজ্ঞান জড়মূকাদির ন্যায় স্থির বা অচঞ্চল থাকে, তখনই জানিবে যে, সে জাড্যমুক্ত হইয়াছে৮২।৮৩। নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নিরস্ত বাসনা হইলে চিত্ত না থাকার ন্যায় হয় অথচ অসীম স্বাত্মানন্দ স্থির প্রবাহে বহিতে থাকে। যোগিগণের সেই আনন্দসম্বিদ অসম্বিদ বলিয়া গণ্য৮৩।৮৪। তাদৃশ যোগী গমন আগমন শয়ন ও ভোজনাদি কার্য্য করিলেও বস্তুতঃ অজড় ও সংবেদন পরিত্যাগী বলিয়া গণ্য৮৬। হে গুণসাগর রাম! তুমি তাদৃশ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যত্ন নামক চেষ্টার দ্বারা দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হও। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সে বৃক্ষ কালক্রমে আকাশব্যাপী হয়, সেইরূপ, আপনার সঙ্কল্প হইতে মিথ্যাভূত অসংখ্য সংবেদ্য জন্ম গ্রহণ করে৮৭।৮৮। যখন দেখিবে, স্বাত্মসম্বিদ (চৈতন্য) স্বাত্ম-

পরিত্যাগী হইয়া (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থে অবগাহন করতঃ) সঙ্কল্পের দ্বারা আপনিই আপনাকে দেখিতেছে, (যাহা দেখিতেছে তাহা আত্মা হইলেও ভ্রান্তি বশতঃ আত্মা বলিয়া জানিতেছে না) তখনই জানিবে, অসভ্য জন্মবীজ জন্মিতেছে[৮৯]। হে রাঘব! অন্তর্গত সংবিদ্ ঐরূপে আপনিই আপনার জন্ম কল্পনা করতঃ আপনিই আপনাকে মুগ্ধ করতঃ কদাচিৎ কখন আপনার প্রযত্নে আপনার মোক্ষ সাধন করে[৯০]। ঐ সংবিদ্ যে ভাবে আপনাকে ভাবিত করে সেই ভাবই তাহাতে প্রকটিত হয় এবং সে অতি দীর্ঘ কালেও রাগাদি দোষ পরিত্যাগী হইয়া স্বরূপ স্থিতি লাভে সমর্থা হয় না[৯১]। সুর বল, অসুর বল, যক্ষ রাক্ষস কিন্নর অথবা নর বল, সমস্তই পরমাত্মার কল্পিত বেশ। পরমাত্মা বিলাসবতী মায়ার দ্বারা এই জগন্নাট্যে নৃত্য করিতেছেন[৯২]। কোষকার কীট যেমন আপনিই আপনাকে স্বকৃত কোষ মধ্যে বদ্ধ করতঃ দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করে, অবশেষে অসহ্য দুঃখের তাড়নায় কোষবন্ধন ছিন্ন করতঃ মুক্ত হয়, কেবল হয়, সেইরূপ, সংবিদ্রূপী চিদাত্মাও স্ব মায়ার বন্ধন ও তজ্জনিত দুঃখানুভব, তদন্তে মায়াবন্ধনের ছেদন, তৎপরে মোক্ষ বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন[৯৩]। সম্বিদ-ই জগৎ জলধির জল, সম্বিদই দিক্‌চক্র এবং সম্বিদই পর্ব্বতাদি ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। দিক্, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সরিৎ ও দিক্‌সকল সংবিদ্ সলিলের লহরী[৯৪।৯৫]। অধিক কি বলিব, সমুদায় জগৎ-ই সম্বিদ্ (চেতনার অনতিরিক্ত), এবম্বিধ সম্যক্ জ্ঞান ঐ সকল ভেদ জ্ঞানের নিবর্ত্তক[৯৬]। সম্বিদ যখন কোন কিছু গ্রহণ করে না, বিচলিত হয় না, আপনাতে আপনি স্থিতি করে, তখনই জানিবে, সম্বিদ বিশুদ্ধ হইয়াছে[৯৭]। হে রামচন্দ্র! যেমন সূর্য্যাদি তেজ হইতে প্রভা উদিত হয়, সেইরূপ, সন্মাত্রস্বভাব মূলীভূত সম্বিদ (মূল চেতনা বা আত্মচৈতন্য) হইতে প্রতিবিম্ব সম্বিদ উদিত হয় (মূলসংবিদ্ বা বিম্বসম্বিদ ব্রহ্ম, প্রতিবিম্ব সম্বিদ জীব)[৯৮]। উক্ত সম্বিদ দ্বয়ের সত্তা বস্তুতঃ এক হইলেও ব্যবহারে দ্বিবিধ। নানারূপ ও একরূপ। ঘটত্ব পটত্ব স্তম্ভ মত্ত্ব প্রভৃতি আকারে আকারিত সত্তাকে নানারূপ ও ঐ সকল বিভাগ ভাব পরিত্যাগ করিয়া একাত্মরূপী সত্তাকে একরূপ ও সত্তাসামান্য বলা যায়[৯৯।১০০]। ঐ সকল বিশেষ ভাব অর্থাৎ ভেদ ভাব পরিত্যক্ত হইলে

যে একরূপ সত্তা অবশেষিত হয় সেই একরূপ সত্তাই তৎপদ[১০২]। বস্তু-কল্পে সত্তার নানারূপ অসম্ভব, সেইজন্য নানারূপ অবস্তু অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপ পরিকল্পিত। সত্তার যে ঐকরূপ্য, (একরূপতা) তাহাই বিমল ও অবিনাশী[১০৩।১০৪]। সেই একরূপিণী সত্তাই কল্পনায় কালসত্তা, বস্তু-সত্তা ও বস্তুর স্বাংশসত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়। হে রঘুনাথ! তুমি ঐ সকল বিভাগ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া একরূপ সত্তায় অবস্থান কর। যদ্যপি কালসত্তাদি সত্তা কল্পনাবিহীন হইলে তাহা একরূপ সত্তাতেই অবশেষিত হয়, তথাপি, উহার বিভক্ত রূপ গুলি অবাস্তবী অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া জানিবে[১০৫।১০৬]। যাহাতে বিভাগ কল্পনা, তাহা বিভাগানুসারে বিভিন্ন ফলপ্রদ। যাহা বিভিন্ন ফলের দাতা তাহা কিরূপে পাবন হইবে[১০৭]? হে রাম। তুমি একরূপী সত্তাসামান্যে পরিভাবিত ও পূর্ণা-নন্দে বিরাজমান হও[১০৮]। ঘটসত্তা পটসত্তা প্রভৃতি সমুদায় বিশেষ বিশেষ সত্তা যে এক মূল সত্তায় প্রলীন হয় সেই মূল সত্তা এই সকল বিশেষ সত্তার বীজ। কল্পনা কলঙ্ক পরিত্যক্ত সেই বীজীভূত সত্তা এতদ্দর্শনের পরম পদ, এবং তাহাই অনাদি ও অনন্ত[১০৯।১১০]। সত্তা কি? না সতের সদ্ধর্ম্মতা অর্থাৎ সতের ধর্ম্ম। সতের ধর্ম্ম সত্তা যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহা অমুক পদার্থের ধর্ম্ম, তাহার ধর্ম্মী অমুক, এ বিভাগ যাহাতে নাই বা থাকে না, তাহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে পুরুষ (আত্মা) নির্দ্দুঃখ হয়। হে রাম! তাহাই সমুদায় বিশ্বের হেতু পরন্তু তাহার আর হেতু নাই। তাহাই সমস্ত পদার্থের সার, পরন্তু তাহার আর সার নাই[১১১।১১২]। যেমন কোন স্বচ্ছসলিল সরোবরের তীরস্থ বৃক্ষাদি তদীয় জলে প্রতিবিম্বিত হয় সেইরূপ সেই অসীম চিৎ রূপ দর্পণে এই সমুদায় দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রতিবিম্বিত হইতেছে[১১৩]। তাহা গুরু হইতেও গুরুতম, লঘু হইতেও লঘুতম, স্থূল হইতেও স্থূলতম, এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম[১১৪।১১৭]। শ্রুতি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকেপি" "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন এবং তাহাকেই তেজের তেজ, তমের তম, বস্তুর বস্তু, দিকের দিক্, ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা কিছু বটে এবং কিছু নাও বটে। তাহা অস্তিও বটে, নাস্তিও বটে। তাহা দৃশ্য বটে, অদৃশ্যও বটে[১১৮।১২০]। হে রঘুনাথ! তুমি চেষ্টা কর,

যত্ন কর, যাহাতে তুমি সেই পরম পাবন পদে স্থিতি লাভ করিতে পার।

সে পদ যার পর নাই মলশূন্য এবং তাহাই আত্মতত্ত্ব। তাহা পাইলে চিত্তের শান্তি হয় এবং চিত্তের শান্তি হইলেই মোক্ষ পদ প্রকটিত হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অচিরাৎ চিরকালের নিমিত্ত সেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হও[১২১।১২২]।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

—○(*)○—

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি সংসার লতিকার বীজ বর্ণনা করিলেন এবং তদ্বিনাশের উপায়ও উপদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—তন্মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা শীঘ্র তৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! আমি প্রথমে যে সকল দুঃখবীজ প্রশমনের উপায় বর্ণন করিয়াছি সেই গুলির প্রত্যেক্‌টীরই প্রয়োগে শীঘ্র তৎ পদ পাওয়া যাইতে পারে। অথবা সর্ব্ব শেষে যে উপদেশ করিয়াছি, তাহাও শীঘ্র তৎপদ প্রদ। অতএব, তুমি যদি শেষোক্ত উপায় অবলম্বন কর, অর্থাৎ সত্তাসামান্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিদ্রূপ মাত্রে চিত্তের স্থিতিপ্রবাহ উত্থাপিত করিতে পার, অর্থাৎ তন্ময়ী ভাবে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অচিরাৎ তৎপদ প্রাপ্ত হইতে পার[২।৪]। যদিও সত্তাসামান্যে স্থিত হইতে কিঞ্চিৎ প্রযত্নাধিক্যের প্রয়োজন হয় বটে; পরন্তু তদ্দ্বারাই শীঘ্র তৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[৫]। হে অনঘ! যদি তুমি সম্বিদ্‌তত্ত্বের ধ্যানে রত হও, তাহাতেও তৎ পদ পাওয়া যায়, পরন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক যত্নের আবশ্যক হইবে[৬]। কেননা সম্বেদ্য উপলক্ষ্যে যে সম্বিদের স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার ধ্যান অসম্ভব। অর্থাৎ কেবল সংবিদের ধ্যান অশক্য, সুতরাং সে পথ সুগম নহে। যদি তুমি বাসনা পরিত্যাগের যত্ন কর, তাহাতেও তোমার বাসনাক্ষয়ে তৎপদ লব্ধ হইতে পারে। হে রাম! অভিহিত উপায়ের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় নিতান্ত দুষ্কর, বরং সুমেরু উন্মূলন করা যায় ত বাসনা পরিত্যাগ করা যায় না[৭।১০]। মনোলয় ব্যতীত বাসনা বিনাশ অসম্ভব, আবার বাসনা ক্ষয় ব্যতীত মনোলয়·অসম্ভব। মনোলয় তত্ত্বজ্ঞান সাপেক্ষ, আবার তত্ত্বজ্ঞান চিত্তোপশম সাপেক্ষ। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়, এই তিনই নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে রাঘব! সেই কারণে আমরা বলিয়া থাকি, বিশেষ পুরুষকার ও বিশেষ বিবেক অবলম্বনে ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ

করতঃ ঐ তিন্ আসাদন করা কর্ত্তব্য[১১।১৫]। অভ্যাস যোগে একই সময়ে ঐ তিন্ সমাক্রান্ত না হইলে শত বর্ষেও তৎপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই[১৬]। হে মহাবুদ্ধিধর! উক্ত তিনের অভ্যাস একই প্রযত্নে ও একই সময়ে আবশ্যক। নচেৎ এক একটীর সেবা বা এক একটীর অভ্যাস চিরকালেও সিদ্ধিপ্রদ হয় না[১৭।১৮]। যেমন এক একটী সৈন্য লইয়া শত্রুর অভিমুখীন হওয়া যায় না, তেমনি ঐ তিনের এক একটীর দ্বারা পরমাত্মার অভিমুখীন হওয়া যায় না[১৯]। কিন্তু যদি বুদ্ধি বা যুক্তি সহকারে একই উদ্যোগে মিলিত বহু সৈন্যের পরিচালন করা যায় তাহা হইলে দুঃসাধ্য হইলেও শত্রু বধ সুসাধ্য হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্তে তত্ত্বজ্ঞানাদি ত্রয়ের যুগপৎ সাধনা, সিদ্ধি লাভের দুঃসাধ্যতা নিবারণ করিয়া সুসাধ্যতা উৎপাদন করে। ভাবিয়া দেখ, এক এক বিন্দু জলের কোনও সামর্থ্য নাই। কিন্তু মিলিত বহু জল অদ্রি ভেদ করিতেও সমর্থ। সেরূপ, উক্ত তিনের মীলনও সংসার অদ্রি ভেদ করিতে শক্ত। অতএব বৎস! রাম! যদি তুমি যত্ন সহকারে একই প্রযত্নে (উদ্যমে অর্থাৎ একই প্রবাহে) বাসনা নাশ, তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ, এই তিনের সেবা কর তাহা হইলে তোমার আর তাপ পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকিবে না[২০।২১]। ঐ তিন্ কিছু কাল অভ্যাস করিলেই অতি দৃঢ় হৃদ্‌গ্রন্থি ত্রুটিত (ছিন্ন) হইয়া যাইবে। হে রাম! য্যাহা শত শত জন্মের অভ্যস্ত, কিরূপে তাহা দু এক দিনের অভ্যাসে ত্রুটিত হইবে? কদাচ তাহা হইবে না। সেই জন্য বলিতেছি, বহুজন্মের অভ্যস্ত সংসার স্থিতির ভেদ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। অর্থাৎ ঐ তিন্ দীর্ঘকাল অভ্যাস যোগে আয়ত্ত করিতে পারিলে সংসার বিনাশ হইতে পারে[২২।২৩]। তুমিও শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত গমন আগমন ও অবস্থান কালে এবং দর্শন স্পর্শনাদি ব্যবহারে, তথা জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থায় ঐ তিনের অভ্যাস করিবে[২৪]। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, বাসনা পরিত্যাগের সহিত প্রাণ নিরোধ করাও শ্রেয়োলাভের উপায়। সেজন্য তুমি তাহাও করিবে। অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবে[২৫]। বাসনা পরিত্যাগে চিত্ত না থাকার ন্যায় হয় এবং প্রাণস্পন্দ নিরোধেও চিত্ত অচিত্ত হয়[২৬]। যোগাভ্যাস কুশল গুরুর উপদেশে ও যুক্তিতে প্রাণায়াম, আসন ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে প্রাণ

নিরোধ হয়[২৭]। তত্ত্বদর্শনতৎপরতার দ্বারা বাসনার অনুদ্রেক ও তৎ-প্রযুক্ত চিত্তলয় হয়। তত্ত্বদর্শন কথার অর্থ—প্রত্যেক্ বস্তুর নাম রূপাদি দৃশ্য ভাগ তাহা মিথ্যা, তাহার যে অস্তিত্ব ভাগ তাহাই সত্য, এতদ্রূপা দৃষ্টি বা অনুভব করা। অসঙ্গ ব্যবহার, ভবভাব বর্জ্জন, শরীরাদির নশ্বরতা দর্শন, এ সকলের দ্বারাও বাসনার বিনাশ ও চিত্তের অপ্রবর্ত্তন হইয়া থাকে[২৮।৩০]। প্রাণস্পন্দনের শান্তি হইলেও চিত্তের স্পন্দন (রূপাদি বিষয়ে চিত্তের ভ্রমণ) নিবারিত হয়। অতএব, প্রাণস্পন্দন জয়ের জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই কর্ত্তব্য[৩১।৩২]। বার বার বা পুনঃ পুনঃ একচিত্তে উপবেশন প্রভৃতির দ্বারা ও হঠযোগ অবলম্বন দ্বারা চিত্ত নিরোধ সাধিত হইতে পারে। হে রঘুনাথ! যেমন অঙ্কুশ ব্যতীত হস্তীকে বশীভূত করা যায় না, সেইরূপ, বিনা যুক্তিতে অর্থাৎ যোগ কৌশল ব্যতীত দুর্দ্দান্ত মন জয় করা যায় না। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ, সাধুসঙ্গ, বাসনা পরিত্যাগ, প্রাণ নিরোধ, এই চার প্রকার যুক্তি চিত্ত জয়ের উপায়[৩৩।৩৬]। যাহারা যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া বল পূর্ব্বক চিত্ত নিরোধ ইচ্ছা করে তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্তনিরোধ দূরে থাকুক, তৎ-কার্য্যের দ্বারা তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিনাশ প্রাপ্ত না হইলেও বিফলপ্রযত্ন হয়। তাহারা এক ক্লেশ হইতে অন্য ক্লেশ এবং এক ভয় হইতে অন্য ভয় প্রাপ্ত হয়[৩৭।৪০]। হীন জীবেরাই বৃথা ফল পল্লব ভোজন তৎপর হইয়া দুর্গম গিরিদুর্গাদিতে ভ্রমণ করে এবং অধীর মনুষ্যেরাও সিদ্ধি লাভার্থ বৃথা চেষ্টা করে[৪১]। যেমন গ্রামাগতা মৃগী সর্ব্বত্র ত্রাস যুক্তা হয়, সেইরূপ, যুক্তিযোগ বর্জ্জিত চিত্তও সর্ব্বথা (সর্ব্বত্র) ভীত হইয়া থাকে। তৃণ যেমন বায়ুবাহিত হইয়া নদী স্রোতে নিপ-তিত ও দূর দূরান্তরে অপবাহিত হয় সেইরূপ অজ্ঞ মনুষ্যেরাও যজ্ঞ দান তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণাদির স্রোতে বাহিত হইয়া বৃথা দেশ দেশা-ন্তরে পরিভ্রমণ করে। অনাত্মজ্ঞ জীব দীর্ঘকাল আধি ব্যাধি জড়িত হইয়া পশুর ন্যায় ক্লেশ ভোগ করে। যদি কদাচিৎ তাহাদের ভাগ্যো-দয় হয় তাহা হইলে তাহাদের আত্মবিজ্ঞান লাভ হইতে পারে বটে, পরন্ত বিঘ্ন বশাৎ না হইতেও পারে। তাদৃশ অনাত্মজ্ঞ জীব ঊর্দ্ধগতি কখন বা অধোগতি, প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কদাচিৎ স্বর্গ কদাচিৎ নরক ভোগ করে[৪২।৪৭]। হে রঘুনাথ! সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি দূর্দ্দৃষ্টি

পরিত্যাগ কর এবং বিশুদ্ধ সংবিদ্ অবলম্বী হইয়া বীতরাগ হও। যে জ্ঞানবান্, সে-ই সুখী, সে-ই জীবিত, এবং সে-ই বলবান্। অতএব তুমি জ্ঞানময় হও[৪৮।৪৯]।

হে মহাত্মন্! তুমি সংবেদ্যবর্জ্জিত, আদ্যন্তরহিত, সর্ব্বাদি, এক অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্ন সংবিদ্ পদ প্রাপ্ত হও। কল্পনা বর্জ্জিত হৃদয়ে অবস্থান কর। যদৃচ্ছাগত কার্য্যও কর পরন্তু তাহাতে কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইও না[৫০]।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

—০()*()০—

বশিষ্ঠ বলিলেন, জীব যদি অল্প বিচারও করে ও তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ চিত্ত নিগ্রহও হয়, তাহা হইলেও তাহার জন্ম সফল[১]। হৃদয়ে যদি বিচারের বীজ রোপিত হয় তাহা হইলে কালে অভ্যাসের দ্বারা তাহা শত শাখায় বিস্তীর্ণ হইতে পারে[২]। যে পুরুষ বৈরাগ্যপূর্ব্বক বিচারকারী হয়, অশেষ সদ্‌গুণ তাহাকে আশ্রয় করে[৩]। যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, বিচারনিষ্ঠ, সত্যদর্শী, অবিদ্যাবিভব তাহাকে অভিভূত করে না[৪]। বিষয় বল, মনোবৃত্তি বল, আধি ব্যাধি বল, সে সকল শুদ্ধবুদ্ধি সম্যক্‌দর্শীর কি করিতে পারে[৫]? কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, শিশুর মুষ্টিতে প্রলয় মেঘ সংগৃহীত হইয়াছে? কে কোথায় দেখিয়াছে, সুন্দরী ললনাগণ স্বনেত্র শোভার পরাভবাশঙ্কায় ইন্দীবর বিকাশক গগনমধ্যগত চন্দ্রকে মঞ্জুষাবদ্ধ করিয়াছে[৬।৭]? কে কোথায় দেখিয়াছে, মশক কর্ত্তৃক মদোন্মত্ত হস্তী বিমর্দ্দিত হইয়াছে[৮]? কে কোথায় দেখিয়াছে, হরিণ গণ সিংহকে পরাভূত করিয়াছে[৯]? কে কোথায় দেখিয়াছে, ভেকশিশু বিষোল্বণ অজগর গিলিয়াছে[১০]। ঐ সকল যেরূপ অসম্ভব, বিষয় ও ইন্দ্রিয়দস্যুকর্ত্তৃক যোগারূঢ় ও জ্ঞাতজ্ঞেয় বিবেকবান্ ব্যক্তির আক্রমণও সেইরূপ অসম্ভব[১১]। বিষয়শত্রুগণ অপ্রৌঢ়বিচারবুদ্ধি জনগণকেও হরণ করিতে পারে না[১২]। বিবেকাঙ্কুর অল্প একটু প্রবৃদ্ধ হইলে ঐ সকল দুরাশয় (রাগাদি) তাহাকে আর ভগ্ন করিতে পারে না[১৩]। চিন্তারূপিণী ঝটিকা সেই বিচার বৃক্ষ উৎপাটিত করে বটে পরন্তু যাহার মূল শিথিল থাকে। অপিচ, সে বিচার সফল হয় না, যাহা কদাচিৎ কখন একবার কৃত হয়[১৪]। কিন্তু যাহার চিত্ত স্থিতি গতি জাগ্রৎ স্বপ্ন, সর্ব্বক্ষণ বিচারময়, তাহার চিত্ত মৃতকল্প[১৫]। স্বয়ং অর্থাৎ একাকী হউক, আর সজ্জনগণের সহিত হউক, অধ্যাত্মদৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহা কি? জগৎ কি? দেহই বা কি? এই সকল বিষয়ের বিচার করিবেক। যেমন দীপালোক প্রয়োগে অন্ধকারগৃহস্থিত বস্তু দৃষ্ট হয় তেমনি অনাত্মান্ধকার

নাশক বিচার দ্বারা পরম পদ দৃষ্ট হয়[১৬।১৭]। যেমন ভানুর উদয়ে অন্ধকারের বিনাশ, তেমনি, জ্ঞানের উদয়ে সর্ব্বদুঃখের বিনাশ[১৮]। জ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞেয় আপনিই প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য পৃথক্ প্রযত্ন আবশ্যক হয় না[১৯]। যে বিচারে ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায় সেই বিচার শাস্ত্রীয় ভাষায় জ্ঞান নামে অভিহিত হয় এবং তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন[২০]। হে রঘুনাথ! বুধগণ বলেন, বিচারজনিত আত্মবিজ্ঞানই জ্ঞান, জ্ঞেয় উহার অন্তর্ভূত। মাধুর্য্য যেমন দুগ্ধেরই অন্তর্ভূত, সেইরূপ, জ্ঞেয়ও জ্ঞানের অন্তর্ভূত[২১]। সদা মদ্যপায়ীর চিত্ত সদা মদময়, তাহার ন্যায় সদা জ্ঞানীর চিত্ত সদা জ্ঞেয়ময়[২২]। স্বভাবতঃ নির্ম্মল জ্ঞেয় ব্রহ্ম, সেইজন্য জ্ঞানোৎপত্তি মাত্রেই তাহা আপনা আপনি নির্ম্মল হয়। তন্নৈর্ম্মল্যের জন্য পৃথক্ উপায় অবলম্বিত হয় না[২৩]। যে তাদৃশ জ্ঞানী, ব্রহ্মানন্দ যাহার অনুভূয়মান, সে আর অন্য কিছুতে নিমগ্ন হয় না। সে আসঙ্গ পরিত্যাগী, জীবন্মুক্ত ও রাজাধিরাজের ন্যায় পূর্ণকাম[২৪]। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বীণা বাদ্য, বংশীর নিঃস্বন, কামিনীর কান্ত গীত, ভ্রমরের গুণ গুণ ধ্বনি, বর্ষার মেঘ গর্জ্জন, ময়ূরের নৃত্য, সরোবরে সারসের রব, করতালের ও মৃদঙ্গের বাদ্য, এ সকলের কোনও কিছুতে রত হন না[২৫।২৯]। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিলাসময় উদ্যানে এমন কি নন্দন বনেও সন্তুষ্ট হন না। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানবান্ নর স্পর্শরতিতে অর্থাৎ ভোগেচ্ছার বশ্য নহেন এবং ভক্ষ্য ভোগেও সতৃষ্ণ ও স্ফীতচিত্ত নহেন[৩০।৩২]। খর্জ্জুর, তাল, রসাল, দ্রাক্ষা, মদিরা, মধু, মৈরেয়, মাধ্বিক, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, আমিক্ষা, নবনীত, ওদন, কটু তিক্তাদি রস, পেয় ও লেহ্য দ্রব্য, বিবিধ বিলাস দ্রব্য, বিবিধ ফল মূল শাক আমিষ, কোনও কিছুর প্রতীক্ষা রাখেন না। তিনি সর্ব্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি ও সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত মূর্ত্তি[৩৩।৩৫]। তত্ত্বজ্ঞ নর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের হুতাশন প্রভৃতির আলয়, মেরু, মন্দর, কৈলাস ও সহ্য প্রভৃতি গিরি, কল্পবৃক্ষের কুঞ্জ, দেহের শোভা, বত্নগৃহ, তিলোত্তমা উর্ব্বশী প্রভৃতির অঙ্গলতা, এ সকলের কিছুই বাঞ্ছা করেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি সর্ব্বত্র অসংসক্ত, তাঁহাদের মন শীতল ও পরিপূর্ণ স্বভাব, তাঁহারা শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি[৩৬।৩৯]। তাদৃশ নর কুন্দ মন্দার কহ্লার কুমুদ কমল পুন্নাগ কেতকী তগর জাতি কদম্ব চূত (আম্র মুকুল) কিংশুক জবা অতিমুক্ত (এক

প্রকার পুষ্প) সৌবীর বিম্ব (তেলাকুচার পক্ক ফল) পাটলা (এক প্রকার পুষ্প। গোলাপ ফুল) প্রভৃতি পুষ্পে ইচ্ছাবান্ হন না এবং চন্দন অগুরু কর্পূর এলা ও কস্তুরি প্রভৃতি সৌগন্ধ্যে আনন্দ অনুভব করেন না। সর্ব্বত্র সমভাব, নির্ব্বিকার ও অক্ষুব্ধ[৪২,৪৩]। তাঁহারা সমুদ্রের গর্জ্জন, গিরিগুহায় উদ্ভাবিত প্রতিধ্বনি ও সিংহ ব্যাঘ্রাদির গভীর নিনাদ, কিছুতেই ক্ষোভ প্রাপ্ত হন না। শত্রুর ভেরী, পটহের নিনাদ, ধনুকের টঙ্কার, অস্ত্র নিপাতনের নির্ঘোষ, এ সকলে ভীত হন না। হস্তীর বৃংহণ, ভূত প্রেতের লীলা, যক্ষ রাক্ষস পিশাচাদির ক্ষেড়া, অশনিনিঃস্বন, এ সকলেও তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হয় না। ক্রকচাস্ত্রের আকর্ষণ, চণ্ড প্রস্তরের নিষ্পেষণ ও শর নিকরের আক্রমণ তাঁহাদের হৃদয় বিকম্পিত করিতে পারে না[৪৪,৪৮]। উপবন প্রাপ্তে তাঁহাদের আনন্দও হয় না, খেদও জন্মে না এবং মরুভূমি প্রাপ্তে খেদও হয় না, আনন্দও হয় না[৪৯]। জলঃ জঙ্গল ও বালুকা প্রদেশ, পুষ্পাস্তরণ ও কোমল শষ্পসম্পন্ন (শষ্প=ঘাস) স্থান, ক্ষুরধার, কণ্টকব্যাপ্ত কূপ, উৎপলের শয্যা ও বন্ধুর (উচ্চ নীচ) ভূমি প্রভৃতিতেও রতি বা অরতি প্রাপ্ত হন না[৫০,৫১]। প্রতপ্ত ও কর্কশ প্রস্তর ও কোমলাঙ্গিনী ললনা, সম্পদ ও বিপদ, উগ্র ও রমণীয়, উৎসব ও ব্যসন, কোনও কিছুতে তাঁহারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা অন্তরে বিমুক্তমনা অথচ বাহিরে কর্ম্ম কর্ত্তা[৫২,৫৩]। সেই সকল ধীর পুরুষ লৌহযন্ত্রে, নরকে, বিজন অরণ্যে ও শর বর্ষণ প্রভৃতিতে ভীত হন না, বিবশ হন না, দীনতা প্রাপ্তও হন না। পর্ব্বত যেমন সম, স্বস্থ ও মৌনী থাকে, তদ্রূপ, তাঁহারা সর্ব্বভাবে সম স্বস্থ ও মৌনী থাকেন। তাঁহারা অপবিত্র, অপথ্য, বিষাক্ত, মলময়, মৃষ্ট নষ্ট ও ক্লিন্ন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন[৫৪,৫৬]। তাঁহাদের নিকট অতিতিক্ত বিল্ব ফল ও ক্ষীরাদি সমাস্বাদ। ইহাদিগকে মদ্য মধু ক্ষীর রক্ত মেদ বসা অস্থি তৃণ ও কেশ ভক্ষণ করাইলে হৃষ্ট বা কুপ্ত হন না[৫৭,৫৮]। ইহারা প্রাণ হর্ত্তা ও প্রাণ দাতা উভয়কেই সমান দেখেন[৫৯]। স্থায়ী অস্থায়ী শরীর ও রমণীয় অরমণীয় বস্তু লাভে ও অলাভে সমবুদ্ধি থাকেন, হৃষ্ট বা ম্লান হন না। যাহা বেদ্য তাহা তাঁহাদের বিদিত। তাঁহাদের চিত্ত নীরাগ, সেইজন্ম তাঁহারা জগৎ ব্যবস্থায় আস্থা শূন্য। তাঁহারা

কোনও সময়ে ও কোনও প্রসঙ্গে ইন্দ্রিয় দিগকে বিষয়রসাস্বাদনে অবসর দেন না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে, বিশ্রান্ত নহে ও আত্মলাভ করিতে পারে নাই, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদিগকেই গ্রাস করে[৬২।৬৩]। তাহারা ভব সমুদ্রের বাসনা স্রোতে অপবাহিত ও ইন্দ্রিয়রূপ জল জন্তু কর্ত্তৃক কবলিত ও রোদমান হয়[৬৪]। কল্পনার স্রোত বিচারশীল ও বিশ্রাম প্রাপ্ত ধীর পুরুষ দিগকে বহন বা আকর্ষণ করিতে পারে না। যাহারা সমুদায় সঙ্কল্পের সীমান্ত পরম পদে বিশ্রান্ত হইয়াছে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের নিকট সুমেরু তৃণ অপেক্ষাও লঘু ও তুচ্ছ। তাহাদের নিকট জগৎ তৃণাংশ, বিষ অমৃত এবং ক্ষণ কল্প ও কল্প ক্ষণ বলিয়া গণ্য[৬৫।৬৭]। ইঁহারা জানেন, অন্তঃস্থ সংবিদ্‌ই জগৎ। সেইজন্য তাঁহারা কোন কিছু পাইবার ইচ্ছা করেন না, ত্যাগেরও বাঞ্ছা করেন না[৬৮।৬৯]। হে অনঘ রামচন্দ্র! যখন সমস্তই সংবিদ্ ও ভ্রান্তির মহিমায় সংবেদ্যের অবভাস, তখন আর কোন্ অভ্রান্ত কি ত্যাগ বা কি গ্রহণ করিবে[৭০]? বলা বাহুল্য যে, অতীত বিষয়ে কাহার স্পৃহা হয় না, কেবল বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েই স্পৃহা হয়। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ অতীতের ন্যায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিস্পৃহ। কেননা তাঁহাদের দর্শনে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সমস্তই সংবিদের প্রথা (প্রকাশ)। যাহা ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহার, মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কি? তাহা বর্ত্তমানেও নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা, সম্বিদ্ বিভ্রম ভাব অভাবের অনুগামী হন না। হে রাম! তুমিও তাহাই স্থির করিয়া সম্বিদ্ মাত্র পরায়ণ হও[৭১।৭৩]। যে ব্যক্তি অন্তরে নিঃসঙ্গ, সে শরীরের দ্বারা মনের দ্বারা অথবা কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন প্রকার ক্রিয়া করুক বা না করুক, অলিপ্ত স্বভাবে অলিপ্ত থাকে[৭৪]। হে মহাবাহু রাম! জনগণ যেমন মনোরথ ক্রিয়ার ফলাফল ভাগী হয় না, (মনে মনে ঘর তৈয়ার করে, সে ঘরে যেমন বাস চলে না), তেমনি, সঙ্গবর্জ্জিত মনের কর্ম্মও তাহাকে স্বফলে লিপ্ত করে না। তিনি মনের অসঙ্গাবস্থায় শরীরকৃত কর্ম্মেও লিপ্ত হন না[৭৫।৭৬]। চক্ষুঃ প্রসারিত থাকিলেও বিনা সম্বন্ধে যেমন দর্শনজ্ঞান জন্মে না, এ রহস্য বালকেরাও আপন আপন অন্যমনস্কতার দ্বারা বুঝিতে সক্ষম, সেইরূপ, তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, ঘ্রাণ থাকিতেও তাহারা গন্ধ গ্রহণ করেন না, স্পর্শ করিয়াও

তদনুভবে সক্ষম হন না[৭৭,৭৯]। চিত্ত দেশান্তরে সমাসক্ত থাকিলে গৃহাবির্ভূত ঘটনা অনুভবগম্য হয় না, ইহা মূর্খেরাও বুঝিতে পারে[৮০]। সঙ্গই পদার্থ দর্শনের, সংসার বন্ধনের ও আশার কারণ[৮১]। সুতরাং সঙ্গ পরিত্যাগে মোক্ষ ও সঙ্গ পরিত্যাগে জন্মোচ্ছেদ। হে রামচন্দ্র! তুমিও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হও[৮২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! সঙ্গ কি? কীদৃশ? তাহা আমাকে বলুন[৮৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে মলিন বাসনা পদার্থের ভাবে হর্ষ ও অভাবে অমর্ষ উৎপাদন করে সেই বিশেষ বিশেষ বাসনার নাম সঙ্গ[৮৪]। যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের বাসনা হর্ষ বিষাদাদি জন্মায় না, সেজন্য তাঁহাদের তাহা শুদ্ধ ও পুনর্জ্জন্ম নিবারক[৮৫]। অসঙ্গ নাম্নী বাসনা যাবদ্দেহস্থায়িনী হইলেও তৎপ্রযুক্ত কর্ম্মের বন্ধন জনকতা নাই। যাহারা জীবন্মুক্ত নহে, পরন্তু মূঢ়চেতা, তাহাদেরই বাসনা (কর্ম্মসংস্কার) হর্ষ বিষাদাদির ও বন্ধনের হেতু হয়। সেইজন্য তাদৃশ বাসনা সঙ্গ নামে অভিহিত হয় এবং তাহারই দ্বারা পুনর্ব্বার দেহাদি জন্মে। অতএব হে রঘুনাথ! তুমি যদি বিকারপ্রদ সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অব্যগ্র অবস্থায় থাকিতে পার তাহা হইলে কোন কিছু করিলেও তজ্জনিত দোষে ও গুণে অলিপ্ত থাকিবে[৮৬,৮৯]। যদি তুমি হর্ষামর্ষ বিষাদের বশ্য না হও তাহা হইলে তুমি রাগ ভয় ক্রোধাদি বিমুক্ত ও অসঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে[৯০]। তুমি দুঃখেও ম্লান হইবে না, সুখেও হৃষ্ট হইবে না, আশার বশ্যও হইবে না। যদি তুমি ব্যবহার কার্য্যে অবস্থান করিয়াও সুখ ও দুঃখ উভয় দশায় সমান বা অকম্পিত থাকিতে পার তাহা হইলে বুঝিবে, তুমি অসঙ্গ হইয়াছ। সংবেদ্য সকল চিত্তেরই স্বভাব। এইরূপ জ্ঞান স্থির রাখিয়া যদি তুমি যথোপস্থিত কার্য্য করিতে পার তাহা হইলেও তুমি বুঝিবে, তাহাও অসঙ্গ হওয়ার লক্ষণ। হে অনঘ! তুমি অসঙ্গতা অনায়াস জীবন্মুক্তস্থিতি অবলম্বনে সম স্বস্থ ও সুখী হও। আর্য্যগণ জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ মৌনী ইন্দ্রিয়জয়ী ও মদ মান মাৎসর্য্যাদি বিহীন ও বিজ্বর হইয়া কাল কর্ত্তন করেন[৯১,৯৫]। জীবন্মুক্তেরা সম্মুখে ভোগ্য পদার্থ থাকিলেও স্পৃহা বা যাচ্ঞা করেন না। সে সকলের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দীনতাও অনুভব করেন না এবং স্বাশ্রমোচিত

কার্য্য ব্যতীত বৃথা কার্য্যও করেন না[৯৬]। অভিনিবেশ বা ফলাফলের আশায় কোন কিছু করেন না[৯৭]। আপদ হউক সম্পদ হউক, সকল অবস্থায় তাঁহারা সমান থাকেন, এবং স্ব স্বভাব (শান্তি দান্তি প্রভৃতি) পরিত্যাগ করেন না[৯৮]। তাঁহারা সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হউন আর ঘোর বিপদ দশা প্রাপ্ত হউন, প্রারব্ধ বশতঃ সরীসৃপাদি যোনি প্রাপ্ত হউন, আর ইন্দ্রত্ব লাভ করুন, ক্ষয়োদয় রহিত ও খেদাদি পরিশূন্য এক রূপেই থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা সেই সেই দশায় কোনও প্রকার বিকারের বশ্য হন না[৯৯]। তাঁহাদের আড়ম্বর থাকে না, ভেদ বুদ্ধি থাকে না, কর্ম্মফলের তারতম্য দর্শনও থাকে না। হে রামচন্দ্র! তুমিও সেইরূপ বিচারবান্ হও, যে বিচারে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারা যায়। বিচারের দ্বারা সমাধি লাভ, তজ্জনিত সর্ব্ববাসনাক্ষয়, তৎপ্রভাবে আপনার বিশুদ্ধ রূপ দর্শন, তদনন্তর অবিদ্যাতীত হওয়া, তৎসঙ্গে নির্দ্দুঃখতা লাভ ও নিরতিশয়ানন্দরূপী হওয়া, এ সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হও[১০০।১০১]।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

উপশমপ্রকরণ সম্পূর্ণ।

-o()o()o-

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ।

নির্ব্বাণপ্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, তুমি উপশম প্রকরণ শ্রবণ করিলে, অতঃপর কৈবল্যপ্রদ নির্ব্বাণ প্রকরণ শ্রবণ কর[১]। মুনিনায়ক বশিষ্ঠ যখন বাল্মীকি মহর্ষির নামোল্লেখ করতঃ উপরি উক্ত কথা বলিলেন, তখন বেলা অবসান প্রায় হইয়াছে। এখন সভার অবস্থা এইরূপ—

সভাগত রাজকুমার রাম একমন একচিত্তে বশিষ্ঠের উপদেশ শুনিতে ছেন, রাজা ও সামন্ত রাজা সকলেই ঋষিবাক্যে মনোনিবেশ করায় চিত্রিত মনুষ্যের ন্যায় নিষ্পন্দ রহিয়াছেন[২।৩]। শ্রোতৃবর্গ সকলেই বশিষ্ঠ-বাক্যের তাৎপর্য্য বিচারে তন্মনস্ক[৪], সকলেই নির্ব্বাক্ ও অঙ্গচালনা রহিত, সেজন্য সভাস্থলী নিঃশব্দ। পুরনারীগণও তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থিত, দিন-দেবতা সূর্য্য আকাশের শেষ সীমায় বিরাজিত, সভ্য সকল অল্প জ্ঞান ও অল্প উপশম-প্রাপ্ত[৫।৬], সততপ্রবাহী অনিলদেবও যেন বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণে শান্তি প্রাপ্ত। তত্রস্থ কুসুমস্রজে অবস্থিত ভ্রমরবৃন্দ যেন ধ্যানাবলম্বী ও মৌন। বিতানভূষণ মুক্তামালা সমূহ যেন সমধিক শোভা প্রাপ্ত। বহুতর সূর্য্যরশ্মি যেন তাপ ও শ্রান্তি বিনাশার্থে গবাক্ষ পথে সুরম্য ও সুশীতল শ্রবণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট। রাজাদিগের করে ও মস্তকে যে সকল ক্রীড়াপদ্ম স্থিতি করিতেছিল, তাহারাও যেন সুরস বশিষ্ঠ বাক্য শ্রবণে নিশ্চল ও নিষ্পন্দ[৭।১২] বালক, অজ্ঞ ও পিঞ্জরস্থ ক্রীড়াপক্ষী ব্যতীত অন্য কাহার মুখে শব্দ নাই, কেবল তাহারাই ভোজনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বধু-

লোক দিগকে আহ্বান করিতেছে। কুমুদবৃন্দ অল্পবিকাশোন্মুখ, তাহাতে ভ্রমরবৃন্দের গত্যাগতি ও গবাক্ষ পথে যেন ভয়াতুর সূর্য্যরশ্মির সমাগম হইয়াছে[১৩,১৪]। এই সময়ে দিবাবসান সূচক ভেরী পটহ শঙ্খ ও ঘণ্টাদির নিনাদ অতি গভীর শব্দে সমুত্থিত হইয়া শ্রবণ গৃহের অভ্যন্তর পরিপূরিত করিল[১৬]। যেমন মেঘনিঃস্বনে ময়ূরের রব অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ তুমুলতর ভেরী প্রভৃতির নিঃস্বনে বশিষ্ঠবাক্য অন্তর্হিত হইল। যেমন ভূকম্প কালে বনবৃক্ষ সকল বিকম্পিত হয়, সেইরূপ সেই বাদ্যকোলাহল কালে পিঞ্জরস্থ পালিত পক্ষিবৃন্দ সকল বিকম্পিত হইল[১৭,১৮]। শিশু সকল ভয়ে ও ত্রাসে ধাত্রী ক্রোড়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। রাজা দিগের শরীরশোভিনী কুসুম মালা হইতে ভ্রমরাবলী উড্ডীন হইতে লাগিল[১৯,২০]। ক্রমে বাদ্যকোলাহল বিনিবৃত্ত হইল, দিবাও অবসান প্রায় হইল, এবং রাজভবন অভিহিত প্রকারে ক্ষুভিত বা বিচলিত অর্থাৎ কোলাহলপূর্ণ হইল। মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ সভাভঙ্গ কাল উপস্থিত দেখিয়া প্রস্তাবিত কথার উপসংহার করিলেন এবং রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাম! আমি যে তোমার সম্মুখে বাগ্জাল বিস্তৃত করিলাম, ইহারই দ্বারা তুমি চিত্তপক্ষীকে বন্ধন অর্থাৎ স্ববশীভূত করিবে[২১,২৩]। তুমি ত আমার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছ? হংস যেমন নীরমিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীর মাত্র গ্রহণ করে সেইরূপ তুমিও মদ্বাক্যের অসার অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিয়াছ কি না[২৪]? তুমি বুদ্ধিযোগে মদুপদেশ সমূহ বিচারারূঢ় করতঃ মদুপদিষ্ট পথে বিচরণ করিবে[২৫]। হে রাঘব! তুমি যদি মদুপদিষ্ট বুদ্ধি অবলম্বনে ব্যবস্থার তৎপর হও তাহা হইলে বন্ধন প্রাপ্ত হইবে না, নচেৎ হস্তীর গর্ত্ত পতনের ন্যায় অধঃপতিত হইবে[২৬]। যদি তুমি মদীয় উপদেশ অবহেলা কর তাহা হইলে অন্ধকার রাত্রে দীপ পরিত্যাগীর অথবা অন্ধের গর্ত্ত পতনের ন্যায় নিরর্থে পতিত হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া যদৃচ্ছাগত ব্যবহার নির্ব্বাহ করিলে তাহা সিদ্ধিবিঘ্নকর হয় না। অতএব, তুমিও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুগামী ও উদারচেতা হইবে[২৭,২৮]। অহে সভ্যগণ! অহে রাজন্যবর্গ! তোমরা এক্ষণে সায়ংকালকর্ত্তব্য আহ্নিক কৃত্যাদির জন্য উদ্যুক্ত হও, কল্য প্রাতে প্রস্তাবিত কথার শেষাংশ বর্ণন করিব[২৯,৩০]।

বাল্মীকি বলিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ ঐরূপ কহিলে তৎক্ষণাৎ সভা ভঙ্গ হইল। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিবৃন্দকে অভিবাদনাদি করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবও বিশ্বামিত্র সহ স্বাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। দশরথ প্রভৃতি রাজা ও বিখ্যাত বিখ্যাত মুনি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বক্তৃপ্রবর বশিষ্ঠের অনুগমন করিলেন, পরে তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রাজগণ স্ব স্ব ভবনে ও মুনিগণ স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। রাজা দশরথ মহর্ষিগণ সহ বশিষ্ঠ চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক গৃহগামী হইলেন। রাম লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন এই তিন্ রাজকুমার গুরুদেব বশিষ্ঠের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাও গুরুচরণ বন্দনান্তে স্ব স্ব বাস ভবনে আগমন করিলেন[৩১।৩৭]। পরে স্নান, পূজা ও তর্পণাদি কার্য্য নির্ব্বাহের পর ব্রাহ্মণ অতিথি অভ্যাগত ও ভৃত্যদিগকে ভোজন করাইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে ভোজন করিলেন। ক্রমে দিবাকর অস্তগত ও রজনীর সহিত রজনীকর সমাগত হইল। রাজা, রাজপুত্র, মুনি, ইঁহারা সকলেই একান্তে ও একাগ্রচিত্তে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করতঃ বশিষ্ঠোক্ত সংসার উত্তরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন[৩৮।৪৭]। পরে প্রহর মাত্র নিদ্রাগত থাকিয়া পুনর্ব্বার বশিষ্ঠকথা শ্রবণার্থ উৎসাহযুক্ত হইতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন, ইঁহারা রাত্রের তিন্ প্রহর বশিষ্ঠোক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য চিন্তা করিলেন, পরে অর্দ্ধ প্রহর নিদ্রার দ্বারা শ্রম বিনাশ করতঃ পুনর্ব্বার বশিষ্ঠ কথা শ্রবণে ত্বরাবান্ হইতে লাগিলেন[৪৩।৪৪]

উক্ত প্রকারে সেই সকল সুচিন্ত শুভাশয় ও জ্ঞাতজ্ঞেয় বিবেকীদিগের দ্বারা অভিহিত ত্রিযামা (রাত্রি) অতিবাহিত হইল[৪৬]।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন, রাত্রি শেষ হওয়ায় ক্রমে নৈশ অন্ধকারের ক্ষয় ও চন্দ্রমণ্ডলের ধূসরতা উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয়ের সূচনা করিল। শিশিরকণবাহী প্রভাতবায়ু মন্দবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল১।৩। রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিন্ ভ্রাতা শয্যা ত্যাগ অন্তে কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া অনুচর সহ পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন।

এ দিকে বশিষ্ঠদেবও সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সভাগমনের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছেন। ক্রমে রামাদি কর্ত্তৃক বন্দিত ও রাজা রাজপুত্র মুনি ও ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গুরু বশিষ্ঠকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে সকল রাজা রাজপুত্র বশিষ্ঠাশ্রমে সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ভৃত্য, ও অনুজীবীগণ কর্ত্তৃক ও হস্তী অশ্ব পদাতিগণ কর্ত্তৃক সেই আশ্রমপদ পরিপূর্ণ হইয়াছিল৪।৬। মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ এক্ষণে সেই সকল সেনা ও জনবৃন্দ সহ দশরথ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথ কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া গুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করতঃ সভাগৃহের অনতিদূরস্থ পথে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে গুরুসমাগমে তিনি হৃষ্টতুষ্ট হইয়া গুরুচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সদ্ব্যবহার সমাপন করিয়া গুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন৭।৯। যে সকল শ্রোতা পূর্ব্বদিনে উপস্থিত ছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সকলেই একে একে সভাগত হইলেন। সভাপ্রবিষ্ট জনগণ প্রথমে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি সদ্ব্যবহার, তৎপরে যথানির্দ্দিষ্ট আসনাদি গ্রহণ করিলেন, অনন্তর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। সভা নিঃশব্দপ্রায় হইলে, বন্দীগণের স্তুতি পাঠ নিবৃত্ত হইলে, অর্করশ্মি গবাক্ষ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, শঙ্করের অভিমুখে কার্ত্তিকেয়ের, দেবগুরু বৃহস্পতির অভিমুখে কচের, শুক্রাচার্য্যের অভিমুখে প্রহ্লাদের ও বিষ্ণুর অভিমুখে গরুড়ের

স্থায় গুরু বশিষ্ঠের অভিমুখে রামচন্দ্র প্রথমতঃ দৃষ্টিপ্রার্থী হইলেন। রঘুবীর রাম গুরুদেবের মুখশোভার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিলে পর গুরু বশিষ্ঠ বাক্যতাৎপর্য্যজ্ঞ রামের উদ্দেশে ধীরে ধীরে কথাবর্ত্তার করিলেন অর্থাৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন[১০।১৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনন্দন! গত কল্য যে সকল গম্ভীরার্থ বাক্য বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ আছে ত? আজ্ আবার বোধজনক বাক্য বলিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে[১৯।২০]। বৈরাগ্যের অভ্যাস ও তত্ত্বের অববোধ এই দুএর দ্বারা সংসার সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সেইজন্য বলিতেছি, তুমি বৈরাগ্যাভ্যাসে যত্নবান্ হইবে। সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে অসম্যক্ বোধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বাসনার আবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত বা বিগলিত হইলে বিশোক পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়[২১।২২]। দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, পূর্ব্বাপর প্রান্ত দৃষ্ট হয় না, এরূপ এক ব্রহ্মই আছেন। তিনিই জগদ্ভাব প্রাপ্ত সুতরাং দ্বিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৩]। যাহাতে আত্যন্তিক বৃহত্ত্বরূপ ব্রহ্মভাব ব্যতিরিক্ত অন্য ভাব নাই, যাহা কোন ভাবে পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, যাহা শান্ত সমরস ও সমপ্রকাশ, তাহাতে অন্য ভাব থাকার সম্ভাবনা কি[২৩]? তুমি মনন দ্বারা ঐরূপ স্থির করিয়া অহং পরিত্যাগী ও জীবন্মুক্ত হও। তাহা হইলে তুমি একরূপ প্রশান্ত ও সাক্ষাৎ স্বাত্মসুখ প্রাপ্ত হইবে[২০]। হে রামভদ্র! চিত্ত, অবিদ্যা, মন, জীব, এ সকল বস্তুভূত নহে। ঐ সকল ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, অন্য কিছু নহে। ভোগ বল, ভোগ্য বল, ভোগকর্ত্তা বল, সমস্তই ব্রহ্ম। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ, আকাশ, তৃণ, সর্ব্বত্রই চিদ্রূপ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতেছেন[২৬।২৮]। হেয়, উপাদেয়, উপেক্ষ্য, এই সকল ভাব এবং বন্ধু বান্ধব বিভব ও শরীর প্রভৃতি যে কিছু ভাব, সে সমস্তই ব্রহ্মসমুদ্রের বিশেষ বিশেষ লহরী[২৯]। যাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের কার্য্য, যাবৎ পর্য্যন্ত অব্রহ্ম ভাবের অভিনিবেশ, যাবৎ পর্য্যন্ত জগতের প্রতি আস্থা বা আদর, তাবৎ পর্য্যন্ত চিত্তকল্পনার বিরাম নাই বা হয় না[৩০]। যাবৎ এই দেহে অহং জ্ঞান, যাবৎ দৃশ্যের সহিত আমি আমার এবম্বিধ সম্বন্ধের অধ্যাস, এবং যাবৎ আমার অমুক, ইত্যাকার ভাব অলুপ্ত থাকিবে, তাবৎ চিত্তে, মন জীব প্রভৃতি বিষয়ক ভ্রান্তি থাকিবেই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না[৩১]। সজ্জনসংসর্গ ব্যতীত উদারতার

অনুৎপত্তি থাকিবেই থাকিবে। অপিচ, মূর্খতার অবিনাশ প্রযুক্তই চিত্তে ব্রহ্মভাবের বৈপরীত্যে ক্ষুদ্র ভাব স্থিতি করে। ভুবন ভাব শিথিল বা বিগলিত ও তত্বজ্ঞান সামর্থ্যের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তাদি কল্পনা দুর্নিবার্য্য[৩২।৩৩]। অজ্ঞতা, জ্ঞানদৃষ্টির অভাব, বিষয়াকাঙ্ক্ষায় আত্মহারা, মূর্খতার দ্বারা মোহের বৃদ্ধি, আশাবিষে আমোদ, এ সকল থাকিতে চিত্তাদি ভ্রম বিনষ্ট হয় না। ভোগে অনাস্থা, আশাচ্ছেদ ও নির্ম্মল বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবিভ্রম অপগত হয়[৩৪।৩৬]। যে পুরুষ তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহার মন শান্তিগুণে ভরিত হইয়াছে, যাহার সংবিদ্ (জ্ঞান) চন্দ্রিকা অপেক্ষাও সুশীতল, সেই পুরুষেরই প্রবোধ সফল[৩৭]। যে ব্যক্তি দেহকে অনুপযুক্ত, দুরস্থ ও তুচ্ছ বলিয়া জানে, বিশ্বাস করে, চিত্ত সে ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত হয় না[৩৮]। যে ব্যক্তি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা অনন্ত চিত্তত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে এবং দৃশ্য জগৎ যাহার মনে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার "আমি জীব" এ বিভ্রম নিশ্চয়ই উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে[৩৯]। ঘৃত যেমন বহ্নিসম্পর্কে দ্রবীভূত হয় ও প্রজ্বলিত বহ্নিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তত্বজ্ঞানে মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ ও তৎপ্রযুক্ত চিত্তের ক্ষয় সংঘটন হয়[৪০।৪১]। যাহারা জীবন্মুক্ত, মহামনা, পরাবরদর্শী, তাহাদের যে চিত্ত, সে চিত্ত শাস্ত্রে সত্ত্ব আখ্যায় প্রসিদ্ধ। যেমন জল শুষ্ক হইলে বালুকাময় স্থানে জলের রেখা বা দাগ থাকে, সেইরূপ, জীবন্মুক্ত দিগের অন্তরে চিত্ত নাশের পর চিত্তের যৎসামান্য একটা আভাস বা সংস্কার থাকে, তাহাতেই তাঁহাদের দৈহিক ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। জীবন্মুক্ত দিগের শরীরে যে দগ্ধকল্প চিত্ত থাকে, সে চিত্তের নাম সত্ত্ব, তাহা চিত্ত নহে[৪২।৪৩]। তাদৃশ সত্ত্বে অবস্থিত তত্ত্বজ্ঞগণ ইহ সংসারে লীলা সহকারে বিচরণ করেন। সত্ত্বে অবস্থিত সংযতেন্দ্রিয় ও শান্তি প্রাপ্ত মহাপুরুষেরা অবিচ্ছেদে অর্থাৎ সর্ব্বদাই সেই নিত্য জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৪৪।৪৫]। সেই মননশীল মুনিরা স্বান্তঃস্থ চিৎ নামক বহ্নিতে এই জগদ্রূপ তৃণ নিক্ষেপ করেন বলিয়াই তাঁহাদের চিত্তাদিবিভ্রম লুপ্ত হয়[৪৬]। যেমন দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ, বিবেকপরিষ্কৃত সত্ত্ব নামক চিত্তেও মোহ ফল ফলে না[৪৭]। মূঢ় দিগের অন্তরে যে চিত্ত, সেই চিত্তই জন্ম মরণাদি ধর্ম্মে বিরাজ করে এবং সেই চিত্তই আবার

বোধ দ্বারা বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ চিত্ত জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে আর তাহা অঙ্কুরিত হয় না[৩৮।৩৯]। তৃণ যেমন অস্ত্রছিন্ন ও অগ্নিদগ্ধ হইলেও বীজশক্তি থাকায় পুনর্ব্বার তাহা হইতে অঙ্কুরিত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ, চিত্ত যদি পুত্র বিত্ত ধনাদি বিষয়ের আশায় বিদ্ধ থাকে তাহা হইলে সে চিত্তের প্ররোহ অনিবার্য্য[৪০]। মোহের দ্বারা ব্রহ্মই জগদাকারে বৃংহিত ও মোহের বিনাশে এই জগদ্ভাব ব্রহ্মভাবের অনতিরিক্ত হইয়া যায়। অতএব, ব্রহ্ম ও জগৎ এই দ্বিত্ব কল্পনা কল্পনামাত্র, বাস্তব নহে[৪১]। যেমন মরিচ তীক্ষ্ণতার অতিরিক্ত না হইলেও তাহাতে মরিচের তীক্ষ্ণতা, ইত্যাদি আকারের ভেদ ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয় সেইরূপ ত্রিজগৎ চিত্তের অতিরিক্ত না হইলেও ব্রহ্ম সৃষ্ট জগৎ, এইরূপ ভেদ ব্যবহার কৃত হইয়া থাকে। সৎ ও অসৎ, আছে ও নাই, এ ব্যবহার মোহের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শব্দ, অর্থ, তদুভয়ের (সঙ্কেত) বোধকবোধ্যভাব ও তাহার সংস্কার ব্যোমরূপী চিদাত্মায় সংলগ্ন নহে। তাই আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, তুমি সৎ অসৎ, আছে ও নাই, এ ভাব (কল্পনা) পরিত্যাগ কর[৪২।৪৩]। তুমি আমি, এ সকল ব্যবহার শরীরসম্পর্কেই উৎপন্ন হইতেছে। পরন্তু শরীর চিদ্বিপরীত জড়, সেজন্য শরীর স্বাত্মবস্তু নহে। সুতরাং যাহা আত্মা তাহাতে শরীরাদি জনিত শোক দুঃখের সম্ভাবনা নাই। আর যদি সমস্তই সদা চিন্ময়স্বভাব হয় তাহা হইলেও বিচার দ্বারা বিদিত হইবে যে, শোক দুঃখ কেবল মোহেরই কল্পনা। অন্য কিছু নহে। বিচারে আরও বিদিত হওয়া যায় যে, চিদাত্মা নিরবয়ব, নিরংশ ও পারাবার বর্জ্জিত। হে রাঘব! তুমি তোমার স্বরূপ স্মরণ কর, বিস্মৃত হইও না[৪৪।৪৫]। তুমি চিৎ, শান্ত, ও ব্রহ্ম। তুমি আপনাকে পূর্ণ আত্মসত্তায় পরিভাবিত কর। প্রকৃত পক্ষে তুমি নানা নহ, কিন্তু এক। যাহা অলীক নামে প্রসিদ্ধ, তাহা অসৎ। তুমি তাহা নহ। তুমি সম্পূর্ণ, স্বস্থ ও চিদ্‌ঘন[৪৭।৪৯]।

হে রামচন্দ্র! তোমার আদি অন্ত মধ্য, কিছুই নাই। তুমি অন্তরে বাহিরে নিবিড়িত চিৎ। স্ফটিক যেমন অন্তরে বাহিরে স্ফটিক ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ তুমিও বাহিরে অন্তরে চিদ্ ব্যতীত অন্য কিছু নহ। সুতরাং দুঃখাদি বিকার তোমাতে হয় না, যাহা বিকারী

মন, তাহাতেই তাহা হয় ও বিরাজিত থাকে। তোমার অতিবিস্তীর্ণ চৈতন্যের উদরে এই মায়ার রেখা অর্থাৎ নিখিল জগৎ প্রকাশ পাই-তেছে। হে রঘুনাথ! এতাদৃক্‌রূপী তোমাকে আমারও নমস্কার৮০।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যেমন, বুদ্বুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতির আস্পদ সমুদ্র, তাহা যেমন কেবল জল, সেইরূপ, অসংখ্য জগতের আস্পদ যে চিৎ-সামান্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিৎ, সেই নির্ব্বিশেষ চিৎ-ই তুমি[১], ইহা দ্বৈত ভাব পরিত্যাগ দ্বারা সম্ভাবিত হয়[২]। এই জীব, আমি জীব, ইহা জগৎ, এ সকল কল্পনাও চিৎ সমুদ্র হইতে ফেনাদির ন্যায় উত্থিত; সে জন্য চিৎ হইতে অপৃথক্[৩]। হে সৌম্যদর্শন! চিৎ সমুদ্র যার পর নাই গভীর ও মহামহা তরঙ্গ যুক্ত! তুমি সেই চিন্মহাসমুদ্রের ঊর্ম্মি। উষ্ণতা যেমন অনল হইতে পৃথক্ নহে, সৌগন্ধ যেমন পদ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কৃষ্ণতা যেমন কজ্জল হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে, শুভ্রতা যেমন হিমপিণ্ড ছাড়া নহে, মধুরতা যেমন ইক্ষু হইতে স্বতন্ত্র নহে, আলোক যেমন প্রকাশের অনতিরিক্ত, লহরী যেমন জল হইতে অপৃথক্, সেইরূপ, অনুভূতিপদবাচ্য বুদ্ধিপ্রকাশও চিৎ হইতে অপৃথক্ সুতরাং জগৎ চিৎ হইতে অপৃথক্[৫।৬]। যাহাকে অনুভূতি ও অনুভব বলা যায়, তাহা বিভিন্ন নহে। যাহাকে অহং বা আমি বলিতেছি, তাহা অনুভব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যাহাকে অহং বা আমি বলি, তাহা জীব ভিন্ন নহে এবং জীবও মন বৈ অন্য পদার্থ নহে[৭]। এইরূপ, মনঃও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে, দেহও ইন্দ্রিয় ছাড়া নহে, এবং শরীরও জগৎ ছাড়া নহে। প্রদর্শিত ক্রম দীর্ঘকাল প্রবর্ত্তিত বটে, আবার অপ্রবর্ত্তিতও বটে। আকাশে আকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, সেইরূপ, ব্যোমবৎ দুজ্ঞের্য়তত্ত্ব চিত্তত্ত্বেও চিৎ বৈ অন্য কিছু নাই। ভ্রান্তির দ্বারা আকাশে মেঘাদির স্থিতি প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, মহাচিৎসমুদ্রেও ভ্রান্তির দ্বারা জগতের স্থিতি প্রতীয়মান হইতেছে[৮।১০]। জগতের স্থিতি এইরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে যে, শূন্যে শূন্যেরই স্ফীতি, ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই বৃদ্ধি, সত্যে সত্যেরই বিজৃম্ভণ, এবং পূর্ণে পূর্ণেরই অবস্থিতি। ইহার ভাবার্থ—জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ ও অনধিক[১১]। যে ব্যক্তি অভিহিত রহস্য জানে, সেই তত্ত্বজ্ঞ অন্তরে

বাহিরে কোন কিছু করিয়াও করে না। অর্থাৎ তিনি অকর্ত্তা[১২]। উপাদেয় বুদ্ধিতে বিষয় গ্রহণ করিলেই তাহা সুখ দুঃখের কারণ হয়, অন্যথা তাহা কোন কিছুর কারণ হয় না। যেমন একই আকাশে নানা আকারের শব্দ জন্মে এবং সে সমস্ত শব্দও আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশস্বরূপ, তেমনি, একই ব্রহ্মে এই নানা আকারের বিশ্ব প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং বিশ্বও ব্রহ্মাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। আশ্চর্য্য এই যে, নানা আকার সম্পন্ন এই জগৎ বাহিরে অথচ ইহার অন্তরে নির্ম্মল ব্যোম। হে রামচন্দ্র! যে অতিশয় শত্রু, বধ করিতে উদ্যত, যে ব্যক্তি তাহাকে পরম মিত্র বলিয়া জানে সে-ই ব্যক্তিকেই তুমি জ্ঞানী বলিয়া জানিবে[১৩।১৬]। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, সেই ব্যক্তিতে হর্ষ অমর্ষ বিষাদ কিছুই নাই। নদী যেমন স্বকীয় তটে স্থিত বৃক্ষাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে সেইরূপ পূর্ব্বোক্তবিধ জ্ঞানও হর্ষ অমর্ষ বিষাদের মূল (অজ্ঞান) বিনষ্ট করিয়া আপন আধারকে কৃতকৃত্য করে। যে সাধু রাগ. দ্বেষ ও বিকার এ সকলের স্বরূপ চিন্তা না করে সে সাধু হইয়াও অসাধু। অর্থাৎ তাহার সংসঙ্গের ফল ফলিত হয় নাই। যাহার অন্তরে অহং নাই, যাহার বুদ্ধি বিষয়ে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কোনও কিছুতে অভিসংহিত হয় না, সে যদি এ সমস্ত লোক বিনাশ করে তথাপি তাহার লোকবিনাশজনিত দুরদৃষ্ট জন্মে না। সে জন্য সে বদ্ধও হয় না[১৭।১৯]। যাহা নাই তাহা প্রতীতিগোচর হওয়ার নাম মায়া। এই মায়া জ্ঞাননাশ্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে থাকে না[২০]। যেমন দীপ তৈলহীন অবস্থায় উপশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি, জ্ঞানীর অন্তরও (চিত্তও) বাসনাশূন্য অবস্থায় উপশম প্রাপ্ত হয়। অতএব, বাসনা জয়ী শান্ত পুরুষেরই জয়, অন্যের নহে[২১]। এই সকল দৃশ্য যে মহাপুরুষের নিকট সৎ অথবা অসৎ বলিয়া গণ্য হয় না, সুতরাং, হেয় অথবা উপাদেয় বলিয়াও বিবেচিত হয় না, ইহ সংসারে সেই মহাপুরুষই জীবিত, এবং সেই মহাপুরুষই মুক্ত[২২]।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

—◡()*()◡—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই সেই এক মাত্র চিতের প্রকাশ। কেননা, চিৎ-ই আপনার সত্তা (অস্তিতা) ঐ সকলে অর্পণ করিতেছে। অর্থাৎ চিতের অস্তিতাতেই ঐ সকলের অস্তিতা, উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিতা নাই[১।২]। যেমন অন্ধকার ক্ষয়ে অন্ধতার অভাব, তেমনি, ভোগতৃষ্ণারূপ বিষের বিনাশে আত্মাজ্ঞানের অভাব সংঘটন হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্ররূপ মহামন্ত্রের দ্বারাই তৃষ্ণা বিষ বিনষ্ট হয়, অন্য কিছুতে হয় না[৩।৪]। হে রাম! তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, মূর্খতা বিনষ্ট হইলে চিত্তও সপরিবারে বিনষ্ট হয়[৫]। চিত্ত যদি অচিত্ত হয় তাহা হইলে বাসনা নামক ভ্রমও বিনষ্ট হয়[৬]। হে রঘুনাথ! যাহারা আত্মদৃষ্টির বৈপরীত্যে শাস্ত্রার্থ চিন্তন করে, অর্থাৎ অভিহিত বেদান্তরহস্যে অবিশ্বস্ত হয়, তাহারাই কৃমি-কীটাদি যোনি প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তের সহিত মিলিত হয়[৭]। হে রাঘব! যেমন বায়ুর শান্তিতে সরোবরের চঞ্চলতা উপশান্ত হয়, সেইরূপ, মূর্খতার শান্তিতে দুর্বুদ্ধিকল্পিত স্ত্র্যাদিশরীরের রম্যতাও উপশান্ত হয়[৮]।

রঘুনাথ! তুমি ভাব অভাবের অতীত, স্থিরতা প্রাপ্ত ও অতি বিস্তৃত পরম পদে আকাশে বায়ুর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ[৯]। আমার মনে হইতেছে, যেমন কোন সুপ্ত রাজা পটহ শব্দে প্রবুদ্ধ হয়, সেইরূপ, তুমিও আমার উপদেশ বাক্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। না হইবেই বা কেন? যখন কুলগুরুর বাক্যে সামান্য লোকের চিত্তও বিগলিত হয়, তখন আর উদারমতি তোমার চিত্ত যে বিগলিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি[১০।১১]? যে হেতু তুমি মদ্বাক্যে বিশ্বস্ত, সেই হেতু আমার উপদেশ তোমার হৃদয়গামী হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছে। হে মহানুভব! আমরা ইক্ষাকু বংশের, বিশেষতঃ রঘুকুলের গুরু, হিতো-

পদেষ্টা, তুমিও রঘুকুলে উৎপন্ন, সে জন্য তুমি অবশ্যই মদ্বাক্য হারের ন্যায় সাদরে হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) ধারণ করিয়াছ[১২।১৩]।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

——(*)——

রঘুনাথ রাম বলিলেন, হে নাথ! আপনার বাক্যে আমার অহন্তা বিদূরিত হইয়াছে। আমিও এখন চিন্ময় হইয়াছি। এই যে জগজ্জাল, ইহা এখন আমার নিকট হইতে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে[১]। আমি এখন পরমাত্মায় যৎপরোনাস্তি নির্বৃতি প্রাপ্ত। আমি শীতল, সুখী, শান্ত ও প্রসন্নাকার। হে মুনে! সমস্ত দিক্ এখন আমার নিকট প্রসন্নাকার, এবং আমি এখন এই দৃশ্য বিশ্বের তত্ত্ব সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিতেছি[২।৪]। আমি এখন সন্দেহশূন্য, আমার আশানাম্নী মৃগতৃষ্ণিকা এখন উপশম প্রাপ্ত, অনুরঞ্জনা এখন রাগনির্ম্মুক্ত, অর্থাৎ বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা পরিমার্জ্জিত, এবং আমি এখন শরৎ কালের ন্যায় শীতল। আমি এখন অসীম আত্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নিকট রসায়নের অমৃতের আস্বাদ তুচ্ছ[৫।৬]। আমি এখন নির্ব্বিকার, স্বস্থ, মুদিত ও কেবল রাম নহি কিন্তু লোকারাম (সমুদায় জীবের রমণ স্থান অর্থাৎ পরমাত্মা)। হে প্রভো! এখন আমাকে ও আপনাকে নমস্কার[৭]। পূর্ব্বের সেই সেই সংশয় ও কল্পনা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে[৮]। আমার মন এখন অতিনির্ম্মল, অতিবিস্তৃত ও হিম অপেক্ষাও শীতল হৃদয়ে নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে[৯]। আমাতে অজ্ঞান কলঙ্ক ও চেত্যদর্শন কোথা হইতে আসিবে? সমস্তই আত্মা, সর্ব্বত্রই আত্মা, এবং তিনিই এখন সর্ব্বাকারে স্ফুরিত হইতেছেন। অতএব, ইহা, তাহা, ইত্যাদি ব্যবহার কল্পনা ব্যতীত বাস্তব নহে[১০।১১]। এখন আমি বিকাশবান্ অন্তরাত্মা ও ক্ষুৎপিপাসাদির অতীত। অহো! কি আশ্চর্য্য! আমিই যে এই সমস্তই ইহা আমি এতকাল বিস্মৃত ছিলাম,

আজ্ তাহা স্মৃতিগম্য হইতেছে। অহো! আজ্ আমি অতিবিস্তৃত পরম পবিত্র পদে আরোহণ করিয়াছি। যাঁহারা এ পদে স্থিত তাঁহাদের নিকট চন্দ্র সূর্য্য ও স্বর্গও পাতাল। অর্থাৎ এ পদ এত উচ্চ যে ইহার উচ্চতার তুলনা নাই[১২,১৪]। যে আমি আজ্ ভাবাভাব পরিপূর্ণ সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ ও পরমা সত্তা প্রাপ্ত, যে আমি আজ্ আপনিই আপনাতে জয়যুক্ত, সেই নমস্য আমাকে আমার নমস্কার[১৫]।

হে নাথ! হে প্রভো! আপনার উৎকৃষ্ট বাক্যোপদেশে আজ্ আমি শোক মোহের অতীত নিত্যানন্দ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি[১৬]।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে পরম শ্রেয়োজনক মহাবাক্য সকল বলিব, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমারই হিতের জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। যদিও এক বৈ দুই নাই, অর্থাৎ দ্বৈত মিথ্যা ও অদ্বৈতই পরমার্থ, তথাপি তোমার জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি দ্বৈত অবলম্বনে তোমাকে উপদেশ করিব। দ্বৈতাবলম্বন ব্যতীত উপদেশ সম্ভব হয় না। যাহারা পূর্ণ প্রবুদ্ধ নহে, তাহাদের পক্ষে ভেদাশ্রয়ী উপদেশ বিশেষ উপকারক[১,২]। হে রামচন্দ্র! তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, যাহারই দেহে অহং-ভাবনা উদিত হয়, ইন্দ্রিয় শত্রু তাহাকেই অভিভব করে। এবং যে জ্ঞানী সত্য আত্মায় অবস্থিত, ইন্দ্রিয়গণ কদাচ তাহার শত্রু হয় না[৩,৪]। যে ব্যক্তি ভোগ্য পদার্থের ব্যবহার করে পরন্তু সর্ব্বদাই সে সকলে দোষদর্শী হয়, সে ব্যক্তির বিষয়ে উত্তমতা বুদ্ধি থাকে না। সে জন্য তাহার দেহ থাকিলেও তদুপলক্ষ্যে কোনও প্রকার দুঃখ অনুভূত হয় না[৫]। আত্মা শরীরের কেহ নহে, এবং শরীরও আত্মার কেহ নহে। যেমন আলোক

ও অন্ধকার অত্যন্ত বিভিন্ন সেইরূপ আত্মা ও দেহ অত্যন্ত বিভিন্ন[৬]। সমুদায় জন্য বস্তু ছয় প্রকার বিকারে * অন্বিত, সে সকল বিকার আত্মায় লিপ্ত নহে। তাঁহার উদয় অস্ত নাই, তিনি সদা উদিত[৭]। জড়, অজ্ঞ, তুচ্ছ, কৃতঘ্ন, ও বিনাশী শরীররূপ উপলের যাহা হয় হউক, তাহাতে আত্মার কি[৮]? এমন মনে করিও না যে, দেহও চেতনাবান্, জড় নহে। কেননা চেতনার দ্বারাই জড় জানা যায়, সেজন্য দেহ ও আত্মা উভয় চেতন নহে। সুখ দুঃখ আপাততঃ উভয়ত্র দৃষ্ট হইলেও বুঝিতে হইবে তাহা একের সহিত অপরের সে সম্বন্ধ অধ্যাসমূলক। লৌহ যেমন বহ্নিতাদাত্ম্য প্রাপ্তে উষ্ণতাদি গুণ যুক্ত হয়, সেইরূপ, সুখ দুঃখাতীত আত্মাও দেহতাদাত্ম্য প্রাপ্তে সুখ দুঃখ ভাগী হইতেছেন। অতএব, আত্মা যদি দেহাধ্যাস হইতে বিমুক্ত হন তাহা হইলে তখন তাঁহার সুখ দুঃখের প্রসক্তি থাকে না। অপর বিবেচ্য এই যে, যার পর নাই সূক্ষ্ম ও অসঙ্গস্বভাব আত্মার স্থূলতম দেহের সহিত বাস্তব ঐক্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই[৯।১১]। যেমন দিন ও রাত্রি এই দুএর একের বিদ্যমানে অপর অবিদ্যমান, সেইরূপ, জ্ঞান অজ্ঞান, এ দুএরও একের উদয় কালে অপরের অস্ত অনিবার্য্য। অপিচ, যেমন ছায়া আতপপ্রাপ্ত হয় না সেইরূপ জ্ঞানও অজ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না[১২]। ব্রহ্ম সৎ, তিনি কস্মিন্ কালেও অসৎ হন না[১৩]। পদ্ম জলে থাকিলেও জলে অলিপ্ত, সেই-রূপ, ব্রহ্ম দেহে থাকিলেও দেহধর্ম্মে অলিপ্ত[১৪]। বায়ু আকাশে মিশিয়া থাকে পরন্তু নির্লেপস্বভাব আকাশ বায়ুজনিত শোষ কম্পন ও সমু-ড্ডীন ধূলি প্রভৃতির দ্বারা অলিপ্ত থাকে। এইরূপ আত্মাও দেহসংসর্গে থাকেন, অথচ জন্ম জরা মরণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দেহ ধর্ম্মে অস্পৃষ্ট থাকেন[১৫]। অতএব হে রাম! এই আত্মায় অল্পমাত্রও দেহধর্ম্ম নাই, ইহা জানিয়া তুমি নির্বৃত হও। জলে যেমন লহরী ও বুদ্বুদ, সেইরূপ ব্রহ্মেই ভ্রান্তিময় জন্ম জরা ও মরণ। দেহাদি পদার্থের স্বাধীন অস্তিতা নাই, সমস্তই আত্মার অস্তিতায় অস্তি হইতেছে[১৬।১৭]। জল যেমন আপনারই সত্তায় তরঙ্গ ভাব প্রাপ্ত হয়, প্রতিবিম্ব যেমন বিম্বের

---

* সামান্যাকারে থাকা, বিশেষাকারে উৎপন্ন হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া, বিকৃত বা রূপান্তর প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষয় ও বিনষ্ট হওয়া। এই ষড়্‌বিধ বিকার জন্মবান্ পদার্থ মাত্রেই আছে।

কম্পনে কম্পিতপ্রায় হয়, সেইরূপ, দেহের সংক্ষোভে অত্রস্থ চিদাভাসের সংক্ষোভ ও তদনুযায়ী চিদাত্মায় সুখ দুঃখাদি উদিত হইয়া থাকে, এ ভ্রান্তিও সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে নিবারিত হইয়া থাকে[১৮,১৯]। চিদাত্মার সত্যতা ও চিদাভাসাদির মিথ্যাত্ব যথাবৎ বিদিত হইলেই তদ্বিধ দ্বৈতভ্রান্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। অন্যথা ইহার (ভ্রান্তির) বৃদ্ধি ব্যতীত উপশম হয় না। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ নহে তাহাদেরই দেহের আবর্ত্তন পরাবর্ত্তন প্রভৃতি হয় অন্যের নহে। এই যে মোহরূপ অর্জ্জুন বৃক্ষ (এক প্রকার বন্য বৃক্ষ), ইহার স্থিতি ও স্ফূর্ত্তি অন্তঃসারবর্জ্জিত ও কেবল অবিচারমুলক[২০,২২]। জড়বুদ্ধি জীব তৃণের ন্যায় বৃথা স্পন্দিত (পর কর্ত্তৃক চালিত) হয়। বস্তুতঃ তাহারা অজড় হইয়াও জড় এবং জড় হইলেও তাহারা প্রাণাদি বায়ুর প্রভাবে সঞ্চরণ করে অর্থাৎ তৃণ কাষ্ঠাদি আহরণ পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে[২৩]। এই সকল জড় শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতিতে আঢ্য, চঞ্চলাঙ্গ, ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত[২৪,২৫]। ইহারা আহার বিহার ও গত্যাগতি করে। এই সকল জড় জীব অজ্ঞানের বশে যার পর নাই দীনতা প্রাপ্ত। ইহারা ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে[২৬,২৭]। ইহারা আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করে পরন্তু তাহাও বৃথা[২৮]। চিদাত্মবিষয়ক বোধ বর্জ্জিত এই সকল জড় জীব অরণ্যতরুর ন্যায় ফল লাভ বর্জ্জিত। তপ্ত শিলায় ও ছিন্নশাখ বৃক্ষের তলে এই দুই স্থানে বিশ্রাম যেরূপ, ইহাদের সাংসারিক বিশ্রামও সেইরূপ। অর্থাৎ সংসারে বিশ্রাম বিশ্রাম নহে[২৯,৩০]। ইহারা যে কিছু করে সেই সমস্তই ব্যোমরূপ দণ্ডের দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং ইহারা যে দান করে সে দানও কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত করার অনুরূপ হয়[৩১]। ইহাদের সহিত যে কথোপকথন, তাহাও কুক্কুরাহ্বানের তুল্য। অর্থাৎ ইহাদের সহিত তত্ত্ব কথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। একমাত্র অজ্ঞানই সমুদায় আপদের আস্পদ সেজন্য অজ্ঞানীরাই বিবিধ আপদ্দশা প্রাপ্ত হয়[৩২]। অজ্ঞেরাই এই সংসার রূপ পথের পথিক, অজ্ঞেরাই অত্রত্য সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং সে সকল অজ্ঞ দিগের নিকট অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়[৩৩]। যাহারা শরীর ধন ও দারা প্রভৃতিতে আস্থা বন্ধন করিয়া আছে তাহারাই পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের বশীভূত হয়[৩৪]। অতি শঠ (অবিশ্বস্ত) অনাত্মদেহে যাহাদের আত্মভাব তাদৃশ অজ্ঞ জনের অভিহিত

প্রকারের দুঃখ নিচয় কদাচ উপশম প্রাপ্ত হয় না[৩৫]। মায়া কি? মায়া অসদ্বোধময়ী। সুতরাং যাহার দুর্ম্মতি বা দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের সম্বন্ধে মায়ার বিনাশ অসম্ভব[৩৬]। চক্ষু আছে, দেখিতে পায়, অথচ তাহারা পদে পদে অবস্তুতে লুণ্ঠিত হয়। তাহাদের সম্বন্ধে চন্দ্রও বিষ উৎপাদন করে[৩৭]। জল বা দুগ্ধও কণ্টক জন্মায়। যেমন কর্ষণ শোষিত ভূমিতে শালি ধান্য উত্তমরূপ জন্মে সেইরূপ অজ্ঞের সম্বন্ধে দিক্ সকল দেহরূপ শাল্মলিবৃক্ষের কোটরে মনোরূপ সর্প উৎপাদন করে। হে ধীর! অজ্ঞানই দুষ্কৃতরূপ সর্পে পরিবেষ্টিত নরক[৩৮।৩৯]। নারীরূপিণী বিষবল্লী মূর্খদিগের জন্যই পুষ্পিতা হয়, বিজ্ঞ দিগের জন্য নহে। উক্ত বিষবল্লীতে অতি চপল নেত্ররূপ ভ্রমর ও অধররূপ নবপল্লব মূর্খদিগের দৃষ্টিতে শোভমান বলিয়া নিপতিত হয়। অজ্ঞ দিগের মনোরূপ ভূমিতেই উক্ত বিষবল্লী আত্মলাভ করে, বিজ্ঞ দিগের মনোভূমিতে নহে। অজ্ঞ দিগের হৃদয়রূপ মরুভূমিতে দ্বেষরূপ দাবানল উৎপন্ন হইয়া শরীররূপ বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে। অজ্ঞ দিগের মনোরূপ সরোবর মাৎসর্য্য জলে পরিপূর্ণ। তাহাতে ঈর্ষ্যা কমলিনী ও চিন্তা ষট্পদ সর্ব্বদা বিরাজমান। মরণরূপ বাড়বাগ্নি অজ্ঞরূপ জলময় সমুদ্রকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে। জন্মের পর বাল্য, বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর জরা, তৎপরে পুনর্ম্মরণ, এ সকল মূঢ় জীবেরই প্রাপ্য। এই জগৎ একটী পুরাতন কূপ, সংসার ইহার জলোত্তলনের যন্ত্র, অজ্ঞ জীবেরা ইহাতে কলশ। কেননা কেবল তাহারাই ইহাতে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছে। যে জগৎ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ গোষ্পদ তুল্য, সেই জগৎ মূঢ় দিগের দৃষ্টিতে অগাধ ও অসীম[৪০।৪১]। অজ্ঞগণ পিঞ্জরাবরুদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ইহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না। অজ্ঞগণ বাসনা ভারে আক্রান্ত, সেইজন্য তাহারা জন্মচক্রের নাভি স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে শোধন করতঃ তাহার গতি-বিপর্য্যয় করিতে অপারক হয়। সংসার একটী অরণ্য, অজ্ঞগণের ইন্দ্রিয় ইহাতে গৃধ্র, তাহাদেরই অনুরাগে শরীররূপ আমিষ ইহাতে আস্তীর্ণ রহিয়াছে। অধিক কি বলিব, এই যে কল্পনারূপ কল্পবৃক্ষ, ইহারই জয় দৃষ্ট হয়[৪৮।৫২]। এক মাত্র অজ্ঞান হইতে উক্ত পাদপের জগৎরূপ অনন্ত পত্র আবির্ভূত হইতেছে, স্থিতি করিতেছে, আবার সেই অজ্ঞানে লীন হইতেছে (প্রলয় কালে)[৫৩]। বিবিধ ভোগেচ্ছু জীব উক্ত বৃক্ষের

বিহঙ্গ, তাহাদের জন্ম তদ্‌বৃক্ষের পল্লব এবং তাহাদের কর্ম্ম তদ্‌বৃক্ষের কলিকা, পুণ্য ও পাপ তাহার ফল, বিভব তাহার মঞ্জরী। ইন্দুর উদয়ে ওষধির শোভা, সেইরূপ, অজ্ঞান ইন্দুর উদয়ে যোষিৎ রূপ ওষধির শোভা। প্রসিদ্ধ চন্দ্রের ন্যায় অভিহিত অজ্ঞান চন্দ্রমার উদয় শূন্যে এবং এ চন্দ্রও দোষাকর অর্থাৎ দোষের ঈশ্বর। (প্রকৃত চন্দ্র পক্ষে দোষা শব্দে রাত্রি) সর্ব্বত্র ইহারই জয় এবং ইহারই প্রসাদে বাসনামৃত পানে চিত্ত চকোর পরিতৃপ্ত হইতেছে এবং তাহারা পুনঃ পুনঃ রক্তরসের অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছে। এই অজ্ঞান ইন্দুর উদয়ে কান্তারূপিণী কুমুদিনী শোভাময়ী, তাহাদের লোচন ভ্রমর ও কেশ পাশ তিমির। যাহা যাহা বলিলাম সমস্তই অজ্ঞানকবলিত মুর্খতার বিলাস। হে রাম! অজ্ঞানরূপ বৃক্ষ হইতেই এই সকল আপাতমধুর, অনর্থ পূর্ণ, ক্ষণভঙ্গুর নানা আকৃতিযুক্ত ফল উৎপন্ন হইতেছে[৫৪।৬১]।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

—(*)—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! অজ্ঞানের অসংখ্য বিভূতি। বলিতে কি, এই স্ত্রী শরীর, ইহা অজ্ঞানের ও তদ্বিভূতি কামের প্রধান বিভূতি। ঐ যে, মুক্তাদামে বিজড়িতা ও নানারত্নে বিভূষিতা যোষা, অজ্ঞানের মহিমায় উহারা কামরূপ ক্ষীর সাগরের লহরী বলিয়া উপমিত হয়[১]। স্বর্ণ পদ্মের মধ্যগত ভ্রমর উহাদের নেত্রের সহিত তুলিত হয়[২]। বসন্ত কালে জাত ও উদ্যান মধ্যে অবস্থিত পুষ্পসমূহ কামের প্রিয়তম দাস[৩]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, যাহাদের অঙ্গ গৃধ্র, গোমায়ু ও কুক্কুর প্রভৃতি মাংসাশী জীবের ভক্ষ্য, কামকিঙ্করেরা সেই সকল রমণীর ক্রব্যাদভক্ষ্য অঙ্গসমূহকে কেহ চন্দ্রের সহিত কেহ চন্দনের সহিত কেহ বা চকোরের সহিত তুলিত করে[৪]। কামকিঙ্করেরা স্ত্রী লোকের বক্ষঃস্থলস্থ

মাংসপিণ্ডকে কেহ স্বর্ণপদ্ম কেহ বা সুবর্ণকলশ দর্শন করে[৫]। তাহাদের অধর নামক মাংস খণ্ডের সহিত রসায়ন, ইন্দুদ্রব, মধুসম্পুট, ও আসব * প্রভৃতির উপমা দেয়[৬]। কবি নামক অজ্ঞানভৃত্যেরা তাহাদের মাংসলিপ্ত দীর্ঘাস্থি দিগকে বাহুলতা বলিয়া বর্ণন করে[৭]। কেবল বাহুলতার বর্ণন নহে, উরু নামক মাংস খণ্ডকে তাহারা রামরম্ভা প্রভৃতির দ্বারা তুলিত করে[৮]। যাবৎ অবিচার তাবৎ উহারা মূঢ় দিগের নিকট প্রথম প্রথম অতি মধুর, মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহার কালে রাগ দ্বেষাদির উৎপাদক, এবং শেষে তাহারা ক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে[৯]। বুদ্ধি যতই দুঃখানুভব করে, ততই সুখও শত শাখায় বিস্তৃত হয়, আবার দুঃখও অনন্ত শাখায় বৃদ্ধি পায়। কর্ম্মফল যে নানা শোভায় প্রকাশ পায়, সে সমস্তই ঐ ঐ কল্পনা হইতে সমুদ্ভূত[১০]। এই সকল নারী কর্ম্মলিপ্ত মুগ্ধ নরের বন্ধন রজ্জু এবং অতি দুর্গম কণ্টকাচিত কর্ম্মারণ্যের শোভনীয় ফল[১১]। অপিচ, উহারা প্রবৃত্তিরূপ জল সেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মোহের কালুষ্যে শ্যামবর্ণা অর্থাৎ তমোময়ী হয়[১২]। উহারা প্রথমতঃ নানাসুখদায়িনী বলিয়া বিবেচিত হয় বটে; পরন্তু পরিণামে নানাদুঃখদায়িনী হইয়া থাকে[১৩]। শরীরই জন্মরূপ বিষ বৃক্ষের রস। তাহা যতই বর্দ্ধিত হয় ততই স্বীয় কর্ম্মরূপ পবন নানা প্রকার উৎকরবাহী হইয়া বহিতে থাকে[১৪]। উক্ত ক্রমে পুত্র পৌত্রাদি বিয়োগ দুঃখের ভোগ, তদবসানে স্বয়ং মৃত্যুর উদরে গমন করে ও করায়। হে রামচন্দ্র! ত্রিতাপবর্জ্জিত ব্রহ্মেরই প্রকাশ বিশেষ জীবেরা ‡ ইহ সংসারের বিচিত্র সর্প। ইহারা মোহমারুত পান করে, করিয়া অবশেষে নানা কুটিল গতির অধীন হয়। ইহাদের যৌবন অন্ধকারময়ী রাত্রির অনুরূপ। কেননা ইহারা যৌবনরূপ তমসাচ্ছন্ন রাত্রে চিন্তা পিশাচের আবির্ভাবে বিবেক চন্দ্রের অদর্শনে অন্ধকল্প হইয়া থাকে। ইহাদের জিহ্বা ও চক্ষু প্রভৃতি বৃথা জল্প দর্শনাদির দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে, ক্রমে বিশীর্ণ হইয়া যায়[১৫,১৮]।

---

* রসায়ন—অমৃত, ইন্দুদ্রব—কর্দ্দমীকৃত চন্দ্র, মধুসম্পুট—মধুর আস্বাদের পেঁটরা, আসব—মিষ্টাস্বাদ মদ্য।

‡ ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার। এ দুঃখ ব্রহ্মে নাই। সুতরাং তদীয় অন্যতম প্রকাশ জীবেও উহা বাস্তবতঃ নাই। কিন্তু কল্পনায় আছে। তদনুসারিণী উক্তি—জীবেরা এই সংসারের সর্প।

হে রঘুনাথ! দরিদ্রতাও অজ্ঞানের বিভূতি। দুঃখ ও শোক যাহার অষ্ঠীলা (গ্রন্থি), কষ্ট যাহার কণ্টক, অজ্ঞানের প্রভাবে তাদৃশ দারিদ্র্যরূপ শাল্মলী সহস্র শাখায় বৃদ্ধি পায়[১৯]। যাহার অভ্যন্তর শূন্য, উন্নতিরহিত, চিত্ত নামক বৃক্ষে যাহার কুলায়, সেই লোভ নামক পেচক মায়ারূপিণী অন্ধকারময়ী নিশায় সোৎসাহে পরিভ্রমণ করে[২০]। জরা নাম্নী বৃদ্ধা মার্জ্জারী যৌবন নামক আখুকে প্রথমে কপোল (আখু ইন্দুর। কপোল গণ্ডদেশ।) প্রদেশে গ্রহণ করে, ক্রমে তাহাকে বিনাশ করে[২১]। যেমন ফেনপিণ্ড অসার অথচ দেখিতে বিলক্ষণ পুষ্ট, এই সৃষ্টিও সেইরূপ অসার অথচ দেখিতে পুষ্ট। চিদাভাসরূপ (জীব) পুষ্পে ধবলিত, জগৎপল্লবে সুশোভিত ও ধর্ম্মার্থফলধারিণী সত্তা নাম্নী লতা অজ্ঞানের অন্যতমা বিভূতি। এই যে জগত্ত্রয়রূপ গৃহ, এ গৃহের বৃহৎ স্থূণ (খুঁটী বা স্তম্ভ) সুমেরু, চন্দ্র ও সূর্য্য গবাক্ষ, গগন ইহার ছাদ, এ গৃহও সেই অজ্ঞানের নির্ম্মিত[২২।২৪]। এই সংসার একটী বিস্তীর্ণ সরোবর, এ সরোবরে প্রাণ নামক ষট্‌পদ (ভ্রমর) বিচরণ করে। নানাপ্রকার শরীর এ সরোবরের পদ্ম, চিৎ বা চেতনা সে সকলের মধু। এই যে ভুবন নামক কুট্টিম (নানা রত্ন শোভিত কৃত্রিম ভূভাগ), ইহার একমাত্র দীপ আদিত্য। এই যে জগদন্তর্গত জীবরাশি, ইহারা জরৎপক্ষীর (বহুকালের পুরাতন বা জীর্ণ পক্ষীর) অনুরূপ। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ আশা তন্তুতে নিবদ্ধ, ইহারা নিরন্তর ইন্দ্রিয়পিঞ্জরের অধীনে অবস্থান করে[২৫।২৭]। এই সংসার একটী লতিকা, এ লতিকার পত্র প্রাণিনিবহ। এ লতিকা প্রাণ-বায়ুর আন্দোলনে নিরন্তর পতিত হইতেছে। বিধাতা পাতাল প্রদেশে নরক স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, প্রাণিগণ তৎপতনশঙ্কাবর্জ্জিত। অথবা বিধাতা মলমূত্রাদিপূর্ণ দেহ নামক নরক সৃজন করিয়াছেন পরন্তু প্রাণিগণ তাহাতেই অহং-অধ্যাসে হৃষ্ট ও মহামান্যাভিমানী। এ সকল ব্যাপারও অত্যধিক অজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য। স্বর্গ একটী সরোবর। দেবতারা তাহার সারস। এবং মেঘ তাহার শৈবাল। এই সরোবরের পদ্ম মোদ (হর্ষ), এ পদ্ম পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা বিকসিত হয়[২৮।৩১]। রাম! এই যে সৃষ্টি ইহা একটী দুর্ব্বলা শফরী। ইহার স্ফূর্ত্তিস্থান ভব পল্বল। কৃতান্তরূপ গৃধ্র ইহাদের ভক্ষক[৩২]। ইন্দুরেখা যেমন দিন দিন উদয় ও উৎক্রম ব্যুৎক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, সৃষ্টিও উদয় ও ক্ষয় প্রাপ্ত

হইয়া থাকে[৩৩]। কুলালধর্ম্মী কাল যে চক্র আবর্ত্তন দ্বারা কত ক্ষণভঙ্গুর প্রাণিরূপ শরাব নির্ম্মাণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই[৩৪]। সেই অচল ব্রহ্মপদে অসংখ্য কল্প ও জগজ্জাল জন্মিয়াছে ও যুগাগ্নির দ্বারা পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়াছে। এই যে জগৎ, ইহার স্থিতি ও গতি একরূপ নহে। কখন ভাব, কখন অভাব, কখন সুখ, কখন দুঃখ। বাসনা শৃঙ্খলে বিজড়িত অজ্ঞ দিগের মূর্খতা এত দৃঢ় যে তাহা শত শত যুগ পরিবর্ত্তনরূপ বজ্রের আঘাতেও বিশীর্ণ হয় না[৩৫।৩৭]। মূর্খ দিগের বাসনারূপ এই শরীর কিছুতেই বিদ্রুত হয় না। নিয়তিঝটিকার দ্বারা জীব সৃষ্টিরূপ পাংশু নিরন্তর কালরূপ সর্পের উদরগত হইতেছে। অভাব অর্থাৎ ধ্বংস এক প্রকার বাড়বানল, তন্মুখে এ সমস্তই ভস্মীভূত হইতেছে ও হইবে[৩৮।৪০]। অকস্মাৎ কত শত আশ্চর্য্য দ্রব্যশক্তি উদ্ভুত হইয়া পুনর্ব্বার লোপ প্রাপ্ত হইতেছে[৪১]। ভূত ও ভৌতিক পদার্থে পরিপূর্ণ এই জগৎ একটী বৃহৎ হস্তী। পরন্তু কৃতান্ত ইহাতে দৃপ্ত (অতিবলবান্) সিংহ[৪২]। জীবরূপ পক্ষিগণ অত্র জগতের উত্তর দক্ষিণ এই দুই পথে নিরন্তর গত্যাগতি করিতেছে[৪৩]। এই সংসাররূপ চিত্রের আধার চিৎ শক্তি। চিৎ শক্তি ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা বিস্পষ্ট ও শুভ্র। পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার পাঁচ প্রকার রং অর্থাৎ বর্ণ, এবং বিধাতা ইহার চিত্রকর[৪৪।৪৫]। ইহাতে এই যে স্থাবর জাতি দৃষ্ট হইতেছে এ সকল নিতান্ত নশ্বর। অর্থাৎ এ সকল নিরন্তর জন্মমরণ ও পরিবর্ত্তন শীল[৪৬]। তদ্ভিন্ন, এই যে জঙ্গম জাতি, এ জাতিও রাগ দ্বেষ সমুত্থিত ভাবাভাবময় ও জরামরণযুক্ত রোগে জীর্ণ[৪৭]। কৃমি কীটাদি জীব আরও অধিক দুঃখী। তাহাদের নিয়তিই তাহাদিগকে নিরন্তর পীড়া প্রদান করিতেছে[৪৮]। কালরূপ সর্প যে কোন্ অতর্কিত গর্ত্তে বাস করে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। সেই কালরূপ সর্প ঐ সকল জীবকে গ্রাস করিতেছে আবার অদৃশ্য হইতেছে। সেই কাল আবার স্থাবর জাতিতে ঋতুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের ফল পুষ্প উৎপাদন ও নিবারণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে সমধিক শীত বাত আতপ সহিষ্ণু করিতেছে[৪৯।৫০]। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই তিনটী লোক যেন তিনটী পথ। এই তিনটী পথই জলোপরি অবস্থিত। * ঐ সকল পথের মধ্যে

* যদিও পৃথিবী জলোপরি অবস্থিত ভাসমান প্রায়, ইহা পুরাণকার দিগের

অসংখ্য ভূত (প্রাণী) রূপ ভ্রমর সর্ব্বক্ষণ কলরব করিতেছে। এই ত্রিলোক নামক ব্রহ্মাণ্ড কালীদেবীর অর্থাৎ কালপত্নীর ভিক্ষাপাত্র। এই কালপত্নী কালী পূর্ব্ব গৃহীত ভিক্ষা (জীবজাতি গ্রহণ) আপন ভর্ত্তা কালকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অন্য প্রাণী ভিক্ষা করিবার চেষ্টায় ব্যগ্রা রহিয়াছে৫১।৫২। তিমির (অন্ধকার) পটল যাহার কবরী, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্ষু, ব্রহ্মাদি দেবতা যাহার অন্তশ্চেতনা, সুমেরু প্রভৃতি স্থাবর যাহার জড়ভাব অর্থাৎ দেহ, ব্রহ্মতত্ত্ব যাহার পয়োধর, চিদাভাস যাহার ধাত্রী (পোষণকর্ত্রী), তারকাগণ যাহার দন্তপংক্তি, যে ইন্দ্র অপেক্ষা পুরাতন, সমুদ্র সপ্তক যাহার মুক্তামালা, নীল মেঘ যাহার আবরণ বস্ত্র, জম্বুদ্বীপ যাহার নাভি, চতুর্দ্দশ ভুবন যাহার রোম, সেই লোকত্রয়রূপিণী বৃদ্ধা রমণী পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কালদশনে চর্ব্বিত ও নিগীরিত হইতেছে৫৩।৫৭। কালরূপ মহাসমুদ্র অতি ভীষণ। ইহাতে যে কত বার বিভ্রমকারিণী ত্রিলোকী রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়া মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না৫৮। ব্রহ্মাণ্ড উক্ত কালসমুদ্রের বুদ্বুদ ও কারণকূট উহার সারস পক্ষী৫৯।৬০। এই কাল মেঘরূপে বর্ণিত হইতেও পারে। কালরূপ মেঘে চৈতন্যরূপ বিদ্যুতের উদয় হইতেছে। উক্ত মেঘের অভিমুখে অসঙ্খ্য ভূতরূপ বিহঙ্গ উড্ডীন হয়। এই কালকে তালবৃক্ষ রূপকেও বর্ণন করা যায়। অসঙ্খ্য ব্রহ্মাণ্ড ইহার ফল, এবং সেই সকল ফল অনবরত উৎপন্ন ও নিপতিত হইতেছে।• কোন কোন ভূত (প্রাণী) নিমেষমাত্র জীবী। যাঁহারা দেবতাদিগের অধিপতি, সেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উক্ত কাল তালের ফল। অপিচ, তাঁহারাও পক্ক ও পতনশীল। চিদ্রূপ পরম পদে রুদ্রাদি দেবপালকগণ নিমেষ মধ্যে উৎপন্ন হন, আবার নিমেষান্তরে বিলীন হন। ব্রহ্মপদে যে অভিহিত (বর্ণিত) রুদ্রান্ত ক্রিয়ার (হওয়া যাওয়া প্রভৃতি বিকারের) অবস্থান দৃষ্ট হয় সে সমস্তই কর্ম্মের ও উপাসনার ফল৬১।৬৪। বলিতে কি, অজ্ঞানের বিভূতি সহস্র সহস্র আশ্চর্য্যের জনক। বলা বাহুল্য যে, জগৎ সংক্রান্ত যে কিছু, সে সমস্তই অজ্ঞানের বিজৃম্ভণ৬৬।৬৭।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অভিমত, তথাপি পঞ্চ ভূতের কার্য্য বলিয়া সমস্তই জলোপরি, এ কথা বলা অসঙ্গত নহে।

অষ্টম সর্গ।

—○()•()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিৎ পর্ব্বতের তটে যে সংসার নামক বন ও তন্মধ্যে যে সৃষ্টি ও অবিদ্যা লতা বিরাজ করিতেছে, এই লতা যেরূপ ও যে সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত, তাহা বলি শ্রবণ কর[১]। সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বত সকল এই লতিকার পর্ব্ব (পাব), ব্রহ্মাণ্ডাবরণ বা ব্রহ্ম কটাহ ত্বক্ এবং লোকত্রয় ইহার সংস্থান (গঠনভঙ্গী)। সুখ দুঃখ জন্ম স্থিতি ও জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতি এই লতিকার বৃদ্ধিশীল ফল মূল পত্র ও পুষ্প প্রভৃতি[২।৩]। একবার সুখানুভব হইলে পুনর্ব্বার তজ্জাতীয় সুখের স্পৃহা জন্মে; সুতরাং সুখই অনুরাগ নামক অবিদ্যার মূল। যে হেতু উক্ত সুখ হইতেই পুনঃ সুখাভিলাষ উৎপন্ন হয় এবং চেষ্টার দ্বারা পুনর্ব্বার তৎসজাতীয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই হেতু উক্ত সুখকে ফল বলিয়াও গণ্য করা যায়। অর্থাৎ সুখেরও শেষ ফল বা শেষ পরিণাম সুখ। এইরূপ, দুঃখও ধনতৃষ্ণাদিরূপ অবিদ্যার মূল এবং তাহারও ফল দুঃখ। ভাবিয়া দেখ, দরিদ্রতা প্রভৃতি দুঃখ হইতে ধন তৃষ্ণারূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে পাপ বাসনা জন্মে, পাপ বাসনা জন্মিলে চৌর্য্যাদি প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তাহা পরিণামে দুঃখ ফলই প্রসব করে[৪]। জন্ম ও স্থিতি এ দুটীকেও উক্ত প্রকারে জন্মান্তরের ও মৃত্যুান্তরের মূল ও ফল বলিয়া বিদিত হইবে[৫]। অজ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানেরই এবং জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানেরই বৃদ্ধি সংঘটন হইয়া থাকে[৬]। এই লতার বিলাস বহুবিধ, ও তাহার সৌগন্ধ বাসনা[৭]। দিবস সকল উক্ত লতার কুসুম, রাত্রি সকল সে কুসুমের ভ্রমর, এবং পতনশীল প্রাণি সকল তাহার পল্লব[৮]। কদাচিৎ কখন বিবেকরূপিণী করিণী আসিয়া দৈবাৎ কোন কোন পল্লবের রজোমার্জ্জন (রজঃ ধূলা, পক্ষান্তরে কর্ম্মজ বাসনা) করে এবং তৎকর চ্যুত (কর = শুণ্ড, রজঃ = দুর্ব্বাসনা) কোন কোন পল্লব পুনর্ব্বার রজোযুক্ত হয়[৯]। এই লতা জায়মান পুত্র মিত্র ও পশু প্রভৃতিরূপ নব পল্লব দ্বারা সুশোভিত এবং উৎপন্ন পুত্র ও

পৌত্রাদি রূপ অঙ্কুরের দ্বারা দন্তুর অর্থাৎ দন্তবিকাশক আনন্দিতমুখ। এই লতা সকল ঋতুরূপ পুষ্প ধারণ করে এবং সর্ব্ব প্রকার রস বহন করে[১০]। জন্ম এই লতার পর্ব্ব, তাহা দুঃখরূপ সর্পে পরিব্যাপ্ত, বিনাশ বা ধ্বংস তাহার ছিদ্র, বিষয়ানুভব তাহার রস, এবং বিচার তাহার নাশক ঘুণ (কীট বিশেষ)[১১]। উক্ত লতায় প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ বিকসিত হইতেছে[১২।১৩]। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির আলোক উক্ত কুসুমের পরাগ। তদ্দ্বারা এই লতিকা অতীব সুন্দরী[১৪]। মনোরূপ হস্তী ইহাকে কম্পিত করে এবং সঙ্কল্প নামক কোকিল ইহাতে কলরব করে। এই লতা ইন্দ্রিয়রূপ সর্পে সম্বাধ অর্থাৎ বিজড়িত এবং তৃষ্ণারূপ ত্বকে উপরঞ্জিত[১৫]। এই লতা নীলবর্ণ আকাশরূপ তমালের আশ্রয়ে উন্নতি প্রাপ্ত[১৬]। অধোভুবন অর্থাৎ পাতাল তল উহার আলবাল এবং সমুদ্রজল তাহাতে জলসেক[১৭]। ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় উক্ত লতার ভ্রমর ও রমণীমণ্ডল উহার পুষ্পপুঞ্জ। এই লতা চিৎস্পন্দরূপ বায়ুর দ্বারা বিচলিত হয় এবং ইহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপ সূক্ষ্ম কীট বাস করে[১৮]। বর্ণিত লতা কুকর্ম্মরূপ অজগরে ব্যাপ্তা, স্বর্গশোভা তাহার পুষ্প, এবং তাহা বহুবিধ জীবের জীবিকায় ও আমোদে পরিপূর্ণা[১৯]। এই লতা বিবেকীর নিকট নানা উপশমযুক্তা, অবিবেকীর নিকট নানা ফল পুষ্পে সুশোভিতা[২০।২১]। এ লতার আলবাল অতীব বিচিত্র। ইহাতে বহুবিধ জীব বিহঙ্গ বাস করে, এবং ইহার পরাগও বিচিত্রতম[২২]। নানাপ্রকার লীলা অর্থাৎ শিল্পাদি ইহার কুট্মল, এবং ইহা নানা প্রকার পর্ব্বতের তটে অবরূঢ়। ইহার ফল নিতান্ত নিবিড়। এ লতা অনেক বার জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিয়া বিনষ্ট হইতেছে। কখন বা এ লতা অৰ্দ্ধছিন্না হয় এবং কখন বা ছিন্ন হয় না। ইহার এককালীন উচ্ছেদ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না[২৩]। সত্য না হইলেও এ লতা সদা সত্যের ন্যায় ভাসমানা। ইহার তরুণত্বও নিত্য এবং শোষও (শোষ=শুষ্ক হওয়া) নিত্য[২৪]। এ একটী বিশেষ বিষলতা। ইহার আলিঙ্গনে সংসারনামক মূর্চ্ছা ও ভ্রান্তি এবং বিচারে ইহার বিনাশ হয়[২৫]। যে ইহার বিচার করে, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে, উক্ত লতা তাহার অন্তর হইতে বিগলিত হইয়া যায়। অর্থাৎ সে ইহাকে অসত্য বলিয়া জানে। যে

বিচার করে না, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে না, উক্ত লতা সেই অজ্ঞ নরের অন্তরে সত্যরূপে অবস্থিতি করে। তাহাদেরই দৃষ্টিতে কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নাগ, কোথাও দেবতা এবং কোথাও বা পৃথিবী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বলিতে কি, সূর্য্য চন্দ্র তারকা তমঃ তেজ আকাশ শস্যসম্পন্না ভূমি শাস্ত্র শস্ত্র বেদ এই লতার পক্ষী ও এ পক্ষীর উড্ডয়ন দেবতা স্থাণু বায়ুপ্রবাহ নরক স্বর্গ দেবত্বাদিপদ কৃমি কীট বিষ্ণু ব্রহ্মা রুদ্র সূর্য্য অগ্নি ও যম। এ সমস্তই আবার দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত হয়[২৮]-[৩১]। যে কোন মহিমান্বিত পদার্থ ও যে কোন তৃণাদি তুচ্ছ পদার্থ ভুবন মধ্যে লক্ষিত হইবে, হে রামচন্দ্র! সে সমুদায়কেই তুমি অবিদ্যা বলিয়া বিদিত হইবে[৩২]।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত।

নবম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আপনার মুখে হরি হর ব্রহ্মাদি আকারেরও অবিদ্যাময়ত্ব শ্রবণ করিয়া আমার ভ্রম বা সংশয় জন্মিতেছে। ঈশ্বর মূর্ত্তির অবিদ্যাময়তা কি রূপে সুসম্ভব হইতে পারে[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! শ্রবণ কর। সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান বিস্পষ্ট জগৎ ছিল না, পরন্তু ইহা সংস্কারের আকারে ছিল। সেই সংস্কার ভাবটী এক বা একটী অখণ্ডিত ভাব; তাহাকেই আমরা সর্ব্বাত্মক বলি এবং তাহা সম্বিদাভাস যুক্ত[২]। পরে সৃষ্ট্যারম্ভ কালে সেই সংস্কারীভূত জগতের উদ্বোধে বা উদ্রেকে তত্রস্থ চিদাভাসও উদ্বুদ্ধ ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তরঙ্গ উঠিবার পূর্ব্বে জলে যেমন প্রথমতঃ একটী সূক্ষ্ম আবর্ত্ত-রেখা উৎপন্ন হয়, পরে সেই রেখা বৃহৎ তরঙ্গাকার ধারণ করে, সেইরূপ, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে প্রথমতঃ মায়ানামক জগৎসংস্কারের উদ্বোধ অর্থাৎ জন্মে। পরে তাহা হইতেই সূক্ষ্ম রেখার আকার ভাবি জগতের

জন্ম হয়। অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম জগৎ ক্রমে স্থূল সুতরাং বিস্পষ্ট হয়[৩]। প্রখর আতপ, মন্দাতপ ও ছায়া যেমন এক সূর্য্য হইতেই প্রকটিত হয়, এবং উক্ত তিন্ অবস্থায় যেমন সৌর তেজের আধিক্য ও অল্পীভাব থাকে, সেই রূপ, সেই সর্ব্বাত্মক এক মূল তত্ত্ব হইতে আগে সূক্ষ্ম, পরে মধ্য, তৎপরে এই স্থূল জগৎ প্রকটিত হয়, সেই জন্য আমরা তাহাকে সূক্ষ্ম: মধ্য স্থূল এই ত্রিবিভাগে কল্পনা করিয়া থাকি। প্রথ-মোক্ত সূক্ষ্ম বিভাগটী তত্ত্বাপ্ত চিদাভাসের শরীর স্থানীয় এবং তাহারই অন্য নাম সমষ্টি মন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ[৪]। যে এক সর্ব্বাত্মক পদার্থকে ত্রিবিভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা বলা হইল, সৃষ্টিমূল সেই এক সর্ব্বা-ত্মক পদার্থের আর এক নাম অব্যাকৃত ও অপর নাম প্রকৃতি, এবং তাহারই অন্য নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা অব্যাকৃত বা প্রকৃতি ত্রিগুণধর্ম্মিণী অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন্ গুণের সমাহার (সম সমাবেশ) বিশেষ। উক্ত তিন্ গুণই জীবের সংসার এবং উহারই পারে পরম পদ[৫,৬]। যে তিন্টী গুণের উল্লেখ করিলাম, সেই তিন্টী গুণ আবার প্রত্যেকে ত্রিবিধ। অর্থাৎ সূক্ষ্ম মধ্য ও স্থূল। স্থূল কি-না বিস্পষ্ট[৭]। যে কোন দৃশ্যের উল্লেখ করিবে সে সমস্তই উক্ত তিন্ গুণের আশ্রিত[৮]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে প্রথম সাত্ত্বিক বিভাগের কথা বলি, শ্রবণ কর। ঋষি, মুনি, সিদ্ধ (দেবযোনি বিশেষ), নাগ, বিদ্যাধর, সুর অর্থাৎ দেবতা, এ সকলকে তুমি সাত্ত্বিক বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে[৯]। সাত্ত্বিক বিভাগের মধ্যে বিদ্যাধর ও নাগ এই দুই জাতির দেহ আধিক্যনিয়মে কিছু অধিক তমোগুণান্বিত, মুনি ও সিদ্ধ গণের দেহ রজোময় এবং হরি হর ব্রহ্মাদির দেহ সত্ত্বময়। অর্থাৎ হরি হরাদির দেহ বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন আর অন্যের দেহে রজস্তমো মিশ্রিত সত্ত্ব। হরি হরাদির দেহ শুদ্ধ সত্ত্বময় বলিয়া সর্ব্বদা নির্ম্মল। অর্থাৎ তাঁহারা অবি-দ্যার আবরণ বর্জ্জিত[১০,১১]। হে রামচন্দ্র! যাহারা তজ্জন্ত অর্থাৎ হরি হরাদির উপাসক, তাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ও জ্ঞান প্রাপ্তির পর মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণেই রুদ্রাদি দেহ নামক সত্ত্বভাগ জগৎস্থিতি পর্য্যন্ত অবস্থান করে[১২,১৩]। যাঁহারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহারাও যাবৎ প্রারব্ধ তাবৎ সদেহ থাকেন, পরে বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হন[১৪]। তাই বলিতেছি, যেমন বীজ ফলরূপ ধারণ করে আবার ফল বীজ-

রূপে পরিণত হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যান্তরের রূপ প্রাপ্ত হয়[১৫]। যেমন সলিল হইতে ফেন বুদ্বুদাদির উদয় হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যার পূর্ব্বাবস্থা হইতে প্রকটিত হয়। ফেন বুদ্বুদাদি যেমন সলিলে লয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি, অবিদ্যাও বিদ্যায় বিলীন হয়[১৬]। জল ও তরঙ্গ এই দুই ভেদ কেবল ভাবমাত্রমূলক, বস্তুমূলক নহে। অর্থাৎ বস্তুদৃষ্টিতে জলই তরঙ্গ। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বিদ্যা অবিদ্যা এ দুই ভেদও ভাবনামূলক, বস্তুমূলক নহে। জল ও তরঙ্গ পরমার্থতঃ এক। সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যা এ দুইও পরমার্থতঃ এক[১৭।১৮]। অতএব হে রাঘব! বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই বিভাগ ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে তাহাই আছে। অর্থাৎ তাহাই পরম সৎ। সেই একাদ্বয় পরম সৎ ব্যতীত বিভাগীভূত বিদ্যা ও অবিদ্যা নাই। যখন তাহা বস্তুতঃ নাই তখন আর তদ্দ্বয়ের বৃথা কল্পনা কেন[১৯।২০]। যাহা কোন নামরূপাদির গোচর নহে তাহাই আছে। যাহা আছে তাহারই অজ্ঞাত ভাব আমাদের মতে অবিদ্যা[২১]। অপিচ, তাহা যদি বিদিত হয় তবে তাহাকে আমরা বিদ্যা বলি এবং বিদ্যা ভাবের উদয়ে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ অবিদ্যা নাস্তি হইয়া যায়[২২]। ঐরূপে অবিদ্যার অনস্তিতা সম্পন্ন হইলে তখন বিদ্যা অবিদ্যা এ কল্পনাও থাকে না[২৩]।

হে রঘুনাথ! যখন তাহা বিদ্যা ইহা অবিদ্যা এ কল্পনা থাকে না, তখন সেই বিদ্যাপ্রাপ্য পূর্ণানন্দ অবশেষিত হয় অর্থাৎ কেবল তাহাই থাকে, অন্য কিছু থাকে না। ভাবার্থ এই যে, অবিদ্যা পক্ষ না থাকিলে বিদ্যা পক্ষও থাকে না, কাযেই তখন একাদ্বয় পরম পদ অবশেষিত হয়। উক্ত উভয় কল্পনার অভাবে যাহা থাকে, তাহা "যৎ কিঞ্চিৎ" এতাবৎ মাত্র বলা যায় অন্য কিছু বলা যায় না। সেই যে যৎকিঞ্চিৎ, তাহা পরমার্থ সৎ ও পরম পদ প্রভৃতি কথায় উক্ত হইয়া থাকে[২৩।২৪]। যেমন বটবীজে বট থাকে, তাহার ফল পুষ্প শাখা কাণ্ড, সমস্তই অব্যাকৃতরূপে তাহাতেই বিরাজিত থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞানাবৃত দশায় তাদৃশ অজ্ঞানে এ সমস্তই অব্যাকৃতরূপে অবস্থিত থাকে, সেই জন্য তাহা কিঞ্চিৎ শব্দের দ্বারা উল্লেখ্য হয়। অতএব, সেই অজ্ঞান ভাবটী সর্ব্বশক্তির পেটরা স্বরূপ[২৬]। পরম সত্য চিৎপদার্থ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম অথচ শূন্য নহে (শূন্য=অভাব)। যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে

বহ্নির অবস্থান, যেমন দুগ্ধে ঘৃতের স্থিতি, তেমনি উক্ত চিৎ পদার্থে এ সমুদায়ের অবস্থান ছিল পরে তাহা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ন্যায়ে অথবা আভাস ন্যায়ে * এ সকল আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব, তরঙ্গের সহিত সমুদ্রের, কিরণের সহিত মণির, যেরূপ সম্বন্ধ, এ সকলের সহিত চিৎ পদার্থের সেইরূপ সম্বন্ধ[২৭।২৮]। অতএব হে রাঘব! উক্ত চিৎ পদার্থই এই দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ রাশির কোষস্বরূপ। কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে, তাহারই অবস্থান দৃষ্ট হয়। যেমন কুম্ভেরই বিনাশ হয়, কুম্ভাকাশের বিনাশ হয় না, তাহা সর্ব্বদা অবিনাশী, সেইরূপ, দৃশ্যভাগই বিনষ্ট হয়, তদাধার চিৎ অবিনাশিনী থাকে। লৌহস্পন্দে অয়স্কান্ত মণির কর্ত্তৃত্ব যেরূপ, জড় দেহের পরিস্পন্দে চিদাত্মার কর্ত্তৃত্বও সেইরূপ। যেমন সন্নিহিত থাকাই অয়স্কান্তের কর্ত্তৃতা, সেইরূপ, সদাত্মার অস্তিতা মাত্র দেহচেতনার প্রতি কর্ত্তৃতা[৩১।৩২]। অতএব, হে রঘুনাথ! এই সমুদায় জগৎ সেই চিদাত্মাতেই অবস্থিত, সেই চিদাত্মাই বিশ্বের এক মাত্র বীজ, সেই চিৎ নাম্নী সম্বিদে এ সকল কল্পিত বলিয়া জানিবে[৩৩]।

নবম সর্গ সমাপ্ত।

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যে হেতু স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত, সেই হেতু এ সকল ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তখন এ সকল তুচ্ছা অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া যায়[১]। যাহাতে ভাব ও অভাব কোনও প্রকার গণনা নাই সেই ব্রহ্ম পদার্থেই

* আভাস ন্যায় কথার অর্থ—ঔপাধিকী ভ্রান্তি অথবা অজ্ঞান বশতঃ কল্পনা বিশেষ। যেমন নিকটে জবা পুষ্প থাকিলে তৎপ্রতিবিম্বপাতে স্ফটিকে রক্তবর্ণ পদ্মরাগ মণির ভ্রান্তি হয়। অথবা যেমন রজ্জুর রজ্জুত্ব অজ্ঞানগ্রস্ত হইয়া সর্পের কল্পনা জন্মায়।

এ সকলের পরিশেষ। হে রামচন্দ্র! তাই আমি বলিতেছি, কেন তুমি বৃথা ইচ্ছা করিবে। এই সকল জীব ও এই সকল দৃশ্য বা এই জগৎ এ সমস্তই মিথ্যা, এবং ব্রহ্মই ইহার সত্য বা সার[২]। দেহের সহিত ও বাহ্যভোগাদির সহিত যে অহং মম সম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ভ্রম বিনাশ হইলে তখন আর সে সম্বন্ধ দৃষ্ট বা অনুভূত হইবে না। সর্পভ্রম বিনষ্ট হইলে তখন কি আর রজ্জুতে সর্পদর্শন হয়? তাহা হয় না। আত্মাই অপরিজ্ঞাত অবস্থায় ভ্রান্ত অর্থাৎ জগদ্দ্রষ্টা এবং জ্ঞাত অবস্থায় ব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাস্তিতার বোদ্ধা[৩,৪]। ব্রহ্মাভিধেয় চিৎ পদার্থ চেত্যমলের আশ্রিত হইলেই লোকে তাহাকে অবিদ্যা বলে এবং চেত্যের অতীত হইলে তাহাকেই লোকে আত্মা ও ব্রহ্মাদি নাম প্রদান করে[৫]। (চিতের বিষয় চেত্য। ফলিতার্থ—স্বাতিরিক্ত রূপের আরোপ)। জীব কি? না চিত্ত। চিত্তই পুরুষ বা জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত। যেমন ঘট থাকিলে ঘটাকাশ থাকে সেইরূপ চিত্ত সদ্ভাবেই জীবের সদ্ভাব কল্পিত হয়। ফলতঃ চিত্তই গমনাগমন করে, তদনুসারে তন্ময়তা প্রাপ্ত চিৎও গমনাগমন করে বলিয়া অভিহিত হয়। হে রঘুনাথ! চিত্তই ভ্রমের প্রভাবে আকুল হইয়া মিথ্যা জগদ্দর্শন করিতেছে[৬,৭]। যেমন কোষকার কীট আপনার লালায় আপনাকে বেষ্টন করে সেই-রূপ চিত্তও আপনাকে নানা প্রকার বাসনা জালে জড়িত করিতেছে[৮]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! বুঝিলাম, জীবচৈতন্য যার পর নাই প্রগাঢ় মূর্খতা অবলম্বন করিয়াছে। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য—স্থাবরাদি শরীরের জীবচৈতন্য কিরূপ[৯]? বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যেমন সুষুপ্তি কালে মনের বিলয় হয়, তখন যেমন মনের সুখদুঃখানুভবের ক্ষমতা থাকে না, জীবচৈতন্য স্থাবর শরীরে সেইরূপ মনস্তা হইতে বিচ্যুত থাকায় সুতরাং একপ্রকার মুগ্ধভাব (মোহপ্রাপ্ত ভাব) মাত্রে অবস্থান করে। (মনস্তা=মনন শক্তি)[১০]। হে বেদ্যবিৎশ্রেষ্ঠ! মুক্তি স্থাবর শরীরের বহু দূরে অবস্থান করে। চিৎ অর্থাৎ জীবচৈতন্য তাহাতে থাকে মাত্র, পরন্তু তাহাতে স্বাত্মোদ্ধারের ক্ষমতা থাকে না। উহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় থাকে না, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল লুপ্ত হইয়া যায় এবং মনেরও প্রচার থাকে না। সুতরাং ঐ অবস্থা বহু দুঃখপ্রদ ও মুক্তির বহু দূরে অবস্থিত[১১]।

রাম বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিতেছেন, জীবাত্মা স্থাবর দেহে

জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার রহিত হওয়ায় সুতরাং অস্তিতা মাত্রে পরিশেষিত হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে সে অবস্থাকে মুক্তির দূরস্থিত বলিলেন কেন? আমার মনে হয়, উক্ত অবস্থার দ্বারা শীঘ্র মনোলয় পূর্ব্বক মোক্ষসিদ্ধি হইতে পারে। কেননা দেখা যায়, যোগীরা জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগ করতঃ শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন[১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! বাসনা বিনাশের সহিত মনোবিনাশ ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। পরন্তু তাহা বিহিতানুষ্ঠান ব্যতীত সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক বিচারণার পর যে তত্ত্ববোধ উদ্ভূত হয়, সেই তত্ত্ববোধ সত্তাসামান্যাবস্থার অপর একটী নাম। মোক্ষ তাহারই সংজ্ঞাবিশেষ এবং তাহাই অক্ষয় অব্যয় ও অবিনাশী ব্রহ্ম[১৩]। আগে জ্ঞান, পরে বাসনা পরিত্যাগ জনিত সত্তাসামান্য লাভ, তৎপরে তাহা কৈবল্য পদের অভিধেয়[১৪]। গুরূপদেশ প্রাপ্তি, বিচার ও শাস্ত্রাভ্যাস পূর্ব্বক যে সত্তাসামান্যের উদয় হয় সেই সত্তাসামান্যকেই আমরা ব্রহ্ম পদ বলি[১৫]। অতএব, যাহাতে বীজে অঙ্কুর শক্তি থাকার ন্যায় বাসনা শক্তি বিদ্যমানা থাকে সে অবস্থাকে তুমি সুষুপ্ত অবস্থার ন্যায় বিদিত হইবে। যেমন সুষুপ্তাবস্থার পর পুনরুত্থান অবস্থা আইসে সেইরূপ স্থাবরস্থ জীবচৈতন্যেরও পুনর্ব্বার দেহান্তরে জন্ম হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলিয়াছি, মুক্তি স্থাবর দেহের অতীব দূরে অবস্থিত[১৬]। জড় দেহে মননধর্ম্ম প্রলীন হইয়া থাকে, বাসনাও (পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কারও) প্রসুপ্ত থাকে, সেইজন্য সে অবস্থা মুক্তির উপযোগী নহে, অধিকন্তু তাহা শত শত জন্মমরণ দুঃখের কারণ[১৭]। অতএব, হে রাঘব! এই সকল স্থাবর জীব জড়ধর্ম্মা, বর্ত্তমানে ইহারা প্রসুপ্তের ন্যায় থাকিলেও ভবিষ্যতে ইহাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে[১৮]। যেমন বীজে পুষ্পাদির অবস্থান দুর্লক্ষ্য, মৃত্তিকাস্তূপে ঘটাদির স্থিতি অলক্ষ্য, তেমনি, স্থাবরে বাসনার অবস্থানও দুর্লক্ষ্য[১৯]। যে প্রসুপ্তভাবে বাসনাবীজ লুক্কায়িত থাকে, সে প্রসুপ্তভাব মুক্তির কারণ নহে। বাসনাবীজ নাই, বিনষ্ট হইয়াছে, যেমন যোগী দিগের প্রসুপ্ত ভাব, সেইরূপ প্রসুপ্ত ভাবই মুক্তি পদ প্রদান করে[২০]। যেমন বহ্নির শেষ, ঋণের শেষ, ব্যাধির শেষ, শত্রুতার শেষ, ও বিষের শেষ ভবিষ্যৎ কষ্টের কারণ, সেইরূপ, বাসনার শেষও পশ্চাদ্দুঃখের কারণ[২১]। বাসনা বীজ যদি জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ

হয়, তাহা হইলে তৎকালের সেই সত্তাসামান্য অর্থাৎ অস্তিত্বাবশেষ নামক অবস্থা আত্যন্তিক দুঃখ নাশক বলিয়া গণ্য[২২]।

হে রঘুনাথ! চিচ্ছক্তিই বীজে অঙ্কুরশক্তি রূপে, স্থাবর পদার্থে রস-শক্তি রূপে, জড়ে জাড্যরূপে, দ্রব্যে দ্রব্যভাবে অর্থাৎ ধন রত্নাদি দ্রব্যে স্পৃহনীয় রূপে, কজ্জলে কালিমারূপে, অস্ত্রে তীক্ষ্ণতারূপে, অবস্থিতি করিতেছে[২৩।২৪]। বলা বাহুল্য যে, আত্মা নামক চেতনাই ঘট পটাদি পদার্থে সত্তাসামান্য আধান করতঃ স্থিত রহিয়াছে[২৫]। যেরূপ বলা হইল, বর্ণনা করা হইল, আত্মা সেই সেই প্রকারে সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে অর্থাৎ সমুদায় দৃশ্য পদার্থে পূর্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। মেঘ যেমন আচ্ছাদক, সেইরূপ আত্মাও সর্ব্বাচ্ছাদক। রঘুনাথ! যাহা যাহা বলিলাম এবং যাহা বলিতে বিরত রহিলাম, সে সমস্তই অজ্ঞানাবৃত চিচ্ছক্তির স্বরূপ। অর্থাৎ তৎস্বরূপান্তর্গত মায়ার বিকার। মায়া সর্ব্বপদার্থ-ব্যাপিনী অথচ অকিঞ্চিৎ[২৭।২৮]। সংসার আত্মদৃষ্টির অভাবমূলক এবং মোক্ষ আত্মদৃষ্টিমূলক। অর্থাৎ আত্মাই অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায় সংসারের কারণ এবং তদাবরণের বিনাশে সমগ্র দুঃখের বিনাশ কারণ [২৯]। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যাহা আত্মদৃষ্টির অভাব তাহাই অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির প্রবৃত্তি[৩০]। অবিদ্যা বস্তুতঃ রূপরহিত ও নিঃস্বরূপ অর্থাৎ অবিদ্যার বাস্তব কোন রূপ নাই। যেমন হিমপিণ্ড আতপতাপে বিগলিত হয়, সেইরূপ, "অবিদ্যা কি? বিচার করিয়া দেখি" এবম্প্রকারে দেখিতে গেলে অবিদ্যাও থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়[৩১]। যেমন কোন মনুষ্য নিদ্রা কি? বিচার করিয়া দেখি, এবম্প্রকার চিন্তাপরায়ণ হইলে নিদ্রা তৎ সকাশ হইতে পলায়ন করে, সেইরূপ, অবিদ্যাও বিচারপরায়ণ মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে[৩২]। অবিদ্যা কি? অবিদ্যা কিংস্বরূপা, বস্তু কি অবস্তু, এরূপ বিচারে অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্তই হইয়া থাকে[৩৩]। অন্ধকারের রূপ কি? অথবা অন্ধকার কি প্রকার? দেখিব, ইহা ভাবিয়া, যদি কেহ দীপ প্রজ্বালিত করে তাহা হইলে সে অন্ধকার দেখিতে পায় না। কেননা, দীপের প্রভাবে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, কাযেই অন্ধকার কিরূপ তাহা দেখিতে পায় না। অতএব, যেমন দীপের দ্বারা অন্ধকারের ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার রূপ নির্ণীত হয় না,

তেমনি, বিচারের দ্বারা অবিদ্যার ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না[৩৪।৩৫]। বিচার পূর্ব্বক অবিদ্যা দেখিতে গেলে অবিদ্যা কোথায় পলায়ন করে। সেইজন্য তাঁহা অবস্তু। আলোকের অভাবে অন্ধকার দর্শনের ন্যায় বিচারের অভাবে অবিদ্যার স্থিতি লক্ষিত হয় এবং অনুসন্ধানে তাহার অবস্তুতাই সিদ্ধ হয়, বস্তুতা সিদ্ধ হয় না[৩৬।৩৮]। এই যে রক্তমাংসাদিময় দেহযন্ত্র, ইহার মধ্যে আমি কে, বিচার করিতে গেলে "আমি" নামের নামী পাওয়া যায় না[৩৯]। যেমন দেহের মধ্যে, সেইরূপ অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে। অতএব, বিচার বুদ্ধি অবলম্বনে প্রত্যেক দৃশ্যের মিথ্যাত্ব দৃষ্ট হইলে যে দ্রষ্টৃভাগের সত্যত্ব অবশেষিত হয় সেই সত্যতাবধারণকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বিনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন[৪০]। তাহাকে কোন কিছু বলাও যায়, না বলাও যায়। পণ্ডিতগণ তাহাকে সৎ, ব্রহ্ম, শাশ্বত, বস্তু, উপাদেয় ও অখণ্ড নামে বর্ণনা করেন[৪১]। উক্ত সৎ প্রভৃতি নাম আপনারই (আত্মারই) নাম[৪২]। অবিদ্যা অন্য কুত্রাপি নাই। যে কোন পদার্থের নামোল্লেখ করিবে সে সমস্তই ব্রহ্ম[৪৩]। অধিক কি বলিব, ইহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপ বোধেরই নাম অবিদ্যা এবং তাহারই বিপর্য্যয়ে এ সমুদায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণীত হয়[৪৪]। ইহা ঘট, তাহা পট, উহা শকট, ইত্যাদি রূপে অবভাসমান এই যে জগজ্জাল, এ সকল অবিভু অর্থাৎ বিভু নহে। এবম্প্রকারা বুদ্ধির নাম অবিদ্যা এবং এ সমস্তই বিভু এবম্বিধা বুদ্ধির নাম বিদ্যা[৪৫]।

দশম সর্গ সমাপ্ত।

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমি তোমাকে তোমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, বিনা অভ্যাসে আত্মভাবনার উদয় হয় না, হইলেও তাহা স্থিরা হয় না[১]। যাহার অন্য নাম অবিদ্যা, সেই অজ্ঞান

নিতান্ত বলবান্ সুতরাং দুশ্ছেদ্য। উহা অসংখ্য জন্মপরম্পরার দ্বারা দৃঢ়মূল ও চক্ষুরাদি প্রবল প্রমাণের দ্বারা অনুভূয়মান; সেই কারণে উহা অত্যন্ত প্রবল[২।৩]। আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সেজন্য তাহার অস্তিতায় বহু লোক সন্দিগ্ধ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও সে সকলের অধিষ্ঠাতা মন যখন নির্বৃত্তিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার সত্তা অর্থাৎ অস্তিতা প্রকটিত হয়। যাহা প্রত্যক্ষের অতীত, ইন্দ্রিয় বৃত্তির অগোচর, তাহার আবার প্রত্যক্ষ কি? কিরূপে বা কিসের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হইবে[৪।৫]। হে রঘুনাথ! তাই তোমাকে বলিতেছি, হৃদ্বৃক্ষে আরূঢ় উক্ত অবিদ্যা লতাকে তুমি জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছেদন কর[৬]। জনক রাজা যেমন আত্মজ্ঞানতৎপর হইয়া সংসারে বিহরণ করিতেছেন, সেইরূপ তুমিও জ্ঞানাভ্যাসতৎপর হইয়া বিহরণ কর[৭]। হে রঘুনাথ! তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার ও আন্তরিক সমাধি আত্মানুভবানুসারী হইয়াছিল। বাহিরে কার্য্যবান্ ও অন্তরে সমাহিত এরূপ হওয়াই আত্মাভ্যাসের ফল এবং তাহাই প্রকৃত জ্ঞানপদাভিধেয়। তাদৃশ জ্ঞানই সত্য, আপাত জ্ঞান সত্য নহে[৮]। তাদৃশ নিশ্চয় অর্থাৎ তাদৃশ দৃঢ় জ্ঞান থাকায় ভগবান্ হরি বিবিধ যোনিজন্মে অবতরিত হন অথচ তৎপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকেন[৯]। হে রঘুনাথ! প্রভু ত্রিলোচনের যে জ্ঞান, এবং রাগরহিত চতুরাননের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তোমারও হউক[১০]। সুরগুরু বৃহস্পতির যে জ্ঞান, অসুরগুরু শুক্রের যে জ্ঞান, দিবসপতি সূর্য্যের যে জ্ঞান, নিশানাথ চন্দ্রের যে জ্ঞান, অনিল ও অনল দেবের যে জ্ঞান, নারদ পুলস্ত্য প্রচেতা ভৃগু ক্রতু অত্রি শুকদেব ও আমার যে জ্ঞান এবং অন্যান্য বিপ্রশ্রেষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত রাজাধিরাজ দিগের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান তোমার হউক[১১।১৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! ঐ সকল মহাবুদ্ধিধর যে জ্ঞানের মহিমায় লোকোত্তীর্ণ হইয়াছেন সেই জ্ঞানের বিবরণ আমাকে পুনর্ব্বার বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! হে মহাবাহো! হে বিদিতবেদ্য! তুমি যে জ্ঞানের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, সেই জ্ঞানের বিবরণ স্পষ্ট করিয়া বলি, শ্রবণ কর[১৪।১৫]।

হে মহাবাহো! এই যে জগজ্জাল দেখিতেছ, এ সমস্ত প্রকৃত পক্ষে জগজ্জাল নহে; পরন্তু সমস্তই অমল ব্রহ্ম[১৬]। চিৎ বা চেতনা,

ভুবন, ভূতগণ, আমি, শত্রু, মিত্র, বান্ধব, এ সমস্তই ব্রহ্ম। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই তিন কাল ব্রহ্মে অবস্থিত। যেমন তরঙ্গ সমূহের দ্বারা সমুদ্রের বৃদ্ধি অনুভূত হয়, তেমনি, ঐ সকলের দ্বারা ব্রহ্মেরও বৃদ্ধি (অর্থাৎ ভ্রান্তিময়ী বিকৃতি) বোধ গম্য হয়[১৭।১৮]। ব্রহ্মই ভোগ্য, ব্রহ্মই ভোগ, ব্রহ্মই ভোক্তা, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বৃদ্ধি বা প্রকাশ, এবং বৃদ্ধিও ব্রহ্মের শক্তি। অতএব, ব্রহ্ম যদি আপনি আপনার শত্রু ও অপ্রিয়কারী হন তাহা হইলে অবশ্যই রাগ দ্বেষাদির অস্তিতা কল্পিত খ বৃক্ষের অনুরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইবে[১৯।২১]। অর্থাৎ সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারা যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে ব্রহ্মে তাহাদের আর প্রসক্তি কি? যে কিছু স্ফুরণ, সমস্তই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের স্ফুরণ। সুতরাং সুখিত্ব দুঃখিত্ব উভয়ের কোনও কিছু নাই। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের তৃপ্তি ও ব্রহ্মেই ব্রহ্মের স্থিতি। সুতরাং ব্রহ্ম ব্রহ্মেই স্ফুর্ত্তি পাইতেছেন। আমিও ব্রহ্মাতিরিক্ত নহি। ঘটপটাদি বহিঃদৃশ্য ও অহমাদি আন্তর পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম। রাগ বিরাগ প্রভৃতির কল্পনা, কল্পনা মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা। যখন জন্ম মরণ দেহাদি সমস্তই ব্রহ্ম, তখন আর মরণে দুঃখ কি? আমি মরিলাম বলিয়া যে দুঃখ হয় সে দুঃখ রজ্জুসর্পেরই ন্যায় কল্পনা ব্যতীত বস্তু অর্থাৎ সত্য নহে। এইরূপ, যখন দেহও ব্রহ্ম, তখন অবশ্যই সম্ভোগ সুখও ব্রহ্ম। যেমন জল ও তদাশ্রিত তরঙ্গ ভিন্ন নহে, সেইরূপ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিবর্ত্ত বিশ্ব ভিন্ন নহে। ব্রহ্মে তুমিত্বও নাই, আমিত্বও নাই। মরণরূপী ব্রহ্মও ব্রহ্ম, দেহরূপী ব্রহ্মও ব্রহ্ম। যেমন স্পন্দমান জলের স্পন্দন জলেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর, সেইরূপ, জন্ম মরণাদিও ব্রহ্মের রূপান্তর বা বিবর্ত্তান্তর। তাহাতেও তুমিত্বও নাই, আমিত্বও নাই। যাহা পরমাত্মা, তাহাতে জড়াজড় বিভাগ নাই। যেমন হেমের বলয়ভাব, জলের আবর্ত্তভাব, সেইরূপ, আত্মারও প্রকৃতিভাব ইহা বিদিত হইবে। ইহা জড়, তাহা অজড়, এবম্বিধ দ্বৈরূপ্য একাদ্বয় ব্রহ্মে অবশেষিত। আমি জীব, তুমি জীব, তাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা, এ সকল অজ্ঞানগ্রস্ত আত্মার মোহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। জ্ঞান প্রাপ্ত আত্মায় ঐ সকল নাই। অজ্ঞানী আত্মার নিকট এ সকল দুঃখপ্রদ এবং জ্ঞানী আত্মার নিকট এ সকল আনন্দ ব্রহ্ম[২২।৩২]। অন্ধের নিকট ভুবন অন্ধকার কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকট ভুবন প্রকাশময়। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ, আত্মা, পরন্তু অজ্ঞানীর

দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখদাতা[৩৩]। যেমন শিশুর নিকট যক্ষের স্ফূর্তি, সেইরূপ, অজ্ঞের নিকট জগতের স্ফূর্তি। যে হেতু এই ঘট অর্থাৎ এই দেহ ব্রহ্মামৃতে পরিপূর্ণ, সেই হেতু বুঝিতে হইবে যে, সত্য সত্যই কেহ মরে না, সত্য সত্যই কেহ জীবিত থাকে না[৩৪,৩৫]। মহাসমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মে ভূতবৃন্দ কখন উল্লসিত ও কখন বা বিলসিত হইতেছে। ইহা নাই, তাহা নাই, ইহা আছে তাহা আছে, এ সকল ভ্রান্তিরই মহিমা ও তাহা আত্মারই আশ্রিত[৩৬]। ব্রহ্ম স্বনিষ্ঠ জগচ্ছক্তির দ্বারা আপনাতেই সংস্থিত। যেমন জল স্বীয় অভিন্ন তরঙ্গ ও কণা প্রভৃতির আকারে অবস্থিত, সেইরূপ, ব্রহ্মও বিশ্ব অভিন্ন বিশ্বের আকারে অবস্থিত। শরীরের নাশে মরণ বুদ্ধি অতীব ভ্রান্তির স্থল। যেমন মহার্ণব জল ব্যতীত অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, শরীরাদিও ব্রহ্ম ব্যতীত নহে[৩৭।৩৮]। যেমন কণা, কণিকা, ক্ষুদ্র লহরী, তরঙ্গ বা ঢেউ, স্রোতঃ, ফেণ ও লহরী প্রভৃতি, সেইরূপ, দেহ, দৃশ্যসমূহ ও সে সকলের উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ যেমন জলের অনতিরিক্ত, সেইরূপ পশ্চাদুক্ত বিভাগও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[৪০।৪১]। সুবর্ণে নানা আকার রচনার ন্যায় ব্রহ্মে নানা ভাবের কল্পনা মূঢ় দিগেরই হইয়া থাকে[৪২]।

হে রঘুকুলতিলক! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়, এ সমস্তই ব্রহ্ম। সুতরাং সুখ ও দুঃখ দুয়ের কিছুই নাই। এই আমি, এইরূপ আমার চিত্ত, এ সকল শব্দ প্রতিধ্বনির অনুরূপ জানিবে অর্থাৎ যেমন একই শব্দ পর্ব্বত গুহাদি প্রদেশে দুই আকারে প্রকাশ পায় তেমনি একই ব্রহ্ম নানা বাহ্যাভ্যন্তর পদার্থের আকারে প্রকাশ পাইতেছে[৪৩।৪৪]। অজ্ঞাত ব্রহ্মই অজ্ঞের ন্যায় স্থিতি করিতেছে। ব্রহ্মভাবে অভাবিত বিধায় ব্রহ্ম অজ্ঞের ন্যায় এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিত বিধায় ভাবিত কালে ব্রহ্ম এক অখণ্ড ও জ্ঞানস্বরূপ। সুবর্ণকে সুবর্ণ বলিয়া না জানিলেই তাহা মৃত্তিকা ও পিত্তলাদি বলিয়া প্রকটিত হয়[৪৫।৪৬]। ব্রহ্মজ্ঞগণই ব্রহ্মকে মহান্ আত্মা বলিয়া জানেন। অজ্ঞগণ তাহা জানে না। যেমন সুবর্ণ বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া সুবর্ণের সুবর্ণত্ব প্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ, ব্রহ্ম বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়াই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কারণ। উক্ত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিযুক্ত, যখন যে শক্তির উদ্রেক হয় তখন তিনি সেই আকারে প্রথিত হন[৪৭।৪৮]।

ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মকে কর্ম্ম কর্ত্তা করণ ও কারণের অতীত বলিয়া জানেন।। তিনি মহান্ আত্মা, প্রভু ও স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অনধীন। অজ্ঞগণ জানে না বলিয়াই তাঁহাকে অজ্ঞান ও জ্ঞানিগণ জানেন বলিয়াই তাঁহাকে অজ্ঞান নাশক জ্ঞান সংজ্ঞা দেন[৪০।৪১]। জানা না থাকিলে বন্ধু অবন্ধু মধ্যে গণনীয় হয় এবং জানা থাকিলে লোক সকল বন্ধু ভাবে পরিতুষ্ট থাকে[৪২]। পুরুষ যখন জানে, জীব জগতের বস্তুতা অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে, তখন তাহাদের উক্ত বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। দ্বৈত মিথ্যা, এ তথ্য বিজ্ঞাত হইলেও জীব দ্বৈতের প্রতি বিরক্ত হয়[৪৩।৪৪]। আমরা যে আমি আমি করি, তাহাও মিথ্যা, এরূপ নিশ্চয় হইলেও আমাদের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে। বৈরাগ্য জন্মিলেই ক্রমে জীব জগতের ব্রহ্মমাত্রতা উপলব্ধ করিতে থাকে। আমি ব্রহ্মই, এই সত্যভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই সত্যরূপে এ সকলের লয় হয়। অর্থাৎ জগৎ থাকিলেও সে তখন জগৎকে জগৎ বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিয়াই জানে[৪৫।৪৭]। তখন সে জানে, এক অপরিচ্ছিন্ন আত্মায় এ সকল কল্পিত, যাহা কল্পিত তাহা মিথ্যা, সুতরাং তুমি আমি তিনি প্রভৃতিও কল্পনা কারণে মিথ্যা। অতএব, যখন তুমি আমি প্রভৃতি কল্পনা থাকে না, তখন সে জানে, এ সমস্তই ব্রহ্ম; সুতরাং আমিও ব্রহ্ম। যখন স্বাত্মব্রহ্মবোধ প্রকট প্রাপ্ত হয়, তখন সে জানে—আমি নির্দুঃখ, নিষ্ক্রিয়, ব্যামোহরহিত, নিরীচ্ছ, সম, স্বচ্ছ, বিশোক, নিষ্কলঙ্ক, নির্লেপ ও নিরাময়[৪৮।৪৯]। আমি গ্রহণ ও বর্জ্জন করি না, কোন কিছু ইচ্ছাও করি না। আমি পূর্ণ বস্তু, ইহাই আমার সত্যরূপ। যে হেতু আমি ব্রহ্ম সেই হেতু রক্ত, মাংস, অস্থি, তন্নির্ম্মিত শরীর, চিৎ বা চেতনা, এ সমস্তই আমি। চিৎও আমি, আকাশও আমি, সূর্য্যাদি গ্রহও আমি, দিগ্‌ও আমি, বিদিক্ ও পৃথিবীও আমি[৫০।৬১]। আমিই ঘট পটাদি আকারে অবস্থিত, ইহা সত্য। তৃণ, উর্ব্বী, গুল্ম, কানন, শৈল, সাগর, দান, আদান, সঙ্কোচ, বিকাশ, এ সমস্তই চিদাত্মা ও অতিবিস্তৃত রূপধারী ব্রহ্ম আমি, এবং প্রাণীর প্রাণন ধর্ম্ম ও লতাগুল্মাদির উৎপত্ত্যাদি ধর্ম্ম, সমস্তই আমি[৬২।৬৪]। যাহাতে ও যাহা হইতে বিশ্ব এবং যাহা এ সমুদায়ের মূলতত্ত্ব, যাহা একাত্মা, পরব্রহ্ম, চিদাত্মা, ব্রহ্ম, সৎ, সত্য, অমৃত, জ্ঞ, ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ, যাহাকে সর্ব্বগত চিন্মাত্র ও চেতন

বর্জ্জিত বলা যায়, যাহা আভাস মাত্র, নির্ম্মল, সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা, যাহা সর্ব্বত্র বিরাজিত, শান্ত ও বিশুদ্ধ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা আমা ছাড়া নহে অর্থাৎ আত্মার অনতিরিক্ত। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণও আমার অনধিক[৬৭।৬৮]। ভেদধর্ম্ম পরিত্যাগ হইলে যে স্বরূপ স্বপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় সেই প্রতিষ্ঠিত স্বপ্রকাশ অনাময় ব্রহ্ম আমি। শব্দাদি ও শব্দাদির আধার আকাশাদির কারণ আমি এবং জগৎস্থিতির কারণও আমি[৬৯]। যাহা সকল পদার্থে সত্তা অর্থাৎ অস্তিতা অর্পণ করতঃ স্থিত রহিয়াছে, সেই চিদ্ব্রহ্ম আমি। আমি ক্ষয়োদয় রহিত চিৎ-ধারা[৭০]। সূর্য্য ও আলোকও আমি, পুষ্প ও সৌগন্ধও আমি, অথবা যোগিগণের অনুভাব্য পরমামৃতও আমি, এবং বৈদান্তিকদিগের কথ্যমান পরমানন্দও আমি। অহঙ্কার প্রভৃতি ভোক্তৃচক্র অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিবৃত্তি সকল আমার অতিরিক্ত নহে। আমি সুষুপ্তসদৃশ শান্তস্বভাব ও আলোকের ন্যায় নির্ম্মল[৭১।৭২]। আমি যার পর নাই উত্তম সম্ভোগ স্বরূপ, সর্ব্বত্র প্রকাশমান, স্বাদু দ্রব্যের স্বাদু, অর্থাৎ আমিই স্বল্প মাত্রায় সমুদায় স্বাদুদ্রব্যে বিরাজ করিতেছি[৭৩]। যে চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রসত্তা অর্পণ করে সে চৈতন্যও আমি। ভূমিষ্ঠ নরেরা যে আকাশে চন্দ্রাদির উদয় দর্শন করে তাহাও আমি এবং যাহা সুখ দুঃখাদির আন্তরালিকী অবস্থা তাহাও আমি। অপিচ, সত্যানুভবরূপী চিদ্ব্রহ্ম আমি[৭৪।৭৫]। বলা বাহুল্য যে, বিষয়সংস্পর্শশূন্য কদাচিৎ প্রতীয়মান যে নিরুপাধিক সুখাদি তাহাও আমি। ক্ষিতি জল ও পবন সংসর্গে যে বীজাদি অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয় সে অঙ্কুরশক্তিও চিদ্ব্রহ্ম আমি। খর্জ্জুর ও নিম্ব প্রভৃতি যে বিশেষ বিশেষ স্বাদ বহন করে, সে স্বাদ ও সে বহন সমস্তই আমি। যে চেতনা লাভ ও অলাভ বিধানে তুল্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই চেতনা চিদ্ব্রহ্ম ও তাহা মৎস্বরূপের অন্তর্গত। সূর্য্য উদিত হইলে ভূমিষ্ঠ নরের চক্ষু হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যে একটী দৃষ্টিসূত্র বিস্তৃত হয় সেই দৃষ্টিসূত্রের মধ্যগত যে কোন সত্তা সে সমস্তই চিদ্ব্রহ্ম আমি। আমিই সেই দৃষ্টিসূত্ররূপে বিস্তৃত হই[৭৭।৮৩]। চিদ্ব্রহ্ম আমি সকল শরীরে সমান, অর্থাৎ একরূপ। সেজন্য তাহাকে বা আমাকে সর্ব্বগামী বলা যায়[৮৪]। চিৎ-ই প্রকাশকারিণী ও কমনীয়স্বভাবা। ভোগ্য সকল অথবা স্বাদ সকল তদীয় শক্তিবিশেষ। যাহা কেবল স্বানুভূতি-

স্বরূপ, সেই চিদ্ব্রহ্ম আমি। এই চিৎ পদ্মনালে তন্তুর ন্যায় সর্ব্বদেহে বিস্তৃতা রহিয়াছে। দেহাদি ছিন্ন ভিন্ন হয় কিন্তু চিতের কিছুই হয় না। তাদৃশ অনাময় চিৎ আমি। মেঘ যেমন ভুবনাক্রমী, তেমনি; এই চিৎও ভুবনব্যাপিনী। এই চিৎ নিতান্ত দুর্লক্ষ্যা। ইহার আকার এত দুর্লক্ষ্য যে কোনও ইন্দ্রিয়ে ইহার গ্রহণ হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ চিতের প্রকাশ্য, কিন্তু চিৎ তাহাদের প্রকাশ্য নহে। তাদৃশ চিৎ আমিই। এই স্বানুভূতিময় চিৎ দেহে দেহে স্নেহমাত্র উপলক্ষে লক্ষিত হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। যেমন ক্ষীরে ঘৃতের সত্তা, সেইরূপ, সর্ব্ব দেহে চিদ্ব্রহ্মের সত্তা অহংরূপে প্রকটিত হয়। সুবর্ণে কেয়ূরাদি রচনার ন্যায়ে অহং ব্রহ্মে বিশ্ব পদার্থের রচনা[৮৭।৯০]। যে চিৎ সত্তাসামান্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ঘট সত্তা পট সত্তা প্রভৃতির ভেদক বিশেষণ পরিত্যাগে কেবল সত্তা রূপে বিরাজিত, সেই সত্তাসামান্য আমি। আমি নির্লেপস্বভাব ও সর্ব্ব পদার্থের অকৃত্রিম আদর্শ[৯১]। বলা বাহুল্য যে আমি মহতী চিৎ, সর্ব্বসঙ্কল্পের ফলদাতা ও সর্ব্ব তেজের তেজ অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশক[৯২]। যে কিছু উপাদেয় ও যে কোন উপাদান, সে সমুদায়েরও সীমা চিদাত্মা। যে চিদাত্মা ঘটপটাদি পদার্থে অস্তি এতদ্রূপে এবং চতুর্ব্বিধ প্রাণিশরীরে স্ফূর্ত্তিরূপে বা চেষ্টা এতদ্রূপে রহিয়াছে সেই চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ স্বাত্ম-অভেদে জানি[৯৩।৯৪]। যে চিদাত্মা জাগ্রৎকালেও সুষুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ সদা নির্ব্বিশেষ, যে চিদাত্মা অগ্নিতে উষ্ণ, হিমে শীত, অন্নে মৃষ্টতা (সুখসেব্যতা), ক্ষুরে তীক্ষ্ণতা, অন্ধকারে কৃষ্ণতা ও চন্দ্রে শুভ্রতা রূপে স্থিত আছে সেই চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ স্বাত্ম অভেদে ধ্যান করি। যিনি বাহিরের ও অন্তরের আলোক, নিকটে থাকিলেও দূর (অজ্ঞদিগের দূর ও জ্ঞানিদিগের নিকট অর্থাৎ হৃদয়স্থ) সেই চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি। তিনিই মধুর রসের মাধুর্য্য, তীক্ষ্ণ পদার্থের তীক্ষ্ণতা, সেজন্য আমরা তাঁহারই উপাসনা করি। তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় সমরূপ, সে ভাবেও আমরা তাঁহার উপাসনা করি। যাহাতে সর্ব্ব সঙ্কল্পের বিরাম, সর্ব্ব কৌতুকের অবসান ও সর্ব্ব সংরম্ভের (আড়ম্বরের) বিশ্রাম, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্য। নিষ্কৌতুক, নিরীহ, নিরারম্ভ, নিরংশ, নিরহঙ্কার চিদাত্মা আমাদের উপাস্য

৯৫।১০১। চিদাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বরূপী অথচ একরূপী। চিদাত্মার চেতনা অসীম, তাহা দেহরূপ মুক্তার সূত্র, জাগ্রদাদি অবস্থার আশ্রয় ও জগৎ পক্ষীর নীড়১০২।১০৩। চিদাত্মাই জীবপক্ষীর বৃহৎ জাল। এই চিদাত্মায় যাহা নাই তাহা অন্য কুত্রাপি নাই১০৪। চিদাত্মা সর্ব্বসত্তা নির্ব্বাহক বিধায় সৎ এবং মহাপ্রলয়ে তদ্বিপরীত বলিয়া অসৎ। চিদাত্মাই বিশ্বাসের চূড়া ও সর্ব্বসম্পত্তির আস্পদ। চিদাত্মাই সমুদায় আকারে বিহরণশীল, স্নেহের আস্পদ, শান্তস্বভাব হইলেও দেহরূপ বায়ুর তাড়নায় অশান্তপ্রায়। চিদাত্মা তত্ত্বদৃষ্টিতে মুক্ত ও অতত্ত্ব দৃষ্টিতে বদ্ধ। ইনি বুদ্ধিসরোবরের পদ্মিনী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুদৃশ্য ১০৫।১০৭। চিদাত্মাই জীবের জীবনোপায় ও স্বতঃসিদ্ধ অমৃত ও অসমুদ্রপ্রভব চন্দ্র১০৮। জীবাত্মা অনাহার্য্য অমৃত ও স্বতঃপ্রমাণ ও সত্য। চিদাত্মাই শব্দ স্পর্শাদির অভিব্যঞ্জক ও ঐ সকলের দ্বারা আভাসিত। চিদাত্মা আকাশ অপেক্ষা বিশদ ও সকল লোকের রঞ্জন১০৯।১১০। বস্তুতঃ ইনি রঞ্জনও নহেন, রঞ্জনাও নহেন, আকাশও নহেন। ইনি মহামহিম অথচ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অতীত। ইনি কোন কিছুর কর্ত্তা নহেন।

অধ্যাস দৃষ্টিতে এ সমস্তই আমি ও সম্বন্ধাধ্যাসের দ্বারা এ সমস্তই আমার। অপবাদ দর্শনে অহং আমি নহি এবং অধ্যারোপ দৃষ্টিতে অহং আরোপের স্থান। উক্তবিধ অধ্যারোপ ও অপবাদ বিধির দ্বারা আমি আমার তত্ত্ব বিদিত হইয়াছি ও হইতেছি। এখন এই জগৎ আমার নিকট মায়াবিরচিত হউক, আর স্থির স্বভাব বা অন্য প্রকার হউক, উভয় প্রকারেই আমি অশোক ও অজর১১১।১১২।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশ সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! জনকাদি রাজা ও নানা মুনি ঋষি ঐরূপ নিশ্চয়ে জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ অন্তরে সত্য পদে ও বাহিরে লোকাচার অনুষ্ঠানে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ ও সমসুখে অবস্থিত ছিলেন[১]। তাঁহারা জীবন মরণের পুরস্কার তিরস্কার করিতেন না। তাঁহারা মেরুর ন্যায় স্থির ও নারায়ণ বাহুর ন্যায় দুর্লক্ষ্য বেধে সমর্থ (ব্রহ্মপদ অতি দুর্লক্ষ্য, সে পদও তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল।) তাঁহারা যার পর নাই সরল ও নম্রস্বভাব[২।৩]। এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ বনখণ্ডে, দ্বীপে, নগরে, উপবনে, দেবোদ্যানে, ও বনশ্রেণীতে অমর গণের ন্যায় ক্রীড়া বিহারাদি করিতেন[৪]। কুসুম শোভিত দোলার আন্দোলনে ও সুমেরুর অগ্রশৃঙ্গে ভ্রমণ করিতেন[৫]। তাঁহাদের কেহ কেহ শত্রুবিজয় পূর্ব্বক ছত্রচামরাদিলাঞ্ছিত রাজত্বও করিতেন[৬]। লোক সকল ইহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অনুষ্ঠান সকল নির্ব্বাহ করিত[৭]। ইহারা সকলেই দৃষ্টাদৃষ্ট সাধন সম্পন্ন হইয়া বিবিধ ভোগ কলাপে বিভূষিত ছিলেন অথচ সে সমুদায়ে নির্লিপ্ত ছিলেন[৮]। ইহারা ইন্দ্রের নন্দন কাননেও প্রবেশ করিতেন এবং গার্হস্থ্য অবলম্বনে যজ্ঞ ক্রিয়াদিও করিতেন[৯।১০]। আবার সময় বিশেষে ঘোরতর সংগ্রাম করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। বিপদ উপস্থিত হইলেও চলচ্চিত্ত হইতেন না এবং ক্রোধাদির বশীভূত হইতেন না[১১।১২]। তাঁহাদের মনে রাগ দ্বেষ ও ভ্রান্তি ছিল না। কোনও কিছুতে ব্যাসক্ত হইতেন না ও আশার সীমান্ত সত্বনামক মহাপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৩]। কি মহা বিপদ কি মহান্ ঐশ্বর্য্য, কুত্রাপি তাঁহারা অধীর হইতেন না, হিমাচলের ন্যায় ধৈর্য্যে অবস্থিতি করিতেন[১৪]। পরম কমনীয় স্ত্রীসৌষ্ঠবে ও বিলাসে উল্লসিত হইতেন না। হে রঘুনাথ! দুঃখ শোকাদি তাঁহাদিগকে ম্লান করিতে পারিত না ও ভোগ সমূহ তাঁহাদিগকে হৃষ্ট তুষ্ট করিতে পারিত না[১৫।১৬]। তাঁহারা যোগ্য ভোগ করিতেন, তদুপযোগী

কার্য্যও করিতেন, অথচ সে সকলে তাঁহারা অব্যগ্র থাকিতেন অর্থাৎ সে সকলে তাঁহারা "আমি কর্ত্তা, আমি করিতেছি" এরূপ অভিনিবেশ রাখিতেন না। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা কর্ম্মতৎপর থাকিলেও সে সকলের ইষ্টানিষ্ট ফল লক্ষ্য করিতেন না[১৭]। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে আপনার উৎকর্ষানুভব করিতেন না, শত্রুসমাক্রান্ত হইলে অপ-কর্ষানুভব করিতেন না, সুখ লাভে সন্তুষ্ট ও সঙ্কটে বিম্লান হইতেন না[১৮], বিমোহন বিষয়ে মুগ্ধ ও বিপদে নিমগ্ন হইতেন না, শুভ লাভে হৃষ্ট ও শোক প্রাপ্তে রোদমান হইতেন না[১৯]। স্বাশ্রমোচিত আচার ব্যবহার নির্ব্বাহ কবিতেন অথচ সংরম্ভী (কর্ত্তৃতাভিমানী) ছিলেন না[২০]। হে রঘুনাথ! তুমি তাদৃশী পাপতাপনাশিনী দৃষ্টি (জ্ঞান) অব-লম্বন করিবে ও অহং পরিত্যাগী হইয়া আহার বিহারাদি করিবে[২১]। সৃষ্টিপরম্পরা যেমন যেমন দৃষ্ট হইবে, ভ্রমবর্জ্জিত হইয়া সে সকল বিষয়ে সুমেরুর ন্যায় স্থির ও সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া সর্ব্বত্র সাম্য অনুভব করিবে[২২]। এ সমস্ত চিন্ময়, চিৎ ছাড়া অন্য কিছু নাই, এ নিশ্চয় স্থির রাখিয়া, মহত্তা অবলম্বন করতঃ কুত্রাপি ব্যাসক্ত না হইয়া, সম ব্রহ্মে অবস্থান করিবে[২৩,২৪]। মূঢ় দিগের ন্যায় ধনের উদ্বেগে রোদন ও তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা করিও না এবং আবর্ত্তে তৃণের ন্যায় উদ্ভ্রান্তচিত্তে ভ্রাম্যমান হইও না[২৫]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! ভগবৎপ্রসাদে আজ্ আমি অনাচ্ছন্ন সূর্য্য সম্পর্কে অম্বুজের ন্যায় বিকসিত অর্থাৎ প্রবুদ্ধ হইয়াছি। আমার ভ্রম অস্তগত হইয়াছে, সন্দেহও বিদূরিত হইয়াছে[২৬,২৭]। হে সাধো! আমার মদ, মোহ, মান, মাৎসর্য্য, এ সকল বিনষ্ট হইয়াছে, শোক উপশান্ত হইয়াছে, এখন আমি চিরকালের নিমিত্ত প্রমুদিত হইয়াছি। এখন আমি শঙ্কাশূন্য হইয়া আপনার রাজ্যপালনাদিবিষয়ক আদেশ প্রতি-পালন করিতে সমর্থ হইব[২৮]।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ সর্গ।

—○*()*○—

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাসনা ক্ষয় হওয়ায় আমি জীবন্মুক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি সত্য; পরন্তু প্রাণ নিরোধ দ্বারা বাসনা বিনাশ ও তাহা হইতে জীবন্মুক্তি পদলাভ যে প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হয় সেই প্রক্রিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন[১।২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সংসার উত্তরণের যে যুক্তি (শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া); তাহাকে আমরা যোগ শব্দে উল্লেখ করি। সেই যোগ দুই প্রকার। উভয় প্রকারেরই ধর্ম্ম চিত্তের উপশম অর্থাৎ চিত্তের বিলয়[৩]। তাহার অন্যতর প্রকার আত্মজ্ঞান, পৃথিবীতে তাহা সর্ব্ববিদিত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম প্রাণ নিরোধ, এক্ষণে তাহার বিবরণ বলি, শ্রবণ কর[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, উক্ত দুই প্রকারের যে প্রকার সুলভ, শুভ ও অল্প কষ্টকর, তাহা আমাকে বলুন। তাহা বিদিত হইলে আমার আর চিত্তবিক্ষেপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদিও তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণনিরোধ, এই উভয় প্রকারই যোগশব্দের বাচ্য; তথাপি, প্রাণনিরোধ বিষয়েই যোগশব্দের প্রসিদ্ধি অতিশয় বিস্তৃত হইতে দেখা যায়[৬]। সংসার উত্তীর্ণ হওয়ার ক্রম দ্বিবিধ। এক যোগ ও অপর জ্ঞান। মনীষিগণ বলেন যে, ঐ দুই উপায়ের ফল একই প্রকার। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাও সংসার জয় হয় এবং যোগের দ্বারাও সংসার জয় হয়। তন্মধ্যে অধিকারী ভেদে উক্ত উভয়ের সাধ্যাসাধ্য বিভাগ স্থিরীকৃত আছে। অর্থাৎ কাহার কাহার পক্ষে যোগ অসাধ্য এবং কাহার কাহার পক্ষে জ্ঞানই অসাধ্য। পরন্তু আমি মনে করি, জ্ঞানই সুসাধ্য[৭।৮]। তৎপ্রতি কারণ এই যে, জ্ঞান সকল অবস্থায় সদা স্বপ্রকাশ। আর অজ্ঞান পরপ্রকাশ্য অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশ্য। পরাধীন বিষয়ে অজ্ঞান ও তদ্‌ঘটিত কৌশলের কার্য্য দুষ্কর এবং স্বপ্রকাশ বিষয়ে জ্ঞানরূপ উপায় অদুঃখপ্রদ[৯]। যোগে ধারণা, আসন ও উপযুক্ত স্থানাদি আবশ্যক হয়, সেজন্য তাহা সুসাধ্য হয়

না। কিম্বা চিত্ত স্থির করিয়া ধ্যানাদি করা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অতি দুষ্কর হইয়া থাকে[১০]। হে রঘুনাথ! শাস্ত্রে যে জ্ঞান ও যোগ এই দ্বিবিধ উপায়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার একতর জ্ঞান। এই জ্ঞান অত্যন্ত নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞেয় দ্বারা অবিদ্ধ। এক্ষণে যোগের কথা বলি, শ্রবণ কর। এই যোগ প্রাণ ও অপান নামক দ্বিবিধ অধ্যাত্মবায়ুর সমতা বা নিরোধ এতন্নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সিদ্ধি কামুকের সিদ্ধি দাতা এবং জ্ঞানকামীর মোক্ষ দাতা (যাহারা অনিমাদি সিদ্ধি ইচ্ছা করে তাহাদের অনিমাদি সিদ্ধি হয় এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞান কামনা করে তাহাদের তত্ত্ব জ্ঞান হয়)। হে রাজকুমার রাম! তুমি যদি প্রাণ সঞ্চরণ রোধ করতঃ সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পার তাহা হইলেও তুমি সেই বাক্য মনের অবর্ণনীয় পরমানন্দ অনুভবের লাভ করিতে পারিবে[১১,১২]।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মরুস্থলে মৃগতৃষ্ণিকা দর্শনের ন্যায়, পূর্ব্বপ্রোক্ত পরম পদের অবিদ্যাবৃত প্রদেশে, এই ব্রহ্মাণ্ড নামক প্রস্পন্দ জন্মিয়াছে। (প্রস্পন্দ অর্থাৎ বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি)[১]। এতদ্বিধ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা কমলযোনি ব্রহ্মা। আমি তাঁহার মানস পুত্র, আমার নাম বশিষ্ঠ, এবং আমি যুগে যুগে সপ্তর্ষি লোকে অবস্থান করি[২,৩]। একদা আমি ইন্দ্র সভায় নারদাদি ঋষিগণের নিকট চীরজীবী দিগের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম[৪]। সেই প্রসঙ্গে শাতাতপ নামক মুনি বলিলেন, সুমেরুর ঈশান কোণস্থ পদ্মরাগময় শৃঙ্গে চুত নামে প্রসিদ্ধ এক কল্পবৃক্ষ আছে[৫,৬]। তাহার মূর্দ্ধপ্রদেশস্থ স্কন্ধ বিশেষের কোটরে এক বিহঙ্গালয় রহিয়াছে, তাহা হেমরূপাময়ী লতিকায় সমাচ্ছন্ন[৭]। উক্ত কোটরে ভুশুণ্ড নামে এক বায়স বাস করে। এই ভুশুণ্ড রাগাদিদোষপরিশূন্য সুতরাং শান্ত স্বভাব। এই বায়স যদ্রূপ চীরজীবী তদ্রূপ চীরজীবী দেবতাদের মধ্যেও [illegible] দীর্ঘায়ু বায়স নীরাগ, মহাবুদ্ধিধর, বিশ্রান্তমতি অর্থাৎ

জীবন্মুক্ত বা তত্ত্বজ্ঞানী ও কালজ্ঞ[১০]। এই পক্ষী যেরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে, যদি কেহ তাহার ন্যায় হইতে পারে, তাহা হইলে সেও দীর্ঘ জীবনের তদ্রূপ সাফল্যপ্রাপ্ত হইতে পারে[১১]। আমি পুনঃ পুনঃ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় মুনিপ্রবর শাতাতপ পুনঃ পুনঃ তাহার দীর্ঘজীবিতার বিষয় সত্য বলিয়া বর্ণন করিলেন[১২]। কথা শেষ ও সভা ভঙ্গ হইলে আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া উক্ত ভুশুণ্ডকে দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। সুমেরুর যে শৃঙ্গে ভুশুণ্ড বাস করে, ক্ষণমধ্যে আমি সেই পদ্মরাগময় শৃঙ্গে গমন করিলাম[১৩,১৪]। দেখিলাম, শৃঙ্গটী রত্নময় গৈরিক ধাতুতে রক্তায়মান ও দেখিতে অতি সুন্দর। বহ্নির ন্যায় তেজস্বী ও রক্তবর্ণ হওয়ায় ইহাকে মদোন্মত্ত যুবার অনুরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে[১৫]। ইহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কল্পাগ্নিনিচয় পিণ্ডীভূত (জমাট্) ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার মস্তকে যে ইন্দ্রনীল মণির স্তূপ রহিয়াছে, সে সকলের প্রসৃত প্রভা ধূমের সহিত তুলিত হইতে পারে[১৬]। যেন সমুদায় রাগের (রক্ত বর্ণের) রাশি, যেন সকল সন্ধ্যা মেঘের ঘনীভাব (জমাট), যেন ইহা মেরুর উৎক্রান্তি নাড়ী, যেন সুমেরুর জঠরানল ব্রহ্মনাড়ীপথে মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া উঠিতেছে, যেন বনদেবীরা ইহাকে অলক্তক রসে রঞ্জিত করিয়াছে, যেন তাহারা আকাশস্থ চন্দ্রকে কৌতুকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় অলক্তকরঞ্জিত হস্ত প্রসারিত করিতেছে[১৭,১৮], যেন কোন বাড়বাগ্নি বা বজ্রাগ্নি, যেন এই মেরু নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিবার জন্য অঙ্গুলী বিস্তার করিতেছে[২০,২১]। অহো! ইহা যেন মেঘরূপ মৃদঙ্গের ধ্বনিযুক্ত, ইহা যেন কোন এক মহারাজার ক্রীড়ামন্দির, যেন ইহা হাস্যময় কুসুমের গুচ্ছ, যেন ইহা ধ্বনিকারী ষট্পদের পেটরা, যেন ইহা অপ্সরাবৃন্দের ক্রীড়া স্থান[২২,২৩]। দেবগণ ইহার শিলা খণ্ডে বিশ্রাম করে ও কন্দরে বিবুধমিথুন (দেব দেবী) বাস করে। এই শৃঙ্গ যেন একটী তাপস। মেঘ ইহার পরিধেয় অজিন, গঙ্গা ইহার যজ্ঞোপবীত, অত্যুচ্চ বেণু সকল ইহার দণ্ড, গঙ্গা নির্ঝর ইহার কমণ্ডলু। ইহা গন্ধর্ব্বদিগের গানে সুভগ, সুগন্ধে আমোদিত, সুখসেব্য অনিলে মধুর, স্বর্ণপদ্মের বিকাশে বিভূষিত, এবং ইহা যেন ব্যোমবীথির পর প্রান্তে অবস্থিত[২৪,২৭]। ইহা যেন শ্বেত, পীত, হরিত, ও পাটল বর্ণের বনকুসুমে রঞ্জিত সুরযুবতিদিগের লীলাপর্ব্বত[২৮]।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আমি গিয়া দেখিলাম, বর্ণিত মেরুশৃঙ্গের শিরঃপ্রদেশে সমবিস্তৃত ও লম্বায়মান শাখা সমূহে পরিবৃত চূত তরু যথাবর্ণিত প্রকারে রহিয়াছে। ইহার সমস্ত অঙ্গই প্রাণিগণের অভিলাষ পূর্ণ করে, সেজন্য ইহার নাম কল্পাঙ্গ। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষ পুষ্পবেণুরূপ শ্বেত মেঘে পরিবৃত, রত্নস্তবকরূপ দন্তে দন্তুর ও উচ্চতায় আকাশজয়ী[১।২]। আকাশে যে পরিমাণ তারা, এই বৃক্ষে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পুষ্প। যে পরিমাণ মেঘ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ শ্যামল পল্লব। যেপরিমাণ সৌরকিরণ, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ পুষ্পরেণু। মেঘে যে পরিমাণ তড়িৎ, এই বৃক্ষে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মঞ্জরী[৩]। ইহার স্কন্ধদেশে ভ্রমরের গীত, পল্লবে দোলালোল অপ্সরোগণের অনুকার অর্থাৎ সাদৃশ্য[৪]। এখানে যে পরিমাণ সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিহঙ্গ। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষ রত্নকান্তিতুল্য নির্ম্মল নীহারের দ্বিগুণিত ত্বক্‌ রূপ বস্ত্রে পরিবৃত[৫]। ইহার ফল ঔন্নত্যে, বৃহত্ত্বে ও রসপূর্ণতায় চন্দ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ। ইহার পর্ব্ব অর্থাৎ স্কন্ধ স্থান কল্পান্তমেঘ অপেক্ষাও অধিক বৃহৎ ও নিবিড়িত[৬]। ইহার পত্র কিন্নর গণের বিশ্রামযোগ্য, লতা বিতান ভাগ দেবতাদের শয্যাযোগ্য[৭]। যৎকালে অপ্সরাগণ ইহার পুষ্প গ্রহণ করে তৎকালে ভৃঙ্গকুল চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হয় ও পুষ্প সৌরভ দিক্‌ সকলকে আমোদিত করে[৮]। সুর, কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ এই স্থানে বিহার করে এবং এই স্থান যেন অভিনব আনন্দ জগৎ[৯]। ইহার কলিকা, পল্লব, পুষ্প, মঞ্জরী, গুচ্ছ সমস্তই ঘন। ইহা দৃশ্যতায় দিব্যচন্দ্র ও রত্নালঙ্কার দ্বারা পরিবৃতের ন্যায়[১০।১১]। ইহার সর্ব্বত্র কুসুম, সর্ব্বত্র ফল ও সর্ব্বত্র পল্লব, সর্ব্বত্র সুগন্ধময় কুসুমরজঃ বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, এই স্থান যার পর নাই অদ্ভুত[১২]। ইহার কক্ষপ্রদেশস্থ কুঞ্জে, লতায়, পত্রে, পর্ণে ও পুষ্পে, বিহগ গণের আলয় (নীড়) দেখিলাম[১৩]। ব্রহ্মবাহন হংস ও তাহাদের শাবক, অগ্নিবাহন শুকপক্ষী ও তাহাদের শাবকদিগকেও

দেখিলাম। ষড়াননবাহন ময়ূর ও তাহাদের পোতক গণকেও দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য ব্যোমচর পক্ষীও আমার নয়নগোচর হইল[১৯,২০]। দেখিলাম, হেমচূড়, কলবিঙ্ক, গৃধ্র, কোকিল, ক্রৌঞ্চ, কুক্কুট, ভাস, চাষ ও বলাকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী নীড় রচনা করিয়া বাস করিতেছে[২১,২২]। আরও দেখিলাম, এই বৃক্ষের দক্ষিণস্কন্ধশাখায় কৃষ্ণবর্ণ কাক সমূহ বাস করিতেছে। এই শাখার পত্রপুঞ্জ অতিপুষ্ট ও অত্যন্ত নিবিড়িত এবং তত্রস্থ কাকবৃন্দও কল্লান্তমেঘবৃন্দের অনুরূপ[২৩,২৪]। এই কাকাবাস শাখার একদেশে একটী কোটর দেখিলাম, তাহা বিবিধ পুষ্পাস্তরণে সুসজ্জিত ও নানা প্রকার সদ্‌গন্ধে আমোদিত। দেখিলাম, এই কোটরে শান্তস্বভাব ও অক্ষুভিতাকার বায়স দিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমান্ অতি উন্নতাকৃতি ভুশুণ্ড স্থিত রহিয়াছেন[২৫,২৭]। কাচ খণ্ডের মধ্যগত বৃহৎ ইন্দ্রনীল মণি দেখিতে যদ্রূপ, সেই বায়সসভায় ভুশুণ্ডের অবস্থানও দেখিতে সেইরূপ। অনুমান হইল, ভুশুণ্ডের মনে কোনরূপ পাপ তাপ নাই, কোনরূপ দুশ্চিন্তাদি নাই, তজ্জন্য সে অত্যন্ত মাননীয়[২৮]। ইনি ধ্যানী জ্ঞানী মৌনী সমাধি সুখী ও দীর্ঘজীবী বলিয়া বিখ্যাত[২৯]। ইঁহার দীর্ঘজীবিতা জগদ্বিখ্যাত, ইঁহার নাম ভুশুণ্ড, ইনি অনেক যুগ যুগান্তরের আগম ও অপায় দেখিয়াছেন[৩০]। ইনি বহুতর কল্পের আরম্ভ, সমাপ্তি ও তন্মধ্যগত জীবচক্রের বিবিধ দশা, লোকপাল দিগের জন্ম অবগত আছেন[৩১]। অতি পুরাতন অর্থাৎ অতিসুদীর্ঘ কালের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর অসুর ও রাজা দিগের বৃত্তান্ত ইঁহার স্মরণ পথে রহিয়াছে। ইনি দেখিতে সুন্দর, ইঁহার মন সতত প্রসন্ন ও গম্ভীর, এবং ইঁহার বাক্যও সুশ্রবণীয় ও পণ্ডিতোচিত। যাহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য, তাদৃশ বিষয় ইনি বিশদ করিয়া বলিতে পারেন। ইনি মমত্বদোষবর্জ্জিত ও নিরহঙ্কার। ইনি সকলের নিকট পুত্রের ন্যায় প্রিয়, সকলের সুহৃদ ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই সংসারের যাবন্ত প্রাণী ও তাহাদের যাবন্ত অবস্থা, সে সমস্তই ইনি বিদিত আছেন। ইনি বিজ্ঞদিগের গণনায় বিজ্ঞতম বলিয়া গণ্য[৩২,৩৩]।

অধিক কি বর্ণন করিব, এই ভুশুণ্ড অতীব সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্ন স্বভাব, মধুরভাষী, মহাত্মা, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদ্য, সরোবরের ন্যায় অন্তঃশীতল, হৃদ্‌পদ্মাকাশের অনুরূপ স্বচ্ছস্বভাব, ব্যবহারবেত্তা, গম্ভীর ও নির্ম্মলাশয়[৩৪]।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত।

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর আমি নভোমণ্ডল হইতে বর্ণিত প্রকার ভুশুণ্ডের সমীপে অবতরণ করিলাম। আমার গমনে সেই বায়স সভা কিঞ্চিৎ সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল; নীলোৎপল পূর্ণ সরোবরের বিচলনে যদ্রূপ শোভা উদ্ভূত হয়, বায়স-সভার বিচলনেও তথায় তদ্রূপ শোভা উৎপন্ন হইল[১,২]। পরে ভুশুণ্ড আমাকে দেখিবা মাত্র বুঝিলেন, ইনি বশিষ্ঠ, মৎসকাশে আগমন করিয়াছেন[৩]। অনন্তর পর্ব্বতে মেঘশিশুর ন্যায় সেই বায়সরাজ পত্রপুঞ্জ হইতে উত্থিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে বলিলেন, হে মুনিবর! আপনি ত এস্থানে আসিতে ক্লেশ প্রাপ্ত হন নাই[৪]? পরে তিনি সঙ্কল্পজাত হস্তদ্বয় দ্বারা আমার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। এবং হে ভগবন্! এই পত্রাসনে উপবেশন করুন, এই বলিয়া স্বয়ং নবপল্লব সকল প্রদান ও বিস্তৃত করিয়া দিলেন[৫,৬]। তৎসভাস্থ অন্যান্য বায়সগণও তদনুরূপ আচরণ করিলে আমি সেই পত্রাসনোপরি উপবিষ্ট হইলাম। পরে সেই বায়সপতি ভুশুণ্ড ও তৎসভাস্থ বায়স সকল আমার উদ্দেশে অর্ঘ্য পাদ্যাদি আহরণ করিলেন ও করিল। তৎপরে তিনি হৃষ্টচিত্তে আমাকে বলিতে লাগিলেন[৭,৮]।

ভুশুণ্ড বলিলেন, অহো ভাগ্য! বহুকালের পর আজ্ আমি ভগবানের দর্শন লাভ করিলাম। বৃক্ষস্বরূপ আমরা আজ্ ভবদ্দর্শনামৃতে সিক্ত হইলাম[১০]। আমাদের চিরসঞ্চিত পুণ্য ভারের প্রেরণাতেই অদ্য ভগবানের অত্র স্থানে আগমন হইয়াছে[১১]। আপনি এই মোহরচিত সংসারে চিরকাল বিচরণ করিতেছেন, তাহাতে ত আপনার সাম্যাস্থিতি বিচ্ছিন্ন হয় নাই? আপনি ত পবিত্রচিত্তে অবস্থিত আছেন[১২]? কি জন্য আপনি মৎসকাশাগমনের ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগকে লজ্জিত করিলেন? তাহা শুনিবার জন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি[১৩]। হে মুনে! যদিও আমি আপনার পাদপদ্ম দর্শনে সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছি, তথাপি, আপনার মুখে তাহা শুনিবার ইচ্ছা করি। ইন্দ্র সভায়

চিরজীবী জীবের কথা প্রসঙ্গে আমরা আপনার স্মৃত্যারূঢ় হইয়াছিলাম, সেই কারণে আজ্ এই আশ্রম আপনার পদরজে পবিত্রিত হইয়াছে [১৪।১৫]। হে মুনিবর! যে জন্য আপনার আগমন তাহা আমি বিদিত হইলেও আমি আপনার বাক্যামৃত পানের বাঞ্ছায় অতীব উৎসাহান্বিত হইয়াছি[১৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই চিরজীবী ত্রিকালদর্শী পক্ষী ভুশুণ্ড আমাকে উক্তরূপ বলিলে আমি বক্ষ্যমাণ প্রকার বাক্য সকল বলিলাম। বলিলাম, হে বিহঙ্গমরাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। চিরজীবী দিগের কথা প্রসঙ্গে আপনার কথা উঠিয়াছিল, তৎপরে আমি আপনাকে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। ভাগ্যবলে আপনি কুশলী ও শীতল চিত্তে অবস্থান করিতেছেন এবং ভাগ্যবলে আপনি অতিভীষণ সংসার পাশে অবদ্ধ আছেন[১৭।১৯]। সম্প্রতি আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহার ছেদন করুন। অর্থাৎ আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কোন্ কুলে জন্মিয়াছিলেন? কি প্রকারে আপনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন? আপনার আয়ুঃ কত? এবং কি কি পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনার স্মৃতি পথে বিরাজিত রহিয়াছে? এবং আপনার এতদ্রূপ বাসস্থানের বিধান কে করিয়াছে[২০।২১]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে মুনে! আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় আমি অবশ্যই আদ্যোপান্ত বর্ণন করিব। আপনি উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া সে সকল কথা শ্রবণ করুন[২২]। আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে বৃত্তান্ত অবশ্যই অন্য শ্রোতারও পাপ তাপ নাশক ও অশুভ নিবারক। যেমন মেঘোদয়ে সূর্য্যের তাপ বিনষ্ট হয় তেমনি মহাপুরুষশ্রাব্য কথাতেও শ্রোতার পাপ তাপ বিনষ্ট হয়[২৩]।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! এই ভুশুণ্ড বুদ্ধিমান্, সরল স্বভাব, ইষ্ট লাভে হৃষ্ট নহে, অনিষ্ট প্রাপ্তে কাতর নহে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বর্ষামেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধভাষী, সহাস্য আস্য, জগত্রয়ের তত্ত্ব বিদিত, সর্ব্বদর্শী বা ভোগবৃন্দে নিস্পৃহ, সংসারের রহস্য বেত্তা, পরাবর ব্রহ্মের বিজ্ঞাতা, অতি ধীর, অতি স্থির, নিষ্কাম, দেখিতে পরিশ্রান্ত কিন্তু অন্তরে বিশ্রান্ত ও আবির্ভাব তিরোভাবের তত্ত্বজ্ঞ। ইহার বাক্য বীণাবাদ্য অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী এবং যেন ইনি মূর্ত্তিধারী পরব্রহ্ম। আমি দেখিলাম, ইনি যেন মদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার উদ্যোগী হইয়াছেন। তৎপরে দেখিলাম, মেঘ যেমন মধুপানরসিক ভ্রমরের প্রতি তাহাদের ধ্বনির অনুকার করে, তাহার ন্যায় এই ভুশুণ্ড মদভিমুখী হইয়া বক্ষ্যমাণ বচনাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশ সর্গ।

—○()*()○—

ভুশুণ্ড বলিলেন, মুনে! এই জগতে, হর নামে এক দেবাধিদেব আছেন। ইনি সমুদায় স্বর্গবাসী দিগের শ্রেষ্ঠ সুতরাং সর্ব্বদেবতার নমস্য পূজ্য ও উপাস্য। ইঁহার নয়নাবলি ভ্রমরাবলির শোভা বিলোপ করে এবং ইঁহার দেহার্দ্ধে তদীয় বিলাসিনী অবস্থিতা থাকেন। যাহার লহরী দেখিতে তুষারের ন্যায় শুভ্র বর্ণ, ও হারের ন্যায় সুন্দর, সেই গঙ্গা তাঁহার জটাজূটের কুসুম বা কুসুম মালিকার ন্যায় আবেষ্টনকারী

এবং শ্রীমান্ চন্দ্র ইঁহার শিরোভূষণ মণি[৩।৪]। অবিশ্রান্ত বিগলিত চন্দ্রামৃতের দ্বারা যে বিষের মারকশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে সেই কালকূট বিষ ইঁহার কণ্ঠভূষণ[৫]। মহাপ্রলয়ে ত্রিজগৎ ধ্বংসে যে কেবল পরমাণুময় ভস্ম বিরাজ করে, সেই পরমাণুময় ভস্ম ইঁহার গাত্রভূষণ[৬]। চন্দ্র অপেক্ষা নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও মালার ন্যায় নির্ম্মিত অস্থিনিচয় ইঁহার রত্ন। চন্দ্রকিরণে ধৌত, নীল মেঘে পল্লবিত অর্থাৎ মেঘ যাহার পাইড় ও নক্ষত্র নিচয় যাহার বিন্দু, এরূপ দিগ্বস্ত্র ইঁহার পরিধেয়[৭।৮]। দগ্ধ নরমাংস লোলুপ শিবা (শৃগাল) সমূহে ব্যাপ্ত শ্মশান ইঁহার বহির্গৃহ[৯]। যাঁহাদের আভরণ নরকপাল, যাহারা রক্ত ও বসা পান করে, যাহারা নরান্ত্রের মালা ধারণ করে, সেই সকল মাতৃগণ ইঁহার ক্রীড়া সখী[১০]। যাহাদের শিরঃপ্রদেশে মণি, অঙ্গ সকল মসৃণ ও বর্ণ স্বর্ণসদৃশ, সেই সকল ভুজঙ্গ ইঁহার বলয়[১১]। ইঁহার দৃক্‌পাতে শৈলরাজও দগ্ধ হয়, ইচ্ছা মাত্রে ত্রিজগৎ ইঁহার কবলগত হয়, অসুরগণ ইঁহার লীলায় ত্রস্ত হয়, এবং আচার অতিভীষণ। ইঁহারই কল্যাণময় সঙ্কল্পে ত্রিজগৎ স্বস্থ থাকে, ইঁহার অন্তর সদা স্বস্থ অর্থাৎ সমাধিমগ্ন এবং ইঁহার হস্তস্পন্দে অসুরপুর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়[১২।১৩]। ধ্যান কালে ইঁহার মূর্ত্তি ক্ষুধাতৃষ্ণাদি রহিত হিমাচলাদি স্থির পদার্থের সহিত তুলিত হয়[১৪]। যাহাদের মস্তক ক্ষুর (তীক্ষ্ণধার) শক্তিবিশিষ্ট এবং ক্ষুর (পায়ের নাম) হস্তশক্তিবিশিষ্ট, যাহারা হস্তে দন্তের, মুখের ও উদরের কার্য্য (ভোজনের কার্য্য) করে, যাহাদের আকৃতি কাহার ভল্লুকের, কাহার উষ্ট্রের, ও কাহার বা ছাগের ও মেষের সদৃশ, তাদৃশ প্রমথগণ ইঁহার লালক অর্থাৎ ক্রীড়ার সহায়[১৫]। সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বশক্তিযুক্ত প্রমথগণের অনুরূপ মাতৃগণ ইহার পরিবার[১৬]; চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবনস্থ অসংখ্য ভূত (প্রাণী) যাহাদের ভক্ষ্য, তাদৃশ মাতৃগণ ইঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকে[১৭]। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গর্দ্দভবদনা, কেহ উষ্ট্রমুখী, এবং কেহ বা ছাগাদিমুখী। ইঁহারা সকলেই রক্ত মেদ ও বসা আসবের ন্যায় পান করেন। ইঁহাদের কেহ শব-করের মালা ও কেহ বা শব-মুণ্ডাদির মালা ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কেহ দিগন্তরে, কেহ গিরিকূটে, কেহ ব্যোমতলে, কেহ লোকান্তরে, কেহ গর্ত্তে এবং কেহ বা জীবগণের শরীরে বসতি করেন[১৮।১৯]। তাদৃশ মাতৃগণের মধ্যে প্রধানা মাতৃ আটটী। তাহাদের নাম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা,

রক্তা, অলম্বুসা ও উৎপলা। এই আট্ মাতৃদেবী সমুদায় মাতৃগণের নায়িকা ২০।২১। হে মুনে! উক্ত মাতৃগণের মধ্যে যিনি অলম্বুসা নামে বিখ্যাতা, চণ্ড নামক কাক তাঁহার বাহন। এই কাকের অস্থি তুণ্ড ও নখ বজ্র সদৃশ। আকৃতি ইন্দ্রনীল পর্ব্বতের অনুরূপ২২।২৩। অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্তা ঐ সকল মাতৃগণ একদা গগন পথে মিলিত হইয়া পরমার্থ প্রকাশক পানোৎসবে * প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। ইঁহারা কেবল পানোৎসবপ্রবৃত্তা হইয়াছিলেন এমন নহে, তুম্বুরুনামক রুদ্রমূর্ত্তির আশ্রিতা ও বামমার্গ-গামিনীও হইয়াছিলেন। † তাঁহারা জগৎপূজ্য তুম্বুরুনামক ভৈরবের পূজা করিয়া ও মদিরাদি পান দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সদালাপ করিতেছিলেন২৪।২৫। ইত্যবসরে তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রস্তাব উপস্থিত হইল যে, দেব উমাপতি আমাদিগকে অবহেলা করেন কেন? আমরা আজ্ এরূপ প্রভাব প্রদর্শন করিব, যাহা দেখিয়া তিনি অতঃপর আমাদের প্রতি অবহেলা করিতে বিরত থাকিবেন। মাতৃদেবীরা ঐরূপ মন্ত্রণা করিয়া রুদ্রশক্তি উমাদেবীকে আপনাদের বশে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করতঃ যজ্ঞে যেমন পশু প্রোক্ষণ করে, সেইরূপ প্রোক্ষণ করিলেন। এই মাতৃগণও উমাদেবীর মূর্ত্তিভেদ, সেই কারণে ইহারা উমাদেবীকে স্ববশে আনয়ন করিতে ক্ষমবতী হইয়াছিলেন। প্রোক্ত উমাদেবী মাতৃগণের মায়ায় শিববামাঙ্গ হইতে অপহৃতা ও উক্ত মাতৃগণের সভায় আগতা হইলে মাতৃগণ তাঁহাকে ভক্ষণীয় হওয়ার জন্ম অভিশপ্ত করেন অর্থাৎ ছাগভাবাপন্ন করেন। যে দিন তাদৃশ প্রকারে পার্ব্বতীপ্রোক্ষণ হয় (পার্ব্বতীকে পশুভাবাপন্ন করা হয়,) সেই দিন মাতৃগণের মধ্যে নৃত্য গীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ

* আসব পানের দ্বারা কৌশলে চিত্ত স্থির করণ পূর্ব্বক সমাধিস্থ হওয়ার নাম পানোৎসব। এই সমাধির উদ্দেশ্য—স্বাত্মতত্ত্বের অনুভব। ইহা সহজ সাধ্য নহে। সহজ সাধ্য নহে বলিয়া সাধারণ লোক আসব পান ঘটিত বিধির বশ্য হইয়া ভ্রষ্ট হয়।

† বামমার্গ কথার অর্থ—তন্ত্রোক্ত বামাচার। বামাচারের বিধান অনুসারে ইঁহারা রুদ্রের অপর মূর্ত্তি তুম্বুরুর বামপার্শ্বগামিনী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তুম্বুরু নামক রুদ্রই আমাদের উপাস্য বা আরাধ্য, এইরূপ সঙ্কল্প করতঃ তদীয় স্ত্রী হইয়া তদীয় বামপার্শ্বে উপবেশনাদি, তদীয় মুখে মদিরা অর্পণাদি ও অন্যান্য প্রকারের সেবা করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন।

আমোদ প্রকটিত হইয়াছিল[২৭।৩১]। অতিশয় আনন্দ, তজ্জনিত উদ্দাম রব, সুদীর্ঘ হস্তপদাদির বিক্ষেপ বা পরিচালনা, স্তন ও উদর প্রভৃতির বিকৃতি, উচ্চ হাস্য, গভীর করতালী, সিংহনাদ, মেঘের ন্যায় তর্জ্জন, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন ও অন্যান্য অঙ্গ বিকার প্রদর্শিত হইয়াছিল[৩২।৩৩]। কেহ শৈল বিদারক কঠোর রবে গান করিতে লাগিলেন, কেহ চন্দ্রোদয়ে স্ফীত সমুদ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কেহ মদিরা পান করিয়া, কেহ সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাদি লিপ্ত করিয়া বিকৃত রব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, মাতৃগণের সেই উন্মাদ বৃত্ত অতি ভয়ঙ্কর ও অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পান, উচ্চৈঃস্বরে গান, দ্রুতবেগে গমন, কর্কশ রবের আলাপ, পতন, উৎপতন, পরস্পরের মুখাগ্নিতে পরস্পরের প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, নৃত্য ও মাংসাদি চর্ব্বণ ও ভক্ষণ এই সকল ব্যাপার নিতান্ত ভীষণ। বলিতে কি, এই মাতৃগণ পানোৎসবে উন্মত্তা হইয়া যেন ত্রিভুবন অপবিত্রিত করিয়া তুলিলেন[৩৪।৩৬]।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত।

ঊনবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, মাতৃগণ ঐ প্রকার উৎসবে প্রবৃত্তা হইলে তাঁহাদের বাহনেরাও তাদৃশ উৎসবে মত্ত হইল। তাহারাও মত্ত হইয়া হাস্য রোদন গান ও তাদৃক্ প্রকারে পানাদি করিতে লাগিল। বাহনগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া যুগল নৃত্য আরম্ভ করিল তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মীর বাহন হংসীর সহিত অলম্বুসার বাহন চণ্ড নামক কাক যুগলিত হইয়া নৃত্যারম্ভ করিল[১।২]। তাহারা নাচিতে নাচিতে ও আসব পান করিতে করিতে সমুদ্র তটের সমতল প্রদেশে গমন করিয়া রতি কামনায় অভিভূত হইল। ক্রমে সমুদায় হংসীই উক্ত কাকের সহিত রমমাণা হইল, এবং তৎক্রমে তাহারা গর্ভধারিণীও হইল[৩।৪]। পরে মাতৃগণ নৃত্য সমাপ্তি করিয়া প্রশান্তচিত্ত রুদ্রের নিকট গমন করিল এবং ভক্ষ্যভাব প্রাপ্ত উমাদেবীকে তদীয় ভোজনার্থ অর্পণ করিল[৫।৭]।

ভগবান্ শশিশেখর যখন বুঝিলেন, আমার প্রিয়তমাকে আমার আহারীয় করিয়া অর্পণ করিয়াছে, তখন তিনি মাতৃগণের প্রতি রুষ্ট হইলেন। মাতৃগণ তখন রুদ্রের কোপে ভীতা হইয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব অঙ্গের দ্বারা এক অভিনব উমা প্রস্তুত করতঃ বিবাহ বিধানে উমাকে অর্পণ করিলে রুদ্রের কোপ উপশান্ত হইল। পরে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অভিমত স্থানে গমন করিলেন[৮।১০]। হে মুনীশ্বর! ব্রাহ্মীবাহন সেই সকল হংসীরা অতঃপর গর্ব্ভবতী হইল এবং সে বৃত্তান্ত তাহারা ব্রাহ্মীদেবীকে বিদিত করিল।

ব্রাহ্মী বলিলেন, বাছা সকল! তোমরা এখন গর্ব্ভিণী। সেজন্য তোমরা এখন মদীয় রথ কার্য্য করণে অক্ষমা। এখন তোমরা যথেচ্ছ বিচরণ কর[১১।১২]। দেবী ব্রাহ্মী দয়াবতী হইয়া ঐ কথা বলিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এ দিকে সেই সকল হংসীরা ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমলের কিশলয় প্রদেশে গিয়া যথাসুখে বিচরণ করিতে লাগিল এবং বিপক্কগর্ব্ভা হইয়া যথাকালে অণ্ড সকল প্রসব করিল। সেই সকল অণ্ড উপযুক্ত কালে দ্বিধা বিভক্ত হইল। হে মুনিশ্বর! হে বশিষ্ঠ! এবম্প্রকারে আমরা একবিংশতি হংসীর একবিংশতি অণ্ড হইতে একবিংশতি ভ্রাতা প্রসূত হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই সেই চণ্ড বায়সের সন্তান[১৩।১৭]। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি কমলে আমরা উক্ত প্রকারে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ক্রমে জাতপক্ষ ও উড্ডয়নে সক্ষম হইলে আমরা স্ব স্ব জননী গণের সহিত ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর দীর্ঘকালব্যাপিনী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরে আমাদের আরাধনায় দেবী পরিতুষ্টা হইয়া সমাধি ত্যাগ করিলেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারকারক জ্ঞান প্রদান করিলেন[১৮।২০]। তখন আমরা মনে করিলাম, অদ্য প্রভৃতি আমরা সকলেই শান্তচিত্তে ধ্যানাবলম্বী হইয়া কোন এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া কাল কর্ত্তন করিব। ঐরূপ চিন্তা করিয়া আমরা পিতার নিকট গমন করিলাম, পিতা আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আমরা দেবী অলম্বুসার পূজা করিলাম, তাহাতে তিনিও আমাদের প্রতি প্রসন্না হইলেন[২১।২২]। আমরা তাঁহার সম্মুখে বিনীত ভাবে স্থিতি করিতে লাগিলাম। পরে আমাদের পিতা চণ্ড আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন।

চণ্ড বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা ত অনন্ত বাসনাসূত্রে গুম্ফিত সংসার জাল হইতে নির্গত হইয়াছ? যদি তাহা না হইয়া থাক, তবে বল, আমরা সকলে একযোগ হইয়া এই ভৃত্যবৎসলা দেবীর নিকট প্রার্থনা করি, তাহাতে তোমরা জ্ঞানপারগ হইবে[২৩।২৪]।

কাক সকল বলিল, পিতঃ! ব্রাহ্মী দেবীর প্রসাদে আমরা যাহা নির্ম্মল জ্ঞেয় তাহা জানিতে পারিয়াছি। এখন আমরা কোন এক উত্তম ও নির্জ্জন স্থানে বাস করিবার বাঞ্ছা করি[২৫]।

চণ্ড বলিলেন, সমস্ত রত্নের আকর, সমুদায় দেবতার আশ্রয় ও সর্ব্ব মহীধর অপেক্ষা উচ্চ মেরুনামে এক মহীধর আছে। চন্দ্র ও সূর্য্য এই মহীধরের দীপ ও ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডপের মধ্য স্তম্ভ[২৬।২৭]। ইহারই মূলে কিম্পুরুষাদি বর্ষ বিরাজিত। (ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষ নামে বর্ষ আছে) ইহার শৃঙ্গ সকল যেন ইহার রত্নভূষিত অঙ্গুলী। দেখিলে বোধ হয়, অব্ধিবলয় দ্বীপবতী পৃথিবী দেবী যেন উর্দ্ধভুজে অবস্থিত রহিয়াছে[২৮]। হে বৎসগণ! এই মহীধর অন্যান্য মহীধরের রাজা। কুল পর্ব্বত সকল ইহার সামন্ত, জম্বুদ্বীপ ইহার সিংহাসন, চন্দ্র ও সূর্য্য ইহার নেত্র, তারা বৃন্দ ইহার মালিকা, দিক্ সকল যাহার দশা তাদৃশ আকাশ ইহার উত্তম বস্ত্র। নাগজাতীয় প্রাণীর আধার বা আশ্রয় এবং নাকনায়ক ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার আভরণ[২৯।৩০]। দিগঙ্গনারা ইহার চতুর্দ্দিকে মেঘরূপ চামর সঞ্চালন করে[৩১]। ক্ষিতি তলে ইহার পাদ দেশ ষোড়শ সহস্র যোজন, নাগ অসুর ও মহোরগ গণ ইহার পাদ সেবক[৩১।৩২]। ইহার দেহ অশীতিসহস্র যোজন; লোচন চন্দ্র ও সূর্য্য, সুর গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ ইহার পরিচারক[৩৩]। এই পর্ব্বতরাজ দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নর; অপ্সরা, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, প্রমথ, গুহ্যক, নাগ, এই চতুর্দ্দশ বিধ প্রাণীর উপজীব্য[৩৪]। ইহার ঈশান ভাগে এক বৃহৎ শৃঙ্গ আছে। তাহা পদ্মরাগমণিময় ও দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল[৩৫]। এই শৃঙ্গের শিরোদেশে এক বৃহৎ কল্পপাদপ আছে, তাহাও নানা প্রকার জীব জাতির বাসস্থান[৩৬]। এই পাদপের দক্ষিণ স্কন্ধে যে শাখানিচয় আছে, সে সকলের পল্লব কনকময়, স্তবক রত্নময় ও ফল চন্দ্রসদৃশ[৩৭]। হে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমি উক্ত শাখায় মণিময় নীড় প্রস্তুত করিয়া ধ্যানে

নিষণ্ণা দেবীর আরাধনা করিতাম[৩৮]। উক্ত নীড়ের একটী অলিন্দ (বারাণ্ডা) আছে, তাহাও রত্নময় পুষ্প পত্রে সুশোভিত, অমৃতাস্বাদ ফলে পরিব্যাপ্ত ও তাহার কোষ্ঠরচনা চিন্তামণির দ্বারা সমাপ্ত (চিন্তা-মণি এক প্রকার শ্রেষ্ঠ রত্ন)[৩৯]। তাহার অভ্যন্তর অতি মনোহর কুসুম সমূহে সমাকীর্ণ ও তথায় বিচারশীল কাকপুত্রেরা বাস করে[৪০]। হে সুতগণ! দেবগণেরও দুর্গম্য সেই নীড়ে তোমরা গমন কর। তথায় তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে[৪১]। আমার পিতা চণ্ড আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়া চঞ্চুর দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ও দেবী কর্ত্তৃক আহৃত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি আমাদিগকে অর্পণ করি-লেন[৪২]। আমরা সেই পিতৃদত্ত দেবীপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া দেবীচরণে ও পিতৃচরণে কৃতনমস্কার হইয়া সেই বিন্ধ্যকচ্ছস্থ অলম্বুসা স্থান হইতে আকাশে উড্ডয়ন আরম্ভ করিলাম[৪৩]। ক্রমে মেঘলোক ভেদ ও বায়ু-লোক উৎক্রমণ করিলাম[৪৪]। পরে সূর্য্য লোক ও স্বর্গ অতিক্রম করতঃ ব্রহ্ম লোক গমন করিলাম। হে মুনিবর! আমরা পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া তত্রস্থা ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর চরণ বন্দনা করিলাম ও আমাদের মেরুশৃঙ্গে গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলাম। পরে দেবদেব ব্রহ্মা ও দেবী ব্রাহ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া তদীয় সেই সত্য লোক হইতে নির্গত হইলাম[৪৫।৪৭]। লোক সকলের পরিত্যাগ অন্তে আমরা এই কল্প বৃক্ষকে প্রাপ্ত হইলাম এবং তদবধি আমরা এই নীড়ে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছি[৪৮।৪৯]।

হে মহানুভাব! আমরা যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যে প্রকারে এই স্থানে স্থিতি করিতেছি, এবং আমরা পরম বোধ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে সমস্তই যথাবৎ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি কি করিতে হইবে, আদেশ করুন[৫০]।

উনবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ যে কল্পে আমার জন্ম সেই কল্পে যে আকারের জগৎ ছিল, এতৎ কল্পে ঠিক্ সেই আকারের জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে। সেই সাম্যতা প্রযুক্তই আমি "এই কল্পতরু" ইত্যাদি কথা বলিয়াছি। সে জগৎ না থাকিলেও এতৎ কল্পের জগ-তের সহিত সে জগতের সাম্য থাকায় একতা আরোপ পূর্ব্বক বর্ত্ত-মানের ন্যায় বর্ণনা করিতেছি। হে মুনে! আমি কেবল আপনাকে সহজে বুঝাইবার জন্যই অতীত কল্পের বৃত্তান্তকে বর্ত্তমান কল্পীয় বলিয়া বর্ণনা করিতেছি[১।২]। হে মুনিনাথ! আপনার দর্শন লাভে অতি সুদীর্ঘ কালের সঞ্চিত মদীয় পুণ্যরাশি অদ্য সফল হইল, এক্ষণে আপনি আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করুন। আপনার দর্শনে আজ্ আমার এই নীড় ও এই শাখা ও এই মহাবৃক্ষ পবিত্রতা লাভ করিল[৩।৪]। হে প্রভো! আপনি অগ্রে এই বিহগের অর্পিত পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, করিয়া এই অধম জীবকে পবিত্র করুন, পশ্চাৎ আদেশ করুন, অতঃপর এই বিহগাধমকে কি বলিতে হইবে[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! ভুশুণ্ড পক্ষী "এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য, ও এই আসন গ্রহণ করুন" এই বলিয়া স্বয়ং ঐ সকল প্রদান করিলে পর আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে বিহঙ্গেশ! তোমাকে একক দেখিতেছি কেন? তোমার সেই সকল মহাবুদ্ধিধর ও মহাসত্ত্ব ভ্রাতাদিগকে দেখিতেছি না কেন[৬।৭]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, মুনিবর! আমরা এই স্থানে থাকিতে থাকিতে ক্রমে এক মহান্ কাল অতিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহাতে মনুষ্যদিগের শত শত যুগ আমাদের দৃষ্টিতে দিবসের ন্যায় গত হইল[৮]। পরে আমার সেই ভ্রাতারা ক্রমে সকলেই শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিব পদে প্রবেশ করিয়াছে[৯]। যিনি যতই দীর্ঘায়ু হউন, মহান্ হউন, সাধু হউন ও বলশালী হউন, কাল সকলকেই অলক্ষ্যে গ্রাস করিয়া থাকে[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যে সময়ে প্রলয় বায়ু অতিবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, সে সময়েও তুমি কি কষ্ট পাও নাই? যে সময়ে সমুদিত দ্বাদশ সূর্য্যের করে বিশ্ব মণ্ডল দগ্ধ হইয়াছিল, সে সময়েও তুমি কি খেদ প্রাপ্ত হও নাই[১১,১২]? যে সময়ে শীতরশ্মির প্রবল প্রভাবে জল সমুদায় করকায় পরিণত হইয়াছিল, সে সময়েও কি তোমার ক্লেশ হয় নাই[১৩]? যে সময়ে কল্লান্তমেঘ উদিত হইয়া মেরু শিখরকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল সে সময়েও কি তুমি অক্ষত ছিলে[১৪]? এই উন্নত কল্প বৃক্ষও কি সেরূপ জগৎসংক্ষোভ কালেও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল[১৫]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধম পক্ষিজাতির কথা দূরে থাকুক, যাহারা অতিশয় মহান্ তাঁহারাও সে সময়ে কষ্টের অবস্থায় পড়েন, পরন্তু প্রভেদ এই যে, মহাত্মারা বিবেক প্রভাবে তজ্জনিত ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। ইহ জগতে যত প্রকার জীবযোনি আছে, তন্মধ্যে পক্ষি যোনি অধিক নিকৃষ্ট। নিরবলম্বন আকাশ ইহাদের অবলম্বন ও ইহারা সর্ব্ব জীবের নিকট হেয় ও তুচ্ছ[১৬]। বিধাতা এ জাতির জীবিকা অর্থাৎ জীবনোপায় শূন্য পথে স্থাপন করিয়াছেন। এ জাতিতে যাহাদের জন্ম, হে প্রভো! সে জাতির আবার সুখ কি? আশাপাশে বদ্ধ এতাদৃশ বিহগ জাতির নির্দ্দুঃখতা অসম্ভব[১৭,১৮]। হে ভগবন্! বিধাতার ইচ্ছায় বিহগজাতি দুঃখনির্ম্মুক্ত না হইলেও আমরা আত্মসন্তোষ অবলম্বনে মোহনির্ম্মুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা কেবল আত্মস্বভাবে সন্তুষ্ট ও পরপীড়াদি চেষ্টায় বিমুখ থাকিয়া এই বিহগালয়ে কালক্ষেপ করিতেছি[১৯,২০]। আমরা জীবন মরণ ও ভোগার্থ ক্রিয়া কারণ কিছুই বাঞ্ছা করি না। এখন যেমন নিরীহ বা পূর্ণ কাম হইয়া আছি, জীবনের অবশেষ এইরূপে অতিবাহিত করিব[২১]। আমি লোক সমূহের অনেক জীবন মরণাদি দশা দেখিয়াছি, সংসারের মিথ্যাত্ব নির্ণায়ক বিবিধ দৃষ্টান্তও বিদিত হইয়াছি, এবং এই বিদ্যুতের ন্যায় অস্থায়ী শরীরের আস্থা পরিত্যাগ করিয়াছি[২২]। এই কল্প বৃক্ষের অনুগ্রহে আমাদের কোনরূপ পাপ তাপ নাই। আমি স্বাত্মপ্রকাশের আলোকে কালব্রহ্মের গতি জ্ঞাত হইয়াছি[২৩]। হে ব্রহ্মন্! আমি প্রাণ ও অপান এই দুই শারীর বায়ুর সূক্ষ্ম গতিবিজ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ কল্পকালের বৃত্তান্ত জানিতেছি। (প্রাণ অপান এই দুই শারীর

বায়ুর গতি বিজ্ঞাত হওয়ার দ্বারা কল্পান্তকালের বৃত্তান্ত জানা যায়, তাহা স্বরোদয় শাস্ত্রে লিখিত আছে।) দেখুন, এই বিহগালয় কত উচ্চে অবস্থিত। এই স্থান সর্ব্বদাই রত্নগুচ্ছের আলোকে প্রকাশময়, তন্নিবন্ধন এখানে দিবা রাত্র বিভাগ নাই, তথাপি আমি কালের সূক্ষ্মা গতি নিজ অনাবৃত জ্ঞানে জানিতেছি[২৪।২৫]। মুনিবর! স্থিরতার প্রভাবে আমার মন চাঞ্চল্যরহিত ও শান্ত হইয়াছে, সার কি অসার কি তাহা জানিতেছি। সামান্য ভূ কাকের ন্যায় আমি আশাপাশে বদ্ধ ও তাহার বশ্য নহি। সে কারণেও তাদৃশ মহাপ্রলয়ে আমার খেদ জন্মে না [২৬।২৭]। জগতের মায়িকত্ব দর্শনে আমার চিত্ত ধীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ঘোরতর বিপদ্দশাতেও আমার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, সুতরাং কোনরূপ খেদও অনুভবগম্য হয় না[২৮।২৯]। আমি বার বার অনুসন্ধানে বিদিত হইয়াছি, জগতের স্থিতি আপাতরম্য মাত্র, ইহার পরিণাম অতি তুচ্ছ। ইহার মিথ্যাত্ব জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ নামক বিকার সমূহের পরিবর্ত্তন মাত্র। সুতরাং দুর্যোগ সমূহ আমাকে ভয় প্রদর্শন বা পীড়ন করিতে পারে না[৩০]। হে ভগবন্! ভূতবৃন্দ হইতেছে যাইতেছে, ইহাও ব্যবহারিকী দৃষ্টি ব্যতীত পরমার্থ দৃষ্টিতে নহে। যদি তাহাই হইল, তবে আর ভয় প্রাপ্তির প্রসক্তি কোথায়? এই ভূতবৃন্দরূপা নদী নিরন্তর কাল সাগরে প্রবেশ করিতেছে, আমরা তাহার তটে অবস্থান মাত্র করিতেছি[৩১।৩২]। আমরা কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করি না, এই একই স্থানে মুনিবৃত্তিতে (মুনিবৃত্তি=মননশীল দিগের ধর্ম্ম) স্থিত রহিয়াছি। লোক যেমন কণ্টকাচিত ভূমে অতি সাবধানে পদসঞ্চালন করে, সেইরূপ, আমরাও এই কল্পক্রমে সাবধানতার দ্বারা মাত্র ব্যবহার নির্ব্বাহক অনুষ্ঠানে কাল কর্ত্তন করিতেছি। যাঁহারা আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ, যাঁহাদের শোক ভয় আয়াস কিছুই নাই, যাঁহারা নিরাময় ও সন্তুষ্টস্বভাব, তাঁহাদের অনুগ্রহও আমার নির্ভয়তার অন্য এক কারণ[৩৩।৩৪]। হে ভগবন্! আমাদের মন ইহা তাহা করিয়া লুণ্ঠিত হয় না ও বিশ্বের রহস্য বা তত্ত্ব (মায়াময়ত্ব) বিস্মৃতও হয় না। মহাসমুদ্র যেমন পর্ব্বকালে অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ের পূর্ণতা কালে পরিপূর্ণ থাকে, আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চন্দ্রের পূর্ণতায় পূর্ণ রহিয়াছি (অক্ষয় অব্যয় রহিয়াছি)[৩৫-৩৬]। হে ব্রহ্মন্! আপনার আগমনে আমার আশয় (চিত্ত) অত্যন্ত

প্রসন্ন হইয়াছে। সাধু সজ্জনগণ যে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের আর অধিক কুশল কি হইবে?[৩৭।৩৮]। ভোগ আপাতরম্য, তাহার দ্বারা কি পাওয়া যায়? কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু সৎসঙ্গরূপ চিন্তামণির দ্বারা যাহা সর্ব্বসার তাহাই পাওয়া যায়[৩৯]। এই ত্রৈলোক্য একটী পদ্ম, একমাত্র আপনিই ইহার ভ্রমর। আপনার বাক্য স্নিগ্ধ, গম্ভীর, জ্যোতিষ্মান্, উদার, ধীর ও মধুর[৪০]।

হে সাধো! আমার মনে হইতেছে, আপনার দর্শনে আমার দুষ্কৃত পুঞ্জ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং আমার পক্ষিজন্মও উত্তম ফলযুক্ত হইয়াছে। কেননা, সাধু সজ্জনের সঙ্গ সমুদায় ভয়ের বিনাশক[৪১]।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, সাধো! সেই অতি বিষম যুগান্ত কালেও এই বৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। ইহা সমগ্র ভূতের অগম্য; সেই কারণে আমি এই স্থানে নিরুদ্বেগে অবস্থান করি[১।২]। যে সময়ে হিরণ্যাক্ষ সপ্তদ্বীপা বসুমতী বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সে সময়েও এই কল্পপাদপ বিচলিত হয় নাই[৩]। ভগবান্ নারায়ণ যে সময়ে বরাহবিগ্রহ ধারণ করিয়া জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন, সে সময়েও এই বৃক্ষ সুস্থির ছিল[৪]। ভগবান্ বিষ্ণু যখন সমুদ্রমন্থনার্থ মন্দরাচল আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তখনও এই কল্পতরু সুস্থির ছিল[৫]। দেবাসুরের যুদ্ধকালে অতি বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে সূর্য্য চন্দ্রাদি বিকম্পিত হইয়াছিল, অথচ এই বৃক্ষ বিকম্পিত হয় নাই[৬]। উৎপাত বায়ু বহমান হইলে সুমেরুস্থ শিলা ও সমুদায় বৃক্ষ বিচলিত হইয়াছিল, তথাপি এই বৃক্ষ বিচলিত হয় নাই[৭]। সমুদ্রমন্থন কালে মন্দরাচলের আন্দোলনে কল্পান্ত মেঘ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়াছিল, তথাপি এই বৃক্ষ

বিকম্পিত হয় নাই[৮]। এক সময়ে কালনেমি এই পর্ব্বতকে ভুজদ্বারা উত্তোলিতপ্রায় করিয়াছিল, সে সময়েও এই কল্পতরু বিকম্পিত হয় নাই[৯]। অমৃতাহরণ কালে পক্ষীন্দ্র গরুড়ের পক্ষবাতে সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি গণও বায়ুবাহিত হইয়াছিল, সে সময়েও এই তরু বিচলিত হয় নাই[১০]। পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম হইলে সপ্তদ্বীপা বসুমতী অন্যান্য লোক সহ জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তদ্দৃষ্টে সঙ্কর্ষণ রুদ্র শেষ নাগের আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, সে উৎপাতেও এই বৃক্ষ বিকম্পিত হয় নাই[১১]। যে সময়ে শেষ অহির মুখনির্গত কল্পানল লোক সকল দগ্ধ করিয়াছিল, সপ্ত সমুদ্র শুষ্ক করিয়াছিল, পর্ব্বত সকল ভস্মসাৎ করিয়াছিল, সে সময়েও এই দ্রুম অক্ষত ছিল। হে মুনিশার্দ্দুল! যাহারা এতদ্‌বিধ শ্রেষ্ঠ দ্রুমে থাকে তাহাদের আবার আপদ্ কোথায়[১২।১৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, কল্পান্ত পবনের তাড়নায় সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্র পর্য্যন্ত নিপাতিত হয়, তখন তুমি কি প্রকারে বিজ্বর থাক?

ভুশুণ্ড বলিলেন, যেমন কৃতঘ্ন নর চিরমিত্রকে পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় আমি তখন এই নীড় পরিত্যাগ করিয়া থাকি[১৪]। সে সময়ে নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট, সঙ্কল্পবর্জ্জিত ও বাসনাশূন্য হইয়া শূন্যে অবস্থান করি[১৫]। দ্বাদশ আদিত্যের উদয় যত কাল থাকে, তত কাল বারুণী ধারণা * অবলম্বনে কাল কর্ত্তন করি। যে সময়ে প্রলয় বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত পর্ব্বত সকলকে খণ্ড খণ্ড করে, সে সময়ে আমি পার্ব্বতী ধারণা অবলম্বনে শূন্যোপরি অবস্থান করি[১৬।১৮]। জগৎ যখন গলিয়া একার্ণব হয়, আমি তখন বায়বী ধারণায় স্থিত থাকি[১৯।২০]। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের পর অব্যাকৃত পদ (অব্যাকৃত=মূলপ্রকৃতি), সেই অব্যাকৃত পদে সমাধি স্থাপন করতঃ সুষুপ্তের ন্যায় দীর্ঘকাল অতিবাহন করি, পরে যখন পুনঃ সৃষ্ট্যারম্ভ হয় তখন পুনর্ব্বার এই বিহগালয়ে প্রবেশ করতঃ স্থিত হই। (পূর্ব্বসদৃশ সুমেরু ও তদুপরি পূর্ব্বসদৃশ কল্পবৃক্ষ ও তৎশাখায় নীড় সৃষ্টি হয়, আমিও পুনর্ব্বার এতন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ প্রবিষ্ট ও স্থিত হই)[২১]।

---

* বারুণী ধারণা—উৎকট জলময় সমাধি। পার্ব্বতী ধারণা—পর্ব্বতময় সমাধি। এইরূপ বায়বী ধারণাও সমাধিবিশেষ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! প্রলয় কালে তুমি যেমন ধারণার দ্বারা অখণ্ডিত থাক (তোমার দেহের বিনাশ হয় না), অন্য যোগীরা সেরূপ অখণ্ডিত থাকেন না কেন? (তাঁহাদের দেহ বিনষ্ট হয় কেন?)

ভুশুণ্ড বলিলেন, ব্রহ্মন্! কোনও ব্যক্তির নিয়তিনাম্নী ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। নিয়তির নিয়ম বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ যাহার যেরূপ প্রারব্ধ বা নিয়তি সে তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। কল্পান্ত কালে দেহ থাকার প্রারব্ধ আমার ব্যতীত অন্য যোগীর নাই[২২।২৪]। সত্যসঙ্কল্পরূপ মদীয় নিয়তির বলে প্রত্যেক কল্পে এই শৃঙ্গ, এই বৃক্ষ ও এই নীড় সৃষ্ট হইয়া থাকে[২৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে কল্যাণ! তুমি যার পর নাই অত্যধিক দীর্ঘায়ু, জ্ঞান বিজ্ঞানে তৎপর, ধীরস্বভাব, যোগযোগ্য ও বুদ্ধিমান্। অনেক বার ও অনেক প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় দেখিয়াছ ও তাহা বলিতেও পারগ আছ। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি জগৎ ক্রমের কি কি আশ্চর্য্য স্মরণ করিয়া বলিতে পারগ আছ[২৬।২৭]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, এই সুমেরুর অধোভাগে পৃথিবীর জন্মপ্রকার আমার স্মরণ হয়। পৃথিবীতে যখন শৈল বন বৃক্ষ এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় নাই, পৃথিবীর সে অবস্থাও আমার মনে পড়ে[২৮]। পৃথিবী এগার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ভস্মপূর্ণা অবস্থায় নিপতিতা ছিল, সে অবস্থাও আমার স্মরণে আবদ্ধ রহিয়াছে[২৯]। সূর্য্য উৎপন্ন হয় নাই, চন্দ্রের জন্ম হয় নাই, সুতরাং দিন রাত্র বিভাগ ছিল না, তৎকালের সে অবস্থাও আমার স্মরণ হয়[৩০]। পর পর যে ক্রমে ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে, সুমেরু ও এই কোটর উৎপন্ন হইয়াছে, সে ক্রমও আমি দৃষ্ট করিয়াছি[৩১]। দেবাসুরের যুদ্ধ মনে পড়িতেছে ও এই মেরু ব্যতীত অন্য সমুদায়ের ধ্বংস স্মরণ হইতেছে। যে সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ব্যতীত আর সমুদায় বিনষ্ট হয় সে সময়ও আমার স্মরণে রহিয়াছে[৩২]। ধরামণ্ডল মণ্ডকাদি (মত্তক বা মণ্ডক) অসুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল দৈত্যদিগের অন্তঃপুর হইয়া রহিয়াছিল, তাহাও আমার স্মরণ হয়। পৃথিবীকে চার যুগের অধিক কাল কেবল পর্ব্বতাচিত (পর্ব্বতব্যাপ্ত) থাকিতে দেখিয়াছি। দশ সহস্র বৎসর স্তূপাকার মৃত দৈত্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ থাকিতে দেখিয়াছি। এই পৃথিবী বহুকাল নির্ব্বৃক্ষ ও আকাশ-

নক্ষত্র বর্জ্জিত ছিল, তাহাও আমার স্মরণ হয়[৩৩।৩৮]। যে সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বত সুমেরু স্পর্দ্ধায় বিবৃদ্ধ হইতে ছিল, অগস্ত্য তাহার স্পর্দ্ধা খর্ব্বীকৃত করেন, এক সময়ে মলয়, দর্দ্দুর ও সহ্য প্রভৃতি বিভাগ ছিল না, কেবল একপর্ব্বত বিন্ধ্যমাত্রই ছিল, সে সমুদায়ও আমার স্মরণ হয়[৩৯]। এইরূপ এইরূপ বহু বৃত্তান্ত আমার স্মরণ হয়, পরন্তু সে সকল বহু বর্ণনায় প্রয়োজন নাই। তন্মধ্যে যাহা সার বা প্রধান, তাহাই বর্ণন করি, শ্রবণ করুন[৪০]। শত শত মনুর পরিবর্ত্তন, বহুযুগব্যাপী জীব লোকের ঐশ্বর্য্যের ও প্রভাবের স্থিতি ও আধিক্য, ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, বেদনিন্দুক শূদ্র, বহুপতিকা নারী যে কালে প্রাদুর্ভূত হয় সে কালের সে সমুদায় আমার স্মরণ হয়[৪১।৪৩]। পৃথিবীকে কেবলমাত্র বৃক্ষে পরিপূর্ণা, লবণাদিসমুদ্রসপ্তক না থাকা; স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-ব্যতীত মনুষ্যোৎপত্তি হওয়া, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়[৪৪]। পর্ব্বত ছিল না, তুমি ছিলে না, সূর্য্যচন্দ্রাদি ছিল না, এ অবস্থাও আমার স্মরণ হয়। ইন্দ্র ছিল না, রাজা ছিল না, উত্তমাধমবিভাগ ছিল না, এরূপ অবস্থাও আমার স্মরণ হয়[৪৫।৪৬]। সৃষ্টির আরম্ভ, তাহার বৃদ্ধি ও তাহার বিভাগ আমার মনে হয় এবং কুল পর্ব্বতের উৎপত্তি ও জম্বুদ্বীপের বিভাগারম্ভ আমার স্মরণ হইতেছে। বর্ণধর্ম্মের সৃষ্টি, মর্ত্ত্যমণ্ডলের বিভাগ ও রচনারম্ভ, নক্ষত্রচক্রের সংস্থান, ধ্রুবনির্ম্মাণ, চন্দ্রসূর্য্যাদির জন্ম, ইন্দ্রোপেন্দ্রাদির স্থিতি, হিরণ্যাক্ষের দৌরাত্ম্য ও বরাহ অবতার, এ সমস্তই আমার স্মরণ হয়। রাজার ও রাজধর্ম্মের উৎপত্তি, বেদোদ্ধার ও সমুদ্রমন্থন আমার স্মরণ হইতেছে[৪৭।৫০]। পক্ষীন্দ্র গরুড়ের জন্ম, সগর রাজার কীর্ত্তিকলাপ, এ সকল যাহারা বালক তাহারাও স্মরণ করিতে পারে। অর্থাৎ ঐ সকল যেন অল্প দিনের ঘটনা, তাই বলিতেছি, এতৎকল্পীয় লোকেরাও ঐ সকল স্মরণ করিতে পারে[৫১]।

অধিক কি বলিব, গরুড়বাহনকে হংসবাহন, হংসবাহনকে গরুড়বাহন, তাঁহাকে পুনঃ বৃষভবাহন হইতে দেখিয়াছি (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের বিষ্ণু অন্য এক কল্পের ব্রহ্মা এবং সে কল্পের ব্রহ্মাকে অন্য কল্পে শিব হইতে দেখিয়াছি)। এবং তত্তৎ কল্পীয় বৃত্তান্তনিচয় আমার স্মৃতিপথারূঢ় রহিয়াছে[৫২]।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে ভগবন্! তৎপরবর্ত্তী জগতে যুষ্মদাদির জন্ম, ভরদ্বাজ পুলস্ত্য অত্রি মরীচি, পুলহ ও উদ্দালক প্রভৃতির জন্ম ও স্থিতি, ক্রতু ভৃগু অঙ্গিরা সনৎকুমার ভৃঙ্গীশ কার্ত্তিকেয় গজবদন গণেশ গৌরী সরস্বতী লক্ষ্মী ও গায়ত্র্যাদির উৎপত্তি এবং মেরু মন্দর কৈলাস হিমবান্ প্রভৃতি গিরির উৎপত্তি, হয়গ্রীব হিরণ্যাক্ষ কালনেমি হিরণ্যকশিপু বলি প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্য দানবের জন্ম, শিবি নাভাগ নল মান্ধাতা দিলীপ নহুষ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় গণের জন্ম, আত্রেয় ব্যাস বাল্মীকি শুক বাৎস্যায়ন উপমন্যু মণ্ডুকী প্রভৃতি মুনি ঋষি গণের জন্ম বৃত্তান্ত, এ সকল যেন অতি যৎসামান্য অতীত কালের কথা[১।৭]। হে মুনে! আপনি এতজ্জন্মে ব্রহ্মার পুত্র, ইহার পূর্ব্বের অপর সাত জন্ম আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। এই অষ্টম জন্মে আপনি আমার সহিত সঙ্গত হইয়াছেন[৮]। আপনি অন্য জন্মে ব্রহ্মপুত্র হন নাই, এই অষ্টম জন্মেই ব্রহ্মপুত্র হইয়াছেন। পূর্ব্বের সাত জন্মের মধ্যে কোন কোন জন্মে আপনি ব্যোমজাত, কোন কোন জন্মে জলজাত, কোন কোন জন্মে বায়ুজ ও কোন কোন জন্মে অনলজ হইয়াছিলেন[৯]। প্রত্যেক কল্প পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সদৃশ রূপে নির্ম্মিত হয় সত্য, পরন্তু কখন কোন কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম ঘটনাও হইয়া থাকে। আমার স্মরণ হইতেছে, পর পর তিন্ বার ঠিক্ সমানাকারের সৃষ্টি হইয়াছে। আচার ব্যবহারও দশ বার সৃষ্টিতে ঠিক্ সমান হইয়াছিল, এবং জীবগণের আয়ুষ্কালও দশ সৃষ্টিতে সমান চলিয়া ছিল। আমার বেশ স্মরণ হয়, পৃথিবী পাঁচ বার জলমগ্না হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বার পৃথিবী বরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা হইয়াছিলেন। সেইরূপ পাঁচ বার সমুদ্রমন্থন, পাঁচ বার কূর্ম্মাবতার, দশ বার ও তৎপরে পুনর্দ্বাদশ বার সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল[১০।১৩]। তিন বার হিরণ্যবধ, (হিরণ্য = অসুর) ছয় বার পরশুরাম, শতবার বুদ্ধাবতার, ত্রিশ বার ত্রিপুরবধ, দুই বার দক্ষযজ্ঞধ্বংস, (শিব কর্ত্তৃক) শত

বার ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বিনাশ, অষ্ট বার বাণযুদ্ধ, তথা শতবার হরি হরের দ্বন্দ্ব, যুগভেদে মনুষ্য দিগের বুদ্ধিভেদ, এই সমস্ত আমার স্মরণ গম্য আছে[১৪।১৯]। যুগে যুগে মহাভারত রামায়ণাদি গ্রন্থের আবির্ভাব ও বেদাদি গ্রন্থের উদয় হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা (রামায়ণের দ্বারা) রামের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত, রাবণের ন্যায় বিলাসী হওয়া উচিত নহে, এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়। বাল্মীকিনামা জীব দ্বাদশ বার হইয়া গিয়াছে ও দ্বাদশ বার লক্ষশ্লোক রামায়ণ প্রকটিত হইয়াছে। পূর্ব্বযুগীয় ব্যাস ও তৎকৃত মহাভারতের ন্যায় এতৎযুগীয় ব্যাস ও তৎকৃত মহাভারত আমার স্মৃতিগম্য আছে। এ পর্য্যন্ত সাত বার ব্যাসনামধেয় জীব জন্মিয়াছে ও সাত বার মহাভারত প্রচারিত হইয়াছে[২০।২৭]। হে মুনীশ্বর! আখ্যান-শাস্ত্রও (ইতিহাস শাস্ত্র) যুগে যুগে বিনষ্ট হয় ও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়[২৮]। হে সাধো! প্রত্যেক যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎযুগীয় পদার্থ সমূহের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট করিয়াছি ও সে সমুদায় স্মরণ করিতেছি। ভগবান্ বিষ্ণু রাক্ষস বধার্থ দশ বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বার তাঁহার রাম আখ্যা হইয়াছে। এবার তাঁহার একাদশ জন্ম, এ বারও তিনি রাম আখ্যায় প্রসিদ্ধ[২৯।৩০]। হরি তিন্ বার নরসিংহ-শরীরী হইয়া তিন্ হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছেন। ভূভার নিবারণার্থ হরির পঞ্চদশ বার বসুদেব গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি, এবার তাঁহার ষোড়শ জন্ম।

হে মুনিশ্বর! আমি আপনার নিকট যে সকল সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম, এ সমস্ত সৃষ্টিই ভ্রান্তিনির্ম্মিত, বস্তুভূত নহে। যেমন জলে বুদ্বুদের ক্ষণিক উৎপত্তি ও ক্ষণিক স্থিতি, সেইরূপ স্বাত্ম-অজ্ঞানে এই সৃষ্টির ক্ষণিক উৎপত্তি ও ক্ষণিক অবস্থিতি জানিবে। উক্তরূপ দৃশ্যভ্রান্তি নিতান্ত অনিত্য; কেননা ঐ সকল জলে লহরীর ন্যায় উত্থিত হইতেছে ও লয় হইতেছে[৩১।৩৪]। কখন পূর্ব্বসৃষ্টির সমান সৃষ্টি, কখন বা সম্পূর্ণ বিপরীত সৃষ্টি কখন বা অর্দ্ধসমান সৃষ্টি হইতে দেখিয়াছি[৩৫]। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে সকল প্রাণীর যেরূপ আচার ব্যবহার স্বভাবাদি দৃষ্ট করিয়াছিলাম, পর সৃষ্টিতে সেই সকল প্রাণীর ঠিক্ তদনুরূপ আচার ব্যবহার ও স্বভাবাদির জন্ম হইতে দেখিয়াছি, কদাচিৎ বিপরীত হইতেও দেখিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! মন্বন্তর ভেদে কখন কখন জগৎক্রমের ভেদও

হইয়া থাকে। প্রায়ই অভেদ, ভেদ কদাচিৎ। বন্ধু মিত্র ভৃত্য বাসস্থান, এ সকল ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমিও কখন বিন্ধ্য পর্ব্বতে, কখন বা সহ্য গিরিতে, কখন বা দর্দ্দুর শিখরে, কখন বা মলয়াচলে বাস করিয়াছি। এই যে ভূধর, এই যে শিখর, এই যে চুতবৃক্ষ, এই যে শাখা, এই যে নীড়, এ সমস্তই এতৎকল্পীয়; পূর্ব্ব কল্পেও এ সকল ঠিক্ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন সর্ব্বধ্বংস মহাপ্রলয় হয় তখন এ সকল থাকে না, পুনর্ব্বার এ সকল প্রাক্তন সন্নিবেশের তুল্যসন্নিবেশে এ সকল উৎপন্ন হয়, আমিও এতন্নীড়ে পুনঃ অবস্থান করি[৩৬।৪৪]। মদীয় পিতার জীবদ্দশায় যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে বটে; পরন্তু এ সকল পূর্ব্বতন নহে; কিন্তু অভিনব[৪৫]। সর্ব্ববিধ্বংস কালে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ থাকি, পুনঃ সৃষ্টি হইলে সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দেখি, সেই মেরু ও পাদপ পুনরুৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে যে আকারের সৃষ্টি ছিল, এই বৃক্ষাদির সেরূপ সংস্থান (অবয়ববিন্যাস) ছিল, পরে তাহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও দেখিতে পাই। তাহাতেই আমার অবিনাশ ও সৃষ্টির বিনাশ অবধারিত হয়। অতএব, জগতের রহস্য সৎ অসৎ দুএর বহির্ভূত অর্থাৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য। যাহাই হউক, বুদ্ধির বিপর্য্যাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৪৬।৪৭]। আত্মাশ্রিত মায়ার বিক্ষেপ শক্তির অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির বিলাস যার পর নাই চমৎকার জনক। কখন পুত্র পিতা হইতেছেন, কখন বা পিতা পুত্র হইতেছে। ঐরূপ মিত্র অমিত্র, অমিত্র মিত্র, পুরুষ স্ত্রী ও স্ত্রী পুরুষ হইয়া জন্মিতেছে। আমি কলি যুগে সত্যের আচার ও সত্যে কলির ব্যবহার দৃষ্ট করিয়াছি। হে মুনিবর! ত্রেতায় ও দ্বাপরে কলিযুগ ও কলিযুগে ত্রেতার ও দ্বাপরের কার্য্য হইতে দেখিয়াছি। সে সমস্তই আমার স্মরণে রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! চার সহস্র যুগের শেষ হইলে যে সর্ব্ববিধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় জন্মে, সে মহাপ্রলয় আমার স্মরণে রহিয়াছে। আমি দশসংখ্যক বার পার্থিবরূপ বর্জ্জিত প্রাণীর অর্থাৎ বায়বীয় মূর্ত্তিধারী জীবের সৃষ্টি সন্দর্শন করিয়াছি।

হে মুনিবর! ব্রহ্মার এক এক দিনে এক এক কল্প হয় সেই সকল কল্পের নানা আকারের সৃষ্টি মদীয় স্মৃতিতে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে[৪৮।৫৩]।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

—○()*()○—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহো! আমি পুনর্ব্বার সেই বায়সরাজ ভুশুণ্ডকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে বায়সরাজ! যাহারা এই জগতে বিচরণ করে ও ব্যবহারে রত থাকে, কি করিলে মৃত্যু তাহাদের দেহ বিনষ্ট করিতে পারে না[১।২]।

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সমস্তই জানেন, তথাপি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুরা ভৃত্যদিগকে মুখরিত করিবার জন্যই বিজ্ঞাত বিষয়ের প্রশ্ন করেন, ইহা আমি বিদিত আছি। যাহাই হউক, যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অবশ্যই তাহা বলিব। কেননা, সাধু দিগের আজ্ঞা পালন করাই আমাদিগের মুখ্য আরাধনা[৩।৪]। মৃত্যু তরণের প্রধান উপায় বাসনাবিনাশ। যাহার হৃদয়ে বাসনাতন্তুগ্রথিত দোষরূপ মুক্তাফল বিধৃত নাই, মৃত্যু তাহাকে কদাচ মারিবার ইচ্ছা করে না[৫]। আধিরূপ কাষ্ঠকীট যাহার দেহ ভেদ না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[৬]। শরীররূপ বৃক্ষের কোটরে স্থিত ও চিন্তারূপ ফণাধারী আশারূপ সর্প যাহাকে বিষজর্জ্জরিত না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[৭]। মনোরূপ গর্ত্তে অবস্থিত ও রাগদ্বেষরূপ বিষে পরিপূর্ণ লোভরূপ সর্প যাহাকে দংশন না করে, মৃত্যু তাহাকে বিনাশ করে না। শরীররূপ সমুদ্রের বাড়বানল স্বরূপ ক্রোধ যাহার বিবেক স্বরূপ জল পান না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না। তিলনিষ্পেষণ যন্ত্রের অনুরূপ কঠিন অনঙ্গ যাহাকে নিষ্পীড়ন না করে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[৮।১০]। যাহার চিত্ত পরম পাবন একাদ্বয় পদে বিশ্রান্ত হইয়াছে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[১১]। যাহার চিত্ত উদয়াস্তবর্জ্জিত ও নিত্য সমাহিত, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না[১২]। হে ব্রহ্মন্! ঐ সকল মহাদোষ সংসার ব্যাধির মুখ্য নিদান, পরন্তু যাহার চিত্ত সদা সমাহিত, ঐ সকল দোষ তাহাকে লুপ্ত করিতে পারে না। যাহার চিত্ত নিত্যসমাহিত, আধিব্যাধিজনিত দুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। যাহার

চিত্ত সমাহিত, তাহার উদয়াস্ত ও স্মরণ বিস্মরণ ও জাগ্রৎ বা স্বপ্ন কিছুই থাকে না[১৩।১৫]। হৃদয়াকাশকে অন্ধকারময় করে, এরূপ কামের ও ক্রোধের বিকারে সমুদ্ভূত চিন্তা যাহার চিত্তকে হিংসা করে না, তাহারই চিত্তকে তুমি সমাহিত বলিয়া জানিবে[১৬।১৮]। যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, সে দান আদান ত্যাগ গ্রহণ ও যাচ্ঞা, এ সকলের কিছুই করে না, অথচ সে লোকদৃষ্টিতে কার্য্যবান্ বলিয়া দৃষ্ট হয়। যাহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, বিপুল অর্থ ও মহৎ গুণ তাহার অনুগামী হয়[১৯]। যাহা পরিণামে হিত, সত্য, অভ্রান্ত ও দুশ্চেষ্টানির্ম্মুক্ত, মনকে তন্নিষ্ঠ করিবেক[২০]। অশুদ্ধ ও চিত্তকাতরকারী অনেক পিশাচ (দ্বৈত ভাবরূপ পিশাচ) যাহাকে দেখে নাই, মনকে তন্নিষ্ঠ করিবেক[২১]। চিত্তকে তন্নিষ্ঠ করিবেক—যাহার আদিতে, অন্তে ও মধ্যে চারু, মধুর ও পথ্য অর্থাৎ নির্দোষ আনন্দ[২২]। যাহা অবিনাশী, মনের হিত ও সাধুসেব্য, মনকে তত্রস্থ করিবেক[২৩]। যাহা বুদ্ধিরও আলোক অর্থাৎ প্রকাশক, যাহা দেবভোগ্য অমৃত হইতেও উত্তম অমৃত, যাহা যৎপরো ন পর (অত্যুৎকৃষ্ট) সৌভগ্য, মনকে তৎপর করিবেক। সুর অসুর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর কিন্নর ও সুরনারী ও স্বর্গ, এই সমুদায়ে যাহা আছে তাহা প্রকৃত শুভ নহে ও সুস্থিরও নহে[২৪]। নাগ অসুর অসুরাঙ্গনা ও পাতাল তলে শোভন সুস্থির কিছুই নাই। তরুরাজিতে নরাধিপত্যে পর্ব্বতে পুরসমূহে ও সমুদ্রে কিছু মাত্র শোভন ও সুস্থির নাই। হে তাত! কোনরূপ ক্রিয়াতেও শোভন ও সুস্থির বস্তু নাই। কেননা সে সকল আধিব্যাধি যুক্ত সুতরাং দুঃখজড়িত। যে হেতু দুঃখদ সেই হেতু তুচ্ছ[২৫।২৯]। বুদ্ধিবৈচিত্র্যের মধ্যেও স্থির ও শুভ নাই। কেননা সে সকল কেবলমাত্র চিত্তের তারল্য বা চিন্তাবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ক্রিয়া সকল হৃদয়রূপ ক্ষীর সমুদ্রের বিলোড়ক মন্দর পর্ব্বতের স্থানীয়। সুতরাং তাহাতেও শোভন ও সুস্থির কিছু মাত্র নাই[৩০।৩১]। অবিশ্রান্ত উৎপন্ন ও প্রধ্বংসযুক্ত চেষ্টাপুঞ্জেও শোভন ও সুস্থির কিছু নাই[৩২]। সমুদায় মহীতলের একাধিপত্যও শ্রেষ্ঠ নহে, দেবত্ব লাভও শ্রেষ্ঠ নহে, নাগত্বও শ্রেষ্ঠ নহে। কেননা সাধুদিগের চিত্ত ঐ সকলে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় না[৩৩]। শাস্ত্রবিচারে, পরকার্য্য বিবেচনায়, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কথাগ্রন্থে, এমন কিছু নাই যাহাতে সন্তের মন স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়[৩৪]। চিরজীবন ভাল নহে, মরণও ভাল

নহে, নরক ত ভাল নহেই, স্বর্গও ভাল নহে। কারণ এই যে, দীর্ঘ-জীবনে আধি ব্যাধি, মরণে মূঢ়তার আধিক্য, নরক ক্লেশময় ও স্বর্গ বা সর্ব্বভুবনের আধিপত্য অবশ্যবিনাশী৩৫।

হে মহাত্মন্! জগতের এবমেবং ক্রম বিচার করিয়া দেখিলে কিছুই রম্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সমস্তই অরমণীয় বলিয়া স্থির হয়। যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা তাদৃশ অশাশ্বত পদার্থে কিরূপে আশ্বস্ত থাকিতে পারেন? অর্থাৎ এ সকলে তাঁহাদের আস্থা স্থিতিপ্রাপ্ত হয় না৩৬।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

—○*()*○—

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে সাধো! কেবল একাত্ময় জ্ঞান অপার, অগাধ ও সত্য। যত প্রকার চিন্তা আছে, একমাত্র আত্মচিন্তাই সে সমস্তের নাশক। আত্মচিন্তা যে কেবল অন্যান্য চিন্তার নাশিনী তাহা নহে; চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্নতুল্য সংসারভ্রমেরও অপহারিণী১।২। উহা মনোগীতির নিষ্কলঙ্ক পথ, তদীয় ভ্রমণের বিশাল চত্বর, সমুদায় দুঃখের ও সমুদায় অনর্থচিন্তার অবসান৩। উহা অন্ধকারের জ্যোৎস্না। তমোনাশক এই জ্যোৎস্না স্বকীয় অন্তরেই সমুদিত হয়। হে ভগবন্! সর্ব্বসঙ্কল্প-বর্জ্জিত ঐ আত্মচিন্তা আপনাদের ন্যায় ব্যক্তিতে সুপ্রাপ্য হইলেও আমাদের ন্যায় ব্যক্তিতে দুর্লভ্য। প্রাকৃত জীবের মধ্যে যাহারা সামান্যজ্ঞানী, কিরূপে তাহারা সমস্ত কল্পনার অতীত পদ প্রাপ্ত হইবে? যদি বলেন, তবে তুমি সে পদ কিরূপে প্রাপ্ত হইলে? তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিলাসিনী আত্মচিন্তার কতক গুলি সখী আছে, আমি তাহাদের অন্যতমা অবলম্বন করিয়া উক্ত বর্ণিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার নাম প্রাণচিন্তা। তিনি বিজ্ঞান চন্দ্রের দ্বারা সুশীতলা, সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ও দীর্ঘজীবনের অকাট্য কারণ৭।৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভুশুণ্ড পক্ষী ঐরূপ কহিলে পর আমি পুনর্ব্বার

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম[৯]। বলিলাম, হে সংশয়নাশন্! হে চির-জীবিন্! হে সাধো! তুমি যে প্রাণচিন্তার কথা বলিলে সে প্রাণ-চিন্তা কিরূপ[১০]?

ভুশুণ্ড বলিলেন; মুনে! আপনি সর্ব্ববেদান্তবেত্তা ও সর্ব্বসংশয়নাশন হইয়াও এই বায়সকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা অবশ্যই আমার পক্ষে পরিহাস। যাহাই হউক, আমি নিজ শিক্ষার জন্য আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিব, তাহাতে আমার ক্ষতি হইবে না[১১।১২]। এই বায়সের দীর্ঘজীবনের ও আত্মজ্ঞানের কারণ স্বরূপ প্রাণচিন্তা বর্ণন করি, আপনি শ্রবণ করুন[১৩]। হে ভগবন্! দেখুন, এই মনোরম দেহ-গৃহ দেখুন। এই গৃহের স্থূণা অর্থাৎ খুঁটা তিনটী (বাত পিত্ত শ্লেষ্মা) ও নয়টী দ্বার। পূর্ব্বে যে পুর্য্যষ্টকের কথা বলিয়াছি, সেই পুর্য্যষ্টক এতদ্-গৃহস্বামীর কলত্র ও স্বজন। এই গৃহের স্বামী অহঙ্কার। অহঙ্কাররূপ গৃহস্থ ইহাতে বাস করে ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে[১৪।১৫]। আপনিও সাক্ষী চেতনার দ্বারা এ সকল দেখিতেছেন। ইহাতে কর্ণশুষ্কুলী নামক দুইটী চন্দ্রশালিকা অর্থাৎ শিরোগৃহ (সর্ব্বোপরিস্থ ছোটঘর) আছে। এই গৃহের আচ্ছাদন শিরোরুহ ও ইহাতে দুইটী বিস্তীর্ণ গবাক্ষ আছে অর্থাৎ চক্ষু দুটী গবাক্ষস্থানীয়[১৬]। ইহার প্রধান দ্বার আস্য (মুখ)। ভুজ ও পার্শ্ব ইহার উপমন্দির অর্থাৎ গৃহের পক্ষ (পাশ চাল)। দন্তশ্রেণীরূপ মালিকার দ্বারা উক্ত প্রধান দ্বার সর্ব্বদা সুশোভিত[১৭]। এই গৃহে পাঁচ দ্বারপাল রহিয়াছে তাহারা সর্ব্বদাই রূপ রস প্রভৃতি বিজ্ঞাপিত করিতেছে (পাঁচ ইন্দ্রিয়)। এই গৃহের সর্ব্বত্রই আত্মারূপ আলোক দ্বারা আলোক-ময়। জাগ্রৎকালে গৃহস্বামী এতদ্গৃহে স্থিত থাকেন তথা নেত্রকনীনি-কারূপ অলিন্দে (বারাণ্ডায়) অবস্থিতি করেন। এই গৃহ রক্ত-মাংস-বসা-রূপ কর্দ্দম দ্বারা লেপিত, স্নায়ু রজ্জু-সমূহে জড়িত, এবং ইহার মূল বা দেওয়াল স্থূলাস্থিরূপ কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত (স্থূলাস্থি=বড় বড় হাড়)-[১৮।১৯]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই গৃহের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম ও অতিকোমল ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী অব্যক্তভাবে রহিয়াছে। একটী বামভাগরূপ প্রকোষ্ঠে (বামভাগগত হৃদ্পিণ্ডে) ও অপরটী দক্ষিণপার্শ্বরূপ প্রকোষ্ঠে (হৃদ্পিণ্ডে)। এই দুই নাড়ী ছেদ ভেদ দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রাণসঞ্চরণ দ্বারা অনুমিত হয়[২০]। যাহার বা যে নাড়ীর নাম পুরীতৎ,

যাহা সমুদায় প্রাণশক্তির আশ্রয়, যাহা শ্বাসপ্রভৃতিসহস্র নাড়ীর মূল বা কন্দ, (যেমন শালুক বা মৃণালের মূল), যাহা সম্পুটিত ও সমৃণাল পদ্মযুগল-ত্রয়াকার হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রত্রয় যে স্থানে বিরাজ করিতেছে, সে স্থান অস্থিমাংসাশ্রিত হইলেও অত্যধিক মৃদু। উক্ত পদ্মাকার প্রাণযন্ত্রের নাল ঊর্দ্ধদিকে ও বক্ত্র অধোদিকে। এই পদ্মাকারযন্ত্র কীলকে প্রোত রহিয়াছে[২১]। নাসাগ্র হইতে পাদ পর্য্যন্ত দেহাকাশে বিচরণকারী চন্দ্র নামক অপান বায়ুর অমৃতে পরিষিক্ত হইয়া উক্ত পদ্মের দল গুলি বিকসিত অর্থাৎ অল্প বিস্তৃত হইতেছে, পুনর্ব্বার প্রাণবায়ুর সঞ্চারে ঐ সকল দল অল্প সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। অতএব, উক্ত যন্ত্রের পত্রভাগ প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও অতি মৃদুভাবে চলমান হইতেছে। কথা গুলির স্থূল তাৎপর্য্য—নিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস যোগে উক্ত প্রাণযন্ত্র একবার অল্প সঙ্কুচিত, আর বার অল্প বিস্তৃত হইতেছে[২২]। তাহাতেই অর্থাৎ উক্ত পদ্মদলের প্রচলনে উক্ত বায়ু দ্বয়ের বৃদ্ধি ও হ্রাস সংঘটন হইতেছে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এ কথার অর্থ এই যে, উক্ত অধ্যাত্মবায়ু পূর্ব্ববর্ণিত পুরীতৎ নামক নাড়ীতে ও হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রসংলগ্ন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বশিরায় প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা বিস্তৃত হইতেছে। বাহ্য বায়ু যেমন বাহিরে অরণ্যবর্ত্তী লতা পত্রসমূহে আঘাত প্রাপ্ত বা বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া যায়, সেইরূপ[২৩], উক্ত প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত সেই অধ্যাত্ম-বায়ু শিরায় শিরায় বিভক্ত হইয়া দেহস্থ সর্ব্বনাড়ীতে বিচরণ করে। তন্নি-বন্ধন দেহে যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সেই সকল কার্য্যের অনু-রূপে উক্ত অধ্যাত্মবায়ুর নামপ্রভেদ হইয়া থাকে। যথা—প্রাণ অপান সমান প্রভৃতি[২৪।২৫]। যেমন চন্দ্র হইতে চন্দ্ররশ্মি সর্ব্বত্র প্রসৃত হয় তেমনি হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রত্রিতয় হইতেই সমস্ত প্রাণশক্তি শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চা-রিত হয়[২৬]। গতি, আগতি, কর্ষণ, বিকর্ষণ, হরণ, আহরণ, বিহরণ, পতন, উৎপতন, এ সমস্তই উক্ত প্রাণশক্তির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়[২৭।-২৭]। এতদনুসারেই যোগিজন কর্ত্তৃক উক্ত হৃদ্‌পদ্মগত বায়ুকে প্রাণসংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। হে মুনিবর! উক্ত প্রাণবায়ুর এক শক্তিতে নেত্রের স্পন্দন (উন্মেষ নিমেষ)° হয়, অপর এক শক্তিতে স্পর্শ গ্রহণ, ও অপর এক শক্তিতে শ্বাস উচ্ছ্বাস সম্পন্ন হয়। উঁহারই এক শক্তি অন্ন পরিপাক

করে, আর এক শক্তি বাক্য উচ্চারণ করে, আর এক শক্তি রস রক্তাদি শরীরের সর্ব্বত্র বহন করে[২৮।২৯]। অধিক কি বলিব, যেমন যন্ত্রপুত্তলিকার অঙ্গপরিচালনাদি যন্ত্রচালকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় তেমনি শারীরিক ক্রিয়া মাত্রেই উক্ত বায়ুর দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে[৩০]। এই শরীরে উক্ত বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধঃ দ্বিবিধ গতি অধিক বিস্পষ্ট, ও তদ্দ্বয়ের নাম প্রাণ ও অপান। আমি সেই প্রাণ অপানের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ তদ্দ্বয়ের উপাসনা করিয়া (প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক বিভাগ বা ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বব্যাপী সূত্রাত্মপ্রাণে অর্থাৎ সমষ্টি প্রাণে ধারণা বন্ধন করিয়া) স্থিত রহিয়াছি। উক্ত প্রাণ অপানের একটী শীতল ও একটী উষ্ণ। ইহারা উভয়েই বহিরম্বরের পথিক ও শরীররূপ মহাযন্ত্র পরিচালনে শ্রমহীন। অপিচ, ইহারা হৃদয়াকাশের সূর্য্য ও চন্দ্র অথবা বহ্নি ও সোম। ইহারাই শরীররূপ পুরের চালক, মনোরূপ রথের চক্র, ও অহঙ্কাররূপ নৃপের প্রিয়তম অশ্ব[৩১।৩৪]। হে ব্রহ্মন্! আমি ইহাদিগকেই সদা সমরূপ রাখিয়া সাবধানে দিন কর্ত্তন করিতেছি। মৃণালতন্তুকে সহস্রধা বিভক্ত করিলে, সে সকল যেরূপ দুর্লক্ষ্য হয়, শরীরে শারীর বায়ুর গতি তদপেক্ষা অধিক দুর্লক্ষ্য।

হে মহাত্মন্! অবিশ্রান্তগতি শারীর বায়ুর সঞ্চার বিদিত হইয়া তদনুসরণ করিতে পারিলে পাশমুক্ত হওয়া যায়, তথা জন্মের উচ্ছেদ ও মরণের মূল বিনাশ করা যায়। অপিচ, অবিচ্ছেদী প্রসন্নতা প্রাপ্ত হওয়াও যায়[৩৫।৩৮]।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! সেই পক্ষী ঐ প্রকার কহিলে পুনর্ব্বার আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রাণবায়ুর গতি কিরূপ[১]?

ভুশুণ্ড বলিলেন, মুনিবর! আপনি সব জানেন, তথাপি আমাকে

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভাল, আপনার প্রশ্নানুসারে আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় যথাযথ বর্ণন করি, আপনি শ্রবণ করুন[২]। হে ব্রহ্মন্! স্পন্দশক্তি ও সদাগতি বায়ু এই দেহের ভিতরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছে। প্রাণ উর্দ্ধভাগে গমন করিতেছে এবং অপান অধোভাগে গতি করিতেছে। এই অপানও স্পন্দশক্তি ও সদা সঞ্চরণশীল। অতএব প্রাণ এই দেহের বাহিরে ও অভ্যন্তরে উর্দ্ধভাবে ও অপান অবাক্ (অধঃ) ভাবে স্থিতি করিতেছে[৩।৪]। হে প্রাণতত্ত্বজ্ঞ! কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই উক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাণ সঞ্চরণে প্রবৃত্ত থাকায় জীবের পক্ষে অযত্নসুলভ প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে যাহা শ্রেয়োলাভের কারণ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন[৫]। প্রাণ যে বর্ণিত হৃদ্‌পদ্মকোটর হইতে স্বস্বভাবে সুতরাং বিনা প্রযত্নে বহির্গমনোন্মুখ হইতেছে, পণ্ডিতগণ সেই বহির্গতিকে রেচক আখ্যা প্রদান করেন। তথা দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত বহির্গতির অর্দ্ধ ভাগকে (নাসাগত বা নাসার মধ্যগত অর্দ্ধ ভাগকে) পূরক সংজ্ঞা প্রদান করেন। (ভাবার্থ এই যে, প্রাণচিন্তক পুরুষ হৃদয় হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত[৬] প্রাণগতির অর্দ্ধভাগকে আন্তর রেচক ও মূর্দ্ধাদি বহির্ব্বর্ত্তী দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্তের অর্দ্ধ ভাগকে বাহ্য পূরক বলিয়া ভাবনা করিবেন)। পুনঃ উক্ত বায়ু যখন বাহ্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্তঃপ্রবেশ করে, তখন যে নাসাগ্রাবধি মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত, ও বহিরাগমন কালে মূর্দ্ধাবধি নাসাগ্র পর্য্যন্ত বায়ুস্পর্শ সংঘটন হয়, সেই দ্বিবিধ বায়ুস্পর্শকেও অন্তঃপূরক বলা যায়[৭।৮]। এইরূপ স্বাভাবিক অন্তঃকুম্ভককেও বিদিত হইতে হয়। অন্তঃকুম্ভকের বিবরণ এই যে, প্রাণ অপানে গিয়া যাবৎ না পুনঃ হৃদয়ে আইসে তাবৎ তাহাকে কুম্ভক বলা যায়[৯]। প্রাণ এইরূপে রেচক কুম্ভক ও পূরক এই ত্রিধা বিভাগে দেহে অবস্থান করে। এতদ্ভিন্ন বাহিরেও রেচক কুম্ভক পূরক কল্পিত হয়। নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বহিরাকাশে বিনা যত্নে প্রাণের গতির নাম স্বাভাবিক বাহ্য রেচক ও তাহার স্থিতির নাম স্বাভাবিক বাহ্য পূরক ইত্যাদি। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যোগীরা যাহা বলেন, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন[১০।১১]। হে প্রভো! নাসাগ্রসম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ স্থানে বায়ুর অবস্থান প্রভৃতিকে বাহ্যপূরকাদি জ্ঞান করা উচিত। তন্মধ্যে অপান বায়ু উক্ত স্থানস্থ (অর্থাৎ নাসাগ্রসম্মুখস্থ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ আকাশে) বাহ্য বায়ুর সহিত একীভাবে

ও নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিলে তাহা কুম্ভক, পরে তাহার নাসাগ্র স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন ও তৎস্থানে স্থিতি করা পূরক, তথা নাসাগ্র হইতে নির্গত হইয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ গমন করাও দ্বিতীয় প্রকারের পূরক, এবং বহির্গত প্রাণবায়ুর অপানসম্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত (প্রত্যাবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত) পূর্ণ ও সম অবস্থা প্রাপ্ত থাকাও বাহ্যকুম্ভক। অপিচ, বিনা প্রযত্নে অপানের অন্তর্ম্মুখী গতিকে বাহ্য রেচক ও দ্বাদশাঙ্গুলের শেষ সীমা হইতে ফিরিবার সময় যে বায়ুর অন্তর্ম্মুখী স্থিতি জন্মে সে স্থিতিকেও প্রকারান্তরের কুম্ভক বলা যায়। এইরূপে প্রাণ অপানের বাহ্য ও আভ্যন্তর কুম্ভক পূরক ও রেচক উত্তমরূপ বিদিত হইতে পারিলে পুনর্জ্জন্ম জয় করা যায়। হে মহাবুদ্ধিধর! কথিত আট প্রকার ভেদ দিবা রাত্র অনুশীলন করা কর্ত্তব্য[১৭।২০]। দেহবায়ুর স্বভাব বর্ণিত হইল, শয়নে গমনে জাগ্রতে বিদিত ঐ সকল স্বভাব স্মরণ বা অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসের সামর্থ্যে অবশেষে প্রাণে নিরোধ-শক্তি আবির্ভূত হইবে। যদিও প্রাণ ও অপান চঞ্চলস্বভাব তথাপি অভ্যাসের সামর্থ্যে উহারা নিশ্চল হইবে। যে পুরুষ নিজ অন্তরে ঐ সকল জ্ঞাত হইয়া অভ্যাসবান্ হয়, সে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান থাকে না। আর আর সমুদায় ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মনকে অভিহিত ব্যাপারে অব্যগ্র অর্থাৎ স্থির করিতে পারিলে মনুষ্য অল্পকালে কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাণচিন্তায় রত পুরুষের চিত্ত, বিষয়ে বৃত্তি লাভ করে না। যেমন কোন ব্রাহ্মণ চর্ম্মপাত্রগত দুগ্ধকে অপেয় মনে করে, সেইরূপ, প্রাণচিন্তাতৎপর মনুষ্যেরাও বিষয় বৃত্তিকে পরিত্যাজ্য মনে করেন। অনেক মহাপুরুষ এই চিন্তার দ্বারা প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থিতি, গতি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সকল সময়েই এই দৃষ্টি (জ্ঞান) স্থির রাখিতে পারিলে বন্ধন দশা বিনষ্ট হয়। যাহারা বোধ প্রাপ্ত, তাহারাই প্রাণাপানের অনুসরণ করিতে পারে[২২-২৭]। তাহাদের মনোমালিন্য ও মোহ থাকে না। তাহারা সর্ব্বদা স্বস্থ, স্বচ্ছ, বোধযুক্ত ও সুখী থাকে। হে ব্রহ্মন্! প্রাণ হৃদপদ্মপত্র হইতে উদ্গত হইয়া বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণের পর অস্তগত (বাহ্য বায়ুতে লয় প্রাপ্ত) হয়। তৎপরে সেই দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বাহ্যাকাশের নিম্ন প্রান্তে অপানের বৃত্ত্যুদয় হয়, হইয়া নাসা পথে হৃদ্পদ্মে আসিয়া অস্ত প্রাপ্ত হয়। প্রাণ দ্বাদশাঙ্গুলের পর যে স্থানে গিয়া বিশ্রান্ত হয়, অপান

ঠিক্ সেই স্থান হইতে হৃদ্‌পদ্মে আগমন করে। প্রাণ যেমন যেমন বহ্নি-শিখার ন্যায় বাহ্যাকাশাভিমুখে বহমান হয়, অপান তেমনি তেমনি জলের নিম্নগতির ন্যায় হৃদয়াকাশাভিমুখে বহমান হয়। অপিচ, অপান চন্দ্রস্থানীয় ও প্রাণ সূর্য্যস্থানীয়। চন্দ্রের দ্বারা দেহের আপ্যায়ন (উপচয় ও হর্ষ ভাব) ও সূর্য্যের দ্বারা দেহের পাক বা পরিণতি জন্মে। প্রতিক্ষণেই প্রাণ হৃদয়াকাশ তপ্ত করিয়া মুখাগ্রবর্ত্তী গগনকে তাপযুক্ত করিতেছে, অমনি চন্দ্রস্থানীয় অপান উদ্‌গত হইয়া মুখাগ্রবর্ত্তী গগনকে অমৃত বর্ষণে শীতল করতঃ হৃদ্‌পদ্মাকাশকে অমৃতপ্লাবিত (শীতল) করিতেছে। হে মুনে! অপান শশীর চরম ভাগ, যে ভাগ প্রাণসূর্য্যের দ্বারা গ্রস্ত হয়, সে ভাগ প্রাপ্ত হইলে আর শোক মোহ থাকে না। আর প্রাণসূর্য্যের যে অংশ অপানশশী গ্রাস করে, সে ভাগ বিদিত হইলে তদ্‌বেত্তা নরের পুনর্জ্জন্ম হয় না। হে মুনিনায়ক! যদিও আমি প্রাণ ও অপান্ এই দুই শব্দের দ্বারা এক পদার্থকে দুই বিভাগে বর্ণন করিলাম, তথাপি, অদ্বয়দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে, একই প্রাণ কার্য্যভেদে বিভিন্ন। অতএব, একাদ্বয় প্রাণই অন্তরাকাশে ও বহিরাকাশে সূর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, আবার সেই প্রাণই আপ্যায়নকারী শশিতা লাভ করিতেছে। পুনর্ব্বার সেই প্রাণ প্রোক্ত প্রক্রিয়ায় শরীরাপ্যায়ক চন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া শোষণ-কর সূর্য্য হইতেছে। প্রাণের সূর্য্যতা পরিত্যাগ ও চন্দ্রত্ব প্রাপ্তি এতদ্দুভয় প্রক্রিয়ার যে সন্ধিস্থান, সেই সন্ধিস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য ও তত্ত্বিজ্ঞানের ফলও শোকাভাব। হৃদ্‌পদ্মসম্পুটমধ্যে আত্মার আধার স্বরূপ উক্ত সূর্য্য চন্দ্রের যে নিত্য উদয়াস্ত, তাহা জ্ঞানগম্য হইলে মনের জন্ম (বৃত্তি) নিবারিত হয়। যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশস্থ উক্ত সচন্দ্র সূর্য্যকে জানে, সেই ব্যক্তির জানাই জানা অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। হৃদয়াকাশস্থ সূর্য্যের জ্ঞানে অনবচ্ছিন্ন আত্মার জ্ঞান হয়, তাহাতে হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট হয়। যেমন বাহ্যিক আলোকে বাহ্যিক অন্ধকারের ধ্বংস হয় তেমনি আন্তর আলোকে অন্তরস্থ অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। হে মুনিবর! হার্দ্দান্ধকারের ক্ষয় হওয়াই মুক্তির কারণ[২৮,৩৩]। সেই জন্যই যোগীরা উদয়াস্তযুক্ত প্রাণসূর্য্যের দর্শনে যত্নবান্ হন। অপানচন্দ্র হৃদ্‌-পদ্মকোটরের যে স্থানে অস্ত হন, সেই স্থান হইতেই বহির্ম্মুখ প্রাণ-সূর্য্যের উদয় হয়। যেমন ছায়া চলিয়া গেলে সে স্থানে আতপের

উদয় হয় তেমনি অপান লয় প্রাপ্ত হইলে পুনঃ সেই স্থানে প্রাণপুর্ব্বা সমুদিত হয়[৬৩,৬৮]। যেমন আতপ বিনষ্টে সর্ব্বত্র ছায়াই সম্ভাবিত হয়, সেইরূপ, প্রাণের অস্তগমনেও অপানের উদয় সম্ভাবিত হয়। হে সাধো! প্রাণজন্মের স্থানকেই তুমি অপানের বিনাশ স্থান বলিয়া জানিবে এবং অপানের জন্ম স্থানকেই তুমি প্রাণের লয় স্থান বলিয়া জানিবে। প্রাণ-লয় ও অপানজন্ম অবলম্বন করতঃ বাহ্যকুম্ভকতৎপর থাকিলে শোকাদি নিবারিত হয় এবং অপানের অস্তগমন ও প্রাণের উদয় কালে অন্তঃ-কুম্ভকতৎপর হইলেও শোকাদি বিনষ্ট হয়। অপান অপেক্ষাও দূরগামী প্রাণরেচক অবলম্বনে পূর্ব্ববর্ণিত স্বচ্ছ কুম্ভক অভ্যাস করিলে তাপ পাপ থাকে না এবং যে স্থানে প্রাণ অপান লয় প্রাপ্ত হয় সেই স্থান অবলম্বন করিলেও পাপ তাপ নিবারিত হয়। সে স্থান কি? সে স্থান শান্ত আত্মা। অপান প্রাণভক্ষণে উন্মুখ হইলে অন্তরে ও বাহিরে দেশ কালাদির চিন্তা করিবেক, এবং প্রাণ অপান ভক্ষণে উদ্যত হই-লেও দেশ কালাদির বিচার করিবেক। অর্থাৎ উক্ত সন্ধিস্থানদ্বয়ে নিষ্কল নিষ্ক্রিয় চিদাত্মার দর্শন সুসম্পন্ন হইবে সুতরাং, তদ্দ্বারা মনোনাশ প্রভৃতি ফলও সুপ্রাপ্য হইবে[৪৯,৫৩]। উক্ত সন্ধি-অবস্থা প্রাণিমাত্রেরই আছে বটে; পরন্তু তাহা যোগী ব্যতীত অন্যে জ্ঞাত নহে। হে মুনিবর! আপনিও দেখুন, দেখিতে পাইবেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাণ ও অপান উভয়েই অন্তরে ও বাহিরে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। তন্মধ্যে যে ক্ষণটী প্রাণের অস্ত ও অপানের উদয় বর্জ্জিত, যোগীরা সেই ক্ষণটীকে স্বাভাবিক বাহ্য কুম্ভক ও তৎপদ বলিয়া জানেন (ক্ষণটী তৎপদ নহে, ক্ষণোপলক্ষিত আত্মচেতনাই তৎপদ) এবং অযত্নসিদ্ধ অন্তঃস্থ কুম্ভককেও পরম পদ বলিয়া জানেন[৫৭,৫৯]। কেননা, উক্ত সন্ধিস্থলে আত্মার আত্মা (আত্মার আত্মা অর্থাৎ জীবের সার পরমাত্মা) স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, কোনরূপ দোষের আবরণে আবৃত হন না। উক্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যাবস্থা স্থায়ী হইলে ও তাহা বিদিত হইলে শোকমোহাদি কিছুই থাকে না[৬০]। যেমন পুষ্পের অন্তরে সুগন্ধ তেমনি প্রাণের অন্তরে আত্মা। তাহা প্রাণও নহে, অপানও নহে, কিন্তু চিৎ বা চেতনামাত্র এবং তাহাই যোগীর প্রাপ্য, উপাস্য ও বিজ্ঞেয়[৬১]। যেমন জলের অভ্যন্তরে স্বাদ তেমনি প্রাণাপানের অভ্যন্তরে আত্মা। তাহা প্রাণ ও

অপান উভয়ের অতিরিক্ত ও চেতনামাত্র এবং তাহাই যোগীর অবশ্য জ্ঞেয় বা উপাস্য[৬২]। প্রাণ লয়ের ও অপান ক্ষয়ের প্রান্তে যে চিদাত্মার প্রকাশ প্রতীয়মান হয় আমরা সেই চিদাত্মার উপাসনা করি[৬৩]। যে চিদাত্মা প্রাণের প্রাণ, জীবের জীবন, দেহ ধারণের ধুর্য্য, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্য (স্বাত্ম—অভেদে চিন্তনীয়)। যে চিদাত্মা মনের মন, বুদ্ধির বোধক, অহঙ্কারের অহঙ্কার, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাস্য[৬৪,৬৫]। এ সমুদায় যাহাতে, যাহা হইতে ও যাহা, সেই চিদাত্মা আমাদের উপাসনীয়[৬৬,৬৭]। বস্তুতঃ যাহাতে অপানের উদয় ও প্রাণের ক্ষয় সম্ভাবিত হয় না, যাহা নাসাগ্রবর্ত্তী দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত আকাশে প্রাণাপানের প্রবাহ সন্ধিতে মাত্র উপলক্ষিত হয়, আমরা সেই চিত্তত্ত্বের ধ্যান করি[৬৮]। যাহাতে প্রাণের অস্ত ও অপানের উদয় বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য[৬৯]। বাহিরে ও অভ্যন্তরে প্রাণাপানের উদ্ভব স্থান বলিয়া বিবেচ্য সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের ধ্যেয়[৭০]। যাহা শক্তির শক্তি ও প্রাণাপানরূপ রথে আরূঢ়, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য[৭১]। যাহা হৃদিস্থ প্রাণের কুম্ভকের, বহিস্থ অপানের কুম্ভকের ও পূরকের উপলক্ষিত, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য[৭২]। যাহা প্রাণাপান প্রবাহের নিমিত্তকারণ ও সত্তাবোধস্বরূপ, সেই চিত্তত্ত্ব আমাদের উপাস্য। যাহা প্রাণচিন্তার উদ্দেশ্য, ফল বা প্রাপ্য, আমরা সেই চিত্তত্ত্বের উপাসনা করি। যাহা প্রাণবায়ুর স্পন্দশক্তির হেতু, কারণসমূহের কারণ ও সমুদায় আনন্দের উৎস, আমরা সেই চিত্তত্ত্বের উপাসনা করি[৭৩,৭৪]।

যাহা সর্ব্বপ্রকার কল্পনাকলঙ্কের অতীত অথচ কল্পনা গণের দ্বারা লক্ষণীয় এবং সম্যক্ অনুভব যাহার বিভূতি, সেই দেবনমস্য শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের প্রতি আমরা প্রপন্ন হইয়া রহিয়াছি[৭৫]।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড বলিলেন, আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রাণোপাসনা করিয়া ক্রমে এই চিত্তবিশ্রান্তি ও নির্ম্মল আত্মবিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি[১]। হে মহামুনে! আমি নির্ম্মল আত্মতত্ত্বে সদা স্থিত থাকি, এক নিমেষের জন্ত বিচলিত হই না। এই সুমেরু বিচলিত হয়, তথাপি আমি বিচলিত হই না[২]। আমার আত্মসমাধি স্থিতি গতি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, কোনও অবস্থায় লুপ্ত হয় না। এই নিত্যানিত্যময় ও অতিলোল (চপল) জগতে আমি আপনা আপনি আত্মকামে অবস্থান করি ও আমার মনোবৃত্তি অন্তর্ম্মুখী বৈ বহির্ম্মুখী হয় না। প্রলয় বায়ু বহমান হউক, আর প্রলয় জলে বিশ্ব বিধ্বস্ত হউক, কিছুতেই আমার সুসমাধি বিনষ্ট হয় না[৩,৪]। হে মহাতপস্বিন্! আমি প্রাণাপানের অনুসরণ ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা শোক মোহের পরপারে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছি[৫]। হে ব্রহ্মন্! আমি সাক্ষিদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া ধীরতা সহকারে প্রাণি-সমূহের বার বার মজ্জন উন্মজ্জন দেখিতেছি ও মহাপ্রলয় হইতে এতাবৎ কাল জীবিত রহিয়াছি[৭]। আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করি না, কেবল মাত্র বর্ত্তমান দর্শনে ও নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করি[৮]। যখন যেরূপ উপস্থিত হয়, ফলাফল চিন্তা না করিয়া সুষুপ্তসম বুদ্ধিতে স্থিত থাকি[৯]। আমি ভাবাভাবময়ী চিন্তা পরিত্যাগী ও কেবল আত্মনিষ্ঠ হইয়া এই অনাময় ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি[১০]। বর্ণিত প্রাণাপানের যোগ (অবলম্বন) করতঃ আপন আত্মাতেই পরিতুষ্ট থাকি, তাহাই আমার এই নিরাপদ দীর্ঘ জীবনের কারণ[১১]। আমি আজ্ ইহা পাইলাম, কাল আবার পাইব, ইহা সুন্দর তাহা অসুন্দর, এ সকল চিন্তা করি না। তাহা না করাতেই আমি গতোদ্বেগ হইয়াছি ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি। আমি কোন কিছুর স্তুতি নিন্দা করি না, আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু জানি না, সেই কারণে আমার এতদ্রূপ শুভ লাভ হইয়াছে[১২,১৩]। আমি শুভসমাগমে তুষ্ট হই না, ও অশুভসমাগমে কষ্ট বা

খেদ প্রাপ্ত হই না, আমার মন সদা একরূপে স্থিত থাকে, সেহ কারণে আমার এই শুভ লাভ হইয়াছে। আমি যার পর নাই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতেছি, তৎকারণে আমার এই শুভ লাভ হইয়াছে[১৪।১৫]। আমার চাপল্য নাই, শোক নাই, আমার মন সদা স্বস্থ ও সমাহিত থাকে, সেই জন্য আমি নিরাপদ ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৬]। কাষ্ঠ, বিলাসিনী, শৈল, তৃণ, বহ্নি, হিম, আকাশ ও পৃথ্বী, সর্ব্বত্র আমি সাম্য দর্শন করি, তৎকারণে আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৭]। আজ্ আমার কি হইল, কল্যই বা কি হইবে, এরূপ চিন্তাজ্বর আমার নাই, তাহা না থাকাতেই আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৮]। আমি জরা ও মরণ জনিত দুঃখে ভীত নহি, রাজ্যলাভ সুখে হৃষ্ট নহি, সেই কারণে আমি গতব্যথ ও দীর্ঘজীবী হইয়াছি[১৯]। এ আমার বন্ধু. এ আমার অবন্ধু, এ আমার পর এ আমার আত্মীয়, এরূপ ভেদ বুদ্ধি আমার নাই। তাহা নাই বলিয়া আমি চিরজীবী ও নিরাময় হইয়াছি[২০]। যে হেতু আমি জানি, আমিই সব, আমিই সর্ব্ব বস্তুতে অবভাসমান এবং আমি আদ্যন্তমধ্যবর্জ্জিত অনাময় চিৎ, সেই হেতু আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[২১]। আহার, বিহার, স্থিতি, গতি, উত্থান, উপবেশন ও শ্বাস, উচ্ছাস ও শয়ন, কোনও সময়ে আমি আমাকে সদেহ বা দেহী বলিয়া জানি না। যে হেতু আমি ঐরূপ জানি না, সেই হেতু আমি চিরজীবী[২২]। আমি সাংসারিক আড়ম্বরে সুষুপ্তের ন্যায় স্থিত নহি ও এ সকলকে অসৎ অর্থাৎ নাই বলিয়া জানি। উক্ত প্রকারে থাকি ও জানি বলিয়াই আমি দীর্ঘজীবী হইয়াছি[২৩]। প্রারব্ধ অনুসারে যখন যে ভোগ উপস্থিত হউক না কেন, সে সকলকে আমি সমভাবে স্বীকার করি এবং তাহাও আমার চিরজীবিতার কারণ[২৪]। আমি সকল ভূতে সমদর্শী ও অকুটিল বলিয়া চিরজীবী হইয়াছি। এই আপাদ মস্তক দেহের কুত্রাপি আমার মমতা নাই এবং আমার কোনও অঙ্গ অহঙ্কার পঙ্কে লিপ্ত নহে। সেই কারণে আমি অনাময় ও চিরজীবী হইয়াছি[২৫।২৬]। আমি পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিলেও আমার মন সে সকলে অভিমানী হয় না। সে জন্যও আমি অনাময় দীর্ঘজীবী। হে মুনিবর! আমি যখন যাহা জানি, আমার তাহাতে ঔদ্ধত্য হয় না। তাহা না হওয়াতেও আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[২৭।২৮]।

আমি পারকতা সত্ত্বেও আক্রম করি না, দরিদ্রতা সত্ত্বেও কিছু বাঞ্ছা করি না, সে জন্যও আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[২৯]। এই শরীরে ও সর্ব্বভূতে আমি চিন্মাত্রদর্শী, ও পরশরীরকে আমি স্বশরীরের ন্যায় দেখি, তথা আশাপাশ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত থাকি, জগৎকে অসত্য ও আত্মাকে সত্য বলিয়া জানি, বাহ্যদৃষ্টিবিষয়ে সুপ্ত ও আত্ম-বিষয়ে সদা প্রবুদ্ধ থাকি, এই সকল কারণে আমি চিরজীবী[৩০।৩২]। জীর্ণ হউক, শ্লথ হউক, ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, বা বিচূর্ণিত হউক, সমু-দায়কে আমি তত্ত্ব দৃষ্টির দ্বারা নূতনবৎ দেখিয়া থাকি। সুখী মানব দেখিলে সুখানুভব করি, দুঃখী দেখিলে তদ্দুঃখে দুঃখী হই, তথা সকলকেই আমি প্রিয় ও মিত্র বিবেচনা করি, এই সকল কারণেও আমি নিরাময় ও দীর্ঘজীবী[৩৩।৩৪]। আমার বুদ্ধি আপদ কালেও বিচ-লিত হয় না, সম্পদেও উচ্ছৃন হয় না, ভাব হউক, অভাব হউক, কোনও বিষয়ে আমার উদ্বেগ জন্মে না, ইহাতেও আমার দীর্ঘজীবন ও অনাময়তা উৎপন্ন হইয়াছে[৩৫]। আমি আমি নহি, আমারও কিছু নহে, ইত্যাকারে আমার চিত্ত সংস্কৃত হওয়ায় আমি অনাময় ও দীর্ঘজীবী[৩৬]। এই জগৎ, এই ব্যোম, এই দেশ, এই কাল ও দিক্ সমূহ, এ সমস্তই আমি, এই নিশ্চয়ের দ্বারা আমার জীবন দীর্ঘ ও স্থায়ী হইয়াছে[৩৭]। আমি ভাবি—ঘট, পট, শকট, দেশ ও আকাশ প্রভৃতি সমস্তই আমি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই ভুশুণ্ড কাক মৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার দীর্ঘজীবনের বিষয় এই সকল কথা বলিল, অবশেষে বলিল, হে মুনিবর! আমি ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রের ত্রিজগৎরূপ তরঙ্গ ভেদ করিয়া অধুনা সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপে স্থিতি করিতেছি[৩৮।৪০]।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ সর্গ।

—০()•()০—

ভুশুণ্ড বলিলেন, হে জ্ঞানপারগ হে ব্রহ্মন্! আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন বলিয়া আমি আপনাকে আমার স্থিতি প্রকার বর্ণন করিলাম, ইহাতে যদি আমার কোনরূপ ধৃষ্টতা হইয়া থাকে ত তাহা মার্জ্জনা করিবেন১।

বশিষ্ঠ বলিলেন, অহো! আপনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের কারণ ও শ্রবণ তৃপ্তিকর স্ববৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলেন। ধন্য তাহারা, যাহারা ব্রহ্মার ন্যায় দীর্ঘজীবী আপনার দর্শন লাভ করিয়াছে২।৩। আজ্ আমি আমাকে ধন্য মনে করিতেছি। কেননা, আপনি যাহা বলিলেন, আর আমি যাহা শুনিলাম, সে সমস্তই অত্যন্ত বুদ্ধিশুদ্ধিকর! আমি নানা দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াছি, নানা বিচিত্র বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি, নানা মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছি, কিন্তু আপনার ন্যায় মহাত্মা এ জগতে আর দেখি নাই৪।৫। এই জগতে ভবত্তুল্য মহাপুরুষের দর্শন সুলভ নহে, কদাচিৎ কচিৎ ভবত্তুল্য মহাত্মার দর্শন লব্ধ হইয়া থাকে৬। সকল বাঁশে মুক্তা পাওয়া যায় না, দৈবাৎ কোন কোন বাঁশে মুক্তা পাওয়া যায়। সেইরূপ, এই জগতে আপনার ন্যায় মহাপুরুষ কদাচিৎ কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন৭। যাহাই হউক, আমি যে আজ্ আপনাকে দেখিলাম, ইহাতে আমার একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল৮। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি এখন আপনার নীড়ে প্রবিষ্ট হউন, আমি এখন যথাগত স্থানে গমন করি।

ভুশুণ্ড মদীয় বাক্য শ্রবণে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া আমার সপর্য্যা নির্ব্বাহ করিলেন ও কিয়দ্দূর মদীয় গমনের অনুগমন করিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে উচিত সম্ভাষণের দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গগন মার্গে পক্ষীন্দ্রের ন্যায় সুরপুরোদ্দেশে আগমন করিতে লাগিলাম। পরে আমি সপ্তর্ষিমণ্ডলে আগমন করিয়া মদীয় জায়া অরুন্ধতী কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইলাম। হে রামচন্দ্র! সত্য যুগের প্রথমে আমি এইরূপে ভুশুণ্ডের সহিত সংগত হইয়াছিলাম। সে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন

ত্রেতা যুগ চলিতেছে[১৮]। এই ত্রেতার মধ্যভাগে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আজ্ অষ্ট বর্ষ সমাপ্ত হইল, পুনর্ব্বার আমি সেই ভুশুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। অর্থাৎ সম্প্রতিও আমি ভুশুণ্ডকে দেখিতে গিয়া ছিলাম। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, ভুশুণ্ড সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে ঠিক্ সেই রূপেই স্থিত রহিয়াছে[১৯]। হে রামচন্দ্র! অতি আশ্চর্য্য ভুশুণ্ড-বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তুমি মদুক্ত ভুশুণ্ডবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য বিচার কর[২০]।

বাল্মিকি কহিলেন, যে ব্যক্তি এই ভুশুণ্ডের সৎকথা বিচার করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভয়াবহ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে[২১]।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! আমি তোমার নিকট আদ্যোপান্ত ভুশুণ্ড বৃত্তান্ত বলিলাম। ভুশুণ্ড অভিহিত প্রকার প্রজ্ঞার দ্বারা অতি-দুস্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন[১]। হে মহাবাহু রাম! তুমিও ভুশুণ্ডের ন্যায় প্রাণচিন্তা ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভবার্ণব উত্তীর্ণ হও[২]। ভুশুণ্ড যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর ও যোগাভ্যাসরত হইয়া তৎপদ প্রাপ্ত হই-য়াছে তুমিও উক্তরূপে তৎপদ প্রাপ্ত হও[৩]। ভুশুণ্ডের ন্যায় অনা-সক্ত ও প্রাণাপানতত্ত্বদর্শী হইতে পারিলে অনায়াসে ভবসঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভুশুণ্ডের এই বিচিত্র বিজ্ঞানদৃষ্টি শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তুমি যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিবে[৪।৫]।

রাম বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি যে সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিলেন, ইহাতে আমার হৃদয়ান্ধকার সম্পূর্ণরূপে উন্মার্জ্জিত হইয়াছে[৬]। আমরা প্রবুদ্ধ, প্রহৃষ্ট ও আপন আস্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা জ্ঞাতব্য তাহা জানিয়াছি এবং ভুশুণ্ডচরিত শ্রবণে শান্ত পদে স্থিত হইয়াছি[৭]। আপনি ভুশুণ্ড চরিত বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই

মাংসাস্থিচর্ম্মবিনির্ম্মিত শরীর আমাদের গৃহ। এই বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য —এ গৃহ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই শরীররূপ গৃহ কাহার নির্ম্মিত, কেন নির্ম্মিত, এবং কে ইহাতে স্থিতি করে, তথা কি প্রকারে ইহার স্থিতি নির্ব্বাহিত হইতেছে[৮।১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রামচন্দ্র! অবহিত হও, তাহাও বলিতেছি। পরমার্থ বোধের উদয় ও দোষের অপাকরণ জন্য আমি তোমাকে যাহা বলি, তাহা তুমি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবে[১১]। অস্থিনির্ম্মিত খুঁটী, রক্ত মাংসে প্রলিপ্ত ও নবদ্বার বিশিষ্ট এই দেহ গৃহকে কেহ নির্ম্মাণ করে নাই[১২]। ইহা কেবল মাত্র আভাস অর্থাৎ বুদ্ধিবিভ্রম। ইহা দ্বিচন্দ্রের অনুরূপ। ইহাকে সৎও বলা যায়, অসৎও বলা যায়। যেমন চন্দ্র এক হইলেও ভ্রমের মহিমায় দুই চন্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দেহী ও দেহ এই প্রতীতিকেও তুমি সেইরূপ জানিবে[১৩।১৪]। প্রতীয়মান কালেই দেহের অস্তিতা, পরন্তু অপ্রতীতি কালে ইহার অনস্তিতা। সুতরাং অর্থাৎ সেই জন্য ইহাকে সৎ ও অসৎ উভয়রূপী বলা যায়[১৫]। যেমন স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শন, অন্য কালে সে দর্শন বিলুপ্ত, সেইরূপ, দেহপ্রত্যয়কালে ইহার স্থিতি, অন্য কালে ইহার অস্থিতি অবধারিত। বুদ্বুদপ্রত্যয় কালেই বুদ্বুদ, অন্য কালে তাহা জলই, অন্য কিছু নহে। অতএব, এখন এই দেহ অবভাসিত হইলেও অন্য কালে ইহার মিথ্যাত্ব অবধারিত হয় [১৬।১৮]। অহং আমি, এই যে এক আকস্মিক জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতেই এই মাংসাস্থিময় পদার্থের বিভ্রম প্রকটিত হইয়াছে[১৯]। অতএব, হে রঘুনাথ! তুমি দেহে দেহবুদ্ধি পরিত্যাগী হও। কেননা দেহের সঙ্কল্পই দেহাকারে রচিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্নে দেহের রচনা। স্বপ্নকালে যে ব্যাঘ্রাদিদেহ প্রতীত হয়, সে দেহ যেমন কেবল মাত্র সঙ্কল্পরচিত, সেইরূপ, এই জাগ্রদ্দেহও স্বসঙ্কল্পরচিত[১৯।২০]। হে রাম! তুমি স্বপ্নকালে যে দেহে পরিভ্রমণ কর, মনোরাজ্য কালে যে দেহে অবস্থান কর, তোমার সে দেহ কোথায় অবস্থিত ও কাহার কৃত তাহা ভাবিয়া দেখ। ঐ সকল দেহেও তুমি স্বর্গে ও সুমেরুতটে পরিভ্রমণ করিয়া থাক। হে মহাবাহু রাম! স্বপ্ন ও মনোরাজ্য গত হইলে সে দেহ থাকে কি? তাহা থাকে না। সেইরূপ, দেহবিভ্রম গত হইলেও এ দেহ থাকে না। তুমি যে তোমার অনুরাগিণী সঙ্কল্পকান্তার সহিত বিহার করিয়া সুখী

হও, সে কান্তা কি বস্তুতঃ সদেহ? তাহা নহে। হে রাম! ঐ সকল দেহ যেমন কেবল মনোময় এবং এক ভাবে সে সকল দেহ আছে ও অন্যভাবে সে সকল নাই, সেইরূপ এই ব্যবহ্রিয়মান দেহকেও তুমি ঐরূপ মনোময় ভাবিবে ও ব্যবহার কালে আছে ও ব্যবহারাতীত কালে নাই, এইরূপ স্থির করিবে২১।২৩। স্বপ্ন কালের দেহাদি যেরূপ, এই বিদ্যমান দেহও সেইরূপ। ইহা ধন, ইহা দেহ, ইহা দেশ, এ সমস্তই ভ্রম, বাস্তব নহে২৭। ঐ সমস্তই চিত্তের মহিমা ও সঙ্কল্পের বিস্তৃতি। ঐ সকলকে তুমি হয় দীর্ঘস্বপ্ন, না হয় দীর্ঘ বিভ্রম, অথবা একটা দীর্ঘ মনোরাজ্য বলিয়া জানিবে। সংসারের স্বপ্নাদিতুল্যতা তুমি সেই দিন বুঝিতে পারিবে যে দিন তুমি পরমাত্মার কৃপায় প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে২৮।২৯। যেমন সূর্য্যোদয় হইলে সমস্তই দেখা যায় তেমনি প্রবোধ অর্থাৎ তত্ত্ববোধের উদয়েও এ সমুদয়ের স্বপ্নতুল্যতা অনুভূত হয়। ইতি-পূর্ব্বে আমি তোমাকে কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি কথা বলিয়াছি, তাহাও মনস্তত্ত্বের মহিমা ও প্রভাব। মনঃই বিচিত্র রচনার বীজ, তথা মনঃই ভ্রান্তিময়। সুতরাং এ সংসার তাহারই সঙ্কল্প, অন্য কিছু নহে। ব্রহ্মাও মনঃকল্পিত ও চিদাভাস, অন্য কিছু নহে৩০।৩৩। হে রামচন্দ্র! চিরাভ্যাসজনিত সুদৃঢ় সংস্কার দ্বারাই চিত্ত আপনার দেহ দর্শন করে, সুতরাং দেহকে তুমি বাসনাময় বলিয়া জানিবে। অতএব, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার ও সঙ্কল্পের প্রবাহ স্থগিত করিবার জন্য কঠোরতর তপস্যার প্রয়োজন অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি অবলম্বন আবশ্যক। সেই এই, সেই আমি, এই আমি, ইহা সংসার, এ সকল ভাবনা দৃঢ় হইলে এ সকল সত্যবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং এ সকল মিথ্যা এতদ্রূপিণী ভাবনা দৃঢ়া হইলে তখন আর এ সকলের সত্যতা প্রতীতি হইবে না। মন অতি তীব্রপ্রযত্নে যাহা ভাবনা করে, ভাবনার পরে তাহাই প্রতীয়মান হয়৩৪।৩৭।

হে রামচন্দ্র! দিবসে যাহা অত্যভ্যস্ত হয়, রাত্রে তাহাই স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়, অত্যভ্যস্ত সঙ্কল্পের প্রভাবে এই সংসার দৃষ্ট হইতেছে। তাপতপ্ত আকাশে জলপ্রবাহ দৃষ্ট হয়, অথচ আকাশে তাহা নাই। সেইরূপ এই পৃথিবী না থাকিলেও সঙ্কল্পের প্রভাবে দৃষ্ট হইতেছে৩৮।৪০। দৃষ্টির দোষেই আকাশে পিচ্ছিকা দৃষ্ট হয়, তদ্বৎ জগৎও অজ্ঞান দোষে দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি যথাবৎ হইলে

তখন আর আকাশে পিচ্ছিকা দৃষ্ট হয় না, জ্ঞানও অজ্ঞানাবরণ মুক্ত হইলে তখন আর জগৎ দর্শন করে না[৩১।৩২]। ভীরু ব্যক্তি স্বসঙ্কল্পিত বেতালে ভয় প্রাপ্ত হয় বটে, পরন্তু যখন সে জানে, দৃষ্ট বেতাল মিথ্যা, কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন আর তাহার ভয় থাকে না। সেইরূপ, জীব যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জানে, দৃষ্ট সংসার মিথ্যা, তখন সে সংসার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে রাঘব! এই সমস্ত প্রতিভাস আপনাতেই প্রকাশিত, অন্যত্র নহে[৩৩।৩৪]। হে রঘুনাথ! এ সমুদায়ই যখন আপনারই প্রতিভাস (ভ্রান্তি), তখন আর কে কি দেখিয়া ভীত হইবে? অতএব, যাহার যে মালিন্যে ভয়, মিথ্যা ভয়, তাহার সেই মালিন্য অবশ্য শোধনীয়। সে শুদ্ধ হইলে তখন আর এরূপ পার্থক্য ও এরূপ বিচিত্রতা দৃষ্ট হইবে না। এ জগৎও তখন মোহের মহিমা বলিয়া অবধারিত হইবে। শুদ্ধি কি? সম্যক্ দর্শনই শুদ্ধি, আত্মার পক্ষে তদ্ভিন্ন অন্য কোনরূপ শুদ্ধি নাই। তাম্রই মলিন হয়, কাঞ্চন কখন মলিন হয় না। অথবা কাঞ্চন তাম্র বলিয়া জানা পর্য্যন্ত তাম্র থাকে, কাঞ্চন বলিয়া জানিলে আর তাহা তাম্র থাকে না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এ জগৎ নাই, এ সমস্ত ভ্রমের বিলাস, এইরূপ জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়, সেই নিরাসই সম্যক্ দর্শন নামে প্রসিদ্ধ[৩৫।৩৭]। জীবন, মরণ, স্বর্গ, নরক, জ্ঞান, অজ্ঞান, কিছুই চিদ্ব্যতিরিক্ত নহে, সমস্তই চিৎ, ইত্যাকারের ঐক্য দর্শনকেই আমরা সম্যক্ দর্শন বলি। এই তুমি, এই আমি, এই দিক্, ইত্যাদিবিধ ভেদ ভাবই সংসার, অথচ ঐ সকল বাস্তবতঃ আমাতে নাই। সুতরাং সমস্ত আমার আভাস অর্থাৎ ভ্রান্তি। এইরূপ নিশ্চয়কে আমরা সম্যক্ দর্শন বলি[৩৮।৪০]। এই সংসার আপাত দর্শনে আছে, আবার বিচার দর্শনে নাই। সুতরাং ইহা সদসন্ময়। পরন্তু বিচার দর্শনে ইহাই স্থির হয় যে, ইহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই। মিথ্যা বস্তুর আবার উদয়, অস্ত, কি? যখন ঐরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে তখন মনঃও অমন হইয়া যায়। মন তখন ঐ নির্ণয়ের দ্বারা কামনা ত্যাগ করে, ও পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ মনস্বী তখন কোন কিছুর নিন্দা করেন না, কোন কিছুর প্রশংসাও করেন না, কোন কিছুর জন্য হৃষ্টও হন না, শোকও করেন না[৫১।৫২]। সম্যক্ দর্শনের বলে মন শীতল হয়,

সত্যাবলম্বী হয়, ও বন্ধু বিয়োগেও দুঃখী হয় না। তখন সে ভাবে, অবশ্য মর্ত্তব্য জীব মরিবে তজ্জন্য আবার শোক কি? জন্মিলেই যখন কিছু না কিছু বিভব প্রাপ্ত হয় তখন বিভব প্রাপ্তিতে হর্ষ কেন? যাহারা এই সংসারে ব্যবহার দশায় থাকে, তাহাদের সকলেরই ঐ দশা অপরিহার্য্য, তজ্জন্য শোক কেন? অর্থও যায়, অনর্থও আইসে, তজ্জন্য শোক করা বৃথা। সমুদ্রে বুদ্‌বুদ উঠিতেছে যাইতেছে আবার হইতেছে। এই জগজ্জাল ঠিক্ তদ্রূপ। যাহা সৎ তাহা সদা কালই সৎ, যাহা অসৎ তাহাও সদাকাল অসৎ অর্থাৎ নাই। ইহাতে ক্রিয়ার বৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কিছু নাই এবং খেদের বিষয়ও কিছু নাই। আমি আমি নহি, আমি হই-ও নাই ও হইবও না এবং বর্ত্তমানেও নহি। তবে আবার পরিদেবনা কি? যদিও আমি দেহ হইতে অন্য অর্থাৎ পৃথক্, তথাপি, চিদাভাস (চিৎপ্রতিবিম্ব) হইতে অপৃথক্। চিৎ ও চিদাভাস এ দুএর আবার ভেদ কি? চন্দ্র ও চন্দ্রাভাস, এ দুএর কি বাস্তব ভেদ আছে? যে মননশীল এইরূপ সম্যক্ জ্ঞানে নিশ্চয়বান্, তাহার উদয় অস্ত তাপ পরিতাপ, কিছুই থাকে না[৫৩।৬১]। সেই অত্যুত্তম পদে স্থিত মহাপুরুষের নিকট আত্ম-পর প্রভেদ থাকে না, সুতরাং কোনরূপ অশান্তি বা জ্বালা যন্ত্রণাও তাহার থাকে না[৬২]। তিত্তিরি পক্ষী অতি কোমল তৃণাগ্র গ্রহণ করে, কর্কশাংশ গ্রহণ করে না। জ্ঞানী পুরুষেরাও এই সংসারের সদংশ গ্রহণ করেন, অসদংশে আস্থা বিহীন হন[৬৩]। আস্থাই বন্ধনের রজ্জু, আস্থার দ্বারাই জীব বদ্ধ হয়। সে জন্য বুদ্ধিমান্ লোক আস্থাপরিত্যাগী হন। হে অনঘ! ব্যক্তি মাত্রের আস্থা বা আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেক, যাহা অকর্ত্তব্য তাহা উপেক্ষা করিবেক। যাঁহারা মহাবুদ্ধিধর, তাঁহারা আস্থা অনাস্থা উভয় ত্যাগী হইয়া লীলার ন্যায় ব্যবহারে রত থাকেন। যাহার জ্ঞানে এ সকল আভাস-কণা বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার অন্তর সদা শীতল। হে অনঘ! তুমিও আস্থা অনাস্থা উভয়াতীত হইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, এই সকল পদার্থ আভাস ব্যতীত অন্য কিছু নহে অর্থাৎ কোনরূপ সত্যদৃশ্য নহে। হে রাম! এই দৃশ্যবৃন্দ কেবল মাত্র আভাস ও চিত্তের কলঙ্ক। অতএব, তুমি এই সমস্ত আভাসের অতীত হও[৬৪।৬৯]। আভাস পরিত্যক্ত হইলে তুমি একান্ত নির্ম্মল হইবে।

আমি, আমার ভোগ, এ সকল অসত্য, এইরূপে পরিভাবিত হইলে তুমি সর্ব্ববর্জ্জিত, সর্ব্বগ ও নিত্য চিদাকাশময় হইবে[১০]। এই যে আড়ম্বর, এ আড়ম্বর ব্যর্থ। কেবল ব্যর্থ নহে, পরন্তু অনর্থের মূল। চিদাত্মায় এ সকল নাই অথবা চিদাত্মাই সব, এই দ্বিবিধ ধ্যানই সিদ্ধিপ্রদ[১১।১২]। হে রামচন্দ্র! উক্ত উভয় পথের যে পথ হয় এক পথ আশ্রয় কর। অথবা উক্ত উভয় পথই অবলম্বন কর[১৩]। রাগ ও দ্বেষ এই দুইটী যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা কর। ইহ লোকে, পর লোকে, আকাশে ও স্বর্গে যে কিছু আছে, সে সমস্তই রাগদ্বেষ ক্ষয় হইলে পাওয়া যায়। রাগদ্বেষবর্জ্জিত চেষ্টার দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, মূঢ়েরা রাগদ্বেষ প্রেরিত চেষ্টায় তাহা পায় না। যেমন দগ্ধারণ্যে হরিণ থাকে না, তেমনি, রাগদ্বেষাবরুদ্ধ চিত্তে সদ্‌গুণ থাকে না। মনোরূপ গর্ত্তে রাগ ও দ্বেষ এতন্নামধেয় দুইটী মহাসর্প যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার কিছুই অলভ্য থাকে না। যাহারা প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও রাগদ্বেষময়, তাঁহারা মানবাকৃতি জম্বুক, ধিক্ তাহাদিগকে ধিক্! অন্যে আমার ধন লইল, আমি প্রাপ্তিযোগ্য অন্যের ধন ত্যাগ করিলাম, ঐরূপ এইরূপ ব্যবহারই রাগের ও দ্বেষের ক্রম অর্থাৎ ক্রিয়া বলিয়া জানিবে। ধন, বন্ধু ও মিত্র পুনঃ পুনঃ আইসে ও যায়, তজ্জন্য বিজ্ঞ নর তাহাতে রক্ত বা বিরক্ত হইবে কেন? এই যে ভাবাভাবময়ী সাংসারিকী লীলা, এই লীলাকেই আমরা পারমেশ্বরী মায়া বলি। ইহাতে ব্যাসক্ত হইলে ইহা অধঃপাতিত করিবে[১৪।৮১]। ধন, জন, মন, এ সকল সত্য নহে, প্রত্যুত অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা। কোন কিছু আগে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে· বিচারে তাহা বর্ত্তমানেও নাই। অর্থাৎ আদ্যন্তের দৃষ্টান্তে ভাবিতে হইবে, তাহা মধ্যেও নাই[৮২।৮৩]। কোন্ প্রাজ্ঞ কল্পিত আকাশ বৃক্ষে অনুরক্ত হয়? যেমন এক ব্যক্তি আকাশে শরীর কল্পনা করে, অন্য ব্যক্তি তাহা ভোগ করে, এই সংসার রচনাকে তুমি সেইরূপ জানিবে। এ সকল ভ্রমদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের অনুরূপে রচিত, সুতরাং ইহার উত্থানও অসৎ। এই সংসার এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন, জীব ইহাতে সংভ্রান্ত। এই অজ্ঞানময় গাঢ় নিদ্রা তুমি পরিত্যাগ কর[৮৪।৮৯]। প্রবুদ্ধ হও, হইয়া দেখ, আত্মা নির্ব্বিকল্প চেতন[৯০]। প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ

হও, এ কথা আমি বার বার বলিতেছি। হে মহাবাহু রাম! তুমি প্রবুদ্ধ হও, হইয়া অনাময় আত্মসূর্য্যকে দেখ[১১]। আমি যে এই অতি শীতল জ্ঞানবারি বর্ষণ করিতেছি, ইহাতেই তোমার অজ্ঞান নিদ্রা বিনষ্ট হইবে। আর বিলম্ব করিও না, অদ্যই তুমি প্রবুদ্ধ হও, হইয়া এই জগৎ ভ্রম পরিত্যাগ কর[১২।১৩]। পরে দেখিবে, তোমার জন্ম নাই, মরণ নাই, দুঃখ নাই; দোষ নাই, ভ্রমও নাই। তুমি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প বা কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি স্থিতি লাভ কর[১৪]।

হে মহাত্মা রাম! তুমি বিকল্পরূপ দোষ সমূহে লিপ্ত নহ। তোমার বৃত্তিও সুষুপ্তের ন্যায় স্থির অর্থাৎ নির্ব্বিক্ষেপ। সুতরাং তুমি অতি বিস্তৃত নিত্যাপরোক্ষরূপী পরব্রহ্ম। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সেই আপন শান্ত আত্মায় সমাহিত হও[১৫]।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ সর্গ।

——(*)——

বাল্মীকি বলিলেন, স্বস্থ ও সমচিত্ত রাম ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ ঐরূপ ঐরূপ বশিষ্ঠ বাক্য শুনিতে শুনিতে স্বাত্মানন্দসমাধি প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে বশিষ্ঠও কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত বাক্‌বিন্যাসে বিরত হইলেন। মুহূর্ত্তার্দ্ধ পরে রাম ও সভাসদগণ ব্যুত্থান অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তথা বশিষ্ঠও পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১।৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহা সম্যক্ জ্ঞান তাহাই তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ ও স্বাত্মলাভ করিয়াছ। তুমি এইরূপ স্বাত্মাবলম্বী হইয়া কাল হরণ কর, অতঃপর আর সংসারে সমাসক্ত হইও না। সংসার একটী চক্র, এ চক্রের নাভি সঙ্কল্প[৪।৫]। হে রঘুনন্দন! যদি উক্ত নাভি নিরুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সংসার চক্রের ভ্রমণ স্থগিত হয়, নচেৎ

হয় না। মনোরূপ নাভির নিরোধ ব্যতীত বলপূর্ব্বক সংসার চক্রের ঘূর্ণন রহিত করা যায় না। তাই বলিতেছি, যৎপরোনাস্তি শাস্ত্রীয় পুরুষকার, উত্তমা প্রজ্ঞা ও সদ্‌যুক্তি অবলম্বন করিয়া সংসার চক্রের নাভি স্বরূপ চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবেক। যথাবৎ ও যথাযোগ্য পুরুষকারের অলভ্য কিছু নাই। সুতরাং দৈবমাত্র পরায়ণ না হইয়া পৌরুষ পরায়ণ হওয়া বিধেয়[৮।৯]। যে চিত্ত আদিজীব ব্রহ্মা হইতে প্রবৃত্ত, আগে সে চিত্তকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য[১০]। হে অনঘ! যাহা নাই তাহাই সতের ন্যায় অর্থাৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে। যে কোন আকৃতি, সমস্তই-অজ্ঞাননামধেয় ভ্রমের বিস্তৃতি[১১]। এই যে দেহ সমুদায়, এ সমস্তই সঙ্কল্পসমুথ। সুতরাং এই এক দেহের বিনাশে সংসার চক্রের নিরোধ সিদ্ধ হয় না। কেননা, সঙ্কল্প পুনর্ব্বার দেহান্তর সৃজন করিবে[১২]। হে রামচন্দ্র! বুদ্ধিমান্ নর সুখ দুঃখের বিচার করেন না। বরং চিত্রস্থ নর ভাল, তথাপি, দুঃখম্লান জীবৎ নর ভাল নহে। চিত্রিত দেহে আধি ব্যাধি নাই, কিন্তু এ দেহে তাহা আছে। আধার পট বিনষ্ট না হইলে চিত্র দেহের বিনাশ হয় না, কিন্তু মাংসময় দেহ অতি অল্প কারণে বিনষ্ট হয়। যত্নে চিত্র মানবের শোভা দীর্ঘকালস্থায়ী করা যায় কিন্তু মাংসদেহ যত্ন সত্ত্বেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, বরং চিত্রদেহ ভাল, তথাপি এই সঙ্কল্পসমুথ মাংসদেহ ভাল নহে[১৩।১৭]। চিত্র দেহে যে সকল গুণ আছে, সে সকল গুণ এই সঙ্কল্পদেহে নাই। যদি বল, চিত্রদেহ জড়, তদুত্তরে আমার বক্তব্য, মাংসদেহও জড়[১৮]। হে অনঘ! তাদৃশ দোষদুষ্ট মাংসদেহে আবার আস্থা কি? স্বপ্নদেহ ও সঙ্কল্পদেহ যেরূপ তুচ্ছ, এ দেহও সেইরূপ তুচ্ছ। ইহাতে যে সুখ দুঃখ, তাহাও সঙ্কল্পানুরূপ। অতএব, এই সঙ্কল্পদেহ আছে বলিলেও হয়, নাই বলিলেও হয়। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা আছে, কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা নাই। অজ্ঞানীরাই এই দেহের জন্য ক্লেশভাজন হয়। চিত্রদেহ, সঙ্কল্পদেহ, স্বপ্নদেহ ও মনোরাজ্যের দেহ বিনষ্ট হয় হউক, তাহাতে যেমন ক্ষতি নাই, প্রতিবিম্ব চন্দ্র যায় যাউক, তাহাতে যেমন ক্ষতি নাই, মৃগতৃষ্ণিকা নদী থাকে না, তাহা যেমন ইষ্টানিষ্টের অতীত, সেই-রূপ, এই মাংস দেহের বিনাশও ইষ্টানিষ্টের অতীত[১৯।২২]। এই শরীর একটী চন্দ্র, ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হউক, আর ক্ষীণ হউক, তাহাতে আমার

ক্ষতি কি? এই দীর্ঘস্বপ্নময় ও চিত্তসঙ্কল্পকল্পিত দেহ ভূষিত হয় হউক, আর দূষিত হয় হউক, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম কোনও কিছুতে বিকৃত হন না, বিনষ্টও হন না। চক্রই ঘূর্ণিত হয়, চক্রস্থ নর ঘূর্ণিত হয় না। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ আপনার ঘূর্ণন অনুভব করে। মদমোহিত নরও মত্ততা দোষে আপনার ঘূর্ণন অনুভব করে। এইরূপ, দেহস্থ আত্মাও স্বাশ্রিত ও স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের দোষে দেহের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করে[২৬।২৯]। দেহের ভ্রমণে, দেহের পতনে, দেহের বিনাশে ও দেহের জীর্ণতায় আপনাকে মিথ্যার ব্যবস্থায় ভ্রান্ত, পতিত, হত, ও জীর্ণ হইতেছি বলিয়া ভাবনা করে। অতএব, যৎপরোনাস্তি ধীরতা অবলম্বন করিয়া উক্তবিধ দীর্ঘ ভ্রম পরিত্যাগ করা বিধেয়[৩০।৩১]। সঙ্কল্পের দ্বারা দেহের আবির্ভাব, সঙ্কল্পও মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং দেহভাব মিথ্যা। যাহা মিথ্যারচিত তাহার সত্যতার সম্ভাবনা কি[৩২]? যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গের উত্থান হয়, সেইরূপ, এই দেহও স্বাত্ম-অজ্ঞানে উত্থিত হইয়াছে। হে রামচন্দ্র! জড় যাহা করে তাহা প্রকৃত কৃত নহে। করিলেও জড় সে সকলের প্রকৃত কর্ত্তা নহে[৩৩।৩৪]। যে হেতু এই দেহ জড়, সেই হেতু ইহার চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এ কিছু করে না এবং ইহার কর্ত্তাও কেহ নহে। আত্মা ইহার কর্ত্তা নহে, কিন্তু দ্রষ্টা[৩৫]। দীপ যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে আপন স্বরূপে স্থিতি করে, এই জগৎস্থিতি বিষয়ে সেইরূপ স্থিতি করা কর্ত্তব্য। ভাস্কর যেমন আপন স্বরূপে স্থিতি করেন, অথচ তৎপ্রভাবে দৈবসিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, হে রাঘব! তুমিও তদ্রূপ আত্মসংস্থ হও, জগৎ স্থিতিও তোমার প্রভাবে নির্ব্বাহিত হউক। এই অসৎ দেহরূপ গৃহ, ইহা বস্তুতঃ শূন্য। ইহার অস্তিত্ব বালককল্পিত বেতালের অনুরূপ। অহঙ্কারনামধেয় কু পিশাচ ইহাতে যে কি প্রকারে আবিষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না[৩৬।৩৯]। তুমি এই দুর্ম্মতি অহঙ্কারের বশ্য হইও না। হইলে নিরয়গামী হইবে[৪০]। দুরাকৃতি চিত্তবেতাল ইহাতে আপন বিলাসে ক্রীড়া করিতেছে[৪১]। চিত্তরূপ পিশাচ এই শূন্য দেহ-গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ করিতেছে। মহান্ ব্যক্তিরা ইহারই ভয়ে সমাধিস্থ হন[৪২]। আপনার এই শরীররূপ মন্দির হইতে যদি চিত্তরূপ পিশাচকে তাড়িত করা যায় তাহা হইলে নির্ভয়ে এই সংসার নামক

শূন্য নগরে বিচরণ করা যায়[৩০]। চিত্তভূতের আবেশে অভিভূত ব্যক্তিরা যে কি জন্য ইহাকে বিতাড়িত না করে তাহা বলা দুষ্কর। যাহারা এই দেহগৃহে চিত্তভূতের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহাদের বুদ্ধি পিশাচের তুল্য এবং তাহারা মরণানন্তর পুনঃ পিশাচগ্রস্ত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[৩১।৩২]। হে সাধো! এই পোড়া শরীরে নানা বৃহৎ ভূত বাস করে। তুমি তৎসহ বিচরণের আস্থা পরিত্যাগ করিবে। তুমি অহঙ্কারের অনুচর হইও না। অহঙ্কারকে ভুলিয়া গেলেই তুমি স্বাত্মাবলম্বী হইবে। যাহারা নরক ইচ্ছা করিবে তাহারাই অহ-ঙ্কারের আনুগত্য করিবে। তাহারা এরূপ অন্ধ যে বন্ধু বান্ধব তাহা-দের দৃক্‌পথে পতিত হয় না। মানুষ সাহঙ্কার বুদ্ধিতে যাহা কিছু করে সে সমস্তের ফল বিষবল্লীর ফলের তুল্য। বিবেক ও ধৈর্য্য বিহীন হইয়া যাহারা অহঙ্কারের উৎসাহে উৎসাহিত হয়, হইয়া কার্য্য করে, সেই সকল মূর্খকে তুমি হত বলিয়া জানিবে[৩৬।৩৭]। হে রাঘব! যাহারা অহঙ্কার পিশাচের বশ্য তাহারা নরকাগ্নির কাষ্ঠ[৩৮]। অহঙ্কাররূপ সর্প যাহার কোটরে বাস করে সেই দেহরূপ পাদপ অচিরে বিনষ্ট হয়[৩৯]। হে মহান্ পুরুষ! অহঙ্কার এতদ্দেহে থাকুক, অথবা চলিয়া যাউক, তুমি তাহাকে মনের দ্বারাও দেখিবে না। যদি তুমি সর্ব্বদা উহাকে তির-স্কার কর ও তাড়াইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ পিশাচ ক্রমে তোমার বশ্য হইবে, কোন কুক্রিয়া করিবে না[৪০।৪১]। এই দেহরূপ গৃহে চিত্তনামক কুপিশাচ নানা বিচিত্র ক্রীড়া করে। করে করুক, তুমি তাহাতে বিস্মিত হইও না। যদি শতবর্ষ চেষ্টা করা যায় তথাপি চিত্তভূতাবিষ্ট ব্যক্তির বিপদের সংখ্যা কল্পনার দ্বারাও গণনা করা যায় না[৪২।৪৩]। হায়! আমি মরিলাম, হায়! আমি দগ্ধ হইলাম, এ সকল দুঃখবচন অহঙ্কার পিশাচ হইতেই উদ্গত হয়[৪৭]। আকাশ সর্ব্বগামী, অথচ তাহার সহিত কোনও কিছুর লিপ্ততা নাই। এইরূপ সর্ব্বগামী আত্মার সহিতও কোন কিছুর লিপ্ততা নাই[৪৮]। এই শরীর যাহা করে, তাহা অহঙ্কারেরই চেষ্টা, শরীরের নহে[৪৯]। আকাশ কোন কিছুর কর্ত্তা নহে, অথচ তাহা বৃক্ষোৎপত্তির হেতু। এইরূপ অকর্ত্তা আত্মাও চিত্ত-চেষ্টার হেতু। দীপ নিকটে থাকাতেই রূপ জ্ঞানের কারণ হয়, তদ্রূপ, আত্মাও সান্নিধ্যপ্রযুক্ত মনঃস্ফূর্ত্তির কারণ হয়[৫০।৫১]। আত্মা ও চিত্ত

কোনও কালে সংশ্লিষ্ট নহে। আকাশ যেমন পৃথিবীর সহিত নিত্য অসংশ্লিষ্ট সেইরূপ। হে রঘুনাথ! অবোধ লোকেরা চিত্তকেই আত্মা মনে করে, কিন্তু তাহা নহে। আত্মা প্রকাশরূপী ও সর্ব্বত্রাবস্থিত, পরন্তু চিত্ত অপ্রকাশরূপী ও পরিচ্ছিন্ন (ক্ষুদ্র পদার্থ)। চিত্তই অহঙ্কার, তাহা আত্মা নহে। বাস্তবতঃ তুমি আত্মা, অহঙ্কার নহ। এ বিষয়ে যেন তোমার বুদ্ধিমৌঢ্য না হয়[৬৪।৬৫]। হে রামচন্দ্র! দেহগৃহে মনোরূপ পিশাচ রহিয়াছে। সেই দুরাত্মাই দেহীকে এ সকল দেখায়। হে রঘুনাথ! তুমি সংসারজনক অমঙ্গলদায়ী ও ধৈর্য্যনাশক মনোরূপ পিশাচকে দূরীভূত করিয়া আপন স্বরূপে স্থিতিমান্ হও[৬৬।৬৭]। বন্ধু বান্ধব গুরু শাস্ত্র, ইহারা কেহই চিত্তভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে পারে না[৬৮]। যাহার চিত্তবেতাল সংশান্ত হইয়াছে তাহার উদ্ধার সহজ সাধ্য। চিত্ত ভূতের দ্বারাই এই জগন্নাম্নী শূন্যা পুরী দূষিতা হইয়া রহিয়াছে। এই জগৎ এক প্রকার অরণ্য, ইহাতে চিত্ত বেতালের বাস, সেইজন্য ইহা ভয়োৎপত্তির স্থান[৬৯।৭১]। এই জগন্নাম্নী নগরীতে কতিপয় মাত্র দেহগৃহ আছে, যাহাতে চিত্ত ভূতের দৌরাত্ম্য নাই অর্থাৎ কেবল। মাত্র কতিপয় মহাত্মাই চিত্তভূতের দৌরাত্ম্য রহিত। তাঁহারা কদাচ সাহঙ্কার দেহগৃহের সেবা করেন না[৭২]। অবশিষ্ট দেহ সকল চিত্তবেতালাক্রান্ত শ্মশান[৭৩]। যাহারা এই জগদরণ্যে বালকের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। অথবা ধীরতার দ্বারা আপনা আপনি আপনাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ অন্য এক প্রকার অরণ্য, এই অরণ্যে প্রাণী সকল মৃগের ন্যায় বিচরণ করে, এবং তৃণের লোভে কূপপতিত হয়। হে রাম! তুমি যেন তদনুরূপ পতন প্রাপ্ত হইও না[৭৪।৭৫]। এই পৃথিবীরূপ অরণ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞান হস্তী বিচরণ করে, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য—অজ্ঞান হস্তী বিনাশের জন্য তুমি সিংহবৃত্তি অবলম্বন করিবে[৭৬]। এই জম্বুদ্বীপের জঙ্গলে মুগ্ধনররূপ অনেক মৃগ বিচরণ করে, পরন্তু তুমি তাহাদের ন্যায় চরমান হইও না। মহিষ যেমন পল্বলস্থ কর্দ্দমে নিমগ্ন হয়, তাহাদের ন্যায় তুমি বন্ধুরূপ কর্দ্দমে নিমগ্ন হইও না[৭৭।৭৮]। ভোগ অভোগ দূরীকৃত করিয়া আর্য্যসেবিত পদের অনুসরণ করিবে ও বিচার পূর্ব্বক আত্মাশ্রয়ী হইবে[৭৯]। অতি অপবিত্র তুচ্ছ দুর্ভগ দুরাকৃতি দেহের জন্য সুদারুণ চিন্তাবর্ত্তীতে

নিমগ্ন ও দগ্ধ হইও না[৮০]। আশ্চর্য্য এই যে, এই দেহের রচনা অন্য কর্তৃক হইয়াছে, পরন্তু অন্য এক ভূত ইহাতে অকস্মাৎ আবিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, দুঃখ একের, কিন্তু তাহার ভোগ অন্যের। আত্মা প্রস্তরের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে একরূপ ও নির্ব্বিকার, সুতরাং তাহার ভোগ অসম্ভব। তাদৃশ আত্মার যে সর্ব্বসাধারণী সত্তা আছে, তাহারই অধ্যাসে বৃথা দুঃখের প্রসিদ্ধি বা অস্তিতা সম্পন্ন হইতেছে[৮১।৮৪]। এই বিষয়ে আমি অপর এক মোহ নাশন জ্ঞানের কথা বলিব, যাহা পূর্ব্বে কৈলাস শিখরে ভগবান্ চন্দ্রমৌলি আমাকে বলিয়াছিলেন[৮৫]।

উত্তর দিকে কুন্দবৎ সুশুভ্র কৈলাস নামে এক শৈলেন্দ্র আছে। ভগবান্ দেবদেব হর সেই স্থানে বাস করেন[৮৬।৮৭]। পূর্ব্বকালে আমি সেই গিরিবরের গঙ্গা প্রদেশে আশ্রম রচনা পূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবের পূজাতৎপর হইয়া বাস করিতেছিলাম, এবং তাপসোচিত আচারে কাল হরণ করিতেছিলাম। আমার চতুর্দ্দিকে সিদ্ধসমূহ বিচরণ করিতেন, এবং আমিও অবসরে অবসরে শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতাম, দেবদেবের পূজার্থ পুষ্প সংগ্রহ করিতাম, ও মালা গুম্ফন করিতাম। ঐরূপ তপশ্চর্য্যার দ্বারা আমার সেই স্থানে এক সুদীর্ঘ কাল অতিবর্ত্তিত হইল[৮৮।৯১]। একদা শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবস আগত হইলে, তদ্দিবসীয় ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধ গত হইলে, আমার সমাধি ভঙ্গ হইল, তখন আমি বাহ্য দৃষ্টিতে নিমগ্ন হইলাম। সহসা দেখিলাম, সেই কাননের আমার সম্মুখ প্রদেশে এক অলৌকিক তেজ আবির্ভূত হইয়াছে। সে রূপ বা সে তেজ শত শত সুবৃহৎ শ্বেত মেঘের অথবা সহস্র সহস্র চন্দ্রবিম্বের অনুরূপ। সেই দিক্ ও সেই লতাকুঞ্জ তদীয় প্রতিভাসে আলোকিত হইয়াছে[৯২।৯৫]। আমি বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরে দেখিলাম, আমার সম্মুখে ভগবান্ শশিশেখর আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি দেবী গৌরীর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়াছেন ও তাঁহাদের অগ্রে নন্দীশ্বর[৯৬।৯৭]। তদ্দর্শনে আমি দূর হইতে শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। পরে তাঁহাদের চরণে অর্ঘ্যপ্রদান ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। তদনন্তর চন্দ্রপ্রভা নাম্নী গৌরী দেবীর সখী আমার প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি প্রেরণ করিলে আমি ভগবতী গৌরী দেবীর ও তদীয়া সখী চন্দ্রপ্রভার যথাযথ পূজা

করিলাম। পুনর্ব্বার আমি পুষ্পচয়োপবিষ্ট লোকসাক্ষী ভগবান্ মহাদেবের পূজা করিলাম ও তদীয় চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। পরে নানাবিধ স্তুতি নতি করিলাম তথা গৌরী দেবীর সপর্য্যাও সেইরূপে সম্পন্ন করিলাম[৯৮।১০২]। পূজা সমাপ্ত করিয়া আমি সাঞ্জলিপুটে তদীয় সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলে ভগবান্ চন্দ্রশেখর আমাকে অতি শীতল শান্ত বাক্যে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি ত পরম পদে বিশ্রান্ত হইয়াছ? তোমার ত কল্যাণপ্রদ সম্বিদ্ স্থায়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে? তোমার তপস্যা ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে[১০৩।১০৪]? যাহা প্রকৃত প্রাপ্য তাহা ত তুমি পাইয়াছ? তোমার ভয় ত ঐকান্তিকরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে[১০৬]? সেই দেবদেব ঐরূপ বলিলে আমি বলিলাম, হে মহেশ্বর! যাহারা আপনার দর্শন পায় তাহাদের আবার ভয় কোথায়? তাহাদের আবার দুষ্প্রাপ্য কি? অকল্যাণই বা তাহাদের কোথায়? যাহারা আপনার স্মরণজনিত আনন্দে পূর্ণমনা, তাহাদের আবার ভয়াদি কি[১০৭,১০৮]? এই জগৎকোষে এমন দেশ, এমন জনপদ, এমন পর্ব্বত ও এমন নর নাই যাহারা আপনাতে বিনত নহে। আমি জানি, আপনার দর্শন লাভ পূর্ব্বতপোর্জ্জিত বহু পুণ্যের ফল[১০৯।১১০]। আপনি জ্ঞানামৃতের কলশ, ধৈর্য্যজ্যোৎস্নার নিশাকর, মোক্ষ নগরের দ্বার, এবং আপনার অনুসরণ চিন্তামণিস্থানীয়[১১১।১১২]। আপনি সমুদায় আপদের মস্তকে পদাঘাত করেন। হে রামচন্দ্র! আমি ঐরূপ বলিলে ভগবান্ মহেশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন ও মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি স্থাপিত করিলেন। পরে পুনর্ব্বার আমি যাহা বলিলাম, তাহাও বলি, শ্রবণ কর। বলিলাম, হে ভগবন্! দিক্ সকলকে আমি পরিপূর্ণ দেখিতেছি। পরন্তু আমার এক বিষয়ে এক মহান্ সন্দেহ আছে, তাহার নির্ণয়ার্থ আমার প্রার্থনা—আপনি আমাকে সে নির্ণেয় নির্দ্দেশ বা উপদেশ করিয়া গতোদ্বেগ করুন[১১৩।১১৪]। হে প্রভো! সর্ব্ব পাপের নাশক ও সর্ব্ব কল্যাণের বৃদ্ধিকারক দেবার্চ্চনার বিধান কিরূপ তাহা আমাকে বলুন[১১৬]।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ! যদপেক্ষা উত্তম নাই, এরূপ দেবার্চ্চনার কথা আমি তোমাকে বলি, শ্রবণ কর। সে অর্চ্চনা এক বার করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করা যায়[১১৭]। হে দ্বিজ!

দেব কি? তাহা কি তুমি জান? পুণ্ডরীকাক্ষও দেব নহেন, ত্রিলোচনও দেব নহেন, পদ্মযোনি ব্রহ্মাও দেব নহেন, দেবরাজ ইন্দ্রও দেব নহেন, বায়ু অনল চন্দ্র সূর্য্য ব্রাহ্মণ রাজা, ইঁহারা কেহই দেব নহেন। অধিক কি বলিব, তুমিও দেব নহ, আমিও দেব নহি। অহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেব দেবরূপীও নহেন ও চিত্তরূপীও নহেন[১১৮।১২০]। শোভা বা লক্ষী দেব নহে ও মতিও দেব নহে। দেব কে? দেব অকৃত্রিম ও অনাদি দেবন অর্থাৎ যাহা নিত্য নিরতিশয় সৎ চিৎ আনন্দ, তিনিই দেব অর্থাৎ প্রকৃত দেব পদের বাচ্য। ঐ লক্ষণ আকারাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সম্ভব হয় না। পণ্ডিতেরাও অকৃত্রিম ও অনাদি অনন্ত চিদ্রূপকে দেব বলিয়া তাঁহাকে শিব আখ্যা প্রদান করেন[১২১।১২২]। এই শিবই প্রকৃত বা প্রধান দেব ও ইঁহারই পূজা বিধেয়। এই দেব কেবল ও সত্তারূপী এবং ইঁহা হইতে এই সমস্ত অস্তিতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ আছে বলিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত[১২৩]। যাহারা এই দেবতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব না জানে তাহারা দেব বুদ্ধিতে আকারের অর্চ্চনা করে। যেমন যোজন গমনে অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি ক্রোশ গমনের উপদেশ, সেইরূপ নিরাকার শিবতত্ত্ব অবিদিত অধিকারীর প্রতি সাকার শিবতত্ত্বের উপদেশ[১২৪]। পরিচ্ছিন্ন রুদ্রাদি দেবতা হইতে পরিচ্ছিন্ন ফলই লব্ধ হয় পরন্তু আত্মদেবের অর্চ্চনে অনাদি অকৃত্রিম ফল লব্ধ হইয়া থাকে[১২৫]। অকৃত্রিম ফল পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম ফলে লোলুপ হওয়া আর পারিজাত উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া করঞ্জ বনে লোলুপ হওয়া সমান। বোধ, সাম্য (সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি) ও শান্তি, এই তিনকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প ও কেবল নির্ম্মল চিন্মাত্রকেই তুমি পূজ্য শিব বলিয়া জানিবে[১২৬।১২৭]। শান্তি ও বোধাদি পুষ্পের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয় তাহাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চন বলিয়া জানিবে। যাহারা আত্মসম্বেদনরূপ দেবার্চ্চনা না করিয়া কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজায় ব্যাসক্ত হয় তাহারা ক্লেশের হস্তে পরিত্রাণ পায় না[১২৮।১২৯]। যদিও দেখা যায়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষেরা কখন কখন চিদাত্মধ্যান হইতে বিরত হইয়া সাকার দেব দেবীর পূজাদি করেন, তথাপি, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের সে পূজা বালক ক্রীড়ার অনুরূপে অথবা অজ্ঞ লোকের ভক্ত্যুদ্রেক উদ্দেশে কৃত হয় অর্থাৎ তাহা তাঁহারা ভোগ প্রত্যাশায় করেন না। হে ব্রহ্মন্! ইহা তুমি নিশ্চয়

জানিবে যে, আত্মধ্যান ব্যতীত অন্যরূপ পূজন মুখ্য পূজন নহে। আত্মাই দেবতা, আত্মাই ভগবান্, আত্মাই শিব, তাঁহারই পূজা পূজা ও তদীয় পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞান। জ্ঞানরূপ পুষ্পের দ্বারা তিনি সর্ব্বদা পূজনীয়[১০০।১০১]। তুমি এই অনাদি অনন্ত পারাবার বর্জ্জিত মহামহিম চিদাকাশকে আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে[১০২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে প্রভো! এই জগৎ কিরূপে চিদাকাশ মাত্র, কি রূপেই বা সেই চিদাকাশের জীবত্বাদি, তাহা আমাকে বলুন[১০৩]?

ঈশ্বর বলিলেন, পারাবার বর্জ্জিত এক চিদাকাশই আছে, আর কিছু নাই। তাহার নিদর্শন—কল্পান্ত। কল্পান্তে কিছুই থাকে না, কেবল চিদাকাশই থাকে। কল্পারম্ভে সেই চিদাকাশস্থ মায়িক আবরণ পূর্ব্বসংস্কারানুসারে পুনঃ জগদাকারে প্রকাশ পাইতে আরব্ধ হয়। সেই জন্যই বলা যায়, এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট নগরের সহিত সমান এবং চিদ্ব্যতীত পদার্থান্তর নহে[১০৪।১০৫]। যাহা চিতের প্রকাশ্য তাহা চেত্য, সুতরাং তাহা চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল নিদ্রা দোষাবৃত স্বাত্মচৈতন্যের অনতিরিক্ত, অর্থাৎ তাহা যেমন বস্তুসৎ নহে, সেইরূপ, সৃষ্টিও চিদাকাশের অনতিরিক্ত ও বস্তুসৎ নহে[১০৭।১০৮]। গিরি, নদী, অম্বর, জগৎ, আত্মা, জীব, ভূত, সমস্তই চিৎ[১০৯]। ঊর্দ্ধ লোকে ও অধোলোকে কুত্রাপি চিদ্ব্যতীত কিছু নাই। যাঁহারা প্রমাণ কুশল, তাঁহারাও চিৎ ব্যতীত বস্ত্বন্তর থাকার প্রমাণ দিতে পারিবেন না[১১০]। আকাশ, পরমাকাশ, ব্রহ্মাকাশ, জগৎ ও চিৎ; এ সমস্তই তুল্যার্থ জানিবে[১১১]। নামভেদ ব্যতীত বস্তুভেদ নাই বা নহে, ইহাও বিদিত হইবে। ঐরূপ ভেদ স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও মায়া এই তিন স্থানেই দৃষ্ট হয়। যাহা সংবিৎ তাহাই স্বপ্নে জগদাকারে প্রকাশ পায়। এইরূপ মহাচিদাকাশই জাগ্রৎ জগতের আকারে প্রকাশ পাইতেছে[১১২।১১৩]। স্বপ্নে চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু থাকা অসম্ভব, সেইরূপ, জাগ্রতেও চিদাকাশ ব্যতীত বস্ত্বন্তর থাকা অসম্ভব। যে হেতু চেত্যের অস্তিতা অসম্ভব সেই হেতু এ সমুদায় চিৎ। এই যে জগত্রয়ের উৎপত্তি, ইহা স্বপ্নেরই অনুরূপ[১১৪।১১৫]। চিদাকাশই নিদ্রাদোষে ঘট পটাদির আকারে প্রকট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নদৃষ্ট গ্রাম নগরাদি সম্বিত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সেইরূপ জাগ্রদ্দৃষ্ট গ্রাম নগরাদিও চিদ্ ব্যতীত নহে।

অধিক কি বলিব, সমগ্র ত্রিভুবন চিদাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে [১৪৭।১৪৮]। যে কিছু দর্শন, যে কোন ভাব, যে কোন দেশ, কাল ও চিত্ত, সমস্তই চিদ্ব্যোম। যাহা প্রকৃত দেব, তাহা তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে তুমি ভাবিবে, সেই দেবই তুমি আমি ও জগৎ[১৪৯।১৫০]। এ সমুদায়ের বাহ্য রূপ যাহাই হউক পরন্তু, পারমার্থিক রূপ পরমাত্মা। যেমন সঙ্কল্পে ও স্বপ্নে চিদ্ব্যোম ব্যতীত অন্য কিছু নাই সেইরূপ এ সৃষ্টিতেও পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু নাই[১৫১।১৫২]।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিংশ সর্গ।

——(*)——

ঈশ্বর বলিলেন, এই সমুদায় বিশ্ব কেবল পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই ব্রহ্ম ও পরমাকাশ। আকাশের ন্যায় বিভু ও নিরাকার বলিয়া নাম আকাশ ও আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষণ পরম। এই পরমাত্মা ব্রহ্ম ও পরমাকাশ নামধেয় বস্তুই শ্রেষ্ঠ দেব এবং এই শ্রেষ্ঠ দেবের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। ইঁহারই পূজায় জীব সর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হয় [১।২]। ইহা হইতে অকৃত্রিম, অনাদি, অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অখণ্ড সুখ লাভ করা যায়[৩]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ! তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ, সেই জন্য তোমাকে এই মানসী শিবপূজার কথা বলিলাম। তুমি এই শ্রেষ্ঠ দেব পূজার উত্তমাধিকারী। এ পূজায় রাশি রাশি পুষ্প ও ধূপাদি আহরণ করিতে হয় না। যাহারা শ্রেষ্ঠ দেবে অব্যুৎপন্ন, স্বল্পপ্রত্যয়ী, তাহারাই কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজার অধিকারী, তাহাদেরই জন্য বাহ্য পূজার বিধান[৪।৫]। তাহাদের শান্তির ও জ্ঞানের অভাব আছে, তাই তাহারা পুষ্প পত্রাদি লইয়া পূজা করে। তাহারা আদর পূর্ব্বক আপন সঙ্কল্পানুযায়ী অর্চ্চনা করে, করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হয়[৬।৭]। তাহারা মোহ বশতঃ আত্মসঙ্কল্পক্রমে কতকগুলি কল্পিত ফলের জন্য কল্পিত প্রতিমাদির অর্চ্চনা করিয়া কতকগুলি মিথ্যা ফল অর্জ্জন করে[৮]। হে

ব্রহ্মন্! যে অর্চ্চনা পুষ্প ধূপাদির দ্বারা নিষ্পাদিত হয় সে অর্চ্চনা অব্যুৎপন্ন বুদ্ধির কার্য্য। তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিরা যে পূজার যোগ্য, সে পূজার কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর[৯]। হে শ্রেষ্ঠবুদ্ধিমন্! আমরা দেব, পরন্তু পরম দেব নাহি। দৃশ্যমূর্ত্তিরূপ দেব মাত্রই মায়িক, সে জন্য সে সকল দেব পরম নহে। ত্রিভুবনাধার পরমাত্মাই পরম দেব[১০]। শিব, সকল পদের উপরে ও সর্ব্ব সঙ্কল্পের অতীত এবং সমুদায় সঙ্কল্প তাঁহারই অধীন বা আশ্রিত। দিক্ ও কাল প্রভৃতি তাঁহার অবচ্ছেদ জন্মাইতে পারে না, যে কোন ক্রিয়া বা কার্য্য, সমস্তই তাঁহাতে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি কেবল চিৎ। হে মুনিবর! সেই দেবই প্রকৃত দেব[১১,১২]। যাহাকে শুদ্ধ সম্বিৎ বলা যায়, তাহা ক্রিয়াদির অতীত অথচ তাহা সর্ব্বত্র অবস্থিত। সেই সম্বিৎই অন্যকে অস্তিতাযুক্ত করে অর্থাৎ প্রতীতি ও অপ্রতীতি জন্মায়[১৩]। হে ব্রহ্মন্! বর্ণিত পরম দেব সৎ অসৎ এই দুই বিভাগের অন্তরালবর্ত্তী, এবং ইহার শাস্ত্রীয় নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তৎ, সৎ ও ওম্। ইহা সত্তাসামান্যরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। সেইজন্য ইহাকে মহাচিৎ ও পরমার্থ বলা যায়[১৪,১৫]। রস যেমন লতার অন্তরে অন্তরে সর্ব্বত্র স্থিতি করে সেইরূপ পরমাত্মাও সত্তারূপে সর্ব্বত্র স্থিতি করেন। যে চিৎ অরুন্ধতীতে, যে চিৎ তোমাতে, যে চৈতন্য পার্ব্বতীতে, যে চিৎ গণদেবতায়, যে চিৎ আমাতে, অধিক কি বলিব, যে মহাচিৎ ত্রিজগদ্ব্যাপী, সেই মহা চিৎ-ই প্রধান দেব[১৬,১৮]। হে ব্রহ্মন্! সম্বিৎ ই জগত্রয়ের সার, সম্বিৎ-ই সংসারের সার, সুতরাং সম্বিৎ-ই মুখ্য দেবতা। তিনি দূরে নহেন, দুষ্প্রাপ্যও নহেন। তিনি সদাই দেহের অন্তরালে আকাশের ন্যায় বিরাজিত। কার্য্যকরণ, খাদ্যভক্ষণ, দ্রব্যধারণ, গমনাগমন, শ্বাস প্রশ্বাস, জানা না জানা, সমস্তই তৎকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে[১৯,২১]। হে মুনিবর! তিনিই বিচিত্রচেষ্ট পুরে অর্থাৎ সেই সেই স্বরূপে রহিয়াছেন[২২,২৩]। তাঁহারই প্রসাদে এই শরীররূপ মহাগৃহ চলায়মান এবং তিনিই এতন্মধ্যস্থ হৃদ্গুহার ঈশ্বর। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাম না থাকিলেও উপদেশ ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি নাম কল্পনা করা হয়[২৪,২৫]। তিনি চিন্ময়, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী ও নিরঞ্জন। আরোপ বা অধ্যাস কালে তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায় পরন্তু অপবাদ কালে (কারণে কার্য্যের লয় অনুসন্ধান

করিতে গেলে) তিনি অকর্ত্তা[২৬]। তিনি বৎপরোনাস্তি নির্ম্মল ও জগৎ কার্য্যের শোভা জনক। যে কিছু মনোজ্ঞ, যে কিছু চমৎকার, সমস্তই সেই মহাচিতের আশ্রিত[২৭।২৮]। তদনুসারেই আকাশ, জীব, চিত্ত, কাল, কলা, দেশ, ক্রিয়া, দ্রব্য, ষড়বিধ ভাববিকার, তথা জাতি, গুণ, প্রকাশ, অপ্রকাশ, নদ, নদী, পর্ব্বত, তম, সূর্য্য, চন্দ্র, যক্ষ, রক্ষ:, ইত্যাদি ইত্যাদি নামভেদ উৎপন্ন হইয়াছে[২৯।৩১]। চিদাত্মা নিজ ভোগার্থ অথবা ক্রীড়ার্থ জগৎ সৃষ্টি করেন না। যেমন বসন্ত ঋতু স্ব স্বভাবে অঙ্কুরাদি জন্মায়, সেইরূপ, চিদাত্মাও স্ব স্বভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন[৩২]। চিৎ পদার্থই এই লোকত্রয়রূপ সমুদ্রের জল, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে। চিদ্রূপিণী ঈশ্বরী শরীররূপ পঙ্কজে মনোরূপ ভ্রমরের সহিত সঙ্কল্পরূপ মধুর স্বাদ গ্রহণ করেন[৩৩।৩৪]। যেমন জলের আবর্ত্তে জলই বহমান, তেমনি, চিতিস্থিত জগৎও চিতে বহমান[৩৫]। এই ভ্রমময় সংসারচক্র চিৎচক্রে ভ্রাম্যমান[৩৬]। চিৎ-ই চতুর্ভুজরূপে অসুর বিনাশ করিয়াছেন এবং চিৎ-ই (চিৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। চিৎ শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ সর্ব্বত্র) ত্রিনয়নরূপে গৌরীকমলিনীর ভ্রমর হইয়া রহিয়াছেন। আবার চিৎ-ই বিষ্ণুর নাভিপদ্মের ভ্রমর হইয়া চিদ্ধ্যান পরায়ণ হন, তথা বেদরূপ নলিনীর সরোবর হন[৩৭।৩৯]। হে ব্রহ্মন্! চিতের শরীর অসংখ্য। যেমন একই হেমে ক্রিয়াভেদে কেয়ূর কটকাদি নানা আকার প্রকটিত হয়, তেমনি, একাদ্বয় চিৎ পদার্থে নানা মায়িক রূপ প্রতিভাসিত হয়। চিৎ-ই ইন্দ্র, চিৎ-ই সূর্য্য, চিৎ-ই চন্দ্র, চিৎ-ই দিক্, এবং চিৎ-ই সর্ব্বাবভাসক দর্পণ[৪০।৪৪]। চিৎ-ই চতুর্দ্দশ ভুবনকে ও ভূত মণ্ডলকে অস্তি (আছে) বলিয়া প্রতীত করায়[৪৫]। উক্ত মহাচিৎ যেন একটী লতিকা। প্রকাশ শক্তি তাহার কুসুম, সঙ্কল্প তাহার পল্লব, ব্যোম তাহার কেদার অর্থাৎ আলবাল, সত্তা তাহার ফল[৪৬]। জীব তাহার মৃত্তিকা, বাসনা তাহার রস, সংবেদন অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞান তাহার ত্বক্, চিত্তবৃত্তিনিচয় তাহার কলিকা[৪৭]। অতীত অসংখ্য ত্রিজগৎ তাহার পর্য্যুষিত কেশর, ঋতু সকল তাহার পর্ব্ব, শৈলাদি তাহার গুল্ম (মূল বা কন্দ), শরীর সকল তাহার গ্রন্থি, প্রবৃত্তি তাহার প্রতান (লতাইয়া থাকা)[৪৮।৪৯]। এই চিল্লতা বিকসিতা হইয়া বিচারাসহ নানাবিধ দৃশ্যরূপ কুসুম প্রসব করিতেছে[৫০]। এই চিল্লতারই

ছায়ায় জন্ম মরণ মনন কথন ও নানা কার্য্য ক্রিয়মান হইতেছে[৫১]। এই মহাচিতের দ্বারাই ভাস্করাদি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, দেহ সকল স্পন্দিত হইতেছে, এই চিতে জড়ভ্রম ও জড়ে চিদ্‌ভ্রম জন্মিতেছে। এই চিৎ-ই নিজ সত্তার দ্বারা জগৎকে দৃশ্যত্বে স্থাপিত করিয়া তৎ-পার্থক্যে অবস্থান ও নর্ত্তন করিতেছে[৫২।৫৩]। চিৎ-ই এই ত্রৈলোক্য মন্দিরের একমাত্র মহাদীপ[৫৪]। চিৎ ই নির্ম্মল চন্দ্রবিম্বের শশ (চিহ্ন) এবং চিদ্রূপ রসের প্রসেকে পদার্থ সকল রূপী বলিয়া প্রকাশ পাই-তেছে[৫৫।৫৬]। যাহাতে এই চিতের স্ফুরণ নাই তাহাই জড়[৫৭]। যেমন আলোক দ্বারা গৃহ প্রাসাদাদি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির অস্তিতা সিদ্ধ হয় সেইরূপ লোকত্রয়ান্তর্গত গো অশ্ব ঘট পট প্রভৃতির আকৃতিও একা-দ্বয় চৈতন্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়[৫৮]। এই দেহরূপ গৃহের মধ্যে যে চিদাকাশের প্রকাশ রহিয়াছে সেই প্রকাশে ক্রিয়ারূপিণী কুলবধূ সঙ্কল্পশিশু ক্রোড়ে করিয়া স্ফুরিত হইতেছে[৫৯]। রসনায় রস থাকিলেও কে কবে তাহা চিদাকাশ ব্যতীত বিদিত হইতে পারিয়াছে[৬০]? চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত, কে কবে কোথায় এই দেহ বৃক্ষকে দৃষ্ট করিয়াছে? জন্ম ও বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই চিজ্জলের অধীন। সে জন্য সিদ্ধান্ত—চিৎ-ই আছে, তদ্ব্যতীত কিছু নাই[৬১।৬২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, দেব ত্রিনয়ন আমাকে অতি মধুর বাক্যে ঐরূপ ঐরূপ বলিলে আমি পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, হে দেব! যদি কেবল মাত্র একাদ্বয় ও সর্ব্বব্যাপিনী চিৎ ই থাকে, অন্য কিছু না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই এই দেহ চিন্ময়, এ কথা স্বীকার্য্য হইবে। তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য—এই দেহ নিদ্রা মূর্চ্ছা মরণাদি অবস্থায় নিশ্চৈতন্য কেন হয়[৬৩।৬৪]। এই দেহ প্রথমে চিদ্বিশিষ্ট থাকে না, পরে চিদ্বিশিষ্ট হয়, পুনর্ব্বার চিদ্বিহীন ও মৃদ্বিকারে দৃষ্ট হয়। ইহা হয় কেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি[৬৫]।

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ কর। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতেছি। তোমার প্রশ্ন যৎপরোনাস্তি মহত্তর[৬৬]। এই দেহে দ্বিবিধা চিৎ আছে। এক বিম্বরূপিণী, অপরা প্রতিবিম্বময়ী। * তন্মধ্যে

* কোন বস্তুতে যাহার প্রতিচ্ছায়া পড়ে তাহা বিম্ব, আর যে প্রতিচ্ছায়া, তাহা প্রতিবিম্ব। জলে চন্দ্রের প্রতিচ্ছায়া পড়ে, তাই চন্দ্রকে বিম্ব বলা যায় এবং সেই

যাহা বিম্বভূতা তাহা কূটস্থা ও নিত্যা নির্ব্বিকল্পা। আর যাহা প্রতিবিম্বরূপা তাহা চলায়মানা ও সবিকল্পা। দেহের অন্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব আছে সেই বুদ্ধিতত্ত্ব থাকাতেই তাহাতে অনাদি অনন্ত কূটস্থা ও নিত্যা চিতির প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিম্ব চিতের অপর নাম বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষই কর্ত্তা ও ভোক্তা ও জীব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। যেমন কোন সাধ্বী স্ত্রী স্বপ্নে উপপতি গ্রহণ করিয়া তৎকালের জন্য দুঃশীলা হয়, পূর্ব্ব ভাব পরিত্যাগে যেন তদ্ব্যতিরিক্তা হয়, অথবা যেমন কোন সাধু লোক ক্রোধাবেশ দ্বারা ক্ষণকালের জন্য রাক্ষসাদির ন্যায় ক্রূর হইয়া পড়ে, সেইরূপ, নির্দ্দোষ বিম্ব চিৎ সদোষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিম্ব হইতে পৃথক্‌বিধ হইয়া পড়ে[৬৭।৬৯]। হে ব্রহ্মন্! চিৎ উক্ত ক্রমেই স্বরূপ চ্যুত হইয়া ক্রমে জড়ভাবাপন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ আপনি আপনাকেই সেই সেই ভাবে কল্পনারূঢ় করে[৭০]। প্রথম কল্পনায় আকাশভাব ও আকাশতন্মাত্রানামক সূক্ষ্ম ভূত ভাব, পশ্চাৎ সূক্ষ্ম বায়ুভাব, এবং ক্রমে দেশ কালাদি বিভাগ ও জীবভাব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি জন্মে। মন হইলেই সংসারভাব উপস্থিত হয়। যেমন কোন দ্বিজ আপন কল্পনায় "আমি চণ্ডাল" এই ভাবে ভাবিত হইয়া নিজ দ্বিজত্ব হইতে চ্যুত হয়, সেইরূপ, সেই সংসারাতীত চিৎ পদার্থও মনঃকল্পনায় প্রতিবিম্বিত বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপচ্যুত হয়। জল যেমন নিবিড়তার দ্বারা পাষাণতুল্য হয়, সেইরূপ, চিৎও জাড্যতাদাত্ম্যে অনন্তসঙ্কল্পময়ী পীবরতায় অবভাসিত হয়[৭১।৭৫]। সেই জাড্যেরই চিত্ত, মন, মোহ, মায়া, এই সকল নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে মুনিবর! ঐ প্রকার জাড্য জন্মের দ্বারাই সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে[৭৬]।

প্রতিচ্ছায়াকে প্রতিবিম্ব বলা যায়। গৃহভিত্তিতে সামান্যতঃ সূর্য্যালোক ব্যাপ্ত থাকে, তদুপরি আবার যদি কাচের সাহায্যে প্রতিচ্ছায়াময় আলোক পাতিত করা যায় তাহা হইলে সেই দ্বিগুণিত আলোকের একটীকে বিম্বালোক ও অপরটীকে প্রতিবিম্বালোক বলা হয়। ইহাকে ইংরাজিতে Solar light ও Reflected Solar light বলে। এতদ্দৃষ্টান্তে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির যোগে দ্বিগুণকল্প হইতেছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য বিম্ব, আর বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিফলিত চৈতন্য প্রতিবিম্ব।

সংসার কি? না মোহ বশে স্বাত্মতিরস্কার, তৃষ্ণারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, কাম ক্রোধ ভয় প্রভৃতিতে অভিভূত, উৎপত্তি বিনাশের অনুগামী হওয়া, বিকারী ও বিচ্ছিন্ন হওয়া, দুঃখদাবানলে দগ্ধ হওয়া, শোকে ক্লিষ্ট হওয়া, আমি অমুক ও এইরূপ হইয়াছি ভাবিয়া বিকল হওয়া, দেহের উপরেই আস্থা স্থাপন ও তদনুযায়ী দীনতাদি অনুভব করা, জীর্ণ শীর্ণ বন্যহস্তীর ন্যায় মোহ পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া, বায়ুর আঘাতে লতার ন্যায় ভাবাভাব চিন্তায় চঞ্চল হওয়া, এই সকল হওয়াই সংসার পদের বাচ্য ৭৭।৮০। এবংক্রমে প্রাপ্তসংসার জীব অসার ও অপার সংসার বিকারে অভিভূত, তদনুযায়ী ব্যবহারে রত, তাপত্রয়ে তপ্ত, রাগে ও তেজে রঞ্জিত, ও ভ্রষ্টযূথ মৃগের ন্যায় দিশাহারা হইয়া নানা কষ্ট অনুভব করে। আবির্ভাবে হৃষ্ট হয় ও তিরোভাবে কষ্ট পায়৮১।৮২। বালকেরা যেমন স্বকল্পিত ভূতের ভয়ে ভীত হয়, সেইরূপ, ইহারাও স্বসঙ্কল্পিত সংসারের দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হয় এবং উষ্ট্র যেমন দুঃখবহুল কণ্টকের অত্যল্প মধুর রস আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ, ইহারাও দোষবহুল বিষয় হইতে সুখকণা আহরণের চেষ্টা করে, করিয়া ক্রমে অধঃপতিত হয় ৮৩।৮৩। যার পর নাই বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তরে, দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ও বিপদ হইতে বিপদান্তরে গমন করে। তথা অসঙ্খ্য অনর্থে জড়িত হয়, আশা ও চেষ্টা পাশে বদ্ধ হয়, হইয়া কষ্টাধিক কষ্টের অনুপাতী হয়৮৫।৮৬। মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়া বাল্য হইতে ব্যবহার কৌশলে দক্ষতা লাভ করে, করিয়া যাহা আত্মবন্ধনের উপকরণ গৃহ ক্ষেত্র ধনাদি, তদ্বিষয়েই পরাক্রান্ত হয়, মোক্ষোপযোগী বিবেক পথ পরিত্যাগ করে৮৭। সর্ব্বদা ভয়, সর্ব্বদা শঙ্কা, সর্ব্বদা প্রাণ বিনাশের আতঙ্ক করে, এবং জলহীন মীনের ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে। বাল্যে পরবশ, যৌবনে চিন্তা, বার্দ্ধক্যে দুঃখ ও মরণে কর্ম্মের বশতাপন্ন হইতে থাকে। কর্ম্মানুসারে স্বর্গে দেবতা, পাতালে নাগ, দৈত্যদেশে অসুর, ধরাতলে নর, রক্ষঃপুরে রাক্ষস, বনকোটরে বানর, গিরিগহ্বরে সিংহ, কুলপর্ব্বতে কিন্নর, দেবগিরিতে বিদ্যাধর, বনগর্ত্তে সর্প, তরুশাখায় পক্ষী, গিরিশৃঙ্গে লতা, ও অরণ্যে মৃগ হয়। ক্ষীরোদে নারায়ণ, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, কৈলাসে হর ও স্বর্গে ইন্দ্র হয়। সূর্য্য হইয়া দিন ও মেঘ হইয়া বর্ষণ করে এবং বায়ু হইয়া বহমান হয়। সেই সম্বিৎ-ই

আপনাতে সমুদ্র, ঋতু, বৎসরাদি কাল, দিন, রাত্রি, তেজ ও তিমির প্রভৃতি দৃষ্ট করিতেছে। সেই সম্বিৎ ই বীজ, বীজস্থ রস, বাক্ বিবর্জ্জিত প্রস্তর, জলবাহিনী নদী, শোভাময় কুমুদ, সুপক্ব ফল, কাষ্ঠ ও তন্মধ্যগত বহ্নি, শৈত্য, হিম ও আকাশ। কোথাও অত্যুজ্জ্বল আকার, কোথাও কষ্টপ্রদ শিলা, কোথাও নীলাদি বর্ণ, কোথাও বহ্নি ও কোথাও মৃত্তিকারূপে প্রকাশ পাইতেছে[৮৮।৯৮]। যে হেতু সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগত ও সর্ব্বশক্তি, সেই হেতু সেই চিৎ-ই সর্ব্ব অথচ আকাশ অপেক্ষা স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্লিপ্তস্বভাব[৯৯]। সেই চিং আপনাকে যে স্থানে যখন যে ভাবে ভাবিত করে সে স্থানে তখন তিনি সেই ভাবেই দৃষ্ট হন[১০০]। হে ব্রহ্মন্! তৃণ যেমন জলাবর্ত্তে ভ্রাম্যমান হয়, সেইরূপ, জীবশক্তিও সংসাররূপ জলাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া হংসী, ক্রৌঞ্চী, বকী, কাকী, সারসী, তুরগী, বৃকী, পারাবতী, বানরী, কিন্নরী, শুনী, বটিকা বা বর্ত্তিকা, পিঙ্গলী, শারিকা, মক্ষিকা, ভ্রমরী, শুকী, ধী, শ্রী, হ্রী, প্রীতি, রতি, শম্বরী, শর্ব্বরী ও শশী প্রভৃতি যোনি জাতিতে বিবর্ত্তমান হয়[১০১।১০৩]। গর্দ্দভী যেমন আপনি আপনার শব্দে ভীতা হয় সেইরূপ ইহারাও স্ব সঙ্কল্পের দ্বারা ভয় প্রাপ্ত হয়। এই জীবশক্তির সদৃশী মুগ্ধা ও দুর্ব্বলা আর নাই[১০৪]। হে মুনিবর! আমি তোমাকে যে জীবশক্তির কথা বলিলাম, এই জীবশক্তি নিতান্ত হেয়। এই জীবশক্তির অপর নাম কর্ম্মাত্মা। এ অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার অন্ত নাই ও ইহা দুঃখ বহুল। এ অবস্থা কেবলমাত্র স্বাত্মবিভ্রমজনিত। ইহা স্বরূপতঃ সৎ না হইলেও ও অত্যন্ত নশ্বর হইলেও এতদ্দ্বারা বৃথা আক্রান্ত হইয়াছে ও হইতেছে[১০৫।১০৭]। আপন অনন্ত বিভব ভ্রষ্ট হওয়ায় ঐরূপ ঐরূপ বৃথা দুর্ভাগ্য বহন করিতেছে ও শোকে অধীর হইতেছে।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাম! তুমি অবিদ্যার শক্তি বা সামর্থ্য কিরূপ তাহা দর্শনগোচর কর, যাহার সামর্থ্যে ব্রহ্মস্বভাবা চিৎ ঘটীযন্ত্র প্রবিষ্ট ঘটাকাশের ন্যায় নিরন্তর উর্দ্ধাধঃ গতির বশ্য হইতেছে[১০৮।১০৯]।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একত্রিংশ সর্গ।

—— (*) ——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ঈশ্বর পুনরপি বলিলেন, যেমন স্বপ্ন, উন্মত্ততা, মোহ ও সম্ভ্রম (ভ্রান্তি) কালে আমি দুঃখী আমি বিপন্ন এইরূপ মিথ্যা অবভাস অনুভব করে, সেইরূপ, নির্দ্দুঃখস্বভাবা চিৎ পদার্থও মিথ্যা বা আবোপিত ভাবময় ভাবনার দ্বারা আমি দুঃখী আমি সুখী আমি বিপন্না এইরূপ এইরূপ অবভাসে আবির্ভূত হইতেছে[১]। অনষ্টা কুলবধূ যেমন মিথ্যা নষ্টতার আরোপে হায় আমি নষ্টা হইলাম ভাবিয়া রোদন করে সেইরূপ অমৃতা চিৎও মতিবিপর্য্যয়ের প্রভাবে আপনাতে হায় আমি মরিলাম এতদ্রূপ মিথ্যা মরণের আরোপ উত্থাপন করিতেছে[২]। ভ্রান্ত যেমন ভ্রাম্যমান কুলাল চক্রকে স্থির দেখে, সেইরূপ, চিৎও ভ্রমের আবেশে অস্থির জগৎকে স্থির দেখিতেছে[৩]। চিত্তের ঐরূপ সংশয়ানুভবের কারণ চিত্ত। ফলতঃ ঐ কারণটীও মিথ্যা। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে চিত্তও নাই[৪]। যে হেতু চিত্ত নাই, সেই হেতু চেত্যও নাই। চন্দ্রে কলঙ্ক যেরূপ, চিদ্ব্রহ্মে দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, মাতা, মেয়, মান, এ সকলও সেইরূপ। আমি, তুমি, তিনি, এ সকল ভাবও আকাশে পর্ব্বত কল্পনের অনুরূপ। নানা, অনানা, শব্দ, শব্দার্থ, এ সকল ভেদও বাস্তব নহে। যেমন সূর্য্যমণ্ডলে রাত্রি নাই সেইরূপ চিদ্ব্রহ্মে এ সকল কিছুই নাই। বস্তুত্ব অবস্তুত্ব এ দুই বিভাগও তুষারে উষ্ণতা না থাকার ন্যায় জানিবে[৫।১০]। শূন্যতা অশূন্যতা প্রভৃতিকেও ঐরূপ জানিবে। চিতে অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যে সমষ্টিচিত্তরূপ দোষে চতুর্ব্বিধ শরীর জন্মিয়াছে এবং তৎকারণে সংসার দুঃখ অনিবার্য্য, এরূপ মনে করিও না। কেননা উহা সত্য বলিয়া পরিভাবিত হইলেই অনর্থ জন্মায়, নচেৎ নহে। যাহারা ইহার তত্ত্ব বা রহস্য জানে, তাহাদের সম্বন্ধে এ সকল দুঃখদ নহে। তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে তৃণ ও ত্রৈলোক্য সমান অর্থাৎ তুচ্ছ। যাহা বলিলাম, ইহা নিশ্চয়ই আয়ত্তাধীন। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যের

মিথ্যাত্ব সত্যভাবনাপরিত্যাগসাধ্য। যাহা অসাধ্য তাহা তুমি কোথায় পাইবে? সেই নির্ব্বিশেষ চিৎ, যাহা সর্ব্বগামিনী, তাহা যৎপরোনাস্তি নির্ম্মলা এবং তেজঃপদার্থেরও তেজ[১১,১৬]। সেই চিৎ-ই সর্ব্বাবভাসিনী, নির্ম্মলা, নিত্যোদিতা, নির্ম্মনস্কা, নির্ব্বিকারা ও নিরঞ্জনা[১৭]। ঘটে, পটে, বটে, শকটে, বানরে, ঘরে, অসুরে, সাগরে, ভূতে, নরে ও নাগে স্থিতি করিতেছে[১৮]। তাহা সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন, কোথাও যায়ও না, কোথা হইতে আসেও না এবং কোন ক্রিয়াও তাহার নাই[১৯]। চিৎ উক্ত প্রভাবান্বিতা, অমলিনস্বভাবা ও নির্ব্বিকল্পরূপা হইলেও দেহাদি ভাবে ভাবিতা হইয়া এই বিচিত্র কল্পনায় নিরূঢ়া হইতেছে[২০]। বস্তুতঃ উক্ত চিৎ পদার্থ নির্ব্বিকল্প ও যার পর নাই পরম সূক্ষ্ম ও প্রত্যেক দেহে আনখাগ্র পরিব্যাপ্ত[২১]। সেইজন্য জাগ্রৎ পুরুষের চেতনা বাহিরে রূপ দর্শনাদি ও অন্তরে মনোবৃত্তি প্রভৃতি অনুভব করে পরন্তু সুষুপ্তিতে স্বজ্ঞানমাত্রের সাক্ষী হইয়া স্থিতি করিতে থাকে[২২]। সাধু যেমন অসাধুর সংসর্গে অসাধু হয়, তেমনি, উক্ত ব্রহ্ম চিৎও দেহাদি তাদাত্ম্যে চিন্তাদি কালুষ্য প্রাপ্ত হয়। মালিন্যের দ্বারা স্বর্ণও তাম্রাকার হয়' পরন্তু মল উন্মার্জ্জিত হইলে তখন আর তাম্রাকার থাকে না। এইরূপ মনের সংসর্গে জীবাকার হইলেও মনের উন্মার্জ্জনে পুনর্ব্বার সমলা চিৎ নির্ম্মলা হইয়া থাকে[২৩,২৪]। নির্ম্মল আদর্শ স্বনিশ্বাসে মলিন হইলে সে মালিন্য মাজ্জন দ্বারা অপগত হয়, তখন তাহাতে যথাবৎ স্বাত্মপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অজ্ঞান যোগে মলিন চিদ্দর্পণও অজ্ঞান মার্জ্জনের পর কেবল হইয়া থাকে[২৫]। চিৎই অসৎ অজ্ঞানের ভাবনায় সংসারী এবং স্ব স্বভাব জ্ঞানে অসংসারী। অনাশস্বভাবা চিৎ অহন্তার প্রাপ্তির দ্বারাই নাশবতীর ন্যায় হয়। অত্যল্প স্পন্দন দ্বারা উর্দ্ধস্থানস্থ বৃক্ষের ফল নিম্নগামীই হয়, তাহার ন্যায় চিৎও অজ্ঞান সংসর্গে অধঃপতিতই হইয়া থাকে[২৬,২৮]। রূপ রসাদির যে সত্তা বা অস্তিতা সে সত্তা চিতেরই এবং এটী দ্বিতীয়, ওটী তৃতীয়, এ সকল ভেদও অধ্যাসমূলক সুতরাং চিতের অনতিরিক্ত। যেমন আলোক থাকিলেই লোক সকল ক্রিয়া করণে ব্যাপৃত থাকে, সেইরূপ, চিত্ত থাকিলেই ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ক জ্ঞান প্রবর্ত্তিত থাকে[২৯,৩০]। চিৎসান্নিধ্যবশতঃ শরীরস্থ ব্যান বায়ুর দ্বারা যে

নেত্রকনীনিকার স্পন্দন হয় এবং তাহাতে যে দীপ্তিবিশেষ স্থিত থাকে, সেই দীপ্তিবিশেষ দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে পরিচিত। তদ্দ্বারা নীল পীতাদি রূপের বোধও হইয়া থাকে সে বোধও সেই পরা চিৎ[৩১]। ত্বক্ ও শরীর বায়ু উভয়েই জড়, অর্থাৎ স্বাধীনসত্তাবিরহিত। চিতের সত্তাতেই তদ্দ্বয় সত্তাশালী হয়, হইয়া স্পর্শেন্দ্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহাও পরা চিৎ। এইরূপে গন্ধ বোধও পরা চিৎ, শব্দ বোধও পরা চিৎ এবং মনন বা কর্মেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক সঙ্কল্পও পরা চিৎ। কেননা, পরা চিৎব্যতীত মন ক্রিয়োন্মুখ হইতে পারে না[৩২,৩৪]। চিৎ পদার্থ স্বপ্রকাশ, স্বতঃ কালুষ্যরহিত, নিত্য, আপনা আপনি বা স্বয়ং ব্যবস্থিত [৩৩]। ইনি অদ্বিতীয় হইলেও এবং অবিকারী হইলেও ঐ সকল সন্নিবেশ স্ফটিকের প্রতিবিম্ব সন্নিবেশ ধারণের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। ইহার উদয়, অস্ত, স্পন্দন, হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না[৩৭]। ইনি স্বরূপে নিঃসঙ্কল্প স্বভাব, অথচ সঙ্কল্পের বশে জীবভাব প্রাপ্ত হন[৩৮]। এই পরা চিতের রথ জীব, জীবের রথ, অহঙ্কার, অহঙ্কারের রথ বুদ্ধি, বুদ্ধির রথ মন, মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের রথ দেহ, দেহের রথ স্পন্দন। স্পন্দন অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য। এই কর্মেন্দ্রিয়গণই সংসার ও জরা মরণের পিঞ্জর[৩৯,৪১]। এ সকল স্বরূপতঃ অস্তিত্বশূন্য হইলেও স্বাপ্ন প্রতিভাসের ন্যায় প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে ও মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় এ সকল নিতান্ত অসত্য[৪২]। "মনের রথ প্রাণ" এ সকল কেন বলিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। যে আধারে প্রাণ, সেই আধারেই মনন, অবশ্যই ইহা অনুভবগম্য। যে স্থানে আলোক সেই স্থানেই রূপের প্রকাশ, অন্যত্র নহে। ইহার দৃষ্টান্ত, জীবন দশাতেই দেহের ব্যবহার, মরণ দশায় নহে[৪৩,৪৪]। মন হৃদয়াকাশে লয় প্রাপ্ত হইলে তখন আর প্রাণস্পন্দন থাকে না[৪৫]। যেমন তেজের উপশমে রূপ প্রকাশ থাকে না, তেমনি, প্রাণের উপশমে অন্তরে মনঃসত্তাও থাকে না। বায়ুর বহমানতা লুপ্ত হইলে কি ধূলির উড্ডয়ন থাকে? তাহা থাকে না। প্রাণ বায়ু যে স্থানে পাঠায় মন সেই স্থানেই যায়। রথ যে স্থানে যায় সারথিও সেই স্থানে যায়। চিত্ত প্রাণেরই প্রেরণায় ক্ষণমধ্যে দেশ দেশান্তরে যায়[৪৬,৪৮]। যে স্থানে পুষ্প সেই স্থানে গন্ধ, যে স্থানে বহ্নি সেই স্থানে উষ্ণতা, যে স্থানে চন্দ্র সেই স্থানেই কিরণ অথবা মনঃ। অতএব,

পৃথক্ পৃথক্ বা প্রত্যেক সম্বিত্তিতে প্রাণ বায়ুর সহায়ভাব আছে। বায়ুই ভুক্ত দ্রব্যের রস সর্ব্বাঙ্গে প্রেরণার্থ সর্ব্বনাড়ী স্পর্শ করিয়া আছে। লিঙ্গশরীরের অভ্যন্তরে চিত্তের প্রতিবিম্ব পাত হওয়ায় বিম্বচৈতন্য প্রতিবিম্বের দ্বারা দ্বিগুণীভূত হইয়া সম্বিত্তিরূপে প্রকটিত হইতেছে। অতএব, কি জড় কি অজড়, কুত্রাপি চিদাকাশের অভাব নাই[৪৯।৫১]। তবে কি না চিৎ পদার্থ জড়ে স্বসত্তা মাত্রে স্থিত, তাহা দ্বিগুণিত নহে[৫২]। জড়েও বেদনা বা সম্বিত্তি আছে, পরন্তু অনভিব্যক্ত। প্রাণ বিলোপ বশতঃ মন ও মনোবৃত্তি সকল লুপ্ত থাকে, সেই জন্য জড়ে স্পন্দন দৃষ্ট হয় না। হে মুনিবর! চিৎ পদার্থ পুর্য্যষ্টকেই প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন স্বচ্ছ আদর্শে প্রতিবিম্ব পাত হয়, উপলে নহে, সেইরূপ। হে মুনিনায়ক! তুমি মনকেই পুর্য্যষ্টক বলিয়া জানিবে (পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ লিঙ্গশরীর)। এই মনকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কল্পনায় আরূঢ় করায়[৫৩।৫৫]।

হে মহাত্মন্! যাহা হইতে জীব, জীবের উপাধি, জীবের ভোগ্য, এতত্ত্রিতয়াত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, স্থিত আছে এবং লয় হইবে, এবং যাঁহার প্রভাবে মন দেহ সৃষ্টির জন্য বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই চিৎকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া স্থির কর[৫৬]।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

——(*)——

ঈশ্বর বলিলেন, মুনিবর! পূর্ব্বোক্ত পরমাচিৎ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূল চৈতন্য) যে প্রকারে শরীরপ্রবিষ্ট হয়, এবং ঐহিক পারলৌকিক কর্ম্ম করে, তথা যে প্রকারে শরীরচেষ্টা নির্ব্বাহ করে, সে সমস্তই তোমাকে বলি, শ্রবণ কর[১]। যাহা চিৎপ্রতিবিম্ব, তাহাই জীব, তাহার যে প্রচলন, তাহা দেহপ্রচলনের কারণ। কাম-কর্ম্ম-বাসনানুযায়ী যে কায়িক বাচিক ও মানসিক চেষ্টা বিশেষ জন্মে, সেই চেষ্টা বিশেষের নাম কর্ম্ম, তাহার

বিভাগ দ্বিবিধ। বিহিত ও নিষিদ্ধ। এ কথার তত্ত্ব বা বিবরণ এইরূপ —শাস্ত্র যাহাকে অনাদি মায়াশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি বলেন, সেই মায়াশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি স্বকীয় আবরণ শক্তির দ্বারা আপনার আশ্রয় ব্রহ্মকে আবরণ করে অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই বা প্রতিভাত হইতেছে না, এইরূপ প্রতীতির বিষয় করিয়া তুলে। দীর্ঘকালে সে প্রতীতি বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং তাহা ক্রমিক বিবিধ কাম কর্ম্মাদির সংস্কারে স্থিত হইতে থাকে। ক্রমে তাহা মনোরূপে পরিণত হয়। তদ্বিধ মনঃপরিণামের পর, তদীয় আধার ব্রহ্মচিৎ তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্তের ন্যায় হয়, তথা মনঃও ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা চিত্তাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহারই নাম চিজ্জড়ের মিশ্রণ এবং এইরূপ মিশ্রণ হইতেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনাদি লৌকিক বৈদিক ব্যবহার নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। অতএব, পূর্ব্বোক্ত মায়াশক্তিরূপ মূলই এই বিস্তৃত সংসার বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া প্রকাশমান রহিয়াছে[২।৩]। হে মুনিবর! বিচার দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মিথ্যা এবং অবিদ্যা দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, জগৎ অমিথ্যা। ব্রহ্মের সন্নিধান থাকিলেও চিত্ত ব্যতিরেকে দেহাদির প্রচলন জন্মে না। সুতরাং চিত্ত থাকাতেই দেহাদির স্ফূর্ত্তি সংঘটন হয়[৪।৫]। পরমাত্মা সর্ব্বগামী বা সর্ব্বত্রাবস্থিত, সেজন্য তিনি জীবত্বের সাধারণ কারণ সত্য, পরন্তু জীবত্বের অসাধারণ কারণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি[৬]। এই জীব আত্মনাম্নী চিচ্ছক্তির দ্বারাই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্ব-পর-প্রকাশে সমর্থ হয়। মুকুর যেমন দ্রব্যাতিরিক্ত গুণাদির প্রতিবিম্বও গ্রহণ করে, তেমনি, লিঙ্গশরীরও স্বাতিরিক্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে[৭]। সেই ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবপদাভিধেয় হইলেও তাহা জাড্য অর্থাৎ নিদ্রা আলস্যাদি দোষ বশতঃই মোহ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে[৮]। চিৎ-ই উক্ত ক্রমে স্ব স্বভাবের তিরস্কারে (প্রচ্ছন্নতায়) চিত্তত্ব প্রাপ্ত হয় ও মোহ বশতঃই (মোহ=ঠিক্ না বুঝা) দৈন্যাদি অনুভব করে। এই দেহ জড়স্বভাব হইলেও স্পন্দশক্তি প্রাণের অধ্যাসে চলনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করে[৯।১০]। অতিতুচ্ছ কর্ম্মাত্মা জীব এই প্রস্তরতুল্য অচল দেহকে বায়ুর ন্যায় সচল করিয়া রাখিয়াছে[১১]। হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মাই এই দেহশকটকে মনের ও প্রাণের দ্বারা বহন করিতেছে[১২]। উক্তপ্রকারে চিৎ ও জড় উভয়ের আধ্যাসিক সম্মীলনে জীবত্ব প্রাপ্ত

হইয়া মনোরূপ রথের রথী হইয়াছে ও প্রাণরূপ তুরঙ্গম তাহা বহন করিতেছে[১৩]। নিজপদচ্যুত চিৎব্রহ্ম প্রোক্ত প্রকারে কখন জন্মবান্ পদার্থ, কখন বিনষ্ট পদার্থ, কচিৎ এক পদার্থ ও কোথাও বা বহু পদার্থ রূপে প্রথমান হইতেছে, তথা ভিন্ন অভিন্ন ও অস্তি নাস্তি ভাবে প্রকাশ পাইতেছে[১৪।১৫]। আলোক যেমন রূপপ্রথার উপজীব্য, তেমনি পরমাত্মাও বৃত্ত ও বর্ত্তিষ্যমান পদার্থের (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান পদার্থের) উপজীব্য[১৬]। পরমাত্মা চিত্তত্বে স্থিত থাকিলেও নিরাময়। তরঙ্গ, বারি, ফেন, এ সকল জলেরই বিকার। সেইরূপ, আধি ব্যাধি ও দৈন্য প্রভৃতি চিত্তেরই বিকার, চিৎপদার্থের নহে[১৭।১৮]। জল যেমন তরঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই চিত্তোপাধিক জীব হইয়া আধিব্যাধিসমাকীর্ণের ন্যায় হন[১৯]। চিৎ পদার্থে সকল শক্তিই আছে। সুতরাং আমি কেবলা চিৎ নহি, এই ভাবে ভাবিতা হওয়াতেই চিৎ বহু ভাবের বশতাপন্ন হইতেছে। মূঢ়তা বশতঃ স্বকীয় সংবিন্ময়তা (চিন্ময়তা) বুঝিতে পারিতেছে না[২০।২১]। যে মুহূর্ত্তে জীব আপনার সংবিন্ময়তা জানিতে পারিবে সেই মুহূর্ত্তেই সে মোহসমুত্তীর্ণ হইবে[২২]। যে মুহূর্ত্তে প্রাণবায়ুর স্পন্দশক্তি প্রমোষ (লোপ) প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই জীব হস্ত পদাদি অঙ্গের অনুসন্ধানরহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু সংজ্ঞা জন্মে। হৃদ্‌পদ্মের স্পন্দন রহিত হইলেই অসংবিৎ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন আর কোনও অঙ্গের জ্ঞান থাকে না। যেমন তালবৃন্তের অসঞ্চলনে বহিঃ পবন উপশান্ত হয় তেমনি হৃদ্‌পদ্মের অসঞ্চলনে শ্বাস প্রশ্বাসাদি উপশম প্রাপ্ত হয়[২৩।২৪]। প্রাণের উপশমে জীব জীবনশূন্য হইয়াছে এতদ্রূপ ব্যবহার জন্মে, পরন্তু তখনও মন থাকে[২৫]। অভিহিত ক্রমের কারণপরম্পরার বৈকল্যে কার্য্য পরম্পরা অধ্যস্ত হওয়ায় দেহ নিশ্চল ও ভূপতিত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়[২৭।২৮]। পূর্ব্বানুভব জনিত বাসনাসম্বলিত মন থাকায় পুনর্ব্বার পুর্য্যষ্টকযুক্ত দেহ জন্মে। পুর্য্যষ্টক = কাম, কর্ম্ম, বাসনা, প্রাণ, মন, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চেতনা, এই ৮টের সম্মীলন। হে মুনিবর! দেহে পুর্য্যষ্টকথাকা পর্য্যন্তই জীবন ও পুর্য্যষ্টকের অভাবে মরণ, এইরূপ ব্যবহার প্রথিত আছে[২৯।৩১] বিরুদ্ধ বাত পিত্তাদি মলের ও রাগদ্বেষাদি বাসনা মলের প্রকোপ বশতঃ অথবা অস্ত্রাদি কৃত ছেদ ভেদ বশতঃ অভ্যন্তরস্থ হৃদ্‌পদ্মযন্ত্রে

স্পন্দন স্থগিত হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে পুর্য্যষ্টকও উপশান্ত হয়। জীব তখন কেবল মাত্র বাসনাত্মক সঙ্কল্পে অবস্থান করতঃ মরণ দুঃখ অনুভব করিতে থাকে। যাহাদের ভোগ বাসনা থাকে না, যাহারা রাগদ্বেষাদির অতীত, তাহারা মৃত্যুর বশ্য হয় না অর্থাৎ মরণ দুঃখ অনুভবকরে না। তাহারা স্থিরস্বভাব ও জীবন্মুক্ত ও দীর্ঘজীবী[৩২,৩৪]। পদ্মযন্ত্র রুদ্ধ ও প্রাণ উপশান্ত হইলেই দেহ তখন কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় ভূপতিত হয়[৩৬]। হে মুনিবর! যেমন হৃদয়াকাশস্থ বায়ুতে পুর্য্যষ্টক লীন হয় তেমনি তদাকাশে মনও লয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ তৎশরীরের কাম কর্ম্ম বাসনাদি লোপ প্রাপ্ত হইয়া ভাবী শরীরের ও ভাবী ভোগের অনুরূপ সঙ্কল্পাদি উদিত হইতে থাকে। শরীর তখন শব হয়, মন ও প্রাণ তখন তদ্দেহকে ত্যাগ করে, গৃহস্বামিশূন্য গৃহের ন্যায় নিপতিত থাকে[৩৭,৩৯]। তৎপরে পুনর্ব্বার তাহার পুনঃ শরীর জন্মিবার উপক্রম হইতে থাকে। চিৎ পদার্থ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তাহা কোথাও যায়ও না, কোথা হইতে আসেও না। মন যে স্থানে জীবভাবাপন্ন সেই স্থানেই তাহার তদনুরূপা স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। তাদৃশী স্ফুর্ত্তি শাস্ত্রীয় ভাষায় জীবে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ এইরূপে অভিহিত হয়। প্রাণ নির্গম কালে তৎসঙ্গে পুনঃ শরীরোৎপত্তির বীজস্বরূপ সূক্ষ্মভূত তন্মাত্রাপঞ্চক স্থিত থাকে এবং সেই সকলের দ্বারা প্রথমতঃ ভাবনাময় বা সঙ্কল্পময় দেহ তাহার অনুভবগোচরে স্থিতি করিতে থাকে। সেই ভাবনাময় দেহের অপর নাম আতিবাহিক দেহ। সেই আতিবাহিক দেহও কিছু কাল পরে বিস্মৃতির অধিকারে গমন করে, অহং-শক্তি প্রবলা হয়, মনঃও তখন পুনর্ব্বার পুর্য্যষ্টক রথে আরোহণ করে, করিয়া পুনঃ স্থূল শরীর জন্মিয়াছে বলিয়া মিথ্যা অনুভব করিতে থাকে। যেমন বেতালের আবেশে শবীভূত শরীর পুনরুত্থিত হয়, সেইরূপ, মনঃ প্রভৃতি পুর্য্যষ্টকের আবেশে পুনর্ব্বার স্পন্দনশীল স্থূল দেহ প্রথা প্রাপ্ত হইতে থাকে। আবার পুর্য্যষ্টকের ক্ষয়, চিত্তের বিলয়, দেহের স্পন্দবিনাশ ও আবার মরণ হয়[৪০,৪৬]। হে মুনে! এইরূপে জীব আপনার অজর অমর ব্রহ্মরূপ ভুলিয়া যায়, এবং শরীরের বশ্য হইয়া তদনুযায়ী ক্লেশাদি প্রাপ্ত হয়[৪৭]। মুনিবর! স্মৃতি প্রভৃতি জীবশক্তির অন্তর্ধান, পদ্মযন্ত্রের ও প্রাণধর্ম্মের নিরোধ, এই সকলের অধীন হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ মৃত হয় ও প্রাক্তন

নিয়মে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। যেমন পুরাতন বৃক্ষপত্র গলিত হয় ও পুনর্ব্বার অভিনব পত্র জন্মে সেইরূপ পুরাতন দেহ বিগলিত ও অভিনব দেহের জন্ম হইয়া থাকে[৪৮,৪৯]। যখন জীর্ণ পর্ণ ন্যায়ে দেহের অপায় ও উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী তখন তজ্জন্য পরিদেবনা কেন[৫০]? এই সকল দেহ চিৎসমুদ্রের বুদ্বুদ ও এই সকল বুদ্বুদ মনুষ্যের ন্যায় চিত্তের প্রতিবিম্ব বহন করে[৫১,৫২]।

হে দ্বিজ! পরিপূর্ণ ও নির্ম্মল স্বভাব চিদ্রূপ আকাশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্মের ফল স্বরূপ এই সকল দেহ স্বাত্মমোহের উপকরণ হইয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ মিথ্যা প্রতীতির বিষয় হইতেছে[৫৩]।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে চন্দ্রার্দ্ধধারিন্! মহামহিম অনন্ত ও একরূপ চিৎ পদার্থ কিরূপে দ্বৈতভাবাপন্ন হইল, এবং কি প্রকারেই বা তাদৃশ দ্বৈতের সুসূক্ষ্ম লতা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি? হে মহাদেব! যদি ইহা অজ্ঞানজনিত হয় তাহা হইলে জ্ঞানের পরে ইহার অনস্তিতা না হয় কেন? রজ্জুজ্ঞানের পর সর্পাভাবের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিশ্বাভাব না হয় কেন? ইহা আমাকে বলুন[১,২]।

ঈশ্বর বলিলেন, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম যখন একরূপে থাকেন, তখন দ্বিত্ব-কল্পনা থাকে না। যেমন দ্বিত্ব থাকে না, তেমনি একত্বও থাকে না। একত্ব দ্বিত্ব ত্রিত্ব, এ সকল সাপেক্ষ শব্দ, সে ভাবে বুঝিতে হইবে যে, একত্বাদিও কল্পিত, ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ কল্পিত, বস্তুভূত নহে। বস্তু চিৎ[৩,৪]। কার্য্য ও কারণ বস্তুতঃ এক বা অভিন্ন। যেমন ফল ও তদন্তর্গত বীজ, সেইরূপ। তদ্দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চিত্তই নানা কল্পনায় নানা আকারে স্ফুরিত হয়। সুতরাং সারকল্পে চেত্যগণ চিত্তের অনতিরিক্ত[৫,৬,৭]। এই যে, ছয় প্রকার বিকারের আশ্রয় স্থান ঘটাদি পদার্থ, (বিদ্যমানতা, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, হ্রাস, ক্ষয় ও ধ্বংস) এ

সমস্তই এক সদ্বস্তু হইতে উদ্ভূত হয় ও জলাহরণাদি কার্য্য করিয়া নামভেদাদি ব্যবহার নির্ব্বাহ করে, করিয়া ভোগ ভেদ জন্মায়। এই ভোগ ভেদ কথার অর্থ—চিৎপর্য্যবসান হওয়া। তাই তত্ত্ববিদ্গণ বলেন, যাহার আদ্যন্তে চিন্মাত্রতা, মধ্যেও তাহার চিন্মাত্রতা। অতএব, চিৎ-ই সমুদায় পদার্থের সার[৮]। জগৎ এক প্রকার কল্পনা, অন্য কিছু নহে, তাই তত্ত্ববিদ্গণের দৃষ্টিতে জলতরঙ্গাদি ব্যবহারিক ব্যতীত পারমার্থিক নহে বলিয়া স্বীকৃত হয়। মৃগতৃষ্ণা জল ও তাহার তরঙ্গ যদ্রূপ মিথ্যা, ব্যবহারিক জল ও তাহার তরঙ্গও তদ্রূপ মিথ্যা। ইহা অমুক, তাহা অমুক, এতদ্রূপ বোধ যখন অজ্ঞানকৃত, তখন আর এ বিষয়ে অজ্ঞানের অপনয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাচনিকী যুক্তি অবতীর্ণ করা বৃথা[৯,১০]। তরঙ্গ, কণা, কল্লোল, বুদ্বুদ, এ সকল যেমন জল হইতে সত্য সত্য ভিন্ন নহে, তেমনি, ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিতাও (সব হওয়ার সামর্থ্য) সত্য সত্য ভিন্ন নহে। পত্র পুষ্প ফল পল্লব এ সকল যেমন লতাই, লতা ছাড়া নহে, সেইরূপ, দ্বিত্ব, একত্ব, জগত্ত্ব, ত্বত্ত্ব ও অহন্তা প্রভৃতিও চিৎ, অর্থাৎ চিদ্ভিন্ন নহে[১১,১২]। তুমি যাহা ভিন্ন বা বিভিন্ন বলিতেছ, ভাবিয়া দেখ, তাহা চিৎ-ই, অন্য কিছু নহে, ঐ সকল কল্পিত উপাধির দ্বারা চিৎ-ই ঐ সকল ভেদ অবভাসে ভাসিত হইতেছে। সুতরাং তোমার প্রশ্ন উচিত প্রশ্ন নহে। অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্যরূপিণী মায়ার উপর আবার প্রশ্ন কি[১৩]? দেশ, কাল, ক্রিয়া, সত্তা, নিয়তি, অধিক কি, সমুদায় শক্তিই চিদাত্মিকা ও চিতের সত্তায় সত্তাবতী[১৪]। বীচি প্রভৃতি জলেরই নাম, তেমনি, চিৎ, চিত্ত, তত্ত্ব, অহং, ব্রহ্ম এ সকলও চিতের নাম। তরঙ্গ কি? তরঙ্গ মহোদধির বিলাস। সেইরূপ জগৎ কি? জগৎও ব্রহ্মের বিলাস। যাহার বিলাস জগৎ তাহা কোন পণ্ডিতের নিকট পরব্রহ্ম, কাহার নিকট সত্য, কাহার নিকট ঈশ্বর, কাহার নিকট শিব বিষ্ণু প্রভৃতি, কাহার নিকট শূন্য ও কাহার নিকট পরমাত্মা। যাহা সমুদায় পদের অতীত অথচ সমুদায়ের অধিষ্ঠান বা আধার, এবং যাহা সেই পরমাত্মার বাস্তব স্বরূপ, তাহা বাক্যের অবিষয়[১৫-১৮]। এই যে বিস্পষ্ট জগৎ দেখিতেছ, ইহা সেই মহতী চিৎ-লতার ফল পত্র ও পুষ্পাদি। চিৎ-ই মহতী অবিদ্যার উপরঞ্জিতা হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং আপনাকেই বাহ্য জগদ্ভাবে

দেখিয়া থাকেন[১৯।২০]। আপনিই আপনাকে অব্রহ্ম ভাবেন, ভাবিয়া অন্যের ন্যায় বা ভিন্নের ন্যায় হন[২১]। বস্তুতঃ তিনি নিষ্কলঙ্কস্বভাব, পরন্তু সংসার সরিতে নিপতিত হইয়া সকলঙ্কের ন্যায় হইতেছেন। অর্থাৎ পুর্য্যষ্টকের সহিত একীভূত হওয়াতে জীবভাবান্বিত হইয়া তদনুরূপ ভাবে ভাবিত হইতেছে (পুর্য্যষ্টক কি তাহা বলা হইয়াছে)। যে হেতু চিৎ-ই জীব, সেই হেতু জীবে চৈতন্যের প্রাচুর্য্য[২২]। পুর্য্যষ্টক-তাদাত্ম্যে যে দেহ, সে দেহ আতিবাহিক, সেই আতিবাহিক দেহ স্থূল দেহ লাভের পূর্ব্বে ব্রীহি যবাদি ভাবে পরিভাবিত হয়। পরে তৎসহযোগে পুংশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রেতোরূপে সম্পন্ন হয়, তৎপরে আপনাকে প্রাণবান্ অস্থিমাংসাদিময় স্থূল দেহের দেহী বলিয়া অনুভব করে[২৩।২৪]। অতএব, অনুভবাত্মক ব্রহ্মই আপনাকে উক্ত ক্রমে অন্তরে স্থূল দেহী বলিয়া জানে এবং চক্ষুরাদির দ্বারা বাহিরেও স্থাবর জঙ্গম জীবজাতি বলিয়া জানে। পরে সেই সেই জীবজাতিবিষয়ক ভাবনা জনিত দৃঢ় সংস্কার দ্বারা সেই সেই জীবজাতিতে সম্পন্ন হয়[২৫]। কাকতালীয় সংযোগের ন্যায় অভ্যস্ত বাসনার অভিভব ও বহু পূর্ব্বের সঞ্চিত বাসনার উদ্ভব ঘটনা হয়, তাহাতেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আকার পরিত্যাগ ঘটে। ভাবার্থ এই যে, তাহার আতিবাহিক দেহস্থ কর্ম্মাশয়ে নানা জন্মের নানা সংস্কার আবদ্ধ থাকে, তন্মধ্যে দেহ ত্যাগ কালে যে সংস্কার উন্মুখ হয় মরণের পর তাহার সেই দেহই জন্মে। এতন্নিয়মানুসারেই মনুষ্য মনুষ্য-শরীর পরিত্যাগের পর মশকাদি শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৬]। যেমন এককে দুই ভাবিলে তাহা দু-ই হয়, অথবা যেমন মানুষ আপনাকে বেতাল বলিয়া জানে ত সে বেতালই হয়, সেইরূপ নরশরীরস্থ জীব মৃত্যু কালে নরভাব বিস্মৃত হইয়া আপনাকে মশক ভাবে জানে, ক্রমে মশক শরীর জন্মে[২৮]। যেমন দুই বলিয়া না জানিলে দুই থাকে না শান্তি স্ফূর্ত্তি না এইরূপ স্থির জ্ঞান থাকিলে কর্ত্তৃতা নিবৃত্ত হয়, তখন দুই আত্মা নাই, এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে আত্মদ্বিত্ব বিনিবৃত্ত হয়[২৯]। যেমন দ্বিত্ব কল্পনা করিলেই এক দুই হইয়া যায়, সেইরূপ, দুই নাই ভাবিলেও দুএর বিনাশ সম্পন্ন হয়[৩০]। আত্মা পরমার্থতঃ দুই নহেন, তিনি এক অবিকারী ও সর্ব্বদা সর্ব্বগামী[৩১]। বরং সঙ্কল্পের রচনায় মানসিক পরিশ্রম আছে, পরন্তু সঙ্কল্পের বিনাশ করিতে

কিছু পরিশ্রম নাই। কেননা, ঔদাসীন্য মাত্রেই তাহা সম্পন্ন হয়[৩২।৩৩]। অতএব হে মুনিবর! কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা এই যে সংসার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এ দুঃখ কেবল মাত্র সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা নিবারিত হইবে। সঙ্কল্প মাত্রেই দুঃখদায়ক এবং তাহার ত্যাগ সুখদায়ক[৩৪।৩৫]। তোমার চেতনা যদি সঙ্কল্পসর্পরহিত না হয় তাহা হইলে নন্দনকাননেও তোমার সুখের সম্ভাবনা নাই[৩৬]। তুমি স্ববিবেকরূপ বায়ুর দ্বারা সঙ্কল্পমেঘ বিতাড়িত করিয়া শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল হও[৩৭]। তুমি সঙ্কল্পময়ী উন্মত্তা নদীতে উহ্যমান হইতেছ, অসঙ্কল্পরূপ মন্ত্রে উক্ত নদী শুষ্ক কর, করিয়া আপনার উদ্ধার সাধন কর[৩৮]। তুমি সমুদায় প্রাণীর হৃদয়াকাশস্থ চিদাত্মা অবলম্বন করিয়া দেখ, চিদাত্মা বায়ুভ্রান্ত তৃণাংশের ন্যায় সঙ্কল্পবায়ুর দ্বারা বৃথা ভ্রান্ত হইতেছে। তুমি আপনা আপনি সঙ্কল্প কালুষ্য মার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ ও আনন্দময় হও[৩৯।৪০]। যে হেতু আত্মা সর্ব্বশক্তি, সেই হেতু তিনি যেরূপ ভাবনা করেন আপনাকে সেই রূপই দেখেন। পরন্তু সে সমস্তই সঙ্কল্পের বিজৃম্ভণ[৪১]। এই জগৎ কেবল মাত্র সঙ্কল্প, সুতরাং মিথ্যা। হে ব্রহ্মন্! যদি সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দেখ, তাহা হইলে আর ইহাকে দেখিতে পাইবে না[৪২]। এই যে জন্মজাল, এ জাল কেবল সঙ্কল্প বায়ুতে ঘূর্ণমান। সে জন্য অসঙ্কল্প মাত্রেই ইহা পরম পদে বিলীন বা বিশ্রান্ত হইয়া যায়[৪৩]। এই যে তৃষ্ণারূপিণী কবঞ্জ লতিকা, ইহার মূল সঙ্কল্প। তুমি অসঙ্কল্পের দ্বারা ইহার মূল ছেদন কর, করিলে ইহা শুষ্ক হইয়া যাইবে[৪৪]। ইহার উত্থানও ভ্রান্তি, বিনাশও ভ্রান্তি। যেমন কোন রাজা আপনার প্রভুত্ব বিস্মরণে শোকান্বিত হয়, দুঃখিত হয়, পুনর্ব্বার তৎস্মরণে সুখী হয়, সেইরূপ, চিদাত্মাও আপনার ব্রহ্মত্ব বিস্মরণে দুঃখী হয় এবং তৎস্মরণে সুখী হয় [৪৫।৪৬]। এক বার যদি আমি ব্রহ্ম, এতদ্রূপ স্মৃতি জন্মে তাহা হইলে আর তাহার পূর্ব্বস্মৃতি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম ভিন্ন, এ স্মৃতি কষ্টপ্রদা হয় না। ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা ও আপ্তোপদেশ দ্বারা যে স্মৃতি জন্মে সে স্মৃতি যৎপরোনাস্তি প্রবলা, সে জন্য তাহা পূর্ব্বস্মৃতির পুনরুদয় অবরুদ্ধ করে। তুমি ইহাই ভাবিবে যে, আমিই একাদ্বয় আত্মা সদাবস্থিত আছি। এই ভাবনা দৃঢ় হইলে তুমি তাহাই হইবে অর্থাৎ অদ্বয়াত্মাই হইবে[৪৭।৪৮]।

হে মুনিবর! অভিহিত প্রণালী আশ্রয় করিয়া তুমি ভাবময়ী পূজা করিবে, বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিবে। বাহ্যপূজা তোমার ন্যায় জ্ঞানীর যোগ্য নহে। কেননা, পরমার্থ সৎ একাদ্বয় পরব্রহ্মই তোমার দেবতা এবং তোমাতে পূজ্য পূজক পূজোপকরণাদি নাই। যাহারা কল্পনার অতীত হইতে পারে নাই, তাহারাই অমুক আমার পূজ্য, আমি তাঁহার পূজক, অমুক অমুক আমার পূজার দ্রব্য, আমার পূজ্য দেবতার মূর্ত্তি বা প্রতিমা এবম্বিধ, এই সকল কল্পনা করে॰॰।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর বলিলেন, আমি দেবপূজা প্রসঙ্গে যাহা বা যেরূপ বলিলাম, বিশ্বকে তুমি সেই প্রকার জানিবে। ইহা বাধ বুদ্ধিতে নাই, অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে আছে। ইহা তত্ত্বতঃ দ্বৈতও নহে, একও নহে। অথচ দ্বৈতাদ্বৈত-রূপে ইহার ব্যবহার নির্ব্বাহ হয়১। চিৎপদার্থের স্বরূপে কোনরূপ কলঙ্ক নাই। তিনি অসংসারী, অভিন্ন ও অদ্বয়। তাঁহার বৈরূপ্য অর্থাৎ জড় ভাব ও সংসারিত্ব মোহ বশতঃ উত্থিত। সেই অনির্ব্বাচ্য স্বরূপ মোহও তদীয় শক্তি বিশেষ২। অস্মি—অর্থাৎ আমি আছি এই ভাবের উদয় হওয়াই চিতের মোহ বা কলঙ্ক এবং তাহাই তাঁহার বন্ধন বা সংসার। ঐ রহস্য বোধগম্য হওয়ার পর তিনি পুনঃ অসংসারী ও মুক্ত হন৩। চিৎ আপনি আপনাকে পদার্থাকার ভাবনায় ভাবিত করিয়া নিজের অখণ্ডতা বিস্মৃত হয় ও আপনাতে দেহ, সুখ ও দুঃখাদির অধ্যাস দ্বারা মিথ্যা স্থিতি ধারণ করে। ইহারই নাম সকলঙ্কা স্থিতি। শুদ্ধা স্থিতি কি তাহাও বলি শ্রবণ কর। শুদ্ধা স্থিতি সত্যাসত্য চিন্তার অতীত ও সর্ব্ব-কল্পনা বিমুক্ত৪।৫। এই শুদ্ধা স্থিতির প্রথমে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় পূর্ণ সর্ব্বব্যাপীরূপে প্রথা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মনোমধ্যে ঐরূপ অখণ্ডা বৃত্তির উদয় হয়। পরে মনের বিলয়ে বর্ণিত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিও লুপ্ত

হইয়া যায়। অর্থাৎ সত্য সাক্ষাৎকার হওয়ায় মিথ্যা জগজ্জাল দর্শন তিরোহিত হয়[৬।৭]। উক্ত রীতিতে সংসার কল্পনা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে জীব তখন ভৃষ্ট বীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া কেবল মাত্র স্বসত্তায় অবস্থান করে। এবম্বিধা প্রথমা স্থিতির অপর নাম জীবন্মুক্ত স্থিতি। কোন কোন জ্ঞানী উহাকে পশ্যন্তী অবস্থাও বলেন। (পরা, পশ্যন্তী, বৈখরী, এই সকল নামের অবস্থা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই সকল অবস্থা যোগশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ সমাধি) এ অবস্থায় চেত্যচর্ব্বণ থাকে না। চিত্তের বিষয় চেত্য, তাহার চর্ব্বণ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান, তাহা থাকে না। সুতরাং জীব তখন মনোমোহরূপ মেঘের প্রচ্ছাদন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শরদাকাশের ন্যায় নিতান্ত নির্ম্মল অবস্থায় স্থিত থাকে[৮।৯]। সুতরাং এতদবস্থায় চিৎ স্বসত্তায় স্থিতি করে এবং এতদবস্থাকে আমরা জীবদ্দশায় মুক্ত বলিয়া ও জীবন্মুক্ত বলিয়া বর্ণন করি[১০]. সুষুপ্তি যদি পুনরুত্থানযুক্তা না হয় (অর্থাৎ চিৎ সুষুপ্ত হয়) তাহা হইলে তাহার সহিত এই জীবন্মুক্ত অবস্থা কথঞ্চিৎ উপমিত হইতে পারে। কেননা ইহাও অপুনর্ভব অর্থাৎ পুনর্জন্মনাশক[১১]। এই প্রথমাবস্থার পরে যাহা হয় তাহার বর্ণনা শ্রবণ কর[১২]। তৎপরে চিৎশক্তি মনোমালিন্য রহিত হইয়া সংসারোন্নতি [illegible] হয়। অসীম আকাশ যদি জ্যোতিঃ ও তমঃ উভয় বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহারই সহিত এই দ্বিতীয়াবস্থা উপমিত হইতে পারে[১৩]। চিৎ পদার্থ যখন নিবিড় সুষুপ্তি পরিণামের ন্যায়, শিলাসলিলেশের ন্যায়, সৈন্ধব রসের ন্যায় ও বায়ুস্থ স্পন্দশক্তির ও আকাশে শূন্যশক্তির ন্যায় হয়, তখন চিৎ আর চেত্যোন্মুখ হয় না। (চেত্য=চিত্তের বিষয়) সমুদ্র যেমন চাপল্য ত্যাগ করিয়া স্থির হয়, চিৎও তদ্রূপ সুস্থির ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়[১৪।১৫], এমন কোন শব্দ নাই যদ্দ্বারা ঐ অবস্থা বুঝান যাইতে পারে। ঐ অবস্থাকে জড় অজড় কাল ক্রিয়া আকাশ কিছুই বলা যায় না[১৭]। এই পদকে দিক্ ও কাল প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছেদ করা যায় না। ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তথা বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত, এ সকল কল্পনারও অতীত। এ অবস্থা কেবল সাক্ষীর ন্যায় স্থিত ও অত্যন্ত স্পৃহণীয়[১৮।১৯]। হে সুব্রত! অতঃপর তৃতীয় পদের (অবস্থার) কথা বলি, শ্রবণ কর।

পরবর্ত্তিনী তৃতীয়াবস্থা ব্রহ্ম ও আত্মাদি শব্দেরও অবিষয়। পূর্ব্বাবস্থা

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির গম্য, এ অবস্থা তাহারও অতীত অর্থাৎ ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুরূপ। এই পদ ষড়্বিধ বিকার বর্জ্জিত ও অত্যন্ত স্থির। যাহা যৎপরোনাস্তি পরম পদ বা পরম পুরুষার্থ, এই পদ তাহাই। ইহাই উৎকর্ষের চরম সীমা ও ইহাই পরম শিব অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল। এই অবিচ্ছিন্না চিৎস্থিতি পরম পাবনী নামে প্রসিদ্ধা[২০।২৩]। এই পদ শৈব শাস্ত্রোক্ত ষাড়্ব পন্থার, শ্রুত্যুক্ত অর্চ্চিরাদি পন্থার ও সর্ব্বপ্রকার উপাসনাপ্রাপ্য লোকের উপরে অবস্থিত। সুতরাং এ পদ আমারও বাক্যের অবিষয় অর্থাৎ আমিও এ পদ বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে অক্ষম। হে মুনে! হে বশিষ্ঠ! আমি তোমাকে সেই সনাতন দেবের কথা বলিলাম, যে দেব মাত্রাত্রয়ের অতীত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই বিশ্ব তন্ময় পরন্তু তিনি সর্ব্ব বিকল্পের অতীত। ইহা ছিল না হইয়াছে, এরূপ নহে এবং ইহা থাকিবে না, এরূপও নহে। ইহা পরম শান্ত অর্থাৎ সংক্ষোভণ রহিত[২৪।২৭]। যেমন একই প্রকার সমুদ্র প্রলয় কালে স্বয়ং সংক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ এই চিদ্‌ঘন • একাদ্বয় সমুদ্রের সংক্ষোভ হয় না। পরে যে সংক্ষোভ হয় সে সংক্ষোভ ঔৎপাতিক অর্থাৎ এই দেব স্বয়ং সংক্ষুব্ধ (বিকৃত) হন না। তাঁহার সংক্ষোভ (নানা ভাব) মায়িক। অর্থাৎ বিশ্বভবন (সৃষ্টি হওয়া) ভাব মায়াকৃত বাতীত বাস্তবতঃ নহে। এই জগৎ তদীয় কোষ বটে; পরন্তু ইহার সহিত তাঁহার কিছুমাত্র ভেদ নাই। সৎও তিনি তথা অসৎও তিনি[২৮।২৯]। তিনিই বিশ্ব, তিনিই শিব, তিনিই শান্ত, এবং একমাত্র তিনিই বাক্যের ও মনের অবিষয়। তিনি প্রণবের চতুর্থমাত্রা তথা তুর্য্য পদেরও ঊর্দ্ধে রাজমান[৩০]।

বাল্মিকি বলিলেন, ঈশান এই প্রকার উপদেশ করিলেন। মুনিবর বশিষ্ঠ ও শিবপার্শ্বগ নন্দী প্রভৃতি দেবদেব ঈশানের ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম শিবোক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। মনের বিশ্রামে তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল সেই স্থলেই ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিত হইয়াছিলেন[৩১]।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

—৹()*()৹—

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর গৌরীনাথ হর সংপ্রতি প্রসন্ন হইয়া নেত্রোন্মীলন করিলেন[১]। যেমন মেঘাবরণের অভাবে সূর্য্যের উদয়ে দিবসের উদয় ভাব জানা যায়, বোধগম্য হয়, তেমনি, তন্মুখাকাশস্থ নেত্রত্রয়ের উন্মীলনে বুঝা গেল, তিনি সমাধি হইতে উন্মুক্ত ও প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। পরে সেই ঈশ্বর আমাকে বলিলেন, হে মুনে! তুমি বিচার উত্থাপন কর, করিয়া আপনার পারমার্থিক স্বরূপ অবধারণ কর। পবন যেমন নির্ম্মল আকাশকে ধূল্যাদি মলে মলিন করে, তুমি অহংপদবাচ্য জীবভাব দ্বারা অথবা বাহ্য দৃষ্টির দ্বারা আপনাকে সেরূপ মলিন করিও না[২,৩]। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের দৃষ্টিতে সব সমান অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় দুএর কিছুই নাই[৪]। তুমি শান্তি ও অশান্তিময় বিকল্প ত্যাগ কর, ধীর হও ও আত্মদর্শী হও[৫]। যদি তুমি শীঘ্র সেরূপ না হইতে পার তবে যৎকিঞ্চিৎ কাল (দু-চার বার) বাহ্য দৃষ্টি অবলম্বনে যত্নবান্ থাকিবে অর্থাৎ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিতৎপর থাকিবে এবং তদন্তে আমার উক্তি সমূহ অনুভব করিবে[৬]। ভগবান্ শূলপাণি এইরূপ কহিয়া অবশেষে আমাকে বলিতে লাগিলেন: বলিলেন, আমি দেহী, এরূপ মনে করিও না। অর্থাৎ দেহই আত্মা, এরূপ ভাবিও না। এই যে দেহরূপ গৃহ, ইহা প্রাণের দ্বারা স্ফুরিত হয়[৭]। প্রাণবিহীন দেহে কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না, পরন্তু ইহা নিশ্চেষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, দেহের প্রচলনশক্তি পবনশক্তির অধীন ও ইহার সংবেদনী শক্তি (জ্ঞান) চিৎশক্তির অধীন[৮]। ক্রিয়া ও ক্রিয়ামূল প্রাণপবন, তদ্দ্বয়ের বিনাশ হইলেও চিৎশক্তি অবিনাশিনী থাকে, তাহার বিনাশ হয় না। কেননা তাহার বিনাশের কারণ নাই। চিদাত্মা আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ, সে জন্য তাহার ধ্বংস অসম্ভব। এই যে মনঃপ্রাণময় দেহ, এই দেহে তাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র হয়, জন্ম হয় না[৯,১০]। নির্ম্মল মুকুরেই প্রতিবিম্বপাত হয়, অস্বচ্ছ মলিন পদার্থে কোন কিছুর

প্রতিবিম্বপাত হয় না। সেইরূপ স্বচ্ছস্বভাব লিঙ্গ দেহেই চিদাত্মা প্রতি-ভাসিত হন, অস্বচ্ছ মাংসাস্থিময় স্থূল দেহে তাঁহার প্রতিফলন হয় না। অতএব, আত্মা সর্ব্বব্যাপিতারূপে স্থূল দেহে থাকিলেও না থাকার ন্যায় গণ্য হইয়া থাকেন[১১]। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেমন সমল মুকুরে প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না তেমনি গতপ্রাণ দেহেও চিদাভাস স্থিত হয় না। যদিও চিৎ পদার্থ সর্ব্বাবস্থিত, তথাপি, বুদ্ধিময় লিঙ্গ দেহ ব্যতীত অন্যত্র তিনি কি ক্রিয়াকারিত্ব বিষয়ে কি স্বতত্ত্ববোধ বিষয়ে কোনও বিষয়ে সমর্থ হন না। লিঙ্গদেহে বুদ্ধির স্থিতি, তদ্দ্বারা তিনি কি ক্রিয়া কি স্বতত্ত্ববোধ সর্ব্ব বিষয়ে সমর্থ হন। যখন তিনি মায়াকলঙ্ক উত্তীর্ণ হন তখন তাঁহার সংজ্ঞা পরম শিব[১২,১৩]। তত্ত্বজ্ঞগণ সেই সর্ব্বসত্তাপ্রদ দেবকে শিব, হরি ও ব্রহ্মা, সুরেশ্বর ইন্দ্র, অনিল ও অনল, চন্দ্র ও সূর্য্য এবং পরমেশ্বর বলিয়া জানেন। সেই এই সর্ব্বব্যাপী আত্মা চিৎ নামে স্মৃত হন[১৪,১৫]। অধিক কি বলিব, দেবদেব, ঈশ্বর, বিধাতা, স্বর্গপতি ইন্দ্র, ইহারা সকলেই ঐ মহাচিতের উল্লাস এবং ইহারা সকলেই মোহবৰ্জ্জিত [১৬]। এই জগতে যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে প্রসিদ্ধ, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু হর উক্ত পরব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত। এ কথা শাস্ত্রীয় ব্যবহার দর্শনে কিন্তু পরমার্থ দর্শনে ইঁহারাও ভ্রমস্থষ্ট অর্থাৎ উক্ত পরম পদের প্রতিভাসে আবির্ভূত[১৭,১৮]। ভ্রান্তির বীজ অবিদ্যাই কল্পনা জালের রচয়িত্রী এবং তাহার শাখা অসংখ্য[১৯]। বেদ, বেদার্থ, সৃষ্টিক্রম, প্রলয়ের নিয়ম, ক্রিয়াকলাপ, উপাসনা, তদধিকারী জীবসঙ্ঘ, তাহাদের কাম কর্ম্ম বাসনা ও জন্ম মরণ জীবন, এ সমস্তই অবিদ্যা হইতে প্রবৃত্ত। অধিক কি বলিব, অবিদ্যাকার্য্যের সঙ্খ্যা নির্ণয় ও বর্ণনা অস্মদাদিরও অশক্য। যে হেতু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ইঁহাদেরও শরীর অবিদ্যামূলক, সেই হেতু বলা যায়, চিদাত্মা ব্রহ্মাদিরও পিতা[২০,২১]। বৃক্ষ যেমন স্বাশ্রীভূত পল্লবাদির কারণ, সেইরূপ, মহাদেবও ব্রহ্মাদি তৃণান্ত পদার্থের কারণ। যত নাম আছে সে সমস্তই তাঁহার নাম, যত জ্ঞান আছে, সে সমস্তেরই কর্ত্তা তিনি, সুতরাং তিনিই সব। তিনিই বন্দনীয়, তিনিই পুজনীয়, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানে সে ব্যক্তির নিকট তিনি নিত্য-প্রত্যক্ষ[২২,২৩]। সম্বেদনরূপে তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বগোচর। কাযেই তাঁহার আবাহন করিতে হয় না ও তজ্জন্য মন্ত্রও পাঠ করিতে হয়

না২৪। তিনি নিত্যাহূত, সর্ব্বত্রাবস্থিত ও সর্ব্বদা 'সর্ব্বলভ্য। হে মুনি-বর! যে, যে বস্তু ও যে অবস্থা প্রাপ্ত থাকুক, সে, সেই বস্তুতে ও সেই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। তিনি স্বয়ংই রূপ, আলোক ও তদ্দ্রষ্টা মনের সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সে জন্য তিনিই পূজাদি ব্যবহারের মূল। অতএব, তিনিই আদ্য ও দেব, তিনিই নমস্কার্য্য, তিনিই স্তুত্য, তিনিই পূজ্য ও তিনিই অন্যান্য দেবতার ঈশ্বর২৫।২৬। ইঁহাকেই তুমি জ্ঞাতব্য পদার্থের চূড়ান্ত [illegible] ও মহত্ত্বের শেষ সীমা বলিয়া জানিবে। এই পরম দেব [illegible] শোক ও ভয় থাকে না, বিনষ্ট হইয়া যায় [illegible] অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ, এতত্ত্বজ্ঞ জীবের জীবত্ব [illegible] জন্মমরণাদি রহিত হইয়া যায়। তুমিও সর্ব্বদা [illegible] হইয়া পরম পদ লাভ কর, বৃথা বাহ্য দৃষ্টিতে [illegible]!

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর বলিলেন, ব্রহ্মজ্ঞগণ বিদিত আছেন যে, একই চিদ্রূপী দেব রুদ্র। তিনি সংসাররূপ রুজা (রোগ) বিদ্রাবিত করেন বলিয়া রুদ্র। সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর, দ্যোতমান বলিয়া দেব ও ঘটসত্তা পট সত্তা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সত্তার অন্তরে অনুস্যূত সত্তা বলিয়া সৎ। ইনি স্বায়ম্ভূ [illegible] ও বীজের বীজ। ইনি সংসার পদার্থের সার, কর্ম্মের [illegible] ইনি নিজে অকারণ ও মালিন্য রহিত। ইনি সংসার [illegible] সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বোৎপাদক কিন্তু পরমার্থ দর্শনে কোন কিছু না থাকায় কারণও নহেন, কার্য্যও নহেন, কর্ত্তাও নহেন১।৩। ইনি চেতনের চেতন ও নিজে চেতনারূপে রাজমান। ইনি সূর্য্যাদিরও সূর্য্য অর্থাৎ প্রকাশক, অথচ চক্ষুরাদির অপ্রকাশ্য। তত্ত্বজ্ঞগণ ইঁহাকে কেবলা চিৎ ও যৎপরোনাস্তি বিমলা বলিয়া জানেন৪।৫। এই

দেবে ক্ষিত্যাদি ভূত নাই, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক (কাল্পনিক) সত্যতা নাই ও নামগ্রাহিণী বিশেষ সত্তাও ইঁহাতে নাই, ইনি সর্ব্বাত্মস্থ্যতা (সর্ব্বব্যাপী) মহাসত্তা[৬]। ইনিই প্রথমে রাগরূপী, পরে বিষয় স্মৃতিকালে রঞ্জক, বিষয় সম্বন্ধ কালে রঞ্জনা, তদ্বিয়োগে কেবলরূপী হন ও নিজে আকাশের ন্যায় অমূর্ত্ত হইলেও কুড্যের ন্যায় মূর্ত্ত হন[৭]। এই দেবই সর্ব্বচিত্তের আধার, তদ্দ্বারা এতদাধারে কোটী কোটী জগৎ মরুমরীচিকার অনুরূপে প্রস্ফুরিত হইয়াছে হইতেছে ও হইবে[৮]। ইনি স্বপ্রকাশস্বভাব, ইনি আছেন বলিয়াই এই জগৎ এতদ্রূপে সম্পন্ন হইতেছে[৯]। ইনি অণু অপেক্ষা অণু অথচ বৃহত্তম সুমেরু ইঁহার গর্ভস্থ[১০]। ইনি কল্পকল্পান্ত কাল আক্রম করিতেছেন অথচ কাল ইঁহাতে নাই। অর্থাৎ ইঁহা অল্প তাহা অধিক, গণনা ইঁহার উপর প্রক্ষিপ্ত নহে। কেশ সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে শতভাগ কল্পনা করিলে যে সূক্ষ্মতা কল্পিত হয়, এই দেব তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম। অথচ এই দেব সর্ব্বব্যাপী[১১]। ইনি সংসার রচনা করেন নাই, অথচ ইনি কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। ইনিই নানা কর্ম্ম করেন, অথচ কিছু করেন না[১৩]। ইঁহাকে অন্ধ, অন্ধীনা ও দৃশ্যবান্ বলা যায় ও অকায় ও মহাকায় বলাও যায়[১৪]। ইঁহাকে এতদ্দিন, অর্থাৎ অদ্য বলা যায়, প্রাতঃও বলা যায়। অথচ ইনি অদ্যও নহেন, প্রাতঃও নহেন[১৫] উন্মত্ত, বালক ও ম্লেচ্ছাদি যে যে নিরর্থক শব্দ উচ্চারণ করে, সে সকল নিরর্থক শব্দও তিনি। অর্থাৎ ভিড়্ ভিড়্, [illegible], খিল্ খিল্, পিচ্ পিচ্, ইত্যাদি নিরর্থক বাক্যও তিনি। আবার তাঁহারই প্রসাদে ঐ সকল বাক্য সার্থক্যে পরিণত হয়। যাহা সত্য নহে বা যাহাতে সত্য নাই, তাহা নাই[১৬।১৭]। হে মুনিবর! যাঁহাতে এই বিশ্ব আছে, যাঁহা হইতে ও যিনি এই বিশ্ব হইয়াছেন, অথবা হইয়াছে ও অভেদে বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বাত্মদেবকে আমি নমস্কার করি[১৮]। না থাকিলেও যাঁহাতে আরোপ করা যায় ও তৎপ্রভাবে যাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথা ঐ সকল অনর্থক শব্দও যাঁহার প্রসাদে সার্থক হইয়া দাঁড়ায়, সেই সর্ব্বরূপী বা বহুরূপী দেবকে আমি নমস্কার করি[১৯]।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর বলিলেন, যাঁহার অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত শব্দ রাশির অর্থ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় সেই সর্ব্বেশ্বরের শক্তিপুঞ্জে না হয় এমন কি আছে[১]? এমন কিছুই নাই যাহা চিন্তামণিতুল্য চিন্মণিতে প্রতিভাসিত না হয় এবং এমন কোন পদার্থ নাই যাহা বিচিত্র বা অদ্ভুত বলিয়া গণ্য হইতে পারে[২]। সেই ঈশ্বরীয়া চিৎ শক্তিই ক্ষেত্রপতিত বীজকে অঙ্কুরাদিরূপে পরিণামিত করে ও অবশেষে তাহা অন্নরূপে গৃহীত হয়[৩]। এইরূপ, রসসামান্যরূপিণী চিৎ শক্তিই উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে আগত ও জলরূপে পরিণত হয়, তথা, জিহ্বেন্দ্রিয় যোগে লৌল্য প্রাপ্ত হয়[৪]। সেই শক্তিই কুসুমে গন্ধরূপে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যরূপে, শিলামধ্যে প্রতিমারূপে ও স্থিতিশীল হিমালয়াদিরূপে প্রকটিত হইতেছে। পবনের স্পন্দ, ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শ, সেই চিৎ শক্তির বিলাস[৫,৭]। তাঁহারই প্রবৃত্তি শক্তিতে সংসার, তথা, তাঁহারই নিবৃত্তি শক্তিতে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি ক্রম পরম্পরা দ্বারা মোক্ষ প্রকটিত হয়[৮]। নিমেষাদি কল্পান্তগণাত্মক কালও সেই চিৎ শক্তির বপু অর্থাৎ শরীর[৯]। অধিক কি বলিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, এ সকল সংজ্ঞা কেবল শক্ত্যুৎকর্ষের তারতম্য মূলক অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যব্যবস্থাপিকা সেই মূল শক্তিরই অবান্তর নাম বা অবান্তর ভেদ[১০]। দীপ যেমন গৃহমধ্যে স্বক্রিয়া বিস্তার করে, করিয়া পদার্থ প্রকাশের কারণ হয়, সেইরূপ, অতি বিস্তৃত ও অতি নির্ম্মল সেই সাক্ষিচৈতন্যে এই জগৎ কার্য্য প্রকাশিত হইতেছে[১১]। চিদাত্মা আকাশে এক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নাট্যশালা (দেহ), তত্রস্থ রঙ্গভূমিতে নাট্যাভিনয় (জাগ্রদাদি অবস্থার কার্য্য), সে নাট্য আত্মশক্তি রচিত সংসার, চিদাত্মা এই সংসার নাট্য তিনি সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া দর্শন করিতেছেন[১২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে জগন্নাথ! শিবের শক্তি কি? কত প্রকার? কি প্রকারে স্থিত? এবং তাহার সাক্ষিত্বই বা কি? তাহার সংখ্যা

ও কার্য্যই বা কত? এই সকল কথার নিরবশেষ অথবা সংক্ষেপ বর্ণনা আমাকে বলুন[১৩]।

ঈশ্বর বলিলেন, শিব অপ্রমেয়, শান্ত, পরমাত্মা, চিন্মাত্র, সর্ব্বময় ও নিরাকার। ঈদৃশ শিবের ইচ্ছাশক্তি, ব্যোমশক্তি, কালশক্তি, নিয়মন শক্তি ও সর্ব্বানুস্যূত এক মহাশক্তি বা মহাসত্তা আছে। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্ত্তৃশক্তি ও অকর্ত্তৃশক্তি প্রভৃতি (কর্ত্তৃতাশক্তি অর্থাৎ প্রবৃত্তি শক্তি। অকর্ত্তৃতাশক্তি অর্থাৎ নিবৃত্তিশক্তি।) এতদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন অবান্তরশক্তি যে কত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই[১৪,১৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দেব! অভিহিত শক্তি সকল কুত্রত্য অর্থাৎ কোথা হইতে আইসে? শক্তির আবার বহুত্ব কি? কেনই বা উহা বহু? কি প্রকারেই বা ঐ সকল শক্তির উদয় বা উদ্রেক হয়? এবং ঐ সকল শক্তি শক্তিমান্ পদার্থ হইতে ভিন্ন? কি অভিন্ন? এই সকল বিষয় আমাকে বলুন।

ঈশ্বর বলিলেন, শিব অপরিচ্ছিন্নস্বভাব, সুতরাং অনন্ত ও চিন্মাত্র। তাঁহার সেই চিন্মাত্রতাই তাঁহার শক্তি। অর্থাৎ মায়িক কল্পনা প্রযুক্ত যে চিদ্ভেদ, চিতের ভিন্ন ভাব, সেই চিদ্ভেদকেই আমরা শক্তি সংজ্ঞায় ব্যবহার করি। বস্তুতঃ তাহা চিৎ-ই, চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। তাহা যে বিভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয় সে প্রতীতি কল্পনা ঘটিত[১৭,১৮]। জল যেমন তরঙ্গ, বীচি ও লহরী, এ সকল বিভিন্ন হইলেও জলাকারে অভিন্ন বা এক, তেমনি, জ্ঞানিত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব প্রভৃতিও ঐরূপ ঐরূপ কল্পনায় বিভিন্নের ন্যায় হইলেও চিদাকারে এক বা অভিন্ন। অতএব, কল্পনাভেদের অনুবিধানে শক্তির ভেদ অর্থাৎ বহুত্ব অঙ্গীকৃত হয়[১৯]। এই ব্রহ্মাণ্ডনামক জগৎ, ইহা যেন একটী নৃত্যমণ্ডপ, কাল যেন ইহাতে সুশিক্ষিত নর্ত্তক। কোন কোন বাদী ঈশ্বরীয় জগদ্ব্যবস্থাপিকা কল্পনাকে তদীয় কৃতি, যত্ন ও ইচ্ছা প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং কেহ বা উহাকে ঈশ্বরীয় ইচ্ছা বলিয়াও উল্লেখ করেন। অপিচ ঐ ইচ্ছাকে কেহ কেহ ঈশ্বরীয় কাল বা কাল শক্তি বলেন। কেহ বা এই কালকে গণনায় দ্বিপরার্দ্ধ বলেন, (মহাপ্রলয়কে সীমা করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পরিমাণ (এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, লক্ষ, এইরূপ গণনার শেষ সংখ্যা পরার্দ্ধ বা শেষ সীমা) স্থির করেন এবং

বলেন, ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল এই দ্বিপরার্দ্ধসঙ্খ্যক।) কিন্তু আমরা বলি, কলনকারী (লয়কারী) বলিয়া কাল, আর কল্পকারী (সৃজনকারী) বলিয়া কল্প[২০।২১]। এই কালশক্তিরই অপর নাম নিয়তি। নিয়মনকারী বলিয়া নাম নিয়তি। নিয়ম দ্বিবিধ। ইহা এইরূপ হউক বা হইবেক, থাকুক বা থাকিবেক, এই এক নিয়ম। এ নিয়মকে আকারনিয়ম বলা যায় এবং ইহা হইতে তাহা হইবে, অবশ্য হইবে, এই ভাবের অপর এক নিয়ম। এ নিয়মকে বিকারনিয়ম বলা যায়। অতএব, উক্ত কালশক্তির সত্বায় আকারনিয়ম ও বিকারনিয়ম, এই দ্বিবিধ নিয়ম অব্যাহত ভাবে স্থাপিত হওয়ায় প্রোক্ত কালশক্তিরই অপর নাম "নিয়তি" হইয়াছে। (নিয়মনাৎ নিয়তিঃ।) সে দিকে মহারুদ্র ও এ দিকে তৃণ হইতে ব্রহ্মা, সমস্তই উক্ত নিয়তির অধীন[২২]। যাবৎ না নিয়তি তত্ত্ববোধ দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয়, তাবৎ জগজ্জাল নামক নাট্য শালায় কালনামক নটের নৃত্যের অবসান নাই[২৩]। এই নাট্যে নানা রস ও নানা বিলাস চলিতেছে। এ নাট্যের বিশ্রাম কালে পুষ্কর ও আবর্ত্তক প্রভৃতি কল্পান্ত মেঘের দ্বারা ঘর্ঘর বাদ্য হয়। এ নাট্যে ছয় ঋতু ও ছয় ঋতুর ধর্ম্ম প্রকটিত হয়, এবং এ নাট্যের মন্দির (এই জগৎ) বর্ষা বারিতে আপ্লুত হয়। মেঘ সকল নীল বস্ত্রের ভ্রম জন্মায়, সমুদ্র সপ্তক নাট্যমন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে, এ নাট্যমন্দির কখন জলমগ্ন কখন বা উন্মগ্ন হয়, মস্তকোপরি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত ধারণ করে, ইহার উর্দ্ধদেশ চন্দ্র সূর্য্য ও গঙ্গা এই তিন্ মুক্তাফল শোভা বিস্তার করে, এ নাট্য মন্দির লোক, লোকপাল ও ভুবন দ্বারা সজ্জিত হয়, এতন্মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন্ স্থানে নাট্যকার নট পাদ বিহরণ (পদক্ষেপ) করে, চন্দ্র ও সূর্য্য এতন্নাট্যকারের কুণ্ডল, তারা সকল ঘর্ম্মকণা, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড এতন্নাট্যমন্দিরের বিতান, ইত্যাদি[২৪।৩১]।

হে মুনে! নিয়তির বিলাসস্বরূপ এই যে সংসারনাট্য, এ নাট্য নানা বিকারে ও আকারে পরিপূরিত। সর্ব্বনাট্যের শ্রেষ্ঠ এই নাট্য চিরব্যাপী। ঈশ্বরনামধেয় একমাত্র দ্রষ্টা (দর্শক) ইহাতে অবস্থিত। তিনি নিত্যোদিত ও সাক্ষীর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া এই স্বাত্মভূত সংসারনাট্য দর্শন করিতেছেন। এ নাট্য তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, এবং তিনিও এতন্নাট্য হইতে ভিন্ন নহেন[৩২]।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

—— (*) ——

ঈশ্বর বলিলেন, যাঁহার বর্ণনা করিলাম তিনিই পরম দেব ও সাধুগণের নিত্যপূজ্য। তিনি চিদ্‌ঘন, তাঁহার স্বরূপ অনুভূতি, তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাশ্রয়[১]। ইনি ঘটে, পটে, বটে, কুড্যে, শকটে ও নরে স্থিত আছেন এবং ইনিই শিব, হর, হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের ও যম। ইনি সর্ব্বাত্মা সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে উভয়ত্রই বিদ্যমান। সকল সদ্বুদ্ধিশালী এই ভগবান্‌কে স্বাত্মভাবে ও নানা ক্রমে পূজা করিয়া থাকেন[২।৩]। হে মহাবুদ্ধিধর! হে তত্ত্বজ্ঞ! বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এই দ্বিবিধ পূজাক্রমের মধ্যে প্রথমে বাহ্যিক পূজার ক্রম বলি, শ্রবণ কর, পশ্চাৎ আন্তর ক্রমের পূজা শ্রবণ করিও[৪]। যদ্যপি দেহরূপ গৃহ স্নান আচমনাদির দ্বারা পবিত্র হয়, তথাপি, ইহাতে যে সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশ আছে, সেই প্রকাশই (স্বাত্মনির্লিপ্ততা জ্ঞানই) বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ পূজায় গ্রাহ্য। কেননা, তদ্বিজ্ঞান দ্বারা দেহের যেরূপ শুদ্ধি হয় সেরূপ শুদ্ধি স্নানাচমনাদির দ্বারা হয় না। এ বিষয়ের অপর এক স্থূল কথা এই যে, ভাবশুদ্ধিই মুখ্যা শুদ্ধি, স্নানাদি তাহার উত্তেজক মাত্র। অপিচ, অন্তরে যে ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় সেই ধ্যানই তাঁহার মুখ্য পূজন, অন্য প্রকার পূজন তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ মাত্র[৫।৬]। অতএব, ধ্যানের দ্বারাই সেই ত্রিভুবনাধার দেবের পূজা করা সদা বিধেয়। তিনি চিদ্রূপ, বাহিরে সূর্য্যাদি প্রকাশেরও প্রকাশক, অন্তরে সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী ও অহম্ভাবের সার। উর্দ্ধাকাশ তাঁহার স্কন্ধ ও অধস্তনাকাশ তাঁহার পাদপদ্ম। (পৃথিবী আকাশে অবস্থিত, অর্থাৎ পৃথিবী আকাশের মধ্য বিতানে অবস্থিত। সে ভাবে উর্দ্ধতনাকাশ ও অধস্তনাকাশ বলা যায়।) দিঙ্মণ্ডল তাঁহার বাহু, ভূলোক ভবলোক জনলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি লোকসমূহ তাঁহার সেই হস্তবিধৃত আয়ুধ[৭।৯]। এবম্বিধস্বরূপ হইলেও তিনি হৃদ্‌পদ্মমধ্যে বিশেষরূপে প্রকাশমান হন। ইনি তমঃপারগামী ও স্বয়ং পার ও পর্য্যন্তরহিত[১০]। ইঁহারই অধঃ, উর্দ্ধ,

দিক্, বিদিক্, সর্ব্বত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, হরি, রুদ্র ও ঈশ প্রভৃতি অমরবৃন্দ শোভা বিস্তার করিতেছে[১১]। এই সকল ভূতবৃন্দ তাঁহার রোমাবলি, ও ইহার শক্ত্যাদিনামক ত্রিজগৎপরিচালক যন্ত্ররজ্জু তাঁহার বপুস্থ নাড়ী। প্রক্রান্ত পরম দেব এবম্বিধ প্রকারে সর্ব্বদা সাধু পুরুষের পূজনীয় [১২-১৩]। ইনি কেবলচিৎ, অনুভূতিময়, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বাশ্রয়। ঘট, পট, বট, শকট, নর, বানর, কুত্রাপি ইহার অবিদ্যমানতা নাই। শিব, ব্রহ্মা, হর, হরি, ইন্দ্র ও কুবের, এ সমস্তই ইনি। রূপভেদ গ্রহণে ইনি অনন্ত ও রূপভেদ পরিত্যাগে ইনি এক ও ইঁহার বিগ্রহও কেবল মাত্র মহাসত্তা[১৪।১৫]। যিনি জগজ্জালের বিবর্ত্তন করেন সেই কাল ইঁহার দ্বারপাল। (অভিপ্রায় এই যে, কালই চিত্তের অশুদ্ধি কালে প্রবেশ নিষেধ করে ও চিত্তশুদ্ধি কালে প্রবেশের অনুকূল হয়)। [১৬]। এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তাঁহারই মায়াযুক্ত একাংশভাগী হইয়া রহিয়াছে। সাধক এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, সকল প্রাণীর শ্রবণ, চক্ষুঃ, মস্তক ও হস্তপদাদি তাঁহারই মায়িক অবয়ব, অন্য কিছু নহে। সাধক এবং প্রকার চিন্তা বা ধ্যান করিবেন বটে, পরন্তু তাঁহার অসঙ্গাদ্বয়তা বিস্মৃত হইবেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার মননের অতীত, অথচ সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্ব সঙ্কল্পদাতা, সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ ও সমুদায়তঃ অদ্বিতীয়, এবম্বিধা চিন্তাও করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর, ধ্যানের পর, যথাবিধি অর্চ্চনা করিবেন। হে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ! অর্চ্চনার বিধানও বলি, শ্রবণ কর। এই আত্মদেব স্বাত্মসম্বিৎ দ্বারাই পূজিত হন, উপহার দ্বারা অর্থাৎ পুষ্পাদির দ্বারা পূজিত হন না[১৭।২২]। এই দেবের পূজায় ধূপ, দীপ, পুষ্প, অলঙ্কার, অন্ন, চন্দন, বিলেপন, কুঙ্কুম, কর্পূর ও ছত্র চামরাদি কিছুই প্রদান করিতে হয় না। একমাত্র অক্লেশলভ্য শীতল ও অনশ্বর স্বাত্মবোধরূপ অমৃত দ্বারাই ইনি পূজিত হন, এবং তাহাই তাঁহার ধ্যান ও তাহাই তাঁহার শ্রদ্ধা বা শুদ্ধা পূজা[২৩।২৫]। অনবরত স্বান্তঃস্থ বিশুদ্ধ-চিন্মাত্রসাক্ষাৎকার করাই পরম শিবের জ্ঞানিসম্মতা মুখ্যা পূজা। দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, পান, ভোজন, শ্বাস, প্রশ্বাস, স্বপ্ন, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, সকল কার্য্যেই শুদ্ধ সম্বিন্ময় হইবেক। পরমাস্বাদযুক্ত ধ্যানরূপ অমৃতে আপনিই আপন আত্মার পূজা করিবেক। একমাত্র ধ্যানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজোপহার। ধ্যানই অর্ঘ্য, ধ্যানই পাদ্য, এবং ধ্যানই পুষ্প, অধিক কি

বলিব, সমস্তই ধ্যানাত্মক, ইহা বিদিত হইবে[২৬।২৯]। ধ্যানামৃত উপহার ব্যতীত ইতর উপহারের দ্বারা আত্মলাভ হয় না। ধ্যান প্রভাবেই আত্মদেব প্রসন্ন হন ও তদ্দ্বারা ভোগসুখও লব্ধ হয়[৩০]। হে মুনে! এই আত্মদেব দেহরূপ গৃহে ভোগোপভোগ করিতেছেন। হে মতিমন্! ত্রয়োদশ নিমেষ ব্যাপিয়া ধ্যানামৃতের দ্বারা পূজা করিলে অতি মূঢ়ও গো দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক শত নিমেষব্যাপী পূজায় ততোধিক ফল লব্ধ হয়। অর্দ্ধ ঘটিকা কাল পূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় ও ঘটিকাব্যাপী পূজায় সহস্র অশ্বমেধের ফল হয়। ধ্যানই বলি, ধ্যানই উপহার ও ধ্যানই জপাদি[৩১।৩৪]। ধ্যানযোগে এক ঘটিকা কাল পূজা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। মধ্যাহ্ন কালে এই প্রকার পূজার ফল আরও অনেক অধিক। দিবসব্যাপিনী পূজার দ্বারা পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই পরম যোগ ও ইহাই শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া এবং ইহারই নাম পরম শিবের বাহ্য পূজা। এইরূপ পূজা যৎপরোনাস্তি পবিত্র ও সর্ব্ব পাপ বিনাশের হেতু। মনুষ্য যদি ক্ষণকালও এই পূজার যথাযথ অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে সে ইহলোকে সমস্ত লোকের পূজ্য হয় ও অবশেষে মুক্তি লাভ করে[৩৫।৩৭]।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

—○*()*○—

ঈশ্বর বলিলেন, যাহা যৎপরোনাস্তি পবিত্রকারক ও সর্ব্বপাপবিনাশক, সেই আত্মপূজনের ক্রম এক্ষণে বর্ণন করি, সাবহিত হও[১]। এই ধ্যানাত্মিকা পূজা গমন, অবস্থান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সকল সময়েই বিহিত। এই যে শরীরস্থ পরম শিব, পূজক ইঁহারই সদা ধ্যান করিবেন। ইনিই অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধি মাত্রের দ্বারা সমুদায়ের কর্ত্তা ও বোধয়িতা[২।৩]। ইনিই শয়ন, উত্থান, গতি, স্থিতি, স্পর্শন ও অস্পর্শন প্রভৃতির প্রযোজয়িতা ও ইনিই ভোগ সমূহের কর্ত্তা ও ভোক্তা। যে কিছু বাহ্য

পদার্থ সে সমস্তই এই জ্ঞানরূপী পরম শিবের নির্ম্মিত[৪।৫]। এই দেহ তাঁহার লিঙ্গ, এই লিঙ্গে তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক। (পদ্মাসনে বসিয়া সম্মুখ ভাগে প্রসারিত হস্ত ও অঞ্জলিবদ্ধ হইলে দেহটা দেখিতে শিব-লিঙ্গের মতনই হইবে)[৬]। চঞ্চল না হইয়া ও উদ্বেগশূন্য হইয়া প্রারব্ধ ভোগে স্থিত থাকিবেক, স্বাত্মজ্ঞানরূপ জলে স্নান করিয়া শুচি হইবেক, এবং ভাবিবেক, আমি নিত্যাববোধ স্বরূপ। এই নিত্যাববোধই শিব ও তদ্ভাবনাই তাঁহার পূজা[৭]। ঐ সময়ে মন যদি অন্ধকারে নিমগ্ন হয় তাহা হইলে আপনাকে সর্ব্বনভঃপরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল ভাবনা করিবেক। মন যদি পরিতাপে নিমগ্ন হয় তবে চন্দ্রমণ্ডল ধ্যান করিবেক। কি বাহ্যবিষয়িনী বুদ্ধিবৃত্তি, কি আন্তর্ব্বিষয়িনী মনোবৃত্তি, সর্ব্ববৃত্তিপ্রকটিত পদার্থ রাশির সহিত এই পূজ্য পরম শিব অনুস্যূত রহিয়াছেন অর্থাৎ ইনি সর্ব্ববুদ্ধিপ্রকাশক নিত্য সম্বিৎরূপে বিরাজ করিতেছেন ও মুখ নাসিকাদি পথে বাহিরেও আপনার অবভাস প্রাপ্ত করিতেছেন[৮।৯]। ইনি শব্দাদি বিষয়কে স্বাত্মানন্দ রসে সিক্ত করিয়া তাহা হইতে আপ-নিই আপনার আনন্দ রসের স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্রিয় ও মন এই দুটী তাঁহার অশ্ব, প্রাণ ও অপান ইঁহার রথ, বুদ্ধি ইঁহার গুহা অর্থাৎ গুপ্ত বাসস্থান[১০]। এই পরম শিব জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞাতা, কর্ম্ম সঙ্ঘের কর্ত্তা, ভোগ্য পদার্থের ভোক্তা ও জ্ঞান সমূহের স্মরণকারী[১১]। যাহা কিছু বিদিত সে সমস্তই ইঁহার অঙ্গ। ইনি বিষয়ভাবনা ও বিষয়ের অভাবনা এতদুভয় দ্বারা লক্ষিত হন। ইনি সূর্য্যাদি প্রকাশক পদার্থেরও প্রকাশক সুতরাং অত্যধিক ভাস্বর। এই সর্ব্বগামী পরম শিবকে বক্ষ্যমাণ প্রকারেও চিন্তা করিবেক। ইনি নিষ্কলও বটেন, সকলও বটেন, ইনি দেহেও আছেন, ব্যোমেও আছেন, রঞ্জিতও বটেন, অরঞ্জিতও বটেন, এবং ইনিই নিত্যসংবিৎ ও অনিত্য বা আগন্তুক সংবিৎ (জ্ঞান)[১২।১৩]। ইনি মনে ও মননে, প্রাণে ও অপানে, তথা তদুভয়ের অন্তরালে ও হৃৎ কণ্ঠ তালু ভ্রূ ও নাসা প্রদেশেও আছেন[১৪]। ইনি শৈব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ৩৬ তত্ত্বের সীমাস্থান ও উন্মনস্ত * অবস্থার অর্থাৎ

* মূলা প্রকৃতি ১ তৎপ্রভব তন্মাত্রা ৫, তাহাদের ধর্ম্ম ৫, স্থূল ভূত ৫, তাহা-দের বিশেষ গুণ ৫, জ্ঞান কর্ম্মভেদে ইন্দ্রিয় ১০, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, এই ৪ অন্তঃকরণ ও জীব ১, এই ৩৬ তত্ত্ব, শিব এ সকলের অতীত। যোগীরা যাহাকে

শিবযোগ প্রসিদ্ধ সবীজ সমাধির অতীত। ইনিই মনোরূপ পক্ষীকে শব্দাদি বিষয়ে প্রেরণ করেন[১৫]। ইনি ব্যবহারে বিকল্পী অর্থাৎ নানা বিশেষণ যুক্ত, পরন্তু নির্ব্বীজ সমাধিতে ও মোক্ষে নির্ব্বিশেষণ অর্থাৎ কেবল। অপিচ, ইনি বাচ্য ও লক্ষ্য এই দ্বিবিধ বাক্যার্থের বিষয়। তৈল যেমন তিলের সর্ব্বাবয়বব্যাপী, সেইরূপ, ইনিও সর্ব্বদেহীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী। সর্ব্ব-ব্যাপী হইলেও ইনি অন্তরস্থ অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে অদৃশ্য[১৬]। ইনি ভূত মাত্রার অতীত অর্থাৎ অমূর্ত্ত, অথচ ভূতমাত্রার দ্বারা কঠিন অর্থাৎ মূর্ত্ত। (ভূতগণের পরিণামে যে দেহ জন্মে, সে দেহও তিনি, অর্থাৎ দেহ তাঁহার অতিরিক্ত নহে)। দেহের এক দেশে যে হৃদ্‌পদ্ম, সেই হৃদ্‌পদ্মে ইনি রাজমান[১৭]। ইনি চিন্ময়, নির্ম্মল, অনিরবয়ব ও সাবয়ব কল্পনায় দক্ষ। ইহার স্বরূপ কেবল স্বানুভূতি, সে ভাবে ইনি প্রত্যক্ষ[১৮]। ইনিই প্রত্যক্‌চেতনা অর্থাৎ প্রতিশরীরস্থ নির্ব্বিশেষ আত্মচৈতন্য। এতাদৃশ স্বরূপ হইলেও ইনি আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হন, হইয়া ভোগ কামনা করেন ও ক্ষণমধ্যে কল্পনার দ্বারা বিষয় ও বিষয়ী হইয়া অথবা ভোক্তা ও ভোগ্য হইয়া তদ্রূপ দ্বিত্বে স্থিত হন[১৯]। সাধক এই অর্চ্চনা কালে ভাবিবেন যে, এই দেহ তাঁহারই পরিচারক সুতরাং হস্ত পদ কেশ নখ ও দন্ত প্রভৃতি অবয়ব তাঁহারই অবয়ব[২০]। পত্নীগণ যেমন উত্তম পতির সেবা করে সেইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি নানা উপচারে শিবরূপী আমার সেবা করে[২১]। মন আমার দ্বারপাল, সে আমাকে ত্রিজগতের সংবাদ দেয়, শুদ্ধিরূপিণী চিন্তা বা ধ্যান আমার প্রতীহারী অর্থাৎ দ্বার রক্ষক, আত্মবুদ্ধি আমার শক্তি, ক্রিয়া কৌশল আমার বরাঙ্গনা, বিবিধ জ্ঞান আমার বিচিত্র আভরণ, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আমার ক্ষুদ্র দ্বার, বুদ্ধি-ন্দ্রীয়গণ আমার বৃহৎ দ্বার, পরন্তু আমি সেই ও সেই আমি আকৃতি বর্জ্জিত পরিচ্ছেদরহিত ও অনন্ত বা অপরিসীম[২২।২৩]। একই আত্মা আমি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে স্থিত আছি। হে মুনিবর! যে সাধক এইরূপ লোকোত্তরী (অলৌকিক) আত্মচমৎকৃতি প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রত্যক্‌তত্ত্ব সাক্ষাৎকার অবস্থায় স্থিত হয়, সে সাধকের অন্তর দেবত্ব প্রাপ্তে অখিন্ন ও পরিপূর্ণ হয়। তাহার অস্তও হয় না, উদয়ও হয় না, সে রোষ তোষের অতীত হয়, তৃপ্তি অতৃপ্তি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহাকে কাতর করে

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলেন, শৈবেরা তাহাকেই উন্মস্তক অবস্থা বলেন।

না, সে কিছু বাঞ্ছাও করে না, কিছু ত্যাগও করে না, সে জীবন্মুক্ত ও সুন্দরাশয়। যাবৎ না দেহপাত হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অভিহিত প্রকারে দেবার্চ্চনায় রত থাকিবেক। বর্ণিত প্রকারের চিত্তত্বযুক্ত দেহই তাঁহার দেবতা, এই দেবতাকেই তিনি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতি বলা হইল) দিবারাত্র অর্চ্চনা করিবেন[২৫।২৯]। প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা; সর্ব্বত্র সম বুদ্ধির দ্বারা, ও যথা প্রাপ্ত ক্রমে এই চিদ্দেবতার অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। গন্ধপুষ্পাদি আহরণ বিষয়ে যত্ন অকর্ত্তব্য[৩০।৩১]। যাহারা ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত তাহারা ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যের ও যাহারা ক্ষত্র দেহ প্রাপ্ত তাহারা ক্ষত্র-বিহিত কার্য্যের দ্বারা এই চিদাত্মরূপ শোভন শিবের পূজা করিবেন[৩২]। অযত্নলভ্য ভক্ষ্য ভোজ্য অন্ন পান শয্যা আসন বিভব কান্তাসম্ভোগ বিলাস ও সুখ বিষয়ে পূজা বুদ্ধি উত্থাপিত রাখিবেন ও আধি ব্যাধি মোহ ও তজ্জনিত দুঃখকেও পূজোপহার অর্থাৎ আত্মপূজার উপকরণ বিবেচনা করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, সুখ কালে সুখে ব্যাসক্ত ও দুঃখ কালে দুঃখে উদ্বিগ্ন হইবেন না। ভাবিবেন, ইহাও আত্মদেবের পূজার দ্রব্য। চেষ্টা, চেষ্টাফল, জীবন, মরণ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, দারিদ্র্যদশা, রাজ্যপ্রাপ্তি, এ সকল প্রবাহপতিত অর্থাৎ প্রারব্ধানুসারে উপস্থিত, হইলে তৎসমুদায় পদার্থকে আত্মপূজার পুষ্প মনে করিবেন এবং কলহে কল্লোল, ললনায় উল্লাস ও রাগদ্বেষাদির বিলাস, এ সকলকেও পুষ্পবৎ জ্ঞান করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে যে সদাসর্ব্বদা সুশীতল মৈত্রী করুণা মুদিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিরাজ করে, সে ধর্ম্মের দ্বারাও এই আত্মশিব অর্চ্চনীয় [৩৩।৩৯]। যে শক্তির দ্বারা ক্রোধাদির দমন হয় সেই বিশুদ্ধা শক্তি এই আত্মদেবতা পূজার উত্তম দ্রব্য। অর্থাৎ ভোগলাম্পট্য পরিত্যাগ দ্বারা আত্মদেবতার উত্তম পূজা নির্ব্বাহিত হয়[৪০।৪১]। অনিষিদ্ধ ভোগ, নিষিদ্ধ ভোগের পরিত্যাগ, তথা রাগ বর্জ্জন অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বর্জ্জন, অন্যায্য যত্ন পরিত্যাগ ও ন্যায্য যত্নে শৈথিল্য, এ সকলও আত্মপূজার উপকরণ। বিনষ্ট বস্তুর প্রতি উপেক্ষা ও যাদৃচ্ছিকরূপে আগত বস্তুর গ্রহণ, বিকারে বিকৃত চিত্ত না হওয়া অর্থাৎ নির্ব্বিকার হওয়াও আত্মশিবের পূজা দ্রব্য। ইষ্টানিষ্ট উভয় বিষয়ে সমভাব থাকাও আত্মপূজার প্রধান উপকরণ। বলা বাহুল্য যে, সমগ্র চেষ্টায় ও সমগ্র বোধে যৎপরোনাস্তি সাম্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ সাম্যা-

বলম্বন পূর্ব্বক আত্মশিবের পূজারূপ ব্রতে রত হইতে হয়[৩৭।৩৮]। এই নিত্যাত্মপূজারূপ ব্রতের ব্রতীরা সর্ব্বং ব্রহ্ম এতদ্রূপ দৃষ্টিমান্ হন ও শুভাশুভ বিভাগ নগণ্য করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অথবা সর্ব্বত্র আত্মদর্শী হন[৩৯]। তাহাদের নিকট আপাতরম্য ও আপাততঃ দুঃসহ সমস্তই সমান। সেই আমি, এই আমি, আমিই অমুক, আমি নহি, এ বিভাগ ত্যাগ করিয়া, সমুদয়ের উপর ব্রহ্মবুদ্ধি নিশ্চল রাখিয়া শিবের পূজা বা শিবব্রত অনুষ্ঠান করিবেক। সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার পদার্থে সর্ব্বভাবে সর্ব্বাত্মক আত্মার অর্চ্চনা করিবেক। ইহা ভাল, তাহা ভাল নহে, এরূপ বিচার করিবেক না। পরন্তু যথোপস্থিত বিধানে নিত্য আত্মপূজা করিবেক[৪১।৪২]। অবাঞ্ছ হইয়া অর্থাৎ বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসমাগত ভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিবেক[৪৩]। উদ্বেগ ও তুচ্ছাতুচ্ছ জ্ঞান বর্জ্জিত হইবেক, অথবা সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবেক। কাল দেশ ক্রিয়া যখন যাহা বা যেরূপ উপস্থিত হইবে তখন সে সকলকে বিনা বিকারে গ্রহণ করিবেক। আত্মপূজার বিধান এই যে, রাগদ্বেষাদি চিত্তবিকারের কারণ সমূহকে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিভাগোক্ত দ্রব্য সমূহকে ও কটুতিক্তাদি স্বাদু অস্বাদু দ্রব্য নিচয়কে একই আত্মানন্দ রসে ভাবিত করিবেক। ভাবনা দৃঢ় হইলে তখন আর ঐ সকল ভেদ উদ্বোধিত হইবে না, সমস্তই তখন একই রস বলিয়া বিনিশ্চিত হইবেক। তখন ইহা কটু তাহা তিক্ত উহা কষায় এ ভাবের অনুভূতি থাকিবেক না। কেবল মাত্র একই মধুর ভাব অনুভূত হইতে থাকিবেক। আত্মাই মূল আনন্দ রস, তদ্দ্বারা যাহা যাহা প্লাবিত বা আচ্ছাদিত হইবেক, তাহা তাহাই আনন্দ রস বলিয়া গৃহীত হইবেক[৪৪।৪৭]। মন যদি আকাশের ন্যায় সাম্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই অবিকার ও অনায়াসময় ভাবকে আমরা মুখ্য দেবার্চ্চনা বলিয়া গণনা করি। সাধক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শীতল ও পরিপূর্ণচিত্ত হইবেন, স্বস্থ ও সমজ্যোতি হইবেন। যেমন প্রস্তরের ভিতরে ও বাহিরে প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছু নাই, সেইরূপ, সাধকও ভিতরে ও বাহিরে চিন্ময় হইবেন। সমুদায়ই চিৎ; চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিবেন না। অথবা স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় হইবেন[৪৮।৪৯]। যাহার অন্তর আকাশের ন্যায় নির্লেপ, রাগ বা রঞ্জনা রহিত, বাহিরে শাস্ত্রোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান উভয় ভাবেই তিনি শৈব অর্থাৎ সেই

ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানী, উপাসক ও প্রধান শিবপূজক[৬০]। অজ্ঞান মেঘের বিনাশে কামনা বিদ্যুতের ক্ষয় ও অহঙ্কার মিহিকার অভাব হওয়ায় জ্ঞানীর হৃদয় শরদাকাশের ন্যায় সুশোভন হয়[৬১]।

হে মুনে! তুমি এইরূপ উত্তমতার চূড়ান্ত পদে স্থিত হও। যথা—আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ সোমের ন্যায়, স্বপ্রকাশের আতিশয্যে সূর্য্যের ন্যায়, চঞ্চল মনোবৃত্তি নিবহের নিবৃত্তিতে একাত্ময় চেতনের ন্যায় ও শিশুদিগের ন্যায় বিকল্পবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানী হইয়া চিদাভাসের ও চিত্তের মূলীভূত স্বাত্মশিবসন্দর্শননিষ্ঠ হও। এইরূপ স্থিতিই উত্তমতার চূড়ান্ত ও ইহারই নাম জীবন্মুক্তি[৬২]।

তুমি সুখ দুঃখ ভ্রম পরিত্যাগ কর, মনোরথ সকল বর্জ্জন কর, করিয়া শরীরনায়ক স্বাত্মশিবের অর্চ্চনা কর, করিলে তাহাই তোমার মুখ্য শিব পূজা হইবেক[৬৩]।

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চত্বারিংশ সর্গ।

—০*()*০—

ঈশ্বর বলিলেন, তুমি যদি আত্মজ্ঞ হও, অন্তরে যদি চিন্মাত্রদর্শী হও, তাহা হইলে যাহা কিছু করিবে অথবা না করিবে, সমস্তই শিবার্চ্চনা বলিয়া গণ্য হইবে[১]। আত্মরূপী শিব তাহাতেই প্রসন্ন হন, তাহাতেই প্রকট অর্থাৎ আবরণশূন্য হন, কেননা তাহাই তাঁহার পারমার্থিক রূপ[২]। আত্মবিৎ সাধক জানেন যে, আত্মায় পরমার্থতঃ রাগদ্বেষাদি নাই, অথবা রাগদ্বেষাদি শব্দও আত্মায় প্রযুক্ত হয় না। যাহাতে ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হয়, সে সমস্তই আত্মা, আত্মা ছাড়া নহে[৩]। এই সকল অভিজ্ঞ লোক সম্পৎ বিপদ দৈন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা এ সমস্তই আত্মায় আরোপণ করা হইতেছে বলিয়া জানেন, সুতরাং সে সমুদায় পুষ্পাদি আরোপণের সদৃশ[৪]। সমস্ত আরোপিত বিজ্ঞান নিত্যাত্মার পূজা[৫]। যে কোন জাগ্রৎ প্রত্যয়, সমস্তই আত্মার রূপ[৬]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,

আত্মা আপনারই স্বরূপে বিস্মৃতের ন্যায় হইয়া আপনিই আপনাকে বিভিন্নের ন্যায় দর্শন করিতেছেন[৭]। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, শিব সর্ব্বাত্মক ও অনন্ত অথচ তাঁহার পূজ্য পূজক ও পূজা এই ত্রিবিধ বিভ্রম উদিত হইতেছে[৮]। হে ব্রহ্মন্! কল্পনা ব্যতীত ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট আকার অসম্ভব, সুতরাং আমি পূজক, ইহা পূজা ও তিনি পূজ্য, এ সকল সঙ্কল্প বা কল্পনা অবাস্তব ব্যতীত বাস্তব নহে[৯]। মালিন্যবর্জ্জিত আত্মদেব ঐ সকল ভেদ ক্রমের দ্বারা বাস্তবতঃ পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। যাঁহা হইতে জগত্রয় বিসৃত হয় তাদৃশ ঈশ্বরের আবার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি কি? অথবা নির্দ্দিষ্ট নামই বা কি[১০,১১]? যাহারা জানে, পরমেশ্বর দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ এক প্রকার পরিমিত পদার্থ, সেই সকল লোকই আমাদের উপদেশ্য। পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের কেহই আমাদের উপদেশ্য নহেন[১২]। তুমি পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি পরিত্যাগ ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান আশ্রয় কর, শান্ত স্বস্থ ও রাগাদি রহিত হও, হইয়া যথোপস্থিত সুখ দুঃখ শুভাশুভরূপ পুষ্পের দ্বারা আত্মাকে অর্চ্চনা করতঃ স্থিত হও[১৩,১৪]।

যে ব্যক্তি আপনাকে শুদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়াছে, সেই পুরুষই সাধু। ঈদৃশ সাধু পুরুষে অমানিত্ব ও অদাম্ভিকত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ জন্মে, পূজ্য পূজক পূজাদি বিচার উৎপন্ন হয় না, সেই জন্য তিনি মায়াতৎকার্য্যের অতীত হন সুতরাং তাঁহাতে সুখ দুঃখাদি কলঙ্কের চিহ্ন পর্য্যন্তও সংলগ্ন হয় না[১৫]।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ সর্গ

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে দেব! যদি ঈশ্বরের কোন আকৃতি না থাকে এবং যদি তিনি সত্যি সত্যই অব্যপদেশ্য হন, নামের অযোগ্য হন, তাহা হইলে শিব, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, এ সকল নাম কিরূপে হইল? গুণ অথবা ক্রিয়া প্রভৃতি অনুসারেই নাম জন্মে, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়

ও নিরাকার বস্তুর নাম কি অনুসারে প্রবৃত্ত হইল? কেহ তাঁহাকে সৎ বলে, কেহ ন কিঞ্চিৎ বলে, কেহ শূন্য বলে, কেহ বা বিজ্ঞান বলে, এ সকল ভেদই বা কিরূপে প্রসিদ্ধ হইল[১,২]?

ঈশ্বর বলিলেন, একই পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, আভাস নাই, এবং যাহা কেবল অস্তি-আছে-এতদ্রূপে গোচরিত হয় ও কেবল অস্তি স্বরূপ বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বলাও যায় তথা ইন্দ্রিয়গণের অগম্য বলিয়া ন কিঞ্চিৎ বলাও যায়[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ঈশান! যদি তিনি বুদ্ধ্যাদির দৃশ্য না হন তাহা হইলে সাধকগণ কি উপায়ে তাঁহাকে দর্শন করেন? তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন[৪]?

ঈশ্বর বলিলেন, উপায়জ্ঞ রজক (ধুপী) যেমন এক মলের দ্বারা অপর মল ক্ষালন করে সেইরূপ সাধকও এক অবিদ্যাংশের দ্বারা অপর অবিদ্যাংশ বিদূরিত করেন। এক সাত্ত্বিকাংশ মুমুক্ষু হয় অপর সাত্ত্বিকাংশ গুরু শাস্ত্রাদি হয়, মুমুক্ষু তদ্দ্বারা সমুদায় আত্মমল অবিদ্যা বিদূরিত করতঃ স্বপ্রতিষ্ঠ বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন[৫।৬]। উক্তরূপে আত্মা আপনার দ্বারাই আপনাকে দেখেন ও উদ্ধার করেন। অর্থাৎ অবিদ্যা ক্ষয় হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয়, ইহা আত্মারই 'স্বভাব'। অবিদ্যাংশের দ্বারা অবিদ্যা ক্ষয়ের দৃষ্টান্ত অঙ্গার দ্বারা অঙ্গারের ক্ষয়। অর্থাৎ শিশুরা ক্রীড়া কৌতুক প্রসঙ্গে ২ খণ্ড অঙ্গার লইয়া এক খণ্ডের দ্বারা অপর খণ্ডের ঘর্ষণ করে, ক্রমে দুই খণ্ডই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও তদ্দ্বারা[৭] হস্ত-নৈর্ম্মল্যও জন্মে[৮]। অতএব, শাস্ত্ররূপ অবিদ্যাভাগের সাহায্যে চিদাত্মার বিচার আরম্ভ করিলে ক্রমে শাস্ত্ররূপ সাত্ত্বিক অবিদ্যাভাগ ও অজ্ঞান-রূপ তামস অবিদ্যাভাগ উভয় ভাগই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তৎপরে আত্ম-নৈর্ম্মল্য জন্মে[৯]। আত্মা আপনি আপনাকে দেখেন, বিচার করেন, বিচারের সিদ্ধান্তে জানেন যে, কেবল আত্মাই আছেন, অবিদ্যা নাই। অবিদ্যা নাই, এতদ্রূপ নিশ্চয় হওয়ার নাম অবিদ্যা ক্ষয়[১০]। গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ, এ সকল আত্মাও নহে, আত্মজ্ঞানের বাস্তব হেতুও নহে[১১]। গুরু দৃশ্য বা দৃষ্ট পদার্থ, সেজন্য তিনি স্বরূপতঃ আত্মলাভের হেতু নহেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ক্ষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেজন্য তাহা ইন্দ্রিয়াতীত। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই আত্মা ও ব্রহ্ম[১২]। হে দ্বিজ! আত্মা বা ব্রহ্ম

স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইলেও তজ্জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত গুরূপদেশাদি ক্রিয়া ক্রম আশ্রয়ণীয়। গুরূপদেশাদি ক্রমের অনুষ্ঠানে শিষ্যের বোধ জন্মে, তাহাতেই অনির্দ্দেশ্য ও অদৃশ্য আত্মা স্বতঃই প্রসন্ন অর্থাৎ সাক্ষাৎকৃত হন। মলাবরণ ক্ষয় হইলে আত্মা আপনা আপনি প্রকাশিত হন, শাস্ত্রার্থের বোধ ও গুরুর উপদেশ তাহাতে উপলক্ষ্য মাত্র[১৩,১৫]। ঐ উপলক্ষ্য ব্যতীত আত্মা অববুদ্ধ হন না। গুরু, তাঁহার উপদেশ, তৎশ্রোতা শিষ্য, এই সকলের সংযোগে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়[১৬,১৭]। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ক্ষয়ে যে ক্ষণভঙ্গুর বা নশ্বর সুখ দুঃখের উৎপত্তি স্থগিত হয়, হইলে তৎকালে যাহা অবশেষিত অর্থাৎ অক্ষয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম শিব, আত্মা ও সৎ প্রভৃতি[১৮]। যাহাতে এই সকল দৃশ্যের কিছুই নাই, অথবা যাহা এই বিশ্বাকারে অবস্থিত, কিম্বা যাহা নির্ব্বিশেষ সত্তা বা কেবল সত্তা, তাহা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ ও অনন্ত। মুমুক্ষুগণ, মনোমুক্ত মনীষিগণ, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও রুদ্র প্রমুখ দেবতাগণ ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞগণ মুক্তির নিমিত্ত তথা জীবন্মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত, উপাসকদিগের বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ প্রচারের নিমিত্ত, বেদসিদ্ধান্ত স্থাপনের নিমিত্ত, সেই অনন্ত বস্তুতে চিৎ, ব্রহ্ম, শিব, আত্মা, ঈশ্বর ও পরমাত্মা, প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়াছেন [১৯,২৩]। ইহাই জগত্তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। যাহা জগত্তত্ত্ব তাহাই আত্মতত্ত্ব ও তাহাই শিবতত্ত্ব। হে বশিষ্ঠ! শিব, আত্মা, পরব্রহ্ম, এই সকল শব্দের দ্বারা যে ভেদ প্রতীত হয় সে ভেদ বাস্তব নহে, কাল্পনিক। কিন্তু সে কল্পনাও পুরাতনপ্রসূত অর্থাৎ পূর্ব্ব গুরুদিগের কল্পিত। হে মুনিনায়ক! জ্ঞানী নর সদা এতদ্রূপ দেবার্চ্চনা করেন বলিয়া আমরা যে পদের ভৃত্য সেই পদ প্রাপ্ত হন[২৪,২৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবন্! এ সকল না থাকিলেও থাকার মত দেখায় কেন? তাহা আমাকে সংক্ষেপে বলুন[২৭]।

ঈশ্বর বলিলেন, যাহা ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের অর্থ তাহা কেবলা সম্বিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। পরমাণুর নিকট সুমেরু যেরূপ স্থূল, সেই চিৎ পদার্থের নিকট আকাশ সেইরূপ স্থূল। বলা বাহুল্য যে, জড়ের সূক্ষ্মতা ও চিতের সূক্ষ্মতা একরূপ নহে, অত্যন্ত প্রভেদযুক্ত[২৮]। চিৎ এই নাম সেই সময়ে কল্পিত হয় যে সময়ে তাহা চেত্যকল্পনার দিকে দোলীকৃত

হয়। তৎপূর্ব্বে তাহা নির্ব্বিকার নিরাকার ও নির্নাম। সমাধিপ্রসিদ্ধ চিদানন্দৈকরস স্বভাবে তাহা স্থিতা থাকে[২৯]। যে-ই তাহা বেদ্য কল্পনায় উন্মুখী হয় সেই তাহা অহন্তার অনুগামিনী হয়। দেশকালাদি কল্পনা উক্ত অহংকল্পনার সখী। সম্মিলিত সেই সকল কল্পনার সমষ্টি জীব[৩০-৩২]। এই জীবশক্তির বিলাস বা প্রধান কার্য্য নিশ্চয়, যাহার অপর নাম বুদ্ধি[৩৩]। এই জীব শব্দশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির অনুগামী[৩৪]। ঐ সকল সমূহই স্মৃতির অর্থাৎ স্মরণশক্তির মেলনে মন। এই মনই যৎপরোনাস্তি বৃহৎ সঙ্কল্প বৃক্ষের বীজ ও আতিবাহিক দেহ, এই উক্তির বিষয়। এই সকল সমূহের অন্তরস্থ যে ব্রহ্মশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি, তাহারই ব্যাপ্তিতে জ্ঞাতা ও প্রমাতা। এইরূপ আন্তর কল্পনার দ্বারা বাহিরে সেই সেই দৃশ্যের কল্পনা উদিত হয়[৩৫।৩৭]। স্পন্দশক্তি বায়ুর সত্তার, স্পর্শশক্তি ত্বক্‌সত্তার, তেজঃশক্তি চক্ষুঃসত্তার বা রূপসত্তার, জলশক্তি স্বাদসত্তার ও মৃত্তিকাশক্তি সেই সেই কল্পিত গন্ধসত্তার কারণরূপে ব্যবস্থিত হয়[৩৮।৩৯]। এবংক্রমে অতি মহতী ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডসত্তা ব্যবস্থিত হইয়াছে ও এই ব্রহ্মাণ্ডসত্তা সর্ব্বসত্তার আঢ্য। বীজ যেমন উত্তরোত্তর পরিণামী অঙ্কুর কাণ্ড শাখা পত্র ও পুষ্পাদি ক্রোড়ীকৃত করিয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ কথিত ও অকথিত প্রকারের সত্তাগণ (অস্তিতা বা শক্তিসমূহ) ক্রোড়ীকৃত অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া প্রাগুক্ত মূলসত্তা স্থিতি করে, পরে সেই সত্তা হইতে উত্তরোত্তর পরিণামে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার বা শক্তির উদয়ে বীজ হইতে বৃক্ষের ন্যায় এই অতি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড উদিত হইয়াছে[৪০।৪১]। যাহার ক্রোড়ে ঐ সর্ব্বসত্তা, তাহারই সংজ্ঞা পুর্য্যষ্টক ও প্রকারান্তরে দেহত্রয় এবং তাহারই সংস্কার ভাব আতিবাহিক দেহ। অপার অপর্য্যন্ত বোধময় ব্রহ্ম কথিত বিভাগে প্রকাশ পাইতেছেন। এই যে উৎপত্তি ক্রম, এ ক্রম অজ্ঞান দৃষ্টিতে, নচেৎ জ্ঞান দৃষ্টিতে এ সকল আরোপ মাত্র, অর্থাৎ কল্পনা মাত্র। তত্ত্বজ্ঞগণ জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখেন ও জানেন, কোনও কিছু হয় নাই অর্থাৎ জন্মে নাই[৪২,৪৩]। জলে যেমন জলদ্রব্যের বিলাস, সেইরূপ ব্রহ্মেও ব্রহ্মের বিলাস। এ সকল ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে[৪৪]। যে হেতু দৃশ্য সকল সম্বিদের সহিত একলোল, অর্থাৎ সম্বিৎ ছাড়া হয় না, অথবা সম্বিৎ হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিতে গেলে এ সকল নাস্তি হইয়া

যায়, সেই হেতু এ সকলকে সঙ্কল্পনগরের ন্যায় নাস্তি বলা যায়[৫]। যদি এ সকলকে সম্বিৎ বলিয়া জানা যায় তাহা হইলেই এ সকল শিব ব্যতীত অন্য প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব, অজ্ঞাত অবস্থা-তেই এ সকল বস্তু, জ্ঞাত অবস্থায় বস্তুরও অতীত[৬]। যাঁহারা ভাবেন বা বলেন, সেই চিন্মাত্রস্বভাব পরম সূক্ষ্ম পরমাত্মাই আপনাতে আপন কল্পনায় এই সকল অংশাংশিভাবাক্রান্ত দৃশ্যমণ্ডল দর্শন করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের মতে এ সমস্ত বাহিরে নহে, সমস্তই অন্তরে, তাহাদের মতেও অদ্বয়াত্মবাদ সুদৃঢ়। এই যে স্থূল ভাব, এ ভাব চিরাভ্যস্ত দৃঢ় সংস্কা-রের প্রভাবে, অর্থাৎ অন্তরস্থ ভাবনাময় সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ডক্রমাভ্যাসের দ্বারা স্থূলভাবান্বিত ও বহিঃস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়[৭,৮]। বাহিরে রূপাদি সত্তা দর্শনের দ্বার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। এবং আন্তরস্থ পুরুষোল্লেখী অহঙ্কারের (আমি মনুষ্য বা পশু, এই সংস্কারের) সহিত হস্তপদাদি অবয়ব সঙ্ঘাতের একসমাবেশ ভাবনায় আমি পুরুষ, আমি মনুষ্য, আমি পশু, এতদ্রূপ জ্ঞানব্যবহার ও তদনুগত হর্ষাদিব্যবহার সম্পন্ন হয়[৯]। সত্য দেহ না থাকিলেও জীবদবস্থায় দেহ দর্শনের ব্যাঘাত হয় না। যেমন গন্ধর্ব্বনগর নাই, স্বাপ্ন মনুষ্যও নাই, অথচ ভ্রমের দ্বারা গন্ধর্ব্বনগর ও নিদ্রাদোষের দ্বারা স্বাপ্ন মনুষ্য দৃষ্ট হয়, তেমনি, কোনরূপ দেহ না থাকিলেও ভ্রমের দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইতে পারে[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগৎ গন্ধর্ব্বনগরের ও স্বাপ্নদৃষ্ট নরের ন্যায় কল্পনাময় হইলেও দুঃখপ্রদ, পরন্তু দুঃখ ক্ষয়ের উপায় কি তাহা আমাকে বলুন[১১]।

ঈশ্বর বলিলেন, বাসনার প্রভাবে দুঃখ জন্মে, সুতরাং যাহাতে বাসনা বিনাশ হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। বাসনা বিনাশ দৃঢ়তর মিথ্যাত্ব বোধ ব্যতীত সামান্যতঃ মিথ্যা এই বচনের দ্বারা হইবে না। তদ্‌বিষয়ের যুক্তি এইরূপ—

বাসনা থাকিলেই দুঃখ হয় ও বিদ্যমান পদার্থেই বাসনা জন্মে, পরন্তু জগৎ মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় অবিদ্যমান[১২]। সুতরাং স্থির করা উচিত—বাসনাও নাই, বাস্যও নাই ও বাসকও কিছু নাই। কবে ও কোথায় কোন্ স্বাপ্ন নর কোন মৃগতৃষ্ণা জল পান করিয়াছে? দ্রষ্টা, অহন্তা, মন ও মনন সম্বলিত জগৎ যখন নাই, তখন প্রকৃত পক্ষে

তাহার বাসনাও নাই[৩৩]।[৩৪] কেবল এক সৎ-ই আছে, যাহাতে বাস্ত সত্যতঃ বাসক ও বাসনা কোনও প্রভেদ নাই[৩৫]। যে জানে, এক পারমার্থিক সত্য ব্যতীত ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্য নাই, সে কেবল কৈবল্যই জানে, সুতরাং তাহার দুঃখাদি উদ্বেগও থাকে না[৩৬]। বেতাল যেমন কেবল শূন্য, সেইরূপ এই জগৎ নামক বাসনাও কেবল শূন্য। ইহার উদয়াদি বেতালের ন্যায় কল্পনাময় সুতরাং অসৎ। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিলেই শান্তি অক্ষয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়[৩৭]। অহংএ, জগতে ও মৃগতৃষ্ণা জলে যাহার আস্থা, সে মনুষ্যকে ধিক্, এবং সে মনুষ্য উপদেশের পাত্র নহে[৩৮]।

তত্ত্ববিদ্গণ বিবেকী পুরুষকেই তত্ত্বোপদেশ করেন, অজ্ঞানোন্মত্তদিগকে উপদেশ করেন না। যে ব্যক্তি অজ্ঞের অনুশাসন করে সে পুরুষ স্বপ্ন দৃষ্ট পুরুষে কন্যা প্রদান করার ফলভাগী হয়[৩৯]।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে ভগবন্! সৃষ্টারম্ভ কালে জীবের প্রথমতঃ দেহ জন্মে; তৎপরে কি হয় তাহা আমাকে বলুন[১]।

ঈশ্বর বলিলেন, জীব সেই পরাৎপর ব্যোমে (চিদাকাশে) পূর্ব্বোক্ত ক্রমে এই সকল সম্পন্ন হইতে দেখে। সে দর্শন স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ[২]। চিৎ পদার্থ সর্ব্বগত, সর্ব্বত্রাবস্থিত ও সর্ব্বশক্তিমান্, সেইজন্য তাহা হইতে সর্ব্বসৃষ্টি অসম্ভব হয় না। যেমন স্বাপ্ন নর স্বাপ্ন জগৎ সৃজন করে, তন্মধ্যে রথ গজ তুরঙ্গাদি সন্দর্শন করে, তাহার ন্যায় সেই আদি শরীরী জীবও আপনাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। যে রূপে সৃজন করেন সে রূপ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে[৩]। সেই প্রথম পুরুষ কোন কোন সৃষ্টিতে (হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা) সনাতন, অহং, অব্যক্ত, পুরুষ, এই সকল নামে প্রথিত। কোন কোন সৃষ্টিতে সদাশিব, কোন কোন সৃষ্টিতে

বিষ্ণু, কোন কোন সৃষ্টিতে পিতামহ ও কোন কোন সৃষ্টিতে অন্যান্য নাম অর্থাৎ কালী দুর্গাদি নাম প্রাপ্ত হন। যাহাই হউক, সদাশিব নামধেয় প্রথম পুরুষ কেবল সঙ্কল্পময়, অর্থাৎ মায়িক সঙ্কল্পরূপী থাকেন, তৎপরে তদীয় সেই সকল সঙ্কল্প সূক্ষ্ম ভূতাদি সৃষ্টির দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। পরিপুষ্ট হওয়ার পর ইনি সমষ্টি মনোরূপে স্থিত হন। ব্যষ্টি মন সকল সমষ্টি মনেরই অন্তর্গত। এই ব্যষ্টিসমষ্টিমনোরূপী হিরণ্যগর্ব্ভাদি মূর্ত্তি যে যে ভুবনের ও যে যে প্রজাদির কল্পনা করেন, সেই সেই ভুবন ও সেই সেই প্রজাদি তাঁহার দর্শনে তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত ও ব্যবহার যোগ্য হয় ৪।৭। অতএব, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রম দৃষ্টিতে সং অর্থাৎ আছে এতদ্রূপ প্রতীতির গোচর হয় ও তত্ত্বদৃষ্টিতে এ সকল যেন আছে অর্থাৎ না থাকিলেও থাকার মত, এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয় হয়। অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টিতে এ সকল থাকিলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে ও ভ্রান্তিজ্ঞানে এ সকল সত্য সত্যই আছে, এইরূপ বিচারণা হইতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, অহংএর ও জগতের রূপ ও গতি উক্ত প্রকারে সত্যাসত্যরূপা এবং উক্ত রীতিতেই সেই আদিপুরুষ স্বসৃষ্ট পদার্থের দ্রষ্টা হন, স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া নিমেষমধ্যে চিদাকাশমাত্র হন, তথা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিমেষমধ্যে অপার সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হন৮।৯। যাহাকে কল্প বলা যায়, কল্পনার প্রভাবে তাহাও নিমেষ এবং যাহাকে নিমেষ বলা যায়, তাহাও কল্পনার প্রভাবে কল্প; অর্থাৎ যেমন কল্পনা, সেইরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়া থাকে১০। প্রতিভাসেরই বৈপরীত্যে পরমাণু, ব্যোম, ক্ষণ, কল্প, মহাকল্প ও ভাব, অভাব সম্পন্ন হইতেছে১১। এই সকল বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি কেবল জীব-বাসনানুসারী, সুতরাং দর্শন ও অদর্শনাদি ব্যবহার জীবগণের বাসনানুরূপে সম্বাদী অর্থাৎ সত্য। অতএব, দর্শন কথার অর্থ—রূপবিশেষের কল্পনা এবং অদর্শন কথার অর্থ—রূপবিশেষের অকল্পনা। সুতরাং যাহাকে অদৃশ্য বলা যায়, তাহাও অধিষ্ঠানাংশে সত্য১২।১৩। সেই আদি সৎ বস্তুই কল্পনা দ্বারা সদ্রূপী ও অসদ্রূপী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন। যেমন শৈল না থাকিলেও স্বাপ্ন কল্পনায় শৈল হয়, সেইরূপ। সুতরাং সৃষ্টির জন্য কল্পনা ব্যতীত স্বরূপতঃ দেশ, কাল, কর্ত্তা, কিছুরই আবশ্যক হয় না। কাল্পনিক বলিয়া এ সকল স্বরূপতঃ সৎও নহে, অসৎও

নহে, হয়ও না ও যায়ও না[১৪।১৫]। সমস্তই চিন্ময় আত্মার সঙ্কল্পেরই উল্লাসে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হয়[১৬]। তজ্জন্য দেশ ও কাল প্রভৃতি আক্রান্ত হয় না। সঙ্কল্পরচিত শৈল কি কখন স্থান ও কাল অপেক্ষা করে[১৭]? স্থানাদি প্রতীত হইলেও তাহা সঙ্কল্প ব্যতীত বাস্তব নহে[১৮]। যেমন, দেশকালাদি বস্তুকল্পে অসৎ অর্থাৎ নাই, তেমনি, সমুদায় জগৎও বস্তুকল্পে অসৎ অর্থাৎ নাই; সেই আত্মানামক পুরুষই সংকল্প দ্বারা এ সকল করে ও করিয়াছে। সেই আত্মানামক পুরুষই স্বসঙ্কল্প দ্বারা কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম। কি উচ্চ কল্পে রুদ্র, কি নীচ কল্পে তৃণ, সমস্তই স্বস্ব সঙ্কল্পের মহিমা। সঙ্কল্পের বা বাসনার সূক্ষ্মতায় অণু এবং তাহারই বৈপুল্যে মহৎ[১৯।২১]। ইহাই সংসার-মায়ার ক্রম এবং অভ্যাস দ্বারা উক্ত ক্রমের উপশান্তিই শিব। চিৎশক্ত্যাত্মক শিব যদি নিমেষের শত ভাগের একভাগ কাল স্বরূপবিস্মৃত হন অর্থাৎ বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিতে স্থিত হন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাহাতেই অনন্তকল্পবিস্তৃত অনর্থের উদয় হয়। অতএব, তিনিই সংসারিরূপেও জ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌রূপে প্রথিত হন। অপিচ, তিনিই ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হন। যেমন যেমন মিথ্যাভিমানের অর্থাৎ স্থূষ্টিসঙ্কল্পের বৃদ্ধি ও তদনুযায়িনী সৃষ্টি আবির্ভূত হয়, তেমনি তেমনি চিদ্‌বিদ্যোতনের হ্রাস হইয়া থাকে। দেখাও যায় পরিচ্ছেদাধিক্য ক্ষুদ্রতার আধিক্য[২২।২৩]। হে সাধো! মিথ্যা দিক্ দেশ কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদ দ্বারাই আত্মার ক্ষুদ্র মশকাদি ভাব, বৃহৎ হস্ত্যাদি ভাব, শ্রেষ্ঠ দেবাদি ভাব ও অশ্রেষ্ঠ অসুরাদিভাব উপস্থিত হইয়া থাকে[২৬।২৭]। বিশ্ব এবম্প্রকার সদসৎ রূপে প্রথিত, তন্মধ্যে যাহা সৎ তাহাই বিশ্বকারক ও বিশ্বব্যাপী। তাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন, তিনি দূরে নহেন, নিকটে নহেন, ঊর্দ্ধে নহেন, অধঃও নহেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং তিনি সৎ অসৎ উত্তম অধম মধ্যম, এ সকল পদের অতীত বা অবাচ্য[২৮]। এ বিষয়ে স্বানুভব ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই। যে হেতু, অন্য প্রমাণ সেই পরম চিতে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় কল্পিত, সেই হেতু, লৌকিক অন্য প্রমাণ বারিতে বহ্নির ন্যায় তাঁহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না[২৯]।

হে মুনিবর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করিলাম। শুনিয়া অবশ্যই তুমি মদুক্ত

বচনাবলীর অর্থ বোধগম্য করিয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে আমরা যথাভিমত প্রদেশে গমন করি[৩০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ নীলকণ্ঠ আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলে, আমি তাঁহার চরণোপরি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। অনন্তর তিনি পরিবার সহ গগন-কোটরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই ত্রিভুবন নাথ উমাপতি গমন করিলে পর, আমি ক্ষণকাল তাঁহার উপদেশসকল পর্য্যালোচনা করিলাম, এবং বুঝিলাম ও ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম যে ভগবদাদিষ্ট শিবার্চ্চনই শ্রেষ্ঠ, জড় দেবার্চ্চন অশ্রেষ্ঠ। অপিচ, ঐরূপ জ্ঞানলাভ অবধি আমি বাহ্যোপচারের আহরণ ও জড়দেবার্চ্চন পরিত্যাগ করিয়াছি[৩১।৩২]।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সেই ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও তদনুরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জগৎ যেরূপে অবস্থিত, তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ[১]। ইহা যাহাতে ও যৎকর্ত্তৃক মিথ্যা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা সেই ভ্রমরূপিণী মায়া—তদুপহিত জীব। অতএব, অলীক পদার্থেই অলীক জীব কর্ত্তৃক অলীক জগৎ দৃষ্ট হয় ও তাদৃশী সংসার মায়াকে অসদসদ্রূপিণী বলিয়া বর্ণন করিতে পারি[২]। যেমন কোন কবি কোন রাজাকে তুমি কল্পবৃক্ষ, তুমি সুমেরু ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করে ও রাজাও আপনাকে তদনুরূপ বোধ করিয়া অভিমানধারী হয়, সেইরূপ এই আত্মরাজাও স্বরূপভ্রান্তি দ্বারা বর্ণিত ও বর্ণনানুরূপ অভিমানী হন[৩]। জলে দ্রবত্বের, বায়ুতে গতির ও আকাশে শূন্যতার অবস্থিতি যেরূপ, আত্মায় সৃষ্টির অবস্থিতিও সেইরূপ[৪]। অর্থাৎ কল্পনাজাল অজ্ঞায়মান আত্মারই স্বভাব। হে রঘুনাথ! পূর্ব্বোক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া অবধি আমি প্রোক্ত প্রকারে আত্মার

অর্চনা করিয়া আসিতেছি; অথচ যথোপস্থিত ব্যবহার অপরিত্যক্ত রহিয়াছে। আমি যথোপস্থিত ক্রিয়াকে ও যথোপস্থিত আচারকে আত্ম-দেবতার পূজোপকরণ পুষ্প মনে করি, তাহাতে সুষুপ্তি-কালেও আমার পূজা অবিচ্ছিন্না থাকে৬।৭। এমন কি, অজ্ঞ জীব আত্মার গ্রাহ্য গ্রাহক ভাব বিদিত নহে, সেই জন্য তাহাদের যথোপস্থিত ক্রিয়া ও আচার আত্মদেবতার পূজাস্থানীয় নহে, কিন্তু যোগীরা ঐ সকল তথ্য জানেন বলিয়া তত্তাবৎ তাঁহাদের নিকট পুষ্পসদৃশ পূজোপহার৮। হে রঘু-নায়ক রাম! তুমিও উক্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হও, আসক্তি পরিত্যাগ কর, ও এই সঙ্কল্পরূপ অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ কর৯। হে সুব্রত! ধননাশজ ও বন্ধুবিয়োগজনিত দুঃখ উপস্থিত হইবামাত্র তুমি ঈশ্বরোক্ত ও মদুক্ত জ্ঞান অবলম্বন করতঃ বিচারনিষ্ঠ হইবে১০। ধনাগমাদিজনিত সুখের ও তদ্বিয়োগাদিজনিত দুঃখের উদয় হইবামাত্র সে সকলকে তুমি মিথ্যা বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে অভ্যা-সের প্রভাবে আর তাহাদের উদয় হইবে না১১। সংসারের সকল পদা-র্থই নশ্বর ও তাদৃগ্ স্বভাববিশিষ্ট। হে রামভদ্র! তুমিও বিষয়নিব-হের বিচিত্রা গতি বিদিত আছ এবং এ সকল যেরূপে যায় ও আইসে, তাহাও তোমার অগোচর নাই১২। প্রেম (ভালবাসা বা বিষয়স্নেহ) ও ধন অবিচারপ্রসঙ্গেই আইসে, অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার বিচারপ্রসঙ্গে ঐ সকল মিথ্যা হইয়া যায়১৩। বলিতে কি, কোনওপ্রকার জগৎকার্য্য বস্তুতঃ তোমার অন্তরে নাই ও তুমিও এ সকলের মধ্যে নহ। তুমি বুদ্ধি-মোহ বশতঃ বৃথা পরিতাপ করিও না, জগৎক্রিয়ামাত্রেই তুচ্ছ১৪। যদি তুমি জগৎকে তুচ্ছ ভাবিতে না পার, তাহা হইলে ভাব, আত্মাই জগৎ। জগতে আত্মদর্শন করিতে পারিলে, তাহাতেও তুমি শোক ও হর্ষের অতীত হইতে পারিবে১৫। বৎস! রাম! তুমি চিন্মাত্র এবং এই জগৎও তোমা হইতে পৃথক্ নহে; অর্থাৎ জগৎও চিৎশক্তির অতিরিক্ত নহে। অতএব, ইহা হেয় ও তাহা উপাদেয়, এ কল্পনা উক্তবিধ জ্ঞানের দৃঢ়তায় বিনিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহার অন্যথা হয় না১৬। এ সকল জগদ্রূপ চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ, ইহাতে শোকের বা হর্ষের স্থিতি বা প্রবৃত্তি নাই১৭। আজ্ হইতে তুমি চিদেকরস ও চিদেকতান হও, ক্রমিক অভ্যাসে সৌষুপ্তিতেও তুর্য্যাবস্থায় স্থিত হও১৮।

তুমি প্রোক্ত প্রকারে আত্মপূজায় রত হইয়া পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া থাক[১৯]। তুমি মদুক্তিসকল শ্রবণ করিলে এবং তোমার বুদ্ধিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য কি শুনিবার বাঞ্ছা কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর[২০]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এখন আর আমার কোনও বিষয়ে সংশয় নাই[২১]। আমি সমুদায় জ্ঞাতব্য জানিয়াছি, উত্তমা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, দ্বৈতমল উন্মার্জ্জিত হইয়াছে, এবং কল্পনাও উপশান্ত হইয়াছে[২২]। ইতিপূর্ব্বে যে আমাতে অজ্ঞান-কলঙ্ক লিপ্ত হইয়াছিল, সে কলঙ্ক এক্ষণে অপগত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমার যে ভ্রান্তি ছিল, সে ভ্রান্তি এক্ষণে আর নাই। আমি এখন বুঝিয়াছি, আত্মা জরামরণাদি-বর্জ্জিত ও সদা নিষ্কলঙ্ক[২৩।২৪]। এখন আমার প্রতীতি হইতেছে, এ সমস্তই ব্রহ্ম। এখন আমি সকল সংশয়ের, সকল প্রশ্নের ও সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছার অতীত হইয়াছি[২৫]। আমার চিত্ত এখন অত্যন্ত নির্ম্মল, অত্যন্ত ভাস্বর ও সর্ব্বপ্রকারে নিরাকাঙ্ক্ষ। সুতরাং সুমেরু যেমন সুবর্ণাকাঙ্ক্ষী নহে, সেইরূপ, আমিও এখন নিরাকাঙ্ক্ষ। এমন কিছু নাই, যাহাতে আমার আশা ও ইচ্ছা জন্মিতে পারে[২৬।২৭]। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহা নাই, যাহা হেয় অথবা উপাদেয় হইতে পারে। হে মুনে! ইহা হেয়, তাহা উপাদেয় ও ইহা উপেক্ষ্য, এ বিভ্রম আমার অপগত হইয়াছে। আমি এখন স্বর্গ-বাঞ্ছাও করি না এবং নরক দ্বেষও করি না[২৮।২৯]। আমি এখন গতভ্রমণ মন্দরাচলের ন্যায় আপনাতেই আপনি স্থিতিলাভ করিতেছি[৩০]। ইহা অবস্তু, উহা বস্তু, এ বিভাগ যাহার হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) স্থিতি করে, নিশ্চয়ই সে কুসন্দেহ অনলে দগ্ধকল্প হয়। হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি জগৎকে উক্ত প্রকারে বিদিত হইয়াছে, জগতে এমন কিছু নাই, যাহা তাহাকে কার্পণ্য দশায় পাতিত করিতে পারে। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমি বিচিত্র-কোলাহলময় ও অস্তিতা-বর্জ্জিত জড়স্বভাব ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং সম্পদের ও বিপদের চরম সীমা কি, তাহা বিদিত হইয়াছি[৩১।৩৩]। যাহা সমস্ত বিকল্পের সার, তাহাতে আমি দীনতাবর্জ্জিত হইয়াছি। এখন আমি পরিপূর্ণ এবং আমার মনকে এখন আমি আশামাতঙ্গ দলনে ও সংসার-সমুদ্র-সন্তরণে মহাশূর বলিয়া গণনা করিতেছি[৩৪]।

হে ভগবন্! আমার মন এখন বিকল্পজাল পরিত্যাগ করিয়াছে, বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছে, দৈন্যতা ত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহা ত্রিজগতের সার ও প্রসন্ন বস্তু, আমার মন এখন তাহাতেই পরিপূর্ণ ও প্রমুদিত হইয়াছে[৩৬]।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, কেবল অর্থাৎ রাগরহিত ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসঙ্গরহিত মন দ্বারা যাহা করিবে, তাহা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে না; অর্থাৎ সেরূপ কর্ম্মের ফল কোনও প্রকার ভোগজনক নহে[১]। বস্তু যে সময়ে পাওয়া যায়, মাত্র সেই সময়ে তাহা তুষ্টিজনক হয়, পূর্ব্বে ও পরে তাহা তোষজনক হয় না, এ সত্য সকলেই বিদিত আছেন। বস্তুর তোষজনকতা যখন কেবলমাত্র বাঞ্ছাকালে, অন্য কালে নহে, তখন ইহাই বুঝা উচিত যে, বৈষয়িক সুখ মাত্রেই ক্ষণিক। এইরূপে যাহারা বিষয়-সুখের ক্ষণিকত্ব নিশ্চয় করিয়াছে, কি জন্য তাহারা ক্ষণিক সুখে আসক্ত হইবে? যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই বিষয়সুখে মগ্ন হয়, যাহারা জ্ঞ, তাহারা নহে[২।৩]। যখন দেখা যায়, বাঞ্ছাসমকালেই তুষ্টি অর্থাৎ সুখ, সদা বা অন্য কালে নহে, তখন এইরূপ অবধারণ করা উচিত যে, বাঞ্ছাই সে সকল সুখের কারণ এবং সে সুখের অবসান দুঃখময়। অতএব, হে রাম! তুমি বাঞ্ছা পরিত্যাগ কর[৪]। এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিবার কারণ এই যে, তুমি ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার অহম্ভাবরূপ পঙ্কে নিমগ্ন হইবে না[৫]। আত্মজ্ঞানরূপ উচ্চ পর্ব্বতে বিশ্রান্তিলাভ করিয়া পুনঃ অহংগর্ত্তে পতিত হওয়া উচিত নহে। আত্মজ্ঞতারূপ সুমেরু শিখরে স্থিতি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পাতাল-পতন স্বীকার অনুচিত[৬।৭]। তোমার স্বভাব সমতাময় ও সত্যতাময়। আমার মনে হইতেছে, তোমার বিকল্প ও তন্মূলীভূত অবিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে[৮]। হে রামচন্দ্র!

তুমি এখন স্বস্বভাবে স্থিত, তোমার মতি এখন নির্ম্মলা[৯]। তোমার আশা নিরাশা হউক, অভাব ভাব হউক ও মন অমন হউক, তুমি সঙ্গরহিত জীবন প্রাপ্ত হও[১০]। তুমি যে যে বস্তু দেখিবে ও যে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, সে সমুদায়কে তুমি চিদ্ঘন ব্রহ্মভাবে বৃংহিত করিবে[১১]। যদি তুমি আপনাকে বিদিত হইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্ত এবং বিদিত না হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বদ্ধ। অতএব, রঘুনাথ! তুমি আপনিই আপনাকে প্রবুদ্ধ কর[১২]। যাহাতে ভোগসুখ স্থান পায় না, প্রারব্ধানুসারে উপস্থিত দুঃখও যাহাতে সংলগ্ন হয় না, তাহাকেই তুমি বাসনা ক্ষয় বলিয়া জানিবে। এই নির্ব্বাসনতাকে সাম্য ও আকাশ-সদৃশ বলা যায়[১৩]। শত শত ঝঞ্ঝা প্রভৃতির তাড়নাতেও আকাশ যেমন সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, তেমনি, তুমিও বাসনাশূন্য অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য করিলে বিকার গ্রস্ত হইবে না[১৪]। জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই তিন্ বিভাগকেই যদি তুমি আত্মা বলিয়া জান, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সংসারাতীত হইবে[১৫]। বিষয়াকারা চিত্তবৃত্তির উদয়ে সংসারের উদয় ও তাহার অনুদয়ে সংসারের বিলয় হয়। অতএব তুমি বাসনা ও প্রাণের প্রচলন নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিবে[১৬।১৭]। অজ্ঞতার উন্মেষ ও অজ্ঞতার অনুন্মেষ কর্ম্মোদয়ের ও কর্ম্মনিবৃত্তির কারণ, সে জন্য তুমি গুরূপদেশ, শাস্ত্রতাৎপর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিয়া কর্ম্মকেও বিলয় কর[১৮]। যেমন, বায়ুর ও ধূলিকণার স্পন্দনে ও মালিন্যে আকাশের স্পন্দন ও মালিন্য প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ, চিত্তেরই বিষয়াকারা বৃত্তির উদয়ে আত্মার সক্রিয়ত্ব ও দৃশ্য-দ্রষ্টৃত্ব সম্পন্ন হইতেছে[১৯]। যেমন, আ-লোক ও কুড্য উভয় সম্পর্কে দ্রষ্টা বিচিত্রাকারের বর্ণ (রং) দর্শন করে, তেমনি, দৃশ্য দর্শনেরই সম্পর্কে জগদ্ভাবের প্রস্ফুরণ দৃষ্ট হইতেছে[২০]। যদি দৃশ্য দর্শন না হয়, তাহা হইলে এতদ্রূপ জগদ্ভাবও থাকে না[২১]। চিত্রিত মনুষ্যের কি হৃদয় থাকে? না কোনও প্রকার ভাবো-দয় হয়? মায়া কি? মায়া চিত্তেরই বিশেষ বিশেষ চাঞ্চল্যের সমষ্টি। সেই চাঞ্চল্যকে যদি নিরুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে মায়া থাকে না, নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জলের স্পন্দন বীচি; জল যদি স্পন্দিত না হয়, তাহা হইলে কি বীচি থাকে[২২]? বাসনা পরিত্যাগ ও প্রাণ নিরোধ এই উভয় দ্বারাই চিত্তের নিস্পন্দতা জন্মে[২৩]। সম্বিৎ নিস্পন্দ হই-

সেই চিত্তের চিত্ততা থাকে না ও তাহা প্রাণ নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে[২৪]। দৃশ্য দর্শনে অথবা তৎসম্পর্কে যে সুখ অভিব্যক্ত হয় সে সুখও ব্রহ্ম, এরূপ অবধারণ মনোলয়ের কারণ হইয়া থাকে অর্থাৎ মন ঐরূপ ভাবে পরিভাবিত হইতে হইতে স্বরূপ শূন্যের হয়[২৫]। যাহাতে চিত্তের অভ্যুদয় নাই অর্থাৎ যাহা চিত্তের দ্বারা জন্মে না, সেই সুখকে তুমি অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে[২৬]। চিত্তনাশজনিত অকৃত্রিম সুখকে তুমি বর্ণনার অতীত ও তারতম্যবর্জ্জিত বলিয়া জানিবে। তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই[২৭]। তত্ত্ববোধই চিত্তের নাশক ও অতত্ত্ববোধ তাহার জনক ও রক্ষক। সমূলে নাশ না হইলেও, তত্ত্ববোধ দ্বারা চিত্তের লয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা মিথ্যাভূত হইয়া থাকে। সুবর্ণীকৃত তাম্রকে যদি তাম্র বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে সুবর্ণাকারসত্ত্বেও যেমন তাহার সুবর্ণত্ব থাকে না, সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্ত থাকিলেও তাহা না থাকার ন্যায় হইয়া যায়। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞচিত্ত চিত্ত সংজ্ঞায় গণনীয় না হইয়া সত্ত্ব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়[২৮।৩০]। চিত্ত কোন বস্তু নহে অর্থাৎ সৎ পদার্থ নহে। চিত্ত এক প্রকার ভ্রান্তি বিশেষ। সে জন্য তাহা তত্ত্বজ্ঞানে দূরীভূত হয়। নিয়ম এই যে, যাহা সৎ, তাহার আত্যন্তিক অভাব হয় না[৩১]। বিকল্পময় চিত্ত অবস্তু অর্থাৎ শশশৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা। অতএব, চিত্ত হউক, আর চেত্য হউক, সমস্তই সদাত্মার বিবর্ত্তন অর্থাৎ আত্মারই মিথ্যা প্রতীতি। আর যে হেতু তাহা মিথ্যা প্রতীতি, সেই হেতু সত্য প্রতীতির উদয়ে তাহার বিলয় হয়[৩২]। উক্ত চিত্তাবস্থা সার্ব্বকালিক নহে, পরন্তু কিঞ্চিৎকালিক। অর্থাৎ যাবৎ না বিদেহমুক্তি বা কৈবল্যস্থিতি উপস্থিত হয়, তাবৎ ব্যবহার নির্ব্বাহক বলিয়া চিত্তের ব্যবহারিক সত্যতা মান্য করা যায়[৩৩]।

হে রঘুনাথ! ব্রহ্মই ব্রহ্মে স্বরূপ বিস্মৃতি বশতঃ এই সমস্ত ভুবন সন্নিবেশ দর্শন করিতেছেন। তিনি এক ও সমস্বভাব হইলেও স্বারোপ-ক্রমে অনেক ও অসম হইয়াছেন। অতএব, তিনি সর্ব্বস্বরূপ। আর যে হেতু তিনি সর্ব্বস্বরূপ সেই হেতু চিত্তাদি পদার্থও তিনি[৩৪]।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

——(*)——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! উপরি উক্ত বিষয় বিস্পষ্টরূপে বুঝা যায় ও উল্লাস জন্যে এরূপ একটী সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর[১]। এমন একটী বিম্বফল আছে—যাহা সহস্র যোজন ব্যাপ্ত সুতরাং বিপুল—যৎপরোনাস্তি বিপুল। কত যুগ যুগান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে, তথাপি উক্ত বিল্বফল জীর্ণ হয় নাই ও হইবে না[২]। উহার রস ও স্বাদ অত্যন্ত মধুর ও অবিনাশী। ইহা অনাদিসিদ্ধ অথচ পুরাতন হয় না। চিরকালই নূতন[৩]। অভিহিত বিল্ব ভুবনমধ্যগত মেরুর সদৃশ, মন্দরাচলের ন্যায় অচল ও কল্পান্তবায়ুর অবিচাল্য[৪]। ইহার বৈপুল্যের ইয়ত্তা নাই এবং ইহাই এই জগৎস্থিতির মূল[৫]। কোন উচ্চ পর্ব্বতের নিকট সর্ষপের কণিকা যেরূপ, এই বিল্বের নিকট ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ (অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র)।[৬]। হে রঘুনাথ! এই বিল্বফল হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহা অতি সুস্বাদু ও অতিচমৎকারজনক[৭]। সাধারণ বিল্ব পাকিয়া অধঃপতিত হয় কিন্তু এ বিল্ব পাকেও না ও পড়েও না। এ বিল্ব চিরপক্কই রহিয়াছে অথচ বিচ্যুত হয় না। অর্থাৎ পচিয়া যায় না। যাহারা অতি বৃদ্ধ, যাহাদের অধিক বৃদ্ধ নাই, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতিরা এই বিল্বের উৎপত্তি বিদিত নহেন। মূল কোথায়, বৃন্ত কোথায়, তাহাও বিদিত নহেন[৮।৯]। ইহার বীজ, অঙ্কুর, বৃদ্ধি, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড, কিছুই দৃষ্ট হয় না এবং ইহার উৎপত্তি ও বিকারাদি বা পরিণাম দেখা যায় না[১০।১১]। ইহা সমস্ত ফলের সার এবং এই মহাকৃতি ফলের মজ্জা ও অস্থি দুএর কিছুই নাই। ইহা নির্ব্বিকার ও নির্ম্মল—অত্যন্ত নির্ম্মল[১২]। যেমন প্রস্তরের মধ্য নীরন্ধ্র সেইরূপ ইহাও নীরন্ধ্র। ইহার রস অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর পরন্তু তাহা সংবিন্মাত্রের আস্বাদ্য[১৩]। ইহাই সকল সুখের কোষ। ইহা শৈলের ও পিণ্ডায়মান অমৃতের সহিত তুলিত হয়। কবিগণ ইহাকে স্বাত্মচমৎকার বলেন, সেই স্বাত্মচমৎকার এই বিল্বের পরম মজ্জা এবং ইহার

সন্নিবেশ অর্থাৎ গঠন অতি বিচিত্র। পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা ফলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ফল এই নামে কল্পিত হইয়াছে। এই ফল পরম সূক্ষ্ম, আবার অন্য ভাবে ইহা যৎপরোনাস্তি স্থূল[১৪।১৩]। যাহা নাই, এই বিল্ব অধ্যাস দ্বারা তাহা উৎপাদন করে। ইহা ভুবন, উহা ভবন, এ সকল ভেদ সত্যতঃ নাই। না থাকিলেও এই বিল্ব ঐরূপ কল্পনা করায়। আগে অহংএর উদয় হয়, তৎপরে ঐরূপ আভিমানিক সৃষ্টি হয়[১৭।১৮]। এই বিল্বের যে মজ্জা, তাহা স্বরূপ সম্বিদ্, সে স্বরূপ এ কদাচ পরিত্যাগ করে না। অথচ সে-ই এই সকল প্রসারিত করিয়াছে[১৯।২০]। যথা—ইহা ব্যোম, ইহা কাল, ইহা নিয়তি, ইহা ক্রিয়া, ইত্যাদি। এরূপ বাহ্যিক ভেদ ব্যতীত ইহা সঙ্কল্প, তাহা বিকল্প, ইহা আশা, ইহা ভ্রান্তি, ইহা রাগ ও দ্বেষ, ইহা হেয়, উহা উপাদেয়, তথা তুমি ও আমি, এইরূপ এইরূপ আন্তরিক ভেদ (ভিন্নভাব) বিস্তারিত করিয়াছে। উর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব্ব, পশ্চাৎ, সম্মুখ, পার্শ্ব, দূর, নিকট, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দবাচ্য অসংখ্য কল্পনা ঐ বিল্বের অন্তঃস্থ। কল্পনাময় অসংখ্য পদ্মের আকর স্বরূপ জীবসমূহ উক্ত বিল্বেরই অন্তর্ভূত। এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ মণ্ডপ ও তদন্তর্গত নানাবিধ ক্রীড়ামণ্ডপ উক্ত বিল্বে স্থিতি লাভ করিয়াছে। এই বিল্ব ভগবান্ হরির হৃদ্‌পদ্ম, যে পদ্ম অনন্ত কল্পনা-তন্তে পল্লবিত এবং যাহার কর্ণিকায় এই সকল লোক প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্মের কোটর মহারুদ্রাদির দ্বারা প্রপূরিত। ইহাতে বিষয়লম্পট স্বর্গি পুরুষ দিগের ও নারকী জীব দিগের গমনাগমন জন্য অতি বিস্তীর্ণ পথ প্রসারিত রহিয়াছে[২১।২৭]। এই জগৎ যেন একটী পদ্ম, তৎকর্ণিকা সুমেরু, তত্রস্থ মধু চন্দ্র, তত্রস্থ অমৃতের প্রত্যাশী দেবতারা এই পদ্মের ভ্রমর। ঈদৃশ পদ্মও বর্ণিত বিল্বের অন্তর্গত[২৮]। এই জগৎ একটী জীর্ণ বৃক্ষ, এই বৃক্ষের পুষ্প সত্ত্বগুণ বা স্বর্গ ও ইহার মূল রজোগুণ বা নরক[২৯]। ব্রহ্মসমুদ্রের তটে অবস্থিত এই যে অপার ও অসীম ব্যোম, এই যে সুকৃত দুষ্কৃতরূপ মহাভীষণ গ্রাহ, এই যে সৃষ্টিরূপ ঘোর আবর্ত্ত, এই যে কালরূপ মহাপদ্ম, এ সমস্তই বর্ণিত বিল্বের অন্তঃ-সন্নিবিষ্ট। ষড়্‌বিধ ভাববিকার, জরামরণাদি দশা, বিদ্যার ও অবিদ্যার বিলাস, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ, এ সমস্তই বিল্ব। বিল্ব ছাড়া কিছু নাই।

এই বিশ্বের নিজমজ্জা চমৎকার অর্থাৎ অতি বিস্ময়জনক বা অনির্ব্বাচ্য। ইহার সন্নিবেশ অর্থাৎ রচনা কেবল মাত্র সঙ্কল্প। ইহার স্থিতিও সঙ্কল্প। সঙ্কল্পে স্থিতি হইলেও ইহার অশান্তি নাই, অস্বাস্থ্য নাই, বাধাও নাই। ইহা সৌম্য, ভাবনাবর্জ্জিত, কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও ইহা অকর্ত্তা। ইহা এক ভাবে এক, বহু ভাবে বহু, অথচ ইহা একও নহে বহুও নহে ইহা সমরূপ ও সর্ব্বাত্মক। বাক্য ইহাকে কি বলে? বাক্য ইহাকে বলে, ইহা মহতী চিতিশক্তি[৩৫।৩৬]।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বসারজ্ঞ! হে ভগবন্! আপনি যে বিশ্বের কথা বলিলেন, উহার অর্থে আমি বুঝিলাম, উহা ব্রহ্মনামক মহাচিৎ[১]। এ সমস্তই সেই চিন্মজ্জার রূপ এবং উহা হইতেই এই অহম্ভাবাদি তুচ্ছ তৃণান্ত পদার্থ আতত হইয়াছে। আরও বুঝিয়াছি, দ্বৈত ও অদ্বৈত এই দুই ভেদ বাস্তব ভেদ নহে[২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! কেবল অহম্ভাবাদিই যে চিদ্বিশ্বের মজ্জা, তাহা নহে। এ সমস্ত বিশ্বই উক্ত চিদ্বিল্বের মজ্জা[৩]। এই যে সৃষ্টি, ইহাও চিদ্বিল্বের মজ্জা, পরন্তু এ বিল্ব প্রাকৃত বিল্বের ন্যায় মজ্জা ও মজ্জাধার বিল্বখর্পর উভয়ের ন্যায় ভেদবিশিষ্ট নহে। তথা পরিণাম বিশিষ্টও নহে। প্রাকৃত বিল্বের বিনাশ আছে, এ বিল্বের বিনাশ নাই। প্রাকৃত বিল্বমজ্জা বিল্বখর্পররূপ আধারে স্থিত থাকে, এ বিল্বমজ্জা আত্মস্বরূপেই স্থিত, ইহার আর অন্য আধার নাই। ইহাতে আধারাধেয় ভাব নাই। এই যে জগৎ-নামধেয় এক অত্যদ্ভুত চমৎকার, ইহা সেই চিৎ পদার্থেরই বিবর্ত্ত, অন্য কিছু নহে। ইহার সন্নিবেশ (রচনা বা সাজান) ও শিলার মধ্যে শিল্পিমনঃকল্পিত পদ্মবনের অনুরূপ[৪।৫]। হে ইন্দুবদন!

হে রাম! অভিহিত রহস্য বুদ্ধিগোচর করাইবার জন্য আমি অন্য এক চিত্তবিস্ময়ক আখ্যান বলি, শ্রবণ কর[৬]।

কোন এক প্রদেশে স্নিগ্ধ, বিস্পষ্ট, কোমলস্পর্শ, যার পর নাই বিস্তৃত ও সদা অক্ষোভ্য, এরূপ এক মহাশিলা আছে[৭]। তন্মধ্যে অনেক প্রফুল্ল পদ্মবন রহিয়াছে। সেই পদ্মের পত্র সকল পরস্পর অনুবিদ্ধ ও পরস্পর বিরুদ্ধভাবে সংঘটিত অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সংশ্লিষ্টও বটে, প্রকট প্রাপ্তও বটে[৮,৯]। সে সকলের কতক ঊর্দ্ধমুখ, কতক অধোমুখ, কতক তির্য্যক্‌মুখ, কতক বা পরস্পর সম্মীলিতমুখ এবং সে সকল মুখ পরস্পর পরস্পরের মুখে নিখাত অর্থাৎ প্রোথিত[১০]। ইহাদের কর্ণিকা অনেক, সে সকল মূলবৎ প্রোথিত, (মূল যেমন প্রোথিত সেইরূপ প্রোথিত) তথা কোন কোন কর্ণিকা মূল মধ্যে সন্নিবিষ্ট। অভিহিত পদ্ম নিবহের মধ্যে কাহার মূল ঊর্দ্ধে, কাহার মূল অধঃ এবং কাহার মূল নাই[১১]। সে সকলের নিকটে শত শত সহস্র সহস্র শঙ্খ রহিয়াছে তথা বিপুলাকার চক্র সমূহও পদ্মের ন্যায় সাজান রহিয়াছে[১২]।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি যে মহাশিলার কথা বলিতেছেন সে শিলা আমি শালগ্রাম ক্ষেত্রে দেখিয়াছি[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি যখন দেখিয়াছ, তখন তুমি অবশ্যই বিদিত আছ। তাহাতে যে প্রাণ আছে তাহা সমান ও অনবকাশ অর্থাৎ তাহা কেবল ঘনচৈতন্য ও নিরতিশয় আনন্দ। বিদিত থাকিলেও আমি তোমাকে সেই শিলার দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। যেমন বিল্বের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইয়াছি, তেমনি এবার, শিলার দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বুঝাইলাম। শিলায় যেমন শঙ্খ পদ্মাদি আকৃতি আছেও বটে, নাইও বটে, সেইরূপ, ব্রহ্মেও এ সকল আছেও বটে, নাইও বটে। শিল্পীর মনঃকল্পনায় আছে, আবার কল্পনা ত্যাগে নাই। শিল্পী স্বকল্পনানুরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সে সকলকে স্থূল দৃশ্যে প্রকট করায়, ব্রহ্মও মায়িক কল্পনাকে মায়িক পরিণতির দ্বারা এ সকল স্থূলাকারে প্রকট প্রাপ্ত করিয়াছেন[১৪,১৫]। হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে প্রাকৃত শিলার কথা বলি নাই, চিৎ-শিলার কথাই বলিয়াছি। চিদ্বস্তুকে শিলা বলিবার কারণ এই যে, শিলা যেমন নিবিড়, একাত্মক, নীরন্ধ্র ও বিবিধ শালভঞ্জিকাকৃতিবিশিষ্ট (শালভঞ্জিকা=খোদাই করা ছবি), চিৎও সেইরূপ নিবিড়,

একাত্মক অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্যে একরূপ ও জগৎরচনাশক্তিবিশিষ্ট। আকৃতি-রহিত আকাশে যেমন বিপুল বায়ু অবস্থিতি করে, সেইরূপ, আকৃতি-বর্জ্জিত চিদ্বস্তুতে এই জগৎ ছিল ও আছে[১৬।১৭]। স্বর্গ বা অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, দিক্‌সমূহ, সরিৎ, সমুদ্র, এ সমস্তই উক্ত শিলায় রহিয়াছে। উক্ত চিৎ হইতেই জগৎরূপ পদ্ম উদ্ভূত হইয়াছে। এমন বস্তু কিছু নাই যাহা চিৎ হইতে পৃথক্‌ভূত। শিল্পীরা যেমন শিলায় শঙ্খ পদ্মাদির আকৃতি লিখিত বা খোদিত করে, সেইরূপ, বর্ণিত চিদ্বস্তুতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক পদার্থ খোদিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, শিলাখোদিত আকৃতি যেমন শিলাই, আকৃতিভাগ মিথ্যা, তাহার ন্যায় চিৎকল্পিত জগৎও চিৎ, কল্পিত জগৎ-ভাগ মিথ্যা[১৮।২০]। শঙ্খপদ্মাদির আকৃতি রচিত হইলেও সে সকল শিলার অনতিরিক্ত[২১।২২]। সেইরূপ এই সৃষ্টিও চিতের অনতিরিক্ত। চিতের উদয় ও অস্ত দুএর কিছুই নাই। যদ্রূপ শিলাস্থ শঙ্খপদ্মাদির রেখা সুষুপ্ত, অর্থাৎ টঙ্কচ্ছেদের পূর্ব্বে (টঙ্কচ্ছেদ=খোদাই) অনভিব্যক্ত থাকে, তদ্রূপ এই জগৎও প্রথমে চিতের অজ্ঞানাংশে সুষুপ্ত অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে অথবা ছিল[২৩।২৪]। যেমন সুচরিত্রা সতী নারীর অন্তরে তাহার কান্ত সদা বিরাজিত থাকে সেইরূপ এই জগৎও চিতের অন্তরে সদা বিরাজিত রহিয়াছে। নানা বিকারময়ী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলী ছিল না, পরে হইয়াছে, এ উক্তির কোন সার্থক্য নাই[২৫।২৬]। যেমন জল-বিকার বিন্দু বুদ্বুদাদি অবশেষে যে জল সেই জলই হয়, সেইরূপ, এ সকল বিকারও অবশেষে চিৎপদার্থে পর্য্যবসন্ন হয়। অতএব, বিকার সমুদায়ও ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্ম ব্যতীত, পৃথক্ বিকার নাই। তাই বলা যায় যে, ব্রহ্মে· ব্রহ্মেরই প্রোক্তপ্রকার উৎপত্তি ও লয় হয় ও ব্রহ্মই স্থিত আছেন[২৭।২৯]। চিৎপদার্থে ভাসমান বিশ্ব সৌরকিরণে ভাসমান জলের ন্যায় মিথ্যা। যেমন বীজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিকারের পরিবর্ত্তনে অঙ্কুরাদিরূপে প্রথা প্রাপ্ত হয় তেমনি চিদ্রূপ জগদ্বীজ ক্রমিক বিকার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে[৩০।৩১]। আগে এক পরে দুই এতদনুসারে দ্বৈতকল্পনা একেরই অধীন, সুতরাং একাদ্বয় চিৎই তত্ত্ব, আর সব অতত্ত্ব। চিৎ কখনও অচিৎ জড় হয় না। মহাশিলার অন্তরে শিল্পি কল্পিত লাঞ্ছনের (ছবির) সত্তা ন্যায় চিতের অন্তরে মায়াকল্পিত জগ

তের সত্তা তুলিত হয়[৩২,৩৩]। যেমন বিন্দে মজ্জা, তেমনি, জগতে চিৎ। শিলা যেমন রেখা ও উপরেখাদির দ্বারা অঙ্গাকারে প্রতীয়মান হয় সেইরূপ ব্রহ্মও ত্রৈলোক্যরূপ রেখার ও উপরেখাদির দ্বারা প্রতীয়মান হই-তেছেন। শিলালিখিত শঙ্খপদ্মাদি সদা সুষুপ্ত, সেইরূপ চিত্তাসিত বিশ্বও সদা সুষুপ্ত এবং ইহার উদয় ও অস্ত বাস্তব নহে। শিলার যে রেখো-পরেখা থাকে তাহা কি শিলা হইতে ভিন্ন? না সে শিলা অন্য শিলা হইতে ভিন্ন? যে হেতু চিৎ-ই জগতের সার অর্থাৎ স্থির বস্তু, সেই হেতু জগদন্তর্গত কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্তই অসার অর্থাৎ কল্পনামাত্র। শিলালিখিত পদ্মাদির যেমন স্পন্দন অস্পন্দন কিছুই নাই, সেইরূপ, চিৎপ্রকাশিত কোনও পদার্থের বাস্তব কর্ত্তৃত্বাদি নাই। চিৎ-প্রকাশিত পদার্থ সকল জড়, জড়ের আবার কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব কি? অতএব, কেহ কিছু করেও না, কোন কিছুর নাশও হয় না[৩৭,৩৮]। সৃষ্টি স্থিতি লয় এ সকল নিয়তির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। একই শিলা যেমন নানা শিল্পীর কল্পনায় নানাত্ব প্রাপ্ত হইলেও শিলার নানাত্ব হয় না, তেমনি, নানা জীবের নানা কল্পনা উপস্থিত হইলেও চিতের নানাত্ব জন্মে না[৩৯]। জগৎ নানা বিকারে ও নানা ভাবে যতই আঢ্য হউক না কেন, ইহাকে তুমি এক মহৎ ভ্রম বলিয়া মনে করিবে[৪০]।

এই যে কার্য্যভূত জগৎ ইহাকে তুমি সুষুপ্তবৎ জানিবে। বস্তুতঃ ইহার তত্ত্ব প্রশান্ত, সম অর্থাৎ উচ্চ নীচ ও উত্তমাধমাদি বর্জ্জিত ও কেবল নিবিড় চিন্মাত্র বলিয়া জানিবে। শিলান্তর্গত কল্পিত পদ্মাদি যেমন অসার, সেইরূপ, চিৎকর্ত্তৃক উদ্ভাসিত এই দেহাদিও সেইরূপ অসার[৪১]।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিদ্রূপ তত্ত্ব যাবৎ স্বরূপপ্রতিসন্ধানশূন্য থাকে তাবৎ তাহা সৃষ্টিকারণ। ফল যেমন অঙ্কুরাদি সৃষ্টির কারণ বলিয়া গণ্য সেই-রূপ প্রচ্ছন্ন স্বাত্মরূপা চিৎ সৃষ্টিকারণ বলিয়া গণ্য। জীবচৈতন্য যেমন স্বপ্ন সন্দর্শনের কারণ, তেমনি, ব্রহ্মচৈতন্যও স্বপ্নতুল্য বিশ্বসৃষ্টির কারণ। অতএব, চিৎপদার্থের সত্তার ভেদ কল্পনাই সৃষ্টি, সেজন্য সৃষ্টির পৃথক্ সত্তা নাই। স্বপ্নেরও পৃথক সত্তা নাই[১]। দেশ কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই যখন চিন্ময়, তখন অবশ্যই ইহা তাহা এ সে প্রভৃতি বাস্তব ভেদ অনুপপন্ন[২]। আবার ইহাও দেখা যায়, সমুদায় শব্দ, অর্থ ও সে সকলের সংস্কারঃ একরূপই আছে ও থাকে, অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয় না। সৃষ্টি, আত্যন্তিক অসৎ হইলে কিরূপে ঐ সকল সঙ্গত হইতে পারে? তাই বলা হয়, সৃষ্টির রহস্য সৎও নহে, অসৎও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য[৩]। যেমন কোন ফলের অন্তর্ব্বাহ্য নানাও বটে, অনানাও বটে, অর্থাৎ সমুদায়তঃ এক বা অভিন্ন, পরন্তু অবয়ব ক্রমে নানা নাম ধারণ করে, অর্থাৎ ইহা মজ্জা, ইহা খর্পর, ইত্যাদি প্রকারের নাম কল্পনা করা যায়, তেমনি, চিৎ ও সৃষ্টি এতদুভয়কে এক ভাবে ভেদ ও অন্য ভাবে অভেদ বলা যায়[৪।৫]। চিদ্রূপ দর্পণে চিদ্‌ভিন্ন জগন্নামক নগর প্রতিবিম্বিত হইতেছে[৬]। যেমন চিন্তামণিতে নানা ফলপ্রদান শক্তি থাকে তেমনি পরম চিন্তামণি চিত্তত্ত্বে কোটী কোটী জগৎসৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে[৭]। যেন চিৎ একটী মুক্তাকোষ, তন্মধ্যে যেন এই জগদ্রূপ মুক্তা[৮]। যেন চিৎ একটী সূর্য্য, যেন তিনি এই জগদ্দ্রব্য দর্শন করিতেছেন[৯]। সমুদ্র-গর্ভে জলাবর্ত্তের বিলাস যদ্রূপ, সে সকল যেমন অনানা হইলেও নানার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, (ফেণ, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, বীচি প্রভৃতি), চিদ্‌গর্ভে বিশ্বের বিন্যাসও তদ্রূপ, তথা এ সকল অনানা হইলেও নানার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে[১০]। চিতে যাহা আছে তাহাও শিলায় শালভঞ্জিকার (ছবির) ন্যায়, যাহা নাই, তাহাও শালভঞ্জিকা না থাকার ন্যায়[১১]।

এই ভাবাভাবময়ী জগতের সার বা মজ্জা চিৎপদার্থ[১২]। পদ্মাদি নাম ও সে সকলের অর্থ পরিত্যাগ করিলে যেমন কেবল মাত্র শিলাই অবশেষিত হয় সেইরূপ জগৎ এই নাম ও নামার্থ পরিত্যাগ করিলে কেবলা চিৎ অবশেষিত হয়। নানা হইলেও যেমন শিলাস্থ পদ্মাদি অভেদ বুদ্ধির গ্রাহ্য কালে একত্বে পর্য্যবসন্ন হয় সেইরূপ এই নানা কল্পনায় কল্পিত জগৎকেও কল্পনাংশ পরিহারে একত্ব বুদ্ধির গম্য করা যায়। সুতরাং বুঝাও যায় যে, ইহার আধার চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং আধেয় জগৎও তদতিরিক্ত নহে[১৩।১৪]। মরুভূমিস্থ মরীচিকা যেমন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের দৃষ্টিতে জল ও অভিজ্ঞদিগের দৃষ্টিতে সূর্য্যাতপ, সেইরূপ, চিদাশ্রিত জগৎও অজ্ঞদৃষ্টিতে জগৎ ও জ্ঞানিদৃষ্টিতে জগৎ নহে[১৫]। রাশীভূত জলের মধ্যে যেমন স্পন্দাস্পন্দ দ্বিবিধ ভাব অর্থাৎ দ্রবতা হেতু প্রচলন ও কচিৎ অচাঞ্চল্য ভাব বিদ্যমান থাকে, তেমনি সেই চিদ্‌ঘন বস্তুর মধ্যে ক্বচিৎ চাঞ্চল্যের ন্যায় অর্থাৎ মিথ্যা সৃষ্টিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়[১৬]। শিলাশ্রিত শঙ্খপদ্মাদি যেমন তন্ময় (শিলাময়) তেমনি চিদাশ্রিত জগৎও তন্ময় অর্থাৎ চিন্ময়। উক্ত মহাচিৎ উক্ত প্রকারে প্রকৃত পক্ষে মহাশিলার সদৃশ, এবং এ মহাশিলা বস্তুতঃ নীরন্ধ্র, নির্দ্বন্দ ও অরচিত। অর্থাৎ কাহার রচিত নহে। যদিও রচিত নহে তথাপি রচিতের ন্যায় অনুভূয়মান হইতেছে। কালাত্মক সূর্য্য চন্দ্রের কোন এক অবান্তর ভেদ কল্পনা করিয়া লোকে বলে, শরৎ নির্ম্মল কিরণ দান করিতেছে ও চন্দ্র স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এইরূপ আমরাও বলি, ব্রহ্ম জগৎ প্রকাশ করিতেছেন ও ব্রহ্ম জগদ্রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন[১৭।১৯]। ব্রহ্মে এই বিশ্ব সুষুপ্তের ন্যায় এবং শিলোৎকীর্ণ পদ্মাদির ন্যায়। ইহা নাশবর্জ্জিত। ব্রহ্মত্ব যেমন ব্রহ্মেই স্থিত, তেমনি এই জগৎও ব্রহ্মে স্থিত[২০]। যেমন তরু ও পাদপ ভিন্ন নহে, তেমনি, ব্রহ্ম ও জগৎ ভিন্ন নহে[২১]। প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ভাব ও অভাব দুএর কিছুই নাই। মরুভূমিস্থ সৌরকিরণ জলরূপে ভাসমান হওয়ার ন্যায় ব্রহ্মচিৎ এই জগদ্রূপে ভাসমান হইতেছেন। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, তৃণাদি ব্রহ্মাণ্ডান্ত বাহ্য দৃশ্য ও চিত্তাদি হিরণ্যগর্ভান্ত আন্তর প্রপঞ্চ, সমুদায় পদার্থের বিভাগক্রম অবলম্বন করিলে সর্ব্বশেষে যাহা অবিভাজ্য বলিয়া নির্ণীত হয় তাহাই ব্রহ্মের রূপ ও তাহা পরম সূক্ষ্ম।

বিভাগক্রমলব্ধ সূক্ষ্ম ভাবের সেই সেই সংঘাত বা মিলিত ভাবই পর পর স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতমাদিরূপে কল্পিত হয়। উচ্চতার দৃষ্টান্ত সুমেরু প্রভৃতি ও ক্ষুদ্রতার দৃষ্টান্ত তৃণাদি। অতএব, যখন সূক্ষ্মতার সার অর্থাৎ প্রথম আধার বা আদি সীমা সৎ (কেবল মাত্র অস্তিতা), তখন ইহা অবশ্য বোধ্য যে, স্থূলতার সারও সৎ অর্থাৎ কেবল অস্তিতা। যেমন জলীয় পরমাণুস্থ রস শক্তিই স্থূল জলে অনুভূত হয়, তেমনি, সর্ব্ব মূল ব্রহ্মসত্তাই ঘটাদি পদার্থে অনুভূত হইতেছে। (অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাই অথবা অস্তি-স্বরূপ ব্রহ্মই এই ঘট, ঘট আছে, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটের সঙ্গে ব্যক্ত হইতেছে) যে রসশক্তি জলে, সেই রসশক্তিই তৃণাদি পদার্থে। একই রসশক্তি তৃণাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইতেছে। সেইরূপ একই ব্রহ্মসত্তা ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশমান হইতেছে[২২,২৩]। যেমন ময়ূরাণ্ড রসে কাঠিন্য ও বিচিত্র পুচ্ছাদি শক্তিরূপে থাকে বলিয়াই পশ্চাৎ পরিণাম ক্রমে সে সকল প্রকট প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মায়াশবল ব্রহ্মে বিশ্বশক্তি থাকায় ক্রমপরিণামের ফলরূপে এই বিশ্বমণ্ডল প্রকট প্রাপ্ত হইয়াছে।' অতএব, যেমন বিচিত্র ময়ূরপিচ্ছ তাহার ডিম্বরস ব্যতীত পদার্থান্তর নহে, তেমনি, এই বিচিত্র বিশ্বও ব্রহ্মরস ব্যতীত অন্য বস্তু নহে[২৭,৩১]। যেমন ব্রহ্ম বাস্তব, জগৎ অবাস্তব, তেমনি, অদ্বৈতই বাস্তব ও দ্বৈত জগৎ অবাস্তব। বাস্তব ও অবাস্তব উভয়ই একই আধারে স্থিতি করিতেছে। যে তত্ত্বে দ্বৈতাদ্বৈতসত্তার স্থিতি বা সমাবেশ, সেই তত্ত্ব-কেই তুমি পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ভাবের ন্যায় অভাব পদার্থেরও একটা আশ্রয় আছে এবং সর্ব্বাশ্রয় পদার্থই ব্রহ্ম শব্দের অভি-ধেয়[৩২,৩৩]। যেমন ময়ূরাণ্ডে পিচ্ছশক্তিসমন্বিত রস থাকে তেমনি চিৎ-পদার্থে জগৎশক্তিসমন্বিত মায়া থাকে। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি জগৎকে চিৎসম্বলিত ভাবিবে। যেমন ময়ূরাণ্ডের রস একরূপ ও নানা রূপ তেমনি চিদ্ব্রহ্মও একরূপ ও নানারূপ[৩৪]।

• সেই আদ্যা চিৎ এই জগদ্রূপ ময়ূরাণ্ডের রস, সেই রসে ময়ূর ও অময়ূর উভয় রূপই আছে, অর্থাৎ জগৎ ও জগতের অভাব উভয় রূপই আছে। অতএব, ময়ূরাণ্ড রসই যথাকালে ময়ূর, সেজন্য ময়ূর ও ময়ূ-রাণ্ড এক বা অভিন্ন পদার্থ। এবং ইহার ন্যায় চিৎ ও জগৎ এক বা

অভিন্ন বস্তু। যেমন ময়ূরাবস্থা বিচিত্রিত, তেমনি, জগৎ অবস্থাও বিচিত্রিত।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহাতে এ সমস্ত বিস্তৃত সে বস্তুকে তুমি শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। সে বস্তুতে এ সকল উদ্ভূত হইয়াছে সত্য, এবং তাহাতেই এ সকল আছেও সত্য, কিন্তু এ সকল তাহাতে সত্যতঃ সমুদ্ভূত ও সত্যতঃ অবস্থিত নহে। সেই চিৎপদার্থই এই দেহে স্বীয় অজ্ঞান বিসৃষ্ট প্রাণাদির প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হইতেছে ও স্বর্গাদি সুখ ও নরকাদি দুঃখ কল্পনা করিতেছে১।২। দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ সর্ব্বদাই তুরীয় পদে অবস্থান করতঃ আপনারই সুখ আস্বাদন করিতেছেন। যাঁহারা নির্নিমেষ নেত্রে কাল কর্ত্তন করেন, তুমি জানিবে, তাঁহারা দৃশ্যদর্শনের অতীত, অসঙ্গ ও অক্রিয় পদে অবস্থিত ৩।৪। যাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তদ্দ্বারা লিপ্ত হন না, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদুভয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিত আছেন ৫। যাঁহাদের প্রাণ স্পন্দিত হয় না, দেখিতে চিত্র লিখিতের ন্যায়, যাঁহাদের মনঃও স্পন্দিত হয় না, তুমি স্থির করিবে যে, তাঁহারা চিত্ত চেত্য এতদুভয়ের সম্বন্ধের অতীত ও স্বাত্মপদে স্থিত। ঈশ্বর যেমন অন্তরে সদা স্বরূপানন্দে স্থিত থাকেন অথচ বাহিরে মায়ার দ্বারা জগতের শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থা করেন, সেইরূপ, ইহারাও অন্তরে শুদ্ধ সদানন্দ অথচ বাহিরে ব্যবহার নিষ্পাদক। যেমন স্বচ্ছ চন্দ্রকিরণ পল্লবের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পল্লবকে আহ্লাদিত করে, সেইরূপ, এই আত্মা অন্তঃপ্রবিষ্ট দৃশ্যদর্শন সম্বন্ধ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করেন। চন্দ্র দূরে প্রসৃত হইয়াছে অথচ ভিত্ত্যাদি পদার্থে নিপতিত হয় নাই এরূপ আন্তরালিক

চন্দ্রকিরণ যেরূপ, আত্মার স্বরূপানন্দও সেইরূপ। অর্থাৎ আত্মার বিষয়-সম্পর্কের পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বিশেষ অবস্থার আনন্দই ব্রহ্মানন্দ। এ আনন্দ দৃশ্যান্তর্গত নহে, বর্ণনার বিষয় নহে, এবং উহাতে দূর নিকটাদি ভাবও নাই। উহা কেবল, ও স্বানুভবগম্য এবং উহাই আত্মার বিশুদ্ধ রূপ। ইহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, চিত্ত, বাসনা, জীব, স্পন্দ, অস্পন্দ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জগৎ, দূর, নিকট, আদি, মধ্য, অন্ত, শূন্য, অশূন্য, দেশ, কাল, বস্তু অবস্তু এ সকলের অতীত[৯।১০]। এই দৃশ্যবৃন্দ যে আধারে বা যাহার অধীনে স্পন্দিত হইতেছে সে আধার কেবল ও আত্মা। আত্মা অনাদি, অনন্ত, অবিনাশী ও অবিরোধী। সহস্র সহস্র দেহরূপ ঘট জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু এতদুপহিত আকাশের তদ্দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষতি হইতেছে না। হে আত্মজ্ঞ! হে রাম! এই যে দেহাদি, এ সকল সেই আত্মাই, অন্য কিছু নহে[১১।১২]। ইহা কেবল, পরন্তু বুঝিবার দোষে ঈষৎ পার্থক্যের মত। এই বিশ্ব তন্ময়, ইহা আমরা সুসিদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা বিদিত হইয়াছি[১৭]। তুমি কার্য্যে দেদীপ্যমান হও পরন্তু অন্তরে নির্ব্বাণ ও নির্ম্মল হও। এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্য, এ সমস্তই ব্রহ্ম, তদতিরিক্ত নহে[১৮]। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্ম, নির্গুণ, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, শান্ত ও শমাত্মক[১৯]। তুমি যদি কাল, ক্রিয়া, করণ, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, জন্ম, স্থিতি, লয়, স্মরণ, অস্মরণ প্রভৃতি সমুদায়কে এক ব্রহ্ম বলিয়া জান, তাহা হইলে তোমার অতঃপর আর সংসারভ্রমণ হইবে না[২০]।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

—○•()•○—

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! এ সমস্ত যদি না থাকে আর ব্রহ্মেরই বৃংহণ হয় তাহা হইলে এই ভাবাভাবময় জগৎ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! যাহার পূর্ব্বরূপ বা পূর্ব্বাবস্থা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তিত না হয় এরূপ বিপর্য্যয়ের নাম বিকার। বৎস! রাম! এই বিকার বুঝিবার দৃষ্টান্ত—দুগ্ধাদির দধ্যাদি আকার প্রাপ্ত হওয়া। দুগ্ধ দধি হইলে পুনর্ব্বার তাহা দুগ্ধ হয় না। এতল্লক্ষণক বিকার ব্রহ্মে নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম দুগ্ধ দধি হওয়ার অনুরূপে বিশ্ব বা জগৎ হন না। ব্রহ্ম বিশ্বের আদিতে যদ্রূপ, মধ্যেও তদ্রূপ ও বিশ্বের পুনরবসানেও তদ্রূপ। অতএব ব্রহ্ম দুগ্ধাদির ন্যায় বিকারী নহেন, পরন্তু নির্ব্বিকার স্বভাব। ব্রহ্মের আদি অন্ত মধ্য, কোনও বিভাগ নাই, সেজন্য ইঁহাকে সূত্রের বস্ত্র হওয়ার অনুরূপে জগৎজন্মের কারণ বলা যায় না[২।৪]। ব্রহ্ম সর্ব্বদা একরূপ, সেজন্য এই আকস্মিক অন্যথাভাব অর্থাৎ এই জগদ্ভাব তাঁহাতে বিবর্ত্ত অর্থাৎ মিথ্যাদর্শন ব্যতীত বাস্তব নহে। যেমন রজ্জুতে সর্পসংস্পর্শ না থাকিলেও অজ্ঞানের মহিমায় সর্পদর্শন হয় সেইরূপ ব্রহ্মে দৃশ্য ও দর্শন সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বাশ্রিত ও স্বনিষ্ঠ অজ্ঞানের মহিমায় দৃশ্য দর্শনাদির ভান হইয়া থাকে[৫।৬]। এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ কাল আছে মাত্র। যাহা আদিতে থাকে না, পরেও থাকেনা, তাহাই অজ্ঞান নির্ম্মিত[৭]। আত্মা আদি অন্ত মধ্য এই তিন্ কালেই সমান ও সর্ব্বত্র সদা বিরাজমান সেজন্য আত্মাই সত্য ও তদবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যা[৮]। ইনি নিত্য, নির্ব্বিকার, এক ও সর্ব্বপ্রকার আকৃতি বা রূপ বিবর্জ্জিত বলিয়া ভাবধর্ম্মের বশ্য হন না। ভাবধর্ম্ম অর্থাৎ জন্মবান্ পদার্থের ধর্ম্ম[৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল, এক ও অস্তিতামাত্ররূপী। তাদৃশ নির্ম্মল তাঁহাতে কিরূপে ও কোথা হইতে ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যার সমাগম সম্ভাবিত হইতে পারে[১০]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, অবিদ্যা আছে এ কথা আমরা অজ্ঞদিগের বোধ উৎপাদনার্থ কল্পনা করিয়া বলি নচেৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবর্জ্জিত [১১]। ব্রহ্ম বলিলেই তৎসঙ্গে বাচ্যবাচক ভাব প্রতীত হয় বটে, পরন্তু তাহাও উপদেশের জন্য বলিতে হয়, বস্তুতঃ ব্রহ্মে বাচ্যবাচক ক্রমও নাই[১২]। তুমি, আমি, জগৎ, দিক্, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, অনল, অনিল, দিবা, রাত্র, সমস্তই ব্রহ্মের অনতিরিক্ত অবিদ্যাও ব্রহ্মের অনতিরিক্ত[১৩]। ঐ সকল নাম মাত্র, অবিদ্যাও নাম মাত্র, নাম

ভ্রমকল্পিত ও অসৎ। হে রামচন্দ্র! যাহা নাই কোনও কালে যাহার সত্তা নাই, কিরূপে তাহা সত্য হইবে[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, আপনি উপশমপ্রকরণে যে ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যা থাকার কথা বলিয়াছেন, তাই আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, অবিদ্যা আছে কৈ? ভ্রান্তির আবার থাকা কি[১৫]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! তদ্‌যাবৎ তুমি অবুদ্ধ ছিলে, তাই আমি তোমার বোধ উৎপাদনার্থে তাদৃশ কল্পনা অবলম্বন করিয়াছিলাম। বাক্যবিশারদ পণ্ডিতগণ অপ্রবুদ্ধদিগকে বুঝাইবার জন্য ইহার নাম অবিদ্যা, ইহার নাম জীব, এইরূপ এইরূপ কাল্পনিক ক্রম (উপদেশ প্রণালী) অবলম্বন করিয়া থাকেন[১৬।১৭]। যাবৎ কাল মন অবোধ থাকে তাবৎ কাল শাস্ত্রকল্পিত ব্যবহার অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অবোধ মনকে বুঝান যায় না[১৮]। যুক্তির দ্বারা অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বিনিবৃত্ত হয়, তৎপরে জীব বোধ প্রাপ্তে পরমাত্মায় যোজিত হয়[১৯]। যে ব্যক্তি অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে "সর্ব্বং ব্রহ্ম" বলে, সে ব্যক্তি স্থাণুর নিকট (স্থাণু মুড়োগাছ) আত্মদুঃখ বিজ্ঞাপিত করে[২০]। যুক্তির দ্বারা মূঢ়দিগকে বুঝান যায়, আবার তত্ত্ব কথার দ্বারা প্রাজ্ঞদিগকে বুঝান যায়। যুক্তি কথা না বলিলে মূঢ়েরা বুঝে না, সেজন্য তাহারা প্রাজ্ঞও হয় না। যখন তাহারা যুক্তির দ্বারা বোধিত হয়, তখন তাহারা প্রাজ্ঞ হয়। তখন তাহারা তত্ত্ব কথা বলিলে বুঝিতে পারে[২১]। তুমি যে পর্য্যন্ত অবুদ্ধ ছিলে সে পর্য্যন্ত তোমাকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছি। এখন তুমি প্রবুদ্ধ, সেজন্য তোমাকে তত্ত্ব কথাই বলিব। আমি ও তুমি, ত্রিজগৎ, তদন্তর্গত দৃশ্যনিচয়, সমস্তই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে[২২।২৩]। একমাত্র মহাসম্বিৎ-ই এই জগত্রয়, এতদাকারের একজ্ঞান যাহার অন্তরে সদা রাজমান থাকে সে বাহিরে কোন কিছু করিলেও করে না বলিয়া গণ্য[২৪]। হে রঘুনাথ! তুমি সর্ব্বদা সকল অবস্থায় আপনাকে, আমি স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী চেতন পরমাত্মা, এইরূপে অনুভব করিতে থাক[২৫]। তুমি এখন নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছ, প্রশস্তবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি এখন চিন্ময় ব্রহ্মমাত্র হও। ব্রহ্মই পরম পদ, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, সে পদ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ। ঐ পদ আদ্যন্তরহিত, আভাসবর্জ্জিত, সুতরাং শুদ্ধসম্বিদ্রূপী

ও সত্তামাত্র। যেমন কুম্ভ যতই থাকুক, মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সেইরূপ, অবিদ্যা থাকুক আর প্রকৃতিই বা থাকুক, ব্রহ্ম ভিন্ন নহে[২৭,২৮]। ঘট যেমন মৃত্তিকা বিকার হইতে ভিন্ন নহে, আবর্ত্ত যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। মৃত্তিকাই ঘটাদি আকারে তথা জলই আবর্ত্তের আকারে স্থিতি করে, তাহার ন্যায় পরমাত্মাই প্রকৃতির আকারে স্থিতি করিতেছেন[২৯,৩০]। যেমন স্পন্দ ও পবন, তথা ঔষ্ণ্য ও অগ্নি এক বৈ দুই নহে, বাস্তবতঃ বিভিন্ন নহে, তেমনি, আত্মা ও প্রকৃতি এ দু-ইও বাস্তবতঃ অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে[৩১]। বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত ঐরূপ ভেদপ্রত্যয় থাকে, বুঝিতে পারিলে তখন আর ভেদপ্রত্যয় থাকে না[৩২]। চিদাত্মা যেন একটী ক্ষেত্র, ইহাতে যদি কোনও ক্রমে একবারমাত্র কল্পনাবীজ রোপিত হয়, তাহা হইলে সেই বীজ কর্ম্মাঙ্কুর উৎপাদন দ্বারা ভাবী সংসারারণ্য উৎপাদন করে[৩৩]। তাহাকে যদি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ অনলে দগ্ধ করা যায় তাহা হইলে সে বীজ আর কর্ম্মাঙ্কুর জননে সক্ষম হয় না। সুতরাং তাহা সুখদুঃখবহুল সংসার বৃক্ষের উৎপাদকও হয় না[৩৪,৩৫]।

হে রঘুনাথ! এই যে জগদ্রূপ দ্বৈত, ইহা অসৎ ও কেবল অজ্ঞান। তুমি ইহাকে জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট কর। তুমি কেবল আত্মা, তোমাতে দুঃখও নাই ও ভয়াদিও নাই।

একোনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশ সর্গ।

—○()•()○—

রাম বলিলেন, যে কিছু জ্ঞাতব্য সমস্তই আমি জানিয়াছি। যে কিছু দ্রষ্টব্য সে সমস্তই আমার দেখা শেষ হইয়াছে। আপনার উপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃতে আমার পূর্ণা তৃপ্তি হইয়াছে[১]। এখন আমি বুঝিয়াছি, পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উপাধি গ্রহণ ক্রমে উৎপন্ন যে জীব তাহা পূর্ণস্বভাব

এবং তদুৎপন্ন আকাশাদিও সেই পূর্ণপদার্থ। অতএব, এ সমুদায় সেই পূর্ণ ব্রহ্মে প্রপূরিত ও ইহারই পর্য্যবসান সেই পূর্ণ[২]; ইহা বুঝিয়াও জ্ঞান বৃদ্ধি কামনায় আপনাকে পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি, পিতা যেমন পুত্রের প্রতি ক্ষমাই করেন, কোপ করেন না, সেইরূপ, আমার প্রতিও ক্ষমা করিবেন, কোপ করিবেন না[৩]। হে ব্রহ্মন্! মৃত দেহেও শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা ও নাসিকা থাকা দৃষ্ট হয়, অথচ উহারা কেহই বিষয় গ্রহণ করে না। উহারা যে জীবদ্দেহেই বিষয় গ্রহণ করে, মৃত দেহে করে না, ইহার কারণ কি[৪]? অপর প্রশ্ন এই যে, ইন্দ্রিয়গণ জড়, ঘটাদি পদার্থ বাহিরে, অথচ যে সকল শরীরের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়, আবার কখন বা নাও হয়। এরূপ কেন হয় তাহা জানিতে ইচ্ছা করি[৫]। ঘটাদি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর অশ্লিষ্ট (অসংযুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে স্থিত)। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা দেখি না[৭]। যদিও এ বিষয়ের তথ্য জানিতেছি, তথাপি, ভালরূপ জানিবার প্রত্যাশায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুকম্পা প্রকাশে এই কয়েক বিষয় আমাকে বলুন[৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ইন্দ্রিয়াদি, চিত্তাদি ও ঘটাদি অতীব তুচ্ছ অর্থাৎ বস্তুতঃ উহারা নাই। একাদ্বয় চৈতন্য ব্যতীত অন্য বস্তু থাকা অসম্ভব[৯]। আকাশ অপেক্ষাও সমধিক নির্ম্মল সেই চিৎ মিথ্যা বা তুচ্ছা মায়ায় আবিষ্টা হইয়া আপনাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে পুর্য্যষ্টকরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন[১০]। সেই যে প্রথম কল্পনা, তাহাই ভবিষ্যৎ জগতের প্রকৃতি তথা তাহারই অবয়ব ইন্দ্রিয়াদি ও ঘটাদি। যে চিত্ত আপন স্বভাবে পুর্য্যষ্টকত্ব প্রাপ্ত, ঘটাদি পদার্থ সেই চিত্তের অবয়ব, অর্থাৎ তদতিরিক্ত নহে। অপিচ, ঘটাদি পদার্থ তাহাতেই প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এতাবতা ইহাই বলা হইল যে, ঘটাদি পদার্থ উক্ত প্রকারে কল্পিত বলিয়া কল্পনারই মহিমায় বহির্ব্বস্তু বলিয়া কল্পিত তথা অন্তঃস্থ বলিয়া অনুভূত হইতেছে[১১।১২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যাহার মহিমা জগৎ সহস্র নির্ম্মাণ করিতে পারে, যে পুর্য্যষ্টক সহস্র জগদ্দর্শনের দর্পণ, সে পুর্য্যষ্টকের স্বরূপ কি প্রকার তাহা আমাকে বলুন[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই জগতের মূল বা বীজ ব্রহ্ম। তাহা অনাদি,

অনন্ত, প্রকাশস্বরূপ ও চিন্মাত্র। তাঁহাতে প্রথমে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত, তৎপরে লিঙ্গশরীর বা ভাবময় সূক্ষ্ম শরীর, তৎপরে সূক্ষ্ম ভূতের স্থূলতা, তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয় (তাঁহারই মায়িক কল্পনাক্রমে)। এই সমুদায়ের অভ্যন্তরে যে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই প্রতিবিম্বই জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত। সেই জীবই এই স্থূল শরীরে বাসনানুরূপ কার্য্যে চেষ্টমান হয় ও শত শত ব্যাপার নির্ব্বাহ করে[১৪।১৫]। "আমি" ইত্যাকার অভিমান ধারণ করায় অহঙ্কার। সঙ্কল্প বিকল্প করায় মন, বোধ নিশ্চয় করায় বুদ্ধি, ইন্দ্রের অর্থাৎ আত্মার দর্শক বলিয়া ইন্দ্রিয়, দেহ ভাবনায় দেহ, ঘট ভাবনায় ঘট, এইরূপ এইরূপ সর্ব্বব্যাপার সাধারণ ভাবে পুর্য্যষ্টক[১৬।১৭]। ঐরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে জ্ঞাতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে কর্ত্তা, সুখ দুঃখাদির আশ্রয় ভাবে ভোক্তা, তথা সর্ব্বপ্রকাশক ভাবে সাক্ষী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে সম্বিৎ জীব নামের নামী, সেই সম্বিৎকেই তুমি পুর্য্যষ্টক বলিয়া জানিবে। চিদংশ লক্ষ্য করিয়া জীব ও জড়াংশ লক্ষ্য করিয়া পুর্য্যষ্টক, এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হয়[১৮]। ঐরূপে জীবই কালভেদে অবস্থাভেদে ও বাসনাভেদে নানা ভাবে ভাবিত হইতেছে[১৯]। অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, এ সকল যেমন একই বীজের আকার ভেদ, সেইরূপ, এই জগৎও সেই ব্যষ্টিসমষ্টি জীবের আকার ভেদ। কিন্তু জীব "আমি সেই আদিম চিদাত্মা" এ রহস্য জানিতেছে না, জানিতেছে, আমি শরীরাদি সমন্বিত ও আমার দৃশ্য এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ[২০।২১]। সমুদ্রপতিত কাষ্ঠখণ্ড যেমন তরঙ্গের তাড়নায় মগ্ন উন্মগ্ন হয়, তেমনি, জীবও বাসনাজালে জড়িত হইয়া কখন বা উর্দ্ধগতি কখন বা অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে[২২]। দৈবাৎ কখন কোন জীব বিশুদ্ধ জন্ম লাভ করে, করিয়া জ্ঞান লাভ দ্বারা সেই অনাদি অনন্ত পদ প্রাপ্ত হয় তথা কোন কোন জীব বহুকাল বহু যোনি ভ্রমণের পর অতিক্লেশে আত্মজ্ঞান লাভ করে, করিয়া পরম পদে স্থিতি লাভ করে[২৩।২৪]। হে মতিমন্! বর্ণিত প্রকারে জীবই শরীরী হয়, হইয়া শরীরাংশ সকল অনুভব করিতে থাকে। এই জীব যে প্রকারে নেত্রাদির দ্বারা বহিঃস্থ ঘটাদি পদার্থ নিচয় স্বকীয় অন্তরে বলিয়া অনুভব করে, সে প্রকার কি তাহা বর্ণনা করি, শ্রবণ কর[২৫]। প্রাগ্বর্ণিত পুর্য্যষ্টকে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বন, তাহা নখ পর্য্যন্ত

সমুদায় শরীরব্যাপী। সেজন্য তাহা দেহপরিমিত ও দেহান্তর্গত সুখ দুঃখাদির জ্ঞাতা। এই জীবচৈতন্য যখন চক্ষুরাদির দ্বারা ঘটাদি বহিঃ পদার্থে গমন করে, সংস্পৃষ্ট হয় সেই ঘটাদি পদার্থ তখন তাহার বিষয় অর্থাৎ তাহার প্রকাশ্য হইয়া দাঁড়ায়[২৬।২৭]। চিত্তসমন্বিত ইন্দ্রিয়ই বাহ্যার্থ বিজ্ঞানের কারণ, চিত্তসংযোগ ব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয় জ্ঞানকারণ নহে। সেইজন্য মৃতশরীরস্থ ইন্দ্রিয় ও মুক্তশরীরস্থ ইন্দ্রিয় চিত্তসংযোগশূন্য বলিয়া বাহ্যার্থ বোধ জন্মায় না[২৮]। মনোবৃত্তি ও নয়নরশ্মি যৎপরোনাস্তি নির্ম্মল, তাহাতেই বাহ্যাকাশস্থ ঘটাদি পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় ও তৎ-ক্রমে সেই সেই প্রতিবিম্ব মনোবৃত্ত্যন্তর্গত জীবে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় জীব তাহা অনুভব করে[২৯]। জীব যে কেবল শরীরাবচ্ছেদেই আছে, তাহা নহে। বাহিরেও আছে কিন্তু প্রাণসম্বন্ধ না থাকায় শরীর ভিন্ন অন্যত্র জীবভাবান্বিত নহে। অর্থাৎ প্রাণব্যাপ্তির অন্যত্র অর্থাৎ বাহিরে অহং—আমি এ জ্ঞানের উদয় হয় না। যে সময়ে নেত্রের মণি দিদৃক্ষা বশতঃ নৈর্ম্মল্য ও বিস্ফারযুক্ত হয়, সেই সময়েই তাহাতে বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব আবিষ্ট ও জীবের জ্ঞেয় হয়[৩০।৩১]। পদার্থজ্ঞান যে ঐরূপ সংশ্লেষঘটিত তাহা বালকেরাও বুঝে, পশুরাও বুঝে, এমন কি কোন কোন স্থাবর জীবেরাও বুঝে। (ইহার নিদর্শন—লজ্জাবতী প্রভৃতি ক্ষুপজাতীয় বৃক্ষ। তাহারা পত্র স্পর্শে যে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহাই তাহাদের বোধ থাকার নিদর্শন[৩২]।) জীবসংশ্লিষ্ট নির্ম্মলতম নয়নরশ্মি বহিঃস্থ ঘটাদি পদার্থকে যেরূপে ক্রোড়ীকৃত করিবে, জীব তাহাকে সেই রূপেই জানিবে[৩৩]। স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ, এ সকলও উক্ত ক্রমে সম্পন্ন হয়, কেবল শব্দ কর্ণগত হইয়া জীবের বোধগম্য হইয়া থাকে[৩৪।৩৫]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনোবৃত্তি, আদর্শ ও কাচ প্রভৃতি পদার্থে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাহা কি? কিংস্বরূপ[৩৬]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বিদিতবেদ্য! প্রতিবিম্বকে তুমি ভ্রান্তি বিশেষ বলিয়া জানিবে[৩৭]। কেবল প্রতিবিম্ব নহে, এই জগৎকেও তুমি ভ্রান্তি বলিয়া জানিবে। জগৎকে তুমি সত্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তরঙ্গ যেমন জলসামান্য হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ, অহং ও তদ্‌গ্রাহ্য জগৎ, সমুদায়কেই তুমি চিজ্জল হইতে অভিন্ন মনে করিবে[৩৮]। সেই যে শ্রেষ্ঠ সমুদ্র, তাহাতে দেশ কাল ক্রিয়া কিছুই নাই। তাহা এক

অব্যয় ও সর্ব্বতোব্যাপী। হে রামচন্দ্র! তুমি অব্যাসক্ত ও প্রশান্ত হও, হৃষ্টস্বভাবে ও সমতায় অবস্থান করতঃ নিরাময় হও[৩৯।৪০]।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমার এই চক্ষুরাদি ছিল না। কমলজ ব্রহ্মা যেমন অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, সেইরূপ, তুমিও অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম[১]। আদি শরীরী ব্রহ্মার যেরূপ কল্পিত পুর্য্যষ্টক, সেইরূপ, তোমারও কল্পিত পুর্য্যষ্টক[২]। গর্ব্ভাবস্থায় যখনই ইন্দ্রিয়গণের উদয় হয় তখন হইতেই পুর্য্যষ্টকোপহিত জীবে ভাবনা ক্রিয়া জন্মিতে থাকে। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এই উভয়কেই তুমি আদিম মন ব্রহ্মার ন্যায় ভাবময় বলিয়া জানিবে[৩।৪]। সম্বিৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশুদ্ধা থাকে, সৃষ্টির পরে তিনি জীবভাবাদিযুক্তা হন, তথাপি তিনি অনিন্দিতা। কেননা, একমাত্র তিনিই পরমার্থ সৎ, আর সব অসৎ। বুদ্ধিবৃত্তি অনেক, তাহাতে সংবিদের প্রতিভাস বা প্রতিবিম্বন মাত্র হয়, সুতরাং সত্য পক্ষে সংবিৎ একই, নানা নহে। অতএব, পুর্য্যষ্টকান্বিত জীবভাবও অসত্য, কেননা তাহাও প্রতিবিম্ব। অতএব পরমাত্মা, মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ের উপরে বিরাজিত! অবিদ্যার কার্য্য তাঁহাতে অসম্ভব[৫।৮]। কেবল শিষ্যোপদেশের জন্যই বলা যায় যে, তাহা হইতে জীবের জন্ম হয়। পরন্তু বাস্তব পক্ষে মন ও জীব উভয়েই ভ্রমজাত। অবিদ্যারূপ ব্যাধি যে স্থান হইতে ও যে প্রকারে আগত হউক বা না হউক, উপদেশে ও বিচারে তাহা বিলীন হইয়া যায়[৯।১০]। অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য লয় প্রাপ্ত হইলে তখন এক মাত্র নির্ম্মল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে। তুমিও ভ্রমরূপিণী অবিদ্যা বিনাশ করিয়া, অস্থায়ী জগদ্ভাব বর্জ্জন করিয়া; নিজ নির্ম্মল রূপে স্থিতি লাভ কর[১১।১২]। অসৎই অবিদ্যার স্বরূপ, সেইজন্য দেখিতে গেলে তাহা

থাকে না। যাহা কোন বস্তু নহে, কে কবে তাহা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হয়? শত বর্ষ চেষ্টা করিলেও কেহ মৃগতৃষ্ণিকা জল প্রাপ্ত হয় না[১৩।১৪]। যাহা অসৎ, তাহা সকল কালেই অসৎ। অসৎ বলিয়া জানা না থাকাতেই তাহা সৎ বা সত্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। পরে যখন জ্ঞান হয়, জানা যায়, তখন আর সে ভ্রম থাকে না[১৫]। জীব ও পুর্য্যষ্টক প্রভৃতি সমস্তই অসত্য, কল্পনা মাত্র, এইরূপ বিচারণা অবিদ্যার নাশক। শাস্ত্রের দ্বারা বুঝাইবার নিমিত্ত জীবাদিবিষয়িণী কল্পনার কথা বলি, তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর[১৬।১৭]। ইতিপূর্ব্বে যে চিৎ-শক্তির কথা বলিয়াছি, সেই চিৎশক্তি পুর্য্যষ্টক উপাধানে জীবত্ব প্রাপ্তের ন্যায় হন। সেইজন্য তিনি যখন যে প্রকার ভাবে ভাবিত হন, সেই প্রকার ভাবই অনুভব করেন। সত্যতঃ হউক বা না হউক, তিনি ভাবেন, অমুক হইয়াছে বা হইয়াছি। যক্ষ সত্যতঃ থাকুক বা না থাকুক, রাত্রিকালে বালকেরা ভাবিয়া লয়, যক্ষ আছে[১৮।১৯]। পঞ্চতন্মাত্রার ও ইন্দ্রিয়াদির কল্পনা ঐরূপেই সম্পন্ন হয় ও সেই কল্পনা হইতেই বহিঃস্থ পঞ্চভূত ও তন্ময় জগৎ জন্ম লাভ করে। অঙ্কুর যেমন শত শাখান্বিত হয়, সেইরূপ, সেই একই কল্পনাবীজ হইতে অসংখ্য কল্পনা প্রাদুর্ভূত হয়। পরে সেই চিতিশক্তি উক্ত প্রকারে ইহা ভিতরে, ইহা বাহিরে, এইরূপ এইরূপ অবধারণ করিয়া লয়[২০।২২]। সে যে বিষয়স্পর্শে সুখানুভব করে, সে সুখ তাহার নিজেরই। পরন্তু ভ্রমের দ্বারা বিবেচনা করে, বিষয় আমাকে সুখী করিতেছে। মরীচের তীক্ষ্ণতা, আকাশের শূন্যতা (অনাবরণত্ব) যেমন অপৃথক্ হইলেও পৃথক্ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই-রূপ, সুখও আপনার অব্যতিরিক্ত হইলেও ব্যবহারে ব্যতিরেকীকৃত হয়[২৩।২৪]। অতএব, জীব প্রোক্ত প্রকার বিষয় ভোগই পুরুষার্থ, ইত্যাকার নিশ্চয় দ্বারা তৎপ্রাপ্ত্যর্থ নানা নিয়ম ও উপায় আশ্রয় করে। এই করিলে এই হয়, অমুক করিলে অমুক হয়, ইত্যাকার দৃঢ় নিয়মের অপর নাম স্বভাব এবং তাহারই দ্বারা কখন কিছু হয়, কখন বা কিছু নাও হয়। সেই প্রাগুক্ত অদ্বয় ব্রহ্ম কথিত প্রকারে দ্বৈত হই-য়াছে। যেমন মধুই খণ্ড (চিনি), যেমন মৃত্তিকাই ঘট, তেমনি, আত্মাই জগৎ। সন্নিবেশ, বিকার, দেশ, কাল, এ সকল ক্রম ঈশ্বরে স্বরূপতঃ অসম্ভব, পরন্তু কল্পনাক্রমে সম্ভবের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে[২৫।২৬]।

বৃক্ষপ্রবিষ্ট একই রস এক স্থানে রস, অন্য স্থানে পত্র, অপর স্থানে পুষ্প, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করে, সেইরূপ, একই ব্রহ্মসত্তা কোথাও ঘট, কোথাও পট, কোথাও কুড্য এবং কোথাও বা অহন্তাদি রূপে প্রকাশ পাইতেছে[২৯,৩০]। একই বারিপ্রদ পদার্থই গ্রীষ্মে তাপরূপে ও বর্ষারম্ভে মেঘরূপে অবস্থান করে, তাহার ন্যায় আত্মাই একত্র সদ্রূপে আবার অন্যত্র অসদ্রূপে প্রথা প্রাপ্ত হন। ইহা এইরূপেই হইবে, ইত্যাদিবিধ অখণ্ড নিয়ম সেই সর্ব্বেশ্বরেই স্থাপিত, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য। আকাশ আকাশে প্রতিবিম্বিত হয় না, দর্পণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় না, উহারা স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবেই প্রকাশ পায়। সেইরূপ, মায়াতীত আত্মাও সর্ব্বত্র স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। যেমন আকাশ ছাড়া বস্তু নাই, সেইরূপ, আত্মা ছাড়া কিছু নাই[৩১,৩৩]। ভূতান্তরে যে আকাশ ভাগ আছে, সে ভাগ প্রথা প্রাপ্ত নহে। কেননা তাহা ভূতান্তরের সহিত একীভাবে অবস্থিত। সেইরূপ, প্রত্যেক মায়া কার্য্যে ব্রহ্মব্যাপ্তি থাকিলেও মায়ার সঙ্গে থাকায় প্রথা প্রাপ্ত নহে। হে রঘুনাথ! কথিত প্রকারে সেই অদ্বয় পদার্থ সদ্বয় হইয়াছে। সৃষ্টিকালে তিনি স্বকীয় মায়া শক্তির দ্বারা যে ভাবে ও যে নিয়মে যদাকারে প্রকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, অসত্য হইলেও সে ভাবকে তিনি বর্ত্তমানে সত্য বলিয়া জানিতেছেন[৩৪,৩৫]। হেমত্ব ও কটকত্ব এই দুই রূপের একটী সত্য, অপরটী মিথ্যা। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজাড্য এই উভয় রূপের একটী রূপ সত্য, অপর রূপ মিথ্যা। চিৎ পদার্থ সর্ব্বত্র থাকিলেও মনঃপদার্থে তাহার প্রকাশ ভাব অধিক। মনঃপদার্থ অর্থাৎ চিত্ত দ্ব্যাত্মক। আরও স্পষ্ট কথা—চিদ্ভাব ও জড়ভাব উভয়রূপী। এই চিত্ত যে ভাব ভাবনা করে সেই ভাবই অনুভব করে, তাহার অন্যথা হয় না। সেই সকল ভাবনার দৃঢ় সংস্কার থাকে, সেই সংস্কার আবার সেই সেই পদার্থের আকারে প্রকট প্রাপ্ত হয়[৩৬,৩৯]। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গ্রাম নগরাদি ক্ষণমধ্যে অন্যথা হইয়া যায়, সে সকল যেমন প্রতিভাময়, জীবের দেহ ও দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ প্রতিভাময় সুতরাং বাস্তব নহে[৪০,৪১]। তেমনি মরণ ও জন্ম স্বপ্নের ন্যায় অসত্য, অর্থাৎ কেবল ভাবময়। বাল্য গেল, যৌবন আসিল, যৌবন গেল বার্দ্ধক্য আসিল, তথা এ দেহ গেল অন্য দেহ হইল, এ সমস্তই ভাবমূলক বা বাসনামাত্র-

সৃষ্ট। স্বপ্নে পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থ অনুভূত হয়, আবার অদৃষ্টপূর্ব্ব পদার্থও অনুভূত হয়। এই যে বিচিত্র জগদ্দর্শন, ইহাও জীবের এক প্রকার জাগ্রৎ স্বপ্ন[৪২।৪৪]। তুমি এমন মনে করিও না যে, ব্রহ্মভাবও স্বপ্ন তুল্য মিথ্যা ও বাসনামাত্রবিনির্ম্মিত। কেননা, ব্রহ্মদর্শনে বা ব্রহ্মে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রতাই সিদ্ধ হয়। সেজন্য তাহা স্বপ্নাদি অবস্থার তুল্য হইতে পারে না[৪৬]। বর্ত্তমান পুরুষকার সমধিক বলশালী হইলে প্রাক্তনী বাসনার অভিভব হইয়া থাকে, ইহা সুক্রিয়ার দ্বারা এতদ্দেহের কুক্রিয়ার অভিভব দৃষ্টে অনুমিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, যত্নজাত প্রবল ব্রহ্মজ্ঞানে আজ্ঞানিক বাসনা নিচয় নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মভাব প্রতিভাসরূপী নহে।) বাসনা, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে, বিনষ্ট হয় না, সেইজন্য বাসনাজাত দেহজন্মাদি ঘটিতে থাকে[৪৭।৪৮]। যেমন শিশুর স্বকল্পিত যক্ষ তাহার সম্মুখে স্থিতি করে সেইরূপ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ভবিষ্যৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ অপরিহার্য্য হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পাঁচ তন্মাত্রা, এই অষ্টকের নাম পুর্য্যষ্টক ও আতিবাহিক দেহ[৪৯।৫০]। এ পুর্য্যষ্টক অমূর্ত্ত অর্থাৎ কেবল ভাবনাময়। বৈরাগ্য ও অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে শমদমাদি সাধন সম্পন্ন ব্যক্তির মন নির্ম্মল হইয়া যায়। অর্থাৎ মনের কল্পনা সকল বিলীন হইয়া যায়। কাযেই ব্রহ্মবোধক মহাবাক্য শ্রবণ দ্বারা কাল্পনিক প্রপঞ্চের বাধ ও তৎক্রমে মুক্তি জন্মে। শাস্ত্রে যে স্থূল পুর্য্যষ্টকের কথা আছে, তদ্বিনাশে মুক্তি হয় না। যেমন জাগ্রৎ অবস্থা গেলেও সুপ্তি থাকে, তাহা হইতে পুনর্জ্জাগ্রৎ আইসে, সেইরূপ, মূর্ত্ত পুর্য্যষ্টক (স্থূল দেহ) গেলেও তৎসঙ্গে সূক্ষ্ম পুর্য্যষ্টক যায় না, সুতরাং মুক্তিও হয় না। অতএব, মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণিত আতিবাহিক দেহ স্থিত থাকে, এবং সেই দেহই পুনঃ পুনঃ স্থূল দেহে প্রবিষ্ট হয়[৫১।৫৪]। কখন বা সুষুপ্তের ন্যায় লুপ্তস্মৃতি অবস্থায় অবস্থান করে[৫৫]। এই যে স্থাবরাদি অবস্থা দেখিতেছ, এই স্থাবরাদি অবস্থাই তাহার (জীবের) দীর্ঘ সুষুপ্তি। যদিও কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবরে পুণ্যাধিক্য বশতঃ কৃমি-কীট-ক্ষুৎ-তৃষ্ণাদিজনিত দুঃখের অভাব দৃষ্ট হয়, *

---

* কল্পবৃক্ষ দেবলোকের বৃক্ষ। ইহার অন্য নাম কল্পতরু। সাধারণ বৃক্ষের নানা দুঃখ, কল্পবৃক্ষের এরূপ নানা দুঃখ নাই। তাহা না থাকার কারণ তাহার পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যসঞ্চার।

তথাপি, সে সকল অবস্থায় প্রবোধের সম্ভাবনা নাই। জড়তাই সুষুপ্তি, স্বপ্নই সংসার, এবং প্রবোধই মুক্তি। জীব কি? কিংস্বরূপ? তাহা বুঝিলেই মুক্তি হয় ও মুক্তি হইলেই পরমাত্মসম্পন্ন হয়। প্রবোধ হইতে যে মুক্তি হয় তাহা দুই প্রকার। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি[৩৮।৩৯]। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তির নাম জীবন্মুক্তি। আর দেহ পাতের পর তুর্য্যাতীত হওয়ার নাম বিদেহমুক্তি। বোধরূপী জীব, তাহার প্রবোধ, এ কথার অর্থ—উপাধি পরিত্যাগে চিন্মাত্র ব্রহ্মরূপে স্থিত হওয়া। সে অবস্থা শাস্ত্রীয় প্রযত্নেরই লভ্য[৬০]। জীবের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, জীব যদি তাহা জানে, তাহা হইলে সে সর্ব্বাবভাসক চিন্ময়তায় স্থিত হয় এবং যে ঐ তত্ত্ব না জানে, সে এই দীর্ঘস্বপ্নরূপ সংসার ও ভয় প্রাপ্ত হয়[৬১]। সংসারের উদয়ও মিথ্যা ও ভয় প্রাপ্তিও মিথ্যা। বস্তুতঃই চিদংশ ব্যতীত জীবহৃদয়ে অন্য কিছু নাই[৬২]। জীব মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা আপনিই আপনাকে বিভিন্নরূপে দেখে ও মিথ্যা শোকে অভিভূত হয়। ফলতঃ জীবে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোন সৎ পদার্থের অবস্থান নাই[৬৩]। অহো! মায়ার কি চমৎকার প্রভাব! যাহাতে জগৎ নাই, অথচ, তাহাতেই জগদ্দৃষ্ট হয়। স্থালীমধ্যগত জল যখন ক্কথিত হইতে থাকে তখন যেমন তাহাতে নানা ভাব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম জীবে বিচিত্র সংসারের দর্শন হইয়া থাকে। বাসনাই ইহার বন্ধন ও বাসনার বিনাশই ইহার মোক্ষ[৬৪।৬৫]। বাসনার চরম সীমা সৌষুপ্তি স্থিতি। কেননা বাসনারই ঘনীভাবে সুষুপ্তিবৎ অবস্থা জন্মে। সেই ঘনীভূত অব্যক্ত বাসনাপুঞ্জের বৈচিত্র্য ও কিঞ্চিৎ স্ফুটভাব স্বপ্নে এবং তাহারই যৎপরোনাস্তি বিস্পষ্টতা জাগ্রতে। মোহের বা মায়ার যৎপরোনাস্তি গাঢ়তায় স্থাবর, তদপেক্ষা অল্প বাসনায় তির্য্যক্, তদপেক্ষা অল্প বাসনায় মনুষ্য, তদপেক্ষা ন্যূন বাসনায় গন্ধর্ব্ব ও তদপেক্ষা অল্প বাসনায় দেবতাদি ভাব প্রাপ্ত হয়। এই জীব যখন আপনাকে দেহমাত্রব্যাপী বলিয়া জানে, তখনই কে আপনার বাহিরে আছে ও বাহিরে ঘটাদি পদার্থ আছে এইরূপ পৃথক্ প্রতীতির বশ হয়[৬৬।৬৭]। জীবচৈতন্য শরীরের ন্যায় শরীরের বাহিরেও আছে, যে স্থানে ঘটাদি সে স্থানেও আছে, জীব তাহা জানে না। তাই সে যখন মনোবৃত্তির দ্বারা বহির্ভাগবর্ত্তী ঘটাদি প্রদেশে এক হইয়া যায় (মিলিত হইয়া যায়) তখনই সে আমি ঘট

জানিতেছি বলিয়া মনে করে[৬৮]। অতএব, অভিহিত প্রকারের গ্রাহ্য গ্রাহক ভেদ মরুমরীচিকায় জল বুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা। বাহিরে ও অন্তরে, সর্ব্বত্রই একাত্মর আত্মারই প্রকাশ, ইহা অবধারিত জানিবে[৬৯।৭০]।

সমুদ্র ও জল বস্তুতঃ একই পদার্থ। অর্থাৎ সমুদ্র জল ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ বস্তু নহে। সেইরূপ এই জগৎও সেই অনাদি অনন্ত অনাময় পরম পদ হইতে পৃথক্‌ভূত নহে[৭১]।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রথম জীবের (জীবঘন বা সমষ্টিজীব ব্রহ্মার) যে স্বপ্ন, তাহাই অস্মদাদি ব্যষ্টি জীবের জাগ্রৎ ও সংসার। ইহা সত্যও নহে, অসত্যও নহে, পরন্তু অনির্ব্বচনীয়[১]। এই যে অস্মদাদি ব্যষ্টি জীবের জাগ্রৎ প্রসিদ্ধ ভূত ভুবনাদি, ইহা সেই প্রথম জীবের স্বপ্ন (কল্পিত বলিয়া স্বপ্ন) সুতরাং ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয়বিধ। হে অনঘ! যে হেতু ইহা অসত্য বা অবস্তু, সেই হেতু ইহা স্বপ্ন[২।৩]। জীব এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইতেছে (এক জন্ম ত্যাগের পর অন্য জন্ম অনুভব করিতেছে) এবং মিথ্যা হইলেও ইহাকে সত্য ভাবিতেছে[৪]। বৎস! বলা বাহুল্য যে, জীব অসংখ্য প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া কেবল ভ্রান্ত অভিমানেই কাল কর্ত্তন করিতেছে[৫।৬]। জীব সর্ব্বগত ও আদ্যন্ত রহিত। তথাপি ভাবনার দ্বারা এ সকলকে সত্য মনে করিতেছে[৭]। হে মহাবাহো! আগামী কালে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের উপদিষ্ট সঙ্গত্যাগরূপা গতি অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হইবেন[৮।৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন কোন্ সময়ে জন্মিবেন এবং ভগবান্ হরি তাঁহাকে কিরূপ সঙ্গ ত্যাগের কথা উপদেশ করিবেন তাহা আমাকে বলুন[১০]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আকাশ যেমন স্বমহিমায় স্থিত, সেইরূপ, স্বমহিমায় স্থিত আদ্যন্তরহিত সদ্রূপ পরমাত্মায় এই সংসার ভ্রান্তি স্ফুরিত হইয়াছে। যেমন সুবর্ণে হাব কেয়ূরাদি, যেমন জলে ফেণ তরঙ্গাদি, সেইরূপ, তাঁহাতেই এই চতুর্দ্দশ ভুবন ও ভুবনান্তর্গত ভূতসমূহ (প্রাণিগণ) এই সংসার জালে জড়িত। যম, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি ইহাতে লোকপাল পদে অবস্থিত। ইহা ভাল, ইহা কর্ত্তব্য, ইহা মন্দ, ইহা অকর্ত্তব্য, এ সকল নিয়ম তাঁহাদেরই দ্বারা স্থাপিত[১১,১৫]। তাঁহারা সকলেই বহুকাল যাবৎ স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবান্ যম প্রত্যেক চতুর্থ যুগে প্রাণিবধজনিত পাপ বিমোচনার্থ তপোনিষ্ঠ হন। কোন যুগে ৮ বৎসর, কোন যুগে ১২ বৎসর, কোন যুগে ১৫ বৎসর এবং কোন যুগে ১৬ বৎসর স্বকার্য্যে উদাসীন হন অর্থাৎ প্রাণিহিংসা করেন না। তৎকারণে পৃথিবী প্রাণিপরিপূর্ণা ও ভারাক্রান্তা হয়। এই সময়ে অন্যান্য দেবতাদিগকে ভারাবতরণপ্রয়োজনে প্রাণিবিনাশার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ ব্যবহার ও এরূপ যুগ ও যুগবিপর্য্যয় যে কত অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই[১৬,২২]। এখন যিনি পিতৃপতি, যাঁহার নাম বৈবস্বত যম, তিনি এই বর্ত্তমান মহাযুগের শেষ ভাগে প্রাণিবধজনিত পাপের বিনাশার্থ দ্বাদশ বার্ষিক অহিংসা ব্রত ধারণ করিবেন, তাহাতেই এই পৃথিবী তৎকালে ভারাক্রান্তা হইয়া ভগবান্ হরির শরণাপন্না হইবেন। এবং হরিও দুই দেহে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন[২৩,২৭]। এক দেহ বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব আখ্যা প্রাপ্ত হইবে তথা অন্য দেহ দ্বিতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাম প্রাপ্ত হইবে[২৮]। প্রথম পাণ্ডবের যুধিষ্ঠির নাম হইবে। এই যুধিষ্ঠির সসাগরা ধরার অধিপতি ও ধার্ম্মিকোত্তম হইবে। ইহার পিতৃব্য ভ্রাতা দুর্য্যোধন, তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী পাণ্ডুপুত্র ভীম, ইহারা পৃথিবী রাজ্য লইবার জন্য যুদ্ধপ্রবৃত্ত হইবে এবং সেই যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইবে[২৯,৩১]। অর্জ্জুনদেহধারী বিষ্ণু সে সমুদায় যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ভারাক্রান্তা পৃথিবীকে স্বস্থা করিবেন। তিনি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় হর্ষবিষাদাদি দেখাইবেন এবং সেনামধ্যগত বন্ধুবিনাশের আশঙ্কা দেখাইয়া যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিবেন[৩২,৩৪]। হে রঘুনাথ! ভগবান্ হরি কৃষ্ণ দেহে স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধযুক্ত অর্জ্জুন দেহকে বক্ষ্যমাণ উপদেশ

সকল প্রদান করিবেন[৩৫]। "আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধিও নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। শরীরই হত হয়, আত্মা হত হন না। যে ইঁহাকে হন্তা বলিয়া জানে, সে ইঁহাকে জানে না। অথবা যে ইঁহাকে হত বলিয়া জানে, সেও ইঁহাকে জানে না [৩৬।৩৭]। যে আত্মা অনন্ত, একরূপ, নিত্যসৎ, আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম (দুর্লক্ষ্য) ও সকলের উপাদান ও নিমিত্ত, কি প্রকারে ও কে তাঁহার নাশক হইবে[৩৮]?"

হে সম্বিদাত্মন্! তুমি আপনাকে দেখ। তুমি অনন্ত, অব্যক্ত, অনাদি, অমধ্য, নির্দ্দোষ, অজ, নিত্য ও নিরাময়। নিরবচ্ছিন্ন সম্বিদ্‌ই তোমার স্বরূপ[৩৯]।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

—০*০—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি হন্তা নহ। আমি হন্তা, এ অভিমান মিথ্যা। সেজন্য তুমি ঐ অভিমান ত্যাগ কর। তুমি জরা মরণ বর্জ্জিত শাশ্বত আত্মা[১]। যাহার আমি করি এ ভাব নাই, এবং যাহার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত হয় না, সে এই সমুদায় লোক হনন করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না[২]। মনোবৃত্তিই জন্মে, সংবিদ্ তাহাতে প্রতিফলিত হয়, সেই প্রতিফলনকেই আরোপক্রমে "জন্মে" বলা হয় ও তাহাকেই লোকে অনুভব শব্দে উল্লেখ করে। অতএব এই, ইহা, তাহা, সেই আমি, উহা আমার, এবমেবং সম্বিৎ তুমি পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ মিথ্যা বা তুচ্ছ বোধ করিবে[৩]। হে ভারত! যদি তুমি উহাতে লিপ্ত হও তাহা হইলে তুমি সুখদুঃখভাগী ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইবে[৪]। আপনার অন্তর্গত সত্ত্বাদি গুণই কার্য্য করে, তাহারাই কর্ত্তা, পরন্তু মোহ বশতঃ আমি করি, এইরূপ অভিমান আবির্ভূত হয়[৫]। চক্ষু দেখুক, কর্ণ

শুনুক, ত্বক্ স্পর্শ করুক, রসনা রস গ্রহণ করুক, তাহাতে অহং-যোগ কর কেন? সঙ্কল্প বিকল্প মনোধর্ম্ম, মন তাহা করুক, তাহাতে অহং আরোপ করিয়া ক্লেশভাগী হও কেন? বহুর সংঘাত শরীর, সমস্ত তাহারই দ্বারা কৃত হয়, অথচ অজ্ঞ লোক ভাবে, আমি করিলাম। ঐ প্রকার অভিমানই অর্থাৎ অহং-অভিমানই দুঃখের ও উপহাস্যের কারণ[৭।৮]। যোগীরা স্বাত্মশুদ্ধি কামনায় অসঙ্গ হইয়া শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এ সকলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন[৯]। অহন্তারূপ বিষ যাহাকে আক্রম করিতে পারে না, তাহারা কর্ম্ম করিলেও তন্নিমিত্তক সুখদুঃখ-ভাগী হয় না[১০]। মমতারূপ দোষে দূষিত শরীর অত্যন্ত অশোভন[১১]। যে নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, ক্ষমাশীল, সে কৃতকর্ম্মে ও তাহার ফলে অলিপ্ত থাকে[১২]। হে পাণ্ডব! তুমি ক্ষত্রিয়, এই যুদ্ধকার্য্য তোমার স্বধর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত ক্রূর অনুষ্ঠানও শ্রেয়স্কর, স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ নির্দ্দোষ অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যখন মূর্খের অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম মঙ্গলাবহ বৈ অমঙ্গলাবহ নহে, তখন জ্ঞানীর অনুষ্ঠিত স্বকর্ম্ম মঙ্গলাবহ, এ কথা বলা বাহুল্য। অহঙ্কার যাহার বুদ্ধি হইতে বিগলিত হইয়াছে সে কোন প্রকার তাপ পাপে লিপ্ত হয় না[১৩।১৫]। হে ধনঞ্জয়! তুমি ফলাফল লক্ষ্য না করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে। নিঃসঙ্গ থাকিয়া যথোপস্থিত কর্ম্ম করিলে তাহা তোমার বন্ধনজনক হইবে না[১৬]। তুমি ব্রহ্ম ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্ম করিবে ও কৃত-কর্ম্মকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিবে। সমুদায় পদার্থ, সমুদায় প্রার্থনা, সমুদায় কামনা ও সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ স্বয়ং ঈশ্বরাত্মা (ঈশ্বরাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণ অথবা ঈশ্বরে নিমগ্ন) হও[১৭।১৮]। সঙ্কল্প সমুদায় পরিত্যাগ কর, সম ও শান্তমনা হও এবং সঙ্গত্যাগরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্ত হও[১৯]।

অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মার্পণ, ঈশ্বরার্পণ, সংন্যাস, জ্ঞান ও যোগ, এই ছয়ের বিভাগ কিরূপ তাহা আমাকে বলুন[২০।২১]?

ভগবান্ বলিলেন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের ও বাসনার (কর্ম্মসংস্কারের) শান্তি হইলে তখন ভাবনার কোন প্রকার আকার থাকে না। পণ্ডি-তেরা সেই অবস্থাকে ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ বলেন। ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি উদিত হইয়া অজ্ঞানকে নিরবশেষ বিনাশ করিলে তাহা জ্ঞান আখ্যা

প্রাপ্ত হয়। যে মনোবৃত্তির প্রবাহ অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ, সেই ব্রহ্ম-বুদ্ধির প্রবাহ যোগ। কি জগৎ কি আমি সমস্তই ব্রহ্ম, এই বুদ্ধিকে কর্ম্মকরণ কালে অবিচ্ছিন্ন রাখার নাম ব্রহ্মার্পণ[২২।২৩]। ব্রহ্মভাব এইরূপে ব্যাখ্যাত হয়—যেমন কোন প্রস্তরের অন্তরে ও বাহিরে একরূপ, সেই প্রকার ব্রহ্মও অন্তরে ও বাহিরে একরূপ। আকাশ যেমন স্বচ্ছস্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মও স্বচ্ছস্বভাব। তিনি দৃশ্যপ্রপঞ্চের অতীত অথচ দৃশ্যপ্রপঞ্চের দ্রষ্টা, প্রকাশক ও সাক্ষী[২৪]। তাহাতেই অত্যল্পমিথ্যা ভেদরূপী এই জগৎ প্রতিভাসিত হইতেছে[২৫]। অহং—আমি এ ভাব তাহারই অন্তর্গত ও তদ্রূপে ভাসমান। অহং—আমি এ ভাবটী তাহাতেই অধ্যস্ত বা অসত্য। সেজন্য অহং ভাবের গ্রহণ প্রকৃত গ্রহণ নহে অর্থাৎ আমি বলিয়া আগ্রহ করা উচিত নহে[২৬]। যাহাতে অর্থাৎ যে আধারে অহং—আমি এই ভাবের উদয় হইয়াছে সে আধার পরিচ্ছেদবর্জ্জিত। অর্থাৎ অসীম ও তাহা আমি এই ভাব হইতে অপৃথক্। সেইজন্য সকলেই আমি আছি এইরূপ জানে, আমি নহি বা নাই বলিয়া কেহ জানে না[২৭]। যেমন অহম্ভাব অপৃথক্ তেমনি এই ঘট, এই পট, ইত্যাদি ভাবও সেই অসীম ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। কেননা ঘটাদি ভাবও সেই অসীম ব্রহ্মে উদিত হইতেছে[২৮]। যে অসীম ব্রহ্মে অহং মম—আমি আমার অথবা এই ইহা এই দ্বিবিধ ভাব স্ফুরিত হইতেছে। জলে লহরীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সেই অসীম ব্রহ্মই প্রতি দেহে আত্মচৈতন্য আখ্যায় প্রথিত। অতএব, উক্ত প্রকারে বিচিত্র হইলেও বাস্তবতঃ সেই ব্রহ্মনামক সংবিৎ এক বলিয়া গণনীয়[২৯]। অপর উপদেশ এই যে, বুদ্ধিবিশেষের দ্বারা অহং মম ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অহং মম ভাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মফলত্যাগরূপ সংন্যাস বিনা চেষ্টায় সুসিদ্ধ হয়[৩০]। সঙ্কল্পজাল পরিত্যাগের নাম অসঙ্গ এবং সমুদায় দ্বৈতপ্রপঞ্চ ঈশ্বরের অনতিরিক্ত; যেমন সমুদায় মৃদ্বিকার মৃত্তিকার অনতিরিক্ত সেইরূপ অনতিরিক্ত, এই জ্ঞানের নাম ঈশ্বরার্পণ। ভেদ অজ্ঞানমূলক এবং তাহাও কেবল নামে, অর্থে নহে। অর্থ সেই একাদ্বয় চিদাত্মা[৩১।৩২]। শব্দই বল, আর অর্থই বল, সমস্তই বোধ। অন্য কিছু নহে। সুতরাং দিক্, জগৎ, আমি, আমার, তুমি, তোমার, ক্রিয়া, কাল, এ সমস্তই বোধাত্মা আমি। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি মদেকচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও;

তথা আমাকেই নমস্কার কর। যদি তুমি মৎপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে অর্থাৎ আমারই একীভাবে স্থিত হইবে[৩৩।৩৪]।

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার রূপ দ্বিবিধ। সগুণ ও নির্গুণ। তন্মধ্যে কোন্ অবস্থায় কোন্ রূপ আশ্রয়ণীয় তাহা আমাকে বলুন[৩৫]।

ভগবান্ বলিলেন, আমার যে রূপ জনসাধারণের বোধ যোগ্য, তাহা সামান্য নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই সামান্য রূপ হস্তপদাদিবিশিষ্ট ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর আমার যে স্বরূপ অনাদি অনন্ত ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ বা ভেদ বিবর্জ্জিত, সেই রূপকেই পরম বলিয়া বিদিত হইবে। আমার এই পরম রূপই ব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি শব্দে অভিহিত হয়[৩৬।৩৭]। যাবৎ না তুমি প্রবুদ্ধ হইবে, মৃষ্ট-অজ্ঞানমালিন্য হইবে, তাবৎ তুমি আমার সেই চতুর্ভুজ রূপের পূজাদি করিবে[৩৮]। চতুর্ভুজ রূপের পূজাদি করিতে করিতে তোমার অজ্ঞানমালিন্য বিদূরিত হইবে, তুমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি আমার অভিহিত পরম স্বরূপ জ্ঞানগোচর করিয়া কৃতার্থ হইবে[৩৯]। যদি তুমি আমাকে ও আপনাকে একাদ্বয় বিশুদ্ধ চিন্মাত্র বলিয়া জান, তাহা হইলে তন্নিষ্ঠ হইয়া থাক। আমি যে তোমাকে আমি তুমি ও তাহা ইহা বলিতেছি, এ সমস্তকে তুমি উপদেশের পন্থা বলিয়া জানিবে, ফলতঃ ঐ সমস্তই এক আত্মতত্ত্ব[৪০।৪১]। তুমি সর্ব্বভূতে আত্মাবস্থান ও আত্মায় সর্ব্বভূতের অবস্থান দর্শন করিবে[৪২।৪৩]। যে ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বভূতাবস্থিত ও এক দর্শন করে, সে জরাজন্মমরণাদির অতীত হয়[৪৪]। জীব যখন আত্মাতেই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বভূত তদব্যতিরেকে স্থিত, এইরূপে আত্মদর্শী হয়, তখন সেই সর্ব্বশব্দ একত্বে পর্য্যবসিত হয় এবং একত্বও আত্মায় সমাপ্ত হয়। এই তত্ত্ব অবগত হইবামাত্রই কৈবল্য জন্মিয়া থাকে। যাহাতে বা যাহার দ্বারা এই ত্রৈলোক্য প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে[৪৫।৪৬]। যে পদার্থ লোকত্রয়বর্ত্তী জলের রস ও দুগ্ধাদি পদার্থের স্বাদ জানিতেছে সেই পদার্থকে তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে[৪৭]। যিনি সমুদায় শরীরের অন্তরে দুর্লক্ষ্য অথচ অনুভবরূপে স্থিতি করিতেছেন, অনুভবনীয় বিষয়ের অতিরিক্ত সেই পদার্থকে তুমি সর্ব্বব্যাপী আত্মা বলিয়া জানিবে। দুগ্ধে ঘৃতের অবস্থিতির ন্যায় যিনি সমুদায় পদার্থে অবস্থিত, সেই পদার্থকে

তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে[৪৮।৪৯]। যেমন সমুদায় রত্নের অন্তরে ও বাহিরে তেজের অবস্থিতি, সেইরূপ, সমুদায় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মার অবস্থিতি[৫০]। যেমন সহস্র সহস্র কুম্ভের অন্তরে ও বাহিরে আকাশের অস্তিতা, তেমনি, ত্রিজগতীস্থ সমুদায় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মার অস্তিতা[৫১]। যেমন শত শত মুক্তা একই সূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ, লক্ষ লক্ষ দেহ এক আত্মায় গ্রথিত, অথচ দুর্লক্ষ্য[৫২]। ব্রহ্মাদি তৃণান্ত পদার্থের সত্তাকে সাধারণ সত্তা বলা যায়, সেই সাধারণ সত্তাই আত্মা[৫৩]। সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে আত্মার নির্ব্বিকার অবস্থানের নাম ব্রহ্মতা, এই ব্রহ্মতাই বাস্তবী, আর সর্ব্বান্তর্যামিরূপে মুক্তা সমূহে সূত্রের ন্যায় অবস্থিতির নাম জীবতা। এই জীবতা অবাস্তবী। হন্তা ও হন্তব্য প্রভৃতি ভাব এই অবাস্তব ভাবের অন্তর্গত। সুতরাং হে অর্জ্জুন! জগতের এইরূপ যখন আত্মারই রূপ, তখন আর বাস্তবতঃ কে কাহাকে হনন করিবে? তথা কে-ই বা জগতের শুভাশুভ দ্বারা লিপ্ত হইবে[৫৪।৫৫]। যে ব্যক্তি আদর্শে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় আত্মায় জগদ্ভাবের অবস্থান দেখে, ও জগতের বিনাশে আত্মার অবিনাশ দেখে, সেই ব্যক্তির দর্শনই যথার্থ[৫৬]। হে পাণ্ডব! আমি বলিতেছি কি, আমি বলিতেছি, এ সমস্তই আমি, এ সকল অন্য কিছু নহে। তুমিও আমাকে ঐরূপ সর্ব্বাত্মক বলিয়া জান। এ সকলের সৃষ্টি ও প্রলয় আত্মাতেই প্রকট-মান এবং সামুদ্র তরঙ্গের অনুরূপ[৫৭।৫৮]। পদার্থের আত্মতা শৈলের প্রস্তরত্বের, বৃক্ষের কাষ্ঠত্বের ও তরঙ্গের জলত্বের অনুরূপ[৫৯]। যে ব্যক্তি আপনাকেই সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতে আপনাকে স্থিত দেখে, সেই ব্যক্তিই আপনাকে অকর্ত্তা দেখে। যেমন নানা আকারের তরঙ্গে জল, হার কেয়ূরাদি অলঙ্কারের সুবর্ণ, হে অর্জ্জুন! সেইরূপ সমুদায় ভূতে আত্মা[৬০।৬১]। যেমন জলে নানা আকারের তরঙ্গ, সুবর্ণে হারকেয়ূরাদি, সেইরূপ পরমাত্মায় এই বিশ্ব[৬২]। হে ভারত! এই সকল পদার্থ, এই সকল ভূত ও ব্রহ্ম, এ সকল একই, পৃথক্ নহে[৬৩]। ব্রহ্ম যখন এক ও নির্ব্বিকার, জগৎ যখন নানা ও সবিকার, তখন ইহাও বুঝা উচিত যে, অসমাবেশ প্রযুক্ত জগৎ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মে জগৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অতএব, বন্ধুবধাদিসমুখ পরিতাপ মোহ ব্যতীত বাস্তব নহে[৬৪]। এই তত্ত্ব শ্রবণের দ্বারা তুমি অভয় ব্রহ্ম অনুভব করতঃ

জীবন্মুক্ত হও[৬৫]। যাঁহারা মোহগ্রস্ত নহেন, মান মোহ ও সঙ্গদোষ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মরতি, নিবৃত্তকাম, দ্বন্দ্বাতীত, সুখদুঃখ-ব্যাসক্ত নহেন, তাঁহারা বর্ণিত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন[৬৬]।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

—:():—

ভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহু অর্জ্জুন! আমি প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার তোমাকে যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর[১]। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সম্পর্ক লাভ করিয়া শীত ও উষ্ণাদি অনুভব করায়, তাহাকেই সুখ ও দুঃখাদি জন্মিতেছে বলা যায়। হে ভারত! উৎপত্তি ও বিনাশ বিশিষ্ট ঐ সকলকে তুমি উপেক্ষা করিবে। উপেক্ষা করা একাত্মদর্শীর পক্ষে অসম্ভব নহে। উপেক্ষা বা বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে তখন ঐ সকল স্বাত্মভূত হইয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা ঐ সকলের সেই সেই অনুভব প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। অনবয়ব ও পরিপূর্ণস্বভাব আত্মার আবার সুখ কি? দুঃখই বা কি[২।৩]? যাহার ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের সত্যতা বোধ উপশান্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ধীর ও মোক্ষভাগী[৪]। এ সমস্তই যখন আনন্দময় আত্মা, ইহা সুখ ও ইহা দুঃখ, এ সকল ভেদ যখন ভ্রমাত্মক, তখন তাহা কেন না উপশান্ত হইবে[৫]? যখন কেবল মাত্র আত্মারই অস্তিতা আছে, অন্য কিছুর অস্তিতা নাই, তখন অনাত্মবিষয়ের ও তৎসংস্পর্শজনিত সুখ দুঃখাদির অস্তিতা থাকিবে কেন[৬]? যাহা নাই তাহা হয় না এবং যাহা আছে তাহারও অভাব হয় না। সর্ব্বগ পরমাত্মাই আছে, সুখ দুঃখাদি নাই[৭]। তুমি জগৎ ও আত্মা এ দুয়ের সত্তা ও অসত্তা অর্থাৎ জগৎ আছে, পরমাত্মা নাই, এরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, তথা উক্ত উভয়ের সম্বন্ধঘটক অজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, চিন্মাত্রপ্রতিষ্ঠ হও[৮]। আত্মা শরীরের

অন্তরে স্থিত, চেতন ও দৃশ্যদর্শী হইলেও সুখের দ্বারা হৃষ্ট হন না, দুঃখের দ্বারা ম্লান হন না। হর্ষ ও গ্লানি মনের, আত্মার নহে[৯]। জড়স্বভাব মনই দুঃখভাগী, তাহার প্রক্ষয়ে আত্মার ক্ষতি হয় না[১০]। এই যে চিত্তাদিঘটিত জীবভাব, এই জীবভাবই ভোক্তা অর্থাৎ সুখ-দুঃখভোগী। এই জীবভাব ও সুখদুঃখাদি ভোগ, সমস্তই মায়াসৃষ্ট অর্থাৎ ভ্রান্তিজনিত। সত্যকল্পে দেহাদিও নাই, দুঃখাদিও নাই[১১।১২]। যে হেতু দুঃখ এক প্রকার ভ্রান্তি, সেই হেতু তাহা সত্যজ্ঞাননাশ্য। (সত্য-জ্ঞান আত্মতত্ত্বজ্ঞান)। যেমন রজ্জুজ্ঞানে অজ্ঞানজাত সর্পভয় বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞানজাত দেহাদিঘটিত দুঃখাদির বিনাশ হয় [১৩।১৪]। জন্মাদিরহিত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের জন্মও নাই, নাশও নাই, এইরূপ বোধ সত্য, পরম সত্য[১৫]। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে এ সকল তরঙ্গের ন্যায় হইতেছে ও যাইতেছে। বোধের উদয় হওয়ায় এখন তুমি নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র[১৬]। কাল, ক্রিয়া, দেশ, তুমি, আমি, সেনা, এরূপ ভেদবুদ্ধি যে ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ, সে ব্রহ্মসমুদ্রে সত্যতঃ কোন ভাব বা অভাব নাই। তুমি মান, মদ, শোক, ভয়, চেষ্টা, সুখ, অসুখ, এরূপ দ্বৈত বুদ্ধি ত্যাগ কর, করিয়া কেবল সম্বিন্ময় হও। তুমি যে সেনা ক্ষয় করিবে, সে সেনাও তুমি, এইরূপ অনুভব করতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মময় হও। সুখদুঃখবোধশূন্য ও লাভালাভজ্ঞানশূন্য ও জয়পরাজয় অনুসন্ধানবর্জ্জিত হও। কেননা তুমি নিষ্কলঙ্ক নিরাময় ব্রহ্ম[১৭।২০]। লাভালাভে সমবুদ্ধি হইয়া নিঃসঙ্কল্পে কার্য্য কর। যে কার্য্য করিবে, যাহা ভক্ষণ করিবে, যে হোম বা দান করিবে, সমস্তকেই তুমি পরমাত্মা ভাবিবে। জীব অন্তকালে যন্ময় হয় জন্মকালে তাহাই হইয়া জন্মে। এই দৃষ্টান্তে তুমি সত্য ব্রহ্ম পাইবার জন্য সত্য ব্রহ্মময় হও[২১।২৩]। ফলানুসন্ধান বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত হও। ব্রহ্মজ্ঞগণ ঐরূপ কেবল কর্ম্ম অর্থাৎ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে, এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ ব্রহ্মে নিত্য-প্রতিষ্ঠরূপ কর্ম্ম দর্শন করে, সেই ব্যক্তি মনুষ্যসংঘের মধ্যে বুদ্ধিমান্। তুমি কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মকরণে সমাসক্ত হইও না। হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগে অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবোধে স্থিত ও কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগী হইয়া কর্ম্ম করিবে[২৪।২৬]। মূঢ়তা, কর্ম্মাসক্তি ও নিষ্কর্ম্মতা বর্জ্জন করিয়া সম ও

স্বস্থ ও যথাপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থান কর। যে কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগী ও নিত্যতৃপ্ত, সেইযোগী কর্ম্ম করিলেও তাঁহাকে কিছু করেন না বলিতে পারা যায়। আসক্তিই করে, সুতরাং তাহাকেই কর্ম্মকর্ত্রী বলা যায়। যদি আসক্তি ত্যাগ না হয় তাহা হইলে না করিলেও করার ফল হয়। মন যদি মূর্খতাগ্রস্ত থাকে তাহা হইলে তৎসঙ্গে আসক্তিও থাকে। অতএব, মূর্খতাই সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য[২৭,২৯]। তত্ত্বজ্ঞ ও আসক্তিশূন্য, এরূপ মহাত্মা কর্ম্ম করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃতার উদয় হয় না। কর্ত্তৃতার অনুদয়ে ভোক্তৃতার অনুদয়, ভোক্তৃতার অনুদয়ে সাম্য, সেই সাম্য হইতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়[৩০,৩১]। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি ভেদ-বুদ্ধি বর্জ্জনপূর্ব্বক পরমাত্মপর হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তুমি সত্য সত্যই অকর্ত্তা হইবে। যে ব্যক্তি কাম ও সঙ্কল্পরহিত হইয়া কার্য্যা-নুষ্ঠান করে ঋষিরা তাহাকেই পণ্ডিত বলেন। হে অর্জ্জুন! জ্ঞানরূপ বহ্নি সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে, এ কথার অর্থ—ঐরূপ জ্ঞানীর ঐরূপ কার্য্য মিথ্যা বা নিষ্ফল হইয়া যায়[৩২,৩৩]। যে ব্যক্তি উৎকর্ষাপকর্ষ প্রতীক্ষা করে না, চন্দ্রের ন্যায় শীতলস্বভাব থাকে, স্থির ও আত্মনিষ্ঠ, ও সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া কাল কর্ত্তন করে, বুঝিবে যে, সে অব্যগ্র হইয়াছে। তুমিও দ্বন্দ্বাতীত, সত্ত্বস্থ, যোগক্ষেমস্পৃহাশূন্য ও আত্মরত হইয়া যথোপস্থিত ব্যবহার নির্ব্বাহ করিবে[৩৪,৩৫]। যে মনুষ্য কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করে, অথচ বিষয় বিস্মৃত হয় না, এরূপ মনুষ্য মূঢ় ও মিথ্যাচারী। যে মনের সহিত অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালন করে, তাহাকে আমরা বিশিষ্ট মনুষ্য বলি[৩৬,৩৭]।
যেমন নদ নদীর সমগ্র প্রবাহ পরিপূর্ণস্বভাব সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সমুদায় কামনা যাহাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই শান্তি লাভ করে। যে কাম্যকামী সে শান্তি লাভ করিতে পারে না[৩৮]।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ বলিলেন, ভোগ ত্যাগের জন্ত যত্নও করিবেক না এবং ভোগ সৌষ্ঠবের চিন্তাও করিবে না। লাভ অলাভ সমান জ্ঞান করিয়া যথোপস্থিতের অনুবর্ত্তী হইবে[১]। এই দেহ আত্মা নহে, ইহাতে তুমি আত্মভাব স্থাপন করিও না। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা অবিনাশী[২।৩]। শীর্ণতা দেহেরই ধর্ম্ম, দেহই জীর্ণ শীর্ণ হয়, আত্মা অশীর্ণস্বভাব। যে সর্ব্বপ্রকার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছে, সে কিছু করিলেও করেনা বলিয়া উক্ত হয়[৪]। পণ্ডিতেরা বলেন, আসক্তিই করে অর্থাৎ আসক্তিই কর্ত্তা, এবং তাহা যাহার ত্যাগ হয় নাই, সে বাহিরে কিছু না করিলেও অন্তরে কর্ত্তা। যে হেতু তাহা মনের মূর্খতা বশতঃ সংঘটন হয় সেই হেতু মূর্খতা সর্ব্বতঃ উপায়ে পরিত্যাজ্য[৫]। আসক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তৃতার উদয় হয় না[৬]। মনীষিগণ জানেন যে, আত্মা অবিনাশী ও অনাদি অনন্ত। "আত্মা বিনষ্ট হয়" এ দুর্ব্বোধ যেন তোমার না হয়[৭]। আত্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্মাকে নশ্বর বলিয়া জানেন না। কেননা তাঁহারা আত্মাকেই আত্মা বলিয়া জানেন, অনাত্মদেহাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানেন না[৮]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জগন্নাথ! মূঢ়েরা দেহাদি পদার্থকে আত্মা বলিয়া জানে জানুক, পরন্তু বিজ্ঞেরা ত তাহা জানেন না, তবে কেন তাঁহাদের ধন পুত্রাদি ইষ্ট বস্তু বিনষ্ট হয়? ধন পুত্রাদির বিনাশ কি তাঁহাদের ইষ্ট বিনাশ হয় না?

ভগবান্ বলিলেন, তাহাই বটে। অর্থাৎ বিজ্ঞদিগের ইষ্ট বিনাশ হয় না। কেননা তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্তই একমাত্র অবিনাশী আত্মা। যাঁহারা জানেন সমস্তই আত্মা ও তাহা অবিনাশী, তখন আর কোথায় কাহার কি বিনষ্ট হইবে? ইহা নষ্ট হইল, ইহা লব্ধ হইল, এ সম্বং

ওই মোহের কার্য্য। মোহ ব্যতীত ঐ সকলের ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বন্ধ্যাপুত্রের অস্তিতার অনুরূপ[৯।১১]। যাহা নাই, তাহার আবার হওয়া কি? যাহা আছে তাহার আবার বিনাশ কি? তত্ত্বদর্শীরা ভাব অ-ভাবের এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, যাহা আছে তাহা সদাকালই আছে এবং যাহা নাই তাহা সদাকালই নাই[১২]। তুমি সেই পদার্থ অবি-নাশী বলিয়া জানিবে—যে পদার্থ সর্ব্বব্যাপী। কেহই সেই অনশ্বর পদার্থের নাশ সম্ভাবনা করিতে সমর্থ নহে[১৩]। এই সকল দেহই নশ্বর, দেহী নশ্বর নহে। সেই জন্যই বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধ কর[১৪]। একই আত্মা আছেন, দুই নাই। যাহা নাই তাহার আবার সম্ভব অসম্ভব অর্থাৎ হওয়া না হওয়া কি? সদ্রূপী আত্মার বিনাশ নাই। দ্বিত্ব ও একত্ব অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য, সে অপেক্ষাবুদ্ধি উন্মার্জ্জিত হইলে যাহা থাকে, এবং সৎ অসৎ উভয় ভাবের অন্তরালে যাহা সদা বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই তুমি পরম পদ বলিয়া বিদিত হও[১৫।১৬]।

অর্জ্জুন বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে আমি মরিলাম, অমুক স্বর্গী ও অমুক নারকী, এ সকল কথার অর্থ কি[১৭]?

ভগবান্ বলিলেন, ক্ষিতি, জল, বায়ু, বহ্নি, আকাশ, এই পাঁচ সূক্ষ্মভূত ও মন তথা বুদ্ধি, এই সাত পদার্থের সমবায়ে (সংযোগে) জীব, তাহাই এতদ্দেহে স্থিতি করে। এই জীব রজ্জুর দ্বারা পশুশাবকের ন্যায় বাসনা (কৃতকার্য্যের সংস্কার) দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই শরীর মধ্যে পঞ্জরে পক্ষীর ন্যায় রহিয়াছে[১৮।১৯]। যেমন বৃক্ষের পত্র উদ্গত ও পুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার শুষ্ক ও বৃক্ষচ্যুত হয়, সেইরূপ, দেহও উদ্ভূত ও পুষ্ট হইয়া যথাকালে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জীব হইতে প্রচ্যুত হইয়া যায়। বায়ু যেমন পুষ্প হইতে সুরভি গ্রহণ করতঃ স্থানান্তরগামী হয়, সেইরূপ জীবও পতনোন্মুখ দেহ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করতঃ পুনর্ব্বার নূতন দেহ গ্রহণের নিমিত্ত উৎক্রান্ত হইয়া যায়[২০।২১]। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন, এই স্থূল দেহ বাসনামূলক। সুতরাং যাবৎ বাসনা তাবৎ দেহ এবং বাস-নার প্রক্ষয়ে শরীরোৎপত্তির অভাব ও পরম পদ প্রাপ্তি, ইহা পণ্ডিত-গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে[২৩]। জীব বাসনাবেষ্টিত হইয়াই ঐন্দ্রজালিক কৃত মিথ্যা পুরুষের ন্যায় নানা দেহ ধারণ করে ও বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে এবং নিক্রান্তি কালে ইন্দ্রিয়শক্তি সহ নিক্রান্ত হয়[২৪]।

জীব নিক্রান্ত হইবামাত্র দেহ নিশ্চল নিস্পন্দ হয়, সেই অবস্থাকেই লোকে মরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে[২৫।২৬]। নিক্রান্তির পর জীব আকাশে কিছুকাল বায়বীয় মূর্ত্তিতে অবস্থান করে এবং সে সময়েও আপনার বাসনানুরূপ মূর্ত্তি অনুভব করে[২৭]। অপিচ, যে দেহ উক্ত প্রকারে বিনষ্ট হইল, সে দেহকে তখন সে মিথ্যা ও নশ্বর বলিয়া জানিতে থাকে। অপিচ, দেহের বিনাশ দেখিয়া তুমিও ইহাকে মিথ্যা অর্থাৎ অসৎ বলিয়া অবধারণ করিবে অথবা সুষুপ্তের ন্যায় ইহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইবে[২৮]। মনুষ্য ও মনুষ্যের বিনাশ, উভয়ই বাসনাবশে কল্পিত, বস্তু বিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত নহে অর্থাৎ সত্য নহে। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও গো অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি আকারের পূর্ব্বকল্পীয় বাসনানুরূপ কল্পনার দ্বারা এতৎকল্পে গো অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট করেন, অন্য কোন উপাদান লইয়া কুম্ভকারের ঘটাদি সৃষ্টি করার ন্যায় সৃষ্টি করেন না। সত্য হউক মিথ্যা হউক, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে যে আকার দৃষ্ট হইবে সে আকার তাহার বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। পূর্ব্বোপার্জ্জিত অশুভ বাসনা যে পশ্চাদুপার্জ্জিত শুভ বাসনার দ্বারা অভিভূত হয় তাহার দৃষ্টান্ত প্রায়শ্চিত্ত। যেমন প্রায়শ্চিত্তাদি যত্নের দ্বারা পূর্ব্বদুষ্ক্রিয়া বিধ্বস্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান দাহাদি যত্নের দ্বারা পূর্ব্বকৃত গৃহাদির বিনাশ করা যায়, সেইরূপ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি শাস্ত্রীয় যত্নের দ্বারাও প্রাগ্‌ভবীয় দুর্ব্বাসনা বিনাশ করা যায়[২৯।৩১]। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চার বিষয়ের বাসনার মধ্যে যে বিষয়ের বাসনা অত্যন্ত তীব্রা হইবে, সেই বিষয়ের বাসনাই জয়লাভ করিবে। অতএব, যাহাতে শাস্ত্রীয় শুভ বাসনার সম্যক্ উদ্দীপন হয় শুভপ্রার্থী পুরুষ তাহাই করিবেন[৩২।৩৩]। মৃদু বাসনা বলবৎ বাসনা জয় করিতে পারে না। সেইজন্য যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ মননাদির দ্বারা চিরাভ্যস্ত জন্ম মরণ স্বর্গ নরকাদি বিভ্রম বিনষ্ট হয় না[৩৪]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বর্গ নরকাদি বিভ্রমের কারণ বা মূল কি? জীবেরই বা স্থিতিকারণ কি? তাহা আমাকে বলুন[৩৫]।

ভগবান্ বলিলেন, এই সংসার বিভ্রম স্বপ্নের অনুরূপ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারই পর পর বিভ্রমের কারণ। ইহা অনাদি প্রবাহ ন্যায়ে সিদ্ধ হয়। অতএব, চিরাভ্যস্ত সংসার বাসনার সংস্কারই সংসারের অর্থাৎ

জীবস্থিতির কারণ, শাস্ত্রীয় প্রযত্নে তাহার প্রক্ষয় হওয়াই মোক্ষ[৩৬]।

অর্জ্জুন বলিলেন, বাসনার উৎপত্তি কোথায়? ও তাহার বিনাশ কিসে হয়?

ভগবান্ বলিলেন, মূর্খতাই বাসনার উৎপত্তি স্থান এবং তত্ত্বজ্ঞানই বাসনার নাশক। অনাত্মায় আত্মভাব স্থাপনের নাম মূর্খতা, আর আত্মায় আত্মজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান[৩৭]। হে কৌন্তেয়! তুমি আপনাকে বিদিত হইয়াছ, সত্য কি তাহা জানিয়াছ, এখন তুমি এই সেই আমি তুমি তোমার আমার ও আমার দ্বারা, এই সকল ভাব পরিত্যাগ কর[৩৮]।

অর্জ্জুন বলিলেন, বুঝিয়াছি, বাসনা বিনাশে জীবের বিনাশ সিদ্ধ হয়। যে যাহার সত্তায় সত্তাবান্ তাহার অসত্তায় তাহার অসত্তা অনিবার্য্য[৩৯]। অতএব, জীবের লয় হইলে তখন আর কে জন্মমরণাদিভাগী হইবে? তাহা হইবে না[৪০]।

ভগবান্ বলিলেন, হে বুদ্ধিমন্! জীব কি? জীব অন্য কিছু নহে। আপনিই আপনার মালিন্য কল্পনা করিয়াই জীব এবং তাদৃশ কল্পনাই বাসনার মূল বা বীজ। সুতরাং সে কল্পনা ও সে বাসনা বিনষ্ট হইলে যাহা প্রকৃত আত্মরূপ তাহাই অবশেষিত ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়। বাসনামুক্ততাই মোক্ষ, মোক্ষ অন্য কিছু নহে[৪১।৪২]। হে মহাবাহু অর্জ্জুন! বাসনাক্ষয়ে যে জীবদ্দশাতেও মুক্তি, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের প্রসিদ্ধি। যাবৎ নির্ব্বাসন না হওয়া যায় তাবৎ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ হইলেও মুক্ত নহে[৪৩।৪৪]।

যাহার অন্তরে বাসনা থাকে, সেই ভ্রান্তি বশতঃ গগনতলে শিখিপিচ্ছ দর্শনের ন্যায় (কখন কখন আকাশে এমন এক পদার্থ দেখা যায়, যেন শত শত ময়ূরপুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। অথচ সে সকল মেঘ, ময়ূরপুচ্ছ নহে।) সংসার দর্শন করে এবং যাহার বাসনা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে সে আর কোনও প্রকার ভ্রমদর্শন করে না সুতরাং মুক্ত হয়[৪৫]।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

—০*০—

ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি উক্ত প্রকারে বাসনা ক্ষয় করিয়া জীবন্মুক্ত ও অন্তঃসুশীতল (তাপাদিশূন্য) হও, হইয়া বন্ধুবধ নিমিত্তক দুঃখের ত্যাগকারী হও[১]। জরামরণের আশঙ্কা ত্যাগ কর, আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত হও, ইষ্টানিষ্ট কল্পনা পরিত্যাগ কর, রাগ বা আসক্তি বর্জ্জিত হও এবং প্রবাহের ন্যায় উপস্থিত কার্য্য সকল যথোপস্থিত নিয়মে করিতে থাক। ঐরূপে কার্য্য করা, করা বলিয়া গণ্য নহে। কেননা সত্যতঃ কোন কিছুর বিনাশ হয় না[২।৩]। জীবন্মুক্তদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহারা অনাসক্তচিত্তে যথোপস্থিত কর্ম্ম করেন। পরন্তু মূঢ়ের স্বভাব বিপরীত। মূঢ়েরা এই কর্ম্ম করি বা করিব অথবা এই কার্য্য করিব না, এইরূপ অভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মপ্রবৃত্ত অথবা কার্য্যনিবৃত্ত হয়[৪।৫]। যে সকল শান্তচিত্ত জীবন্মুক্ত প্রবাহন্যায়ে যথোপস্থিত নিয়মে কার্য্য করে সেই সকল মুক্ত পুরুষ সুষুপ্তের ন্যায় প্রকাশমান হয়। অর্থাৎ সুষুপ্ত পুরুষ যেমন নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রে অবস্থান করেন, কার্য্য করিলেও জীবন্মুক্তেরা সেইরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন[৬]।[৭] যেমন কূর্ম্মদিগের মস্তক ঝটিতি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় সেইরূপ জীবন্মুক্তদিগের ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। জীবন্মুক্তেরা এই জগৎকে সেই বিশ্বাত্মায় চিত্রিতের ন্যায় দেখেন[৭।৮]। এ চিত্র সেই চিত্তনামক চিত্রকরের চিত্রিত মাত্র। চিত্তনামক চিত্রকর অজ্ঞানরূপ আকাশে এই বিশ্বচিত্র চিত্রিত করিয়াছে। অজ্ঞানময় চিত্রকে প্রতিবিম্বচৈতন্যরূপ দীপ প্রকাশপ্রাপ্ত করিতেছে[৯]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সামান্য বা লৌকিক চিত্র কোন একটা আধারে চিত্রিত হয়। পরন্তু এই বিশ্বচিত্র বিনা আধারে চিত্রিত। আগে চিত্র, পরে আধার, ইহাও যৎপরোনাস্তি অদ্ভুত। কেন? তাহা ভাবিয়া দেখ। ব্যোমকে শূন্য বলা যায় বটে, পরন্তু মনোরূপ চিত্রকরের রচিত এই বিশ্বচিত্র তদপেক্ষা অধিক শূন্য অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ। মনোরূপ চিত্রকর ক্ষণমধ্যে এই

লোকত্রয়ের ক্ষয় ও উদয় নির্ব্বাহ করে[১০,১২]। মনও তৎকার্য্যভূত জগৎ এই স্বপ্নের ন্যায় শূন্য অর্থাৎ মিথ্যা[১৩]। ভ্রমের আবার সত্যতা কি? ভ্রান্তিকল্পিত সর্প যেমন রজ্জু দর্শনে কোথায় লীন হইয়া যায়, সেইরূপ, ইহাও স্বাত্মদর্শনে লুক্কায়িত হইয়া যায়[১৪]। যেমন শরন্মেঘ সৌরালোকে দৃষ্ট হয় আবার তাহারই দ্বারা অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ জানিবে। এ চিত্রের কোন ভিত্তি নাই, সেজন্য ইহাও নাই। সুতরাং তুমিও তুমি নহ, ইহারাও ইহারা নহে। অতএব, বধ্য ও বধক এ মোহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও নির্লিপ্ত হও। শূন্য কখন হয়ও নাই, হইবেও না[১৫,১৭]। এ সমস্তই ব্রহ্মাকাশ, অন্য কিছু নহে। মনোরাজ্য যেমন মনেরই রচনা ও মিথ্যা, তেমনি, বাহিরের এই জগৎও মনোবিশেষের রচিত ও মিথ্যা[১৮]। এই সমুদায় জগৎকে তুমি প্রসিদ্ধ শূন্য অপেক্ষাও শূন্য বলিয়া জানিবে। চিত্তই ইহার ভিত্তি এবং এ চিত্রের চিত্রকরও চিত্ত। ব্যোম যেমন সর্ব্বশূন্য, সেইরূপ, ইহাও সর্ব্বশূন্য। শূন্যতাপক্ষে উভয়ের অল্পমাত্র ভেদ নাই। জগতের নির্ম্মাণ ও বিনাশ উভয়ই চিত্তের মহিমা[১৯,২০]। হে অর্জ্জুন! আমার উপদেশে তোমার বিবিধ ভেদবুদ্ধিযুক্ত মনোরাজ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হউক[২১]। তুমি ভাবিতে পার বটে, আকল্প বিস্তীর্ণ সংসার মনঃকল্পিত কিরূপে? পরন্তু বিচার সহকারে ইহাও ভাবা উচিত যে, মন যেমন অসৎ রচনায় পটু, তেমনি, কল্প রচনাতেও পটু। মন ক্ষণকে কল্প করিতে পারে আবার কল্পকে ক্ষণ করিতে পারে। অল্পকে বহু করিতে পারে, আবার বহুকে অল্প করিতে পারে। যে মন যাহা নাই ক্ষণমধ্যে তাহারই সৃষ্টি করে, সেই মন যে ক্ষণকে কল্প করিবে, তাহাতে অদ্ভুত কি? আশ্চর্য্য কি? অতএব, মনেরই তাদৃশ সামর্থ্যে এই জগদ্ভ্রান্তি উত্থিত হইয়াছে ও মনই ইহাকে সত্যরূপে প্রতীত করাইতেছে[২২,২৩]। নিত্যমুক্ত আত্মায় এই জগৎ ভ্রান্তি ক্রমে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে ইহা নিতান্ত তুচ্ছ, ও অজ্ঞানীর পক্ষে বজ্রসার অর্থাৎ চিরস্থায়ী বা দুরুচ্ছেদ্য[২৫,২৬]। যাহা থাকে তাহারই নিরাস যত্নসাপেক্ষ। পরন্তু ইহা নাই। চিত্তই এই জগচ্চিত্রের চিত্রকর, সুতরাং কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এ চিত্রের ভিত্তি নাই, রঞ্জন দ্রব্য নাই, অথচ ইহা উজ্জ্বল[২৭,২৮]। ইহা দেখিতে ভাল, ইন্দ্রিয় প্রলোভন, নানাবিধ তমোরূপ

মসীর দ্বারা অঙ্কিত ও নানা তেজে বিভূষিত[৩১]। নানা কল্প ইহার অঙ্গ, সে সকল নানা রাগে রঞ্জিত, নানা দর্শনের বিলাস ও নানা অনুভবের বিষয়। ইহাতে আবার পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্ ও ব্যোমরূপ একটী বৃহৎ সরোবর। চন্দ্র ও সূর্য্য এই সরোবরের পদ্ম ও মেঘ সকল তাহার পত্র। এই চিত্রে ভিত্তিশূন্য অনেক প্রকোষ্ঠ, তাহাতে সুর অসুর মনুষ্য প্রভৃতি পুত্তলিকা চিত্রিত। এই সকল প্রকোষ্ঠ চন্দ্র সূর্য্যের আলোকরূপ সুধায় প্রলিপ্ত অর্থাৎ ধবল বর্ণ[৩০,৩২]। ইহাতে ত্রিলোকরূপিণী তিনটী নটী চিত্রিত হইয়াছে। অতিচপল ও কামুক চিত্ত আপনার আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মাকাশে অতিচমৎকার তিনটী নটী চিত্রিত করিয়াছে। * ইহাদের নৃত্যশালা প্রতিভা অর্থাৎ উন্মেষবতী বুদ্ধি, প্রদীপ সাক্ষিচৈতন্য, বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ ঐ নটীদিগের আভরণ, ইহারা নানাবিধ হাবভাববিলাসে সদা ব্যাকুলা[৩৩]। সুবর্ণবর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ইহাদের শরীর, মেঘ ইহাদের কেশ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইহাদের বস্ত্র, সপ্ত পাতাল ইহাদের পূর্ব্বকায়, (পূর্ব্বকায়—নাভি হইতে পদতল) সপ্ত স্বর্গ ইহাদের ঊর্দ্ধকায়, উন্নত স্থান সকল নিতম্ব, ব্রহ্মাদি বাহু, সত্বগুণ কঞ্চুক, বিবেক ও বৈরাগ্য কুচ অর্থাৎ স্তনমণ্ডল, মহীতল ইহাদের পদ্মাসন অর্থাৎ উপবেশন পীঠ। নানাবিধ পৰ্ব্বতমালা ইহাদের পত্ররচনা (শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে তিলক রচনার নাম পত্ররচনা ও পত্রভঙ্গ) এবং মধ্য-

---

* স্বর্গ ১ মর্ত্ত্য ১ পাতাল ১। এই তিন্ নর্ত্তকী তুল্য অর্থাৎ নর্ত্তকীরা যেমন মনোরঞ্জন করে, স্বর্গাদি লোকও তদ্রূপ মনোরঞ্জন করে। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল ও রসাতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল যথাক্রমে পদতল, পদপৃষ্ঠ, গুল্‌ফ, জানু জঙ্ঘা প্রভৃতি রূপকে বর্ণিত হইতে পারে। এইরূপ উপর্য্যুপরি বিদ্যমান জনলোক তপোলোক ও সত্য-প্রভৃতি নাভি, বক্ষঃ, কণ্ঠ, চিবুক, প্রভৃতিব উপমিত হইতে পারে। সুবর্ণ বর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এই কথায় জগতের আদিম অবস্থা বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় অণ্ড। যাহা ব্রহ্মা হইতে প্রথম উৎপন্ন। ইহা তেজোময় বলিয়া সুবর্ণ বর্ণ বলা হইয়াছে। মৃত্তিকা প্রভৃতি সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে সুবর্ণ বর্ণই ছিল। মনুর বর্ণিত, "তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং" এই বচনেও সৃষ্টির প্রথমে অণ্ডোৎপত্তি ও সে অণ্ড সহস্র সূর্য্যসম প্রভান্বিত ও তেজোরূপী বলিয়া সুবর্ণ বর্ণ, এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব, ব্রহ্মাণ্ড এখন সুবর্ণ বর্ণ না হইলেও উৎপত্তি কালে সুবর্ণ বর্ণ ছিল। তাই বশিষ্ঠ ঋষির লক্ষ্য; এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ইহাদের উদর[৩৪।৩৫]। চন্দ্র সূর্য্যের মেরু প্রাদক্ষিণ জনিত দিবা রাত্র ইহাদের ব্যাবর্ত্তন, বিদ্যুৎ ইহাদের দন্তপংক্তি, চতুর্দ্দশ ভুবন ও তত্রস্থ ভূতনিচয় ইহাদের রোমাঞ্চ, বৈরাগ্য ও সদ্বাসনা প্রভৃতি ইহাদের আপাদলম্বা কদম্বমালা। ইহারা ব্যষ্টিসমষ্টি জীবে পরিবেষ্টিত[৩৬]।

এই চিত্র রচনার উপকরণ বিচিত্র কাম কর্ম্ম ও বাসনা ও চিত্রকর চিত্ত। চিত্তই বিচিত্র কাম কর্ম্ম বাসনা উপকরণ লইয়া এই ত্রিলোক-পুত্তলিকার চিত্র আপনার আশ্রয়ীভূত আত্মাকাশে অতিআশ্চর্য্য কৌশলে রচনা করিয়াছে[৩৭]।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

—○()•()○—

ভগবান্ বলিলেন, অর্জ্জুন! আগে চিত্র, পরে ভিত্তি, এতদপেক্ষা মহদাশ্চর্য্য আর কি আছে! দেখা যায়, আগে ভিত্তিশূন্য চিত্রের উদয় হইয়াছে, পরে তাহার ভিত্তি অর্থাৎ আধারপট বিস্তৃত হইয়াছে। অহো! মায়া কি অদ্ভুত! তুম্বীফল জলমগ্ন, আর শিলাখণ্ড প্লবমান[১।২]। হউক, জগচ্চিত্র আশ্চর্য্য, পরন্তু শূন্যরূপ আত্মায় অহন্তার উদয় আরও অধিক আশ্চর্য্য। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, সমস্তই ব্যোম অর্থাৎ শূন্যরূপী? শূন্য, শূন্যের দ্বারা কৃত, শূন্যে শূন্যেরই উদয়, শূন্যে শূন্যেরই লয়, শূন্যই শূন্য ভোগ করে, ভোগও শূন্য, এবং শূন্যে শূন্যেরই বিস্তৃতি[৩।৪]। হে অর্জ্জুন! এই যে জগচ্চিত্র, ইহাতেই অতিদীর্ঘ সংসারভ্রমণ বিদ্যমান এবং ইহা পশুবন্ধন রজ্জুর ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। আর সেই চিদাকাশ (ব্রহ্ম), তাহাও ইহাতে বাসনারজ্জুবিজড়িত[৫]। আদর্শে প্রতিবিম্বের স্থিতি যেরূপ, ব্রহ্মে জগচ্চিত্রের অবস্থান সেইরূপ। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ইহার ছেদভেদাদি সম্ভবে না। অপিচ,

যখন ব্রহ্মই ব্রহ্মে, ব্রহ্মে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই, তখন আর কে কাহাকে ছেদন করে[৯]? যখন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের বলে ছেদভেদাদি ব্যবহার লুপ্ত ও বাসনাপুঞ্জ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় সুতরাং তখন ছেদ্য ছেদক ও ভেদ্য ভেদক ভাব থাকে না। ঐ জ্ঞান যাহাদের নাই বা হয় নাই, অর্থাৎ বাসনাও ব্রহ্ম, এ বোধ যাহাদের জন্মে নাই, তাহারা ধার্ম্মিক হইলেও পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় বদ্ধ। বাসনাবীজ অতি অল্প থাকিলেও তাহা অতি বিস্তৃত সংসার কানন জন্মায়। সেইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন, অভ্যাস দার্ঢ্যের দ্বারা হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বাসনা-বীজ নিরবশেষে দগ্ধ করিবেক। বীজ দগ্ধ হইলে সে বীজ আর প্ররোহ (অঙ্কুর) জন্মাইবে না[১০]। যে মনে বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়াছে সে মন সুখ দুঃখে ব্যাসক্ত হয় না, পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকে[১১]। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি শান্ত হইয়া অতি পবিত্র ভগবদ্গীতা শ্রবণ করিলে, তোমার মোহও বিগলিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি কেবল শান্তি পদে স্থিত হও[১২]।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! আপনার প্রসাদে মায়া মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি কি তাহা স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আমি আপনার বাক্য পালন করিতে সন্দিগ্ধ নহি[১]।

ভগবান্ বলিলেন, যদি এমন ভাব যে, তত্ত্ববোধের দ্বারা রাগাদিবৃত্তি পরিষ্কাররূপে উপশান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে জানিবে, তোমার চিত্ত সত্য সত্যই বাসনাবীজ বর্জ্জিত হইয়াছে[২]। অপিচ, ইহাও জানিবে যে, ঐ অবস্থায় প্রত্যক্‌চেতন অর্থাৎ শরীরোপহিত আত্মা তখন সর্ব্বথা মালিন্যমুক্ত হয়, যে প্রত্যক্‌চেতন ব্যবহারে সর্ব্বময় ও ব্যবহারাতীতে

এক। এই অবস্থা চক্ষুরাদির ও অজ্ঞজনের অবেদ্য[৩।৫]। যাঁহারা অতি দূরদর্শী তাঁহাদেরও এই সকল বর্জ্জিত সুতরাং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ চেতন অবোধ্য। যেমন মনুষ্যের দৃষ্টি পরমাণু দেখিতে পায় না, সেইরূপ, এই বিশুদ্ধ চেতনকেও কেহ দেখিতে পায় না[৫।৬]। যে অবস্থা পাইলে ঘটপটাদি স্থূল দৃশ্যও ক্ষীণ হইয়া যায়, সে অবস্থায় বাসনা ক্ষয়ের কথা বলাই বাহুল্য[৭]। বহ্নিপর্ব্বতসম্পর্কে হিমরাশি বিদ্রবিত হওয়ার ন্যায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে অবিদ্যার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কোথায় তুচ্ছ বাসনা, আর কোথায় বিপুল চিত্তত্ত্ব? হে অর্জ্জুন! তাবৎ অবিদ্যার স্ফূর্ত্তি—যাবৎ বিশুদ্ধ আত্মার দর্শন লাভ না হয়[৮।১০]। যে আত্মার উদরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সে আত্মার সাক্ষাৎকারে দৃশ্য মণ্ডল দৃষ্ট হইতে পারে না। যত আকার সমস্তই সেই আত্মার আকার অথচ তিনি নিরাকার। বাক্‌পথের অতীত তাদৃশ পরম বস্তু কোন্ তুচ্ছ বস্তুর দ্বারা উপমিত হইতে পারে[১১।১২]? তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি বিষয় বিষূচিকা দূরীভূত কর, বাসনা পরিত্যাগ কর, করিয়া নির্ভয় ও নিষ্কাম হও[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ত্রিলোকনাথ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন ক্ষণকালের নিমিত্ত মৌন রহিলেন। পরে পদ্মের নিকট ভ্রমরের ন্যায় ভগবানের নিকট পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন[১৪]।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভগবন্! আমার সমুদায় শোক বিগলিত হইয়াছে এবং আমার মতি আপনার উপদেশে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছে[১৫]। গাণ্ডীবধন্বা হরিসারথি অর্জ্জুন ঐরূপ বলিয়া গুরুজন বধে দোষাদোষ বিষয়ের সন্দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণলীলা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। অতঃপর হয় হস্তী সারথি প্রভৃতি বিনাশ দ্বারা পৃথিবীকে রুধির প্লাবিতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[১৬।১৭]।

অর্জ্জুনোপাখ্যান সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুনাথ! তুমিও ঐ দৃষ্টি অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া স্থিত হও ও সঙ্গপরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসময় হও[১]। যে আত্মায় ও যে আত্মা হইতে এই বিশ্ব, যিনিই সমস্ত ও যিনি সর্ব্বময়, তাঁহাকেই তুমি পরমাত্মা বলিয়া বিদিত হও[২]। ইনি দূরস্থ ও অদূরস্থ, সর্ব্বগত ও প্রত্যেকগত, তাঁহারই সত্তায় তোমার সত্তা, সুতরাং তিনিই তুমি[৩]। যিনি বেদ্যনির্ম্মুক্ত, বেদনরূপী, অনির্ম্মিত ও চিদাভাস, তিনিই তুমি ও তিনিই তৎপদবাচ্য[৪]। তাহা সীমারও সীমা, দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, মহিমারও মহিমা ও গুরুরও গুরু[৫]। আত্মা, বিজ্ঞান, শূন্য, ব্রহ্ম, তৎপদ, শ্রেষ্ঠ, মঙ্গল, পরম মঙ্গল, শান্তি, বিদ্যা, স্থিতি, এ সমস্তই তিনি[৬]। ইনিই বুদ্ধিস্থ চিৎপ্রতিবিম্বের বিম্ব, সুতরাং অনুভবরূপী এবং সর্ব্ব দ্রব্যের সত্তা ইঁহারই সত্তা[৭]। তিলে তৈলের ন্যায় জগৎ তাঁহাতেই স্থিত এবং তিনিই এই জগদ্রূপ গৃহের দীপ। ইনি এই জগদ্বৃক্ষের রস ও জগৎরূপ পশুর পালক[৮]। ইনিই প্রাণিরূপ মুক্তার সূত্র ও হৃদয়াকাশের সার। প্রাণিরূপ মরিচের তীক্ষ্ণতা, অর্থাৎ শক্তি, পদার্থের পদার্থতা, সত্যের সত্য, সমস্তই তিনি। সতের সত্ত্ব ও অসতের অসত্ত্বও তিনি[৯,১০]। এই আত্মা আপনিই আপনার বিচিত্র বা বিশেষ স্ফূর্তির দ্বারা লব্ধ। এই যে জগদ্ভাব, এ ভাব অবিচার দশায় মনোহর কিন্তু বিচারে ইহার অসত্তা। এই জগজ্জালের প্রথমাঙ্কুর অহং অর্থাৎ আমি ইত্যাকারা বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি শুদ্ধস্বভাব আত্মাকে কি বন্ধন করিতে পারে? তাহা পারে না। আমার আদ্যন্ত মধ্য নাই, আমি অনন্ত অসীম, সুতরাং সাঙ্কল্পিক কার্য্য সমূহও আমি, আমার অতিরিক্ত কিছু নাই[১১,১২]। যাহার মন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, উদয় ও অস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, বাহিরে তাহার ব্যবহার দৃষ্ট হইলেও সে ব্যবহারের অতীত[১৩,১৪]। যে ব্যক্তি ভাবনার দ্বারা অন্তরে অদ্বৈতসম্পন্ন, বাহিরে তাহার ব্যবহার আদর্শ-প্রতিবিম্বিত মনুষ্যের ব্যবহারের অনুরূপ। অর্থাৎ আদর্শপ্রতিবিম্বিত

মনুষ্য হস্তপদাদি সঞ্চালন করে না, অথচ দর্শকের দৃষ্টিতে তাহার মিথ্যা সঞ্চলন দৃষ্ট হয়[১৬,১৭]। তাদৃশ নর মানাপমানাদি জনিত দুঃখভাগী ও সুখভাগী নহে, সেইজন্য সে মুক্ত[১৮]। যেমন প্রতিবিম্বিত মনুষ্যের ব্যবহারে আদর্শ অলিপ্ত, সেইরূপ, চিদাত্মাও এই জগতের অবভাসে অলিপ্ত[১৯]। একত্ব, দ্বিত্ব, এ সকল উপদেশ ও গুরু, শিষ্য, বাচ্য, বাচক, এ সকলের কোন কিছু নিতান্ত নির্ম্মল চিদ্বস্তুতে লিপ্ত হয় না। (চিদাত্মায় কোনও কিছুর দাগ বা চিহ্ন সংলগ্ন হয় না)[২০।২১]। চিদ্বস্তুর কেবলীভাব অসংসার, তাহার বিপরীত ভাব সংসার, সুতরাং কেবলী ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে সংসারও বিনিবৃত্ত হয়[২২।২৩]। সুবর্ণ, হার ও বলয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্ থাকে না। সেইরূপ, চিদাত্মায় প্রমাণ প্রমেয়াদিও পৃথক্ থাকে না। চিত্তই চিদাত্মার প্রথম প্রস্পন্দ, তাহাই সংসার তথা তাহাই তাহার অবুদ্ধতা[২৬,২৭]। হে রামচন্দ্র! সংসারনামধেয় ঐ সকল ভাব বোধ কালে থাকে না, বোধ কালে কেবলা ও শুদ্ধা চিৎ অবশেষিত হয়, সুতরাং ভোগ বাসনারও অভাব সংঘটন হয়[২৮]। সহজসিদ্ধ ভোগের অভাবনাই জ্ঞানীর ও মোক্ষের লক্ষণ। অতিতৃপ্ত ব্যক্তির কি কখন কদন্নে স্পৃহা হয়? তাহা হয় না। ভোগবিষয়ে সেরূপ অতিতৃপ্ততাও তত্ত্বজ্ঞানের অপর লক্ষণ[২৯।৩০]। আমার স্বাত্ম-চৈতন্যই ভোগ, ভোগ্য ও ভোক্তা, এতদ্রূপে প্রথমান হইতেছে। এ সমস্তই স্বাত্মচৈতন্যের রূপান্তর, এ নিশ্চয় অত্যন্ত অভ্যস্ত হওয়াও স্বাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানের অপর লক্ষণ। অতএব, যে ব্যক্তি ভোগ্য ভোগ করে অথচ ব্যাসক্ত নহে, সেই ব্যক্তিকেই তুমি উত্তম বুদ্ধিমান্ বা জ্ঞানী বলিয়া জানিবে[৩১,৩২]। সার্ব্বাত্ম্য দর্শন কৃত্রিম অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা কৃত হই-লেও উহার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মদৃষ্টি দূরীভূত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। আকাশ লগুড়ে আহত হয় না, তথাপি কখন কখন কোন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আকাশে লগুড় প্রহার আবশ্যক হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, কৃত্রিম বুদ্ধি যোগ ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না। দেহাত্মজ্ঞান নিরস্ত করাই তত্ত্বজ্ঞানের অন্যতম সহায়, তাই বলিয়া দেহ দলন (বিধ্বস্ত) করা তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ নহে[৩৩।৩৪]। বলা বাহুল্য যে, যাবৎ না অন্তরে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে তাবৎ সংসার নামক স্পন্দাস্পন্দ দশা বিদ্যমান থাকে, পরন্তু যখন সম্যক্ জ্ঞান জন্মে ও তাহা স্থিতি লাভ

করে, তখন এ সকল দীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়া কোথায় কি হইয়া যায় তাহা বলিবার যোগ্য নহে[৩৫।৩৬]। এই আত্মায় কোন প্রকার প্রাণচেষ্টার কথা ও সৎ অসৎ অনির্ব্বাচ্য এ সকল কথা প্রসক্ত হয় না। শান্তিস্থিতিই চিদাত্মার স্বরূপ, অশান্তি ভাবই তাহার স্বরূপচ্যুতি। তিনি বন্ধ ও মোক্ষ এতদুভয়ের অতীত, তাঁহাতে বাস্তবতঃ বন্ধ মোক্ষের নাম গন্ধও নাই। আমি বদ্ধ আছি, মুক্ত হইব, এ বোধও আত্মার পূর্ণতা প্রতিবন্ধক[৩৭।৪০]। মোক্ষেচ্ছার কথা দূরে থাকুক, চিৎপদার্থ বিক্ষেপ বা প্রচ্ছাদন বর্জ্জিত হউক, এ ভাবটীও বন্ধজনক। অতএব, সর্ব্বপ্রকার সম্বেদন রাহিত্যাকেই তুমি পরম পদ বলিয়া স্থির করিবে। যাহা সঙ্কল্প, সঙ্কল্পন ও সঙ্কল্পক শব্দের বোধ্য, তাহা বন্ধের ও মোক্ষের যোগ্য। তাহা বিবেক দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেই প্রণষ্ট হয়। অহং যদি আস্পদশূন্য অর্থাৎ প্রতিষ্ঠারহিত হয়, তাহা হইলে বন্ধ ও মোক্ষ এ দুই ব্যবহার কোথায় বা কাহার উপর হইবে? জ্ঞানী যদি স্বকৃত সঙ্কল্পের বিচার করে, পূর্ব্বাপর তথ্য অনুসন্ধান করে, বিবেক দ্বারা তাহার পরিহার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সঙ্কল্পের বিরামে চিত্তের অস্পন্দতা ব্যবস্থিত হয়, তাহার অন্যথা হয় না। সুতরাং তখন সঙ্কল্প-মূলক সংসারও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অথবা চিৎস্পন্দও চিত্তের অন্যবিধ প্রকাশ, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে, এরূপ অবধারণ হইলেও সংসার ক্ষয় সম্ভাবিত হয়[৪১।৪৫]। অতএব, ইহা এক বিবিধ দৃশ্যময় দীর্ঘ স্বপ্ন, এ দীর্ঘ স্বপ্নে জ্ঞানিলোক মুগ্ধ হন না[৪৬।৪৭]।

যাহাতে এই জগদাকার উপলব্ধ হইতেছে, যাহাতে এতদুপলক্ষিত আনন্দের স্বাদ প্রকট প্রাপ্ত হইতেছে, যাহাতে এ সকলের সত্তা উদিত ও অন্তর্হিত হইতেছে, তুমি সেই প্রত্যগাত্মাকে ধ্যানযোগে বিদিত হও[৪৮]।

একোনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহা আদ্য পরম পদ তাহা কেবলা চিৎ, তাহাতেই হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি মহাকল্প অবস্থিত[১]। তাঁহারা অতিউচ্চ বিভূতির দ্বারা প্রস্ফুরিত ও নৃপতির ন্যায় হৃষ্ট তুষ্ট। আকাশগমনাদি ইঁহাদের ক্রীড়া[২]। হে রামচন্দ্র! তাঁহারই প্রাপ্তিতে অমরত্ব ও তাঁহারই প্রাপ্তিতে শোকরাহিত্য জন্মে। তাঁহাকে পাইলে জীব ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জীবধর্ম্মের দ্বারা উৎপীড়িত হয় না, অপিচ কোনও কিছুতে নিরুদ্ধ হয় না। জীব যদি সেই অপার পরমাকাশ স্বরূপ পরমাত্মার সত্তাসামান্য অর্থাৎ সর্ব্বানুস্যূতা স্থিতি ক্ষণমাত্রও বোধগম্য করিতে পারে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত ও মুনি হয়। সে সংসার কার্য্য করিলেও পরিতাপ প্রাপ্ত হয় না।

রঘুনাথ বলিলেন, প্রভো! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত, যাহাতে কেবলী সত্তা প্রতিষ্ঠিত, তাহা কি ঈশ্বর? কি অন্য কিছু[৬]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহা ব্রহ্ম, তাহাই সর্ব্বদেহস্থ। সেই দেহস্থ ব্রহ্মই পান, ভোজন, আদান, প্রদান, সমস্তই করেন। এই দেহে তিনি সংবিত্তি অর্থাৎ চেতনারূপী ও সর্ব্বপ্রকার বেদ্যের বেদয়িতা[৭]। তাহা সর্ব্বগামী, আদ্যন্তরহিত ও সর্ব্বসত্তার একতা[৮]। তাহাই ব্যোমের ব্যোমত্ব, শব্দের শব্দত্ব, স্পর্শের স্পর্শত্ব, ত্বকের ত্বক্‌ত্ব, ভূমির ভূমিত্ব, রসের রসত্ব, রসনার রসনাত্ব, রূপের রূপত্ব, নেত্রের নেত্রত্ব, দৃষ্টির দৃষ্টিত্ব, ঘ্রাণের ঘ্রাণত্ব, গন্ধের গন্ধত্ব, জলের জলত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, তেজের তেজত্ব, বুদ্ধির বুদ্ধিত্ব, মনের মনস্ত্ব, অহঙ্কারের অহঙ্কারত্ব, চিত্তের চিত্তত্ব, বৃক্ষের বৃক্ষত্ব, পটের পটত্ব, ঘটের ঘটত্ব ও বটের বটত্ব[১০]। হে রঘুনাথ! সেই পদার্থই স্থাবরে স্থাবরত্বরূপে, জঙ্গমে জঙ্গমত্বরূপে, পাষাণে পাষাণত্বরূপে, চেতনে চেতনত্বরূপে, অমরে অমরত্বরূপে, নরে নরত্বরূপে,

তির্য্যকে তির্য্যক্ত্বরূপে ও কৃমিতে কৃমিত্বরূপে স্থিতি করিতেছে[১৫।১৬]। কালত্ব, ঋতুত্ব, ত্রুটিত্ব, ক্ষণত্ব, নিমেষত্ব, এ সকল সত্তাও সেই সত্তার অধীন, অথবা এক বা অভিন্ন[১৭]। সেই বিভু সত্তাই শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল, পীত ও ক্রিয়া প্রভৃতিতে বিদ্যমান এবং তিনিই স্পন্দরূপে ক্রিয়ার, নিয়মরূপে নিয়তিতে, স্থিতিরূপে স্থিতিতে, নাশরূপে নাশে, উৎপত্তিরূপে উৎপত্তিতে অবস্থিত[১৮।১৯]। বালকের বাল্য, যুবার যৌবন, বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য, মৃতের মরণ, এ সমস্তই তিনি[২০]। হে রঘুনাথ! সেই পরমেশ্বর এবম্প্রকারে সর্ব্বপদার্থ-অভেদে বিদ্যমান। যথা সমুদ্রের কল্লোল, শীকর, ফেণ, আবর্ত্ত, তরঙ্গ ও স্রোত, তথা পরমেশ্বরের এই সকল। শিশুর কল্পিত যক্ষের ন্যায় এ সকল সেই চেতনের প্রকল্পিত[২১।২২]।

হে মহাত্মন্! সর্ব্বত্রাবস্থিত নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম নিরাবাধ চিৎস্বরূপ আমিই বিবিধ বিলাসে বা বিবিধরূপে স্থিত আছি, ইহাই মনন কর, করিয়া শান্তমতি হও[২৩]।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একষষ্টিতম সর্গ।

——()*()——

রঘুনাথ বলিলেন, মুনিবর! আপনি বলিলেন, এ সকল পরমাত্মার ভ্রান্তির দ্বারা কল্পিত ও অস্মদাদির স্বপ্ন সদৃশী বিভূতি, পরন্তু আমরা এ সকলকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া বুঝি না, অধিকন্তু সত্য বলিয়াই বুঝি। এরূপ কেন বুঝি তাহা আমাকে বলুন[১।২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমরা এ সকলকে সত্য ভাবি, কিন্তু ব্রহ্মাদি মুক্ত জীবেরা এ সকলকে সত্য ভাবেন না। এই সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের সত্যতা প্রতীতি হয় না। কিন্তু ব্রহ্মা যখন পূর্ব্বকল্পে উপাসকাবস্থায় ছিলেন, তখন তাৎকালিক সৃষ্টিকে তাঁহার সত্য মনে হইত, পরন্তু এতৎকল্পে তাঁহার সেই তৎকল্পীয় মিথ্যা জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা

বাধ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে এ সকল এখন অবাস্তব। ব্রহ্মাও পূর্ব্বকল্পে অস্মদাদির ন্যায় অমুক্ত জীব ছিলেন, এতৎকল্পে তিনি মুক্ত জীব[৬]। যাবৎ অজ্ঞানের অনুবৃত্তি, তাবৎ সত্যতা বোধ ও সংসার, সম্যক্‌জ্ঞানে অজ্ঞানের অভাবে ভ্রান্তির নিবৃত্তি ও অসংসার[৭]। প্রজাপতির তত্ত্বজ্ঞানবাধিত এই স্বপ্নতুল্য প্রতিভাস অজ্ঞ অস্মদাদির অহং জ্ঞানে একীভূত ও ভাসমান হইয়েছে, তাই আমরা বুঝি, এ সকল সত্য[৮]। স্বপ্ন মিথ্যা, পরন্তু সুপ্ত পুরুষ সুপ্তি অবস্থায় তাহা অনুভব করে না। সেইরূপ ব্রহ্মাও কিঞ্চিৎকাল এ সকলের মিথ্যাত্ব বুঝিয়াও বুঝেন না। অর্থাৎ আধিকারিক প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারও তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত কার্য্যকারী হয় না। স্বাপ্ন পুরুষ যাহা করে তাহাও স্বপ্নের অনুরূপ অর্থাৎ তুমি এ সকলকে প্রজাপতির স্বাপ্নসৃষ্টি বুঝিয়া অস্মদাদির স্বাপ্নসৃষ্টির সমান মিথ্যা বলিয়া স্থির করিবে। প্রজাপতির এই জগৎ স্বপ্নও বাস্তবিক দীর্ঘ অর্থাৎ বহুকালস্থায়ী নহে অর্থাৎ ইহার দীর্ঘতাও প্রাগুক্ত হরিশ্চন্দ্রাদি স্বপ্নের ভ্রান্তিকল্পিত দীর্ঘতার অনুরূপ ৯।১২। দৃশ্যতা মাত্রেই চিত্তত্বের অধীন, সুতরাং দৃশ্যতা বোধ প্রজাপতির ও অস্মদাদির একই বিধ। জল প্রবাহাদি নানা আকারে দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যভাগ মিথ্যা, জল ভাগই সত্য। এইরূপ স্বাপ্নময় জগৎও বিবিধ বিধানে দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যভাগ মিথ্যা দৃষ্টিভাগ সত্য[১৩।১৪]। প্রজাপতির সৃষ্টির মিথ্যাত্বে প্রমাণ মহাপ্রলয়। অঘটনঘটনসমর্থা ভ্রান্তির মহিমা অনির্ব্বাচ্য। ভ্রান্তির সৃষ্টিতে কোনও প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ চলে না। সম্ভব অসম্ভব সমস্তই ভ্রান্তির ভ্রান্তিসৃষ্টিতে নির্ব্বাহিত হয়। জলেও অগ্নি জ্বলে, আকাশেও গ্রাম নগরাদি দৃষ্ট হয়, প্রস্তরেও জলজ পদার্থ জন্মে, একই বৃক্ষে নানা পুষ্প ফুটে, শিলাও ফল প্রসব করে, প্রস্তর মধ্যেও ভেক জন্মে ও বাস করে, শিলা হইতেও জল জন্মে, ক্ষণমধ্যে ঘটও পট হয়, আবার পটও ঘট হয় এবং স্বপ্নে আত্মমরণও অনুভূত হয়[১৫-২১]। শাম্বরী মায়ায় ও গান্ধর্ব্বী মায়ায় যে সকল অদ্ভুত প্রদর্শিত হয় তাহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। দূরত্বাদি দেশকৃত ভ্রান্তি ও ক্ষণিক উৎপাত জনিত ভ্রান্তি। মন্ত্র প্রয়োগে দ্রব্যবিশেষের সামর্থ্যে, মত্ততায় ও ভূতাবেশে বহু অসম্ভব দর্শন হইয়া থাকে[২২।২৩]। ব্রহ্মাও নাশ আপাতত অসম্ভব হইলেও যথাকালে তাহাও সম্ভাবিত হইবে। অতএব, এমন

কিছুই নাই যাহা সত্য নহে এবং এমন কিছুই নাই যাহা অসত্য নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সমস্তই সত্য, আর জগৎ ভাবে দেখিলে সমস্তই অসত্য। যেমন স্বাপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাপ্নপদার্থের স্থিরতা দর্শন করে, সেইরূপ, জীবও সংসারকালে এ সকলের স্থৈর্য্য চিন্তা করে[২৭,৩০]।

যেমন গর্ত্তনিপতিত অবোধ মৃগেরা গর্ত্ত নিপতনের দোষে অধিক বিভ্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্ত্তনিপতিত হয়, এক গর্ত্ত হইতে গর্ত্তান্তরে প্রবিষ্ট হয়, উদ্ধার লাভে সমর্থ হয় না, এবং সুপ্ত ব্যক্তি সুপ্তির দোষে এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্ন দর্শন করে, সেইরূপ, মুগ্ধ জীবেরাও মোহের দোষে পুনঃ পুনঃ সংসারসমুদ্রে নিপতিত হয়, উদ্ধার লাভে শক্ত হয় না[৩১]।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুনাথ! অভিহিত বিষয় বুঝিবার উপযুক্ত একটী ইতিহাস বলি, শ্রবণ কর। ইতিহাসটী কোন এক অল্প মননশীল ভিক্ষুর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত ঘটিত[১]।

কোন এক প্রদেশে এক মহাভিক্ষু (সন্ন্যাসী) বাস করিতেন। তিনি নিত্য সমাধি অভ্যাস করিতেন ও তদনুকূল কার্য্যে সমস্ত দিবা অতিবাহিত করিতেন[২]। ক্রমে সমাধ্যভ্যাস দৃঢ় হওয়ায় তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিল অর্থাৎ পূর্ব্ববাসনা সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। লহরী যেমন জলে লয় প্রাপ্ত হয়, জলাকার ধারণ করে, তাহার ন্যায় তদীয় মনের বৃত্তি সকল ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ তাঁহার চিত্তে ধ্যেয় বস্তুর সংস্কার ব্যতীত অন্য বস্তুর সংস্কার রহিল না, লুপ্ত হইয়া গেল[৩]। এই মহাভিক্ষু একদা সমাধি ত্যাগ করিয়া একাগ্র চিত্তে আপনার ধ্যান ক্রিয়ার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন[৪]। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে

হইল, সামান্ত নরেরা যেরূপ কার্য্য করে, আমি একবার সেইরূপ কার্য্য করিয়া কৌতুক করিব[৫]। জলস্রোত এক ভাবে চলিতেছে, এমন সময়ে যদি সে স্রোতের বৈপরীত্য জন্মে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে আবর্ত্ত জন্মে। চিন্তার প্রভাবে ভিক্ষুর চিত্তের গতি ক্ষণমধ্যে ফিরিয়া গেল, তাহাতে তাঁহার চিত্ত তন্মুহূর্ত্তে এক সাধারণ নরের আকৃতি কল্পনা করিয়া লইল। পূর্ব্বধ্যেয় উড়িয়া গেল, সে তখন ভাবিল, আমি জীবট নামা ব্যক্তি[৬,৭]। স্বাপ্নপুরুষের ন্যায় সমুৎপন্ন এই জীবট তখন স্বপ্ননির্ম্মিত নগরের ন্যায় কোন সঙ্কল্পিত নগরে আহার বিহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় স্নান, পান, আহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। (সমস্তই ভাবনার দ্বারা) এই জীবট এক দিন স্বপ্নে দেখিতেছেন, আমি বেদপাঠী ব্রাহ্মণ হইয়া দেশান্তরে অবস্থান করিতেছি। অবস্থান করিতে করিতে এই দ্বিজ এক দিন নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন এক সামন্ত রাজা হইয়াছেন। এই সামন্ত আবার একদিন আহারান্তে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি প্রধান রাজা হইয়াছেন। এই রাজা আবার একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি এক অপূর্ব্বদর্শনা দেবাঙ্গনা হইয়াছেন এবং এই সুরাঙ্গনা এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন এক মৃগী হইয়া বনে বিচরণ করিতেছেন[৮,১০]। এই মৃগী আবার এক দিন নিদ্রায় দেখিল, সে এক বল্লী (লতা) হইয়াছে। এবংক্রমে সেই বল্লী আপনাকে লতা পুষ্প ফলসমন্বিত বনদেবী, বনদেবী আবার আপনাকে ভ্রমর, ভ্রমর আবার আপনাকে হস্তী, হস্তী আবার আপনাকে রাজবল্লভ, রাজবল্লভ আপনাকে নিশাচর, এই নিশাচর আবার আপনাকে পুনর্ব্বার ভ্রমর, এই ভ্রমর আবার আপনাকে হংস এবং এই হংস আবার আপনাকে ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মার বাহন হংস হইতে দেখিল[১১,১৬]। এই রাজহংস সেই ব্রহ্ম সদনে দীর্ঘকাল জ্ঞানবিজ্ঞানাদি সম্পন্ন হইয়া অবস্থান করিল, তৎপরে যেন সে কল্প শেষে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইল[১৭]।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

—()*()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই ব্রহ্মবাহন হংস একদা ব্রহ্মার সহিত রুদ্রভবনে গমন করিল। সে স্থানে রুদ্রের ঐশ্বর্য্যোৎকর্ষ দর্শনে সহসা তাহার চিত্তে রুদ্রভাব উপস্থিত হইল। তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সে রুদ্রসারূপ্য প্রাপ্ত হইল এবং হংসদেহ ও হংসাভিমান পরিত্যাগ করতঃ রুদ্রানুচর রুদ্র হইয়া থাকিল[১।৩]। এই রুদ্র রুদ্রভবনে কিছু কাল মুখ্য রুদ্রের ন্যায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া অবস্থান করিল এবং কিছু কাল পরে বুদ্ধি-যোগে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃত্যারূঢ় হওয়ায় মনে মনে বলিতে লাগিল। অহো! মায়ার কি অদ্ভুত প্রভাব! বিশ্ববিমোহিনী মায়া মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মানা হয়। মরুভূমিতে জল অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীভাত হয়[৪।৭]। আমার প্রাক্তন স্থিতি কেবলা চিৎ অর্থাৎ আমি প্রথমে চিন্মাত্র ছিলাম, পরে কোথা হইতে এক মিথ্যা মায়া আমাকে বিষয় ও আশ্রয় করিয়া চিত্ত করিয়া তুলিল, অর্থাৎ কল্পনা শক্তির আধার করিয়া তুলিল, তখন আমি একাংশে সর্ব্বজ্ঞ ও অপরাংশে আকাশাদি ভূতবৃন্দ কল্পনা করিয়া লইলাম। তৎ-পরে ক্রমে ব্যষ্টিসমষ্টি লিঙ্গ ও স্থূল দেহের দেহী জীব হইয়া পড়িলাম। জীব হইয়া আমি অসংখ্য জন্মপরম্পরা অনুভব করিতে থাকিলাম এবং তন্মধ্যগত কোন এক জন্মে আমি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিতৎপর ভিক্ষু অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম[৮।৯]। সন্ন্যাসী হইয়া যোগ-শাস্ত্রোপদিষ্ট আসন বন্ধনের দ্বারা স্থূল শরীর সংযত ও প্রাণ নিরোধ করতঃ লিঙ্গদেহ সংযত করিয়া দেবতাধ্যানাদিতৎপর হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম। ইহার দ্বারা সর্ব্ববিধ মনোভাব বা মনোবৃত্তি বিলীন হইয়া গেল, সমাধিই সম্যক্ অভ্যস্ত হইয়া পড়িল[১০।১১]। সমাধিসিদ্ধ হওয়ায় চিত্ত পূর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগে ক্ষমবান্ হইল। এই ভিক্ষু একদা সমাধি ভঙ্গের পর আসনে স্থিত থাকিয়াই এক মনে আপনার ক্রিয়া ক্রমের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। চিত্তের স্বভাব এই যে

ভবিষ্যৎ আশ্চর্য্যের দ্বারা পূর্ব্বজাত আশ্চর্য্যবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। যোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিলেও তীব্রভাবে অশান্তির চিন্তায় রত হওয়ায় ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব লোপ হইয়া গেল। অবশেষে জীবট-নামধের সাধারণ জীব হইলাম[১২]। পিপীলিকা যেমন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ্রমণ করে, সেইরূপ আমিও জীবট হইয়া বাসনানুসারী দেহে দেহে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে ঐরূপে ব্রাহ্মণ, পরে সামন্ত রাজা, পরে রাজা, তৎপরে বাসনার প্রাবল্যে সুরসুন্দরী অপ্সরী হইলাম। অপ্সরাত্ব অনুভবের পর মৃগীত্ব প্রাপ্ত হইলাম। পরে সে মৃগীত্বও থাকিল না, বাসনামোহের প্রভাবে লতাদেহী হইলাম। অহো! বাসনামোহ জীবের পক্ষে কেবল দুঃখপ্রদই হয়, সুখপ্রদ হয় না[১৩,১৭]। লতা হইয়া বনমধ্যে কিছু কাল সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় অতিবাহিত করা হইল, তৎপরে ভ্রমর জন্ম সংঘটন হইল। এই ভ্রমর পদ্মনালের সহিত হস্তিপদদলনে দলিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যে আমি প্রথমে নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্র ব্রহ্ম ছিলাম, সেই আমি এবম্প্রকার মহাসংসারবিভ্রম প্রাপ্তে পুনঃ পুনঃ এক ভ্রম হইতে অন্য ভ্রম, সে ভ্রম হইতে অন্য ভ্রম অনুভব করিয়াছি। প্রোক্ত শত সংসার ভোগের পর সেই আমি এক্ষণে রুদ্র হইয়াছি। এই যে সংসার শত ভোগ, এ সমস্তই মনের বিভ্রম, অন্য কিছু নহে[১৮,২১]। যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যভূত এই সংসাররূপ অরণ্য অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় প্রতীতিগোচর করিয়া বার বার ইহাতে ভ্রমণ করিয়াছি[২২]। এক সৃষ্টিতে জীবট নামধারী ব্রাহ্মণ, অন্য সৃষ্টিতে রাজা, অপর সৃষ্টিতে হংস, অপর সৃষ্টিতে হরিণ হইয়াছি। চিন্মাত্রাত্মক পরম পদ হইতে চ্যুত হওয়ার পর এ যাবৎ অসংখ্য সহস্র বৎসর, অনন্ত চতুর্যুগশত, অপরিমেয় দিন মাস ঋতু ঐরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে[২৩,২৫]। প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানযোগ্য ভিক্ষু হইয়াছিলাম, তাহারই ফলে বহুজন্ম ব্যবধানের পর ব্রহ্মার হংস হইয়াছিলাম[২৬,২৭]। জীবের যে অভ্যাস অত্যন্ত দৃঢ় হয়, সহস্র জন্ম ব্যবধান হউক না কেন, সে অভ্যাসের ফল হইবেই হইবে[২৮]। কখন কখন এমন হয় যে, সাধুসঙ্গাদির প্রাবল্যে জীবের কদাচিৎ কাকতালীয় ন্যায়ে অশুভ বাসনার ধ্বংস হইয়া থাকে[২৯]। অতএব, যে পুরুষ দুর্ব্বাসনা নাশের ইচ্ছা করিবে, সে পুরুষের জন্মজন্মান্তরব্যাপী সদ্বাসনাভ্যাস দৃঢ় হওয়া আবশ্যক[৩০]। এতদ্দেহে যাহা অজস্র অভ্যস্ত হয়। অথবা দেহা-

ত্বরে যাহা অজস্র অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় অনুভূত হইবেই হইবে। অতএব, যখন অভ্যাসের প্রভাবে মিথ্যাভূত পদার্থও সত্যবৎ হয়, তখন যে সত্য বস্তুর অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদি শাস্ত্রীয় প্রযত্ন দ্বারা সত্য বস্তুর প্রাপ্তি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। অতএব, ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, অনাত্মবিষয়ক যাদৃচ্ছিক ভাবনার অভ্যাস দুঃখোদয়ের হেতু, তথা অনাত্মবিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রযত্নের অভ্যাস (পূজাধ্যানাদি) দুঃখ মিশ্রিত সুখের হেতু। যদি কোন প্রকার ভাবনা না থাকে, সর্ব্বপ্রকার ভাবনার উচ্ছেদ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অনর্থের জয় সুসম্পন্ন হয়[৩১।৩২]। ভাবনার উচ্ছেদ নিতান্ত দুষ্কর নহে, কেননা তত্ত্বদর্শন মাত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। পূর্ব্ব সংস্কারের নাম ভাবনা, তাহারই প্রভাবে আত্মা "এই আমি, এই আমার দেহ" এ সকল দর্শন করে বা অনুভব করে। অতএব, দেহাদি-বিভ্রম কেবল মিথ্যারই বিস্তৃতি; অন্য কিছু নহে[৩৩]। ভাবনা কি? এই প্রশ্নের পর যদি উহার তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন দেখা যায় যে, এ সকলের কিছুই নাই। ভাবনাও অসৎ, সুতরাং কার্য্যও অসৎ। ভাবনার নিরোধ কেবল মাত্র অসম্বেদন দ্বারা অর্থাৎ উহার অস্তিতা-জ্ঞানের অভাব দ্বারা সম্পন্ন হয়। অতএব, এই যে জগৎ-ভ্রম জন্মিয়াছে ইহা আকাশ-বর্ণের ন্যায় মিথ্যা—ভ্রান্তি মাত্র। ইহার বর্জ্জনও অসম্বেদন বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যদিও তাদৃশী অসন্ময়ী মায়া তত্ত্ব-জ্ঞানীর কৌতুকদাত্রী হইয়া থাকে, থাকুক, উহাতে তত্ত্বজ্ঞের কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই[৩৪।৩৬]।

রুদ্র এইরূপ ভাবিয়া ও স্থির করিয়া কৌতুক বশতঃ অবশেষে ভাবিলেন, আমার সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংসার দেখিব ও সে সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়া একাত্মায় পর্য্যবসিত করিব[৩৭]।

রুদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সৃষ্টিতে গমন করিলেন, যে সৃষ্টিতে ভিক্ষুত্ব অনুভূত হইয়াছিল। রুদ্র সেই ভিক্ষু সকাশে গিয়া দেখিলেন, ভিক্ষু স্বকীয় মঠে শবীভূত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন[৩৮]। পরে তাহাকে জাগ্রৎ করিয়া তাহার চিত্ত ও চেতনাংশকে তত্ত্বজ্ঞ রুদ্রচেতনের সহিত ঐক্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভিক্ষু এখন আপনার ভ্রান্তি স্মরণ করিতে সমর্থ হইলেন[৩৯]। রুদ্র আপনাকেই সেই সেই জীবটাদিময় দেখিতে

ছিলেন, সেজন্য তাঁহার বিস্ময় না থাকিলেও ভিক্ষুর বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর, রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে সেই জীবট সংসারে গমন করিলেন। জীবটের বাসস্থান দ্বীপ, জনপদ, গ্রাম, পুরী, এ সমস্তই চিদাকাশের কোন এক উপাধি-কল্পিত অংশে কল্পিত হইয়াছিল, সুতরাং তদভিজ্ঞ রুদ্র ও ভিক্ষু উভয়ে সহসা জীবটের সেই সেই দ্বীপাদিতে গমন করিলেন অর্থাৎ স্বমনোমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, জীবট জ্ঞানশূন্য ও অচেতনকল্প হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জাগরুক তত্ত্বজ্ঞচেতনে সংযোজিত করিলেন এবং একরূপ বা একাত্ম হইয়া সংসারান্তর দর্শনে উৎসুক হইলেন। ইহারা অবিস্মিত-স্বভাব ও প্রবুদ্ধ হইলেও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মিতের ন্যায় ও অপ্রবুদ্ধের ন্যায় স্তব্ধীভূত হইয়াছিলেন[৪০-৪৫]। অনন্তর চিদাকাশেরই একাংশে যে বিপ্রসংসার স্থিত ছিল, সেই বিপ্রসংসারে গমন করিলেন। বিপ্রসংসারের কল্পনাস্থান চিদাকাশে এবং পৃথগ্‌ভূত ভুবন, দ্বীপ, জনপদ, গ্রাম ও তাহার বাসগৃহ, এ সমস্তই যেন পৃথগ্‌ভূত দেখিলেন। বিপ্র স্বগৃহে ব্রাহ্মণীর সহিত নিদ্রায় অচেতন[৪৬,৪৮]। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহাকেও প্রবুদ্ধ ও একাত্ম তত্ত্বজ্ঞচেতনে মিলাইয়া লইলেন[৪৯]। অনন্তর ঐকাত্ম্য প্রাপ্ত জীবটাদি ব্রাহ্মণান্ত জীব সেই পূর্ব্বোক্ত সামন্ত রাজার সংসারে গমন করিলেন। সে ভুবন, সে দ্বীপ, সে রাজ্য, সে পুরী ও সেই সামন্ত রাজাকে গিয়া দেখিলেন, সামন্ত তাহার সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে সুষুপ্ত। অতঃপর ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবুদ্ধ ও রুদ্র করিয়া লওয়া হইল। এ স্থলেও তাঁহারা এক ভাবে বিস্মিত ও অন্য ভাবে অবিস্মিত হইয়াছিলেন[৫০,৫৪]। অতঃপর ইহারা সেই পূর্ব্বোক্ত রাজসংসার দেখিতে উৎসুক হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সে রাজাকেও প্রবুদ্ধ ও রুদ্রভূত করিয়া লইলেন। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, এই সকল ও অন্যান্য সংসার সকল তাঁহারা চিত্তের দ্বারা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সমস্তই যে চিত্তেরই পরিণতি বিশেষ, ইহা বিদিত হইয়াছিলেন[৫৫]। অবশেষে ব্রহ্মহংসরূপা চিত্তপরিণতি ও সর্ব্বশেষে রুদ্ররূপা চিত্তপরিণতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বিরাজমান রহিলেন। প্রোক্ত কারণে এই সকল রুদ্রের সংখ্যা এক শত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রকারের এক শত জীব উক্ত প্রকারে রুদ্রভাব প্রাপ্ত হওয়ায় এক শত

বলিয়া গণ্য[৫৬]। সেই সকল প্রাতিভাসিক অর্থাৎ কল্পিত দেহ সমুদায় রুদ্র ও সে সকলের সংখ্যা এক শত বলিয়া উদাহৃত। মুক্তচেতন রুদ্র একই অর্থাৎ সংবিৎ অংশে একরূপা বা অভিন্না, পরন্তু শরীর বিভিন্ন। পরমেশ্বরের স্বরূপও এই প্রকার অর্থাৎ তত্ত্বতঃ এক, পরন্তু কল্পনায় বহু। ফলিতার্থে ইহাই বুঝিবে, এই সমুদায় দৃশ্যই পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ[৫৭]। শ্রুতিতে এই রুদ্রশতকের কথা আছে, তাহারা সকলেই চিন্ময়, অব্যাহতজ্ঞানী=(যাহাদের জ্ঞান কোন বিষয়েই বাধা প্রাপ্ত হয় না) ও সংসার স্থিতির নেতা। হে রামচন্দ্র! ভিক্ষু-রুদ্রের কল্পিত জগৎ-শতকের মধ্যে বর্ত্তমান, এই জগৎ অর্থাৎ যাহা এক্ষণে তোমার ও আমার অনুভবে স্থিত রহিয়াছে, এ জগৎ একাদশ অর্থাৎ ইহা ভ্রামর-রুদ্রের সংসার। ভ্রামর অর্থাৎ ভ্রমর হইয়া যে সংসার অনুভবীকৃত হইয়াছে, এ সংসার সেই সংসার[৫৮,৫৯]। * যে জীবের আভিমুখ্যে যে সংসারের উদয় হয়, সে জীব সেই সেই সংসারই অনুভব করে, পরন্তু তন্মধ্যগত অজ্ঞ জীবেরা তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না[৬০]। যাহাদের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ হইয়াছে, তাহারা সকলেই ঐক্য বা মেলন প্রাপ্ত হয়। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গের মেলন জন্মে, সেইরূপ তাহাদেরও ঐক্য বা মেলন জন্মে, পরন্তু তন্মধ্যগত অপ্রবুদ্ধ জীবেরা তাহাদের হইতে পৃথক্ থাকে[৬১]। জল লহরী যেমন দ্রবত্বকারণে পরস্পর মিলিত হয় সেইরূপ প্রবুদ্ধ জীবেরাও পরস্পর একীভূত হয়, তাহার অন্যথা হয় না[৬২]। কারণ এই যে, ব্রহ্মই জীব জগতের তত্ত্ব, ব্রহ্মেরই কল্পিত রূপ জীব, সে কল্পিত রূপ অন্তর্হিত হইলে সুতরাং জীবব্রহ্মৈক্যরূপের মেলন সুসম্পন্ন হয়। চিৎব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত কল্পনার আশ্রয় ও বিষয়, সেজন্য কল্পনাভাগ অসত্য হইলেও চিৎসংসর্গে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ভূমির যে স্থান খনন করা যায়, সেই স্থানেই আকাশ পাওয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বগামী চিতেরও

* পূর্ব্বে (৬২ সর্গে) মহাভিক্ষুর কথা প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সেই মহাভিক্ষু একদা প্রবৃত্তধ্যান ত্যাগ পূর্ব্বক কল্পনারাজ্যে উপস্থিত হইলেন; তখন কল্পনাবলে স্বপ্নাবেশের ন্যায় দেখিলেন; তিনি যেন রুদ্রলোকে গমন করিয়াছেন এবং নিজেও রুদ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবংক্রমে হরিণ, হংস, বৃক্ষ, লতা ও ভ্রমর প্রভৃতি বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া সংসার ভোগ করিতেছেন। ইহাকেই শতরুদ্রী কহে।

সর্ব্বত্র চিৎসত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়[৬৩।৬৪]। তুমি যে জগৎপ্রপঞ্চ অনুভব করিতেছ, ইহারই অন্তরালে চিৎব্রহ্মের অবস্থিতি। যেমন সর্ব্বভূত অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বভূত আত্মা চিৎতত্ত্বের অনুভব হয়। যেমন কোন এক বৃক্ষে অথবা প্রস্তরে বিবিধ শালভঞ্জিকা (ছবি) দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, চিদাত্মাতেই এই জগৎ দৃষ্ট হইতেছে[৬৫।৬৬]। ব্রহ্মচিৎ দৃশ্য বা জ্ঞেয় না হইলেও যে, প্রকারান্তরে দৃশ্য বা জ্ঞেয় করা হয়, সেই অন্যথাভাবই এই জগৎ স্থিতির কারণ[৬৭]। হে রঘুনাথ! বিশ্ব আছে ও তাহা সত্য, এতদাকারের জ্ঞানই বন্ধন, বিশ্ব নাই ও তাহা মিথ্যা, এতদাকারের জ্ঞানই মোক্ষ। উভয়ের মধ্যে যাহাতে তোমার রুচি, তাহাকেই তুমি দৃঢ় বা অবিচাল্য কর[৬৮]। ঐরূপ জানা ও না জানার নাম সৃষ্টি ও প্রলয়, তথা বন্ধ ও মোক্ষ, যাহা তদুভয়ের সাক্ষী, তাহা অভিন্ন অর্থাৎ এক ও একরস[৬৯]। অসম্বেদন মাত্রে যাহা থাকে না, তাহার নাশে আবার দুঃখ কি? যাহা কেবল মাত্র তুষ্ণীভাবের প্রাপ্য, তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব কি[৭০]। যে এই জগৎকে আত্মা বলিয়া জানিতেছে, তাহার সেই জগৎজ্ঞান অবেদন অর্থাৎ না জানা বলিয়া গণ্য[৭১]। জলে যেমন ক্ষুদ্র লহরীর দর্শন, সেইরূপ চিৎতত্ত্বে এই জগতের দর্শন। হে রঘুনন্দন! দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের ভেদ এই যে, ক্ষুদ্র লহরীতে ও জলে দেশ, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতির একতা আছে, চিৎতত্ত্বে সে সকল নাই। অর্থাৎ জগৎ নাই ভাবিলেই জগৎ থাকে না, রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। যাহা স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ তুচ্ছা অবিদ্যার আবরণে তাহার সেই স্বপ্রকাশ স্বরূপের অন্যথাত্ব ঘটনা হয়, সেই অন্যথা ভাবই এই ত্রিজগৎ। স্বাধীন স্বপ্রকাশ এক অখণ্ড চৈতন্যই চিতের পারমার্থিক রূপ, জগতের স্বরূপ তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই জগৎ নানা ভেদে ক্লিষ্ট। সেইজন্য জগৎ কথায় আছে বটে, কিন্তু পারমার্থিক রূপে নাই। সুতরাং বাক্যের বিরামে জগতের বিরাম, ইহা সিদ্ধ হয়। বাক্যের অতীত স্থানই পরমাত্মা বা শিব। শব্দ ও অর্থ বস্তুতঃ ভেদ শূন্য। ক্ষুদ্র লহরী একটা শব্দ এবং জল আর একটা শব্দ। এই দুই বিভিন্ন শব্দের অর্থ বস্তুতঃ ভেদশূন্য। অর্থাৎ জলই লহরী রূপে দৃষ্ট হয়, সুতরাং লহরী জল হইতে পৃথক্ নহে[৭২।৭৩]।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ

—()○()—

রামচন্দ্র বলিলেন, মুনীশ্বর! ভিক্ষুর সেই সকল স্বাপ্ন শরীর অর্থাৎ জীবট ও হংস প্রভৃতির শরীর অবশেষে কি হইয়াছিল? স্বাপ্ন শরীর থাকে না—মিথ্যা হইয়া যায়, ইহা সর্ব্ববিদিত। ভিক্ষুর সেই সেই স্বাপ্ন শরীর কি সাধারণ স্বাপ্ন শরীরের ন্যায় মিথ্যাভূত হইয়াছিল? কি ব্যবহার যোগ্য ছিল[১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, তাহারা সকলেই প্রবোধ প্রাপ্তে রুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরে কৌতুক বশতঃ সেই সকল রুদ্রাংশ রুদ্র-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপন আপন মায়াময় পূর্ব্বাপর সংসার সন্দর্শন-পূর্ব্বক কৃতকৃত্য ও সুখী হইয়াছিল[২,৩]। রুদ্র সেই সকল স্বাংশভূত রুদ্রদিগকে বলিলেন, তোমরা এখন আপন আপন স্থানে যাও, প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার মৎসকাশে আসিবে। আমার এই পুরের ভূষণ হইয়া থাকিবে, পরে আমরা সকলেই মহাপ্রলয়ে স্বাধিকার বিনিবৃত্তির পর পরম পদে স্থিত হইব[৪,৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগবান্ রুদ্র এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলে সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি স্ব স্ব স্থানে আগমন করিলেন। ইহারা জীবন্মুক্ত অবস্থায় কিছু কাল কর্ম্ম করিয়া যথা সময়ে রুদ্রলোকগত হইবেন[৬,৮]।

রাম বলিলেন, ব্রহ্মন্! জীবটব্রাহ্মণাদি সেই ভিক্ষুর সঙ্কল্পকল্পিত। যাহাদের রচনা বা সৃষ্টি কেবল সঙ্কল্প মাত্র, তাহাদের আবার সত্যতা কি? স্বপ্নের ন্যায় সঙ্কল্পেরও অসত্যতা দৃষ্ট হয়, কুত্রাপি সত্যতা দৃষ্ট হয় না[৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সঙ্কল্পেরও আংশিক সত্যতা আছে, অর্থাৎ কল্পনাংশে সত্যতা না থাকিলেও তাহার আশ্রয়ের সত্যতা আছে। সঙ্কল্পের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় চিদাত্মা, ইহা তুমি বিবেক দ্বারা বিদিত হও। উক্ত অধিষ্ঠান চৈতন্যই তৎপদবাচ্য, তাহা সর্ব্বময়, সুতরাং তাহারই সামর্থ্যে সাঙ্কল্পিক পদার্থ ব্যবহার যোগ্য হয়[১০]। সেই সর্ব্বাত্মক

চিদাত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সর্ব্বত্র সঙ্কল্পের দ্বারা সেই সেই আকারে বিরাজ করেন, সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট ও সঙ্কল্পদৃষ্ট পদার্থ "আছে" (অস্তি) বলিয়া ব্যবহার-গম্য হয়। আত্মাও সর্ব্বদেশব্যাপী, মনও সর্ব্বগামী, এরূপ হইলেও যেমন উপদেশকাদি কারণ কলাপ ব্যতীত একদেশবাসীরা অন্য দেশ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, স্বপ্নও জাগ্রৎ-সুষুপ্তির অন্তরাল ব্যতীত অন্যাবস্থায় লব্ধ হয় না। * ফল কথা, চিৎকোষে সকল পদার্থ থাকিলেও দর্শনের উদ্বোধ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না, যখন তাহার উদ্বোধ হয়, তখন তাহাই দৃষ্ট হয়১১।

হে রঘুনাথ! চিতের কোষ কি? না মায়া। তাহাতে সকল বাসনাই আছে, সেই জন্যই যখন যে বাসনার উদয়, তখন চিৎ সেই বাসনার পুষ্টিতে সেই পদার্থ দর্শন করে, পরন্তু তাহাও অভ্যাসযোগ সাপেক্ষ বা অভ্যাসযোগের ফল। যাঁহারা ঈশ্বর, যাঁহাদের যোগ বিজ্ঞানের ফল স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্কল্পিতার্থ লাভ তাৎকালিক অভ্যাস যোগ সাপেক্ষ নহে১২।১৩। মায়াপটে যে সব আছে, তাহা শঙ্কর প্রভৃতি ঈশ্বরেরাই দেখিতে পান, অন্যে নহে। কারণ এই যে, একাগ্রতার নাম যোগ, তাহার বলবৎ অভ্যাস অর্থাৎ সিদ্ধি ব্যতীত সত্যসঙ্কল্প হওয়া যায় না। আমাদের সম্মুখে শত শত বস্তু রহিয়াছে, অথচ আমরা সে সকল দেখিতে পাই না। মন যেটীতে ব্যাসক্ত হয়, সেইটীই আমরা দেখি, অন্যটী দেখি না। সঙ্কল্প সিদ্ধি পক্ষে এই দৃষ্টান্ত বিশেষ অনুকূল। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, চিত্তকে একাগ্র বা তন্নিষ্ঠ করিতে পারিলে সমুদায় অভিমত সিদ্ধ করা যায়১৪।১৭। দক্ষিণ দিকে যাইবার ইচ্ছায় বহির্গত হইলে দক্ষিণ দিকেই যাওয়া যায়, উত্তর দিকে যাওয়া যায় না। সঙ্কল্পিত পদার্থের অভ্যাসের দ্বারা সঙ্কল্পিত পদার্থই লব্ধ হয়, অসঙ্কল্পিত পদার্থ লব্ধ হয় না। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝিবে যে, যাহারা আমি অমুক হইব বা অমুক পাইব, বা অমুক সিদ্ধ করিব,

---

* কোন ব্যক্তিকে স্বস্থান হইতে অপরিচিত স্থানান্তরে যাইতে হইলে যেরূপ, একজন পথোপদেষ্টা, মনের স্থিরতা ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা বা কার্য্যক্ষমতা অপেক্ষা করে, জীবের স্বপ্নাবস্থা লাভ করিতে হইলেও ঠিক সেইরূপ জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থা না থাকিলে কস্মিন্ কালেও জীবের স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না;

এইরূপে তদেকাগ্রতা আশ্রয় করে, ভবিষ্যতে তাহারা তাহাই হয়, তাহাই পায়, তাহাই সিদ্ধ করে। যাহারা সেরূপ একাগ্র হইতে পারে না, তাহারা কিছুই লাভ করে না। ভিক্ষুজীব ঐরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হইয়াই রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা অহং সর্ব্বাত্মা, এইরূপে একাগ্র হয়, তাহারা সর্ব্বাত্মাই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। ভিক্ষুসঙ্কল্পপ্রভব জীবের প্রত্যেকে যে যে সঙ্কল্পে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে সেই সেই জগতে স্থিত হইয়াছে। যাহারা প্রত্যেকে রুদ্রভাবনায় সিদ্ধ হয় নাই, সেইজন্য তাহারা প্রত্যেকে সেই সেই জগতে স্থিতি কালে রুদ্রতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমে যে সকল অপ্রবুদ্ধ জীব জন্মে, তাহারা প্রবুদ্ধ জীবের ইচ্ছার দ্বারা বা সঙ্কল্পের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়। একরূপ, বহুরূপ, দেব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, পণ্ডিত, এ সমস্তই ধ্যানের ফল। ধ্যান-ধারণাদিরূপ প্রযত্নের দ্বারা এক, বহু, পণ্ডিত, মূর্খ, দেব ও মনুষ্য উৎপন্ন হয়[১৮।২৫]। জীবের যে সর্ব্বগমন শক্তি আছে, তাহার সার্থক্যাদি প্রযত্নসাপেক্ষ। জীব উৎকট প্রবাহবর্ত্তী ইচ্ছার প্রভাবে না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই, অর্থাৎ সব হইতে পারে[২৬।২৭]। যোগী ও যোগিনীগণ অভিমত দেশ কাল ক্রিয়া ও সে সকলের ক্রম দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যে—সে স্থানে স্থিত করিয়া থাকেন। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে, সিদ্ধিলাভান্তে স্বদেহে ও অন্য দেহে ভোগানুভব করিবার বাধা হয় না। রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্য গৃহে থাকিয়াই সর্ব্বশাস্তা, ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে থাকেন, আবার পৃথিবীতেও পুরুষ রূপে দৃষ্ট হন। দেবী ও দেব স্বর্গলোকে যোগিনীগণ মধ্যে থাকেন, অথচ বলি গ্রহণার্থ পৃথিবীতেও গমন করেন[২৮।৩০]। ইন্দ্রও স্বর্গীয় আসনে স্থিত থাকেন, পরন্তু তৎসমকালে পৃথিবীতেও পূজা গ্রহণার্থ অবতীর্ণ হন। জনার্দ্দন এক, অথচ সহস্র হন। অর্থাৎ একই সময়ে শত শত ভক্ত মনুষ্যের নিকট আবির্ভূত হন, সুতরাং শত বা সহস্র হন। একই জনার্দ্দন শত শত অংশাবতার লীলার দ্বারা জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন এবং একই ভগবান্ একই সময়ে সহস্র কান্তার কান্ত রূপে আবির্ভূত হন[৩১।৩৩]। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তুমি বিদিত হইবে যে, জীবট ব্রাহ্মণাদি জীব সেই একই ভিক্ষু-সঙ্কল্পের প্রভাব বা মহিমা। সেই সকল জীব রুদ্রবিজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া আপন আপন সঙ্কল্পজগতে স্থিত ছিলেন, ভোগান্তে রুদ্র-

পুরে গমন করতঃ রুদ্রানুচর হইয়া বিবিধ ভোগ অনুভব করতঃ অব-শেষে রুদ্রের সহিত পরম পদে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৩১।৩৩]।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভিক্ষুর চিত্তে বর্ণিত প্রকারের ভ্রম উদ্রিক্ত হইয়া-ছিল, সেই ভ্রমকেই সে প্রাক্তন কর্ম্ম বশতঃ পরিপুষ্ট ও পর পর পৃথক্ ভাবে দর্শন বা অনুভব করিয়া ছিলেন[১]। প্রত্যেক জীব উপাধি পরিচ্ছিন্ন চিদাভাস, ইহাদের সকলেরই স্থিতি মৃতি জন্মময়ী অর্থাৎ মরণকালে ইহাদের যেরূপ জগৎ স্বপ্নের ন্যায় দৃষ্ট হয়, জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপ জগৎই ইহারা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ অনুভব করে[২]। আত্মা অপরিচ্ছিন্নস্বভাব হইলেও দেহ-পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়া ঐ সকল অনুভব করে। যাবৎ না মোক্ষ হয়, তাবৎ জীবমাত্রেই ঐরূপ মরণ ও স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় সংসার দর্শন করে। ভিক্ষুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জীব কি ও তাহাদের গতি কি? তাহা তোমার বোধগম্য হউক। জীব মাত্রেরই ঐরূপ দশা ভোগ করিতে হয়। মোক্ষ হইলে জীবত্ব গিয়া ব্রহ্মত্ব হয়, তখন ঐ দশার অতিক্রম করে[৩।৪]। হে রামচন্দ্র! কেবল ভিক্ষুই যে পরম পদ হইতে স্খলিত হইয়া মোহ হইতে মোহা-ন্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। জীব মাত্রেই পরমপদ-স্খলিত ও মোহ হইতে মোহান্তর প্রাপ্ত[৫]। যেমন পাষাণ খণ্ড পর্ব্বতাগ্র পরিভ্রষ্ট ও নীচ হইতে নীচতরে নিপতিত হয়, সেইরূপ, পরমাত্মপরিভ্রষ্ট জীবও স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর অনুভবের ন্যায় মিথ্যাভূত সংসার অনুভব করে। প্রভেদ এই যে, ইহা স্বপ্ন অপেক্ষা দৃঢ়[৬।৭]। মায়াজর্জ্জরিত জীব মায়ার দ্বারা আন্তরে অর্থাৎ মনোমধ্যে বর্ণিতবিধ অন্তর্ব্বাহ্ বিবিধ জগৎ দেখিতে থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই জন্মাদি দুঃখ, নিতান্ত নির্বি-

মিত্তক নহে। নিষ্কর্ষ এই যে, অহং দেহী ইত্যাকার অভিমানই বন্ধন, এবং আত্ম লাভই মোক্ষ।

রামচন্দ্র বলিলেন, অহো! মায়া কি বিষম! অহো! জীবের কি বিষম মোহ*! অত্যন্ত মত্ত বা ভ্রান্ত পুরুষেরা সুপ্ত হইয়া স্বাপ্ন মায়ায় দ্বারা নানা বিষম বিকার ও সঙ্কট অনুভব করে ও সে সমুদায়কে সত্য মনে করে, ইহা যেরূপ আশ্চর্য্য, জীবের সংসার তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য। হে ভগবন্! আপনি যে বলিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিষয় সদা সম্ভব, তাহাও আমি দেখিতেছি ও বুঝিতেছি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য,—তাদৃশ গুণাদিযুক্ত ভিক্ষুনামা জীব আছে, তাই আমার নিকট তাহার কথা বর্ণন করিলেন? অথবা আমার বোধ উৎপাদনার্থ নিজে ঐরূপ একটা জীব কল্পনা করিয়া তাহার চরিত্রাদি আমার নিকট বর্ণন করিলেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন, আজ্ রাত্রে আমি সমাধিস্থ হইয়া এই লোকত্রয় অনুসন্ধান করিব। কল্য প্রাতে ঐরূপ কোন ভিক্ষু আছে কি না, তাহা বলিব।

বাল্মীকী বলিলেন, মুনিবর বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলে, সভার বাহিরে মধ্যাহ্নসূচক বাদ্য বিশেষ শ্রুতিগোচর হইল। তৎশ্রবণে সভাস্থ জনবৃন্দ মুনিবরের পদ প্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও প্রণামাদি কার্য্য করিয়া মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ সভা ত্যাগের উদ্যোগ করিল[১০।১০]। সভা ভঙ্গ হইলে পরস্পর যথাযোগ্য প্রণামাদি করণানন্তর স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। দৈবসিক কার্য্য নির্ব্বাহের পর মুনিবরের উপদিষ্ট কথা সকল চিন্তা করতঃ রাত্রি যাপন অন্তে পুনঃ প্রাতঃকাল আগতে পুনঃ সভামণ্ডপে সমাগত হইল[১১,১৩]।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

—০()•()০—

বাল্মীকী বলিলেন, বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্র প্রভৃত্যন্য মুনিবৃন্দের সহিত ও সিদ্ধগণ পরিবৃত রাজগণ পুনর্ব্বার সভায় সমাবেত হইলেন এবং তন্মধ্যে রাম লক্ষণও শোভা পাইতে লাগিলেন। সভা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণভাব ধারণ করিল১।২। বশিষ্ঠ মুনি কাহারও কোন প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়া, পূর্ব্বদিবসের প্রশ্নানুসারী প্রত্যুত্তর বাক্য উচ্চারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন৩।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুকুলাকাশের পূর্ণচন্দ্র রাম! আমি গত রাত্রে জ্ঞান নেত্রের দ্বারা সেই ভিক্ষুকে দেখিয়াছি৪। আমি সেই ভিক্ষুকে দেখিবার জন্য ধ্যানযোগে এই সপ্তদ্বীপা সপর্ব্বতা ও সকাননা পৃথিবী পরিভ্রমন করিয়াছি। প্রথমে আমি কুত্রাপি তাদৃশ ভিক্ষু দেখিলাম না, পরে রাত্রিশেষে পুনর্ধ্যানযোগে অন্বেষণ আরম্ভ করিলে দেখিলাম, উত্তর দিকের এক প্রান্তে বল্মীকনামক জনপদের পর জিন নামে এক দেশ আছে, সেই দেশে এক বিহার, তন্মধ্যে এক কুটীর, সেই কুটীর মধ্যে দীর্ঘদৃক্ নামে এক ভিক্ষু সমাধির নিমিত্ত স্থিত রহিয়াছেন৫।৮। ভিক্ষু একবিংশতি রাত্র ধ্যানস্থ থাকিবেন, পাছে কেহ তাহার ধ্যান বিঘ্ন করে, সেই ভয়ে তিনি কুটীর দ্বার সুদৃঢ় অর্গল দ্বারা বদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে স্থিত থাকিলেন। আজ্ তাঁহার পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারের অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্য লাভের দিন। তিনি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সহস্র বৎসর অতি বাহিত করিয়াছিলেন, অবশেষে বর্ণিত প্রকারে তিনি একবিংশতি রাত্র সমাধিস্থ ছিলেন। পূর্ব্বকল্পে এরূপ আর একটী ভিক্ষু ছিলেন, এতৎ-কল্পে এইটী দ্বিতীয়। এরূপ তৃতীয় ভিক্ষু আছে কি না, তাহা আমার তৎকালে জ্ঞানগোচর হয় নাই১০।১৩। অলি যেমন পদ্মে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ আমি পুনর্ব্বার জগৎপদ্মে ধ্যানযোগে পরিভ্রমণ ও অন্বে-ষণ করিয়া দেখিলাম, অন্য সৃষ্টিতে এরূপ আর একটী ভিক্ষু আছে। তৎপরে পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সে সৃষ্টিতেও

এতদ্রূপ অপর এক ভিক্ষু আছে[১৪।১৩]। ব্রহ্ম নির্ম্মিত সৃষ্টি বা ভুবন-কোষ অনন্ত, এবং সমুদায় সৃষ্টি চিদাকাশের এক কোণে স্থিত। হে রঘুনাথ! এই সভায় যে সকল মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন, ইহারাও পুনঃ পুনঃ এতদ্রূপ সমাচার বিশিষ্ট হন ও হইবেন। ইহাদেরই অনুরূপ আরও অনেক মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন[১৭।১৮]। এই নারদ পুনঃ অন্য নারদ হইবেন, ব্যাস ও শুকও পুনঃ অন্য ব্যাস ও শুক হইবেন, ইহাদের জন্ম কর্ম্মাদিও ইহাদের জন্ম কর্ম্মাদির তুল্য। এইরূপ শৌনকও আবার শৌনক, ক্রতু ও পুলস্থ পুনঃ ক্রতু ও পুলস্থ, অগস্ত্যও পুনঃ অন্য অগস্ত্য, ভৃগুও পুনঃ অন্য ভৃগু, অঙ্গিরাও পুনঃ অন্য অঙ্গিরা হইয়াছিলেন ও হইবেন। মায়ার বিস্তৃতি এইরূপ। দীর্ঘকাল সমান আচারের ও সমান জন্মের জীব জন্ম গ্রহণ করে। জলে যেমন অবিশ্রান্ত ও অসংখ্য ক্ষুদ্র লহরী জন্মে, সেইরূপ, ব্রহ্মাকাশেও অবিশ্রান্ত ও অসংখ্য সৃষ্টি উদ্ভূত হইতেছে। কোন কোন সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান, কোন কোন সৃষ্টি অর্দ্ধসমান, কোন কোন সৃষ্টি কোন কোন অংশে সমান, আবার কোন সৃষ্টি সম্পূর্ণ অভিনব। মায়ার এই বিস্তৃতি মহান্‌দিগেরও মোহজনক[১৯।২০]। ক্ষণনিমেষময় কালাত্মক, তাহাতে দেহাদি চেষ্টার কথা দূরে থাকুক, মানসী চেষ্টাও সম্ভবে না, সুতরাং ঐ সকল ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ভাবিয়া দেখ, কোথায় এক-বিংশতি রাত্র, আর কোথায় জীবটাদি-ঘটিত অনন্ত সৃষ্টি। ভিক্ষুর চরিত্রে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ সমস্তই প্রতিভার (ভ্রান্তির) বিকাস[২৩]। যেমন প্রভাত হইবামাত্র পদ্মের বিকাশ জন্মে, বহু ভ্রমরের কলহ উপস্থিত হয়, সেইরূপ, শুদ্ধ ব্রহ্মে সংবেদনের দোষে এই অশুদ্ধ সংসার প্রতিভাত হয়[২৭]। ভিক্ষুর মনের ন্যায় সমুদায় জীবের মনে জগৎ-প্রতিভাস, তদন্তর্গত জীবের বিচিত্র চরিত্রাদি, উদিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। যে যাহা দেখিতেছে, সে সে—সমুদায়কে সত্যই ভাবিতেছে, মিথ্যা বলিয়া জানিতেছে না। চিদাত্মা সর্ব্বাত্মক, সমস্তই তদৈক্যে প্রস্ফুরিত হয়, সেই জন্যই জীব সত্য বলিয়া জানে। অর্থাৎ চিদাত্মার সত্যতাই অধ্যস্তভূত সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়, অবিবেক বশতঃ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। জীবের যখন বিবেক ও আত্ম-তত্ত্ববোধ জন্মে, তখন এ সমুদায়ের মিথ্যাত্ব সুস্থির হয়, তৎপূর্ব্বে হয়

না। যাবৎ রজ্জু ও সর্প উভয়ের অবিবেক থাকে, তাবৎ সর্পের অসত্যতা উপলব্ধ হয় না[১৮]।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

দশরথ বলিলেন, হে মুনিবর! সেই ভিক্ষু যে স্থানে ও যে কুটীমধ্যে সমাহিত আছে, আমার এই সকল সেই স্থানে যাউক, তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া মৎসকাশে আনয়ন করুক। আমি তাহাকে দেখিব[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! ভিক্ষুর সেই বিদ্যমান দেহ এক্ষণে প্রাণবর্জ্জিত। তিনি এক্ষণে গতপ্রাণ অর্থাৎ জীবিত নহেন। ভিক্ষুর সেই জীব এক্ষণে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবাহন হংস ও জীবন্মুক্ত[২,৩]। ভিক্ষু কুটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাহিত হইয়া একাবিংশতি দিবসের পর দেহ বর্জ্জন করিল, তদীয় ভৃত্যেরা বলপূর্ব্বক দ্বার ভঙ্গ করিয়া ভিক্ষুশরীর নিষ্কাশিত করিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদীয় পোষ্যগণ সকলেই সমবেত হইয়াছিল[৪]। তাহারা ভিক্ষুশরীর গতপ্রাণ দেখিয়া জলমগ্ন করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা ভক্তি পূজাদি ব্যবহার প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত সেই কুটীরে তদীয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ভিক্ষু সেই প্রকারে অদেহ ও মুক্তাবস্থ হইয়াছে। যে শরীর জীবিত নহে—সে শরীরে কি প্রবোধ জন্মে? তাহা জন্মে না[৫,৬]। (রাম প্রশ্নের এইরূপ প্রত্যুত্তর দিয়া পুনঃ প্রস্তাবিত কথা উত্থাপিত করিলেন) বশিষ্ঠ বলিলেন, জগন্ময়ী মায়া দুর্ব্বোধ্য ও দুরপনেয়। অসত্য হইলেও সে সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়। সুবর্ণ যেমন হার কেয়ূরাদিভাবে প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ, আত্মসংবোধের যৎকিঞ্চিৎ অন্যথা হইবামাত্র আত্মাতেই এই সকল প্রতিভাস উদিত হয়[৭,৮]। জলে যেমন তরঙ্গ, তদ্রূপ পরমাত্মায় বিশ্ব। পরমাত্মাই অবিবেক বশতঃ জীব, আবার বিবেক বশতঃ পর-

মাত্মা। শ্রুতিতে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্বাত্মসম্বোধে পরমাত্মা ও অবোধে সংসার[৯।১১]। প্রত্যেক প্রাণির সংসারকে তুমি ভিক্ষুস্বপ্নের ন্যায় ভ্রান্তিকৃত বলিয়া স্থির করিবে[১২]। আদি শরীরী পদ্মযোনি হইতেই প্রথমে জগৎ-স্বপ্ন সৃষ্ট হয়, পশ্চাৎ তাহাই ব্যষ্টি ক্রমে অর্থাৎ তদন্তর্গত প্রত্যেক ভূতে নিরূঢ় হইতে থাকে। জীব যখন চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, তখন সে দেখে, সমস্তই ভ্রমের বা স্বপ্নের অনুরূপ। এই যে জীব-জগদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ ব্যবহার, ইহা যাহাই হউক, ফলতঃ আন্তরস্থ দীর্ঘ স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কিছু নহে[১৩।১৫]। কেবল মাত্র চিৎসত্তা অর্থাৎ আত্মার অস্তিতা মাত্র আশ্রয় করিয়া স্বরূপ প্রতীতির অন্যথা হইতে এই জরামরণাদি দুঃখের উদয় হইতেছে[১৬]। বিচিত্র সুকৃতশালিনী জীব চিৎ চিত্তের দ্বারাই এ দিকে পাতাল ওদিকে ব্রহ্মলোক রচনা করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। সেই যে প্রাগুক্ত পরমাত্মচিৎ, সে প্রাণ কল্পনা করতঃ তদধীনে লুঠিত হইতেছে[১৭।১৮]। ইহা জীব, উহা দেহ, এ সকল কল্পিত হইলেও মূলতঃ পরমাত্মাই, বস্তুন্তর নহে। সর্প কল্পিত হইলেও তাহা রজ্জুর অনতিরিক্ত। প্রতিবিম্ব কল্পিত হইলেও তাহা বিম্বের অনতিরিক্ত[১৯]। তখন পরমার্থ পক্ষ দূরে থাকুক। যখন তদ্রূপ ঐক্য প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্যবহার দৃষ্টিতেও ব্রহ্মেই ব্রহ্মের অবস্থান—জগৎ নহে, ইহা স্থির করা উচিত। যেমন আকাশে শুদ্ধাকাশ, জলে নির্ম্মল জল, সেইরূপ[২০]। বালকেরা যেমন প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভয় পায়, সেইরূপ, অজ্ঞ জীবেরাও ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ দেখিয়া ভয়ত্রাসাদি অনুভব করে[২১]। ভিন্নতা-বোধ বুদ্ধিরই অবস্থাবিশেষ—পরিণাম বিশেষ, সুতরাং শুদ্ধতার কোনও ভেদ থাকে না, সমস্তই অগ্নিসংযোগে ঘৃতের ন্যায় গলিত হইয়া যায়[২২]। সর্ব্বাত্মা চিৎ-পদার্থে বিশ্ব দর্শনকে তত্ত্বজ্ঞ নরেরা মিথ্যা বলিয়া বর্ণন করেন[২৩]। বস্তুতঃই চিতের স্পন্দ ও অস্পন্দ দুএর কিছুই নাই। একত্ব, দ্বিত্ব ও নাই। কেননা, ভেদ মাত্রেই কল্পনা-প্রসূত, কল্পনার মিথ্যাত্ব সর্ব্ববিদিত। অতএব, বিশুদ্ধ কেবল চৈতন্যই এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব। বিচারের দ্বারাই হউক, আর বস্তু-স্বভাব বশতঃই হউক, সমস্তই চিৎ, এরূপ স্থিরীকৃত হইলে দৃশ্যপ্রপঞ্চ অভাবগ্রস্ত হয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিহত হয়[২৪।২৫]। ভেদ জ্ঞানের দ্বারাই এ সকলের উদয়, পরন্তু ভেদ প্রকৃতির বা মায়ার

চিহ্ন, সুতরাং অভেদ বোধের দ্বারা ভেদ তিরোহিত হইলে তখন কেবল পরমাত্ম-চিৎই অবশেষিত হয়, আর সব মিথ্যা হইয়া যায়[২৩]। তুমিই অবোধ দ্বারা নানা হইয়াছ ও অবোধ কেবল আত্ম-অনবেক্ষণ বশতঃ। তুমি যদি ভাল করিয়া দেখ,—বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে তোমার আর শঙ্কা থাকিবে না[২৭]। সেই যে নিঃশঙ্কাবস্থা, সে অবস্থা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির ও তুর্য্যতার অতীত। তাহা বন্ধনও নহে, মোক্ষও নহে, কিন্তু স্বরূপস্থিতি[২৮]। যে হেতু দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি ভাবান্বিত জগৎ অবোধমূলক ও অবোধ অসত্য, সেই হেতু, দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন, এ সকল পরমার্থতঃ নহে। তুমি যদি নিঃসঙ্কল্প হও, তোমার এই স্পন্দও নিস্পন্দ হইবে। স্পন্দ অর্থাৎ মনের ভিন্ন ভিন্ন কল্পনাময় গতি বা প্রচলন। কেননা কেবলা চিৎ স্পন্দাস্পন্দের অতীত। দ্বৈত বা ঐক্য, কল্পনারই মধ্যপাতী। কল্পনা ত্যাগ হইলে ব্রহ্মই অবশেষিত হয়[২৯।৩১]। চিদ্রূপ চন্দ্রে যে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক, এ কলঙ্ককে তুমি মিথ্যা বলিয়া জানিবে। যে আত্মা কেবলা চিৎ, তাহাতে আবার কলঙ্ক কি? তাহা সৎ অসৎ উভয় বাক্যের অতীত মঙ্গলময়. তুমি সেই বিস্তৃত চিদ্‌ঘন পদে স্থিতি কর। হে চিচ্চন্দ্র! হে অসঙ্কল্পকলঙ্ক! ভাব ও অভাব তোমাতে ক্ষয় প্রাপ্ত, তুমি অম্লান-ধর্ম্মা, তুমি চিন্ময়, এই ভাবে তুমি আস্থা স্থাপন কর এবং সুখে স্থিতি কর[৩২।৩৪]।

কল্পনা বল, অকল্পনা বল, অথবা স্পন্দাস্পন্দ বল, এ সকল কেবল নাম মাত্র। তুমি আনন্দের সমুদ্র, আর সব চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভ্রান্তি। যে হেতু ভ্রান্তি, সেই হেতু তুমি পূর্ণাপূর্ণ দশাকে এক বলিয়া জানিবে[৩৫]।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

৩য় সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি সুষুপ্তমৌনী হও, চিত্তের বিলাস পরিত্যাগ কর, করিয়া তৎপদে অবস্থান কর[১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! বাক্যমৌন, ইন্দ্রিয়মৌন, ও কাষ্ঠমৌন, এই তিন্ মৌন জানি। সুষুপ্তমৌন কি? তাহা জানি না। অতএব, সুষুপ্তমৌন কি তাহা আমাকে বলুন[২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিরা দ্বিবিধ মৌনের উপদেশ করেন। এক কাষ্ঠ-মৌন, অপর জীবন্মুক্ত মৌন। আত্মতত্ত্বপর্য্যালোচন বর্জ্জিত, সুতরাং শুষ্ক বা নীরস যে মৌন, যে মৌন কেবল ইন্দ্রিয় নিরোধ দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে মৌনকে মুনিরা কাষ্ঠমৌন ও কাষ্ঠতপস্যা বলেন[৩।৪]। আর যাঁহারা যথাযথ আত্মরূপ বোধগম্য করিয়া আত্মাতেই স্থিত হন, অন্তরে নিত্য-তৃপ্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন, বাহিরে অন্যান্য লোকের ন্যায় স্থিত হন, তাঁহারা মুক্ত মুনি[৫]। উক্ত মুনি দ্বয়ের যে চিত্তনিশ্চয়াত্মক ভাব, সেই ভাবকে লোকে ও শাস্ত্রে মৌন বলে[৬]। মৌনজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মৌনকে চারি প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাক্যমৌন, অক্ষমৌন, কাষ্ঠমৌন, আর সুষুপ্তমৌন[৭]। বলপূর্ব্বক বাক্য নিরোধ করিলে তাহাকে বাক্য-মৌন, ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে তাহাকে অক্ষমৌন, চেষ্টাবিবর্জ্জিত হইলে তাহাকে কাষ্ঠমৌন বলা যায়। এইরূপ বিভাগ পক্ষে মনোনিগ্রহকেও মনোমৌন বলা যাইতে পারে। আর জীবন্মুক্ত লক্ষণ অবস্থাকে পণ্ডিত-গণ সুষুপ্তমৌন বলেন[৮।৯]। যাহারা কাষ্ঠতপস্বী উক্ত ত্রিবিধ মৌন তাহাদেরই সেব্য। যাহাদের বুদ্ধি জীবন্মুক্ত পদে স্থিতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সেই মৌন চতুর্থ অর্থাৎ সুষুপ্তমৌন বলিয়া গণ্য[১০]। কাষ্ঠতপস্বী-দিগের বাক্যমৌন প্রভৃতি মৌনে বন্ধন চ্ছেদ হয় না। কাষ্ঠমৌনীরা আপনাকে স্মরণ করিতে পারে না, কেবল দৃশ্য স্মরণ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করে। আত্মার বিস্মরণই তাহাদের বন্ধনের কারণ[১১।১২]। যখন তাহারা ব্যুত্থান লাভ করে, অর্থাৎ মৌনতা ত্যাগ করে, তখন

তাহাদের চিত্ত পূর্ব্ববৎ চঞ্চল হয়[১৩]। সেইজন্য পণ্ডিতেরা ত্রিবিধ কাষ্ঠ-মৌনকে ভাল মনে করেন না। রাম! আমি তোমাকে পূর্ণ স্থিতি-প্রসঙ্গে মৌনীদিগের মৌনাবস্থার লক্ষণ ও ফলাফল বর্ণন করিলাম, ইহাতে সেই সেই মৌনীরা সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হন, হইবেন[১৪]। এক্ষণে জীবন্মুক্ত-লক্ষণ সুষুপ্তমৌন বলি, শ্রবণ কর। এই মৌন যথার্থ শুনিবার যোগ্য ও জীবের পুনর্জ্জন্ম নিবারক[১৫]। এ মৌনে প্রাণ-সংযম আবশ্যক হয় না, ইহার ঐ প্রকার বিভাগ বা ভেদ নাই এবং ইহাতে উল্লাস ও গ্লানি প্রভৃতি কিছুই নাই[১৬]। ইহা নানাত্ব কল্পনার উপশম স্থান, চিত্ত অচিত্ত এবং সৎ ও অসৎ বিভাগের অতীত, অযত্ন-সিদ্ধ বা স্বরূপাবস্থা মাত্র। ধ্যান করুক বা না করুক, ইহা অপরিচ্ছিন্ন আত্মরূপ আদ্যন্তাদি শূন্য[১৭।১৮]। যে মহাপুরুষ এই নানাত্বভাবান্বিত জগৎকে ভ্রম বলিয়া জানিয়া সন্দেহাদির অতীত হয়, সেই মহাপুরুষের সেই স্থিতিকে সুষুপ্তমৌন বলা যায়[১৯]। শিবই এই অনেক রূপে আতত, ইহা যে স্থির করিয়া স্থিত হয়, তাঁহারও তাদৃশী স্থিতি সুষুপ্ত মৌন। আকাশ বা আকাশ নহে অর্থাৎ শূন্য নহে, কিন্তু পূর্ণ, সমস্তই আছে, অথচ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আছে; তদতিরিক্তরূপে নাই, এই ভাবে যাহার চিত্ত উপশান্ত হইয়াছে, তাহাকে আমরা সুষুপ্তমৌনী বলি। যে সমস্তই শূন্য, নিরালম্ব, শান্তিময় ও কেবল জ্ঞপ্তি, সদসৎ বিভাগের অতীত হয়, তাহাকেই আমরা উত্তম মৌনী বলি[২০।২২]। যাহার সম্বিৎ ভাব অভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্থিতি করে ও ভ্রম-শূন্যা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে উত্তম মৌনী বলেন[২৩]। যাহার অন্তর অত্যন্ত সাম্য লাভ করে, অর্থাৎ যাহার চিত্ত ভেদবৃত্তি বর্জ্জিত হয়, তাহার সেই মৌন অক্ষয়[২৪]। আমি নহি, অন্য কিছুও নাই, মন ও মানস মিথ্যা, এক জ্ঞানরূপী আত্মা আছে ও সত্য, এইরূপ সম্বে-দনও উত্তম মৌন[২৫]। এই জগতে একমাত্র আমিই আছি, অর্থাৎ অহং এই মনোবৃত্তিতে চৈতন্যের প্রকাশ, সেই চৈতন্যই আমি, অহং এই বৃত্তিটা আমি নহি, এইরূপ যে নির্ব্বিশেষ অস্তিতা, সেই নির্ব্বি-শেষ অস্তিতাই উত্তম মৌন[২৬]। যে হেতু স্ব-পর-অন্য প্রভৃতি ভেদ নিরস্ত হয়, সেই হেতু এই সুষুপ্তমৌন শ্রেষ্ঠ[২৭]। এই সুষুপ্তমৌন অনন্ত ও তুর্য্যাতীত। অর্থাৎ প্রবোধে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বাধিত হইয়া যায়,

পরন্তু তৎকালেও ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি থাকে, সেজন্য সে অবস্থা তুর্য্য, তৎপরে সে বৃত্তিও থাকে না, সুতরাং তাহা তুর্য্যাতীত। যে সমাধি সুষুপ্ততুল্য, যে সমাধি তুর্য্যপদবাচ্য ও যাহা তুর্য্যাতীত, এ সমস্তই জ্ঞানীর জাগ্রৎ কালেও হয়[২৮।২৯]। হে সাধো! নির্ম্মলবৃত্তি, ও:শান্ত ও তুর্য্যত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ কালে ব্যবহার নির্ব্বাহ করিলেও এবং সদেহ অথবা বিদেহ হইলেও তাহার ঐ অবস্থা আকাশের সহিত কথঞ্চিৎ তুলিত হইতে পারে।

তুমি ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ নির্ব্বাসনত্ব লাভ কর, আমি, এ, সে, তাহা, ইহা, এ সকল ভেদ তোমার অসত্য হইয়া যাউক, তুমি কেবল মাত্র একাদ্বয় চিদাকাশময় হও[৩০।৩১]।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতম সর্গ

—•—

রাম বলিলেন, হে মুনিনায়ক! কি কারণে আপনি রুদ্রের শত সংখ্যা বর্ণন করিলেন? যাহারা গণ বা অনুচর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কি রুদ্র নহে?

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভিক্ষু এক শত স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন, প্রত্যেক স্বপ্নের স্বাপ্নশরীর বিভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্যে তুমি ঐ রহস্য বোধগম্য করিয়াছ, সেজন্য আমি তোমার নিকট প্রত্যেক রুদ্রের নাম উল্লেখ করি নাই। ভিক্ষুর স্বপ্নে যে জীবটাদি আকার প্রথিত হইয়াছিল, সেই সকল আকার সামান্যতঃ গণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। তাহারাই রুদ্রশতক ও রুদ্র ও গণশতক। অভিপ্রেতার্থ এই যে, সকলেই ভোগে ও ঐশ্বর্য্যে সমান ও রুদ্রের অংশ। যে হেতু অংশ, সেই হেতু রুদ্র[১।৩]।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! ভিক্ষুর চিত্ত এক, তাহা হইতে কিরূপে

এক শত চিত্ত সমুৎপন্ন হইল? ভিক্ষু-স্বপ্নকৃত রুদ্র হইতে শততম রুদ্র কিরূপে উৎপন্ন হইল[৪]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাহারা অনীশ্বর বা অজ্ঞ, তাহাদের চিত্ত হইতে চিত্তান্তর সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহারা যোগ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সত্যসঙ্কল্প, তাহারা কল্পনারূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। আমার আত্মা সর্ব্বগামী, সর্ব্বব্যাপী, এ জ্ঞান যাহাদের দৃঢ় ও সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বাত্মা। ইহাদেরও ভাবিত পদার্থ ভাবনামাত্রে প্রথা প্রাপ্ত হয়[৫],[৬]।

রঘুনাথ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি ঈশ্বর, যাঁহার আভরণ ভস্ম, যাঁহার নিলয় শ্মশান, তাঁহার আবার কামনা বা ইচ্ছা কি[৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, যাঁহারা জীবন্মুক্ত, সিদ্ধ ও মহেশ্বর, তাঁহাদের কোন রূপ ক্রিয়া নিয়ত নাই। ঐ সকল ক্রিয়া-নিয়ম অজ্ঞের অর্থাৎ অজ্ঞেরা ঐ সকল কল্পনা করিয়া লয়। অজ্ঞদিগের চিত্ত রাগ দ্বেশ প্রভৃতি বিবিধ বিকার দ্বারা খণ্ডিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, তাহারা ক্রিয়া-নিয়মের অধীন হইয়া অর্থাৎ বিধিনিষেধের বশ্য হইয়া সুখ দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত হয়[৮],[৯]। যাহারা অজ্ঞবিপরীত অর্থাৎ জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ইষ্টও নাই, অনিষ্টও নাই। তাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, বাসনাও ক্ষয় প্রাপ্ত, সেইজন্য তাঁহারা কোনও কিছুতে নিমগ্ন বা ব্যাসক্ত নহেন[১০]। তাঁহারা যে কার্য্য করেন, কামনা পূর্ব্বক নহে। তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ কাকতালীয় ন্যায়ে সম্পন্ন হয়। সুতরাং অজ্ঞেরা তাঁহাদের কার্য্য বা ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর করিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা করেন না। বিষ্ণু যাহা করেন, তাহাও কাকতালীয় ন্যায়ের সহিত তুলিত হয়, ত্রিনয়ন দেব শিবের কার্য্যও সেইরূপ, ব্রহ্মার কার্য্যও সেইরূপ[১১],[১২]। তাঁহাদের নিকট কোনও কিছু নিন্দিত, অনিন্দিত ও হেয় বা উপাদেয় নহে। তাঁহাদের আত্মীয়ও নাই, পরও নাই, এবং কোনও কিছু তাঁহাদের বন্ধনজনক নহে[১৩]। যেমন প্রথম সৃষ্টিতে অগ্নিতেই উষ্ণতা স্বভাবতঃ রূঢ় হইয়াছে, সেইরূপ, ভস্মকপালাদি ধারণা ক্রিয়াও হর প্রভৃতিতে স্বতই রূঢ় হইয়াছে[১৪]। যাহারা অজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া তাহাদের ঐরূপ রূঢ় নহে, অর্থাৎ অজ্ঞেরা বিধির বশ্য হইয়া ঐ সকল ক্রিয়া পশ্চাৎ গ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ সকল ক্রিয়া ফলও তাহারা স্ব স্ব কল্পনানুসারে পশ্চাৎ

অনুভব বা ভোগ করে[১৫]। রঘুনাথ! সদেহ-প্রসিদ্ধ চার প্রকার মৌনের কথা বলা হইয়াছে, পরন্তু বিদেহ প্রসিদ্ধ মৌনের কথা বলা হয় নাই, সেই অবশিষ্ট অংশ বলি, শ্রবণ কর[১৬]। হে রামচন্দ্র! আত্মাকাশনামধেয় চিদাকাশ এই ভূতাকাশ অপেক্ষা অতিশয়িত নির্ম্মল। তদ্ভাব প্রাপ্তি যেরূপে হয় তাহা বলি, শ্রবণ কর[১৭]। সংখ্যা অর্থাৎ বিবেক বিচারাদি প্রভব জ্ঞানের দ্বারা যাহারা সম্যক্ অববুদ্ধ হন, তাঁহারা সাংখ্য যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারা অদ্বয়মতি হইয়া সমাধি সাধন করিয়া ঐ সিদ্ধি লাভ করেন। আর যাঁহারা যুক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাণবায়ুর নিরোধ প্রভৃতির দ্বারা উক্ত পদ প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রে তাঁহারা যোগযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই অকৃত্রিম শান্ত পদ সকলেরই উপাদেয়, পরন্তু তাহা কেহ সাংখ্যের দ্বারা লাভ করেন, কেহ বা যোগের দ্বারা লাভ করেন[১৮।২০]। যে পুরুষ সাংখ্য ও যোগ উভয় পথকে তুল্য বলিয়া জানে, সে পুরুষই যথার্থ জ্ঞানী। যে স্থান বা যে পদ সাংখ্যের প্রাপ্য, সেই স্থান বা সেই পদ যোগীরও প্রাপ্য, সুতরাং সাংখ্য ও যোগ উভয়ই প্রাপ্য বিষয়ে এক[২১]। বৎস রঘুনাথ! প্রাণের ও মনের বৃত্তি যে স্থান স্পর্শ করিতেও পারে না ও বাসনারূপ রজ্জু অতিক্রান্ত, সেই পদকে তুমি পরম পদ বলিয়া জানিবে[২২]। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতির চেষ্টা ও সে সকলের পুঞ্জীভূত সংস্কার ও তদাত্মক চিত্ত, এই সমস্তই সংসারের কারণ। সাঙ্খ্যের অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অথবা যোগের দ্বারা ঐ সকলের একতর বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার হইলে সংসারও বিলয়গামী হয়[২৩]। মন বালকের ভূত-প্রেত দর্শনের ন্যায় দেহ দর্শন করে, সে যদি লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আর কে আছে? যে দেহ দর্শন করিবে[২৪]। ফলতঃ মন অসৎ, তাহার সত্তা নাই, তাহার উদয় কেবলমাত্র মোহ। যেমন স্বপ্নে আত্মমরণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মনও মোহাবস্থায় দৃষ্ট হয়[২৫]। এই সংসার মনঃপ্রভব, যে হেতু মনঃপ্রভব ও মিথ্যা—মনের কল্পিত, সেই হেতু অহং মমাত্মক সংস্কারও কল্পিত। অমুক উপদেশ্য, অমুক উপদেষ্টা, আমার বন্ধন, আমার মোক্ষ, এ সমস্তই মনের কল্পনা, সুতরাং অবাস্তব[২৬]। দৃঢ়তর অদ্বৈত জ্ঞান, প্রাণাদির বিলয় ও মনের নিগ্রহ, ইহাই মোক্ষ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ ঐ তিন্ প্রকার মোক্ষের কারণ[২৭]।

রামচন্দ্র বলিলেন, যদি প্রাণের বিলয় মোক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, মৃত্যুতেই সর্ব্ব জীবের মুক্তি[২৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মৃত্যুতে প্রাণের বিলয় হয় না। যাহাতে তাহা হয়, তাহা পরে বলিব। তত্ত্বজ্ঞান, প্রাণবিলয়, মনের উপশম, এই তিনই মোক্ষ কারণ সত্য; পরন্তু মনের উপশমরূপ কারণটী সুসাধ্য বলিয়া শ্রেষ্ঠ[২৯]। মৃত্যুতে প্রাণের বিলয় হয় না, প্রাণ তখন এই কুৎসিত শরীর পরিত্যাগ করতঃ ভাবনাময় দেহ আশ্রয় করিয়া বাহ্য বায়ুর সহিত আকাশে অবস্থান করে—[৩০]। একক অবস্থান করে না, বাসনাময় মনের সহিত একলোল হইয়া অবস্থান করে। প্রত্যেক জীবের বাসনা ও তদাত্মক মন ভিন্ন, সেজন্য এক জীবের প্রাণ অন্য জীবের সহিত মিশ্রণ প্রাপ্ত হয় না[৩১]। দেহান্তরেও প্রাণ বাসনাযুক্ত অবস্থায় উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তদ্দেহস্থ হৃদয়াকাশে তিলে কুসুম গন্ধের ন্যায় প্রবিষ্ট ও সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়[৩২]। জলপূর্ণ কলস মাত্র জলমগ্নই হয়, বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ, বাসনাবেষ্টিত মনও মৃত্যুর দ্বারা বিনষ্ট হয় না, দর্শক দিগের বোধ-হয় বহির্ভূত মাত্র। ঐরূপ প্রাণও বিনষ্ট হয় না, কারণ এই যে, মনঃ ও প্রাণ সমনিয়তস্বভাব, মন প্রাণসঙ্গ ও প্রাণ মনঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে না[৩৩]। যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাবৎ মন ও প্রাণ সহস্থিতি লাভ করে, কিন্তু যখন জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান মনের বাসনা সকল দগ্ধ করে, দগ্ধবাসন মন তখন প্রাণসঙ্গ পরিত্যাগ করে[৩৪।৩৫]। জ্ঞানের প্রভাবে সকল পদার্থ নাই বলিয়া স্থির হয়। তৎক্রমে বাসনাও নষ্ট হয়, এবং বাসনার অভাবে মন প্রাণপরিত্যাগী হয়, তাহাতেই মন তখন দেহদর্শনবর্জ্জিত হয়। অতএব, বাসনাই মন, এইরূপ অবধারণ করিবে[৩৬।৩৭]। মন বাসনাত্মক, তাহারই অভাবে পরম পদ, পরম পদই তত্ত্ব ও জ্ঞান, অথবা তত্ত্বজ্ঞান, তৎপর্য্যন্তই সংসার। হে রামচন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী সংসার বিবেক জ্ঞানের দ্বারা রজ্জুসর্পভ্রম বিদূরিত হওয়ার ন্যায় বিদূরিত হইয়া যায়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর সংসারভ্রম থাকে না[৩৮।৩৯]। অদ্বৈতজ্ঞান, প্রাণনিরোধ ও মনোনাশ, এই তিনের একটীর অভাবে অন্যটী সিদ্ধ বা আয়ত্ত হয়। যেমন তালবৃন্তের প্রচলন নিবৃত্ত হইলে বায়ু সঞ্চলনও উপশান্ত হয়, সেইরূপ, প্রাণস্পন্দন উপশান্ত হইলে মনও উপশম প্রাপ্ত হয়[৪০।৪১]। মৃত্যুতে

মন ও প্রাণ বিনষ্ট হয় না, দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ব্যোমবায়ু আশ্রয় করে এবং তথায় স্থিত হইয়া বাসনানুরূপ দেহাদি অনুভব করে। যেমন বায়ু-গতির অভাবে গন্ধ বিস্তারের অভাব, সেইরূপ, মনশ্চাঞ্চ-ল্যের উপশমেও প্রাণস্পন্দের উপশম সুসম্পন্ন হয়[৩৩]। জন্তুদিগের প্রাণ ও চিত্ত নিত্য অবিনাভূত, অর্থাৎ একটা থাকিলে অন্যটা থাকি-বেই, একটী না থাকিলে অন্যটীও থাকিবে না, এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত। যেমন পুষ্প ও গন্ধ, সেইরূপ। মনের স্পন্দন প্রাণ ও প্রাণের স্পন্দন মন। এই দুই পদার্থ রথী সারথী অথবা আধারাধেয়ভাবে স্থিতি করিতেছে। সুতরাং একতরের বিনাশে অন্যতরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং উহাদের বিনাশের পর মোক্ষও করতলস্থ[৩৫।৩৭]। অদ্বৈত জ্ঞান অভ্যস্ত ও গাঢ় হইলে প্রাণচেষ্টা থাকিবে না, এইরূপ অবধারণ করতঃ একাদ্বয় আত্মতত্ত্বে মন নিমগ্ন করিবে[৩৮।৩৯]। মন উক্ত আত্মতত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইলেই উক্ত আত্মতত্ত্ব সুস্থিরত্ব প্রাপ্ত হইবে। অজ্ঞানময় সংসার আর জ্ঞানময় ব্রহ্ম, এই দুএর মধ্যে যাহা অত্যন্ত শ্রেয়, তাহাতেই তোমার স্থৈর্য্য হউক[৪০]। উক্ত একাদ্বয় তত্ত্ব দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত অভ্যাস করা বিধেয়। ভাবনার এমনিই প্রভাব যে, তাহার তীব্রতায় ভাবও অভাব এবং অভাবও ভাব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া বিশ্বাস, তাহা নাই এবং যাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস, তাহা আছে, এই-রূপ অবধৃত হয়[৪১]। যাহারা সর্ব্বদা প্রত্যাহাররত তাহাদের চিত্ত উপ-যুক্ত কালে প্রাণের সহিত লয় প্রাপ্ত ও পরমাত্মায় শেষ হয়। ইহাই চিত্তের স্বভাব যে, যাহাতে একতান হইবে, সে তৎক্ষণাৎ তন্ময় হইবে। এ সমস্তই অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানের বিভূতি, এইরূপ যুক্তিসংস্কৃত বুদ্ধির নাম জ্ঞান, তদ্দ্বারা পরমত্ব প্রাপ্ত অনিবার্য্য[৪২।৪৪]। যে প্রকা-রেই হউক, চিত্তের উপশম হইলেই এই সংসাররূপ মৃগতৃষ্ণিকা উপশান্ত হইবে[৪৫]। হে রাম! অবিদ্যা চিত্তের কল্পিত হউক, আর চিত্তই বা অবিদ্যার কল্পিত হউক, চিত্তের ক্ষয় আবশ্যক। চিত্তের পরিক্ষয়ে তদাধার আত্মার নির্ব্বিশেষ স্থিতি এবং তাহারই নাম পরম পদ, নাশ পদার্থটা পরম পদ নহে[৪৬]। মুহূর্ত্তমাত্রব্যাপী চিত্তের পরম পদ-বিশ্রান্তি নির্ব্বাণ পদবাচ্য[৪৭]। জ্ঞানের দ্বারা হউক, আর যোগের দ্বারা হউক, যাহার চিত্তবিশ্রান্তি জন্মে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়

না[৬৮]। অবিদ্যাশূন্য চিত্তের নাম সত্ব এবং তাহাই এই সংসারের দগ্ধ বীজ। দগ্ধ বীজে অঙ্কুর জন্মে না, ইহা তুমি বিদিত আছ[৬৯]। যাহার অবিদ্যা লয় প্রাপ্ত ও বাসনা বিনষ্ট, সে সত্বস্থ, সত্বস্থ ব্যক্তি পরমাকাশের সহিত তুলিত হন, তথা পরজ্যোতি সাক্ষাৎকারে উপশান্ত অর্থাৎ নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হন।

হে সর্ব্বসুন্দর রাম! বর্ণিত ত্রিবিধ উপায়ে যাহার আত্মপদ গলিত হইয়াছে অর্থাৎ সংসার ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ইহ সংসারে জীবন্মুক্ত ও সত্ব নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবন্মুক্ত নর অতঃপর আর সংসারমালিন্যে অভিভূত হন না[৭০।৭১]।

একোনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্ততিতম সর্গ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিচারে অর্থাৎ প্রাগুক্ত উপায়ে অবিদ্যা নাশ হইলে জীব অজীব হয়, চিত্তও অচিত্ত হয়, সুতরাং সে অবস্থাকে মোক্ষ এই নাম অর্পণ করা হয়[১]। মনই মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় নাশ্য-নাশকাদি ভেদ দর্শন করে, সে দর্শন বিচারে বিলীন হয়[২]। এই সংসাররূপ স্বপ্নভ্রান্তি বিষয়ে এক বেতালের প্রশ্ন স্মরণ হইল, সেই প্রশ্নগুলি বলি, শ্রবণ কর[৩]।

বিন্ধ্য পর্ব্বতের মহাবনে এক বিপুলাকৃতি বেতাল বাস করিত। এক সময়ে এই বেতাল কোন এক রাজার রাজ্যে বধ-যোগ্য প্রাণী বিনাশার্থ আগমন করিল[৪]। পূর্ব্বে এই বেতাল অন্য এক সজ্জন রাজার রাজ্যে থাকিত। সেই রাজা ইহার ভক্ষ্য আহরণ করিত। তৎকালে এ ক্ষুধাকাতর হইলেও সম্মুখাগত নিরপরাধ ব্যক্তির হিংসা করিত না[৫।৬]। ক্রমে ভক্ষ্যের অভাব হওয়ায় এই বেতাল পুনঃ স্বাসস্থান বিন্ধ্যারণ্যে আগমন করিল এবং ক্ষুধাকাতর হইয়া এক নগরে

প্রবেশ পূর্ব্বক উচিত নিয়মে মনুষ্য ভক্ষণের চেষ্টা আরম্ভ করিল[৭]। অনন্তর, নিশীথ সময়ে রাত্রিচর্য্যায় বিনির্গত সেই স্থানের রাজার সহিত বেতালের সাক্ষাৎ ঘটনা হইল। বেতাল মেঘগম্ভীর নিস্বনে রাজাকে বলিতে লাগিল[৮]।

বেতাল বলিল, ওহে রাজন্! তুমি কোথায় যাইবে? আজ্ এই ভয়ানক বেতাল তোমাকে পাইয়াছে, এ আজ্ তোমাকে ভক্ষণ করিবে[৯]।

রাজা বলিলেন, অবে নিশাচর! তুমি যদি আমাকে অন্যায়ে ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক সহস্রখণ্ড হইয়া পড়িবে[১০]।

বেতাল বলিল, আমি তোমাকে অন্যায়ে ভক্ষণ করিব না। তুমি রাজা, সকলেরই আশা পূর্ণ করিবার পাত্র। আমি কয়েকটী ন্যায়সঙ্গত প্রশ্ন করিব, তোমাকে সে সকলের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে হইবে[১১।১২]। প্রশ্নগুলি শ্রবণ কর—

১। অনেক শত ব্রহ্মাণ্ড কোন্ সূর্য্যরশ্মির ক্ষুদ্র ও কৃশ ত্রসরেণু?

২। কোন্ পবনের নিকট মহা গগণও রেণু বালুকাকণা?

৩। এক স্বপ্নের পর অন্য স্বপ্ন, এই নিয়মে শত শত স্বপ্ন হইতেছে ও যাইতেছে, পরন্তু যে সে সকলের প্রকাশক, সে আপনার স্বচ্ছতা ও সত্যতা পরিত্যাগ করে না, সে কে?[১৩।১৪]।

৪। কদলীকাণ্ডের ন্যায় সারশূন্য পদার্থের মধ্যগত সার কি?

৫। ব্রহ্মাণ্ড, তন্মধ্যগত আকাশ, চতুর্দ্দশ ভুবন, সূর্য্যমণ্ডল, সুমেরু, এ সকল কোন্ অণুর পরমাণু? অথবা কোন্ অণু ঐ সকল হইয়াও আপনার অণুত্ব পরিত্যাগ করে না[১৫।১৬]?

৬। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, এই তিন্ জগৎ কোন্ নিরবয়ব ও সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম অথচ মহাগিরিতুল্য পদার্থের মজ্জা?[১৭]

যদি তুমি আমার এই ছয় প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমার ভক্ষ্য হইবে না। নচেৎ তুমি অজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী বলিয়া আমার ভক্ষ্য হইবে। কেবল তুমি নহ, তোমার রাজ্যবাসী সমগ্র মানব আমার ভক্ষ্য হইবে। আমি বল পূর্ব্বক ফলভক্ষণের ন্যায় তোমার রাজ্য ভক্ষণ করিব[১৮]।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, বেতাল ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া সে সকলের সদুত্তর দিবার কথা বলিলে রাজা সহাস্য আস্যে বলিতে লাগিলেন[১]।

রাজা বলিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা ফল, ইহা (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) অন্তর ও পর পর দশগুণ অধিক ভূ, জল, তেজ ও বায়ু প্রভৃতি ত্বকে অর্থাৎ আবরণে আবৃত[২]। ঈদৃশ সহস্র সহস্র ফল যাহাতে পর্য্যাপ্ত তাদৃশী সুবিস্তীর্ণা শাখা এবং তাদৃশ সহস্র সহস্র শাখা যুক্ত এক দুর্লক্ষ্য মহাবৃক্ষ[৩।৪]। তাদৃশ বৃক্ষের একটী মহাবন, সহস্রাধিক তাদৃশ মহাবন যাহাতে, তাদৃশ এক বৃহৎ শৃঙ্গ, তাদৃশ সহস্রাধিক শৃঙ্গ যাহাতে আছে, এরূপ এক বৃহৎ প্রদেশ, তাদৃশ সহস্র বৃহৎ প্রদেশ যাহাতে, তাদৃশ এক বৃহৎ দ্বীপ, তাদৃশ সহস্র বৃহদ্দ্বীপ যাহাতে, এরূপ এক মহীপীঠ, এই মহীপীঠের রচনা অতীব মনোরম, ঈদৃশ মহীপীঠের সহস্রে এক পৃথিবী, ইহারও সহস্রে এক মহাভুবন[৯।১০], এরূপ সহস্র মহাভুবন যাহাতে সন্নিবিষ্ট, তাদৃশ এক অণ্ড, তাদৃশ সহস্র অণ্ড ভাসমান যাহাতে, তাদৃশ এক মহাসমুদ্র[১১।১২], এরূপ লক্ষ লক্ষ সমুদ্র, সে সকলের সমাহারে এক মহার্ণব[১৩], তাদৃশ মহার্ণবের গর্ত্তে তদনুরূপ জল, এ সমুদায়ের তুল্যরূপী এক বৃহৎ পুরুষ, তাদৃশ বৃহৎ পুরুষ সহস্রের মালা যাহার বক্ষে বিরাজিত, এরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ রহিয়াছেন[১৪।১৫]। এইরূপ সহস্র সহস্র পুরুষ যাহার লোমরাজি[১৬], এক মহাদিত্যই নিত্যোদিত, নিত্য বিরাজিত ও নিত্যপ্রতিষ্ঠ। এই সূর্য্য এক হইলেও সাধারণের দৃষ্টিতে (অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে) বহু ও অধিক কি বলিব, উক্ত অনুক্ত যে কোন কল্পনা, সমস্তই বর্ণিত সূর্য্যের দীপ্তি বা প্রভা[১৭]। ইহারই কিরণ ত্রসরেণু ব্রহ্মাণ্ড। আমি এই চিৎসূর্য্যের কথাই বলিতেছি, এই চিৎসূর্য্যই এ সমুদায়ে তাপ প্রদান করিতেছে[১৮]। ইনিই বিজ্ঞানাত্মা অর্থাৎ জীব, ইনিই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই সকল ভুবন সেই চিৎসূর্য্যের ত্রস-

রেণু[১৯]। এই পরম বিজ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশে সমস্ত ভুবনের প্রকাশ। এই জগৎ শোভাও সেই বিজ্ঞানরবির শোভা[২০]।

হে বেতাল! মায়াশবল ব্রহ্মই এই ত্রৈলোক্যরূপ গৃহ, ইহারই প্রকাশক সেই পরম সূর্য্য। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্যাধিকারী, সেই ব্যক্তির নিকট ইনি শাস্ত্রচর্চ্চাজনিত সাক্ষাৎকারবিশেষ দ্বারা আত্মারূপে প্রথমান হন, অন্য অনধিকারী জন্তুর নিকট অপ্রকটিত রহিয়াছেন। এই সকল অজ্ঞ লোক জীব ও জগৎ উভয়ের পার্থক্য ভ্রমে ভ্রান্ত, পরন্তু যাহাদের ভ্রম নাই তাহারা দেখে, এক পরমাত্মা ব্যতীত পরমার্থতঃ অন্য কিছু নাই। অতএব হে বেতাল! তুমি প্রশ্নের আড়ম্বর পরিত্যাগ কর, ও শান্ত হও[২১]।

প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

১

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

—()—

রাজা বলিলেন, কাল, আকাশ ও স্পন্দ এই তিন্ সত্তাই চিন্ময়ী। চিন্ময়ী হইলেও বিশুদ্ধা নহে অর্থাৎ মায়া সহায়। মায়া-সহায় বলিয়া শুদ্ধা নহে। যাহা কেবল চেতন তাহাই শুদ্ধসত্তা এবং তাহাই পরম পাবন। (কাল অর্থাৎ মহাকালরূপা চিৎ। আকাশ অর্থাৎ চিৎসম্বলিত মায়াকাশ। স্পন্দ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মা)[১]। ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মাতেই অর্থাৎ মূল প্রাণাত্মাতেই এই সকল চলনশীল রজঃ অর্থাৎ নানা বিকার স্ফুরিত হইতেছে। যেমন কুসুমের অঙ্গে আমোদ অর্থাৎ সৌগন্ধ স্ফুরিত হয়, সেইরূপ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

এই জগৎই মহাস্বপ্ন। ব্রহ্ম এতদ্রূপ মহাস্বপ্ন হইতে অন্য মহাস্বপ্নে অনুবৃত্ত অথচ তিনি শান্ত অর্থাৎ অসঙ্গস্বভাব জ্যোতিরূপ, ব্রহ্ম সেই সেই স্বপ্নে পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লিপ্ত[২।৩]।

তৃতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

রম্ভাস্তম্ভের উপরের স্তর অসার, তন্নিম্নের স্তরও অসার ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, এবংক্রমে যাহা সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম, তাহাই সার বলিয়া গণ্য। উক্ত রীতিতে ব্রহ্ম-বিবর্ত্ত বিশ্বের ও পরিণামশীল শরীরাবয়বে পঞ্চ কোষের মধ্যে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠান ও সর্ব্বান্তর বলিয়া সিদ্ধ। এই ব্রহ্মকে সৎ, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লক্ষ্যরূপে বুঝান হয়, বাচ্যরূপে নহে। বিষয়োপলক্ষিত প্রত্যেক সত্তাই অনুভবমূলক, সুতরাং এক মূলসত্তার অধীন। যেমন পটসত্তা বস্ত্রসত্তার ও তন্তুসত্তা কার্পাসসত্তার, তাহা আবার ফলসত্তার, তাহা আবার বৃক্ষসত্তার, তাহা আবার বীজসত্তার, তাহা আবার মৃত্তিকাদি সত্তার অধীন, এবংক্রমে সমুদায় সত্তা যে এক মহাসত্তায় গিয়া সমাপ্ত হয়, সেই মহাসত্তাই শাস্ত্রগোচরে চিৎ ও ব্রহ্ম বলিয়া কথিত। অতএব চিৎ-ই সর্ব্ব সার। আর সব রম্ভাত্বকের ন্যায় অসার[৪।৬]। এই ব্রহ্মপদার্থ দুর্লক্ষ্য ও দুর্লভ বলিয়া অণু, এবং অসীম বলিয়া সুমেরু প্রভৃতির আধার, সুতরাং তদপেক্ষাও বৃহৎ। সুমেরু কেন—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই উক্ত ব্রহ্মপরমাণুর ব্যাপ্য[৭।৮]।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

পরমাণু যেমন দুর্লক্ষ্য, সেইরূপ দুর্লক্ষ্য বলিয়া উক্ত পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা অণু পরমাণু সূক্ষ্ম প্রভৃতি শব্দের বোধ্য হন। এবং সমস্ত বিশ্বের পূরক বলিয়া মহাগিরি নামে অভিহিত হন। ইনি সকল অবয়বের অবয়বী অথচ স্বয়ং নিরবয়ব[৯]। স্বর্গাদি জগত্রিতয় এই জ্ঞপ্তিরূপ পরমাত্মার মজ্জা।

অহে বেতাল! এই ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই উক্ত জ্ঞপ্তি পুরুষের অন্তরে সমাহিত। মজ্জা মধ্যে থাকাই প্রসিদ্ধ, সুতরাং জগত্রয় যখন বর্ণিত জ্ঞপ্তি পুরুষের মধ্যে বা অন্তরে অবস্থিত, তখন অবশ্যই প্রসিদ্ধ ত্রিজগৎ মজ্জা আখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অহে বালক! অর্থাৎ অবোধ বেতাল! এ সমস্তই যে বিজ্ঞানের লীলা-কৌশল, এবং যে বিজ্ঞানের অধীনে এ সকলের প্রকাশ, সে বিজ্ঞান তোমার অলঙ্ঘনীয়, ইহা জানিয়া এবং আমার এই উক্তি শুনিয়া আপনার স্বরূপ অনুভব ও দর্প পরিহার পূর্ব্বক শান্ত হও[১০।১১]।

ষষ্ঠ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, বেতাল রাজার প্রমুখাৎ ঐ সকল তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি লাভ করিল, এবং ক্ষুধা ভুলিয়া গিয়া শ্রুত আত্মতত্ত্বে সমাধিমান্ হইল[১।২]। হে রামচন্দ্র! বেতালের প্রশ্ন ও তদুত্তরে রাজার উক্তি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বর্ণিত ক্রমে সেই সুসূক্ষ্ম চিৎ-তত্ত্বে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি করিতেছে[৩]। সেই চিৎ-পরমাণুর একাংশে এই বিশ্ব বিবর্ত্ত নিয়মে অর্থাৎ মিথ্যারূপে স্থিতি করিতেছে, বিচারে ইহার স্থিতি থাকে না। বালকেরা ভ্রান্তির বশে অতি ভীষণ বেতাল-শরীর কল্পনা করে, ভ্রান্তির অপগমে তাহা থাকে না, কোথায় লীন হইয়া যায়। যাহাতে লীন হয়, তাহাকেই তুমি তৎপদ বলিয়া বিদিত হও[৪]। সমুদায় বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ কর, নিশ্চল অন্তরাত্মায় অবস্থান কর, আর অব্যাসক্তভাবে যথোপস্থিত কার্য্য করতঃ শান্তি লাভ কর[৫]। মনের দ্বারাই মনকে আকাশের ন্যায় বিশদ কর, শান্ত সমদর্শী স্থিরবুদ্ধি, মোহের অতীত ও প্রাপ্তানুবর্ত্তী হও। তাহা হইলে তুমি ভগীরথের ন্যায় দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসিদ্ধ করিতে পারিবে[৬।৭]।

তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে শান্তচিত্ত, পরিতৃপ্ত ও সমসুখে স্থিত হও, তাহা হইলে তুমি ভগীরথের ন্যায় দুর্লভ লাভে সমর্থ হইবে। যে কার্য্য সগর, অংশুমান্ ও দিলীপাদি রাজারা করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ উঁহারা গঙ্গাবতারণরূপ কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলেন, পরন্তু শান্তি তৃপ্তি সমদর্শিত্বাদি গুণ বিশিষ্ট ভগীরথ সেই দুঃসাধ্য গঙ্গার তারণরূপ কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ করিয়াছিলেন[৮]।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

—()*()—

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! ভগীরথের গঙ্গাবতারণ-কথা অতিশয় চিত্ত-চমৎকারকারক। যেরূপে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরাকালে ভগীরথ নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। এই রাজা সসাগরা ধরার অধিপতি। প্রার্থীরা প্রার্থনা মাত্রেই এই রাজার নিকট প্রার্থ্যমান পদার্থ পাইতেন। ইহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় হ্লাদজনক[২।৩]। ইনি দীন দুঃখী অনাথ সাধু সচ্চরিত্র দিগের জন্য অবিরত ধনব্যয় করিতেন এবং স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্য তৃণ পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেন[৪]। যেমন হীরক-বেধের যন্ত্র অতি দুর্ভেদ্য হীরককেও ছিদ্রিত করে, তেমনি ভগীরথও যৎপরোনাস্তি বলবান্ শত্রুকে ও তাহাদের চেষ্টাকে ছিদ্রিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বশ্য করিয়াছিলেন[৫]। ইহার দৈহিক কান্তি নির্ধূম পাবকের ন্যায় ছিল এবং শ্রান্ত হইলেও ইনি দীনের ন্যায় ম্লান হইতেন না। চন্দ্র যেমন নৈশ অন্ধকার হরণ করেন, তেমনি ইনিও প্রজাদিগের মানস অন্ধকার বিনষ্ট করিতেন[৬]। ইনি প্রতাপাগ্নি নিক্ষেপ করতঃ শত্রুদিগের সম্বন্ধে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় প্রজ্বলিত থাকিতেন[৭]। ইনি তত্ত্বজ্ঞদিগের হ্লাদজনক ছিলেন এবং চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় তাঁহাদের চিত্তকে মৃদু ও শীতল জ্যোৎস্নার দ্রব তুল্য করিতেন[৮]। যে প্রবাহ এই জগতের যজ্ঞোপবীত স্বরূপ স্বর্গ ও পাতালবাহী, সেই গঙ্গাপ্রবাহ ইহারই দ্বারা তৃতীয় গুণরূপে পরিণত হইয়াছে। (যজ্ঞোপবীতে তিন্‌টী গ্রন্থি থাকে। গঙ্গাও স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন্ প্রবাহে প্রবাহিত হওয়ায় যজ্ঞোপবীত তুল্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে মর্ত্ত্যপ্রবাহরূপ গুণটী ভগীরথ দ্বারা কৃত)[৯]। অগস্ত্য মুনি সমুদ্রকে শুষ্ক করিয়াছিলেন, ভগীরথ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা তাহাকে পুনঃ পূর্ণ করিয়াছিলেন[১০]। এই ভগীরথই পাতালস্থ আপন পূর্ব্বপুরুষদিগকে গঙ্গারূপ সোপানের দ্বারা স্বর্গগামী করিয়াছিলেন[১১]। যিনি

গঙ্গা আনয়নের জন্ত ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ভূমিপতি ভগীরথের যৌবন কালে এই লোকযাত্রাবিষয়ক বিচার-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। যেমন দৈবাৎ কখন মরুভূমিতেও বল্লী জন্মে, তেমনি, তারুণ্যেও কাহার কাহার বৈরাগ্যজনক বিচার জন্মিয়া থাকে [১২,১৩]। এই মহীপতি একদা ব্যাকুল হইয়া জগদ্‌যাত্রার বিষয় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৪]।

পর্য্যায়ক্রমে পুনঃ পুনঃ দিন ও রাত্রি যাইতেছে ও আসিতেছে, এবং তৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ দান ও আদান এতদ্রূপ করা হইতেছে। কাল, যে ভোগ ভুক্ত হইয়াছে, আজ্ আবার সেই ভোগই ভোগ করি-তেছি। কেবল পুনঃ পুনঃ পর্য্যুষিত ও ভুক্তবিরস ভোগে কাল কর্ত্তন করা হইতেছে মাত্র। এমন কোনও কার্য্য করা হইতেছে না, যাহার ফল অপূর্ব্ব বা অপ্রাপ্ত। যে কার্য্যে সেরূপ পর্য্যাপ্ত সুফল পাওয়া যায়, সেই কার্য্যই কার্য্য, অবশিষ্ট কার্য্য রোগ বিশেষ[১৬,১৭]। অবোধ লোকেরা বার বার পর্য্যুষিত কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করে না। রাজা ভগীরথ সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদা ইনি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া ত্রিতল নামধেয় নিজ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১৮,১৯]।

ভগীরথ বলিলেন, প্রভো! এই অন্তঃসারশূন্য সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিয়া আমি অতিশয় খিন্ন হইয়াছি। ভগবন্! যাহাতে এই জরামরণ মোহাদি দুঃখের অন্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন[২০,২১]।

ত্রিতল বলিলেন, শ্রবণ মননাদি উপায় অভ্যস্ত হইলে অখণ্ড ব্রহ্মা-কারা মনোবৃত্তি উদিত হয়, তাহারই প্রভাবে সর্ব্বদুঃখের অবসান হইয়া থাকে। তখন আর হৃদ্‌গ্রন্থি থাকে না, সংসার থাকে না ও কর্ম্মও তখন সমাপ্ত হইয়া যায়। আত্মাই প্রকৃত জ্ঞেয়। তাহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্র, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যপদার্থ। তাহার উদয়ও নাই অস্তও নাই[২২,২৩]।

ভগীরথ বলিলেন, হে মুনীশ্বর! আমি বুঝিয়াছি, তিনি চিন্মাত্র, নির্গুণ, শান্ত, নির্ম্মল, অচ্যুত ও দেহাদি পদার্থের অতীত[২৪]। কিন্তু ঐ তত্ত্বে আমার স্থিরতর প্রতিপত্তি জন্মিতেছে না। যাহাতে আমি ঐ বিষয়ে অবিক্ষিপ্ত হইতে পারি তাহা আমাকে উপদেশ করুন[২৫]।

ত্রিতল বলিলেন, অমানিত্ব ও অদম্ভিত্ব প্রভৃতি সাধনসাধ্য জ্ঞানে

নিয়ত অবস্থান করিতে পারিলে তৎপরিপাক দশায় জীব অজীব ও সর্ব্বময় হইয়া যায়[২৭]। গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতিতে অনাসক্তি, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে সমচিত্ততা, নিরন্তর আত্মদর্শনে রতি, বিবিক্ত স্থানে অবস্থিতি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানোপযোগী জ্ঞান, এই সকল জ্ঞান পদবাচ্য [২৮।৩০]। হে রাজন্! অহম্ভাবই শত্রু। তাদৃশ অহম্ভাব বিনষ্ট হইলেই রাগদ্বেষাদির নাশক ও সংসার ব্যাধির মহৌষধ স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়[৩১]।

ভগীরথ বলিলেন, হে মহাভাগ! দীর্ঘকাল এই শরীররূপ পর্ব্বতে অহম্ভাবরূপ বৃক্ষ রূঢ় রহিয়াছে। এ অহম্ভাব যাহাতে নষ্ট হয়, তাহা আমাকে বলুন[৩২]।

ত্রিতল বলিলেন, ভোগভাবনা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রযত্নের অবলম্বন করিলে অহম্ভাবের বিলয় হইতে পারে[৩৩]। যাবৎ না মনে অপমান লজ্জা ভয়াদি পরিত্যাগ দ্বারা অকিঞ্চন হওয়া যায়, তাবৎ যন্ত্রণা-পঞ্জরস্থ অহম্ভাব নৃত্য করিবে। অতএব, যদি তুমি জ্ঞান-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পার, নিশ্চল নিষ্কম্প অর্থাৎ স্থৈর্য্যে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অহম্ভাব নষ্ট ও পরম পদ লাভ হইবে[৩৪।৩৫]।

কোনও প্রকার বিশেষণ থাকিবে না, ভয় থাকিবে না, এষণা অর্থাৎ কোনও প্রকার বাঞ্ছা থাকিবে না, শ্রী সম্পদ সমস্তই শত্রুসাৎ হইবে, এরূপ অবস্থা যদি প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তুমি অহম্ভাবের শান্তিতে অকিঞ্চন হইবে। কেবল মাত্র শরীরধারণোপযোগী এক ভিক্ষা তোমার বিদ্যমান থাকিবে, এরূপ অকিঞ্চন অবস্থায় যদি স্থিত হইতে পার, তাহা হইলে মহান্ হইতেও মহান্ হইবে[৩৬]।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভগীরথ গুরুসকাশে ঐ সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানে রত হইলেন[১]। পরে সর্ব্বত্যাগী হওয়ার উদ্দেশে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের আয়োজন করিলেন[২]। মহীপতি ভগীরথ এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন বন্ধু বান্ধব ও প্রার্থীদিগকে গো ভূমি হিরণ্য অশ্ব প্রভৃতি দান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভগীরথ তিন্ দিবসের মধ্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইলেন[৩।৪]। পরে সীমান্তবাসী কোন পূর্ব্বশত্রু রাজাকে রাজ্য প্রদান করিয়া একবস্ত্র দেহে বহির্গত হইলেন। যে স্থানে গেলে কেহ জানিতে পারিবে না, কাহারও প্রমুখাৎ কোন কিছু শুনিতে হইবে না, যে স্থানের লোক ভগীরথ এই নাম পর্য্যন্ত বিদিত নহে, তাদৃশ অরণ্যে ও গ্রামে গিয়া ধীব হইয়া বাস করিতে লাগিলেন[৬।৭]। এইরূপ বাস অধিক কাল করিতে হয় নাই, অল্পকাল পরেই সমুদায় এষণা পরিত্যাগ হইল, তিনি আত্মবিশ্রান্তি লাভ করিলেন[৮]। পরে যাদৃচ্ছিক বাসে প্রবৃত্ত হইয়া পৃথিবীস্থ নানা স্থান পর্য্যটন করিলেন। এই যাদৃচ্ছিক ভ্রমণ কালে তিনি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলেন, যে স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব শত্রুরা প্রভুত্ব করিতে ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা তাঁহার পূর্ব্বরাজ্য ছিল। এই স্থানে নগরস্থ নানা গৃহাদি দেখিলেন, যে সমুদায় তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট। যে সকল পুরবাসী ও মন্ত্রি তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট, এক্ষণে তাহাদিগকেও দেখিলেন। অনন্তর ভিক্ষাকাল আগতে সেই সকল পূর্ব্বদৃষ্ট পুরবাসীদিগের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন[৯।১০]। পুরবাসীরা জানিল, তাঁহাদের পূর্ব্বরাজা এক্ষণে ভিক্ষা-প্রার্থী। সকলেই সাদরে ও দুঃখকাতরে তাঁহার সপর্য্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করিল, পরন্তু ভগীরথ প্রদত্ত ভোজন ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিলেন না। ধন বস্ত্র রাজ্যাদি তুচ্ছাৎতুচ্ছতর জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন এবং কতিপয় দিবস তথায় বাস করিয়া পুনঃ স্থানান্তরে গমন

করিলেন। ভগীরথের গমনে পুরবাসীরা সকলেই হাহারবে রোদন করিল[১১।১৩]। এই আত্মারাম ভগীরথও পর্য্যটন করিতে করিতে একদা আপনার সেই ত্রিতল নামধেয় গুরুর সহিত মিলিত হইলেন এবং গুরু শিষ্য উভয়ে এক সঙ্গে কিছুকাল নানা গ্রামে ও নানা অরণ্যে বাস করিলেন। ইহারা উভয়েই দেহ ধারণকে বিনোদ মাত্র মনে করিতেন। ভাবিতেন, দেহ থাকে থাকুক, যায় যাউক, ইহা থাকা ও যাওয়া দু-ই সমান। এইরূপ কৃতনিশ্চয় গুরু ও শিষ্য এক বন হইতে অন্য বনে, আবার সে বন হইতে অন্য বনে কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন[১৪।১৮]। সিদ্ধগণ ইঁহাদের চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়া অণিমাদি আট প্রকার সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেও ইঁহারা সে সকলকে জর্জ্জরিত তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১৯]। ইঁহারা ভাবিতেন, স্বকৃত কর্ম্মের ফলে দেহ হইয়াছে, কর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা থাকিবেক, কর্ম্মের শেষ হইলে ইহা আপনিই বিনষ্ট হইবে[২০]।

এই দুই মননশীল মহাপুরুষ আপন আপন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বশে সমুপস্থিত সুখ ও দুঃখ উভয়কেই অভিনন্দন করিতেন। অর্থাৎ সুখে উৎসাহিত ও দুঃখে উদ্বিগ্ন হইতেন না। সম ব্রহ্মে অবস্থিত পরমা-শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[২১]।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, একদা—এক রাজ্যের রাজা অনপত্য অবস্থায় মৃত হইলে রাজামাত্যগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখ ও বিপদ বোধ করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা রাজাসনে বসাইবার জন্য রাজ্যপালনক্ষম ও গুণভূষিত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল[১।২]। ক্রমে তাহারা জানিল, রাজ্য পরিত্যাগী ভগীরথ এইরূপ ভিক্ষাবৃত্ত্যবলম্বী ও মুনি হইয়াছেন। জানিতে

পারিয়া সেই রাজ্যের রাজামাত্যেরা এই ভগীরথকে তদ্রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ভগীরথ যদৃচ্ছাক্রমে গজারোহণ করিলে প্রজাগণের মধ্য হইতে "জয় মহারাজা ভগীরথের জয়" ইত্যাকারের মহান্ জয় শব্দ সমুত্থিত হইল। ভগীরথ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া এইরূপে রাজ-সিংহাসনারূঢ় হইলে তাঁহার পূর্ব্ব মন্ত্রিরা ও পুরবাসীরা তথায় আগমন করিল, এবং নিম্ন লিখিত প্রকার সানুনয় বাক্য সকল বলিতে লাগিল৬।৭।

অমাত্যেরা বলিল, মহারাজ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ কালে সীমান্ত-বাসী যে শত্রু রাজাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, এই অনপত্য ও মৃত রাজা সেই ব্যক্তি। সুতরাং ইহা আপনারই প্রাক্তন রাজ্য। অতএব, আপনি ইহা পালন এবং আমাদের প্রতি দয়া বিতরণ করুন। আমরা বিনা আহ্বানে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না৭।৮।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা ভগীরথ প্রকৃতিবর্গের প্রার্থনায় সম্মতি দান করিলেন এবং পুনর্ব্বার সপ্তসাগরচিহ্নিত ভূমণ্ডলের প্রধান রাজা হই-লেন। ইনি রাগ দ্বেষ মাৎসর্য্যাদির অতীত, মৌনী ও শান্তচিত্ত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে রহিলেন৯।১০। এই সময়ে তিনি লোক পরম্পরায় শ্রুত হইলেন যে, এক মাত্র গঙ্গাজলই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাতালতলে কপিল-ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, গঙ্গাজলসেকে তাঁহাদের উদ্ধার হইতে পারে বটে, পরন্তু তাহা এক প্রকার অসম্ভবের ও অনায়াসের বিষয়। কেননা তখন গঙ্গা পৃথিবীতে বহমানা নহেন। ভগীরথের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় আরও অনেক লোকের পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গাজল অপ্রাপ্তে দুর্গতি ভোগের অধিকারে রহিয়াছিল১১।১২। ভগীরথ যেদিন গঙ্গাজলের অভিহিত মহিমা শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গাবতারণের উদ্দেশে নিয়ম ধারণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যভার স্থাপন করিয়া পুনঃ অরণ্যবাসী হইলেন এবং উৎকটতর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। বর্ষসহস্র যাবৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পৃথিবীর সহিত গঙ্গার সংযোগ সাধন করিলেন১৩।১৪। সেই দিন হইতে জগৎপতি শঙ্করের অঙ্গসঙ্গিনী অমলতরঙ্গভঙ্গিনী নভস্তল হইতে পৃথিবীতে আপতিত হইয়া

ত্রিধারারূপে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্ফুরত্তরঙ্গভঙ্গিনী ও ফেনপুঞ্জহাসিনী গঙ্গা যেন ভগীরথের যশঃ প্রচারের জন্যই পৃথিবীতে ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন[১৬,১৭]।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, তুমি ভগীরথের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া, ভগীরথের ন্যায় জ্ঞানী হইয়া, সমব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল বিভব ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এ সকলের আসক্তি মন হইতে উন্মার্জ্জিত করিয়া শিখিধ্বজ রাজার ন্যায় আত্মারাম হইয়া স্থিতি কর[১,২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, শিখিধ্বজ কে? কিরূপে তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন? আমাকে বলুন[৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পূর্ব্বকল্পে তোমাদের ন্যায় যে এক দম্পতী ছিলেন, অগ্রিম দ্বাপরে ঠিক্ সেই রূপের এক দম্পতী হইবে[৪]।

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভিন্ন অথচ আপনি বলিলেন, অতীতের সদৃশ ভবিষ্যৎ, এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি, তাহাও আমাকে বলুন?[৫]

বশিষ্ঠ বলিলেন, জগন্নির্ম্মাতা ব্রহ্মাদি সত্যসকল, তাঁহাদের সঙ্কল্প অন্যথা হইবার নহে। এবং সেই সঙ্কল্পের নামই নিয়তি অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়ম। এই সৃষ্টিনিয়মই কারণ, অন্য কারণ নাই। সৃষ্টি নিয়তির ক্রম এই যে, কোন কোন বস্তু বহু ও বহুবার হয়, আবার কোন কোন বস্তু পূর্ব্বে হয় নাই, পরে হয়। আবার কোন সৃষ্টি এক বারই হয়, বহু ও বহুবার হয় না। একই আম্রবৃক্ষে পুনঃ পুনঃ বহু আম্রফল জন্মে ও সে সকল পূর্ব্বেরই সদৃশ হইয়া জন্মে। স্কন্ধবট এক বারই হয়, ছিন্ন

হইলে আর তাহাতে হয় না। মনুষ্যসংসারেও এইরূপ নিয়তি বা সৃষ্টি-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অতএব, শিখিধ্বজের ন্যায় ভবিষ্যতেও শিখিধ্বজ হইবে, সেই শিখিধ্বজও বর্ণ্যমান কথার নায়ক হইতেও পারেন৮।৯। অতএব, যে শিখিধ্বজ পূর্ব্ব দ্বাপরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ এক শিখিধ্বজ ভবিষ্যৎ দ্বাপরেও হইবেন। তদ্দৃষ্টান্ত বলি, শ্রবণ কর১০।

এই জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উজ্জয়িনী নগরে শিখিধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি কুরুবংশীয়। এই শিখিধ্বজ ধৈর্য্য ঔদার্য্য শম দম ক্ষমা, নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত১১।১২। ইনি শূর, সদাচারী, সত্যবাদী ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। ইনি নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ও ধনুর্দ্ধরদিগের জেতা ছিলেন১৩। নানা প্রকার পূর্ত্ত কার্য্যের কর্ত্তা, পৃথিবীর ভর্ত্তা, পণ্ডিত, সুন্দর, শান্তস্বভাব, প্রতাপশালী ও ধার্ম্মিক ছিলেন, দাতা, ভোক্তা, সৎসঙ্গকারী ছিলেন এবং বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অথচ নিরভিমানী ছিলেন১৪।১৬। বালক কালে ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহারই পরে ইনি ষোড়শ বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয় কার্য্যে লিপ্ত হন এবং ক্রমে সমুদায় শত্রুকে বশীভূত করেন১৭। সম্রাট হইয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। একদা বসন্ত সমাগমে শৈত্যমান্দ্য মলয়ানিল প্রবাহিত ও নানা প্রকার কুসুম বিকাশ প্রভৃতি হইতে দেখিয়া এই রাজাধিরাজের মনে কান্তা বিলাসের ইচ্ছা আবির্ভূত হইল। কুসুমসৌরভ মত্ত হওয়ায় তদীয় মন কান্তা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থকে তৃপ্তিজনক বলিয়া বোধ করিল না১৮।২০। কবে আমি পদ্মকুট্মলস্তনী প্রণয়িনী ক্রোড়ে ধারণ করিব? কবে আমার অঙ্কে পুষ্পিত লতাভিলাষিনী ভুবনমোহিনীর অবস্থান হইবে২০।২১? কবেই বা তাদৃশী ইন্দু সুন্দরী আমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলিতা হইবে? রাজা এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তার বশ্য হইয়া বন, উপবন, উদ্যান প্রভৃতি মনোরম স্থানে বিহরণ করিতে লাগিলেন এবং শৃঙ্গাররসোদ্দীপক কথায় মনোমগ্ন করিতে লাগিলেন২৮।৩১। তাহার হৃদয়ে সুন্দরী কুমারীই শ্রেষ্ঠ বস্তু, এইরূপ সঙ্কল্প উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর মন্ত্রিবর্গ তাঁহার বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টে আন্তরিক ভাব বুঝিলেন, পরে তাঁহার বিবাহের জন্য যত্নতৎপর হইলেন৩২।৩৩। সুরাষ্ট্র দেশের রাজার একটী যৌবনান্বিতা পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, রাজার বিবাহের জন্য তাহারা সেই কন্যা প্রার্থনা

করিলেন, অনন্তর সেই কন্যার সহিত রাজার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। রাজা শিখিধ্বজ এই চূড়ালা নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, কন্যা চূড়ালাও স্বানুরূপ ভর্ত্তা প্রাপ্তে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্টা হইলেন। সূর্য্যদেব যেমন পদ্মিনীকে বিকসিত করে, রাজা শিখিধ্বজও সেইরূপ নবপত্নীর মুখপদ্ম বিকসিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রণয় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল৩৪।৩৭। রাজা শিখিধ্বজ মন্ত্রীর প্রতি সমুদায় রাজ্যভার অর্পণ করতঃ প্রিয়তমা পত্নীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কখন উদ্যানে, কখন বিহারে, কখন লতাগৃহে, কখন পুষ্পপূর্ণ প্রদেশে, কখন চন্দন বনে, কখন পুরমধ্যে, কখন সরোবরে, কখন বা বনান্তে ও দিগন্তে বাস করিতে লাগিলেন ৩৮।৪১। জল, জঙ্গল ও বৃক্ষ, প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের আহ্লাদজনক হইয়াছিল। সর্ব্বদা অবিযুক্ত থাকায় ও পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হওয়ায় তাঁহারা উভয়েই শিল্পগীতাদিবিদ্যায় পণ্ডিত ও পণ্ডিতা হইলেন। পরস্পরের হৃদয় পরস্পরে অর্পিত হইয়াছিল, এবং রাজা শিখিধ্বজ অনুকূলা পত্নীর নিকট গান বাদ্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন৪২।৪৭। যেন শরীরমাত্র দুই, পরন্তু হৃদয় এক। যেমন অমাবস্যায় চন্দ্রসূর্য্যের একত্রাবস্থান এবং শিব ও শিবার একত্রাবস্থান, সেইরূপ, শিখিধ্বজ ও চূড়ালার একত্রাবস্থান দৃষ্ট হইয়াছিল। উভয়েই সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, যেন কমলা ও কমলাপতি এক কার্য্য সাধনার্থ পৃথিবীতে আসিয়াছেন, যেন তাঁহারা উভয়ে সমবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন৪৮।৫০। যেন একযোগে দুই শশধর উদিত হইয়াছে এবং যেন দুই রাজহংস ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের কুহরে বিরাজ করিতেছে৫১।৫২।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, সেই দম্পতি যৌবনলীলায় বহুবর্ষ অতিবাহন করিলে, ক্রমে তাঁহাদের তারুণ্য বিগলিত হইল১। দেহ তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গুর-স্বভাব, ইহার পতন পক্ক ফলের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং মরণ অনিবার্য্য২।৩। যেমন অম্ভোজে হিমপাত, তেমনি, যৌবত দেহে জরার আবির্ভাব। জল যেমন অঞ্জলির মধ্য দিয়া বিগলিত হয়, সেইরূপ, আয়ুও ক্রমে গলিত হয়। যৌবন গিরিনদীর ন্যায় বেগে চলিয়া যায়, কেবল বৃদ্ধি পায়—ভোগতৃষ্ণা৪।৫। ইন্দ্রজাল যেমন অসত্য, সেইরূপ, জীর্ণ দেহের অবস্থান অসত্য। সুখ দূরে পলায়ন করে, চিত্ত দুঃখে নিমগ্ন হয়। বর্ষার জলে বুদ্বুদ যেরূপ অস্থায়ী, এই শরীরও সেইরূপ অস্থায়ী৬।৭। কদলী বৃক্ষের অভ্যন্তর যেরূপ অসার, দেহব্যবহারের অভ্যন্তরও সেইরূপ অসার। যৌবন অধিক কাল থাকে না, শীঘ্র চলিয়া যায়৮। অরতি অর্থাৎ দুর্ম্মনস্তা আসিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে। এইরূপ বলিলে যথেষ্ট বলা হয় যে, এই সংসারে স্থির ও বাস্তব সুশোভন কিছুই নাই। এমন কোন অবস্থা দেখা যায় না, যাহা পাইয়া জীব পুনর্দ্দুঃখের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। উক্ত দম্পতি এইরূপ বিবেচনা করিয়া সংসার ব্যাধির মহৌষধ যে বিচার, তৎপরায়ণ হইলেন৯।১০। দীর্ঘকাল অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলেন, এবং বুঝিলেন, একমাত্র আত্মজ্ঞানই সংসার ব্যাধির ঔষধ। ঐরূপ বোধসম্পন্ন হইয়া সেই দম্পতি সদা আত্মনিষ্ঠ হইলেন। তাঁহাদের মন, প্রাণ, চিত্ত, সমস্তই আত্মনিষ্ঠ হইল। হে রামচন্দ্র! তাঁহারা ঐরূপ আত্মপূজায় ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বোধ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত হইতে লাগিলেন। অনন্তর চূড়ালা আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের প্রমুখাৎ সর্ব্বদা মোক্ষোপযোগী বাক্য সমুদায় শ্রবণে অভ্যস্তা হইলেন এবং মনে মনে দিবা রাত্র আত্মবিচার করিতে লাগিলেন১১।১৫। কার্য্যব্যাপৃতা ও কার্য্যপরিত্যক্তা, কোনও অবস্থায় তিনি

আত্মবিচার বর্জ্জিতা থাকিলেন না। "সর্ব্বদাই আমি কি? কোথা হইতে ও কিরূপে এই ব্যামোহ-অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম? মোহ বস্তুতঃ কাহার? এ মোহ কোথা হইতে ও কিরূপে হইল? মোহ ধর্ম্মটী কাহার? আত্মা অসঙ্গস্বভাব, সুতরাং আত্মার নহে। আত্মায় যে মোহের উপলব্ধি, তাহা জড় দেহের সংসর্গে আরোপ মাত্র, বাস্তব নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দেহ ব্যতিরিক্ত নহে[১৭।১৮]। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও দেহের অংশ, সেজন্য তাহাও দেহের ন্যায় জড়। সঙ্কল্পশক্তিমৎ মনও পরাধীন বলিয়া জড়, তথা নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিও পরপ্রকাশ্য বলিয়া জড়া [১৯।২১]। অহঙ্কারও তাদৃশী বুদ্ধিতে বাহিত হয়, সেজন্য অহঙ্কার শবের ন্যায় অচেতন[২২]। জীবই তাহার জনক ও তাহা ভ্রমাত্মক। জীব চেতনাকাশ, প্রাণরূপ উপাধিতে প্রকাশমান[২৩]। এই জীব সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বচৈতন্যে পরিপূর্ণ, এবং বিষয় প্রকাশের সাক্ষী স্থানীয়[২৪]। এই জীবই উক্ত প্রকারে সেই পুরাতন—যৎপরোনাস্তি পুরাতন আত্মা ও চিদ্রূপী[২৫]। সুগন্ধ ও বায়ু যেমন এক বপু, সেইরূপ, জীবও মিথ্যা জড়ের ও চিতের অধ্যাসে এক বপু[২৬]। যেমন জলমধ্যগত অগ্নি আপনার রূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি, একাদ্বয় মহাচিৎ সঙ্কল্পিত চেত্যের মধ্যপাতী হইয়া আপনার প্রকৃত রূপ পরিত্যাগ করিয়া এই জীবরূপে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে[২৭।২৮]। জড় মাত্রেই অসৎ, যে হেতু সে চৈতন্যের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়।

চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। এখন তাঁহার স্থির হইল যে, এত কাল পরে আমি আমার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বুঝিয়াছি[২৯।৩০]। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এ সমস্তই চিতের (আত্মচৈতন্যের) বিলাস, পৃথক্ পদার্থ নহে[৩১]। একমাত্র মহাচিৎই আছে, তাহা মহাসত্তা নামের নামী[৩২]। সেই মহাসত্তায় কলঙ্ক নাই, বৈষম্য নাই, সুতরাং তাহা শুদ্ধা ও অহংবৃত্তির উপরে বিকাশমানা। তাহা, বিশুদ্ধ সম্বিৎ, কেবল সৎ, অচ্যুত ও পরম শিব[৩৩]। শাস্ত্রকারেরা এই মহাসত্তাকেই স্বপ্রকাশ, নির্ম্মল, নিত্যোদিত, পরব্রহ্ম ও পরমাত্মাদি নামে গান করেন[৩৪]। চেত্য, চেতন, চিত্ত, এ সকল উক্ত মহাসত্তার অতিরিক্ত নহে। ইহাই মূল চিৎ এবং ইহারই দ্বারা আর সব চেতিত হইতেছে। (জীব পক্ষে চেতিত, অজীব পক্ষে প্রকাশিত)। এই

মহাসত্তা অচেত্য অর্থাৎ চিত্তের উপরে। পরন্তু চিত্ত ও চেত্য সমুদায় উক্ত মহাসত্তারই রূপ বিশেষ। এই মহাসত্তাই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও সে সকলের বিষয় রূপে প্রকাশ পাইতেছে। জল যেমন তরঙ্গ, কণা ও কল্লোলাদিরূপে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ। এই যে জগৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে, এ ভাসমানতা উক্ত মহাচিতের। যে হেতু জগৎসত্তা (জগতের অস্তিত্ব) এতদীয় আশ্রয় চিৎসত্তার অধীন বলিয়া অভিন্ন, সেই হেতু ইহা মায়ামাত্র[৩৫।৩৯]। যেমন নানা নাম-রূপাদি বিশিষ্ট অলঙ্কার সুবর্ণের অনতিরিক্ত, সে সকল সুবর্ণই, অন্য কিছু নহে, এবং সে সকল নাম রূপের লয় হইলে সুবর্ণ মাত্র অব-শেষিত হয়, সেইরূপ, জগৎ প্রলয়ে সেই মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাই অবশেষিত হন। স্বপ্নে চিত্তই দ্রবরূপী অর্থাৎ জলরূপী হইয়া সমুদ্রাদির আকারে প্রথা প্রাপ্ত হয়, তদ্দৃষ্টান্তে স্পষ্ট বুঝা যায়, মহাচিৎসত্তাই জগৎরূপে প্রথা প্রাপ্ত হন[৪০।৪১]। যেমন চিদ্রূপ আত্মাই স্বপ্নকালে জলরূপী হন, সেইরূপ অহঙ্কারাতীত চিৎ পদার্থই "অহং আমি" এত-দাকারে স্ফুরিত হইতেছে[৪২]। সুতরাং জন্ম, মরণ, সদ্গতি, অসদ্গতি, নাশ, এ সকল প্রথা জগতে সত্যতঃ অসম্ভব[৪৩]। ইনি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, ও অদাহ্য। অহো! সেই আমি এতকাল পরে আজ চির-কালের নিমিত্ত শান্ত ও নির্ব্বাপিত হইলাম[৪৪]। মন্থন শেষে নির্ম্মন্দর সমুদ্র যদ্রূপ অচঞ্চল হইয়াছিল, ভ্রম মুক্ত হওয়ায় আজ আমি তদপেক্ষা অধিক নির্ব্বিক্ষেপ হইয়াছি[৪৫]। এই আত্মাকাশ অবাধ, অগাধ, অমল ও অনন্ত। সুরাসুরযুক্ত এই বিশ্বও উক্ত অকৃত্রিম আত্মার ভ্রমময় রূপ। যেমন প্রতিমূর্ত্তি পদার্থে স্ত্রী পুরুষ ভাব কল্পিত, সত্যতঃ সে সমস্তই মৃত্তিকা, তেমনি, এই বিশ্বও কল্পিত, সত্যতঃ এ সকল পর-মাত্মা[৪৬।৪৭]। দ্রষ্টৃসত্তা ও দৃশ্যসত্তা চিন্মাত্র মহাসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তাহা, দ্বিত্ব একত্ব, আমি ও আমি নহি, এ সকল ভাব সম্মোহ বা ভ্রম। ভ্রম বা মোহ বিনষ্ট হওয়ায় আমি এখন অনন্ত, অনায়াস, ও যৎপরোনাস্তি শান্ত। আমি নির্ব্বাণতা প্রাপ্ত ও গতজ্বর হইয়াছি। চেতন রূপেই হউক, অচেতন রূপেই বা হউক, ভোক্তৃ রূপে হউক, আর ভোগ্য রূপেই বা হউক, যাহা যাহা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে সে সমস্তই সদা স্বপ্রকাশ আত্মার অনতিরিক্ত। যাহা সদা স্বপ্রকাশ আত্মা তাহাই

ব্রহ্ম এবং তাহা চিদাকাশ আমি। রজ্জুতে যেমন সর্প নাই, তেমনি চিদাকাশে এ সকল নাই, আমিত্ব নাই, ভাব অভাব, কিছুই নাই। তাহা শান্ত, সর্ব্ব, নিরালম্ব, কেবল ও সর্ব্বমূল[৮।৩১]।

বিচারপরায়ণা চূড়ালার হৃদয়ে এইরূপ প্রবোধ উদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় হইতে রাগ দ্বেষ ভয় মোহ ও তমোগুণের সমুদায় কার্য্য তিরোহিত হইল এবং শরদাকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও পরম শোভা ধারণ করিল[৩২]।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম সর্গ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালা ঐরূপে অনুক্ষণ স্বাত্মারাম অবস্থায় অবস্থান করায় ক্রমে তাঁহার স্বভাবিকী আত্মপ্রতিষ্ঠা জন্মিল[১]। রাগ, আসক্তি, দ্বন্দ্ব ও চেষ্টা তাঁহা হইতে অপগত হইল। তিনি ত্যাগ ও গ্রহণ জন্য উদ্যুক্তা রহিলেন না[২]। তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূরগত হইয়াছে, তাঁহার অন্তরাত্মা পরমাত্মলাভে পূর্ণ হইয়াছে[৩]। তাঁহার দীর্ঘকালের ভ্রান্তি অপগত হইয়াছে, এক্ষণে বিশ্রান্তা। যত উপমা থাকুক, তিনি সে সমুদায়ের অতীত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী চূড়ালা অতি স্বল্পকালেই বিদিত-বেদ্যা হইলেন[৪।৫]। তাঁহার জগদ্ভ্রম যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ণিত প্রকার বিশ্রান্তি পদে স্থিতি করায় চূড়ালার শোভা সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি পাইল[৬।৭]। আত্মবিবেক অভ্যস্ত হইল, অব্যাকুলা স্থিতি উপস্থিত হইল এবং পুষ্পিত লতিকার অনুরূপ শোভায় সুশোভিতা হইলেন[৮।৯]। অনন্তর রাজা শিখিধ্বজ একদা চূড়ালার তাদৃশী অভূতপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন[১০]। তন্বি! তোমার যৌবন কি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়াছে? তোমার শোভা

যে অনেক অধিক দেখিতেছি! হে প্রিয়ে! যে অমৃত পান করিয়াছে, যে অলভ্য লাভ করিয়াছে, সে যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তোমাকে আজ্ তদ্রূপ আনন্দপূর্ণ দেখিতেছি[১১,১২]! তুমি শান্তিযুক্ত অথচ কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ! হে কামিনি! তুমি শোভায় চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছ[১৩]! হে প্রিয়ে! আমি দেখিতেছি, তুমি ভোগকৃপণ নহ, তোমার চিত্ত প্রশান্ত ও গম্ভীর[১৪]। আমি দেখিতেছি, তোমার মন জগৎকে তৃণ তুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে। হে মহাভাগে! ক্ষীরসমুদ্রের সহিতও তোমার তুলনা হয় না[১৫,১৬]। তোমার সেই প্রাক্তন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়কে যেন আরও অধিক সুদৃশ্য বোধ করিতেছি[১৭]। সেই অঙ্গ, সেই প্রত্যঙ্গ, সেই হস্ত, সেই মুখ, তথাপি লতা যেমন ঋতুপরিবর্ত্তে অন্যাকার হয়, সেইরূপ তোমাকেও অন্যাকার দেখিতেছি[১৮]। তুমি কি অমৃত পান করিয়াছ? না সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছ? অথবা কোন যোগ শক্তিতে মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছ[১৯]? হে নীলোৎপললোচনে! বোধ হয়, তুমি এমন কিছু পাইয়াছ, যাহা রাজ্য, চিন্তামণি ও লোকত্রয়ের আধিপত্য অপেক্ষাও অধিক[২০]।

চূড়ালা বলিলেন, মূঢ়জনপ্রসিদ্ধ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী। পরিচ্ছিন্ন ও তুচ্ছ এ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মা আশ্রয় করিয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী[২১,২২]। যাহা কিছু ও কিছু না, অর্থাৎ সৃষ্টি দর্শনে কিছু ও প্রলয় দর্শনে কিছু না, তাহা জানিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি শ্রীমতী। আমার রোষ তোষে ও ভোগ অভোগে সমান ভাব, তাই আমি শ্রীমতী[২৩,২৪]। আকাশের ন্যায় কেবল অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্যে এক, এরূপ বুদ্ধিতে রমণ করি, রাজলীলায় রমণ করি না, তাই আমি শ্রীমতী[২৫]। আসন, উদ্যান, গৃহ, সর্ব্বত্রই আত্মনিষ্ঠ থাকি, এবং ভোগে ও লজ্জায় থাকি না, সেই কারণে আমি শ্রীমতী[২৬]। জগতের প্রভু অথচ কিছু নহি, এতদ্রূপ জ্ঞানে পরিতুষ্টা, তাই আমি শ্রীমতী। আমিই এ সমস্ত, পরন্তু এ সমস্ত আমি নহি এবং আমিই সত্য অথচ অহং আমি নহি। যে হেতু সমস্তই আমি, সেই হেতু আমি শ্রীমতী[২৭,২৮]। আমি সুখ চাহি না, অসুখ চাহি না, কিছুই চাহি না, যথোপস্থিত বিষয়ে হৃষ্টা থাকি, তাই আমি শ্রীমতী[২৯]। যে প্রজ্ঞার দ্বারা রাগ ও বিদ্বেষাদি

কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টি এই দুই সখীর সঙ্গে ক্রীড়া করি, সেই কারণে আমি শ্রীমতী[৩০]। হে নাথ! নয়ন রশ্মির দ্বারা যাহা দেখি, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দেখি, অধিক কি বলিব, চিত্তের দ্বারাও যাহা দেখি, সে সমস্তই মিথ্যা। ঐ সকলের অতীত ও ঐ সকলের অন্তরে নিষ্প্রপঞ্চ বস্তু সদা দর্শন করি, সেই কারণে আমি অত্যন্ত শ্রীমতী হইয়াছি[৩১]।

একোনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অশীতিতম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালার ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলেন না। না বুঝিয়া উপহাস সহকারে বলিতে লাগিলেন[১]। হে বরবর্ণিনি! তুমি প্রলাপ বলিতেছ ও অল্পবুদ্ধি হইয়াছ। আমি এ সকল আকার পরিত্যাগ করিয়া যাহার আকার নাই, তাহা পাইয়াছি বা হইয়াছি, তাই আমি শ্রীমতী, এ কথা প্রলাপ। যাহার কোনও আকার নাই, সে ত শূন্য! শূন্যের আবার শোভা কি[২।৩]? ভোগ না করিয়া পরিতুষ্ট বলিয়া পরিচয় দেওয়া ও যান আসন শয্যাদি পরিত্যাগ করা ত ক্রোধের কথা। যে ক্রুদ্ধ, তাহার আবার শোভা কি[৪]? যে ব্যক্তি ভোগ অভোগ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হইয়া একাকী আকাশে অবস্থান করে ও তাহাতেই সুখ বোধ করে, তাহার আবার শোভা কি? ঐরূপ স্থিতি পিশাচের[৫]। যাহাদের ধৈর্য্যবল অধিক থাকে, তাহারা বলপূর্ব্বক শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ধারণ (সহ্য) করিতে পারে বটে, পরন্তু তাহা শোভা বৃদ্ধির কারণ নহে। আমি দেহাদি নহি, দেহাদিও আমার নহে, এ কথা বিস্পষ্ট প্রলাপ[৬।৭]। যাহা দেখি তাহা কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে, তাহাই দেখি, এ উক্তি নিতান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ[৮]। তাই বলিতেছি, তুমি হয়

অপক্কবুদ্ধি ও চঞ্চলমতি, না হয় তোমার ঐ সকল কথা বিলাস ক্রীড়া। আমি জানি, সুন্দরীরা ক্রীড়া কৌতুকের জন্য নানা প্রকারের আলাপ প্রলাপ করিয়া থাকে! রাজা শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিয়া হাসিতে হাসিতে মাধ্যাহ্নিক কার্য্য করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন[৯।১০]। রাজা আত্মায় বিশ্রান্ত হইতে পারেন নাই ও চূড়ালার বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, ইহাতে চূড়ালা কিছু খিন্না হইলেন, অনন্তর তিনিও স্বকার্য্য করণে প্রবৃত্তা হইলেন[১১]। ঐরূপে বহুবর্ষ অতীত হইলে একদা চূড়ালার মনে আকাশে গমনাগমন করিবার ইচ্ছা হইল[১২।১৩]। অনন্তর সেই রাজকন্যা খেচরত্ব সিদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্তা হইলেন[১৪।১৫]।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! কি স্থাবর কি জঙ্গম, সমস্তই ক্রিয়া নিষ্পন্ন অর্থাৎ বিনা ক্রিয়ায় কোনও কিছু উৎপন্ন হয় না। পরন্তু কাহার ক্রিয়ায় ঐ সকল সিদ্ধি জন্মে? আত্মা ত নিষ্ক্রিয় স্বভাব[১৬।১৭]? আত্মজ্ঞ অনাত্মজ্ঞ উভয়বিধ লোককেই সিদ্ধ হইতে দেখা যায় এবং কেহ বা সিদ্ধির জন্য কেহ বা কেবল কৌতুকের জন্য সাধন অনুষ্ঠানে রত হয়। তাই আমার জিজ্ঞাসা—কি প্রকারের লোক সকল সিদ্ধি লাভ করে[১৮]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! সাধ্য বা সাধনার বস্তু ত্রিবিধ। হেয়, উপাদেয় ও উপেক্ষ্য[১৯]। আত্মবিজ্ঞানের অনুকূল উপাদেয়, তাহার প্রতিকূল হেয়, এবং যাহা হেয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, তাহা উপেক্ষ্য। অপিচ, যাহা সুখের সাধন, তাহা উপাদেয়, যাহা সুখের বিরোধী তাহা হেয়, এবং যাহা হেয়ও নহে উপাদেয়ও নহে, তাহা উপেক্ষ্য। এই তিন্ বিভাগ অজ্ঞদিগের পক্ষে ব্যবস্থিত, পরন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কেননা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মা, সেজন্য তাঁহাদের পক্ষে ঐ তিন্ বিভাগ অসম্ভব[২০।২২]। কদাচিৎ উপেক্ষা পক্ষ সম্ভবে ও জ্ঞানীরা কখন কখন লীলার জন্য তাদৃশ উপেক্ষা পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সিদ্ধি উপার্জ্জনের ক্রম বলি, শ্রবণ কর[২৩।২৪]। সিদ্ধি লাভের প্রতি দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য, এই চার প্রকার কারণ দেখা যায়। তন্মধ্যে ক্রিয়াই প্রধান, আর সব সহকারী। উক্ত কারণ চতুষ্টয়ের মেলনে শীঘ্র সিদ্ধ হওয়া যায়। একতরাদির অভাবে বিলম্বে সিদ্ধি

লাভ হয়[২৫-২৬]। উড্ডামর তন্ত্র ও যোগিনীসাধন প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রকার সিদ্ধির উপায় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে আকাশগমনাগমনের জন্য গুটিকাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি, পাদুকাসিদ্ধি ও খড়্গসিদ্ধি প্রভৃতি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। পরন্তু ঐ সকল সিদ্ধি অত্যন্ত দোষাবহ ও জ্ঞানীর পক্ষে বিঘ্নকর[২৭]। রত্ন, ঔষধি, তপস্যা ও মন্ত্র, এ সকলের দ্বারাও সিদ্ধি হওয়া যায়, পরন্তু তাহাও তত্ত্বজ্ঞানের শত্রু। শ্রীপর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইলেও তাহার জ্ঞানবিঘ্নকারিত্ব নিবারিত হয় না[২৮।২৯]। অতএব, আমি তোমাকে শিখিধ্বজ-কথা উপলক্ষ্যে পবনাভ্যাসরূপ উপায় বর্ণন করি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর[৩০]।

পবনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইলে আগে যম নিয়মাদি নামক যোগাঙ্গ শিক্ষা করিতে হয়, তৎপরে অন্তঃস্থ বাসনানিচয় ত্যাগ করিতে হয়, তৎপরে স্বস্তিকাদি আসন আয়ত্ত করিতে হয়, এবং হিত মিত মেধ্য ভক্ষ্য অবলম্বন, শুদ্ধাচারী ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে হয়। শুদ্ধাচার, বিশুদ্ধ ভক্ষ্য ভক্ষণ, শাস্ত্রার্থ ধ্যান, সদাচারতৎপরতা, সাধুসংসর্গ, সর্ব্বত্যাগিতা ও আসন জয় সম্পন্ন হইলে ও প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হইলে যথাকালে কোপ, লোভ, ভোগ, বৈরাগ্য ও প্রাণবায়ুর রেচন পূরণ ও স্তম্ভন অত্যন্ত অভ্যস্ত হইলে, প্রাণের প্রতি যোগীর প্রভুত্ব জন্মে অর্থাৎ প্রাণ অপান সমানাদি সংজ্ঞক বায়ু ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত হয়[৩১।৩৪]। হে রঘুনাথ! রাজ্য হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে কোন সম্পদ, সমস্তই প্রাণানিল জয়ের দ্বারা লাভ করা যায়[৩৫]। শত শত নাড়ীর আশ্রয় আন্ত্রবেষ্টনিকা নাম্নী নাড়ী মর্ম্মস্থানে পরিমণ্ডলাকারে স্থিত আছে। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা বীণার মূল ভাগে যে তন্ত্রাবর্ত্তক রেখা থাকে, তাহার অথবা জলের আবর্ত্তনের অনুরূপ আকার বিশিষ্ট। ইহার গঠন প্রণবাক্ষরের অর্দ্ধ অঙ্কনের সদৃশ। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা যে কেবল মনুষ্য প্রাণীর, তাহা নহে। দেব অসুর যক্ষ রাক্ষস ও পশু পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মূল মর্ম্মস্থানে বিরাজিত[৩৬।৩৮]। শীতকাতর সুপ্ত সর্পের ফণার অনুরূপে মণ্ডলীভূত ও শুভ্রবর্ণ এই আন্ত্রবেষ্টনিকা গুহদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মনোবৃত্তির দ্বারা অনুস্যূত এবং প্রাণ বৃত্তির দ্বারা চঞ্চলা[৩৯।৪০]। ইহারই অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী শক্তির স্থিতি। এই কুণ্ডলিনী শক্তির অন্য নাম পরা

শক্তি ও চিচ্ছক্তি। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বীণাতন্ত্রী যেমন অনবরত গতিযুক্তা হয়, এই চিৎশক্তি তদ্রূপ অনবরত উর্দ্ধাধোগতি যুক্তা। এই শক্তিই অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তির প্রাণ স্বরূপ[৪১,৪২]। এই শক্তিই প্রাণকে নিরন্তর অধঃ উর্দ্ধে প্রেরণ করিতেছে। প্রাণ হৃদয়াবচ্ছিন্ন কুণ্ডলিনী সংযোগে আন্তঃকরণিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, এবং ইহারই বিশেষ বিশেষ স্ফুরণে বিশেষ বিশেষ কার্য্য অর্থাৎ দর্শন স্পর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়[৪৩।৪৬]। এই কুণ্ডলিনীর সহিত হৃৎকোষস্থ সমুদায় নাড়ীর সম্বন্ধ। এবং তদ্দ্বারাই তিনি ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন। প্রাণবায়ুর অন্তঃপ্রবেশ ও বহিরাগতি, এই দুই কার্য্যের দ্বারা সেই সেই নাড়ীর সঙ্কোচ বিকাশ হইয়া থাকে[৪৭,৪৮]।

রাম বলিলেন, চিৎপদার্থ সর্ব্বত্রাবস্থিত, সেজন্য তাহার সর্ব্বত্র সমান প্রকাশ থাকাই উচিত। পরন্তু আপনি বলিলেন, নাড়ীমূলস্থ কুণ্ডলিনী পদার্থে তাহার উদয় দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? তাহা বলুন[৪৯]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, চেতনা বস্তু সকল সময়ে ও সর্ব্বত্র সংবিদিত হয় বটে; পরন্তু ভূততন্মাত্রার বশে অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ আধারে কিছু অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। আতপ যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ভিত্তি প্রভৃতিতে অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় চিদ্বস্তুও কোন কোন দেহে অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়[৫০।৫১]। উপাধির মালিন্য অনুসারে চিতের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সংঘটনা হয় এবং তদনুসারেই কোন কোন দেহে চৈতন্যের অদর্শন, কোন কোন দেহে চৈতন্যের অধিক স্ফূর্ত্তি ও কোন কোন দেহে তাহার উচ্ছেদ কল্পিত হইতেছে[৫২]। হে অনঘ! এই রহস্য তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, মনুষ্য দেহে সংবিদের ক্রম কিরূপ[৫৩]। একাদ্বয় চিদ্বস্তু আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ও ব্যাপ্তিস্বভাব[৫৪]। তোমারও নিজ সম্বিদ্ সেই অনাময় পদার্থ, পরন্তু তন্মাত্রপঞ্চকে (লিঙ্গশরীরে) প্রতিবিম্বরূপে আবিষ্ট হওয়ায় পঞ্চ ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। সেই একই সম্বিৎ লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন দুই হইয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ এরূপ ভ্রম হইতেছে যে, জীব যেন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ)[৫৫,৫৬]। সঙ্কল্প মাত্র উপলক্ষ করিয়া তিনি আগে পাঁচ প্রকার তন্মাত্রারূপী হন, পরে সেই সকলের কিয়দংশে লিঙ্গশরীর ও কিয়দংশে বাহ্যব্রহ্মাণ্ডরূপী

হন। দেহ ও বিষয় প্রভৃতি বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত[৫৭।৫৮]। অতএব, এই দৃশ্য জগৎ তন্মাত্রাপঞ্চকেরই প্রস্পন্দ অর্থাৎ কার্য্য এবং সেই জন্য চিৎসম্বিদ্ সর্ব্বত্র বা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে গণ্য হইতেছে[৫৯]। সেই কেবল বা একক চিৎপদার্থ তন্মাত্রাপঞ্চকের বশে দেহাদিতে চেতন ও স্থাবরাদিতে অচেতন বা জড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। জলে বীচি বা লহরী দৃষ্ট না হইলে সেই স্তব্ধীভূত জলকে যেমন স্থল বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেইরূপ, স্থাবরাদি পদার্থগত স্তব্ধীভূত চৈতন্যও জড় বলিয়া প্রখ্যাত হয়[৬০।৬১]। সমুদ্রের অচঞ্চল ভাব ও চঞ্চল ভাব যদ্রূপ, শরীরভেদে চেতনার ভাবও তদ্রূপ। অর্থাৎ স্থাবরাদিতে জড়ভাব ও মনুষ্যাদি শরীরে জীবভাব[৬২-৬৩]। এক বস্তু ঐরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয় কেন? এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কেননা ভাব অভাব সমস্তই পূর্ব্ব বাসনার অনুগামী। বাসনার বিপর্য্যয় কেন? এ আপত্তিতেও ফলোদয় নাই। যে আপত্তিতে অনাপত্তি ফল ফলে সেই আপত্তি উত্থাপ্য, নচেৎ বৃথা আপত্তি অনুত্থাপ্য। আকাশকে কি কেহ মুষ্টিক্ষেপ্য করিতে পারে[৬৪।৬৮]? অতএব, বাসনা সত্তে সমস্তই সম্ভবে, বাসনাক্ষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বাত্মলাভ কালে প্রভেদ না থাকায় আপত্তি অনাপত্তি দুএর কিছুই থাকে না[৬৯]। স্থাবর জঙ্গমে বাসনা সুপ্তকল্প এবং দেব অসুর মনুষ্যে জাগ্রৎকল্প। স্থাবরাদি জীব মলিন বাসনা যুক্ত বলিয়া মলিন, অস্বস্থ, পরন্তু যাহারা বাসনা মুক্ত হইয়াছে তাহারাই মুক্ত সংজ্ঞার সংজ্ঞী। অতএব, বাসনামুক্তিই মুক্তি, আর বাসনার বেষ্টনই (বাসনার দ্বারা জড়িত হওয়াই) বন্ধন। দেহ, দেহের বাহ্য ও অভ্যন্তর, হস্ত পদ মস্তকাদি, সমস্তই তন্মাত্রাপঞ্চকের স্তূপ হইলেও বাসনা অনুসারে ঐ সকল নাম কল্পিত[৭০।৭২]। পশুতে পদচতুষ্টয়, শৃঙ্গ ও পুচ্ছ, পক্ষিতে চঞ্চু, চরণ, পদ ও পুচ্ছ, সর্পে ফণা ও পুচ্ছ, এবং কৃমি কীট পতঙ্গাদিতে বাসনানুরূপ ব্যবহার নিষ্পাদনার্থ অবয়ব সকল কল্পিত রহিয়াছে[৭৩]। হে সাধো! পাঁচ তন্মাত্রার রাশিই (পরমাণু রাশির) এবম্বিধ বিচিত্র আকারে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে। তন্মধ্যে যাহা ঐ সকলের আধার তাহা নির্ব্বিকার, অজড় ও সৎ, পরন্তু যাহা সেই আধারের আধেয়, তাহা সবিকার, জড় ও অসৎ[৭৪]। হে মহারাজ! অনন্ত ভেদ বিশিষ্ট এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বীজ একটী। সেই একই হইতে এই শূন্যকল্পা বিচিত্র বৃক্ষ জন্মিয়াছে। উক্ত বৃক্ষের

পুষ্প ইন্দ্রিয়, বিষয় সকল সৌগন্ধ, ইচ্ছা সকল ভ্রমরী, ক্রিয়া সকল মঞ্জরী, স্বর্গাদি লোক গুল্ম বা বিটপ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত মূল, মেঘ সকল পল্লব, দিক্ সকল লতা, প্রাণী সকল এই সৃষ্টিরূপ আকাশ বৃক্ষের ফল[৭৫।৭৮]। হে রামচন্দ্র! এই বৃক্ষ স্বয়ং যথাকালে জন্মে আবার যথাকালে বিনষ্ট হয়। স্বয়ংই নানাত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জড় ভাব ও বিবেক ভাব এই দুই ভাব স্বয়ং উৎপন্ন হয়[৭৯।৮১]।

হে রাঘব! তন্মাত্রাপঞ্চকের যে রাশি (অর্থাৎ দেহী) বিবেকের বশ্য হয় সেই রাশিই বিচিত্র মায়িক বিলাস হইতে উত্তীর্ণ হয় সুতরাং সে রাশি আর এরূপ সংসার স্থিতিতে থাকে না[৮২]।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই স্থূল পঞ্চকের (দেহের) অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী, ইঁহাতে সূক্ষ্ম পঞ্চকের (লিঙ্গ দেহের) বীজ ভূতসূক্ষ্ম প্রথমে প্রাণাদি পঞ্চকরূপে স্ফুরিত হয়। সেই কুণ্ডলিনী প্রাণাদি বায়ুধর্ম্মে ও নিজধর্ম্মে স্পন্দ, স্পর্শ, সম্বিৎ, এই ত্রিরূপিণী হইয়া চিৎকল্প ও জীব, মন, সঙ্কল্প, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুর্য্যষ্টক, এই সকল নাম লাভ করে। এই কুণ্ডলিনী এই দেহে পশ্চাদুক্ত নামে ও আকারে স্থিতি করিতেছে। যথা—কলনা বা কল্পনা কার্য্যের দ্বারা নাম কলা, চেতনা কার্য্যের দ্বারা চিৎ, জীবন কার্য্যের দ্বারা জীব, মনন ক্রিয়ার দ্বারা মন, সঙ্কল্প (ইচ্ছা) ক্রিয়ার দ্বারা সঙ্কল্প, বোধ কার্য্যের দ্বারা বুদ্ধি, অহং আমি এই অভিধান ধারণ দ্বারা অহঙ্কার। এইরূপে পুর্য্যষ্টক অভিধা প্রাপ্ত হইতেছে[১।৪]। কুণ্ডলিনীই অপান বৃত্তি অবলম্বনে অধোবাহিনী, উদান বৃত্তি অবলম্বনে উর্দ্ধবাহিনী ও সমান বৃত্তি অবলম্বনে দেহের মধ্য স্থানে স্থিতা। অপানের নিম্নাকর্ষণ ও উদানের উর্দ্ধাকর্ষণ এই দুএর দ্বারা মধ্যবর্ত্তী সমান

স্থির থাকে। অর্থাৎ লিঙ্গকে বহিষ্কাশিত হইতে দেয় না[৮,৯]। মধ্যাবস্থিত সমান অধঃ ঊর্দ্ধ গমনের সাম্য বিধান না করিলে মনুষ্যের মৃত্যু হয় ও নানা প্রকার আধি ব্যাধি জন্মে। তাই যোগী ঋষিরা বলেন, যদি প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ অভ্যস্ত করা যায় তাহা হইলে সমান বৃত্তির প্রাবল্য জন্মে এবং তদ্দ্বারা অন্যান্য বৃত্তি বশ্য হওয়ায় ব্যাধিক্ষয় ও মৃত্যু বিজয় নামক সিদ্ধি জন্মে[৭,৯]। শরীরে প্রধান নাড়ী এক শত, পরন্তু শাখা নাড়ী অসংখ্য। তন্মধ্যে প্রধান নাড়ীর বৈষম্যে প্রধান রোগ ও শাখা নাড়ীর বৈধর্ম্যে অল্প রোগ হইয়া থাকে[১০]।

রাম বলিলেন, হে মুনীশ্বর! আধি ও ব্যাধির উৎপত্তি ও বিনাশ যথাযথ বর্ণন করুন[১১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, আধি ও ব্যাধি দু-ই দুঃখের কারণ এবং তদ্দ্বয়ের নিবৃত্তিই সুখ। উক্ত কারণ দ্বয়ের যে বিনাশ, আত্যন্তিকী নিবৃত্তি, তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া জানিবে[১২]। এই কুৎসিত শরীরে কখন বা আধি ও ব্যাধি ক্রমসংলগ্ন হইয়া জন্মিতেছে, কখন বা একই সময়ে ও অক্রমে জন্মিতেছে, আবার কখন বা পর্য্যায় নিয়মে জন্মিতেছে[১৩]। দৈহিক দুঃখ ব্যাধি ও মানস দুঃখ আধি। এই আধি বাসনাময় ও অজ্ঞতামূলক সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানে তাহার বিধ্বংস সম্ভব হয়[১৪]। তত্ত্বজ্ঞান না থাকায় মূর্খেরা রাগ দ্বেষাদিতে রত হয়। ইহা পাইলাম, আমায় পাইতে হইবে, এইরূপ চেষ্টায় মুগ্ধ হয়। সেইজন্য নানা আধি (মানসী ব্যথা) জন্মে[১৫,১৬]। অদম্য ইচ্ছা, দোষ গুণ বোধের অভাব, কুভক্ষ্য ভক্ষণ, দুর্দ্দেশ বাস, অযোগ্য কালের ব্যবহার, দুষ্ক্রিয়ায় রতি, দুর্জ্জনের সংসর্গ, দুর্ভাবের উদ্ভাবন, এই সকল হইতে শরীরস্থ নাড়ীরন্ধ্রে অন্নরসের প্রপূরণ ও অপূরণ অথবা বাতাদি পদার্থের বিগুণিত প্রবেশ ঘটে, তাহা ঘটিলে দেহ বিকলীকৃত ও ব্যাধিদুঃখে আক্রান্ত হয়। বর্ষা ও গ্রীষ্ম নিমিত্তক নদীর বৈপরীত্য হওয়ার ন্যায় দেহেরও ব্যাধি ও নির্ব্যাধি নিমিত্তক বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে[১৭,২০]। ব্যাধি জন্মের কারণ দুটী অর্থাৎ ঐহিক ও প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে উপস্থিত হয়। হে রাঘব! ভূতপঞ্চকময় দেহে এইরূপে আধি ব্যাধি জন্মে, এক্ষণে উহাদের প্রক্ষয় যাহাতে হয় তাহা বলি শ্রবণ কর[২১,২২]।

ব্যাধি দ্বিবিধ। সামান্য ও সুদৃঢ়। সামান্য ব্যাধি ব্যবহারমূলক, এবং সুদৃঢ় ব্যাধি জন্মাদি বিকার। যোগ্য অন্ন পান ও ঔষধাদির দ্বারা সামান্য ব্যাধি উপশান্ত হয়, পরন্তু জন্মরূপ সুদৃঢ় ব্যাধি আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না[২৩।২৫]। আধি ও ব্যাধি উভয়ের মধ্যে আধি বিনাশই সার, কেননা আধিই সকল দুঃখের মূল। সামান্য ব্যাধি, দ্রব্য মন্ত্র শুভানুষ্ঠান ও চিকিৎসক দিগের উপদিষ্ট প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়, এবং স্নানাদি উপায়েও বিনষ্ট হয়[২৬।২৮]।

রাম বলিলেন, ভগবন্! আধি হইতে ব্যাধি জন্মে কি প্রকারে এবং কি প্রকারেই বা মন্ত্রাদির দ্বারা তাহার বিনাশ হয়, তাহা আমাকে বলুন[২৯]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, চিত্ত আধির দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে দেহও সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তি, সম্মুখে কি তাহা দেখে না, তাহা না দেখিয়া অপথে পদার্পণ করে। অর্থাৎ প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত পথে গমন করে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, সংক্ষোভ উপস্থিত হইলে প্রাণ বায়ুর সাম্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে সে বৈষম্যবাহী হয়। প্রাণ বৈষম্যবাহী হইলেই নাড়ী সকল বিসংস্থিতি হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক সংস্থানে থাকে না। তাহাতে কোন নাড়ী পূর্ণ ও কোন নাড়ী রিক্ত হইয়া পড়ে। প্রাণ সঞ্চারের ঐরূপ বৈগুণ্যে কুজীর্ণ, অজীর্ণ ও অতি জীর্ণ প্রভৃতি দোষ ঘটে[৩০।৩৫]। সমানাখ্য প্রাণ বায়ু ভুক্তান্ন রসের সাম্য বিধান করে, পরন্তু সে বিধান ভঙ্গ হওয়ায় বৈষম্য হেতু ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির সম্ভব হয় এবং আধির অভাবে ব্যাধিরও অভাব হয়। মন্ত্রের দ্বারা ব্যাধি বিনাশ কেন হয় ও কিরূপে হয় তাহা বলি, শ্রবণ কর[৩৬।৩৮]। যেমন হরীতকী স্ব স্বভাবে বিরেচন কার্য্য করে, তেমনি, য র ল ব প্রভৃতি মন্ত্র বর্ণও মন্ত্র প্রয়োক্তার ভাবনায় ব্যাধি বিনাশকারী হয়[৩৯]। হে সাধো! পবিত্রতা, পুণ্য কার্য্য ও সাধু সেবার দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, মনের নৈর্ম্মল্যে আধিও বিনষ্ট ও আনন্দ বর্দ্ধিত হয়[৪০।৪১]। মনের শুদ্ধতায় এই শারীর বায়ু প্রাণও যথোচিত বহমান হয়, তাহাতেও পরিপাক ক্রিয়া উত্তম রূপ নির্ব্বাহিত হওয়ায় ব্যাধি বিনাশ হইয়া থাকে[৪২]। আধি ব্যাধির জন্ম ও বিনাশ যে ক্রমে হয় সে ক্রম বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত কথা

বলি, শ্রবণ কর[৪৩]। যাহার অন্য নাম পুর্য্যষ্টক ও লিঙ্গদেহ, সেই জীবের পরমাশ্রয় প্রাণনামিকা কুণ্ডলিনী, তিনি শক্তি নামে পরিচিতা। পুরক যোগে উক্ত প্রাণ যদি কুর্ম্ম নাড়ীতে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় (কণ্ঠ কূপের অধোভাগে বক্ষঃ প্রদেশস্থা কুর্ম্মাকারা নাড়ী কুর্ম্মনাড়ী), তাহা হইলে শরীর সুমেরুরন্যায় গুরুভার হয়। অর্থাৎ গরিমা-সিদ্ধি জন্মে। প্রাণ যদি পুরক যোগে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমায়াত হয় তাহা হইলে আকাশগতিরূপা সিদ্ধি জন্মে[৪৪,৪৮]। যোগীরা অভ্যাস পটুতার দ্বারা ঐরূপে অণিমা ও লঘিমা সিদ্ধি লাভ করেন[৪৯]। রেচক যোগে কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্নানাড়ীবাহিনী হইয়া মূর্দ্ধা প্রদেশে স্থিতি লাভ করিলে সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি দিগের দর্শন লাভ হয়[৫০,৫১]।

রাম বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিনা-নেত্ররশ্মির দেখা কিরূপ?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! ভূচর মনুষ্যেরা কেহই চক্ষুর দ্বারা আকাশচর সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি দর্শন করে না, করিতে পারেও না। ইহারা জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা সেই সকল দূরস্থ সিদ্ধাদি স্বপ্নের উপমানে দর্শন করিতে পারে[৫২,৫৪]। যেমন স্বপ্নে বিনা চক্ষুতে দর্শন সিদ্ধি হয়, সেইরূপ, জ্ঞান চক্ষুতেও দর্শন সিদ্ধি হয়। পরন্তু স্বপ্নের দেখা অস্থির ও মিথ্যা, আর জ্ঞান চক্ষুর দেখা স্থির ও সত্য[৫৫]। রেচক যোগের অভ্যস্ত হইলে যদি মুখ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দূরে প্রাণের স্থিতি দীর্ঘকাল ব্যাপিনী হয় তাহা হইলে পরশরীর প্রবেশ কারিণী সিদ্ধি জন্মে[৫৬]।

রাম বলিলেন, প্রভো! জগতের সমস্তই মায়াময় বলিয়া অস্থির। অস্থিরতাই জগতের স্বভাব, অথচ আপনি বলিলেন, জ্ঞান চক্ষের দৃষ্ট বস্তু স্থির। ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা আমাকে বলুন[৫৭]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরমাত্মার যে শক্তি স্বভাবনামিকা, সে শক্তি সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত ও প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। ঈশ্বরের সঙ্কল্প অমোঘ, সেইজন্য বস্তু স্বভাবের অবস্থান প্রলয়াবধি স্থায়ী[৫৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কাষ্ঠ ও ক্রকচ উভয়ের সংশ্লেষে ছেদন ক্রিয়া জন্মে। উহার ন্যায় প্রাণ অপান উভয়ের সংঘর্ষে স্বভাবের ব্যবস্থায় জঠর প্রদেশে বহ্নি (উষ্মা) আবির্ভূত হয়। এই কুৎসিত দেহ যন্ত্রের জঠরপ্রদেশে পরস্পর শ্লিষ্টমুখ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ আশ্রয়ী ভস্ত্রাদ্বয়ের অনুরূপে পদ্মাকার

মাংসখণ্ড রহিয়াছে। তদ্দ্বয়ের মূলভাগে প্রাগুক্ত কুণ্ডলিনী নিজ স্থানে নিলীন আছেন[৫৯,৬৪]। সেই কুণ্ডলিনী অনুক্ষণ চলন দ্বারা সূক্ষ্ম শব্দযুক্তা এবং দণ্ডাহত ভুজগীর ন্যায় পরিবর্ত্তনবতী। রুদ্রাক্ষ মালা জপ কালে যেরূপ অস্পষ্ট সূক্ষ্ম শব্দ হয় কুণ্ডলিনী সেইরূপ শব্দকারিণী। ইনিই প্রাণী দিগের জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় শক্তির কারণ[৬৫,৬৭]। এই বাহ্য বায়ু যেমন এই বিশাল বহিরাকাশে তৃণ কাষ্ঠাদি সঞ্চালিত করে ও কাল প্রভাবে সে সকলকে জীর্ণ করে সেইরূপ, অন্তরাকাশেও প্রাণবায়ু ভুক্তান্ন পরিপাক করতঃ সে সকলের সার সর্ব্বশরীরগামী করে। প্রাগুক্ত হৃৎপদ্মনাড়ীরূপ ভস্ত্রা প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আহত অর্থাৎ সঞ্চালিত হয়, তাহাতেই ভুক্তান্ন দ্রব ভাব ধারণ করে। সেই দ্রবীভূত সার বা রস শিরা পথে হৃদয় (হৃদয়=হৃৎপিণ্ড) প্রবিষ্ট হইয়া রক্তাকার ধারণ করে, ক্রমে মাংসাদি রূপে দেহলগ্ন হয়। উক্ত প্রকারেই জঠ-রাগ্নির সর্ব্বদেহব্যাপিতা ও তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ঔষ্ণ্য অনুভূত হয় [৬৮,৭১]। যোগীরা হৃৎপদ্মে সেই তেজকে তারকাকৃতি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন এবং চিদ্রূপে চিন্ত্যমান সেই তেজো দ্বারা তাঁহারা দূর-ব্যবহিত পদার্থ নিচয় দর্শন করেন। লক্ষ্য যোজন দূরে থাকিলেও তাহা যোগীর তদ্রূপ দৃষ্টির দৃশ্য হয়[৭২,৭৩]। যেমন বাড়বাগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ) সমুদ্রজল, সেইরূপ, শরীরস্থ অন্ন রস হৃৎসরোবরস্থ জাঠরগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ)[৭৪]। সেই স্বচ্ছ ও শীতল অন্নরসময় জল ইন্দুর অংশ। এই ইন্দু অংশই শরীরস্থ বাড়বাগ্নিতুল্য বহ্নির উত্থান স্থান। এইরূপে এই দেহ অগ্নিসোমাত্মক[৭৫]। যে কিছু উষ্ণতা সে সমস্তই তেজ, অর্ক ও অগ্নি নামের নামী এবং যে কোন শৈত্য সে সমস্তই সোম নামের নামী[৭৬]। এই জগৎ ঐরূপে অগ্নিসোমাত্মক অর্থাৎ শৈত্যজাড্যসমন্বিত অথবা প্রকাশ ও উষ্ণ সম্মিলিত। যাহা হইতে এতাদৃশ জগৎ নিষ্পন্ন হইতেছে সেই মায়াশবল ব্রহ্মও সদসদাত্মক অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের অপার্থক্য বা একযোগ। তন্মধ্যে বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান) সূর্য্য ও অগ্নিস্থানীয় এবং অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ও জড়তা প্রভৃতি সোম স্থানীয়[৭৭,৭৮]।

রাম বলিলেন, বায়ুরূপ সোম হইতে বহ্নির উদয় হয় ইহা বুঝি-ছ, পরন্তু সোমের উৎপত্তি প্রকার বুঝিতে পারি নাই[৭৯]।

প্রাপ্তি, তাহাই নির্ব্বাণ। কুড্য (ভিত্তি) ও আলোক যেমন পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া প্রতীতিগম্য হয়, তেমনি, দেহাভাবে আত্মার স্ফুরণ থাকে না, আত্মার অস্ফুরণেও দেহ থাকে না, এই কারণ, পরস্পর সাপেক্ষ-স্বভাব দেহদেহীকেও অগ্নিষোমময় (চিজ্জড়াত্মক) জানিবে। অগ্নির সম্পূর্ণভাবে কাষ্ঠাদি উপাধি রহিত হইলেই যথার্থ রূপ প্রকাশ পায়, জল শিলাদি ভাবে জাড্যাধিক্য হইলে সোমেরও (জড়ের) প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়[১০৮,১০৯]। উষ্ণাত্মক প্রাণই অগ্নি, এবং শীতল অপান বায়ু সোম স্বরূপ, ছায়া ও আলোকের মত বিপরীত স্বভাব এ উভয়, উভয় পথে প্রবাহিত হয়। প্রতিবিম্ব যেমন আদর্শে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ উষ্ণস্বভাব প্রাণাগ্নিও শীতল অপানে অধিষ্ঠান (আশ্রয়) লাভ করে। সূর্য্য যেরূপ স্বীয় প্রভা দ্বারা বাহিরে নিজ প্রতিবিম্বকে উদ্ভাসিত করে, মুখ্য প্রাণরূপ চিৎ অগ্নিও পদ্মাকার ষট্‌চক্র স্থিত বাক্যময় সোমকে স্বীয় অনুভূতি বা স্ফুর্ত্তি দ্বারা উদ্ভাবিত করে[১১০,১১১]। সৃষ্টির প্রথমে যেরূপ মায়াসম্বলিত ব্রহ্মসম্বিৎই শীত উষ্ণাদি বিবিধ ভাবে "অগ্নীষোম" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, এখন ব্যষ্টি ভূত শরীর নির্ম্মাণেও সেই সম্বিৎই অগ্নীষোমরূপে বিরাজ করিতেছে[১১২]। সূর্য্য অর্থাৎ প্রাণ-রূপ তেজ যে হৃদয়াকাশে চন্দ্রের পঞ্চদশ কলা গ্রাস করিয়া ষোড়শী কলা অবশিষ্ট রাখে (এ স্থলে চন্দ্র শব্দের অর্থাৎ অপান বায়ু) এবং সেই ষোড়শী কলা মুখমার্গ হইতে প্রাদেশ মাত্র বিনিঃসৃত অবস্থায় থাকে, তুমি তাহাতে অবস্থিত হও অর্থাৎ যোগনিষ্ঠ হও। যে হৃদয়াকাশে সোমই সূর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ প্রকাশময় ভাবে বহিরবস্থান করে, তাহাতে সমাহিত হও। উষ্ণ স্বভাবকে অগ্নি ও চিৎসূর্য্য এবং শৈত্য স্বভাবকে সোম বলা হইয়াছে; যেখানে এই সোম সূর্য্য বা শৈত্য ঔষ্ণ্য পরস্পর প্রতিবিম্বিত আছে, তাহাতে স্থির চিত্ত হও অর্থাৎ প্রাত্মস্বরূপে স্থিত হও। হে রাঘব! দেহ মধ্যে সোম, সূর্য্য ও অগ্নির পরস্পর সংযোগ কিরূপে হয়, তাহা সম্যক্ অবগত হও, হইলে তখন বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তু তৃণতুল্য হেয় হইয়া যাইবে[১১৩,১১৪]।

হে রামচন্দ্র! তুমি যদি প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস বলে প্রাগুক্ত সংক্রমণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাত্মক সংবৎসরকে বাহ্যানুভূত ঘটপটাদির ন্যায় অভ্যন্তরে ও যথাযথ রূপে সাক্ষাৎ করিতে পার; তবেই যোগ

মার্গে অধিকারী হইবে, কিন্তু সেরূপ না করিয়া বিষয়াসক্ত হইলে কখনও অধিকারী হইতে পারিবে না[১১৯]।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যোগিগণের দেহ যেরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাব প্রাপ্ত হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর[১]।

সন্ধ্যাকালীন মেঘমধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় হৃৎপদ্মের ঊর্দ্ধ কর্ণিকার অভ্যন্তরে যে স্বর্ণ ভ্রমরের মত বহ্নিকণা আছে, বাত্যার (বাত্যা=বায়ু সমূহ) ন্যায় বর্দ্ধনোপায় জ্ঞান দ্বারা সেই বহ্নি বৃদ্ধি পায়, এবং সূর্য্যের মত জ্ঞানরূপে দেহকে সমুদ্ভাসিত করে। অনন্তর, অগ্নি যেরূপ স্বর্ণকে দ্রবীভূত করে, তদ্রূপ সেই বর্দ্ধমান অগ্নিও হস্তপদাদি অঙ্গসমেত সমস্ত দেহকে দ্রবীভূত করে, সেই অগ্নির প্রভা প্রভাতগগণে উদীয়মান সূর্য্যের সদৃশ। সেই অগ্নি স্বকীয় স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা যোগে জলের বিমর্দ্দক হয় (বিমর্দ্দক=স্থূলতা নাশক অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু ক্ষয় করে)। তাহাতে দেহস্থ জল শোষন করিয়া ও দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া মনে বা লিঙ্গশরীরে অবস্থান করে। বাত্যাস্পর্শে হিম যেমন অন্তর্হিত হয়, তেমনি, প্রাণের পরিস্পন্দ বশতঃ সেই অগ্নি দেহদ্বয় (স্থূল ও সূক্ষ্ম) পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়। তখন, অগ্নি হইতে বিনির্গত ধূম রেখার ন্যায় কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আতিবাহিক দেহস্থ আকাশে অবস্থান করেন[২।৭]। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি মনোবুদ্ধিময় সূক্ষ্ম শরীরে অহং ভাব স্থাপন করেন। ধূমের অভ্যন্তরে যেরূপ সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ প্রভা থাকে, সেইরূপ, তাঁহারও অভ্যন্তরে নিয়মিত জ্ঞান শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার ফলে সে আবশ্যকমতে মৃণাল, পর্ব্বত, তৃণ, ভিত্তি, পাষাণ, আকাশ ও ভূতল—যেখানে যেরূপে যাইতে ইচ্ছা হয় সেখানে অবাধে যাইতে পারে। চর্ম্ম

নির্ম্মিত ভস্ত্রা (কূপ হইতে জল তুলিবার এক প্রকার পাত্র) যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ, সেই কুণ্ডলিনী শক্তিই ক্রমশঃ রসাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণত্ব লাভ করে। চিত্রকর যেমন প্রথমে মনে মনে রেখা কল্পনা করে, অনন্তর সেই রেখাই বাহিরে আকৃতি (ছবিরূপ) ধারণ করে; হে রামচন্দ্র! রসপূর্ণা সেই যোগিশক্তিও ভাবনার অনুরূপ বাহ্যরূপ ধারণ করে। দেহের বীজশক্তি মাতৃগর্ভে যেরূপ অস্থি প্রভৃতি আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ, দৃঢ়তর ইচ্ছা বলে ভাবি শরীরের অস্থি প্রভৃতি রূপ ধারণ করে। হে রাঘব! সেই জীবশক্তি যেরূপ আকার ও পরিমাণ চিন্তা করে, তদনুসারে মহৎ সুমেরু প্রভৃতি ও সূক্ষ্ম তৃণাদি রূপে পরিণত হইতে পারে৮।১০।

হে রামচন্দ্র! যোগলভ্য অণিমাদি সিদ্ধির কথা শ্রবণ করিলে, এখন শ্রবণপ্রিয় জ্ঞানলভ্য বিষয় শ্রবণ কর।

এ সংসারে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর, অলক্ষ্য, নির্দ্দোষ ও প্রশান্তরূপ একমাত্র চিৎই সৎ। জগৎ বা জগতের পরিস্পন্দ কখনও সৎ নহে। সেই চিৎই যখন মায়ার আবেশে ("বহু হইব ও জন্মিব" ইত্যাদিরূপে) সঙ্কল্প দ্বারা আপনি আপনাকে অধ্যস্ত করে; তখনি মলিন ভাব প্রাপ্ত সেই চিৎ "জীব" সংজ্ঞা লাভ করে। বালক (অনভিজ্ঞ) যেমন ভ্রম বশতঃ অবিদ্যমান যক্ষকেও সম্মুখে দণ্ডায়মান দর্শন করে, তেমনি, সেই মোহগ্রস্ত জীবও ভ্রান্ত চিন্তার বলে শরীর সন্দর্শন করে। যখন জ্ঞানময় দীপের আলোক উপস্থিত হয়, তখন জীবের সঙ্কল্পভ্রম শরৎকালীন মেঘের মত বিলীন হইয়া যায়, হে রাঘব! তখন সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তৈলাভাবে দীপের ন্যায় এই দেহও তখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। লোক যেমন নিদ্রার অপগমে আর স্বপ্ন দেখে না, তেমনি, "সত্য বস্তু" সম্যক্ অবগত হইলে জীবও আর দেহ দর্শন করে না১৪।২০। জীব মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করিয়া দেহসম্বদ্ধ হয় এবং একমাত্র তত্ত্বচিন্তাবলে বিদেহ হইয়া শান্তি সুখ লাভ করে। হে রামচন্দ্র! অনাত্মা দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাই জীবের হৃদয়স্থ তমঃ, ইহাকে সূর্য্যাদির আলোক অপনীত করিতে পারে না। কেবল "আমি সর্ব্বব্যাপী, নিরঞ্জন ও নির্ম্মল চিন্মাত্রস্বরূপ" এইরূপ প্রকৃত আত্মবুদ্ধিরূপ আদিত্যের উদয়ে উহা (তমঃ) বিনষ্ট হয়২১।২৫। আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ অপরেও যাহা যেরূপে

ভাবনা করে, দৃঢ়তর ভাবনার বলে তাহা তদ্রূপেই দর্শন করে। হে রাঘব! মূঢ়জনেরাও দৃঢ় ভাবনার বলে বিষকে অমৃত এবং অমৃতকেও বিষ করিতে পারে। এ জগতে এই প্রকারে অর্থাৎ যাহাকে যেরূপে ভাবনা করা যায়, সেই গাঢ়তর ভাবনার বলে তাহা অবিলম্বে তদ্রূপত্ব লাভ করে। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এই দেহ সত্য বুদ্ধিতে দৃষ্ট হয় বলিয়াই দেহ, আবার অসত্য বা মিথ্যা ভাবে দৃষ্ট হইলে এই দেহই ব্রহ্মাকাশরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। হে সাধু রামচন্দ্র! তুমি অণিমাদি সিদ্ধির হেতুভূত জ্ঞানযোগ শ্রবণ করিয়াছ, এখন অপর যোগ শ্রবণ কর[২৬,২৮]।

জীব রেচক প্রাণায়ামাভ্যাস বশতঃ এই দেহ হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া পর দেহে স্থাপিত হইতে পারে। যেমন বায়ুমণ্ডল হইতে পুষ্পগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সংযোজিত হয় সেইরূপ। পরন্তু, সে সময় পূর্ব্ব দেহটী কাষ্ঠলোষ্টবৎ নিস্পন্দ অবস্থায় পরিত্যক্ত থাকে, বস্তুতঃ তখন তাহা পরকীয় দেহ। জীবাত্মারও তাহাতে কোনরূপ আদর থাকে না। অভিলাষানুসারে স্থাবর জঙ্গম যাহাই ভোগ করিতে ইচ্ছা করে; জীব তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়। এইরূপে, সিদ্ধির ফল সম্পৎ ভোগ করার পর পূর্ব্ব দেহ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে আইসে নতুবা অন্য দেহে ইচ্ছামত প্রবেশ করে[২৯,৩২]। অনন্তর সে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব জগতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করে। হে রামচন্দ্র! তখন যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন সেই ব্যক্তি নিত্য নির্দ্দোষ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমস্তই তৎক্ষণাৎ প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞগণ নিরতিশয় আনন্দকেই যথার্থ অবলম্বনীয় বলিয়া জানেন[৩৩,৩৪]।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

——()•()——

রাজকামিনী সেই চূড়ালা উক্ত প্রকার দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা যোগশক্তি লাভ করিয়া ছিলেন এবং তদ্বলে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্না হইয়াছিলেন। কখনও আকাশ পথে গমন করিতেন, কখনও সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেন, কখন বা পৃথিবীমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন, (তথাপি) গঙ্গাপ্রবাহের মত নির্লিপ্তা ছিলেন। যোগ বিশেষের দ্বারা ক্ষণকালও পতির বক্ষঃ ও হৃদয় বিযুক্তা হইতেন না, লক্ষ্মীর ন্যায় সমস্ত রাজ্যে ও জগতে বাস করিতেন। কখন বা বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় উজ্জ্বল ভূষণা হইয়া মেঘ মালার ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করিতেন, কখন বা গীর্বাণগণের সহ ভূতলে অবস্থান করিতেন। মুক্তার অভ্যন্তরে সূত্রের ন্যায় তিনি কাষ্ঠ, তৃণ, পাষাণ এবং ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতে অবাধে প্রবেশ করিতেন। সুমেরু শৃঙ্গে, ইন্দ্রাদি লোকপাল পুরে স্বর্গে ও ভূমির অভ্যন্তরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন। পশু, পক্ষী, পিশাচ, সর্প, দেবতা, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও সিদ্ধগণের সহিত তিনি ব্যবহার করিতেন[১০]। জ্ঞানামৃত লাভের জন্য বহুবিধ যত্ন সহকারে স্বামীকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতেন না। নৃত্যগীতাদি বিদ্যা নিপুণা মনোরমা চূড়ালা আমার গৃহিণী, রাজা চূড়ালাকে কেবল এইরূপেই জানিতেন। বালক যেরূপ বিদ্যার মহিমা বুঝে না, তদ্রূপ, রাজা তত কালেও তাদৃশ গুণশালিনী চূড়ালাকে বুঝিতে পারিলেন না। শূদ্রকে যেরূপ যাগ ক্রিয়া দেখাইতে নাই, তদ্রূপ, চূড়ালাও নিজের যোগ সিদ্ধি সেই রাজাকে প্রদর্শন করেন নাই[১১]।

রামচন্দ্র বলিলেন, প্রভো! মহাযোগসিদ্ধিশালিনী চূড়ালার যত্নেও যখন শিখিধ্বজের প্রবোধ হইল না, তখন অপরে কিরূপে বুঝিবে[১২]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! ব্যবস্থানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানই উপদেশের ফল। হে রাঘব! কারণ সকল কেবল শিষ্যগণের বিমল প্রজ্ঞার দ্বারা ফলবান্ বা সফল হইয়া থাকে[১৩]। পুণ্য সঞ্চয় অথবা

বেদাধ্যয়ন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সর্প যেমন সর্পপদ জানিতে পারে, সেইরূপ, আত্মাই জ্ঞেয় পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে[১৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে মুনিবর! গুরুপরম্পরায়, উপদেশই আত্ম-জ্ঞানের কারণ বলিয়া জগতে উল্লেখ আছে, তাহা হইলে ঐ কথার অর্থ কি[১৫]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, বিন্ধ্যারণ্যে অত্যন্ত কৃপণ এবং বহুধনধান্য সম্পন্ন এক বণিক বাস করিত[১৬]। একদা বন ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বণিকের নিকট হইতে এক কপর্দ্দক জঙ্গলমধ্যে নিপতিত হয়। অত্যন্ত কৃপণতা নিবন্ধন সেই বণিক সমস্ত বনের তৃণাদি অপসৃত করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। এই কপর্দ্দক হইতে চারিটী কপর্দ্দক হইবে, চারিটী হইতে অষ্ট, অষ্ট হইতে শত, শত হইতে সহস্র হইবে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিবা রাত্রি অনু-বরত তাদৃশী অবস্থায় সেই স্থানে দিবসত্রয় অতিবাহিত করিল। সামান্য কার্য্যের নিমিত্তও যদি অধ্যবসায় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতেই বহু ফল লাভ হইয়া থাকে[১৭,১৮]। দিবসত্রয়ান্তে সেই অরণ্য হইতে পূর্ণেন্দু সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক অমূল্য চিন্তামণি সে প্রাপ্ত হইল[১৯]। মণি লাভ করিয়া সানন্দ চিত্তে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত জগতের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি এইরূপ চিন্তা করিয়া শান্ত ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিল[২২]। অহোরাত্র অবিশ্রান্ত অক্লান্তভাবে পরি-শ্রম করিয়া কপর্দ্দক অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কিরাটের ভাগ্যে অমূল্য রত্ন লাভ ঘটিল[২৩]। বেদাধ্যয়ন দ্বারাই যে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে এরূপ কার্য্য কারণ নহে। কেহ বা অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হয়, কেহ বা গুরুক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৪]। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, বেদাদির অগোচর। হে অনঘ! তাই বলিতেছি, কিরূপে বেদোপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইবে[২৫]। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না, এ কথা সত্য; পরন্তু তৎপ্রাপ্তির জন্য নিজের দৃঢ় যত্ন করাও আবশ্যক। যেমন কপর্দ্দক অন্বেষণ বিনা চিন্তামণি লাভ হইতে পারে না[২৬]। অকারণও কখন কখন সকারণ হইয়া থাকে। যেরূপ কপর্দ্দক অনুসন্ধান করিতে করিতে চিন্তামণি লাভ হইল এই নিমিত্ত মহার্থ

তত্ত্বজ্ঞান গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও কখন কখন লাভ হইয়া থাকে। কেহ কেহ যত্নাতিশয়ে অন্বেষণ করে, কেহ বা সহজে ফল উপভোগ করিয়া থাকে[১৭,১৮]। কেহ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া থাকে, কেহ বা তাহার ফল ভোগ করে। এই নিমিত্ত এই জগৎ ভ্রমময় এই কথাই বলিতেছি[১৯]।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

চতুঃরশীতিতম সর্গ।

——()——

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, সন্তানাদি নষ্ট হইলে মনুষ্য যেমন শোকান্ধতমস দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অভিভূত হয়, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া বনমধ্যে আগমন করিলেন[১]। মনুষ্য যেমন অগ্নি শিখাকে সুখালিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে না, তিনিও সেইরূপ, দুঃখাভিভূত হইয়া সমুদায় মণিমানিক্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যকে অগ্নি শিখার ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন[২]। দুরাত্মা ব্যাধ হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া মৃগাদি যেরূপ নির্জ্জন গিরি প্রদেশে কিম্বা নির্ঝরিণী তটে কিম্বা নিভৃত গুহা প্রদেশে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তদ্রূপ, তিনিও অরণ্য প্রদেশে আগমন করিয়া শান্তি লাভ করিলেন[৩]। হে মানদ রামচন্দ্র! মহারাজা শিখিধ্বজ দেবতা ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণকে অত্যন্ত শ্লাঘনীয় গো ভূমি এবং হিরণ্যাদি দান করিয়াছিলেন[৪,৬]। তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত দুঃসহ চান্দ্রায়ণাদি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তীর্থ, বনপ্রদেশ এবং আয়তন (পুণ্যস্থান) সকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন[৭]। নিধ্যন্বেষী ব্যক্তি নিধিহীন ভূমি খনন করিয়া নিধি না পাওয়ায় যেমন অসন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজও কোন প্রকারে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না[৮]। সংসার ব্যাধি দূরীকরণাভিপ্রায়ে ঔষধ অন্বেষণের নিমিত্ত দিবা রাত্রি চিন্তা করিয়া দিন দিন কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন[৯]। রাজ্য বিষতুল্য, এইরূপ

চিন্তাপরায়ণ হইয়া দীন ও খিন্নচিত্ত হইয়া পুরোবর্ত্তী মহাবিভবও পরিলক্ষ্য করিলেন না[১০]। ইত্যবসরে এক দিবস চূড়ালা সমুপস্থিতা হইলে মহারাজ শিখিধ্বজ তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন[১১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমি বহু দিন রাজ্য ও বহু ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। এক্ষণে আমি তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া বন গমন করিতেছি[১২]। হে সুমধ্যমে! আমার তাহাতে দুঃখ বা সুখ, বিপদ বা সম্পদ, বিবেচনা করিতেছি না। বনবাসী মুনিদিগের সহিত এক্ষণে আমি ক্রীড়া করিতে অভিলাষ করিয়াছি[১৩]। দেশভঙ্গ, জনমোহ বা সংগ্রাম নিবন্ধন জনক্ষয় ইহাতে নাই। আমি বনবাসিমুনিদিগের সুখ রাজ্য-সুখ হইতে অধিক প্রিয়তর বলিয়া অনুভব করিতেছি[১৪]। কুসুমস্তবক যাহার পয়োধর স্বরূপ, রক্তপল্লব সমূহ যাহার পাণিতল, মঞ্জরীজাল সমাযুক্ত বিচঞ্চল অম্বুদ সমূহ যাহার অংশুক, পুষ্পপরাগ যাহার অঙ্গরাগ, কুসুম সমূহ যাহার ভূষণ, কাঞ্চনশিলা যাহার নিতম্বদেশ, মুক্তাকল্প তরঙ্গ-মালা সমাকুলা গিরিনদী সকল যাহার মুক্তামালা এবং মুগ্ধ মৃগকুল যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, স্বভাব সৌগন্ধ্য পূরিত ফল সমূহ যাহার ভোজ্য, ষট্‌পদশ্রেণী যাহার নয়নতুল্য, হে বরাননে! আমি এতাদৃশ রমণীয় বনভূমিতে যেরূপ শান্তি লাভ করিতে পারিব, আমি কৌমুদীরাশি পরিসেবিতা ব্রহ্মসদ্মকেও তদ্রূপ শান্ত্যাস্পদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না[১৫।২০]। অয়ি তনুমধ্যমে! তুমি আমার এই পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। কুলললনাগণ স্বপ্নেও পতির বাঞ্ছিত কার্য্যে বাধা প্রদান করেন না[২১]।

চূড়ালা বলিতে লাগিলেন, হে নরপতি! কাল প্রাপ্ত হইলেই কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। অকালে কৃত কার্য্য কখনই ফল প্রসব করে না। বসন্তকালে পুষ্প সঞ্জাত হইয়া থাকে এবং শরৎ কালে ফল প্রসব করিয়া থাকে[২২]। আধি ব্যাধি জরাযুক্ত দেহধারী গণের বনবাস আশ্রয় কর্ত্তব্য কিন্তু যুবগণ তাই বলিয়া বনবাসাশ্রয় করিবে, এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে[২৩]। হে মহারাজ! যৌবন কালে বনবাসাশ্রয় কর্ত্তব্য নহে। পুষ্প কুসুমদাম পরিশোভিত তরুরাজি যতদিন কুসুমিত থাকে, ততদিন স্বাশ্রয়েরই শোভাস্পদ হইয়া থাকে। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিই

বনবাসাশ্রয় করিবে। হংস সকল সরোবর হইতে যেমন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ, আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন[২৫।২৬]। হে নরবর! প্রজাপালন পরিত্যাগ করিয়া অযোগ্য কালে বনবাসাশ্রয় করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে। অকার্য্যানুষ্ঠানকারী নরপতিকে প্রজাকুল প্রতিরোধ করিবে এবং ভূমিপতিও অন্যায়াচরণ হইতে প্রজালোককে নিবারণ করিবেন, ইহাই বিধান[২৭]।

শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, অয়ি নীলেন্দীবর লোচনে! আমার অভিমত কার্য্যে তোমার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে অতিদূরবর্ত্তী বনবাসগামী বলিয়া জানিবে[২৮]। অয়ি অনবদ্যাঙ্গি! তুমি বালা, তোমার বন গমন বিধেয় নহে। পুরুষ হইতে কঠিন হইলেও বনবাস তোমাদের পক্ষে সুদুষ্কর[২৯]। যোষিৎ সকল কঠিন হইলেও বনবাসক্ষম হইতে পারে না। কারণ কাননে কুসুম মঞ্জরী সকল ঝঞ্ঝাবাতাদি সহ্য করিতে পারে না[৩০]। অয়ি সুশীলে! তুমি রাজ্যেই অবস্থান কর, পতি গমন করিলে কুটুম্বভার বহন করা স্ত্রীগণের ব্রত[৩১]।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, ইন্দুবদনা দয়িতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া মহারাজ শিখিধ্বজ দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত স্নানার্থ উত্থিত হইলেন[৩২]। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী সূর্য্যদেব সমস্ত জনস্থানাদি পরিত্যাগ করিয়া শিখিধ্বজের বনগমনের ন্যায় প্রজালোকের কার্য্যাদি হইতে অপসৃত হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন[৩৩]। ভবন বিনিষ্ক্রান্ত নরপতির অনুগামিনী চূড়ালার ন্যায় প্রভা সমূহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিল[৩৪]। গঙ্গাধরকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত গঙ্গাদেবী যেমন আগমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ, ধূলিধূসরিত অবনীমণ্ডলে শ্যামা যামিনী সমাগতা হইলেন[৩৫]। তমালতরুরাজি পরিশোভিতা যমুনা নদী কৌমুদী সমাকীর্ণা হইলে যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যাকালীন দীপমালার দ্বারা পরিশোভমানা হইতে লাগিল। সেই সময়ে রাজদম্পতী মেরু প্রদেশের অপর দেশ গমন করিতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া বোধ হইল যেন দিনশ্রী ও দিনপতি প্রমোদোদ্যান গমন করিতেছেন[৩৬।৩৭]। মাঙ্গলিক কার্য্যোদ্দেশে দিগ্বধূকরপল্লবাঞ্জলি প্রক্ষিপ্ত লাজ সমূহের ন্যায় তারকারাজি গগনমণ্ডলে সমুদিত হইতে লাগিল। শ্যামা পরিশ্রান্তা কুসুমহাসিনী চন্দ্রাননা কমলকোরক পয়োধরা যামিনী যেন

যৌবন দশায় উপস্থিতা হইলেন৩৮।৩৯। সাগর গর্ভে মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় চূড়ালার সহিত রাজা এক শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। গভীর রজনীযোগে জনপদ সমূহ নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিতে লাগিলে যখন প্রকৃতিদেবী নিস্তব্ধা হইলেন এবং রাজ্ঞী চূড়ালা কমলোদরে নিদ্রাভিভূতা ভ্রমরীর ন্যায় দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ তাঁহাকে সেই সময়ে পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রমণ্ডল রাহু নির্ম্মুক্ত হইলে কৌমুদী যেমন অল্পে অল্পে প্রসারিত হয়, সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল৪১।৪২। সুনির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট চঞ্চল উর্ম্মিমালা মণ্ডিত ক্ষীরসমুদ্র হইতে হরি যেমন উত্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, বধূবক্ষোর্দ্ধ সংযুক্ত শয্যা হইতে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন৪৫।৪৬। বীরধর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত আমি যাইতেছি, তুমি এই ব্রত অবলম্বন কর বলিয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য গমনে যাত্রা করিলেন। হে রাজলক্ষ্মি! আপনাকে নমস্কার, এই বলিয়া ভবন হইতে বিনিক্রান্ত হইলেন। সমুদ্রে যেমন নদ্যাদি গমন করে, তদ্রূপ, গ্রাম হইতে অরণ্যানী ও অরণ্যানী হইতে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন৪৭। ক্রমে ঘনান্ধকার সংশ্লিষ্ট ভূতগণ সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত জনশূন্য অরণ্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন৪৮।৪৯। সূর্য্যমণ্ডল অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে স্নানাদি পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার প্রভাত সমাগত হইলে গিরি নদী সকল উল্লঙ্ঘন করতঃ দূর বনে প্রবেশ করতঃ দ্বাদশ রাত্রি ঐরূপে অতিবাহিত করিলেন৫০।৫১। পরে জনদুর্গম ও অতিদূরস্থ জন কোলাহল বিবর্জ্জিত মন্দর পর্ব্বতের কানন ভূমি প্রাপ্ত হইলেন৫২। যে স্থানে জল প্রপাত সকল সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে, বাপীকূলস্থিত পাদপ সকল জল বেগভরে পরিচালিত হইতেছে এবং যে স্থানে ভূতপূর্ব্ব আশ্রম সকলের চিহ্ন সকল অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাণীবিবর্জ্জিত লতাবিতান সকল সিদ্ধচারণ গণের দ্বারা পরিসেবিত হইতেছে এবং বিটপীরাজি প্রাণ ধারণ যোগ্য ফল দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে, এতাদৃশ বন ভূমির অভ্যন্তর প্রদেশে আগমন করতঃ জলাশয় সেবিত ফল মূল দ্বারা সতত পরিসেবিত এক বিজন দেশে উটজ নির্ম্মাণ করিলেন৫৩।৫৭। মুমুক্ষু

বৈনবদণ্ড, ফল ভোজন পাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পুষ্পভাণ্ড, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, শীত প্রতিরোধক কন্থা ও মৃগাজিন ও তাপসযোগ্য অন্যান্য দ্রব্য সাম গ্রীও তথায় আনয়ন করিলেন[৭৯]। সন্ধ্যোপাসনান্তর প্রাতঃকালে জপবিধি অনুষ্ঠান, তৎপরে দ্বিতীয় প্রহরে স্নান ও পুষ্পাহরণ করিতে লাগিলেন[৮০]। পরিশেষে কিঞ্চিৎ মাত্র বনফল ও কন্দমূলাদি আহরণ করিয়া ভোজনান্তর সন্ধ্যাকালীন জপবিধি সমাপনান্তে নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন[৮১]। এইরূপে নরনৃপতি শিখিধ্বজ মন্দর পর্ব্বতের বিবিক্ত বন প্রদেশে স্বকীয় পর্ণোটজে অক্লিষ্ট হইয়া তপোবিধির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দিবস যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন[৮২]।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ শিখিধ্বজ বনবাসাশ্রয়ী হইলে, রাজ্ঞী চূড়ালা রাজভবনে যাহা করিলেন, তাহা বলি, শ্রবণ কর[১]।

গভীর যামিনীযোগে মহারাজ শিখিধ্বজ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে চূড়ালা ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় জাগ্রতা হইলেন[২]। শশি দিবাকর বিরহিত অম্বরের ন্যায় পতিবিরহিত শয্যা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইলেন[৩]। ক্ষারাদি সংযোগে লতা যেরূপ পরিম্লানা হইয়া থাকে, সেইরূপ, খেদযুক্তা নিরুৎসাহা এবং পরিম্লানা হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন[৪]। কুজ্ঝটিকাচ্ছন্না দিনশ্রীর ন্যায় অতি অপ্রসন্না ও বিমনায়মানা হইয়া উপবেশন করিলেন[৫]। ভাবিতে লাগিলেন, "রাজ্য কি কষ্টজনক!" প্রভু এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করিয়াছেন। এই গাঢ় চিন্তায় চিন্তিতা হইয়া চূড়ালা শয্যোপরি কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন করিলেন এবং এক্ষণে আমি কি করিব, আমিও

তাঁহার নিকট গমন করি। কারণ ভর্ত্তাই স্ত্রীর প্রধানা গতি, আর্য্যগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন[৬।৭]। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া পতির অনুগমন করিতে অভিলাষিণী হইলেন। পরে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে বনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন[৮]। বায়ুমার্গে যোগিনীগণ যেমন বিচরণ করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ সিদ্ধ যোগিগণের পক্ষে অদ্বিতীয় চন্দ্রপ্রভার ন্যায় গগনমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন[৯]। খড়্গাধর পতি যেখানে গমন করিয়াছেন, ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। অনন্তর রজনীযোগে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় নিজ পতিকে কোন এক বিবিক্ত প্রদেশে অবস্থান করিতে দেখিয়া গগনমার্গ হইতে ভর্ত্তার ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন[১১]। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে তাহাতেই সন্তোষ লাভ করে[১২]। চূড়ালা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমার স্বামীর এই প্রকারই ভবিতব্যতা। এই চিন্তা করিয়া তিনি প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। আমার গমনের আর প্রয়োজন নাই, আমি অবশ্যই অন্য এক সময়ে পতিপার্শ্বে শোভমানা হইব, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। চূড়ালা এই চিন্তা করিয়া পুনরায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রচূড়ের শিরোদেশে চন্দ্রকলা যেমন শোভমানা হইয়া থাকে, তদ্রূপ, তিনি পুনঃ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিতা হইলেন[১৩।১৪]। পরে কোন কারণ নিবন্ধন ভূপতি সম্প্রতি অন্যত্র গমন করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া পুরবাসিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন[১৫।১৬]। ক্ষেত্রপালিকা যেমন কালে ধান্য সকল রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ, তোমরা এক্ষণে রাজ্য রক্ষা করিতে যত্নপর হও[১৭]। এইরূপে মহারাজ শিখিধ্বজের বনবাসাশ্রমে এবং মহিষী চূড়ালার অন্তঃপুরমধ্যে মাস পক্ষ অয়ন সকল অতিবাহিত হইতে লাগিল[১৮।১৯]। অধিক কি, এই ভাবে প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল[২০]। মহাত্মা শিখিধ্বজ কথিতরূপে বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন মন্দর শৈলে সময়াতিপাত করিলে, চূড়ালা নিজ পতি সমীপে গমন করা কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া রজনীযোগে আকাশ মার্গে অধিরোহণ করিলেন। রত্নাদি দ্বারা বিভূষিতা না হইয়া বায়ু পথে গমন করিতে লাগিলেন[২১।২২]। পূর্ণেন্দুকৌমুদীবর্ণাভা সিদ্ধাভিসারিকাগণ নন্দনোদ্যানে নিজ প্রিয়তমের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ

ক্রীড়া করিতেছে, তাহাদের গাত্রসংস্পৃষ্ট উত্তম গন্ধাঢ্য চন্দন গন্ধরুষিত পবন চূড়ালার গাত্র সংস্পর্শ করিতে লাগিল[২৬।২৭]। আকাশমার্গে জ্যোৎস্নারাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মেঘান্তরালে বিদ্যুৎ সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন[২৮]। পতিবিচ্ছেদবিধুরা চূড়ালা পুনঃ পুনঃ এই সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন এবং আপনা আপনি খেদোক্তি করিতে লাগিলেন[২৯]। আমার স্বভাব শান্তি লাভ করিতেছে না, মনও অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। হে প্রণয়প্রবণ মৃগেন্দ্রস্কন্ধ! আমি আবার কবে তোমাকে সন্দর্শন করিব, মন আমাকে এইরূপেই উৎকণ্ঠিত করিতেছে। মঞ্জরীযুক্ত লতা সমূহ মহাবৃক্ষকে বেষ্টন করিয়াছে, আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া তোমার উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। সিদ্ধাভিসারিকাগণ নিজ নিজ পতি সহ প্রেমালাপ করিতেছে, আমি কবে তোমার সহিত বিবিক্ত প্রদেশে আলাপ করিব, এই চিন্তা আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এই মৃদুমন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছে, এই নির্ম্মল শশিকর সকলকে আমোদিত করিতেছে, এই বনরাজি শোভা পাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার উৎকণ্ঠা পরিত্যক্ত হইতেছে না। অরে নির্ব্বোধ মন! তুমি কেন বৃথা বিড়ম্বিত হইতেছ [৩০।৩৪]। হে সাধো! আকাশের ন্যায় নির্ম্মল তোমার বিবেক বুদ্ধি এক্ষণে কোথায়? অথবা হে সখে! যে তোমার ভর্ত্তা তুমি তাহারই জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইতেছ[৩৫]। অরে নির্ব্বোধ চিত্ত! তোমার উৎকণ্ঠা এখন বৃথা। আমার ভর্ত্তা এখন বৃদ্ধ, তপস্বী, কৃশ, এবং ভোগ বাসনা বর্জ্জিত। আমি বুঝিতেছি, ইঁহার সর্ব্বপ্রকার ভোগ বাসনার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে[৩৬।৩৭]। এখন ইনি একবস, একাত্মা, ইচ্ছাপরিহীন [৩৮]। আমার বোধ হইতেছে, আমার এই ভর্ত্তা এক্ষণে শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত। যাহাই হউক, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না, শীঘ্রই আমি ইঁহার তত্ত্বজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোমার সহিত যাবৎ প্রারব্ধ তাবৎ সংযোজিত করিয়া দিব। মতি অর্থাৎ জ্ঞান সমান হইলেই তোমার উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইবে। তখন আমরা পরম সুখে বাস করিব[৩৯।৪০]। আমার পতি যে চিন্তায় চিন্তিত আমিও এক্ষণে তাহার অনুষ্ঠান করিব। সমগ্র আনন্দ সমূহের তাহাই পরিণাম অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মানন্দ[৪২]। যাহাদিগের মনোবৃত্তি একজাতীয় তাহারাই সমাগম নিবন্ধন বিমলানন্দ

ভোগ করিয়া থাকে। চূড়ালা মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন[৪০]। নানা দেশ ও নানা নদ নদী সকল অতিক্রম করিয়া মন্দর পর্ব্বতের দর্শন লাভ করিলেন এবং নভোদেশে থাকিয়া অদৃশ্য আকারে বনান্তরে প্রবেশ করিলেন[৪৪]। পরে বনমধ্যে পর্ণোটজ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ধ্যানাবলম্বী নিজ পতিকে দেখিতে পাইলেন। জীর্ণ পর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ মেরুকান্তি কৃশাঙ্গ পতিকে সন্দর্শন করিলেন[৪৫,৪৭]। কজ্জলাম্বুভর ভৃঙ্গীর (শিবদূত) ন্যায় নিস্পৃহ ও চীরবাস পরিহিত বিবিক্ত প্রদেশে একাকী উপবিষ্ট নিজ পতিকে সন্দর্শন করিলেন। লম্বায়মান স্রজে কুসুমরাজি গ্রন্থনকারী নিজ পতিকে অবলোকন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পীবরস্তনী চূড়ালা কিঞ্চিৎ খেদগ্রস্তা হইয়া মনে মনে বলিলেন, যাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত নহে তাহারা কি মূর্খ[৪৮,৫০]। মূর্খতা নিবন্ধন আমার পতি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মীবান্ ইনি-ই সেই রাজা, যিনি আমার প্রিয় পতি[৫১]। মোহনিবন্ধন অদ্য এই অশোভন দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি অদ্যই এই স্থানে ইঁহাকে ভোগ ও মোক্ষ কি, তাহা নিবেদন করিব। কিন্তু এ অবস্থায় যাওয়া আমার যুক্তিযুক্ত নহে। আমি অন্যরূপে ইঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইব। যে হেতু আমি বালা, ইঁহার পত্নী, আমার কথা না শুনিলেও শুনিতে পারেন। এই নিমিত্ত তপস্বিবেশে ইঁহার সমীপে যাইয়া ইঁহাকে বুঝাইব। স্বামী এক্ষণে পরিপক্কমতি হইয়াছেন অর্থাৎ বুঝিবার পাত্র হইয়াছেন। এই বলিয়া দ্বিজবালক রূপে গগনমণ্ডল হইতে শিখিধ্বজ সম্মুখে উপনীত হইলেন। মহাত্মা শিখিধ্বজ সহসা অপূর্ব্বদৃষ্ট দ্বিজবালক সন্দর্শন করিলেন[৫২।৫৮]। ইনি বিগলিত কনকের ন্যায় গৌরবর্ণ, মুক্তা-হার বিভূষিত মূর্ত্তিমতী তপস্যার ন্যায় বনান্ত প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছেন[৫৯]। এক্ষণে শুভ্র যজ্ঞোপবীত পরিশোভিত শুক্লবাসযুগ পরি-হিত কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক শিখিধ্বজ নরপতির পুরোবর্ত্তী হইলেন[৬০]। আমণিবন্ধ (মণিবন্ধ=করমূল) মনোজ্ঞ দ্বিগুণিত অক্ষমালা দ্বারা পরি-বেষ্টিত দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত ভূমিতলে উপস্থিত ভ্রমরপরিব্যাপ্ত কমলের ন্যায় কুন্তলজালাবৃত অজিন বিশিষ্ট স্বশরীরোদ্ভূত অংশু মালার দ্বারা নবোদিত অর্কমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া কুন্তলপরিবেষ্টিত বদন এবং নিজ জ্যোতির দ্বারা মন্দর পর্ব্বত আলোকিত করিয়া দ্বিতীয়

চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন৬১,৬৩। বিজিতেন্দ্রিয় মনোজ্ঞ এবং শান্ত প্রকৃতি তথা ভস্মদ্বারা অলকাতিলকা মণ্ডিত, অতএব, সুমেরু শৃঙ্গে কজ্জলে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুনি কুমারকে অবলোকন করিয়া নরপতি শিখিধ্বজ গাত্রোত্থান করিলেন৬৪,৬৫। দেবকুমার মনে করিয়া পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, হে সুরকুমার! আপনাকে নমস্কার, এই আসনে উপবেশন করুন৬৬। এই বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিষ্টর (পত্রাসন) দেখাইয়া কুসুম পেলব দ্বিজ পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন। চন্দ্র কুমুদ খণ্ডের ন্যায় পাণি পল্লব দ্বারা হে রাজর্ষি! আপনাকে নমস্কার বলিয়া তিনিও প্রতিনমস্কার করিয়া বিষ্টরে উপবেশন করিলেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! হে মহাভাগ! আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন? আপনাকে যখন দর্শন করিলাম তখন আজ্ আমার দিন সফল হইল৬৭,৬৯। হে মানদ! এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই পুষ্প সকল গ্রহণ করুন, আপনার মঙ্গল হউক৭০।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! মহাত্মা শিখিধ্বজ এই বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্প ও মালা সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন৭১।

চূড়ালা বলিলেন, আমি নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আপনার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হই নাই৭২। হে অনঘ! আপনার এই প্রকার সুমধুর প্রণয়নিস্বনে আমি মনে করিতেছি, আপনি দীর্ঘজীবী হউন৭৩। এবং শান্তমনা হইয়া নির্ব্বাণ লাভের নিমিত্ত যে তপশ্চরণ করিতেছেন তাহার ফল অনতিবিলম্বে ফলিত হইবে, ইহাও আমি ভাবনা করিতেছি৭৪। হে সৌম্য! যখন আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই মহাবনে আগমন করিয়াছেন, তখন, অসি ধারার ন্যায় আপনার এই ব্রত (অতিতীব্র তপস্যা ব্রত) সাফল্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই৭৫।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! আপনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। লোকোত্তরী বুদ্ধির দ্বারা আপনি সমস্ত বুঝিতে পারিতেছেন। আপনার অঙ্গযষ্টি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বিনির্ম্মিত হইয়াছে, অথবা সমালোচনার প্রয়োজন নাই, স্থূল কথা, আপনাকে অমৃততুল্য অনুভব করিতেছি৭৬,৭৭। আমার সহধর্ম্মিণী এক্ষণে রাজ্য রক্ষা করিতেছেন, আপনার ন্যায় তাঁহারও অঙ্গযষ্টি এইরূপ সুন্দর

এবং শান্ত। আপাদ মস্তক আকৃতি মন্দার পুষ্পরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত। ভবদীয় বাহু শুভ্রাম্বুদরাশির দ্বারা আচ্ছন্ন মহীধর শৃঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে[৭৮।৭৯]। হে সুমনস্! আপনার কুসুমপেলব অঙ্গযষ্টি রবিকর দ্বারা ইন্দুকান্তির ন্যায় পরিক্লান্তি হইতেছে[৮০]। দেবকার্য্যের নিমিত্ত আমার এই সঞ্চিত পুষ্পরাশি আপনাতে অর্পিত হওয়ায় কৃতার্থতা লাভ করিল[৮১]। অদ্য অতিথি পরিচর্য্যার দ্বারা আমার জীবন সফল হইল। অতিথিগণ দেবতা হইতেও অধিক পূজার্হ হইয়া থাকেন[৮২]। এক্ষণে আপনি কাহার পুত্র? আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এস্থানে আগমন করিলেন? হে শশিমুখ! আমাকে বলিয়া সংশয়াপনোদন করুন[৮৩]।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, কোন্ ব্যক্তি এমন বিনীত প্রশ্নকারীকে বঞ্চনা করিয়া থাকে[৮৪]? শুনুন, একদা পুণ্যশীল শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন কর্পূর তিলকের ন্যায় দৃশ্য নারদ মুনি পর্ব্বত গুহাতে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সুরতরঙ্গিণী জলে অকস্মাৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি নদী তীরে আগমন করিয়া দেখিলেন, রম্ভা তিলোত্তমার ন্যায় সুবর্ণ পদ্মোপমস্তনবিভূষিত সুররমণীগণ পুরুষ বিবর্জ্জিত দেশে স্ব স্ব বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলকেলি করিতেছে[৮৫।৯০]। তিনি দেখিলেন, সুরললনাগণ লতা যেমন বৃক্ষকে অবলম্বন করে, তাঁহারা সেইরূপ, পরস্পর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, হেম প্রবাহের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণ বিশিষ্টা রমণীগণ যেন কাম-মন্দিরের স্তম্ভ বিনির্ম্মাণ করিতেছে। অথবা চন্দ্রকান্তি কামিনীগণ স্বকীয় লাবণ্য দ্বারা অমরোদ্যানের পরিখা সদৃশী মন্দাকিনীর (স্বর্গীয় গঙ্গার) লাবণ্যকে পরাস্ত করিতেছে। তাহারা পরস্পর নির্ভয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। তাহাদের পয়োধর সমূহ যেন পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা বিস্তার করিতেছে। আলুলায়িত কেশপাশ সকল অসংযত থাকায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমরশ্রেণীর শোভা অনুকরণ করিতেছে[৯১।১০০]। চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর এবং একত্র বহু সুরললনা গণের তাদৃশ সমাবেশ দেখিয়া মহাত্মা নারদ মুনির অন্তঃকরণ হইতে বিবেক বৃত্তি দূরীকৃত হইল এবং তাঁহার মন আনন্দে প্রমত্ত হইয়া

উঠিল। গ্রীষ্মাবসানে মেঘ হইতে জলধারা পতনের ন্যায়, অথবা ছিন্নশাখ বৃক্ষ হইতে রসস্রাবের ন্যায়, তাঁহার দেহ হইতে দেহসার শুক্র ক্ষরিত হইল। এই সময়ে তাঁহাকে কুজ্ঝাটিকাচ্ছন্ন শশাঙ্কের ন্যায় অথবা দ্বিধাকৃত মৃণাল তন্তুর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল[১০১,১০৪]।

মহারাজ শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, বহুজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, নিষ্পাপ, নিরভিলাষ, এবম্ভূত গুণসম্পন্ন নারদ মুনিও কি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন নাই[১০৫,১০৬]?

চূড়ালা বলিলেন, হে রাজর্ষি! এই ত্রিভুবন মধ্যে সমস্ত ভূতজাতি, এমন কি দেবতারাও স্বভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না[১০৭,১০৮]। এই জগৎ সুখদুঃখময়; যাহাতে যাহার তৃপ্তি সে তাহারই বশ্য হয়। কেহবা দীপালোক দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ আলোক মাত্র দেখিয়া, কেহবা চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা সুখ অনুভব করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ক্ষুধাদির দ্বারা দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন[১০৯,১১০]। নির্ম্মল সত্য বিস্মৃত হইলে অন্ধকার দ্বারা আকাশের ন্যায় স্বভাব কর্ত্তৃক চিত্ত কলুষিত হইয়া থাকে[১১১]। বর্ষা কালের মেঘ যেমন আনন্দ বিধান করে, তদ্রূপ, চিত্তাকর্ষক পদার্থের দ্বারা লোকের উল্লাস জন্মিয়া থাকে[১১২]। মণি প্রভৃতির আভার দ্বারা শুভাশুভ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কারণ মণি স্ব প্রভাবে পুরোবর্ত্তী পদার্থগণের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া থাকে[১১৩,১১৬]। নারদ মুনি জীবন্মুক্ত হইলেও তাৎকালিক তাদৃশ বোধে অভিভূত হওয়ায় সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১১৭]। পদার্থের উপর বুদ্ধির দৃঢ়তা জন্মিলে বুদ্ধি তদ্বিষয়েই পরিচালিত হইয়া থাকে। যেমন কুঙ্কুম নষ্ট হইলেও বস্ত্র তাহার অনুরঞ্জন ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ, মূঢ় ব্যক্তিরা বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না। জীব সেই সেই রূপেই বন্ধ ও মুক্তির হস্তে পতিত হয়। যিনি বিষয়ানুরাগ বশতঃ বিষয় বুদ্ধির অনুগামী হন তিনি বদ্ধ হইয়া থাকেন আর যিনি বিষয়ে বিরাগ প্রদর্শন করেন, বিষয় যাহাকে রঞ্জিত করিতে পারে না, তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন[১১৮,১১৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, সুখ দুঃখের উৎপত্তি কিরূপে হয় তাহা আমাকে বলুন। হে প্রভো! আপনি এই বিষয়টী বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ময়ূরগণ মেঘ দর্শনে অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে, আমিও

সেইরূপ আপনার এই সকল উদারার্থ এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছি[১২০।১২১]।

চূড়ালা বলিতে লাগিলেন, সুখের প্রকৃত উৎপত্তি নাই। কেননা তাহা আত্মার অন্তর্গত। তবে তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব লইয়াই উৎপত্তি অনুৎপত্তি কথা প্রচলিত আছে। সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব বুদ্ধির আবির্ভাবাদি ঘটিত। শরীর, চক্ষু এবং হস্তাদির দ্বারা নিকটস্থ ও শব্দ অনুমানাদির দ্বারা দূরস্থ হৃদ্য পদার্থ অনুভূত হইলে স্বাত্মসুখানভিজ্ঞ হৃদ্‌গত বুদ্ধিতত্ত্ব উল্লসিত হয় এবং তদনুক্রমেই জীব আপনাকে সুখী বিবেচনা করে। শরীরের জীবের সঞ্চরণ নাড়ী পথ একরূপ নহে, তাহা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন। সুতরাং সুখভোক্তা জীব বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। লোকেও দেখা যায়, এক জন যাহাতে সুখ বোধ করে, অন্যে তাহাতেই দুঃখ বোধ করে। সুখের ন্যায় শান্তি পক্ষেও এইরূপ প্রণালী। জীব যাহাকে যে পরিমাণে শান্তির আশ্রয় বলিয়া মনে করে, তাহা হইতে সেই পরিমাণেই শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যে যাহা হইতে যে পরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে তাহা হইতে সে সেই পরিমাণে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখ এবং দুঃখ বদ্ধ জীবের পক্ষে, মুক্ত জীবের পক্ষে নহে। সুখ দুঃখের অভাবই মোক্ষের হেতু, বিধতা ইহাই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুখ এবং দুঃখ সকল ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহ ও অনিগ্রহ নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে[১২২।১৩০]। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব শান্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ততক্ষণ সে সুখ ভোগ করিতে থাকে। সমুদ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া থাকে, তদ্রূপ, জীবও সুখ প্রাপ্তে উল্লসিত হইয়া থাকে। আপাত-মধুর সুখোৎপাদক অর্থাদির বিনাশ হইলে আমিষলোভী মার্জ্জারের ন্যায় জীবকে ক্ষুব্ধ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞতাই তাহার কারণ। শুদ্ধ বোধের দ্বারায় জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে[১৩১।১৩৩]। যাহার সুখ দুঃখ বোধ নাই, তিনিই সৌম্যতা অর্থাৎ বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারেন[১৩৪]। জীব সকল যদি অভিহিত প্রকারে প্রবুদ্ধ হয় তাহা হইলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে[১৩৫]। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে, চিদাকাশ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, জীব তখনই শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩৬]। তৈলহীন প্রদীপ্ত

ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সুখাদিরূপ স্নেহ সংক্ষয় হইলেও জীব স্নেহবিহীন প্রদীপের ন্যায় শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩৭]। দ্বৈতভাব দূরীকৃত হইলে সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ঘটাকাশ পটাকাশ সমস্তই এক, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইলে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না[১৩৮]। ক্ষুব্ধ হইবে কেন? হইবার কারণ নাই। কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অর্থাৎ দ্বৈত বোধ রহিত হইলে তখন জীবত্বও শূন্য হইয়া যায়। প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভ। তিনিই প্রথমে অহং আমিত্ব বোধের বশ্য হইয়া সংসারী হয়, পরে আবার তিনি নাহং বোধের দ্বারা মুক্ত হন। সুতরাং অদ্যাপি বর্ণিত প্রকারের ভ্রম অক্ষুণ্ণ পথে চলিতেছে[১৩৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবপুত্র! জীব সুখসঞ্চরণ যোগ্য নাড়ী পথে বিচরণ করিলেও, তদুপলক্ষে নারদের বীর্য্য ক্ষরণ কিংবিধ ক্রমে হইয়াছিল?

চূড়ালা বলিলেন, স্ত্রীকায়া দর্শনে পূর্ব্বের রাগসংস্কার (স্ত্রী সম্ভোগ জনিত সুখানুভবের সংস্কার) উত্তেজিত হয়, তদ্বশে জীব চঞ্চল হইয়া পড়ে। জীব চঞ্চল হইলেই শরীরস্থ প্রাণ প্রভৃতি বায়ু বিচলিত হয়, তাহাতেই মজ্জাসার চরম ধাতু শুক্র শিরাপথে অধোগমন করে। যেমন বায়ুর চালনায় পুষ্পাদির সৌগন্ধ স্থানচ্যুত হয়, মেঘবৃন্দ হইতে বারি বহির্গত হয়, সেইরূপ[১৪০-১৪৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ভাব অভাব ও পদার্থের গতি অগতি সমস্তই জানেন। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, স্বভাব কাহাকে বলে, স্বভাব শব্দের অর্থ কি?

চূড়ালা বলিলেন, সৃষ্টির প্রথমে যে পদার্থ যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল, যে বস্তু যদ্গুণসম্পন্ন হইয়াছিল, পুনঃ প্রলয় পর্য্যন্ত সে সকল সেইরূপে সম্পন্ন হওয়ার নিয়মটী স্বভাব শব্দের অর্থ। এখন যে ঘটপটাদি পদার্থের স্বভাববৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, ইহারও মূল প্রাগুক্ত নিয়ম, পরন্তু তুমি স্বভাবকেও মায়া বিশেষ বলিয়া জানিবে[১৪৪-১৪৬]।

বর্ণিত লক্ষণ স্বভাব এই জগতে রূঢ় রহিয়াছে। ইহারই অধীনে চতুর্ব্বিধ প্রাণী ভ্রান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন প্রাণী জ্ঞানী ও ক্ষীণ বাসনা হইয়া পুনর্জ্জন্ম বর্জ্জিত হইতেছে এবং কেহবা অজ্ঞান দেহী থাকিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতেছে[১৪৭]।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম সর্গ।

—()০()—

চূড়ালা বলিতে লাগিলেন, এই পরিদৃশ্যমান্ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্ম-স্বভাব বশতঃ সৃষ্ট হইয়াছে এবং বাসনার দ্বারা সংস্থান প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুগুণে পরিচালিত হইতেছে। হে মুনিবর! ত্যাগাভ্যাস দ্বারা ভোগবাসনা হ্রাস হইলে জীবের জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভাবও তাহাকে আক্রম করে না, আমরা এইরূপ অনুভব করিয়া থাকি[১।২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বাগ্মিপ্রবর! আপনার এই উদারার্থসম্পন্ন যুক্তিপরিপূর্ণ অনিহতার্থ (অনিহত=অব্যর্থ) গূঢ়ার্থব্যঞ্জক এবং অপূর্ব্বার্থ-প্রতিপাদক বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি[৩]। হে প্রিয়দর্শন! অমৃত পান করিলে আত্মা যেরূপ শীতলতা অনুভব করে, আপনার এই অর্থসম্পত্তিশালী বাগমৃত পান অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া আমিও তাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়াছি। অতএব, আপনি সত্বর আপনার জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন। জ্ঞানগর্ভ বাক্যরাজি আমি যত্নের সহিত শ্রবণ করি[৪।৫]। পদ্মযোনি ব্রহ্মার আত্মজ মহাভাগ নারদ কিরূপে নিজ স্খলিত বীর্য্য রক্ষা করিলেন, এবং অবশেষে তাহা কি হইল? তৎ সমুদায় আপনি কীর্ত্তন করুন[৬]।

চূড়ালা বলিলেন, মদমত্ত মাতঙ্গকে যেমন রজ্জুর দ্বারা সুবৃহৎ আলানে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ, দেবর্ষি নারদ আপনার প্রভূত বিবেকরূপ আলানে অনপায়িনী বুদ্ধিরূপ রজ্জুর দ্বারা মনোরূপ হস্তীকে দৃঢ়তররূপে সংযত করিয়া, প্রলয়কালীন অগ্নিরাশির ন্যায়, বিগলিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, অথবা গলিত পারদাদি ধাতু রসের ন্যায়, সেই স্খলিত বীর্য্যকে পার্শ্বস্থিত স্ফটিকনির্ম্মিত কুম্ভের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় স্বীয় বীর্য্য রক্ষা করিলেন। সেই কুম্ভ অতি দৃঢ় ও গভীর এবং তাহা প্রস্তরা-ঘাত সহ্য করিতেও সমর্থ। বিধি যেমন অমৃতের দ্বারা অম্বোধি সকল

(জলরাশির) পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তদ্রূপ, মহাত্মা নারদ মুনিও নিজ বীর্য্যের দ্বারা সেই কুম্ভ পরিপূর্ণ করিলেন[১]।[১১]। কিছু দিন ঐরূপে অতিবাহিত হইল। পরে মুনিবর নারদ স্বকর্ত্তব্য হোমাদি বিধানে অনবধান হইলে সেই কুম্ভমধ্যে সেই বীর্য্যে জীব সঞ্চার হইল। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে যেমন পত্রাবলী ও ফুল্ল কুসুমদলের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ, যথাকালে সেই কুম্ভমধ্যগত গর্ভ হইতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুক্ত শিশুর জন্ম হইল। কুম্ভ হইতে জন্ম হওয়ায় শিশুর নামও কুম্ভ হইল [১২,১৪]। পরে সেই শিশু কতিপয় দিবস মধ্যে শুক্লপক্ষে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল[১৫]।[১৮]। একটী ভাণ্ড হইতে অপর ভাণ্ডে যেমন দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে পারা যায়, মহামুনি নারদ সেইরূপ নিখিল সংস্কার সম্পন্ন সেই বালকের উপর সমস্ত বিদ্যা আধান বা অর্পণ করিলেন। পরে এই অর্ভক অল্পদিবস মধ্যেই নিখিল বাঙ্ময়শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিলেন এবং মহামুনিও এই বালককে নিজ প্রতিবিম্বের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন। (অর্থাৎ সর্ব্বদা তিনি তাঁহাকে সন্নিকটেই রাখিতেন) ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যে, যেন সায়ন্তনীন শশধর রত্নরাজিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। একদা মহাত্মা নারদ নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ নিজ পিতৃদেব ভগবান্ চতুরাননকে অভিবাদন করিলেন। প্রজাপতি নিখিল শাস্ত্রবিৎ এবং কৃতাভিবন্দিত নিজ পৌত্রকে অতীব সাদরে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিলেন[১৯]।[২০]। কমলযোনি তাঁহাকে আশির্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী হইলে এবং তুমি আজ্ হইতে কুম্ভ নামে আখ্যাত হইবে[২১]।

কুম্ভ কহিলেন, আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র, মহাত্মা নারদ মুনির পুত্র এবং আমারই নাম কুম্ভ। অর্থাৎ সেই কুম্ভই আমি। * আমি পিতার সহিত সেই অনন্যসাধারণ ব্রহ্মলোকে বাস করি[২২]।[২৩]। চতুর্ব্বেদ আমার লীলার সামগ্রী, আমার মাতৃভগিনী গায়ত্রীদেবী এবং আমার জননী স্বয়ং সরস্বতী[২৪]।[২৫]। আমি কামকারী হইয়া অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে পারি। আমি লীলার দ্বারা পরিপূর্ণ হই-

---

* চূড়ালা অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানরতা, সমস্তই তাঁহার আত্মভূত, সুতরাং তাঁহার পক্ষে "আমি কুম্ভ" এ উক্তি মিথ্যা নহে।

লেও কাহারও কর্ম্মের দ্বারা উদ্ভূত নহি। ধরামণ্ডলে আমার পাদপীঠ নিপতিত বা সংলগ্ন হয় না এবং রজস্পৃষ্ট হইলেও আমার অঙ্গ সকল ম্লান বা গ্লানিজনক হয় না। আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি এবং আপনাকে আমার সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলাম[২৬।২৭]।

ভগবান্ বাল্মিকি বলিলেন, মুনিবর ঐরূপ কহিলে ভগবান্ মরিচিমালী অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলেন। তদ্দর্শনে সমাগত তপস্বিবর্গ সায়ংকালীন হোমাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের উদ্দেশে সভা হইতে উত্থিত হইলেন, পরে সকলে স্নানার্থ গমন করিলেন। অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাতে পুনঃ সভা ও কথারম্ভ হইল[২৮।২৯]।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমার পুণ্য প্রভাব বশতঃ প্রভূত বায়ুচালিত জলধর পটলের ন্যায় আপনি এই পর্ব্বতে প্রেরিত হইয়াছেন। অদ্য আমি ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য হইয়াছি। যে হেতু আপনার এই অমৃত নিস্যন্দিনী বাণীপরম্পরা আমি শ্রবণ গোচর করিলাম। সাধু সমাগম লাভ করিলে আমি যেরূপ আনন্দিত হই, রাজ্য লাভ করিলেও আমি তাদৃশ বিমলানন্দ লাভ করিতে পারি না। যে স্থানে অনন্ত সুখ সামান্য কারণে বিজৃম্ভিত হয়, সে স্থানে বিষয় সুখের কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র[১।৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভূপতির এবম্বিধ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ গোচর করিয়া দ্বিজবালকরূপিণী চূড়ালা পুনরায় কহিতে লাগিলেন। এ সমস্ত কথায় আর, প্রয়োজন নাই, আপনি কি নিমিত্ত এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন এবং কত দিবসই বা এখানে আসিয়াছেন, আনুপূর্ব্বিক

সমস্ত বিবরণ কীর্ত্তন করুন। হে মহাভাগ! তপস্বী ব্যক্তিরা কথা প্রবঞ্চনা দ্বারা অন্যকে মুগ্ধ করেন না। অথবা মিথ্যা কথা বলাও তাঁহাদের অভ্যস্ত নহে[৫।৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবপুত্র! আপনি যখন সমস্ত লোকরহস্য অবগত আছেন, তখন আমার বিষয়ও অবশ্য অবগত আছেন। আমি সংসার ভয়ে ভীত হইয়া এই বনান্তরে আগমন করিয়াছি, আমার নাম শিখিধ্বজ। আমি দেখিতেছি, জীব সকল জন্মের পর জন্ম দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ ভোগ করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্ত আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই বনবাস আশ্রয় করিয়াছি ৮।১০। নির্দ্ধন ব্যক্তি একটী অমূল্য রত্ন পাইয়াও যেমন শান্তি লাভ করিতে পারে না, আমিও তদ্রূপ, তপস্যার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে মহাভাগ! আমি তপস্যার নিমিত্ত অযত্নেই হউক অথবা কোন প্রকার ফলোৎপাদন না হয় এ রূপেই হউক, মূল ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় এই বনে বাস করিব। আমি দুঃখ হইতেও দুঃখ লাভ করিয়া যদি তপশ্চরণানুষ্ঠান না করিতে পারি তবে অমৃতও আমার পক্ষে বিষতুল্য হইবে[১১।১৪]।

তখন চূড়ালা কহিতে লাগিলেন, আমি একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলাম, হে প্রভো! জ্ঞান ও ক্রিয়া এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বিশেষ মঙ্গলপ্রদ আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

চতুরানন কহিলেন, জ্ঞান-ই পরম বস্তু, ইহাই কৈবল্য লাভের এক মাত্র উপায়। কেবল কালাতিবাহন ও চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান। হে পুত্র! যাহাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি নাই, ক্রিয়াই তাহাদের এক মাত্র আশ্রয়। কারণ যাহার পট্টবস্ত্র নাই সে কি কখনও কম্বল পরিত্যাগ করিয়া থাকে[১৫।১৭]? অজ্ঞ ব্যক্তিরা বাসনা চরিতার্থ হইলেই ক্রিয়া সফল জ্ঞান করে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বাসনা সংক্ষয় হইলে সমস্ত ক্রিয়াই অফল অনুমান করেন[১৮]। লতা সকল ফল ধারণ করিলেও যদি জলসেক প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহা যেমন অশুভ ফলদায়িনী হইয়া থাকে, সেইরূপ, বাসনা থাকিলে সমস্ত ক্রিয়াই অফলা বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন এক ঋতুর অবস্থান কালে অন্য ঋতুর সত্তা উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ, বাসনার নাশ হইলে ক্রিয়া সকল অফল বলিয়া অনুমিত

হইয়া থাকে। হে সৌম্য! শরলতা (শর এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ) যেমন প্রকৃতি অনুসারে কখনও ফল প্রদান করে না, সেইরূপ, ক্রিয়া সকল অজ্ঞানীর ফল উৎপাদন করে না। বালক যেমন যক্ষ চিন্তা করিয়া কেবল যক্ষ দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও বাসনা বদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বহু আড়ম্বরযুক্ত হইলেও ক্রিয়া বহু ফল প্রদান করে না। কাশ লতা কেবল মাত্র ফুলই প্রসব করিয়া থাকে, কখনও ফল উৎপাদন করে না[১৯,২৩]। অতএব, অহঙ্কারাত্মিকা বাসনা বিশুদ্ধা থাকিতে পারে না। মরুপ্রদেশে যেমন সমুদ্রের উৎপত্তি হইতে পারে না সেইরূপ[২৪]। সমস্ত ব্রহ্মময়, এই চিন্তার দ্বারা যাঁহার মূর্খতা অপনোদন হইয়াছে, সেই সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে মরুভূমিতে সমুদ্রের উৎপত্তির ন্যায় বাসনার উৎপাও হয় না[২৫]। বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই জীব পুনর্জ্জন্ম রহিত হয় এবং জরা মরণ বর্জ্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৬]। বাসনাযুক্ত চিত্তই মন এবং বাসনা রহিত হইলেই মন জ্ঞান নামে কথিত হয়। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম বস্তু জানিতে পারিলেই জীব পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে না[২৭]।

চূড়ালা বলিলেন, জ্ঞানই একমাত্র মঙ্গলময়, ব্রহ্মাদি দেবগণও এইরূপ কহিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি কি নিমিত্ত অজ্ঞানতা ভজনা করিতেছেন[২৮]? হে মহীপাল! আপনি এই দণ্ড, এই কন্থা, এই কমণ্ডলু, এই প্রকার অনর্থ চিন্তায় কি নিমিত্ত ক্লিষ্ট হইতেছেন[২৯]? আমি কে এবং কোথা হইতে জন্ম হইয়াছে? এবং ইহা কোথায় শেষ পাইবে? তাহাই চিন্তা করুন। মহারাজ! ঐ সকল বৃথা চিন্তা করিয়া কি নিমিত্ত খিন্ন হইতেছেন[৩০]? কি করিলে বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং কি উপায়েই বা অপবর্গ মার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সকল চিন্তা করিয়া যাঁহারা সংসার সমুদ্রের পরতীর গমন করিয়া চিন্ময় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, কি নিমিত্ত তাঁহাদের পদানুসরণ করিতেছেন না[৩১]? শিলাকীটের ন্যায় কেবল ব্রতোপবাস দ্বারা আপনি কি এই বনমধ্যে কালাতিবাহিত করিবেন[৩২]? যাঁহারা তত্ত্বদর্শী ও সাধু, তাঁহাদিগের সহিত বিশ্রম্ভালাপ এবং সজ্জন সেবার দ্বারা জীব পরমা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩৩]। অতএব, আপনি পুণ্যশীল সাধুদিগের সমাগম লাভ করতঃ স্তব্ধকীটের (স্তব্ধকীট=নিশ্চল নিস্পন্দ এক প্রকার

জীব) ন্যায় জীবনকে অতিবাহিত করুন[৩৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, প্রাণানন্দদায়িনী দেবকন্যার ন্যায় চূড়ালা কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া মহারাজ শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন[৩৫]। হে দেবসুত! অদ্য আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আমি এক্ষণে সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছি যে, আর্য্যসমাগম-ই এক মাত্র অপবর্গ মার্গ প্রাপ্তির উপায়। হে অনঘ! আমি অদ্য সমস্ত পাপরাশি হইতে পরিমুক্তি লাভ করিয়াছি। অন্যথা আপনি কি নিমিত্ত আমাকে এবম্ভূত উপদেশ প্রদান করিবেন[৩৬,৩৭]। আপনি আমার পূজনীয় গুরু। হে শুভানন! আপনি শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন[৩৮]। হে অনিন্দিত দেহ! আপনি যে সকল উদারার্থ যুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতেই আমি পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়াছি এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপদেশ বলিয়া সে সকলকে অনুভব করিতেছি[৩৯]। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান আছে। তর্কোপন্যাস দ্বারা জ্ঞানের বহু বিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি যে জ্ঞান একমাত্র কৈবল্য প্রদান করিতে সমর্থ, সেই জ্ঞান কিরূপ তাহা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন[৪০]।

চূড়ালা বলিলেন, মহারাজ! যাহা অতিশ্রদ্ধেয় এবং আর্য্যগণের নিকট সমীচীন, আপনাকে আমি সেই সমস্ত কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন[৪১]। অনাস্থা সহকারে বাক্ বিন্যাস করিলে অন্ধকারে অক্ষবেত্তার অক্ষদর্শন চেষ্টার ন্যায় তাহার বাক্য সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে[৪২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বেদ বিধির ন্যায় আপনা কর্ত্তৃক অবগত এই বাক্যপরম্পরা আমার সম্বন্ধে অবিচারিত ভাবেই থাকিবে, অর্থাৎ কুতর্কগ্রস্ত হইবে না, ইহা আমি আপনাকে সত্য করিয়া কহিতেছি[৪৩,৪৪]। আপনার বাক্য সকল আমার পক্ষে অতীব শ্রেয়স্কর। আমি অনন্যচিত্ত হইয়া এ সকল অনুভব করিতেছি[৪৫]।

চূড়ালা বলিলেন, আমি আপনাকে ভবভয় নাশন এবং অতি শ্রেয়স্কর মোক্ষপদপ্রদায়ক এক উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন[৪৬,৪৭]।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

—০—

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

——()•()——

চূড়ালা বলিলেন, পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব হইলেও সমুদ্র যেমন বড়বানল ও অম্বুরাশির আধার, সেইরূপ, বিবিধ গুণসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী পরস্পর বিরুদ্ধ ধৈর্য্য ঔদার্য্য বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীমান পুমান্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন[১]। তিনি কলাবিদ্যা বিশারদ, অস্ত্রবিৎ এবং ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ও অতি বিচক্ষণ এবং সঙ্কল্পিত কার্য্য নিঃশেষে সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু বাসনা বহুল থাকায় তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ছিল না[২]। বড়বাগ্নি যেমন সমুদ্র জল শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ, তিনি অতি আয়াসসাধ্য চিন্তামণি সংসাধনে সুদুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি তীব্র তপস্যার ফলে অচিরকাল মধ্যে চিন্তামণি সিদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যে হেতু উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তি যদি সমবায় প্রাপ্ত হয়, তবে, তাহাদের কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য থাকে না। অকিঞ্চন ব্যক্তিও সুদুষ্প্রাপ্য ফলাহরণে সমর্থ হয়[৩।৪]। সুমেরু শৃঙ্গাগ্রভাগে নবোদিত শশিকলার ন্যায় নিকটস্থ মণি তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তিনি চিন্তামণি ইহা বাস্তবিক বটে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহপরবশ হইলেন। অতি দীনদরিদ্র ব্যক্তি অকস্মাৎ রাজ্য পাইলে সে যেমন তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, তদ্রূপ, তিনিও মণি সিদ্ধি বিষয়ে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত এই মণি চিন্তামণি কি না, এবং স্পর্শ করিলে যদি ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, ইত্যাকার বহু সংশয় তাঁহার মনোমধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। পারলৌকিক ক্রম যেমন জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ, তিনি অত্যল্প কালের মধ্যে মণি সিদ্ধ হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না[৭।১০]। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভ্রম বশতঃ লোকে যেমন চঞ্চল লতায় সর্প দর্শন করে, চন্দ্র এক হইলেও যেমন দুইটী বলিয়া প্রতীত হয়,

তদ্রূপ, আমিও ভ্রান্তিজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া এই মণি সন্দর্শন করিতেছি[১১]। আমার এমন কি সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে যে, আমি এই অত্যল্প কাল মধ্যেই সেই দুরারাধ্য মণি প্রাপ্ত হইব[১২]। যাঁহাদিগের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন এবং প্রভূত তপোবল আছে, তাঁহারাই সেই দেবদুর্লভ বস্তু লাভ করিতে পারেন[১৩]। আমি অতি অভাজন এবং আমার তপোবল অতি সামান্য, সুতরাং আমি কখন চিন্তামণি লাভের যোগ্য হইতে পারি না। এইরূপ স্থির করিয়া মূর্খতা নিবন্ধন তিনি সেই মণি পরিত্যাগ করিলেন[১৪।১৫]। অজ্ঞান অবস্থায় যদি শর ত্যাগ করা যায় তাহা হইলেও যেমন শর ধনুকের জ্যা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, চিন্তামণি, অবমাননাকারী সেই পুরুষের নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও যদি উপস্থিত সিদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অতিশয় সহায়শূন্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১৬।১৭]। কিন্তু পুমান্ পুনরায় মণি লাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যে হেতু অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি সকল ব্যর্থমনোরথ হইলেও কখন পশ্চাৎপদ হন না[১৮]। কিছু কাল অতীত হইলে তিনি অখণ্ড এক খণ্ড কাচ সন্দর্শন করিলেন। ভ্রমান্ধ ব্যক্তি মৃৎপিণ্ডে যেমন স্বর্ণরূপ সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, তিনি সেই কাচ খণ্ডকে চিন্তামণি বিবেচনা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন[১৯]। মনুষ্যের মোহ উপস্থিত হইলে তাহারা ষষ্ঠে অষ্ট, শত্রুকে মিত্র, সর্পে রজ্জু, জলে স্থল এবং এক চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র ভাবনা করিয়া থাকে[২০।২১]। পরে তদ্গ্রহণের পর ভাবিতে লাগিলেন, দেশই বা কি বন্ধুবর্গই বা কি, এই মণি হইতে আমি সর্ব্ব সম্পদ লাভ করিতে পারিব। অতএব, বন্ধুবর্গে বা দেশে আমার প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্বসম্পৎশালী হইয়া দূর দেশে বাস করিব। এই চিন্তা করিয়া নিবিড় অরণ্য প্রদেশে গমন করিলেন[২৩।২৪]। অতঃপর তিনি স্বাভিলষিত স্থানে গমন করিয়া মূর্খ ব্যক্তি যেমন বিপদরাশি সন্দর্শন করে, তদ্রূপ, তিনি বিপদ সাগরে পতিত হইলেন[২৫]। জরা মরণে যে দুঃখ হয় না, অজ্ঞতা নিবন্ধন ততোধিক দুঃখে তিনি নিপতিত হইলেন। যেমন কেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ হইলেও মস্তকের উপর শোভা পায়, তদ্রূপ, তাঁহার গুণরাশি থাকিলেও অজ্ঞতা নিবন্ধন বহু অনর্থ সজ্ঘটিত হইল[২৭]।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একোননবতিতম সর্গ ।

——()•()——

চূড়ালা বলিলেন, আর একটী অতি রমণীয় কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিন্ধ্যারণ্যে এক যূথপতি হস্তী বাস করিত। অগস্ত্য ঋষির আজ্ঞায় অদ্রিবর বিন্ধ্যাচল যেমন স্থির ভাবে ছিলেন, তদ্রূপ, বজ্রাগ্নি সদৃশ তেজঃ সম্পন্ন এবং সুমেরু উৎপাটনে সমর্থ দন্তদ্বয়ে পরিশোভিত সেই মহাকায় বারণ হস্তিপকের শাসনে স্থির ভাবে বাস করিত। ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক বলি যেমন বদ্ধ হইয়াছিলেন অথবা মুনীন্দ্র অগস্ত্য কর্ত্তৃক বিন্ধ্যাদ্রি যেমন বশতাপন্ন হইয়াছিলেন হস্তীবরও তদ্রূপ বশতাপন্ন হইয়াছিল। হস্তী লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দিবসত্রয় ঘোর যন্ত্রণা পাইতে লাগিল[৮]। নিগড় বদ্ধ হইয়া হস্তী অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতে লাগিল এবং বারম্বার যন্ত্রণাসূচক ভয়ঙ্কর নাদ করিতে লাগিল। অসুরগণ যেমন সর্গদ্বার ভগ্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ, মদমত্ত মাতঙ্গ দন্তের দ্বারা লৌহ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া ফেলিল[৯]। হস্তিপক দূর হইতে বলিরাজ কর্ত্তৃক স্বর্গদ্বার ভগ্নের ন্যায় হস্তীকে লৌহ শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে দেখিল[১০]। হস্তিচালক দূর হইতে হস্তীর এতাদৃশ কার্য্য ও অবস্থা দর্শন করিয়া বিরোচন পুত্র কর্ত্তৃক ত্রিদশালয় উত্যক্ত হইলে সুমেরু শৃঙ্গ হইতে নারায়ণ যেমন তৎপুরোভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ, হস্তিপক বৃক্ষারোহণ করতঃ লম্ফ প্রদান দ্বারা হস্তীর শিরোদেশে পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দৈব নিবন্ধন মহাবায়ু কর্ত্তৃক সুপক্ক ফল যেমন বৃক্ষতলে নিপতিত হয়, তদ্রূপ, হস্তিপক সেই হস্তীর শিরোদেশে পতিত না হইয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়াছিল[১১]। হস্তীর পদতলে পতিত হইলে তির্য্যক্ জাতি হইলেও গজের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। যে হেতু সাধু ব্যক্তি অকারণে শত্রুকেও পীড়া প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না[১২]। পদতলগত এই দুর্ব্বল প্রাণীকে আমি পদ দলিত করিয়া কি পুরুষকার লাভ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া করিবর তাহাকে বধ

করিতে বিনিবৃত্ত হইল[১৩]। জলরাশি যেমন প্রবল বেগে সেতু ভগ্ন করিয়া গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ, ছিন্ননিগড় গজরাজ তথা হইতে অতি বেগে পলায়ন করিতে লাগিল[১৪]। অংশুমালী যেমন স্বীয় কিরণ দানে মেঘ সমূহ দূরীকৃত করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ, বারণও শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিল[১৫]। হস্তী গমন করিলে হস্তীর গমনের সহিতই গতব্যথা হইয়া হস্তিপক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল[১৬]। তাদৃশ ভয়ারোহ সুউচ্চ তাল বৃক্ষের ন্যায় হস্তীর শিরোদেশ হইতে ভূমিপতিত হইয়াও হস্তীপকের কিছু মাত্র কষ্ট বোধ হইল না। দুরাত্মা ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই এইরূপ কঠিনাবয়ব হইয়া থাকে। বর্ষাকালের মেঘ যেমন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ, অসাধু ব্যক্তি সকলের কুকার্য্য বিষয়িনী চেষ্টা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হস্তিপরিচালক তৎকালে অধিকতর উদ্যমশীল হইয়া উঠিল[১৭।১৮]। হস্তী পলায়ন করিলে বারণারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং মেঘাচ্ছন্ন গগনতলে রাহু যেমন চন্দ্রমণ্ডলকে অন্বেষণ করিতে থাকে, সেইরূপ, বিবিধ পাদপ সঙ্কুল বনরাজি মধ্যে গজারি সেই মহাগজকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়ৎ দিন পরে এক নিবিড় বনমধ্যে বৃক্ষতলে সমর বিশ্রান্ত বীরের ন্যায় সেই হস্তীকে দেখিতে পাইল[১৯।২১]। অনন্তর তন্নিকটে গজবন্ধনোপযোগী এক সুবৃহৎ ও সোপকরণ খাত নির্ম্মাণ করিল। শরৎ কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ, লতা পত্রাদির দ্বারা সেই খাতের উপরিভাগ সম্যক্ আচ্ছাদন করিয়া দিল। পরে সমুদ্রে যেমন পর্ব্বত পতিত হয়, সেইরূপ, হস্তীও সেই দুরাত্মা করিনিসূদন কর্ত্তৃক খানিত সুগভীর খাত মধ্যে নিপতিত হইল। এবং সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত রথের ন্যায় গজরাজ খাত মধ্যে পতিত হইয়া সেই স্থানে কালাতিপাত করিতে লাগিল[২২।২৩]। বলিরাজ যেমন পাতাল পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ, গজরাজও নিজ কর্ম্ম দোষে পুনরায় খাতপতিত হইয়া তন্মধ্যে রহিল ও অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল[২৭।২৮]। যাহারা অজ্ঞতানিবন্ধন পুরোবর্ত্তী শত্রুকে উপেক্ষা করিয়াও বর্ত্তমান কার্য্যের দ্বারা ভবিষ্যতের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা না করে, তাহারা এই বিন্ধ্যগজের ন্যায় কষ্টাদপি কষ্টতম অবস্থা পাইয়া থাকে। আমি দুর্বৃত্ত শঠ পরিচালকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি এবং তাহা হইতে বহু দূর

দেশে সমাগত হইয়াছি, সে এক্ষণে আমার কিছুই করিতে পারিবে না, এইরূপ চিন্তা করিয়া হস্তী পুনরায় বন্ধন দশায় সমুপস্থিত হইল ও মহৎ দুঃখ পাইতে লাগিল। মূর্খতানিবন্ধন বন্ধনের কষ্ট হইতে কে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে২৯।৩০। অজ্ঞানতাই অত্যন্ত বন্ধন, আত্ম-জ্ঞান দ্বারা তাহার ধ্বংস না হইলে জীব অপবর্গ মার্গ অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। হায়! আমি সতত বন্ধন দশায় আছি, কষ্ট পাইতেছি, আমার মুক্তি নাই, যিনি এইরূপ ভাবনা করেন তিনিই বদ্ধাবস্থায় থাকেন। পরন্তু সেই বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমিই সমস্ত, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতে অভিন্ন, ইহা ব্রহ্মময়, এই-রূপ ধারণা করিয়া সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মময় বা আত্মময় ভাবনা করিবেক৩১। করিলে তাহা হইতেই জীব মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেক।

একোননবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে অমরনন্দন! আপনি পুনর্ব্বার আমার নিকট মণিসাধক ও বিন্ধ্য হস্তীর উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণন করুন১।

চূড়ালা বলিলেন, হে মহারাজ! গৃহভিত্তিতে যেমন বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকে, সেইরূপ, আমিও বাক্যার্থের দ্বারা আপনার চিত্ত বিনোদন করিব। হে মহীপতে! যিনি শাস্ত্রার্থদর্শী, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত, তিনিই মণিসাধক অর্থাৎ তিনি কাচ প্রাপ্ত হইয়া চিন্তামণি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সুমেরু শিখরে রবিমণ্ডল যেমন প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ, তুমি নিখিল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ। কিন্তু সলিলোপরি প্রস্তর খণ্ড যেমন ভাসমান হয় না, সেইরূপ, তোমারও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতেছে না২।৪। হে সাধো! কুটিলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ের আস্থা পরিত্যাগ করিলে চিন্তামণিকে জানিতে পারিবে।

তাহা হইলে বিচিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া সকল দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হইবে[৭]। হে অনঘ! শুদ্ধচিত্ত হইয়া সর্বত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিলে চিন্তামণি হইতে নিখিল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত কামনাই তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সাধো! আপনি যখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই অধঃকৃত করিয়াছেন এবং আপনার আত্মোদয় হইয়াছে[৮]। ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে যেমন সৃষ্টিকার্য্য আরব্ধ থাকে না, সেইরূপ, আপনা কর্তৃক সমস্ত রাজ্য ধন ও জন পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৈনতেয় গরুড় যেমন গজকচ্ছপকে ভোজনার্থ গ্রহণ করিয়া জগতের সীমান্ত প্রদেশে গমন করিয়াছিল, সেইরূপ, আপনিও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি দূরস্থ হইয়া এই শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন[৯]। শরৎকালীন অভ্রনীহারাদি বায়ু কর্তৃক যেমন বিতাড়িত হয়, তদ্রূপ, আমি আপনার এই সর্ব্বস্বত্যাগে দুঃখিতান্তকরণ হইয়াছি[১০]। ব্রহ্ম নিশ্চয় দ্বারা পরিত্যাগ করিলে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে বা ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু তোমার তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয় না হওয়ায় ত্যাগ করি, কি না করি, এই প্রকার বিকল্পাবস্থা হওয়ায় মেঘাবৃত আকাশের ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ মলিন হইয়া রহিয়াছে[১১]। সর্ব্বপরিত্যাগ করিলে যে মহোদয় লাভ করা যায় ইহা সেরূপ পরমানন্দদায়ক নহে। কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ অখিন্নতা লাভ করিতে পারে[১২]? সঙ্কল্পকারীগণের চিন্তার দ্বারাই বাসনা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১৩]। পবনস্পন্দনযুক্ত তরুস্পন্দনের ন্যায় যাহার চিন্তার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত ও কলুষিত হইয়া থাকে, তাহার ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়[১৪]? চিন্তাই চিত্ত, সেই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে সঙ্কল্প বলিয়া অপর একটী নাম দিয়াছেন। হে সাধো! যাহারা তদ্রূপ চিন্তাগ্রস্ত, তাহারা কিরূপে সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম পুরুষকে ভাবনা করিবে[১৫।১৬]? যেমন কোনরূপ শব্দ উত্থিত হইলে কপোতাদি গ্রাম্য বিহঙ্গমকুল আকুল হইয়া ইতঃস্তত প্রোড্ডীয়মান হয়, সেইরূপ, হৃদয় মধ্যে সঙ্কল্প থাকিলে ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে না[১৭]। হে সাধো! অন্তঃকরণে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত থাকিলে এই বাগুরাতুল্য সংসারে লোকে কিরূপে ত্যাগস্বীকার করিয়া নিত্য নিরঞ্জন

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে? আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আমন্ত্রণকারী কর্ত্তৃক পূজিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সুখী হয়। যদি তাহা না হয় তবে কি সে দুঃখিত হয় না? আপনি কাচকে মণিভ্রমে দর্শন করিয়াছেন। সলিল মধ্যে চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন প্রকৃত চন্দ্র বলিয়াই অনুভূত হয়, তদ্রূপ, ভ্রম জ্ঞানে আপনি কাচকে মণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[১৮।২০]। আপনি দুঃখ লাভের জন্যই এই তপশ্চরণ করিতেছেন। এই তপঃক্রিয়ার আদ্যন্ত সকলই দুঃখময়। আপনি অমৃতানন্দ পরিত্যাগ করিয়া অতি দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। পরিমিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অধিক আয়াসসাধ্য বস্তু লাভে উদ্যোগী হয়, সে শঠ[২১।২২]। আপনি যখন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তখন, এই কার্য্য আরম্ভ করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। আপনি অজ্ঞানতা নিবন্ধনই এই বন প্রদেশে আগমন করিয়াছেন[২৩]। রাজ্য বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া এই অরণ্য পথ আশ্রয় করিয়া দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইতেছেন[২৪]। বনবাস আশ্রয় করিয়া অজ্ঞানতা নিবন্ধন আপনি শীত বাত হইতে অধিক ক্লেশ পাইতেছেন। আপনি চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই চিন্তায় আপনি আরও বদ্ধ হইয়াছেন[২৫।২৬]।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

একনবতিতম সর্গ।

——()*()——

চূড়ালা বলিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে বস্তু সন্দর্শনের জন্য বিন্ধ্যহস্তীর বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বিন্ধ্যাটবীতে যে হস্তীর কথা বলিয়াছি, সে আর কেহই নহে, আপনিই সেই হস্তী। বৈরাগ্য ও বিবেক নামে তাহার দুই দন্ত এবং যাহাকে হস্তিপক বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছি, সে আপনার এই অজ্ঞান, তাহারই নিমিত্ত আপনি এই দশায় উপনীত হইয়াছেন[১,৩]। শক্ত ব্যক্তি যেমন অতিশক্ত কর্ত্তৃক দুঃখ হইতে অধিক দুঃখে নিপতিত হয়, বিভীষিকা হইতে অধিক বিভীষিকা দর্শন করে, হস্তিপক হইতে হস্তী যেমন দুঃখ হইতে অধিক দুঃখে নিপতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ, আপনিও মূর্খতানিবন্ধন অধিক দুঃখ পাই-তেছেন[৪]। যে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা হস্তী বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আশাপাশরূপ দুর্ভেদ্য জাল, তাহাতে আপনি বদ্ধ হইয়াছেন। আশাই বিষম বন্ধন রজ্জু। কালে লৌহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিন্তু তৃষ্ণা বা আশা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[৫,৬]। হস্তিপক যেমন দূর হইতে হস্তীকে লক্ষ্য করিতেছিল, অজ্ঞান কর্ত্তৃক আপনিও সেইরূপ লক্ষীকৃত হইতেছিলেন। হস্তী যে শত্রুর লৌহজাল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল, আপনিও রাজ্যভোগরূপ ভীষণ ভোগজাল ছিন্ন করিয়াছেন[৭]। হে সাধো! শাস্ত্রদর্শনও সুকর হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগাশা বিনিবৃত্তি বড়ই দুষ্কর[৮]। বিরক্তি সহকারে জীব যদি ভোগাশা পরিত্যাগ করে তবে ছেদ্য বৃক্ষে পিশাচের ন্যায় তাহার অজ্ঞানতা স্পন্দিত হয়, কিন্তু বিবেকী পুরুষ যদি ভোগাশা হইতে বিনিবৃত্ত হন তাহা হইলে উন্মূলিত বৃক্ষে যেমন পিশাচ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ, অজ্ঞানতাও তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না[৯,১২]। আপনি যখন বনবাসাশ্রয় করিয়াছেন তখনই আপনি অজ্ঞানতা আশ্রয় করিয়াছেন। ত্যাগরূপ মহা অসির দ্বারা আপনি তাহা ছিন্ন করেন নাই[১৩,১৪]। পুনরপি তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই গহন বনে তাপসবৃত্তি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন[১৫]। গজবৈরী যেরূপ হস্তী আক্রমণের নিমিত্ত খাত প্রস্তুত করিয়াছিল, অজ্ঞানরূপ বৈরীও আপনার সম্বন্ধে সেইরূপ তপশ্চরণরূপ খাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। হে নরবর! হস্তিপকের যে রাজরাজশ্রী তাহা নৃপতির অন্তঃকরণস্থা চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে মহারাজ! আপনিই সেই গজ। অজ্ঞানরূপ বৈরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই বৃহদরণ্যে সমুপস্থিত হইয়াছেন। নব তৃণাচ্ছাদিত যে খাত অবলোকন করিতেছেন, ইহা অজ্ঞতা নিবন্ধন তপশ্চরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে[১৬,২০]। হে মহারাজ! বলিরাজা যেমন পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন সেইরূপ আপনিও এই তপশ্চর্য্যা নিবন্ধন সুদারুণ দুঃখজালে বদ্ধ হইয়া এই খাত প্রদেশে আগমন করি-

য়াছেন। আপনিই এই সংসাররূপ মহাবনের গজ, আশাপাশ আপনার নিগড়, মোহ আপনার শত্রু এবং এই অত্যুৎকট বন্ধন আপনার নিপাতন খাত ও মহীতল বিন্ধ্য। আমি আপনাকে সমস্ত বৃত্তান্ত হস্তি-রূপকে বর্ণন করিলাম[২১।২২]।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

—*—

চূড়ালা বলিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে অনন্যসাধারণ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিতেছি। এ সমস্তই সত্য, অতি সত্য এবং অন্যেরও সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। হে নৃপসত্তম! যদি মদুক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে আপনার এই বাসনা পরিত্যাগ কোনও ব্যক্তি স্বীকার করিবে না[১।৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমি রাজ্য, দেশ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্র এবং অধিক কি আমার অঙ্গাদিও ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি আমা কর্ত্তৃক কি সর্ব্ব ত্যাগ হয় নাই[৪]?

চূড়ালা বলিলেন, হে মহারাজ! ধন, দারা, গৃহ, রাজ্য, ভূমি, ছত্র, বন্ধু, বান্ধব, এ সকল আপনার নহে সুতরাং আপনি ত্যাগও করেন নাই[৫]। হে মহারাজ! আপনি এখনও অনুরাগ পরিত্যাগ করেন নাই। নিঃশেষে সেই অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই আপনি আর শোক তাপ প্রাপ্ত হইবেন না[৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, শৈল ও বৃক্ষ সকল গুল্ম পরিবৃত হইয়া থাকে। রাজ্যাদি তদপেক্ষাও অধিক জড়িত। আমি সেই রাজত্ব পরিত্যাগ করিলাম[৭]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! কুম্ভের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ মনোরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। বর্ষাকালিক

নদী তটগত সুতরাং পাংশুজালাচ্ছাদিত প্রবাহ রাশির ন্যায় সবেগে তিনি আপনাকে দৃঢ় নিশ্চয়ে জানিতে পারিলেন[৮,৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বৃক্ষ পর্ব্বত পল্বল এবং বন বাসনা এ সমস্তই আমি পরিত্যাগ করিলাম[১০]।

কুম্ভ বলিলেন, অদ্রি বন পল্বল সলিল পাদপ এ সমস্তই বনপ্রদেশে। তবে আপনা কর্ত্তৃক কিরূপে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল[১১]? হে মহারাজ! এ সকল অপেক্ষা আপনি উৎকট অনুরাগ পরিত্যাগ করিলেই শোকাভিভূততা প্রাপ্ত হইবেন না[১২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বাপী তড়াগ পল্বল উটজ প্রভৃতি যাহা কিছু আমার সে সমস্তই আমি অদ্য পরিত্যাগ করিলাম[১৩]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! জিতেন্দ্রিয় মহাবীর শিখিধ্বজ মহাত্মা কুম্ভের তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে ধ্যানস্তিমিত হইয়া প্রবুদ্ধান্তঃকরণ হইলেন। অর্থাৎ বাসনামলরহিত হইলেন। বায়ু যেমন পরিচালিত রজঃকণা সমূহে পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ, অন্তঃকরণও বাসনার দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে[১৪,১৫]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, বৃক্ষ উটজ বীরুধ্ প্রভৃতি আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম[১৬]।

কুম্ভ বলিলেন, বৃক্ষ বাপী স্থল গুল্ম উটজ লতা এ সমস্ত কিছুই আপনার নহে, সুতরাং আপনা কর্ত্তৃক ইহাদিগের ত্যাগ সম্ভব হইতে পারে না[১৭,১৮]। হে মহারাজ! আপনি সর্ব্বোচ্চ অনুরাগ পরিত্যাগ করিলেই অশোকতা লাভ করিতে পারিবেন[১৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, এই সমস্ত যদি আমার না হয়, তবে, কর্ম্ম ও কুটীরাদি আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিলাম।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এই কথা বলিয়া শরৎকালীন মেঘমালা যেমন অচিরকাল মধ্যে অপসারিত হয়, সেইরূপ, বিমলাত্মা মহারাজ শিখিধ্বজ তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইলেন[২০]। মহাত্মা কুম্ভ নরপতির তাদৃশ কার্য্যাবলী অবলোকন করিয়া সুখিতান্তঃকরণে অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আপনি যাহা করিয়াছেন এবং করিলেন, এ সমস্তই পুণ্যপ্রদ, এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাবে নরবর শিখিধ্বজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শিখিধ্বজ আশ্রম হইতে

ভাণ্ডাদি ও সমুদায় উপকরণাদি আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন, আমার জ্ঞানোদয় না হওয়াতেই আমি এতাবৎ কাল এই সমস্ত বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে আমার ভ্রান্তি অপসারিত হইয়াছে। আমার এ সমস্ত দ্রব্যে আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি অক্ষমালাদি সমস্ত দ্রব্যই অগ্নিসাৎ করিলেন। আমি ভ্রান্ত চিত্তে এই মৃগাজিন ধারণ করিয়াছি, অতএব হে অজিন! আপনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন, আপনার পথ সকল শুভ হউক। এই বলিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদিও অগ্নিতে পরিত্যাগ করিলেন[২১।৩১]। আরও বলিলেন, হে কমণ্ডলু! তুমি আমার এতদিন মহান্ উপকার সাধন করিয়াছ, তুমি আমার প্রিয় সুহৃৎ মনোজ্ঞ এবং উপকারাস্পদ। দেহ অতি প্রিয়, তথাপি যেমন সেই দেহ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ, আমি আজ্ তোমাকেও পরিত্যাগ করিলাম। অতঃপর কুশাসনাদি ও অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুকেই ঐরূপ প্রিয় বচনের দ্বারা আমন্ত্রিত করিয়া তিনি সেই সমস্ত দ্রব্যনিচয় অগ্নিসাৎ করিলেন[৩২]।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

——০=০——

বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর মহারাজ শিখিধ্বজ স্বকীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন শুষ্ক পর্ণবিরচিত তৃণমন্দির ও তত্রস্থ অন্যান্য সমুদায় সামগ্রী অগ্নিসাৎ করিলেন[১।২]। কতকগুলি দ্রব্য অগ্নিদাহে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বীরভদ্র কর্ত্তৃক যেমন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ, তিনিও স্বকীয় আশ্রমপদ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন[৩।৪]। আশ্রম প্রদেশস্থ ভূভাগ হইতে মৃগকুল আকুল হইয়া রোমন্থন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইতে লাগিল। অগ্নিদাহে পুরী সকল নষ্ট হইলে ভীত জনের ন্যায় তাঁহাকে প্রতীত হইতে লাগিল। ভাণ্ডজাত অর্থাৎ সমুদায়

দ্রব্য অগ্নিসাৎ করিয়া নরপতি স্নেহ মমতা শূন্য হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন৫,৬।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অদ্য আমি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবপুত্র কর্তৃক প্রবোধিতান্তঃকরণ হইলাম৭। অদ্য আমি শুদ্ধতাসম্পন্ন ও সুখোদ্বোধ প্রাপ্ত হইলাম। সঙ্কল্পজাত এই সমস্ত দ্রব্যাদিতে আমার কি হইবে৮। সমস্ত বন্ধন যখন দূরীকৃত হয়, তখন, পরমানন্দসম্ভূত নির্বৃতি আসিয়া উপনীত হয়৯। আজ আমি উত্তম নির্বেদ প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ শান্তি লাভ করিলাম। অদ্য আমি পরমা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। আজ আমার সমুদায় বন্ধন দূরীভূত হইল। অদ্য আমি সর্বত্যাগী ও সুখী হইলাম১০। অদ্য আমি দিগম্বর দিক্‌সদন এবং দিক্‌সম অবস্থায় স্থিত হইলাম। হে দেবপুত্র! ইহা হইতে আর কি অবশিষ্ট আছে১১।

কুম্ভ বলিলেন, হে নরবর শিখিধ্বজ! আপনা কর্তৃক এখনও সর্বস্ব ত্যাগ সম্পন্ন হয় নাই। সমস্ত বস্তু পরিত্যাগের বৃথা অভিনয় করিবেন না১২। সমস্ত বস্তু হইতে অনুরাগ এখনও অপরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, অন্য পরিত্যাগে আপনি কি অশোকতা লাভ করিবেন১৩?

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র! হে মহাবাহো! রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাপরায়ণ রহিলেন। অতঃপর তিনি বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন১৪।

শিখিধ্বজ বলিলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিপোষিত রক্তমাংসময় এই দেহকে উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করিয়া আমি স্বীয় বিনাশ সাধন করিব। তাহা হইলেই আমি সর্বত্যাগী হইব১৫,১৬। এই কথা বলিতে বলিতে রাজা শিখিধ্বজ সবেগে উত্থিত হইলে, কুম্ভ তাঁহাকে বলিলেন১৭। মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত এই নির্দোষী দেহলতাকে উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করিতেছেন? দুর্বুদ্ধি বৃষভই কুপিত হইয়া ক্ষুদ্র ও সদ্যোজাত বৎসকে হত্যা করিয়া থাকে১৮। হে মহারাজ! অজ্ঞানতা নিবন্ধন নির্দোষী মূক জড় দেহকে পরিত্যাগ করিবেন না১৯। যেমন কাষ্ঠখণ্ড তরঙ্গের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া প্রবাহিত হয়, সেইরূপ; এই দেহলতা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে২০। যেমন মত্ত তস্কর নিরপরাধী ব্যক্তিকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে, তদ্রূপ, এই শরীরও অন্য কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিপীড়িত হইয়া থাকে২১। শরীর নিবন্ধন

সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া কি শরীর অপরাধী হইবে? তাহা নহে। বায়ুচালিত হইলে ফলবান্ তরুর ফল ও পুষ্প পড়িয়া যায়, তাই বলিয়া কি বৃক্ষ দোষভাগী হইবে[২২,২৩]? পদ্মপত্রে জল যেমন অস্থির ভাবে থাকে, সেইরূপ, এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলে আপনা কর্ত্তৃক কি সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইল বিবেচনা করিতেছেন[২৪]? নিরপরাধী শরীরকে উচ্চ দেশ হইতে নিপাতিত করিলে আপনা কর্ত্তৃক সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না। মত্ত মাতঙ্গ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত বৃক্ষের ন্যায় আপনা কর্ত্তৃকই এই দেহ পীড়িত হইতেছে। যদি আপনি এই শরীরকে পরিত্যাগ করেন, তবে, মহাত্যাগী হইলেও আপনি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ হইবেন[২৫,২৬]। হে মহারাজ! আপনাকে ত্যাগ করিলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধি ত্যাগ করিলে দেহাদি সকল ত্যাগ করা হয়, অন্যথা ইহা নষ্ট হইলেও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও দুঃখপ্রদ হয়[২৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন! এই দেহ কাহার দ্বারা চালিত হয়? এবং জন্ম কর্ম্মের বীজ-ই বা কি? কি পরিত্যাগ করিলে সকল পরিত্যাগ করা হয়? তাহা আমাকে বলুন[২৮]?

কুম্ভ বলিলেন, হে সাধো! দেহ ত্যাগ, রাজ্য ত্যাগ, গৃহ, উটজ প্রভৃতি ত্যাগ করিলেই সমস্ত ত্যাগ করা হয় না। যিনি সকলের বীজ, যিনি সমস্তের নিদান, সেই সর্ব্বভূতকারণ নিত্য নিরঞ্জন ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিতে পারিলে সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে[২৯,৩০]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বার্থদর্শিন্! সমস্ত বস্তুই অতি হেয় এবং সর্ব্বদা সমস্তই ত্যাজ্য এবং সর্ব্বই বা কি, তাহা আমাকে বলুন[৩১]?

কুম্ভ বলিলেন, হে পুণ্যশীল! প্রাণাদি নামক সর্ব্বগতাকার জীব জড়ও নহেন, অজড়ও নহেন, ভ্রান্ত চিত্তই সমস্ত নামে কথিত হয়। চিত্তই ভ্রম, চিত্তই নর, চিত্তই সংসার পাশ এবং চিত্তই সমস্ত[৩২,৩৩]। হে মহীপতে! তরু যেমন বৃক্ষেরই বীজ, সেইরূপ, মনই রাজ্য আশ্রম অথবা দেহাদি এই সমুদায়ের বীজ। (অর্থাৎ বাসনানুসারে এই সকল উৎপন্ন বা উপস্থিত হইয়া থাকে) হে মহারাজ! সমস্ত বস্তুর বীজ স্বরূপ একমাত্র মনকে পরিত্যাগ করিলেই সমস্ত ত্যাগ হয়। অথবা বাসনা পরিত্যাগ করিলেই সকল ত্যাগ হয়। তাহার অন্যথা হইলে ত্যাগ করা হয় না[৩৪,৩৫]। বাসনাযুক্ত জীবের বাসনানুসারে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাজ্য

অথবা অরণ্য সম্ভোগ হইয়া থাকে। বাসনাবিহীন ব্যক্তির নিরন্তর সুখ হইয়া থাকে[৩৬]। বৃক্ষের বীজ যেমন আকারাদি পরিগ্রহ করিলে বৃক্ষ-রূপে দেখা যায়, সেইরূপ, বাসনার বিবর্ত্তন হেতু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভোগাস্পদ হইয়া থাকে[৩৭]। যেমন ভূকম্পের দ্বারা পর্ব্বত আলোড়িত হয়, অথবা যেমন বাত্যাপ্রযুক্ত বৃক্ষ স্পন্দিত হয়, সেইরূপ, চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ এই দেহাদিরও স্পন্দন হইয়া থাকে[৩৮]। দেহধারী মাত্রেরই জরা ও মরণ আছে। মুনিগণের বাসনারহিত সুদৃঢ় মনকে চিত্ত বলিয়া জানিবেন না। জীব সকল মনের অবস্থানুসারে দেহাদি প্রাপ্ত হয়। হে মহীপতে! বুদ্ধি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও প্রাণাদির ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা শান্তি লাভ হইয়া থাকে। চিত্তই সমস্ত, সেই চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ বাসনা ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইতে পারিলে আধি ব্যাধি হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায় ও শান্তি পাওয়া যায়। হে ত্যাগবিদাম্বর! বাসনা ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ বলিয়া কথিত হয়। সেই বাসনা ত্যাগ করিলে চির সত্য লাভ করা যাইতে পারে[৩৯,৪০]। চিত্ত সংযত হইলে দ্বৈতভাব দূরীকৃত হইয়া একত্বভাব আসিয়া উপনীত হয়। এবং তাহা হইলেই অনাময় পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারা যায়[৪১,৪৪]। তৈল বিহীন প্রদীপের দ্বারা যেমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং পক্ষান্তরে তৈলযুক্ত প্রদীপ দ্বারা সমস্ত দ্রব্য প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ, যিনি বাসনা ক্ষয় করিয়া চিত্তকে সংযত করিয়াছেন, তিনি সস্নেহ দীপের ন্যায় পরম ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন[৪৫,৫২]। বাসনা থাকিলে যেমন দ্রব্যান্তরের প্রতি আসক্তি জন্মায়, তদ্রূপ, বাসনা ত্যাগ করিলে কোন বস্তুর প্রতিই আর আস্থা থাকে না। হে মহারাজ! বস্তুর ধ্বংস হইলেও তখনও আপনি সেই একই পদার্থ থাকিবেন এবং তাহা হইলে আপনি নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে পারিবেন। সূর্য্য চন্দ্রাদি যেমন আকাশমার্গে উদিত হন, সেইরূপ, বাসনা রহিত হইলে তিনি শূন্যাত্মা হইয়া থাকেন। যাহারা ত্যাগ করিতে অসমর্থ তাহারা জরা মরণে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। চিত্রপটস্থ চন্দ্র যেমন আকাশমার্গে কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ্য হয় না, বাসনাত্যাগী জীবেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। বাসনা রহিত হইলে তিনি বিমলান্তঃকরণ হইয়া সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। বাসনা ত্যাগই পরমানন্দ, তদ্বিপরীত চিরদুঃখ। এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা

সম্পন্ন করিতে পারেন। বাসনা পরিত্যাগ করিলে, যেরূপ নদীবাহিত জল সমুদ্রে মিশাইয়া যায়, তদ্রূপ, আপনি সমস্ত বিষয়ই আত্মতত্ত্বে মিশাইয়া উপভোগ করিতে পারিবেন। বাসনা ত্যাগ করিলে আপনি অতীব প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন। হে মহারাজ! আপনি সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরশান্তি লাভ করুন[৫৩।৫৪]।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

——()•()——

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামনা কুম্ভ পুনঃ পুনঃ চিত্ত পরিত্যাগ করিতে বলিলে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি নরপাল শিখিধ্বজ গভীর গবেষণা সহ-কারে বলিতে লাগিলেন[১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, মন হৃদয়াকাশের পক্ষী অথবা হৃদয় বৃক্ষের মর্কট। উহাকে পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করিলেও আমাকে উহা পুনঃ আক্রমণ বা আশ্রয় করে[২]। মৎস্য সকল জালবদ্ধ হইয়া যেমন আকু-লিত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ! আমিও তদ্রূপ মমতাকৃষ্ট হইয়া ঐ চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না[৩]। হে মহাভাগ! আপনি কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক চিত্তের স্বরূপ কি এবং কি প্রকারে উহা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? হে প্রভো! অভিহিত চিত্তকে আমি কি করিয়া পরিহার করিব, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। আমি উহাকে গ্রহণ করিতে জানি, ত্যাগ জানি না[৪]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! বাসনাই চিত্তের স্বরূপ, সেজন্য চিত্তের পর্য্যায় শব্দ (অন্য একটী নাম) বাসনা[৫]। উহাব ত্যাগ অনায়াসসাধ্য। কেননা, কেবল ঔদাসীন্যের দ্বারা উহার ত্যাগ হইয়া থাকে। রাজ্য লাভ হইতেও তাহাতে অধিক আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। উহা কুসুম হইতেও অধিক স্পৃহণীয়[৬]। তৃণের মেরুতা এবং পামর ব্যক্তির সাম্রাজ্য যেমন

অসম্ভব, সেইরূপ, অজ্ঞ জনের সম্বন্ধে চিত্ত পরিত্যাগ অসম্ভব হইয়া থাকে[৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্তের স্বরূপ বাসনাময়, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তাহার ত্যাগ বজ্রাপেক্ষাও কঠিন বলিয়া বুঝিতেছি[৮]। অতএব, চিত্ত পরিত্যাগ অতীব দুষ্কর। হে মহাভাগ! সংসাররূপ সুগন্ধ পুষ্পের অথবা হৃদ্‌পদ্মের ভ্রমর, তথা দুঃখরূপ উত্তাপের বহ্নি, তথা শরীররূপ যন্ত্রের পরিচালক চিত্তকে আমি যাহাতে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি তাহার উপদেশ করুন[৯,১০]।

কুম্ভ বলিলেন, হে নরবর! পরিণামদর্শী ঋষিগণ বলেন যে, সমস্ত বস্তুর বিয়োগ হইলেও যাঁহারা তাহার স্মরণ না করেন অথবা স্মরণ করিয়া দুঃখিত না হন, তাঁহারাই চিত্তত্যাগ করিতে পারিয়াছেন[১১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! চিত্তত্যাগ অপেক্ষা চিত্তনাশ দুঃসাধ্য। তৎসিদ্ধির নিমিত্ত উপায়াবলম্বন আবশ্যক। মনুষ্যের চিত্তই ব্যাধি, তজ্জন্য তাহার চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। নচেৎ অভাবজনিত বহু-প্রকার যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না[১২]।

কুম্ভ বলিলেন, শাখাপল্লববিশিষ্ট চিত্ত পাদপের বীজ "অহং" জ্ঞান। হৃদয়াকাশস্থিত সেই "অহং" জ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করুন[১৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! চিত্তের মূল কি? এবং অঙ্কুরই বা কি? ইহার শাখা প্রশাখাই বা কি? আর ইহার স্কন্ধদেশই বা কি এবং আমি কিরূপে ইহাকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আমাকে বলুন[১৪]?

কুম্ভ বলিলেন, অহংজ্ঞানই বেদনাত্মক চিত্তবৃক্ষের বীজ, এবং ইহার ক্ষেত্র পরমাত্মা। সেই ক্ষেত্র এখন মায়াজালে জড়িত আছে। সেজন্য উহাকে মায়াক্ষেত্র বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। এই মায়া ক্ষেত্র হইতে যখন অহং জ্ঞানের অনুভব বিকাশ পাইতে থাকে তখন তাহাকে অঙ্কুর কহে। নিশ্চয়াত্মিকা নিরাকারা বুদ্ধি যখন বিশেষরূপে পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন, তাহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়। মনীষিগণ তাহাকেই চিত্ত বলিয়া থাকেন। শূন্যাত্মা জীব উহারই অন্তর্গত। সুতরাং মিথ্যা[১৫,১৬]। এতাদৃশ চিত্তবৃক্ষের বাসনার দ্বারা দূরবিলম্বী শাখা প্রশাখা সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা এই চিত্তবৃক্ষের ফলাস্বাদন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা এই মহাবিটপীর শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে

মহারাজ! আপনি এই বৃক্ষের শাখা সকল ছিন্ন করিয়া মূলদেশ কর্ত্তন করিতে যত্নবান্ হউন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্তপাদপের শাখা সকল ছিন্ন করিয়া কিরূপে মূলদেশ কর্ত্তন করিব আপনি আমাকে তাহার উপদেশ করুন।

কুম্ভ বলিলেন, বিবিধ বাসনাই বিবিধ শাখা এবং তাহার স্পন্দনই ফল[২০, ২৩]। যাঁহারা অনাসক্ত মৌনী এবং তত্ত্ববিচারে সক্ষম তাঁহারাই এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন[২৪]। আর যাহারা বিষয়াসক্ত তাহারা ইহাতে জড়ীভূত হইয়া থাকে। আপনি পুরুষকার দ্বারা এই চিত্তপাদপের শাখা প্রশাখা সকল ছিন্ন করুন[২৫]। যিনি স্থিরচিত্তে অর্থাৎ অচঞ্চল চিত্তে বা সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতে পারেন তিনি ইহার মূলোচ্ছেদে সমর্থ হন। শাখাচ্ছেদন ইহার গৌণ ও মূলোচ্ছেদ মুখ্য ফল। অতএব, আপনি চিত্তবিটপীর মূলোচ্ছেদে যত্নপর হউন[২৬, ২৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অহং ভাবই চিত্ত বিটপীর বীজ। কোন্ অগ্নি এই বীজ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয় আপনি তাহার উপদেশ করুন[২৮]?

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আত্মবিচারই চিত্ত বৃক্ষের বীজ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়[২৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! আমি স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা বার বার বহুবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, এই বনরাজি পরিশোভিত অরণ্যপ্রদেশে কিম্বা বহুবৃক্ষসমাকুল গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গে কিম্বা বনরাজি মধ্যে কিম্বা উপবনসমূহে, কুত্রাপি আমি অহং পদার্থ দেখিতে পাইতেছি না। জড়ত্বহেতু দেহাদি কিছুই নহে, অস্থিমাংস এ সকলও কিছুই নহে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিও কিছুই নহে। জড়তাপ্রযুক্ত আমি মনেরও অহংজ্ঞান থাকা দেখিতে পাইতেছি না[৩০, ৩২]। সুবর্ণের দ্বারা হার কেয়ূরাদি প্রস্তুত হইলে যেমন তাহা সুবর্ণই থাকে, তদ্রূপ, আমি আত্মাতে অহং ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না[৩৩, ৩৪]। পরন্তু হে ভগবন্! আমি অন্তর্জ্ঞান শিখিতে পারি নাই এ নিমিত্ত বহুকাল এই তপোনুষ্ঠান দ্বারা কালাতিপাত করিতেছি[৩৫]।

কুম্ভ বলিলেন, হে অনঘ! হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন! আপনি যদি এতদূর জানিতে পারিয়াছেন তবে আপনি কি অর্থাৎ আপনি কিংস্বরূপ তাহা বলুন[৩৬]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বিভুষাম্বর! যিনি চিরস্থির, নিত্যশুদ্ধ, সেই একমাত্র চিদ্রূপ, ইহা আমি এখনও স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি যাহাতে সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি তাহা আমাকে বলুন[৩৭।৩৯]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহাবাহু! আপনি যাহাতে সংসারে ব্যাপারবান্ আছেন, সেই মহৎ ভাব কি অথবা কিংস্বরূপ তাহা বিবৃত করুন[৪০]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, চিত্ত বৃক্ষের যে বীজ আমাকে আকৃষ্ট করিয়া আছে আমি সেই বীজ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যাহাতে ত্যাগ করিতে পারি তাহা বলুন[৪১]।

কুম্ভ বলিলেন, কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। কারণ হইতেই কার্য্য হয়। তাহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। যে স্থানে কারণ নাই সে স্থানে কার্য্য হইতে পারে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আপনি বীজানুসন্ধান করুন[৪২।৪৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! অহংজ্ঞানই চিত্ত বিকারের কারণ। আমি যাহাতে সেই অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে পারি তাহা বলুন[৪৪।৪৫]?

কুম্ভ বলিলেন, হে নরপাল! আপনি কারণজ্ঞ, অতএব, এই চিত্ত সন্তাপের কারণ আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন। পরে আমি আপনাকে কারণ ও অকারণ বিবৃত করিব। অকারণও কারণ হয়, আবার কারণও অকারণ হয়[৪৬]। যাহাতে আপনার অকারণে কারণতকার হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন[৪৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন. হে মুনিবর! এই পরিদৃশ্যমান জগতীস্থ দ্রব্য সমূহের সদ্ভাব বা সত্তাবোধ হইতে দেহাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। বস্তু সমূহেরও উপাদান অন্তরস্থ বেদনা অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞান। শরীর মধ্যে যে বেদনাদির (বেদনা=বিশেষ বিশেষ অনুভব বস্তুজ্ঞান) আবির্ভাব হয় সে সকল বায়ুরাশির স্পন্দন নিবন্ধন মিথ্যা রেখাদির সদৃশ অর্থাৎ অসত্য। আমি সেই অসত্যভূত বস্তু সকল হইতে যে চিত্তবিকার প্রাপ্ত হইতেছি তাহাও অসত্য[৪৮।৫০]।

কুম্ভ বলিলেন, যদি উপাদান সামগ্রী হইতে দেহাদির আবির্ভাব সত্য বলিয়া আপনার প্রতীত হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। আর দেহাদির অসদ্ভাব হইলে তখন আর বেদনা জন্মিবে না। কোথা হইতে জন্মিবে[৫১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, যাহার একটা স্বরূপ অনুভব হয় তাহার নাস্তিতা কিরূপে সম্ভবে। হস্তপাদাদিবিশিষ্ট সতত বিনাশভাগী এই দেহকে কিরূপে অভাব অর্থাৎ নাই বলিয়া স্থির করিতে পারি?[৫২।৫৩]

কুম্ভ বলিলেন, হে ভূমিপাল! যে কার্য্যের কারণ নাই সেরূপ কার্য্য জগতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবয়বাদি কারণসম্ভূত নহে সুতরাং যাহার কারণ নাই এরূপ শরীরাদি থাকিতেই পারে না। যাহার বীজ নাই তাহা কিরূপে উদ্ভূত হইতে পারে[৫৪।৫৫]। যে কার্য্যের হেতু নাই তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না। যিনি এই সকল কার্য্যকে সত্য বলিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নিশ্চয় মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রমজালে পতিত হন[৫৬]। আপনিও মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ন্যায় ভ্রমজালে পতিত হইয়া তাহাতে আস্থা প্রদর্শন করিবেন না[৫৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, দেহাদি যদি দ্বিচন্দ্রাদির ন্যায় অত্যন্ত মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কারণ অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। বন্ধ্যাপুত্রের শরীর ভূষিত করিবার চেষ্টা আর অত্যন্তমিথ্যা পদার্থের অনুসন্ধান করা সমান[৫৮]।

কুম্ভ বলিলেন, অস্থিপঞ্জর নির্ম্মিত এই শরীরাদি কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। হে মহারাজ! উৎপন্ন হইলেও ইহারা নষ্ট হইবে, আপনি তাহা পরিজ্ঞাত হউন[৫৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মুনিবর! হস্তপাদাদিযুক্ত শরীর যে পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, নিত্য দর্শনযোগ্য সেই পিতা কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না[৬০]?

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! কারণের সত্তা না থাকায় পিতাও কারণ হইতে পারে না। যাহার সত্তা নাই তাহা অসৎ বা অলীক। আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা। কার্য্য সকলের বীজই কারণ বলিয়া গণ্য হয়[৬১]। হে রাজন্! ব্রহ্মাণ্ডে বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হইতে পারে না[৬২]। এই নিমিত্ত যাহার কারণ নাই সেরূপ কার্য্য হইতেই পারে না। যে স্থলে কারণের অভাব, সে স্থলে কার্য্যের প্রতীতি হইলেও তাহা ভ্রমজাল বলিয়া জানিবে[৬৩]। যাহার অসত্তা নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার কারণানুসন্ধান মরুভূমিতে জলানুসন্ধানের ন্যায় অথবা বন্ধ্যা নারীর পুত্র প্রসবের ন্যায় মতিভ্রম বলিয়া জানিবেন[৬৪]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, পিতামহ, পিতা ও পুত্র, ইহাদের পরস্পর কেহই

প্রকৃত কারণ নহেন কেন? পিতার কারণ পিতামহ কি নিমিত্ত কারণ হইতে পারেন না[৩৫]?

কুম্ভ বলিলেন, হে ভূপতে! যে পিতামহকে আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন তাঁহারও সত্তা নাই। কারণের অভাব নিবন্ধন কোন কালেই তাঁহার সত্তা থাকিতে পারে না[৩৬]। কারণীভূত পিতামহের বীজ না থাকায়, এক ভ্রান্তি জ্ঞান হইতে যেমন অপর ভ্রম জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ, পিতামহেরও সত্তা ও কারণ নির্দ্দেশ করা ভ্রম জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না[৩৭]। মৃগতৃষ্ণিকা নিবন্ধন যেমন জলভ্রম হইয়া থাকে, পিতামহকে বীজভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সেইরূপ ভ্রম জ্ঞানের ফল[৩৮]। আপনি পিতামহকে পুত্রাদির কারণ বলিয়া যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছেন, আমি তাহা অপনোদন করিব[৩৯]। হে ভূমিপতে! যাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি দেবদেব, তিনি আত্মা হইতে অভিন্ন। সেই পরম পিতা চিরশান্তিপ্রদ ভগবান্ বিষ্ণু হইতে আপনি ভিন্ন নহেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ করুন[৪০]।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

——()——

শিখিধ্বজ বলিলেন, যদ্যপি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যই ভ্রমময় বা ভ্রান্তিনির্ম্মিত, তবে, এ সকলের অর্থক্রিয়া বা ব্যবহার নির্ব্বাহ কিরূপে হয়? এবং কি নিমিত্তই বা দুঃখোৎপাদক হইতেছে[১]।

কুম্ভ বলিলেন, এই জগদ্ভ্রম শৈত্যের দ্বারা জলের কাঠিন্যের ন্যায় রূপান্তর মাত্র। অর্থাৎ অজ্ঞানের ঘনতায় জগৎ ও তদ্ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতেছে[২]। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মোহ দূরীকৃত হইলে এ সকলের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যাবৎ তাহা না হয়, তাবৎ হর্ষ বিষাদাদি

জন্মে ও সে সকল বিশেষ বিশেষ ভোগ বলিয়া গণ্য হয়[৩]। পূর্ব্ব-সংযোগ ধ্বংস হইলে তৎসমুদায় বস্তু নূতন বলিয়া যিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সে সকলের বিনাশ নিবন্ধন দুঃখও উপভোগ করেন[৪।৫]। হে মহারাজ! মৃগতৃষ্ণিকায় জল ভ্রমের ন্যায় আপনি পৃথক্ আদি পুরুষ থাকা অনুভব করিতেছেন। পিতামহাদি কর্তৃক উদ্ভূত হইলেও এই সকল সন্তানাদি মিথ্যা। কারণ এই যে, অসত্য বস্তু হইতে কখনও সত্য বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে না[৬।৭]। যেমন শুক্তিকায় ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ রজত জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু বিচার দৃষ্টির পরে যেমন আর তাহাতে রজতত্ব জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ, আত্মতত্ত্ব বিচারের পরেও এ সকলের সত্যতা থাকে না। তদ্রূপ, মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় আপনি এই সকল দ্রব্যের স্বরূপে ভ্রান্ত হইয়াছেন। কারণ না থাকিলেও কার্য্য হইতে পারে এবম্বিধ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব হয় না[৮।৯]। মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা যাহা অবলোকন করা যায় তাহা কখন সত্য নহে। মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমে পতিত হইয়া কে কোথায় কবে ঘটপরিপূর্ণ করিতে পারিয়াছে[১০]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্ত শাশ্বত অব্যয় পরম ব্রহ্ম কি নিমিত্ত প্রথম সৃষ্টির কারণ নহেন[১১]?

কুম্ভ বলিলেন, পরম ব্রহ্ম কোন কারণাধীন নহেন। সুতরাং যাঁহার হেতু নাই তিনি অক্রিয় ও অকর্ত্তা। তাঁহার কারণও নাই কার্য্যও নাই। দ্বৈতবুদ্ধি তিরোহিত হইলে আত্ম-অভেদে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। যিনি তর্কের দ্বারা অগম্য, অহেতু, নিষ্ক্রিয়, তিনি কিরূপে কর্ত্তা হইতে পারেন[১২।১৩]? যিনি কার্য্যাদি ও কারণাদি রহিত, চিরশান্ত, অব্যয়, অতীন্দ্রিয় এবং অনধিগম্য, অথচ যাঁহাতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি কোন হেতুর অধীন নহেন এবং কার্য্যাদি বিরহিত হইয়া নিরন্তর অবস্থিত রহিয়াছেন[১৪।১৫]। অতএব, এই নিয়ত বা সদা পরিদৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে ইহা স্থির করিবে। ইহার সত্তা সতত অনশ্বর। তিনি ইহার কর্ত্তাও নহেন ও ভোক্তাও নহেন। সমস্ত শান্তিময়, এক অজ ও অব্যয়, সুতরাং কে কাহার কর্ত্তা ও ভোক্তা হইতে পারে[১৬]? কারণের অভাব হইলে কোন কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং ভ্রমজ্ঞান নিবন্ধন আপনি এই জগতের কর্তৃতা ও কারণতা অনুভব করিতেছেন[১৭]।

অকার্য্যত্ব নিবন্ধন স্বর্গাদিও নাই, দ্রব্যাদির অভাব সংসিদ্ধি হওয়ায় এই জগৎ নশ্বর, এই প্রকার জ্ঞানোদয় হইলে দুঃখাদি অনুভূত হয় না, এবং দুঃখাদি অনুভব না হইলে আমি ইহার কারণ বলিয়াও প্রতীতি জন্মায় না। আপনি এক্ষণে বন্ধন ও মোক্ষ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আমি আপনার নিকট অতি চমৎকারিণী হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তি সকল শ্রবণ করিয়া বিমলাত্মতা লাভ করিলাম[১৮।২০]। কারণের অভাব হেতু কর্ত্তার সত্তা অনুমিত হয় না। এখন আমি এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না। কর্ত্তার অভাব বশতঃ ক্রিয়াধীন জগতেরও সত্তা থাকিতে পারে না[২১]। চিত্তাদি দুঃখের কারণ নহে এবং আমিও কিছুই নহি, এইরূপ বুদ্ধি হওয়ায় আমি বিশুদ্ধ ও বিমলাত্মা হইয়াছি অথবা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় রহিয়াছি, এইরূপ অনুমান হইতে থাকে[২২]। আকাশ যেমন সতত নির্ম্মল থাকে, মেঘাদির অভ্যুদয় হইলে তাহাতে কলঙ্কাদির আরোপ হয়, সেইরূপ, আত্মা সতত নির্ম্মল, অহংজ্ঞান দ্বারা জীব মোহিত হইলে চিত্ত কলুষিত হইয়া নানা প্রকার অনুভব করিয়া থাকে। অতঃপর আমিই সেই, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আমি স্বতন্ত্র নহি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা শিখিধ্বজ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[২৩]। দেশ কাল ও কলাদিরও ক্রিয়া সমূহের একত্র সমবায় এবং পদার্থ সমূহের একত্র সম্মিলন হইলে জগৎ নামক মিথ্যা পদার্থ নয়নগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হইলে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল পদার্থ কখনও চিরস্থির নহে, কেবল সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই চিরকাল অনন্তরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি অদ্য উপশম প্রাপ্ত হইলাম, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলাম, বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলাম, আমার আর জন্ম অথবা মৃত্যু উভয়ের কিছুই নাই, উদয় অথবা ক্ষয় নাই। যেমন সর্ব্বমঙ্গলময় পরম ব্রহ্ম সতত মৌনাবস্থায় থাকেন, আমিও সেই আত্মার (ব্রহ্মের) দর্শন লাভ করিয়া কেবল শান্তিময় রূপে অবস্থান করিতেছি। মহারাজ শিখিধ্বজ এইরূপ অনুভব করিয়া চিত্ত সংযত করিলেন[২৪।২৫]।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌নবতিতম সর্গ।

—()○()—

মহারাজ শিখিধ্বজ এইরূপে নিরাময় পরম ব্রহ্মে শান্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মহামনা কুম্ভ সকাশে নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সত্বর চেষ্টা করিতে লাগিলেন[১।২]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মোহজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, আপনার কার্য্যও নাই কারণও নাই। আপনি যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন, তখন আর আপনি কোনওরূপ অনিষ্টশঙ্কা করিবেন না। আপনি সমস্ত বেদনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেন[৩।৪]।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ শিখিধ্বজ মহাত্মা কুম্ভ কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া মহা মোহজাল হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া মেঘ-নির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন[৫]। তিনি অত্যন্ত নির্ম্মল বুদ্ধি হইয়া অচিরকাল মধ্যে চিরপ্রার্থিত বস্তুর (ব্রহ্মজ্ঞান) দর্শন ও তজ্জনিত সুখ লাভ করিলেন এবং মুক্তাত্মা হইয়া এ সকলের অসত্যতা অনুভব করিতে লাগিলেন[৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে হর্ষদ! হে মানদ! আপনার কৃপায় আমি এক্ষণে বিদিতবৃত্তান্ত হইয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব, আপনি উত্তর দানে আমাকে নিরতিশয় সুখী করুন[৭]। মায়াবিবর্জ্জিত অতএব শান্তরসাস্পদ পরম ব্রহ্মে আত্মা উপরত হইলে বিশ্বদর্শন বিষয়ে দ্রষ্টা দর্শন দৃশ্য এ সকলের স্বরূপ কিরূপে অনুভবগম্য হইতে পারে[৮]?

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি অতি সুন্দর প্রশ্ন করিয়াছেন এবং আপনি ময়ূখমালা বিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল হইতেছেন, যে হেতু আপনি এই সকল হিতকর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে উদ্‌গ্রীব হই-

য়াছেন[৯]। এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পরিশোভিত যে জগৎ অবলোকন করিতেছেন এ সকলের কিছুই থাকিবে না, কল্পান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[১০]। তদনন্তর গাঢ় অন্ধকারের উদয় হইবে। তাহা হইতে তেজ অথবা অন্ধকার কিছুই উদ্ভূত থাকিবে না। কেবল মহাকল্পান্ত কালে অতি সত্য বস্তু (আত্মা) অবশিষ্ট থাকিবেন[১১]। কেবল বিমলাংশু চিৎ আকাশরূপে বর্ত্তমান থাকিবেন। সমস্ত ভোগ ও যন্ত্রণাদি হইতে বিরহিত হইয়া কেবল সেই চিৎ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবেন[১২]। অত্যুজ্জ্বল শান্ত স্বচ্ছ তেজস্তিমিত জ্ঞানমাত্র পরমাত্মা বিরাজিত থাকিবেন[১৩]। সেই পরম ব্রহ্ম তর্কের অতীত, দুরধিগম্য, অনিন্দিত, শিবরূপী, তিনি নির্ব্বাণ ব্রহ্ম এবং তিনি পূর্ণ হইতেও পূর্ণ[১৪]। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্থির হইতেও স্থির, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! সেই নিয়ত চিরশান্তিপ্রদ পরম পুরুষ অতি সূক্ষ্ম পরমাণু পার্শ্বে মহা-মেরু যেরূপ, সেইরূপ তাঁহাতে জীব আত্মা প্রতিভাত হইয়া থাকে[১৫,১৬]। এই প্রকার সেই জীব আত্মার নিকটে জগৎ পরমাণুর সদৃশ, এবং তৎকালে এ সকলে সামান্যতঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, বিশেষ রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। বায়ু স্পন্দনাদির দ্বারা প্রবাহিত হইলেও তাহা যেমন বায়ু হইতে পৃথক নহে, শূন্যতা ও আকাশ যেমন পৃথক নহে, তদ্রূপ, পরমাত্মা আত্মা অহং জ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকেন। যখন অহং জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মা এক অর্থাৎ অপৃথক থাকেন[১৭,১৮]। দেশকালাদির দ্বারা মতি পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ভেদ কল্পনা উৎপন্ন হইলে, জলের সহিত তরঙ্গের ও কটকাদির সহিত সুবর্ণের ভিন্নভাব যদ্রূপ, তদ্রূপ ভিন্নভাব অনুমিত হয়। প্রত্যুত জল ও তরঙ্গ একই পদার্থ, সুবর্ণও বলয়াদি হইতে অপৃথক। সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড পৃথক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। পরন্তু তিনি জগৎ রাজ্যের অধীশ্বর এবং অথচ জগৎ হইতে পৃথক নহেন। যিনি জগৎ হইতে সেই পরম পুরুষকে পৃথক ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন তিনিই তৎকালে বেদনাদি অনুভব করেন[২০,২১]। হে ভূপতে! তিনিই একমাত্র অবলম্বন সত্য পদার্থ, তাঁহা হইতে কিছুই পৃথক নহে। দ্বৈত ভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবেন না, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পদার্থ কিছুই নাই, যখন যিনি আত্মতত্ত্ব লাভ করেন নাই তিনি তখন তাঁহাতে

মলিনভাব এবং অপূর্ণতা দেখিয়া থাকেন[২৪।২৫]। তিনি অদৃশ্য হেতু কার্য্য বা কারণ নহেন। অথচ তিনি সর্ব্ব এবং সমস্ত হইতে পৃথক নহেন[২৬]। তিনি প্রত্যক্ষ পদার্থ হইতে অনধিগমনীয়। অতএব, তাঁহা হইতে অধিক কি উৎকৃষ্ট বস্তু থাকিতে পারে? তিনি সমস্ত, সর্ব্বাত্মা এবং অতি সূক্ষ্ম। তিনি নিরাভাস আখ্যা ও অনাখ্যা বর্জ্জিত। তিনি সৎ এবং অসৎ। সুতরাং তিনি কিরূপে কারণতা প্রাপ্ত হইবেন?[২৭।২৮]। যিনি কাহারও বীজ নহেন এবং আখ্যা বিরহিত হওয়ায় কাহারও কারণ নহেন এবং যাঁহা হইতে কোনও বস্তুর উদ্ভব হয় নাই, যিনি অকর্ত্তৃক এবং অকর্ম্ম এবং চিরসত্য অক্ষত আত্মরূপ ও স্বয়ং জ্ঞাত। হে মুনিবর! তাদৃশ পরম ব্রহ্ম হইতে কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই[২৯।৩০]। অতএব, হে মুনে! যেমন জলে তরঙ্গোৎপত্তির কারণ আছে, সেরূপ কারণ না থাকায় জগৎকে সকারণ বলিয়া স্থির করা যায় না। ভ্রমসৃষ্ট পদার্থের ভ্রমই কারণ, অন্য কারণ নাই। সুতরাং কে কি দিয়া কি জন্মাইয়াছে? বোধগম্য করিবে।

শিখিধ্বজ বলিলেন, কারণাধীন জলাদিতে তরঙ্গের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং অহংজ্ঞানাধীন জগতের কারণ অনুমান হয়।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহীপতে! এক্ষণে আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন[৩১।৩৩]। এই জগৎ, এই আমি, এ সকল প্রলয় কালে থাকিবে না। জগৎশব্দার্থরহিত শিবাত্মক ব্রহ্মই আছেন[৩৪]। আকাশ হইতে সূক্ষ্মতর আকাশে যেমন শূন্যতা অবস্থান করে, তদ্রূপ, ঈশ্বরে তন্ময় জগৎ বিদ্যমান আছে[৩৫]। নিজ রূপেই তাহা অভিব্যক্ত, অন্য রূপ তাহার উপলব্ধি অনুপলব্ধ. এইরূপ বোধ হইলে শিবরূপ জগৎ পরিদর্শন করিবেন[৩৬]। জ্ঞানের সম্যক বিকাশ হইলে বিষও অমৃতের ন্যায় কার্য্যকারী হয়। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ না হইলে এই অশিবাত্মক জগৎ, দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে[৩৭]। বিষবুদ্ধি প্রযুক্ত অমৃতও বিষ তুল্য হইয়া থাকে। ভ্রম বশতঃ যেমন বিচিত্রাকার নানা ভ্রম জন্মে, তদ্রূপ যে বস্তুতে যেরূপ জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে তাহাতে চিত্ত তদাকারত্ব প্রাপ্ত হয়[৩৮।৩৯]। কিন্তু চিত্ত আত্মার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কেবল ব্রহ্মদর্শনই হইয়া থাকে[৪০]। এই নিমিত্ত ভ্রম জ্ঞান হইলে জগদাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি অহংজ্ঞান

প্রযুক্ত নশ্বর জগতের প্রশ্ন করিবেন না। যাহা সত্য তদ্বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার দর্শন বিষয়ে প্রশ্ন করায় কোন ফল নাই। সন্নিবেশ বশতঃ সুবর্ণাদির সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে[১১।১৩]। অহং ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি হয় না। কারণতা শূন্য হওয়ায় এই চরাচরের কোন সত্তা নাই। সুতরাং ইহা ব্রহ্মময়, এই প্রকার ধারণা যুক্তি সঙ্গত[১৪]। এই নিখিল জগৎ সেই ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব নিবন্ধন যে জীবাদির সৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে তাহা মায়া প্রেরিত। সুতরাং জীবকে ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা প্রতারিত হইতে হয়। সমস্তই চিন্ময় এবং চিন্ময় ব্রহ্মে বস্তু সকল লীন থাকে[১৫।১৬]। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে তখন নানা জ্ঞান থাকে না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ পদার্থেরই উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। পূর্ণ হইতে পূর্ণই বিকাশ পাইয়া থাকে[১৭]। পূর্ণাবয়ব হইতে পূর্ণই প্রকাশমান হইয়া থাকে এবং শেষে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। আত্মার যেরূপ চিন্ময়াবির্ভাব হইয়া থাকে তদ্রূপ ইহাও চিন্ময়[১৮]। যখন অকল্পিত ভাব অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণাবেশ হয়, তখন নিরুপাধি ব্রহ্ম জ্ঞান বিরাজিত থাকে। তাহা মায়াবরণে আবরিত হইলে উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ, তৎসঙ্গে অহং জ্ঞানের উদ্রেক হইয়া থাকে[১৯]। নিরাময় পরব্রহ্ম তেজোময়, অনাদি ও অনন্ত। তিনি মনের অগোচর, তিনি সম্রাট্। মায়ার দ্বারা আহৃত হইলে সংসারের উপাধি ভাবনা হয় ইহা জ্ঞানের দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে[২০।২১]। তাই পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই শব্দ ও অর্থ যুক্ত অর্থাৎ নাম রূপ যুক্ত এই জগৎ বস্তুরূপে নাই অথচ প্রতীতিরূপে আছে। দ্বৈরূপ্য বশতঃ ইহা অব্যপদেশ্য অর্থাৎ আছে অথবা নাই বলিবার অযোগ্য। ইহার তত্ত্ব বা রহস্য এই যে, ইহা একই বস্তু। ব্রহ্ম বস্তু স্বপ্রকাশ। যাহা আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয় ইহা তাহাই। ইহা যে দেখা যায়, এ দেখা তদাশ্রিত মায়া বিশেষ[২২]।

ষড়নবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

কুম্ভ বলিলেন, দেশ কাল অবস্থাদি পরিচ্ছেদ দ্বারা সুবর্ণে জন্ম-জনকতা ভাব জন্মিয়া থাকে। সত্যতঃ কোন পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে না এবং কিছুই লয় প্রাপ্তও হয় না[১]। নিরাভাস ব্রহ্ম স্ব সত্তায় অবস্থান করেন, তিনি কাহারও বীজ বা কারণ নহেন। তিনি নিত্যশুদ্ধ, তাঁহা হইতে অন্য কিছুই হয় নাই[২]। ব্রহ্ম অনন্ত এবং জগৎ ক্ষুদ্র।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে, মুনিবর! ব্রহ্মে জগৎ এবং অহং জ্ঞান সত্যতঃ নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সর্গাদি অনুভবাত্মক ইহা কিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে তাহা আপনি আমাকে সত্বর বলুন[৩]।

কুম্ভ বলিলেন, তিনি অনাদি অনন্ত জ্ঞানময়, ভুবনাদি তাঁহার বপু স্বরূপ। তিনি জ্ঞানের অতীত, তিনি শূন্য হইয়াও পরিপূর্ণ[৪]। জলের দ্রবত্ব যেরূপ, সেইরূপ, অনুভব বিশেষ দ্বারা চিৎ জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা অচিৎ অর্থাৎ জড়, চিৎ তাহার কারণ, এতদ্রূপে নিরূপিত হইতে পারে না[৫]। সেই চিন্ময় পদার্থই মায়ার দ্বারা জগদাকারে প্রথা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। এই বস্তু আছে ও এই বস্তু নাই, অথবা ইহা স্বচ্ছ ও তাহা অস্বচ্ছ, এই ভাব দ্বয়ের বিচার করিতে গেলে না থাকা ভাব অথবা অস্বচ্ছ ভাব মিথ্যা বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। ভাবিয়া দেখ, আছে এই পক্ষই স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ প্রথমোদিত। এবং নাই বা অস্বচ্ছ এ পক্ষ তাহার বিপরীত। অতএব, থাকা পক্ষের স্থিরতা, না থাকা পক্ষকে দূরীকৃত করে, করিয়া থাকা পক্ষকে খাঁটি করে[৬]। তাই বলিতেছি একই পরম পদার্থের অন্যাকার প্রতীতি মায়িক, এবং মায়িক বলিয়া তাহার কারণ নিরূপণ অগ্রাহ্য। মায়া দৃষ্টির কারণ মায়াই; অন্য কিছু নহে[৭]। অতএব, ব্রহ্ম কোন কিছুর উপাদান কারণ নহেন। তিনি তর্কের অগোচর, ইন্দ্রিয়ের অবোধ্য[৮]। সৃষ্টি সত্য, এ পক্ষ

নিরূপণের কিছুমাত্র উপায় নাই[১০]। কেবল মাত্র এক নিত্য নিরবয়ব চিৎ পদার্থ নিত্য বিদ্যমান আছে, তদ্বিপরীত জড় কোনও কালে ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। এই যে বিবিধাকার জগৎ দেখিতেছ, দেখা যায় বলিয়া ইহা লোকপ্রতীতির বিষয় হইতেছে বটে; বস্তুতঃ ইহা তাহা নহে। অর্থাৎ ইহাকে যে ভাবে দেখিতেছ, এ ভাব ইহার প্রকৃত ভাব নহে। ইহার প্রকৃত ভাব সেই ব্রহ্ম নামক চিৎ পদার্থ। অতএব, অহংভাবে, জগৎ এই শব্দে ও জগৎ শব্দের অর্থে ব্যাসক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণাভাব বশতঃ কার্য্যের অনুপপত্তি, তাই বলিয়া ইহা যাদৃচ্ছিকও নহে। ইহা সেই চিৎ পদার্থের রূপান্তর ও চমৎকার জনক[১১],[১২]। দিক্ বস্ত্বাদি শব্দ শব্দমাত্র, ঐ সকলের অর্থ আকাশ কুসুমের তুল্য। জগতীস্থ ঘটপটাদি বস্তু সকল চিতের রূপান্তর সত্য, পরন্তু এ রূপের নাশ বা পরিবর্ত্তন রহিয়াছে, সেজন্য এ সকল প্রকৃত চিৎ নহে[১]। এই যে নশ্বরের নাশ ও উৎপন্নের উৎপত্তি বর্ণন করিতেছি, ইহার উপলম্ভক কে? অর্থাৎ ইহার জ্ঞাতা কে? বলিতে বা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, চিৎ ই জ্ঞাতা। এখন ভাবিয়া দেখ, যখন নাশ কালেও চিতের অস্তিত্ব তখন নাশ শব্দ শব্দমাত্র, উহার অর্থ খ-পুষ্প সদৃশ। কেননা, জড়ের দ্বারা জড়ের নাশ অসম্ভব। অভিপ্রায় এই যে, চিৎ-ই নিত্য বিদ্যমান, তদ্ব্যতিরিক্ত জগৎ মিথ্যা। মিথ্যার আবার উৎপত্তি বিনাশ কি[১৪]? আমার জগতের নিত্য উৎপত্তি ও নিত্য বিনাশ শব্দের দ্বারা স্বীকার করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার চিদ্রূপতা স্বীকার করিতে বা জানিতে কষ্ট হয়। যাহাই হউক, ফলিতার্থে ইহা অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য কেবলমাত্র চিত্তের মহিমা, অন্য কিছু নহে[১৫]। হে মহীপাল! কেবলমাত্র এক চিৎ পদার্থ আছে, অর্থাৎ অদ্বৈতই সত্য, দ্বৈত মিথ্যা। এই যে অহংজ্ঞান, এই অহংজ্ঞানকেই তুমি চিত্ত বলিয়া জানিবে। অহং ভাবই চিত্তের রূপ, অহম্ভাবের মিথ্যায় চিত্তেরও মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়। যাহার বাসনা নাই, মন শান্ত হইয়াছে, যে আকাশের ন্যায় মৌনী, সে সদেহ বিদেহ সকল কালেই নিশ্চল ও নির্ব্বিকার। দ্বৈত পদার্থ নাই, এই বোধ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে সে তখন চিত্ত ও তদন্তর্গত অহং এই দুএর অতীত হয়। চিত্তের অধিকার বা সামর্থ্য বা বিষয় না থাকায় চিন্তাও বিনিবৃত্ত হয়[১৬],[২০]।

অতএব, নির্ম্মল, কার্য্যকারণাদিদশা পরিবর্জ্জিত, শাশ্বত, অনেকরূপী হইলেও এক আদ্যন্তরহিত সেই ব্রহ্মই আছেন এবং সমুদায় জগৎ তাহাই[৩১]।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

——()•()——

শিখিধ্বজ বলিলেন, যে যুক্তির দ্বারা আপনি চিত্তের সত্তা বা অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিলেন, তাহা পুনরায় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন[১]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! চিত্ত বলিয়া কোন পদার্থ নাই, তবে কদাচিৎ যে অনুভব হয় তাহা ব্রহ্ম স্বরূপ এবং অব্যয়[২]। যখন সমস্ত চিত্তাদি জগৎ অজ্ঞানাত্মক, তখন জ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানাত্মক জগতের সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে না। অজ্ঞানের উদয় হইলে অহং ত্বং তৎ ইত্যাদি কাল্পনিক পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের উদয় হইলে অহং ত্বং তৎ ইত্যাদি কল্পনা হইতে পারে না[৩]। কিঞ্চনাদিত অর্থাৎ মায়াপ্রসূত এই জগতের সত্তা নাই, একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্মই সৎ রূপে চিরকাল বিরাজিত আছেন। এইরূপ জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে[৪]। মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টি, অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়। এ কল্পনাও অজ্ঞানীর কল্পনা। ফলতঃ যদ্রূপ মহাপ্রলয়ে জগৎ ছিল না, তদ্রূপ পরেও নাই। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই আমি তোমার নিকট সৃষ্টি শব্দের নির্দ্দেশ করিতেছি[৫]। আত্মাকারাদীর উপাদান কারণের অভাব বশতঃ এবং অশেষ ভাব পদার্থের অকারণত্ব হেতু ও অজ্ঞান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জগতের সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞান ভাব তিরোহিত হইলে জগতের সত্তা উপলব্ধি হয় না। তবে যদি কখনও ঐরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তবে তাহা ব্রহ্মেতদ্ধ (ব্রহ্মভিন্ন) বলিয়া জানিবেন[৬।৭]। যাঁহার আখ্যা বা উপাধি নাই, যিনি অকর্ত্তৃক অবস্থায় নির্লিপ্ত ভাবে সতত বিরাজমান;

তিনি যে এই জগতের মূল ইহা অসৎ জ্ঞান। অনুপপত্তি হেতু আত্মসত্ত্ব উপলব্ধি হয় না[৮]। সোপাধি অনিরাকার আত্মবান্ ঈশ্বর জগদাদি বিনির্ম্মাণ করেন ইহা ইতিহাসাদির মত[৯]। ঐ প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তের সত্তা বর্ত্তমান থাকে না। হে মহারাজ! জগদাদির যখন সত্তা নাই, তখন তদ্গত চিত্ত কিরূপে সত্তাবান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে[১০]। বাসনাবিষ্ট চিৎ চিত্ত নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, সুতরাং বাসনাধীন জগৎও অসৎ। অসৎ পদার্থাত্মক চিত্তের সত্যতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে[১১]। ব্রহ্মই আপনাতে আপনার দ্বারা এই জগদ্ভাব রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই সেই রচনার অর্থাৎ কল্পনার অপর এক নাম চিত্ত। অতএব, এই সকল দৃশ্য বস্তুতঃ উৎপন্ন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণের অভাব বশতঃ কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। সে কথা চিত্ত শব্দেরও বিষয় অর্থাৎ চিত্তও সত্যতঃ উৎপন্ন নহে। জগতের মূল চিদাকাশ, যাহা পরমাত্মশব্দে উক্ত হয়, সর্ব্বত্র তাহারই বিকাশ, চিত্তও তাহার বিকাশ, সেজন্য চিৎ ব্যতীত চিত্তের অনস্তিতা[১২।১৩]। এই দৃষ্ট জগৎ বাসনাধীন, আমাদিগের উৎপত্তিও বাসনাধীন। কারণের অভাব হইলেই মন নির্ব্বাসন হইয়া থাকে। স্বপ্ন যেমন অলীক, সেইরূপ, অহং ত্বং এই জগৎ ইত্যাদিও বাস্তবিক নহে[১৬]। যখন বাসনা বিরহিত হইয়া থাকে, তখন বাসনাধীন জগতেরও উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। অতএব, বাসনাত্মক চিত্তেরই বা কিরূপে সত্তা উপলব্ধি হইতে পারে[১৭]। যাহাদিগের জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, তাহারাই এই ভ্রমাত্মক জগৎ অবলোকন করিয়া থাকে। প্রথমে নিরাকার এবং অসৎ চিত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে[১৮]। কারণাভাব বশতঃ সৃষ্ট্যাদির প্রকৃত উদ্ভব হইতে পারে না। যদি জন্য জনক ভাব না থাকে, তবে জগৎ নিত্য এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে দৃশ্য বস্তু সকল উৎপত্তিধ্বংসাদি ক্রিয়া রহিত, ইহা কেবল জ্ঞানভেদ মাত্র[১৯]। অনাদিত্ব অজত্ব স্থূলাদি ও সাকারাদি ভাব, এ সমস্ত কেবল মাত্র অনুভব বিশেষ[২০]। মহাপ্রলয় প্রভৃতি লোকতত্ত্ব, শাস্ত্র ও অনুভব দ্বারা নাই বলিয়া প্রতিপাদন করা উচিত[২১]। লৌকিক ব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় উপদেশ, বেদার্থ, এ সকলের দ্বারা ঐ সকল (মহাপ্রলয়াদি) বিদিত হইলেও প্রাগুক্ত কারণাভাব যুক্তিতে ঐ সকলের পারমার্থিকতা নাই বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে[২২]। শাস্ত্র প্রমাণ

নহে, বেদ অপ্রমাণ, এ কথা যাহারা বলে, তাহারা অসৎ, অতিমূঢ়, সাধু সজ্জনগণ তাহাদের সংশ্রব করেন না[২৩]। যদিও শ্রুতি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, তথাপি, তাহার তাৎপর্য্য বা অভিপ্রায়, জগতের ব্রহ্মাভিন্নতা পক্ষেই পর্য্যবসিত। সুতরাং তাহা নিরাকার ব্রহ্মের সাকার কারণতা পক্ষ নিরাকরণ করিতে সমর্থ[২৪]। হে মুনে! এইরূপ এইরূপ আলোচনার পর নিশ্চয় হয় যে, জগৎ নাই, ইহার কোন কার্য্য-কারিতাও নাই। সমস্তই ভ্রমপ্রপঞ্চ[২৫]। তাই বলিতেছি, এ সমস্তই পূর্ব্বাপর উভয় কালেই নিরাময়[২৬]। ব্রহ্মই সর্ব্বরূপী, এবং ব্রহ্মই সৃষ্টি প্রলয়াদি রূপে বিরাজমান[২৭]। ব্রহ্ম আপনিই আপনার জগদ্রূপ শরীর দেখেন, আবার সে দর্শন ত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে স্থিত হন[২৮]। শাস্ত্র শ্রবণ ও তাহার মননাদি জনিত আত্মবহত্ত্বের প্রতীতি দৃঢ় হইলে ইহা তাহা জগৎ ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। চিত্ত ও চিত্তের গোচরীভূত দ্বৈতাদ্বৈত কল্পনাও অন্তর্হিত হয়[২৯]।

যে কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, সমস্তই নিরালম্ব বা নিরাধার, অর্থাৎ মিথ্যা বুদ্ধির মহিমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। নানা অনানা, এক ও বহু, এ সকল ব্যবহারও নিরালম্ব। অতএব, যাহা থাকে থাকুক, তুমি কাষ্ঠের ন্যায় মৌন থাক[৩০]।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

নবনবতিতম সর্গ।

—()•()—

মহাত্মা শিখিধ্বজ বলিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! আপনার অসীম করুণা গুণে আমার মোহজাল অপসৃত হইয়াছে। আমি এক্ষণে বিমল বুদ্ধি ও পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিলাম, আমার সংশয় সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে আত্মদর্শন লাভ করিলাম[১]। দুস্তর অর্ণব সদৃশ মায়া সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ায় আমার চিরন্তনীন জ্ঞেয় পদার্থের

জ্ঞান লাভ হইল। আমি এক্ষণে চিরশান্তি লাভ করিলাম, এবং আমি অনুভূতির স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া নিরাময় হইলাম[২]। আমি ভবসাগরে বহুদিবস অপ্রবুদ্ধাবস্থায় ভ্রান্তিজালে বিজড়িত ছিলাম, এক্ষণে আমি অক্ষুব্ধ হইয়া অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম[৩]। হে মুনিবর! এক্ষণে আমার অহং জ্ঞান তিরোহিত হইয়া পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে[৪]।

কুম্ভ বলিলেন, প্রশান্ত অর্ণবোদরে আবর্ত্ত যেমন উদ্ভূত হইয়া আবার তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে, সেইরূপ, এই সংসার সমুদ্রে জীবও পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া আবার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৫,৬]। ইহা ব্রহ্মরূপ চিরস্থির শব্দজ্ঞানাধীন আকাশের যেমন সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ, এই আমি ও এই জগৎ ইহারও আভাস প্রতীত হইয়া থাকে[৭]। ইহা আদ্যন্ত রহিত, মায়া প্রভাবে চিত্ত চমৎকারের ন্যায় কদাচিৎ উদ্ভব হইয়া থাকে[৮]। সুবর্ণাদি যেমন কটকাদিতে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ, জগৎও মায়ার দ্বারা জীবাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব, সুবর্ণ যেমন কটকাদি হইতে পৃথক নহে, তদ্রূপ, জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে[৯]। যেমন স্বয়ম্ভু সঙ্কল্প দ্বারা উদ্ভূত সুতরাং সঙ্কল্পময়, তদ্রূপ, তদন্তর্গত জীবও সঙ্কল্পময় এবং বন্ধ মোক্ষও সঙ্কল্পের অধীন[১০]। হে মহারাজ! অহং বুদ্ধি হইলে বন্ধন দশা প্রাপ্ত, এবং সোঽহং বুদ্ধি হইলে অর্থাৎ অহং বুদ্ধির অভাব হইলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[১১]। যে সাক্ষিচৈতন্য বন্ধ, মোক্ষ ও সঙ্কল্প প্রভৃতিকে জানিতেছে, প্রকাশ বা প্রথা প্রাপ্ত করিতেছে, সেই কেবল অনুভূতিরূপ চৈতন্যই ব্রহ্ম, এবং তাহাই তৎ ও সৎ প্রভৃতি শব্দের বোধ্য[১২]। আমি আমি নহি, এতদ্রূপ জ্ঞানের নাম সিদ্ধি ও আমি অমুক, এতদাকার জ্ঞান আপদ অর্থাৎ বন্ধন। অতএব, আমি আমি নহি, পরন্তু ব্রহ্ম, এইরূপ বিশুদ্ধ বোধে স্থিত হও[১৩]। সঙ্কল্প ত্যাগ হইলেই কেবল ও বিশুদ্ধ বোধের উদয় হয়, সুতরাং সঙ্কল্প ত্যাগই সিদ্ধি লাভের উপায়। সঙ্কল্প পদার্থ অসৎ অর্থাৎ একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র, সেজন্য উহার ক্ষয় হইয়া থাকে[১৪]। ব্রহ্ম তর্কাদির অতীত, সেজন্য তিনি কোনও কিছুর প্রকৃত কারণ নহেন। অপিচ, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। সুতরাং বুঝা উচিত যে অহং জ্ঞানেরও কারণ নাই। ব্রহ্মাতীত পদার্থ নাই, এ ভাব সিদ্ধ হইলে তখন আর এ সকলের

জ্ঞান জন্মে না। অহং জ্ঞানের কোন বাস্তব কারণ না থাকায় বুঝিতে হইবে যে উহার বাস্তব জন্মও নাই[১৫।১৬]। যদি অহং ভাব না থাকে তাহা হইলে সংসার কি তাহা বুঝিয়া দেখ। অর্থাৎ সংসারও থাকে না এবং সংসারের অভাবে পরমাত্মাই অবশেষিত হয়[১৭]। যে কিছু অবভাস, সমস্তই সেই পরমাত্মায়। অচল যেমন কেবল শিলাকীর্ণ, সেই-রূপ, এই নিখিল পদার্থও পরব্রহ্মে সমাকীর্ণ। অর্থাৎ তাহাতেই উদ্ভূত সুতরাং পরব্রহ্ম হইতে কিছুই ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া তদাত্মতা লাভ করুন[১৮।১৯]। সঙ্কল্প নষ্ট হইলে সঙ্কল্পিত নগরের যেরূপ অবস্থা হয়, জগতের সেইরূপ অবস্থা অর্থাৎ অসন্ময়তা জানিবেন[২০]। জগৎ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যিনি জগৎ পরিদর্শন করেন, তিনি এই জগৎকে ছায়া পুরুষের সদৃশ বলিয়া অবগত হন[২১]। যিনি জ্ঞানে পার-দর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিয়াছেন পণ্ডি-তেরা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন[২২]। সুবর্ণ যেরূপ কটকাদি হইতে বিভিন্ন নহে, স্পন্দহীন বায়ু যেরূপ, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপও সেই-রূপ[২৩]। রূপ দর্শন ও মনের অবধারণা সমস্তই ব্রহ্মে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেমন উর্ম্মি শব্দের অর্থ রহিত হইলে বহু জল ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতীতি জন্মে না, তদ্রূপ, সৃষ্টি পদার্থের অর্থ রহিত হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভব গোচর হয় না[২৪।২৫]। সৃষ্টিও ব্রহ্ম। সৃষ্টির দ্রষ্টাও ব্রহ্ম। সুতরাং সৃষ্টিশব্দও ব্যবহারিক রহিত হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই অনুভূত হয় না[২৬]। ব্রহ্ম শব্দের অর্থের দ্বারা সৃষ্টি ও সৃষ্টি শব্দের অর্থ সম্পত্তির দ্বারা ব্রহ্মই প্রতীত হয়[২৭]। সৃষ্টি শব্দ কেন, সমস্ত শব্দের ভাবনা অর্থাৎ অর্থ বিচার দ্বারা কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা নিশ্চয় হয়। সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে বেদ্য ও বেদন এই দ্বি ভাবই বিনিবৃত্ত হয়, তখন এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না[২৮।২৯]।

যাহাতে নানা জ্ঞান উপশান্ত, তাদৃশ এক ব্রহ্মই আছে। তাহা জ্ঞপ্তিরূপ ও প্রস্তরের ন্যায় অন্তর্ব্বাহে একরূপ[৩০]।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত।

শততম সর্গ।

—()—

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে! কারণ বা উপাদান যাহার যেরূপ তাহার কার্য্যও সেইরূপ সংসাধিত হইয়া থাকে[১]।

কুম্ভ বলিলেন, যেখানে কারণ বিদ্যমান থাকে, কার্য্যও সেই স্থানে হইয়া থাকে। যে স্থানে কারণতা নাই, কার্য্যও সে স্থানে হইতে পারে না[২]। এখানে অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারণায় কোনও কারণ নাই সুতরাং কার্য্যও নাই[৩]। কারণাধীন যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাই কারণ-বিশিষ্ট। যাহার উৎপত্তি হইতে পারে না তাহার সাদৃশ্য কোথায়[৪]। যাহার বীজ নাই তাহার উৎপত্তিও সম্ভবে না। যাহা তর্কের দ্বারা অনুমিত হয় না, যাহার সংজ্ঞা নাই, তাহার বীজ কিরূপে সম্ভবে[৫,৬]। যিনি কর্ত্তা ও কারণ উভয়ের অতীত, সেই শিব অর্থাৎ পূর্ণ মঙ্গল বস্তু কিরূপে সকারণ হইতে পারে? অতএব, জগৎ এই শব্দের অর্থ সেই জ্ঞপ্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৭]। ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ, এইরূপ বা এই উপদেশ তুমি গ্রহণ ও ধারণ কর। সম্যক্ জ্ঞান রহিত অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ যাহা বা যে বিষয় দেখে, জগৎ তাহাদের নিকট সেই বিষয়েই পরিব্যাপ্ত[৮]। প্রমাণেও পাওয়া যায়, কেবল মাত্র এক বিশুদ্ধ চিৎ অজর ও অমর বস্তু আছে। এই জগৎ তাঁহারই বপু অর্থাৎ অজ্ঞদশায় বহির্দ্দৃশ্য[৯]। হে রাজন্! চিত্তের যে অন্যথা ভাব, তাহাই তাহার নাশ, ইহা পণ্ডিতগণের অনুভব ও উক্তি[১০]। চিত্ত নাশস্বভাব বিশিষ্ট ও নাশাত্মক অর্থাৎ কল্পনা সকল ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে সুতরাং মানিতে হয় যে চিত্তেরও ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস হইয়া থাকে। যাহার প্রতিক্ষণেই ধ্বংস হইয়া থাকে তাহাকেই চিত্ত বলিয়া থাকে[১১]। সঙ্কল্প সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই নষ্ট হইয়া যায়। উদারাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক সঙ্কল্প ব্যতিরেকে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না[১২]। যদি নাম মাত্রের দ্বারা বিশ্বের স্থিতিত্ব অঙ্গীকার করা

যায়, তবে নামার্থের দ্বারা তাহার স্থিতিত্ব কেন না অঙ্গীকৃত হইবে [১০]? যিনি হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আমি শূদ্র বলিয়া থাকেন, তিনি বিপ্র হইলেও কিরূপে তাহাতে বিপ্রত্ব থাকিতে পারে[১৪]? যিনি আমি মৃত হইয়াছি বলিয়া স্থিত হন, জীবিত থাকিতে তাহাতে মৃত্যুর আরোপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে[১৫]? অলাত চক্রের তুল্য অথবা মৃগতৃষ্ণিকায় জলভ্রমের ন্যায়, অথবা প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দ্বিচন্দ্রের ন্যায়, কিম্বা বালকের বেতাল ভীতির ন্যায় যাহা ভ্রমাকৃতি বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাকে কি বলিয়া সত্য বলিয়া অনুমান করিব? চিত্ত অজ্ঞান ও ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে[১৬।১৭]। চিত্ত ও অজ্ঞান একই বস্তু, তাহা অসৎ স্বরূপ হইলেও সৎ স্বরূপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সম্যক্ জ্ঞানই জ্ঞান, তদ্বিপর্য্যয় অজ্ঞান[১৮]। হে সাধো! যেমন ইহা মরীচিকা, এই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে ইহা জল এই অসম্যক্ জ্ঞান বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, ইহা জগৎ এই অসম্যক্ জ্ঞানও ইহা ব্রহ্ম এই সম্যক্ জ্ঞানের উদয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়[১৯।২০]। চিত্ত নাই, যাহাকে চিত্ত বলিয়া জানিতেছি, তাহা চিত্ত নহে, এই সম্যক্ জ্ঞান চিত্তের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। যেমন রজ্জু এই জ্ঞান সর্প জ্ঞানের নাশক, সেইরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞানও চিত্ত জ্ঞানের বাধক। কেবল চিত্তজ্ঞানের নাশক বা বাধক নহে, সম্যক্ জ্ঞান সমস্ত ভ্রমসম্ভূত বিষয়ের বাধক অর্থাৎ নাশক[২১।২৩]। অতএব, চিত্ত নাই, অহঙ্কারাদিও নাই, সমস্তই ভ্রম, ভ্রমের বশে সঙ্কল্প ও চিত্তাদি কল্পিত হইয়াছে। তাই পণ্ডিতগণ বলেন, প্রবুদ্ধ হইলে সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ, তৎসহ চিত্তকল্পিত সমস্ত বস্তুর পরিত্যাগ সিদ্ধ হয়[২৪।২৫]। সঙ্কল্পসৃষ্ট পদার্থ অসঙ্কল্প দ্বারা তিরোহিত হয়, ইহা বায়ু ও অগ্নি শিখার দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে (স্পন্দ ধর্ম্মের অভাবে বায়ুর বায়ুত্ব তিরোহিত ও জ্বলন ধর্ম্মের অভাবে বহ্নির বহ্নিত্ব তিরোহিত হয়)[২৬]। সমুদ্র যেমন কেবল বারিময়, পদার্থান্তর নহে, সেইরূপ, জগৎও নিবিড় আত্মতত্ত্ব, অন্য কিছু নহে[২৭]। আমি, তুমি, আমার ও দৃষ্ট, চিত্ত বা মন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়, এ সমস্তই সেই নির্ম্মল আত্মা[২৮]। আত্মাই ঘটপটাদির আকারে অবভাসিত হইতেছে। আমি তুমি চিত্ত, এ সকল কল্পনা মাত্র[২৯]। জগদ্ভ্রমের কোনও কিছু জন্মে না, মরেও না। এ সকল চিতি-শক্তির উন্মাদ অর্থাৎ

কাল্পনিক অবস্থা। সেই চিৎ-শক্তিই সৎ ও অসৎ রূপে ভাসমান[৩০]। সমস্তই আত্মা বা পরব্রহ্ম। ব্রহ্মই দ্বিত্ব ও একত্ব প্রকারে রাজমান। তাঁহাতে ভ্রমও সত্যতঃ নাই, অসদ্ভ্রমও সত্যতঃ নাই[৩১]। হে মহাবুদ্ধে! তুমি ইন্দ্রিয়াদির আকারে অনুভূত হইতেছ। আকাশ যেমন দগ্ধ হয় না, সেইরূপ তুমিও দগ্ধ হও না[৩২]। বিনাশ ও বৃদ্ধি তোমার নহে। তুমি কেবল ও নির্ম্মল আকাশের সদৃশ[৩৩]। ইচ্ছা শক্তি ও অনিচ্ছা শক্তি ও অন্যান্য শক্তি তোমারই স্বরূপ সন্নিবিষ্ট। চন্দ্র অংশু অর্থাৎ কিরণ ব্যতীত পদার্থান্তর নহে[৩৪]। যাহা আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা অজ, অজর, অমল, অনাদি, অনন্ত, সৎস্বরূপ, সদা একরূপ ও বিকারাদি ধর্ম্ম রহিত[৩৫]।

শততম সর্গ সমাপ্ত।

একশততম সর্গ।

—()⌒()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, কুম্ভের অমৃতনিস্যন্দী অকৃত্রিম বচন শ্রবণ করিয়া মহারাজা শিখিধ্বজ চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নব ভাব প্রাপ্ত হইলেন[১]। শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক স্তিমিতলোচন ও সংযত চিত্ত হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন[২]। অনন্তর কুম্ভরূপিণী চূড়ালা মুহূর্ত্তমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন রাজাকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন[৩]।

কুম্ভ বলিলেন, শুদ্ধ নির্ম্মল এই পথে নির্ব্বিকল্প ব্যক্তির ন্যায় আপনি বিশ্রান্ত হইতেছেন[৪]। কখন অন্তর্ব্বোধ প্রাপ্ত হইতেছেন, কখনও বা ভ্রান্তিজ্ঞানও প্রাপ্ত হইতেছেন। কখনও বা জ্ঞেয় পদার্থ নিরূপণ পূর্ব্বক দ্রষ্টব্য পদার্থ পরিদর্শন করিতেছেন[৫]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ বশতঃ আমি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছি[৬]। আমি

মহানুভব সাধু ব্যক্তিগণের বেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছি। অপূর্ব্ব অমৃত সার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে মহামৃত শত শত জন্মে লাভ করিতে পারিতাম না, তাহাও অদ্য আপনার সমাগম বশতঃ লাভ করিলাম[৭।৮]। কিন্তু হে কমললোচন! ইতিপূর্ব্বে আমি কি নিমিত্ত আত্মপদ লাভ করিতে পারি নাই তাহা আমাকে বলুন[৯]?

কুম্ভ বলিতে লাগিলেন, ভোগ বাসনা তিরোহিত না হইলে, মন শান্তি প্রাপ্ত না হইলে, শুভাশুভ কর্ম্ম পাক প্রাপ্ত না হইলে, আত্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ সকল হইলে চিত্ত যখন বিশ্রাম করিতে থাকে তখন গুরুর (উপদেষ্টা গুরুর) উপদেশ নিচয় কার্য্যকারী হয়। শুভ্র বস্ত্রেই কুসুম রঙ্গের রঞ্জনা জন্মে, মলিন বস্ত্রে নহে[১০।১১]। শরীরী মাত্রেরই অসংখ্য কষায় অর্থাৎ অশুভ সংস্কার থাকে, সে সকল পাক প্রাপ্ত না হইলে তত্ত্ববোধ জন্মে না। বহুকাল পরে তোমার কষায় অর্থাৎ অশুভ বাসনাদি পাক প্রাপ্ত হইয়াছে। হে সাধো! যেমন বৃক্ষের ফল পরিপক্ক হইলে বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া যায়, তেমনি, দেহীদিগের কষায় গণও পক্ক হইলে শরীর হইতে নিক্রান্ত হয়[১২।১৩]। অদ্য আপনি আমাকর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইলেন। হে মতিমন্! আপনার অজ্ঞানরাশি অদ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে[১৪।১৫]। আপনি অদ্য জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, আপনি অদ্যই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং অদ্যই প্রবুদ্ধ হইলেন[১৬]। আপনার শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্মেরই অদ্য সংক্ষয় হইল। সাধুজন সংসর্গে অদ্য আপনার বাসনা বিদূরিত হইল[১৭]। হে নরপতে! দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধের ন্যায় যতক্ষণ অজ্ঞান তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ "অহং" "মম" ইত্যাকার অভিমানও দূরীকৃত হয় না[১৮]। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনার বোধোদয় হইয়াছে। হে ভূপতে! আত্মাভিমান নষ্ট হওয়াতে আপনি বিশেষ প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হইয়াছেন[১৯]। যতক্ষণ হৃদয়ে মনের সত্তা থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানও অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তের অভিমান ভাগ পরিত্যক্ত হইলে জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়[২০]। চিত্তের অজ্ঞানতা নিবন্ধন দ্বিত্ব ও একত্বাদি জ্ঞান হয়, একত্ব দ্বিত্বের যখন তিরোধান হয়, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি না থাকে, তখনই পরমা গতি লাভ করিতে পারা যায়[২১]। হে নরপতে! আপনি প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, বিমুক্ত হইয়াছেন, আপনি অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি সদসৎ সমস্ত পরিত্যাগ

করিয়াছেন এবং সৎ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন[২২]। আপনি বীতশোক, নিরভিমান এবং নিঃসঙ্গ হইয়া আত্মবান্ হইয়াছেন। আপনি মহাপ্রভাব সম্পন্ন নির্ম্মল ও মৌনী মুনিতুল্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[২৩]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! মূর্খ প্রাণীগণের চিত্তই এইরূপ হইয়া থাকে। হে প্রভো! প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চিত্ত কখনও এরূপ হয় না[২৪]। যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহারা কিরূপে বিহার করেন তাহা বলুন। যাঁহাদের কোনরূপ বাসনা নাই আপনাদের মত মহানুভাব তাঁহারা কি করিয়া থাকেন[২৫]। আপনি আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক সে সকল বলুন। আপনি আমার সম্বন্ধে অতীব প্রিয়তম, এইরূপ অনুভব করিতেছি। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না[২৬]।

কুম্ভ বলিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞ! আপনি যাহা বলিতেছেন সে সকলই সত্য তাহার অন্যথা নাই। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চিত্তের প্ররোহ নাই[২৭]। পুনর্ব্বার জন্ম যোগ্য বাসনা জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের নাই, যে বাসনার দ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ সে কর্ম্ম পরিগ্রহ করেন না, এইজন্য তাঁহারা আর ভব যন্ত্রণা ভোগ করিতে জন্ম গ্রহণ করেন না। জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ সকল অবস্থাতেই সংযমী হইয়া থাকেন, তাঁহারা আসক্তি শূন্য হইয়া পরিভ্রমণ করেন[২৮-৩০]। চিত্ত যখন মোহ প্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তখনই চিত্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং প্রবুদ্ধ হইলে উহা সত্ত্ব শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। অপ্রবুদ্ধ চিত্তস্থ আধী সমুদায় দূরীভূত হইয়া থাকে[৩১]। চিত্তই পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু সত্ত্ব পুনরায় উৎপন্ন হয় না। হে ভূপতে! অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন প্রাপ্ত হন না[৩২]। এক্ষণে আপনি সত্ত্ববান্ হইয়াছেন, মহান্ ও ত্যাগী হইয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকারেই চিত্ত পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন[৩৩]। হে রাজন্! অদ্য আপনি সমস্ত বাসনা হইতে বিরত হইয়াছেন। আকাশ যেমন নির্ম্মল, সেইরূপ, আপনিও সুনির্ম্মল হইয়া অবস্থান করিতেছেন[৩৪]। আপনি অত্যর্থ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত সংস্থান প্রাপ্ত হইলেন। আপনা কর্ত্তৃক যখন সমস্তই পরিত্যক্ত হইল, তখন আপনিই ত্যাগী[৩৫]। হে সাধো! স্বর্গ অপবর্গ ও বিত্ত (ধনাদি) এ সকল

তপস্যার ফল, দানের ফল নহে। যাহারা চিত্ত পরিহার পূর্ব্বক সংযত হইয়া থাকে তপস্যাদি তাহাদের পক্ষে অধিক ফল নহে[৩৬,৩৭]। সদ্বস্তু কদাচিৎ নাশ প্রাপ্ত হয় না ও ভাবাভাবাদির দ্বারা পরিবেদন প্রাপ্ত হয় না[৩৮]। হে মানদ! দৃষ্ট পদার্থের সংস্থান সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। ক্রিয়া সমূহ সিদ্ধির দ্বারা শুভ হইয়া থাকে[৩৯]। যিনি সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি কি পিত্তল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? (সুবর্ণ=তত্ত্বজ্ঞান। ক্রিয়াসিদ্ধি=পিত্তল। জ্ঞানীরাও নিরভিমানে ক্রিয়াসিদ্ধি গ্রহণ করেন)। চূড়ালা সংসর্গেও অনায়াসে আপনার জ্ঞাতৃতা সম্পন্ন হইতে পারে[৪০]। তবে আপনি কি নিমিত্ত অনর্থক তপোধর্ম্মে আত্মাকে বিনিযুক্ত করিয়াছেন। আশ্রমাদির বিকল্প কুকর্ম্মী ব্যক্তিই করিয়া থাকে[৪১]। হে সুমতে! তপোধর্ম্মের আদ্য ভাগ আচরণাবস্থা, অন্তঃভাগ ফলক্ষয়াবস্থা, মধ্য প্রদেশ স্বর্গাদি ভোগাবস্থা। তবে আপনি কি নিমিত্ত তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বদ্ধ দশায় রহিয়াছেন? চিত্তরূপ আকাশে সমস্ত ভাবই উদিত হইয়া থাকে[৪২,৪৩]। তাহাতেই সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্গণ এইরূপ কার্য্য ও সঙ্কল্প গ্রহণ করেন না[৪৪]। হে শিখিধ্বজ! বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ কর। হে সখে! যে ইষ্ট প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই প্রার্থনা কর[৪৫]। অর্থাৎ আত্মলাভই লাভ, তাহা তোমার সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর তোমার কিছুই প্রার্থিতব্য নাই। যে নারীর প্রণয়াস্পদ পতি আছে সে কি পত্যন্তর প্রার্থনা করে? তাহা করে না। সেইরূপ, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের কোনও কিছু প্রার্থিতব্য নাই। তাঁহারা জানেন, এ সকল সঙ্কল্পরচিত ও অরমণীয়[৪৬]। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ সমস্তই তাঁহাদের নিকট আত্মা[৪৭]। জগতের অসৎ অংশ মায়িক, সদংশ আত্মা। তুমি অসৎ অংশ ত্যাগ কর, নিস্পৃহ হও ও সদংশে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হও[৪৮]। মনঃকল্পিত পদার্থে আস্থা করিও না। চিত্তকে স্থির রাখিয়া অবস্থান কর। চিত্ত যদি ধাবমান না হয় তাহা হইলে সংসারও থাকে না[৪৯]। হে মহীনাথ! যে কিছু দুঃখ সমস্তই চিত্তচাপল্য জাত অর্থাৎ বাস্তব নহে। যাহার চিত্ত স্থির, চাপল্য রহিত, সে মহা-আনন্দী ও সেই পুরুষই মোক্ষ রাজ্যের রাজা[৫০,৫১]। হে তত্ত্বজ্ঞ!

চিত্তের গতি রুদ্ধ করিয়া, অথবা চাপল্য অচাপল্য সমান বোধ করিয়া, একভাবে স্থিতি কর[৫২]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বিভো! স্পন্দ ও অস্পন্দ এ দুটী বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কিরূপে উহার ঐক্য সিদ্ধ করা যায় তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন[৫৩]

কুম্ভ বলিলেন, এ সমুদায় জগৎ চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যেমন জলময় সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী উঠে, সেইরূপ, চিৎসমুদ্রেও বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী জন্মে। অর্থাৎ যেমন জলের স্পন্দন লহরী, তেমনি, বুদ্ধির স্পন্দন চিৎপদার্থেরই স্পন্দন বলিয়া গণ্য। যাহার ব্রহ্ম, চিৎ, সত্ত্ব, এই সকল নাম, সেই বস্তুকেই মূঢ়েরা জগদ্ভাবে দর্শন করে[৫৪,৫৫]। সেই যে মিথ্যা স্পন্দন তাহাই চিত্ত নামের নামী। এবং তাহারই মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ে স্পন্দ অস্পন্দের ঐক্য হয় এবং তাদৃশ সম্যক্ জ্ঞানে স্পন্দময় সৃষ্টির বিলয় সম্পন্ন হয়। যেমন রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রান্তি থাকে না, সেইরূপ[৫৬,৫৮]। স্পন্দনই চিত্ত, তাহা ক্ষুদ্র আর অস্পন্দনই মহান্। তাহা বাক্যের বোধ্য নহে[৫৯]। শাস্ত্রালোচনা, সাধুসজ্জনের সংসর্গ ও নিরন্তর অভ্যাস, এই সকল হইতে সেই পদ উদয় প্রাপ্ত হয়[৬০]। যে কিছু প্রকাশ সমস্তই আত্মার বিভূতি। যাহাদের আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই আত্মার ঐ প্রকার স্বরূপ বুদ্ধিগোচর করে। এবং তদ্‌ঘটিত বাক্যও তাঁহাদের অনুভবে প্রকাশমান্ হয়[৬১]।

হে সাধো! তুমি এক্ষণে সার প্রাপ্ত হইয়াছ, আত্মপদে স্থিতি করিতেছ এবং শোকশূন্য হইয়াছ। এখন তুমি অনাদি অলক্ষ্য নিজ পদে স্থিতি কর[৬২]।

একশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

—()○()—

কুম্ভ বলিলেন, হে মহীপতে শিখিধ্বজ! যাহা হইতে এই সমস্ত উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সে সমস্তের বৃত্তান্ত আপনার গোচর করিয়াছি[১]। হে মুনিনায়ক! এক্ষণে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, এবং বিবেচনা করিয়া, গোচরীভূত পদার্থ সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন[২]। অমর সভায় ব্রহ্মলোক হইতে ভগবান্ নারদ মুনি সমাগত হইয়াছেন। আমি এই পর্ব্ব কালে স্বর্গে গমন করিতেছি[৩]। আপনি যদি তথায় আমার সন্দর্শন না পান তবে কোপপরায়ণ হইবেন না। কারণ গুরুতর ব্যক্তি সকল উদ্বেজিত হন না[৪]। আপনি সঙ্কল্প সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ বস্তুও আপনার প্রার্থিতব্য নাই। আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন ইহাই পবিত্র দৃষ্টি[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুষ্পহস্ত শিখিধ্বজ পূজনীয় কুম্ভকে প্রণাম পূর্ব্বক বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তিনি তৎকালে অন্তর্দ্ধান করিলেন। যে হেতু সাধ্বী স্ত্রী সকল ভর্ত্তার প্রণাম গ্রহণ করেন না[৬]। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকল জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ, মহারাজ শিখিধ্বজ সম্মুখে আর কুম্ভকে দেখিতে পাইলেন না[৭]। কুম্ভ সহসা অন্তর্হিত হইলে শিখিধ্বজ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। উক্ত বিস্ময় জনক ব্যাপার চিন্তা করিতে করিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য। যেহেতু সমাগত কুম্ভকে আমি উপদেশ ব্যপদেশে সাক্ষাতে দেখিয়াও চিনিতে পারিলাম না[৮,৯]। নারদ পুত্র কুম্ভই বা কে? শিখিধ্বজ নামধারী আমিই বা কে? সমস্তই কালের গতি। পরে তিনি আমিই সেই, এইরূপে প্রতিবোধিত হইলেন[১০]। দেবপুত্র আমাকে যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। আমিও মোহ নিদ্রা হইতে সম্যক্ প্রকারে প্রতিবোধিত হইয়াছি[১১]। এই কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, এই কর্ম্ম

অনমুষ্ঠেয়, এই প্রকার মিথ্যা মায়াচক্রে ক্রিয়াজালকুকর্দ্দমে আমি নিমগ্ন রহিয়াছিলাম[১২]। এক্ষণে বুঝিতেছি, ইহাই শুদ্ধ শীতল এবং স্বকীয় পদ। রসাঞ্জনের ন্যায় আমাকে শীতলতা প্রদান করিতেছে[১৩]। আমি শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি আর তৃণাগ্রও ইচ্ছা করি না, আমি সংস্থিত হইয়াছি[১৪]। নির্ব্বাণের অর্থাৎ অপবর্গ লাভের আশায় রাজা শিখিধ্বজ শৈলবাসে মৌনাবস্থায় অবস্থিত রহিলেন[১৫]। সঙ্কল্পরহিত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তথায় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অধিবাস করিতে লাগিলেন[১৬]। মহারাজ শিখিধ্বজ তথায় চিত্ত সংযমনাদির দ্বারা অচির কাল মধ্যে সুষুপ্তের ন্যায় বিচারসাধ্য পদ লাভ করিতে লাগিলেন[১৭]।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে চূড়ালা ও তাদৃশ শিখিধ্বজ রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[১]।

কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা স্ব ভর্ত্তা শিখিধ্বজ রাজাকে প্রবোধ দিয়া অন্তর্হিত হইয়া সহসা আকাশ মণ্ডলে উত্থিতা হইলেন[২]. গগনমণ্ডলে মায়ারচিত দেবপুত্রাকৃতি পরিত্যাগ করিয়া লোকললামভূতা নয়নমনোরঞ্জন রমণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন[৩]। আকাশ মার্গে গমন করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং পৌরজনের দর্শনীয়া হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন[৪]। তিন দিবস পরে পুনরায় গগনমণ্ডলে অধিরোহণ করিয়া কুম্ভ, যোগের দ্বারা পুনরায় শিখিধ্বজ বনে প্রবেশ করিলেন[৫]। তিনি সেই বনভূমিতে নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ, অতএব, দীর্ঘতর তরুবরের ন্যায় সুস্থির নিজ পতিকে সন্দর্শন করিলেন[৬]। আমি কি এক্ষণে এই স্থানেই বিশ্রাম করিব, পুনঃ পুনঃ এই বাক্যের আলোচনা

করিতে লাগিলেন[৭]। এক্ষণে ইনি কি এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিবেন? অথবা আমি এই স্থানেই প্রবুদ্ধ করিব[৮]। অথবা ইনি কিয়ৎকাল রাজ্যেই হউক আর বনবাসেই হউক অবস্থান করুন, পরে উভয়েই দেহ ত্যাগ করিব[৯]। যাহাই হউক, মদীয় উপদেশ অতি বিষম পরিণাম প্রাপ্ত হইবে না অর্থাৎ আমার কথায় প্রবুদ্ধ হইবেন না। যাহা হউক, অভ্যাস্ত যোগ দ্বারা আমি ইহাকে জাগ্রৎ করিব[১০]। চূড়ালা এই প্রকার চিন্তা করিয়া নিজ স্বামী শিখিধ্বজের অগ্রে ও সেই বনভূমিতে ভয়প্রদ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন[১১]। পর্ব্বত শিখরে শিলা খণ্ডের ন্যায় রাজা ইহাতে বিচলিত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ সেইরূপ করিয়াও শান্ত রাজাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না[১২]। যখন তিনি রাজাকে পাতিত ও চালিত করিয়াও জাগরিত করিতে পারিলেন না, তখন, কুম্ভরূপিণী চূড়ালা অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইলেন[১৩]। বিস্ময় সহকারে বলিলেন, ভগবান্ এক্ষণে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি ইহাকে কি উপায় দ্বারা প্রবোধিত করিব[১৪]। অথবা এই মহাত্মাকে আমি কি জন্য প্রতিবোধিত করিব? বিদেহ অনুভব প্রাপ্ত হইয়া যথাভিলষিত সুখে অবস্থান করুন[১৫]। আমিও এক্ষণে রমণী দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহারই সহিত পুনর্জ্জন্ম বিবর্জ্জিত হইয়া গমন করি[১৬]। এই বলিয়া নিজ দেহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়া পুনরায় মনস্বিনী চূড়ালা বিবেচনা করিতে লাগিলেন[১৭]। আমি মহীপতির এই দেহযষ্টি সন্দর্শন করি, দেখি, ইহার অভ্যন্তরে কোন প্রকার অনুভব শক্তি আছে কি না[১৮]? বৃক্ষের মূল দেশে অন্তর্দ্ধুম কুসুমের ন্যায় হয় ত ইহার চিত্ত-কোষে জ্ঞানোদয় না হইতেও পারে[১৯]। এই প্রকারে হয় ত ইনি অত্যর্থ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমিও ইহার সহিত গমন করি[২০]। এই প্রকার চিন্তা করিয়া বরবর্ণিনী চূড়ালা সশঙ্কিত ভাবে বলিতে লাগিলেন[২১]। সত্ত্বশীল গণের হৃদয় কন্দরে অনুভব কারণ লুক্কায়িত থাকিতেও পারে। এবং উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে তদ্দ্বারা পুনঃ প্রবোধ জন্মিয়া থাকে[২২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অত্যন্ত শান্তভাবাপন্ন হইয়া কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় অবস্থান করিয়া ধ্যানশালিগণ কিরূপে পুনঃ প্রতিবোধিত হন[২৩]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, বীজে পুনঃ পুষ্প ফল যেমন পরম সূক্ষ্ম অবস্থায়

থাকে, সুতরাং নিতান্ত দুর্লক্ষ্য ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ, শান্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের মূল শক্তি স্থিত থাকে, কারণ উপস্থিত হইলে তাহা পুনঃ কার্য্যকারী হয়[২৪।২৫]। মহাত্মাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধিও নাই অস্তও নাই, সতত সমভাবেই থাকে[২৬]। যাহাদিগের স্পন্দন অক্ষুণ্ন হইয়া থাকে, তাহারা অন্যরূপ দেহ ধারণ করিয়া থাকে[২৭]। জগতের স্থিতি সম্বন্ধে চিত্তের স্পন্দনই কারণ। কুসুমে যেমন মধু থাকে, তেমনি, ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে চিত্তের স্পন্দনও স্থিতিমান্ হইয়া থাকে[২৮]। হে রঘুবহ! ক্ষয়শীল দেহে মুহুর্ম্মুহু চিত্তে শোক মোহ কোপ হর্ষাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে[২৯]। সত্ত্ব বর্জ্জিত শরীরে চিত্তের শান্তি হইলে বিকার সম্ভাবিত কার্য্যাদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩০]। জলের শমতা হইলে যেমন তাহাতে তরঙ্গোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ, সত্ত্বশীল ব্যক্তিদিগের হৃদয়েও চিত্তের বিক্ষোভ হয় না[৩১]। এই দেহে চিত্ত বা সত্ত্ব নাই। তাপ প্রাপ্ত হইলে যেমন শীতলতা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহের সহিত সত্ত্ব ও চিত্ত নষ্ট হইয়া যায়[৩২।৩৩]। শিখিধ্বজের দেহ তেজ দ্বারা অর্জ্জিত, সত্ত্বাংশে সংগ্রথিত। অতএব, গ্লানি তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে না[৩৪]। বরাঙ্গনা চূড়ালা ভর্ত্তার সেই দেহ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া দেহ পরিত্যাগ না করিয়া অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণা হইলেন[৩৫]। পরে বলিলেন, চিত্ত! তুমি সর্ব্বস্থানে যাইতে পার, এবং তুমি শুদ্ধ। তুমি আমার ভর্ত্তার অন্তঃকরণে প্রবেশ কর, করিয়া ইঁহাকে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া দাও[৩৬]। আমি যদি ইঁহাকে না প্রবোধিত করি, অথবা যদি নিজেই প্রবুদ্ধ হন, তাহা হইলে আমি এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছি[৩৭]। চূড়ালা এই চিন্তা করিয়া দেহপঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া আদ্যন্তবর্জ্জিত স্থিতি প্রাপ্ত হইলেন[৩৮]। তিনি প্রভু সম্মুখে চেতনায় স্পন্দন উত্থাপিত করিয়া পক্ষিণী যেমন নীড় মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন[৩৯]। কুসুমোপরি ভ্রমরীবৃন্দের ন্যায় কুন্তাকৃতি চূড়ালা তাঁহার চিত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[৪০]। স্তনশালিনী বরবর্ণিনী চূড়ালা ভ্রমরান্তর নিষ্পিষ্ট পদ্মিনীর ন্যায় মহীপতির দেহে প্রবেশ করিলেন[৪১]। অর্ক যেমন পদ্মিনীকে প্রবোধিত করে, তদ্রূপ, মহীপতিও প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া চূড়ালাকে প্রতিবোধিত করিলেন[৪২]। তৎপরে রমনীয় অবয়ব বিশিষ্ট অপর সাম-

বেদের ন্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় সামবেদের ন্যায় স্বীয় অগ্রে কুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মুনিকুমার পুনরায় এস্থানে আসিয়াছেন! এই বলিয়া তাঁহাকে পুষ্পাদি প্রদান করিলেন[৪৩।৪৪]। বলিলেন, ভাগ্য ক্রমেই আপনার পবিত্র হৃদয়ে পুনর্দ্দর্শনের ইচ্ছা উদিত হইয়াছে। অথবা হে প্রভো! আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্যই আপনার এখানে আগমন হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তবে কি জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা বলুন[৪৫।৪৬]?

কুম্ভ বলিলেন, হে অনিন্দিত মহারাজ! যে দিন আপনার নিকট হইতে গমন করিয়াছি, সেই দিন হইতে আপনাতেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হইয়াছে[৪৭]। আমি রমণীয় স্বর্গ ধামেও বাস করিতে চাহি না। সম্প্রতি আপনার নিকটেই অবস্থান করিব, আপনার নিকটেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে[৪৮]। আপনার ন্যায় বিশ্বস্ত সুহৃৎ মিত্র আমি জগতীতলে আর কাহাকেও দেখিতেছি না[৪৯]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য! এই কুলাচলে অদ্য আমার পুণ্য পাদপ ফলিত হইল। যদি তাহা না হইবে তবে আপনি বীতস্পৃহ হইয়াও আমার সমাগম কি জন্য কামনা করিয়া থাকেন[৫০]। এই বনরাজী, এই বিটপী সমূহ, এবং যদি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা থাকে, এবং স্বর্গবাসে প্রবৃত্তি না থাকে, তবে হে প্রভো! আপনি এই স্থানেই অবস্থান করুন। আপনার যুক্তিযুক্ত যোগমার্গের আখ্যান সকল শ্রবণ করিয়া আমিও পরম সুখী হইব। যেখানে আপনার বিশ্রান্তি লাভ হইবে সেই স্থানেই অবস্থান করুন। আপনিই আপনার বিশ্রামের স্থান। আপনি স্বর্গে অথবা এই স্থানে যথা সুখে বিহার করিতে পারেন[৫১।৫৩]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি ব্রহ্ম বস্তু অবগত হইয়া নিরতিশয় শান্তি লাভ করিতেছেন ত? সংসার দ্বৈতময়, এই ভেদ জ্ঞান আপনার ত তিরোহিত হইয়াছে[৫৪]। হে নরপুঙ্গব! আপাত রমণীয় পদার্থ বিশেষে আপনার অনুরাগ নির্ম্মূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে ত[৫৫]? নিন্দনীয় পদার্থে ও অনিন্দনীয় পদার্থে আপনার সমান অনুরাগ হইতেছে ত? অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত উদ্বেগ ও প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি অনুদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় কি[৫৬]?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহ নিবন্ধন আমি দৃশ্য পথের অতীত পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সংসারের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়াছি, এবং যাহা লাভ করিবার বস্তু, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি[৭]। যাহা বহু দিনেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই পরম বস্তু অতি অল্প দিন হইল আমি প্রাপ্ত হইয়া নিরাময় হইয়াছি ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা লাভ করিবার এক মাত্র বিষয়, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়া শান্তি লাভ করিতেছি[৮]। আমি এক্ষণে বিগতজ্বর হইয়া সর্ব্বত্রই অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেছি। আমার সম্বন্ধে আর কিছু উপদেশ দিবার সামগ্রী নাই[৯]। যাহা অপ্রাপ্ত ছিল, তাহা এক্ষণে আয়ত্তীকৃত হইয়াছে। যাহা ত্যক্ত তাহা আশ্রিত ও যাহা আশ্রিত তাহা ত্যক্ত হইতেছে। যাহা এক মাত্র সত্য বস্তু, সেই ব্রহ্ম বস্তুতে আমার মন নিবিষ্ট হইয়াছে[১০]। আমি বিগতমোহ ও বীতভয় হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্ব বস্তুতে সমদৃষ্টি বিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শান্তি প্রাপ্ত হইয়া আকাশ কোশের ন্যায় অবস্থান করিতেছি[১১]।

ত্র্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম সর্গ।

—()○()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা করতঃ বিচিত্র উপাখ্যান দ্বারা তাঁহারা উভয়ে তিন মুহূর্ত্ত কাল বনভূমি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন[১]। কখনও পর্ব্বতের সানুদেশে, কখন বা সারস-কলহংস প্রভৃতি বিহঙ্গম কূজিত সরোবর তীরে, আনন্দিত মনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২]। সেই সকল রমণীয় উপাখ্যান কহিতে কহিতে এবং বন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাদের অষ্ট দিন অতিবাহিত হইয়া গেল[৩]। অনন্তর কুম্ভ বলিলেন, আমরা অন্য বনে গমন করি। রাজা বলিলেন, আপনার যে প্রকার অভিরুচি আমি সেই প্রকারই করিব।

এই বলিয়া তাঁহারা বনান্তর প্রদেশে প্রবেশ করিলেন[৪]। তাঁহারা বহুবিধ বনরাজী, নানাপ্রকার তটভূমি, গুল্মজাল, সরিত্তট ও গিরিশৃঙ্গ সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৫]। নদী, দেশ, গ্রাম, নগর ও বহু বিটপী সমাচ্ছাদিত বনভূমি, মনোহর শব্দযুক্ত গিরিপ্রদেশ, কুঞ্জ, কানন, তীর্থ ও আয়তন ভূমি সকল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৬]॥ তাঁহারা সমবৃত্তি, সমান স্নেহ, সমোৎসাহ সহকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন[৭]। হে রাঘব! তাঁহারা পিতৃলোকের ও দেবলোকের পূজা পূর্ব্বক উত্তপ্ত অথবা শীতল প্রদেশে সমভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন[৮]। তমাল বৃক্ষ ও মন্দার বৃক্ষ সমাকীর্ণ গহন কানন মধ্যে প্রণয়পেশল দম্পতী স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন[৯]। হে রামচন্দ্র! এই গৃহ, ইহা গৃহ নহে, এই প্রকার দ্বৈত ভাব তিরোহিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা বায়ুসেবিত অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[১০]। কখনও ধূলিধূসরিত কখনও বা চন্দন চর্চ্চিত হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন[১১]। কখন দিগাম্বর কখনও বা চিত্রাম্বর, কখনও বা পল্লবসংচ্ছন্ন, কখনও বা কুসুমমণ্ডিত দেহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন[১২]। এইরূপে কতিপয় দিবসের মধ্যে সমচিত্ত বশতঃ রাজা দেবপুত্র কুম্ভের ন্যায় হইয়া উঠিলেন[১৩]। অনন্তর মানিনী চূড়ালা দেবযোনির ন্যায় শিখিধ্বজকে সন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৪]। এই আমার অভিনাত্মা পতি সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন, এবং এই রমণীয় বনভূমি, তবে আমি কি নিমিত্ত অনায়াসলভ্য রতি সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছি[১৫]। জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণও যথাকালোৎপন্ন সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ করেন নাই। যাহারা পরিত্যাগ করে তাহারা তত্বজ্ঞ নহে[১৬]। আমার স্বামী উদারচেতা এবং ব্যাধি বিবৰ্জ্জিত ও পরিপূর্ণ যৌবন চিহ্নে সুশোভিত। এই কুসুম সমূহ আমাদের গৃহের কার্য্য করিতেছে, সুতরাং এরূপ স্থলে যে কামিনী স্বামিসম্ভোগ না করিয়া জীবন্মুক্ত পথ অনুসন্ধান করে, সে স্বামিসম্ভোগ ত্যাগ জনিত পাপে লিপ্ত ও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকশিক্ষা প্রদান না করায় নিন্দাস্পদ হইয়া থাকে। বনজ কুসুমাকীর্ণ লতাগৃহে যে রমণী স্বামীকে স্বামিসৌভাগ্য লক্ষ্য ও তৎসহ রতিক্রিয়া না করে, সে নিশ্চই হতভাগিনী[১৭,১৮]। রমণীয় নির্জ্জন বিহার ভূমি এবং রমণীয় নিজ পতি প্রাপ্ত হইয়া যে সতী রমণী স্বামী সম্ভোগ না করে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত

হতভাগিনী[১৯]। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ যথাভিলষিত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহা পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক ফল পাইয়া থাকেন[২০]? অতএব, সেই নিমিত্ত অদ্য আমি ভর্তা আমার সহিত যাহাতে সম্ভোগ করেন, এরূপ মায়া বিস্তার করিব[২১]। চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া গুল্মমধ্যস্থা কোকিলা যেমন কোকিলকে সম্ভাষণ করে, সেইরূপ, নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন[২২]।

কুম্ভ বলিলেন, অদ্য চৈত্রমাসীয় শুক্ল প্রতিপৎ। অদ্য স্বর্গে মহাদেবের উৎসব হইবে[২৩]। আমি অদ্য সেই স্থানে পিতার সমীপবর্ত্তী হইব। নিয়তি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার কাহারও শক্তি নাই[২৪]। যদ্যপিও আমি নিরুদ্বেগ অবস্থায় আপনার সহিত এই কুসুম সমাকীর্ণ বন প্রদেশে বাস করিতেছি, তথাপি, আমাকে তথায় তদনুরোধে যাইতে হইবে[২৫]। আমি অদ্য দিবাবসান সময়ে গগনমণ্ডল হইতে পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইব। স্বর্গ হইতেও আপনার সমাগমে অধিক সুখোপভোগ করিব[২৬]। এই বলিয়া নিজ প্রীতি বশতঃ নন্দনকুসুম নির্ম্মিত মঞ্জরী স্বীয় সুহৃৎকে প্রদান করিলেন[২৭]। আপনি সত্বর এখানে আগমন করিবেন, ভূপতি এই কথা বলিতে না বলিতে কুম্ভরূপিণী চূড়ালা শরৎ কালের মেঘের ন্যায় বনভূমি হইতে আকাশগামিণী হইলেন[২৮]। মেঘমালা যেমন বনবায়ু কর্ত্তৃক হিমসজ্ঘ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে কুসুমরাশি পরিত্যাগ (পুষ্পবর্ষণ) করিতে লাগিলেন[২৯]। ময়ূর যেমন এক দৃষ্টে মেঘমালা সন্দর্শন করিতে থাকে, সেইরূপ, মহারাজা শিখিধ্বজ আকাশমার্গে চাহিয়া রহিলেন[৩০]। শিখিধ্বজের দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া আকাশমার্গে কুম্ভবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং স্বকীয় চূড়ালা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন[৩১]। কল্পবৃক্ষ সকল মঞ্জরী সমাবৃত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ, তিনিও আকাশ পথ হইতে পরম রমণীয়া পতাকাপরিশোভিতা নিজ পুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন[৩২]। এবং অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া মধুমাসে লতা সমূহ যেমন পরম রমণীয়া হয়, সেইরূপ, তত্রস্থ ললনাকুলের শোভা দেখিতে লাগিলেন[৩৩]। অল্প সময়ের মধ্যে রাজকার্য্য সমাপন করিয়া ফলপুষ্পের ন্যায় পুনর্ব্বার শিখিধ্বজ সম্মুখে আপতিত হইলেন[৩৪]। এবং তৎকালে শিশিরবিন্দুব দ্বারা পদ্মের ন্যায় অথবা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শশিকলার ন্যায়

ম্লান মুখ দেখাইতে লাগিলেন[৩৫]। শিখিধ্বজ তাঁহার ঐরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া অতি যত্ন সহকারে তাদৃশ পরিম্লানির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন[৩৬]। হে দেবপুত্র! আপনাকে নমস্কার, অদ্য আপনাকে কি নিমিত্ত এরূপ অন্যমনস্ক দেখাইতেছে? হে কুম্ভ! আপনি দুঃখ পরিত্যাগ করুন এবং এই আসন গ্রহণ করুন[৩৭]। পদ্মপত্র যেমন জলের আধার হইয়াও জলসিক্ত হয় না, সেইরূপ, সাধুগণ কখনও দুঃখে লিপ্ত হন না[৩৮]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজাকর্ত্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া কুম্ভ আসন পরিগ্রহ করতঃ ভগ্ন বংশখণ্ডের ন্যায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন[৩৯]। দেহী সকল জীবন্মুক্ত হইলেও কর্ম্ম ফল অনুসারে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হয়[৪০]। হে নরশার্দ্দুল! যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা মূঢ়তা নিবন্ধন বালকের ন্যায় অনেক অযথা আচরণ করিয়া থাকে। সমদর্শিতা না থাকায় তাহারা কোন পদার্থ স্থির রাখিতে পারে না[৪১]। তৈল যেমন তিলের সত্তা মাত্রে অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ, দেহী মাত্রেই দেহ ধারণ নিমিত্ত হর্ষ গ্লানি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যিনি দেহ ধারণ করিয়া দেহসম্ভূত গ্লানি প্রভৃতি ভোগ না করেন, তিনি অসিপত্র দ্বারা (অসিপত্র=খড়্গ) শূন্য প্রদেশ ছেদন করিয়া থাকেন[৪২]। দেহ ধারণ করিয়া সমচিত্ততা নিবন্ধন যদ্যপি গ্লানি দুঃখ প্রভৃতির অনুভব না করেন, তথাপি, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবেই হইবে। কেবল মাত্র বুদ্ধীন্দ্রিয়ের দ্বারা অবস্থান করা যায় না। এই দেহ ধারণ করিলে দুঃখ ও তদনুরূপ দশা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না[৪৩,৪৪]। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি প্রভৃতিও শরীর ধারণ করিয়া দুঃখাদি উপভোগ করিয়াছেন। দেহী মাত্রকেই ইহা ভোগ করিতে হইবে, ইহাই নিয়তির বিধান[৪৫]। জল যেমন অম্বুনিধির প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, অজ্ঞই হউক, আর জ্ঞই হউক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উদয় হউক বা না হউক, জীব মাত্রেই নিয়তির বশবর্ত্তী হইবে[৪৬]। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুদ্ধ্যাদি বৃত্তির ও হস্ত প্রভৃতির সঞ্চালন দ্বারা অখণ্ডনীয় নিয়তির আদেশ সকল জীবিত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন[৪৭]। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্ষোভ দুঃখ ও সুখ দ্বারা নিয়তির আদেশ সকল বহন করিয়া থাকে[৪৮]। এইরূপ সুখ ও দুঃখের দ্বারা

অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয়বিধ মনুষ্যগণ নিয়তির অখণ্ডনীয় নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া থাকেন[১১]।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে বেদবিৎ! যদি নিয়তির এই দুষ্পরিহার্য্য নিয়ম সমস্ত লোককে অবনত মস্তকে বহন করিতে হয়, তবে, আপনি কি নিমিত্ত এতদূর দুর্ম্মনায়মান হইয়া চিন্তিত হইতেছেন[১]।

কুম্ভ বলিলেন, হে বসুধাধিপতি! অদ্য স্বর্গে আমার সম্বন্ধে যে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে আপনার নিকট তাহা সমুদায় বিবৃত করিব[২]। দুঃখ সকল প্রিয় সুহৃদের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহা অবসানকল্প হয়। দেখুন, মেঘ সকল ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে[৩]। সুহৃদ্ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলে চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে। কতক (ফলবিশেষ) দ্বারা জলের স্বচ্ছতা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে[৪]। আমি আপনাকে পুষ্পমঞ্জরী প্রদান করিয়া গগনমার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অমরাবতী উপস্থিত হইলাম[৫]। এবং মহেন্দ্র সভায় মদীয় জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিয়ৎক্ষণ সে স্থানে অবস্থান করতঃ আগমন কালে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম[৬]। এবং এখানে আগমন করিবার নিমিত্ত স্বর্গ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নভঃ প্রদেশে উপস্থিত হইলাম, এবং ভগবান্ মরীচিমালীর অশ্বগণ সমভিব্যাহারে অনিলবর্ত্মে আগমন করিলাম[৭]। অনন্তর সূর্য্যদেব অন্য পথে গমন করিলেন। আমি আর এক পথে গমন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ বোধ করিলাম, পরে আকাশমার্গে আগমন করিলাম[৮]। বারিপূর্ণ অভ্র প্রদেশে মেঘ মধ্যে ভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিকে আগমন করিতে দেখিলাম[৯]। জলধরপটলসমাচ্ছন্ন বিদ্যুৎবলয়বিভূষিত মেঘসংস্পৃষ্টে চন্দন লেখা বিধৌত হওয়ায় তাঁহাকে অভিসারিকার ন্যায় (অভিসারিকা=যে প্রচ্ছন্ন ভাবে

প্রিয় সকাশে গমন করে) দেখাইতে লাগিল[১০]। ধরণীপৃষ্ঠদেশস্থ পাদপ-রাজি ছায়ার প্রদেশে বেগবতী নদীর ন্যায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ তপোলক্ষ্মীর ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল[১১]। আকাশমার্গে অবস্থিত হইলেও আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। এবং বলিলাম, হে মুনিবর! নীলবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হওয়ায় আপনি অভিসারিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন[১২]। হে মানদ! মুনিবর আমার উক্তবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে পয়োধরযুগল ও কেশপাশ পরিশোভিত এবং হাব ভাব বিলাসবতী রমণী হও, এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন[১৩] আমি রজনী সমাযোগে রমণী হইব, পরিণতবয়স্ক দুর্ব্বাসার মুখে ঐ নিষ্ঠুর অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিলাম[১৪]। মুনিবর আমাকে ঐরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে রাজন্! আমি সেই জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছি[১৫]। আমি আপনার নিকট নিশাকালে আমার অঙ্গনা হইবার বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলাম। দিবাভাগে পুংরূপ ধারণ করিয়া রজনীযোগে স্ত্রীরূপে কি করিয়া অবস্থান করিব, এই ভাবনায় আমি অত্যর্থ দুর্ম্মনায়মান হইয়াছি[১৬]। রাত্রি কালে স্তনযুগশালিনী রমণী হইয়া কাল যাপন করি, আমি পিতার নিকট কিরূপে এ কথা ব্যক্ত করিব। আমি ভবিতব্যের অতি বিষম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি[১৭]। গৃধ্রগণ আমিষ দর্শন করিলে যেমন কলহ উপস্থিত করে, সেইরূপ, আমিও যুবকগণের দর্শন পথে পতিত হইলে আমাকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিবে। কি আশ্চর্য্য! আমি অদ্য কলহের বিষয়ে পতিত হইলাম[১৮]। আমি এক্ষণে লজ্জা বশতঃ স্বর্গধামে দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ গণের এবং কামার্ত্ত দেবকুমার-গণের অগ্রে কি করিয়া রজনী যাপন করিব, তাই ভাবিতেছি[১৯]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রঘুবহ! মুনি সকাশে এইরূপ কহিয়া কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করতঃ পুনরায় বলিতে লাগি-লেন। আমি কি নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় বিলাপ করি, এবং কি নিমি-ত্তই বা পরিতাপ করি। আমার কর্ম্মানুসারে আমাকে নিশ্চয়ই স্ত্রী ও পুরুষ রূপে বিচরণ করিতে হইবে[২০।২১]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবকুমার! আপনার পরিদেবনায় কোন কারণ নাই। এই দেহ যে ভাবে থাকুক না কেন, তাহাতে কিছুই দোষ নাই, কারণ আত্মা কিছুতেই লিপ্ত নহেন। জীবের ভাগ্যে যে

সকল সুখ দুঃখের বিধান আছে, তাহা কেবল দেহের জন্যই। দেহো-পলক্ষিত চিদাত্মাকে এ সকল ভোগ করিতে হয় না[২২।২৩]। জীব স্বকীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবন্ধন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আপনি জানিয়া শুনিয়া কি নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন[২৪।২৫]। আপনি নিখিল বেদাদি ও জীবের ভবিতব্য অবগত আছেন। জানিয়া শুনিয়া যদি পরিতাপ করেন, তবে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি উপায় করিবে? এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করুন[২৬]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে উভয়ে তাঁহারা কথোপকথন দ্বারা সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হরিদশ্ব (সূর্য্য) এই সময়ে তৈল বিহীন প্রদীপের ন্যায় কুম্ভের স্ত্রীত্ব সম্পাদনের জন্যই যেন অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। কমলিনী প্রিয় নায়কের অদর্শন নিমিত্ত সঙ্কুচিতা হইলেন[২৭।২৮]। পান্থ রমণীর ও পথিকগণের হৃদয় ভীত হইতে লাগিল। নিশাগমে বর্ত্ম সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দ্রষ্টব্য সকল অন্ধকারে লীন হইতে লাগিল। অন্ধকারে বিহঙ্গমগণ একত্র সমাবিষ্ট হইতে লাগিল[২৯]। তারকামণ্ডিত ভুবন সাম্যভাব ধারণ করিল। নভোমণ্ডলে তমোনুদ চন্দ্রবিম্ব প্রকাশ প্রাপ্ত হওয়ায় গগন যেন উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে লাগিল[৩০]। চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় এখন তাঁহারা উভয়ে যথোপযুক্ত প্রদেশে পৃথক্ অবস্থান জন্য উদ্যত হইলেন[৩১]। অনন্তর, শুভ্রাস্তরাচ্ছাদিত হইয়া বন্দনাদি কার্য্য সমাপন করতঃ কুম্ভ সত্বর রমণী বিগ্রহ ধারণ করিলেন[৩২]। এবং শিখিধ্বজের সম্মুখে পুনঃ উপস্থিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি ইঁহাকে অঙ্গযষ্টির দ্বারা পাতিত করিব, উজ্জ্বলীকৃত করিব এবং রঞ্জিত করিব। পরে বলিলেন, মহারাজ! আমি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া কি আপনি লজ্জা অনুভব করিতেছেন? হে মহারাজ! দেখুন, এক্ষণে আমার জটাজাল মুনিশাপে তারকাজাল সমাবৃত গগন মণ্ডলের ন্যায় কুসুমদাম পরিশোভিত নিবিড় কুন্তলজাল হইয়া শোভা পাইতেছে। আমার স্তনদ্বয় প্রোদ্ভিন্ন কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে[৩৩।৩৪]। আমার বস্ত্র আগুল্ফ বিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে[৩৫]। হে নাথ! দেখ, আমি কিরূপ অনুপমা রমণী রূপ পারগ্রহ করিয়াছি। বিবিধ ভূষণ ও রত্নরাজি সকল ধারণ করিয়াছি[৩৭]। কুসুম সকল বৃক্ষে সঞ্জাত হইয়া বৃক্ষেরই শোভা বৃদ্ধি করিয়া

থাকে, সেইরূপ, আমার অঙ্গ সকলও আমার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেখুন, আমার অঙ্গ সকল শশিদ্যুতি ধারণ করিয়াছে[৩৮]। পর্ব্বত শৃঙ্গে তুষার পাতের ন্যায় আমার শিরোদেশে পট্টাংশুক শোভা পাইতেছে। হে মানদ! এক্ষণে আমার সমস্তই রমণীয় হইয়াছে[৩৯]। হায়! আমাকে ধিক্! আমার কি কষ্ট! এক্ষণে আমি কি করিব, আমি কাহার নিকট গমন করিব। হা কষ্ট! এক্ষণে আমি রমণীরূপে এই দীর্ঘ নিশা অতিবাহিত করিব[৪০]। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার গুরু নিতম্ব ও জঘন প্রদেশ আমাকে মন্থর করিতেছে। কুম্ভ বনমধ্যে এই সকল বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন[৪১]। রাজাও তাঁহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন। কিয়ংক্ষণ মধ্যে শিখিধ্বজ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। হে সাধো! আপনি যাহা জানিবার তাহা সম্যক্ অবগত আছেন। আপনাকে অধিক কি বলিব, নিয়তির সমস্ত পথই অবগত আছেন। যাহা হউক, আপনি মহাসত্ত্বগুণাবলম্বী, আপনাকে যে এরূপ রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা আর কি পরিতাপের বিষয় আছে[৪২।৪৩]। যাহা হউক, অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে পরিতাপিত হওয়া ভবাদৃশ মহদ্ব্যক্তির উচিত নহে। আমি জানি, সুধী ব্যক্তিও দেহ ধারণ করিয়া কর্ম্ম ফলে গ্লানি ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এইরূপ এইরূপ কারণে কেবল মাত্র দেহ জনিত কষ্ট ভোগ করে না, পরন্তু তাহারা চিত্তেও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে[৪৪]।

কুম্ভ বলিলেন, যাহা হউক, আমি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রজনী যাপন করিব, নিয়তি কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। আমি আর পরিতাপ করিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য উদ্দীপ্ত করিলেন[৪৫।৪৬]। তাঁহারা যেন মনোদুঃখ হ্রাস করিবার নিমিত্তই রাত্রি কালে এক শয্যায় শয়ন করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে রজনী যাপন করিলেন। কুম্ভ প্রভাত কালে পুনরায় যৌবনদৃপ্ত স্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিলেন[৪৭]। এবং কুম্ভসদৃশ কুচদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া রাজমহিষী বরবর্ণিনী চূড়ালা কুম্ভমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন[৪৮]। দিবাভাগে কুম্ভমূর্ত্তি এবং রজনী যোগে রমণী রূপে সেই বনমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন[৪৯]। মহিষী চূড়ালা ঐরূপে নিজ প্রিয়তম ভর্ত্তার সহিত কখন মহেন্দ্র পর্ব্বতে, কখন হিমগিরিতে, কখন সুমেরু পর্ব্বতের সানুদেশে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন[৫০]।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়ুত্তরশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ[১] বলিলেন, অভিহিতরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে এক দিবস চূড়ালা কুম্ভরূপ ধারণ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজীবলোচন নরপতে! আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আমি প্রতিদিন রজনী যোগে অঙ্গনা রূপ ধারণ করিয়া থাকি। সুতরাং আমি স্ত্রী ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত বিবাহ বিধির দ্বারা ভর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠা করিয়া কোন এক মহাপুরুষকে আমার চিত্ত ও আত্মা সমর্পণ করিব[২।৩]। সে মহাপুরুষ অন্য নহে। আপনাকেই এই ভুবন ত্রয়ের মধ্যে ভর্ত্তৃরূপে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি রজনী যোগে আমাকে ভার্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রহণ করুন[৪]। হে সাধো! প্রিয় সুহৃদের সহিত আমি অযত্নোপনত স্ত্রীসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার অভিষ্ট পূর্ণ করুন[৫]। অদ্য অবধি এই অপ্রবৃত্ত মনোরম সুখ আপনি প্রকৃত রূপে পরিণত করুন। এবং ইহাতে আপততঃ কোন দোষও পরিলক্ষিত হইতেছে না[৬]। যাহারা ইচ্ছার ফল্গু পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা সমস্ত বস্তুতেই সমদর্শন করিয়া থাকে[৭]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, সখে! যদ্যপি আপনার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে, তাহাই হউক। আমি ইহার শুভাশুভ কিছুই জানি না[৮]। আমি সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জগত্রয় এক্ষণে আমার আত্মারই স্বরূপ[৯]।

কুম্ভ বলিলেন, হে মহীপাল! এক্ষণে যদ্যপি আপনার অভিমত হইয়া থাকে, তবে, অদ্য শ্রাবণী পৌর্ণমাসী এবং লগ্নাদিও শুভজনক। আমি গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছি। অতএব, অদ্য রাত্রি কালেই আমরা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিব[১০।১১]। এই মহেন্দ্র পর্ব্বতের রমণীয় সানুপ্রদেশস্থ রত্নালোক বিশিষ্ট মণিময় গহ্বর প্রদেশে যে স্থানে কুসুমভারাবনত তরু ও গুল্মরাজি সমধিক নয়নপ্রীতিদায়ক হইতেছে,

এবং যে স্থানে লতা সমূহ পুষ্প বিতানে সুসজ্জীভূত হইয়া কুসুমালঙ্কার পরিশোভমানা রমণী গণের ন্যায় লাস্য ক্রীড়ায় অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়াছে, এবং যে স্থানে গগনমণ্ডলে তারাধিপ অসংখ্য রমণী বেষ্টিতা নায়কের ন্যায় নক্ষত্র বিমণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, তাঁহারাই আমাদের এই বিবাহ ব্যাপার অবলোকন করিবেন[১২,১৩]। হে প্রিয়! হে রাজন্! এক্ষণে উত্থান করুন, চলুন, বিবাহোপযোগী চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া আমরা অবস্থান করিতে থাকি[১৪]। কুম্ভ এইরূপ বলিয়া রাজার সহিত উত্থান করিলেন এবং পুষ্প ও রত্ন সকল সঞ্চয় করিতে লাগিলেন[১৫]। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রত্নময় সানুপ্রদেশে তাঁহারা বিবিধ কুসুম সংগ্রহ করিলেন। এবং বিবিধ প্রকার রত্নরাশিও সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কাঞ্চনকন্দরে দেবপূজাদির নিমিত্ত রত্ন ও পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া মন্দাকিনী তীরে স্নানার্থ গমন করিলেন[১৭,১৯]। তথায় কুম্ভ গজস্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট রাজা শিখিধ্বজকে মজ্জনপূর্ব্বক অত্যন্ত আদরের সহিত স্নান করাইয়া দিলেন[২০]। মহারাজ শিখিধ্বজও ভবিষ্যৎ ভর্ত্তা হইবার নিমিত্ত কুম্ভরূপধারিণী চূড়ালাকে স্নান করাইয়া দিলেন[২১]। এবং তথায় তাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিতে লাগিলেন। অন্য লোকে ক্রিয়া ফল ইচ্ছা করিয়া যেরূপে পূজা করিয়া থাকেন ফল ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহারা সেইরূপ পূজাদি করিলেন[২২]। নিত্য জ্ঞান বলে পরিতৃপ্ত হইয়া জগতের ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা পরম পবিত্র ভোজনাদি সম্পন্ন করিলেন[২৩]। কল্পবৃক্ষ হইতে শুভ্র বাস পরিধান করিয়া বিবিধ প্রকার স্বাদু ফল ভোজন করিয়া তাঁহারা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন[২৪]। এই সময়ে ভগবান্ কমলিনীনায়ক যেন তাঁহাদের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্তই অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন[২৫]। সন্ধ্যা সমাগতা হইলে অঘমর্ষণাদি ব্যাপার সমাধা করিলেন। তারাবলী যেন তাঁহাদের বিবাহবিধি দেখিবার নিমিত্ত আকাশপটে একে একে প্রকাশ পাইতে লাগিল[২৬]। সেই কুসুম বিকাশা ত্রিযামা এইরূপে তথায় সমাগতা হইলেন। তিনি যেন দম্পতী যুগলের সখ্য বন্ধন করিবার জন্য তুষারকণা সকল বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন[২৭]। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন গগনমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় গ্রহগণের স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ, কুম্ভ সেই সানুপ্রদেশে বহুসংখ্যক রত্নদীপ প্রজ্বালিত

করিলেন[২৮]। যামিনী যোগে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া মহারাজ শিখিধ্বজকে চন্দন অগুরু প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত করিলেন[২৯]। হার বলয় মাল্য ও কুসুম স্রজ দ্বারা তাঁহাকে সজ্জীভূত করিয়া দিলেন[৩০]। কল্পলতা মন্দার ও পারিজাত কুসুম প্রভৃতি পুষ্প ও বিবিধ প্রকার রত্ন দ্বারা তাঁহাকে পরিশোভিত করিলেন[৩১]। কুম্ভ এই সময়ের মধ্যে বিপুল পয়োধরাক্রান্তা এবং হাবভাববতী বিলাসিনী রমণী হইয়া উঠিলেন[৩২]। এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি এক্ষণে ভোগবিলাসিনী রমণী হইয়াছি। পরন্তু এই সময়টীও কামোপভোগের উপযুক্ত হইয়াছে[৩৩]। আমি আপনার স্ত্রী এবং আপনি আমার স্বামী। অতএব, হে স্বামিন্! আপনি আমাকে যথেচ্ছ উপভোগ করিতে পারেন[৩৪]। এই বলিয়া রতি মদন সমীপে যেরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ, গহন বনস্থিত উদয়োদ্যত রবির ন্যায় ভর্তার সমীপে উপগতা হইলেন[৩৫]। হে মানদ! আমার নাম মদনিকা, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমাকে স্নেহ নয়নে অবলোকন করুন, বলিয়া তাঁহার সমীপস্থা হইলেন[৩৬]। ঐ সকল কথা বলিয়া সেই অনিন্দনীয়রূপ ও শোভনকান্তিবিশিষ্ট রমণী লজ্জাবনত মুখে কাঞ্চন মণ্ডিত অলকদামপরিশোভিত মস্তক তাঁহার পাদপ্রদেশে উপস্থাপিত করিলেন[৩৭]। এবং বলিলেন, হে নাথ! আপনি আমাকে বিচিত্র অলঙ্কার রাশির দ্বারা পরিশোভিত করতঃ অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক মদীয় পাণি গ্রহণ করুন[৩৮]। হে রাজন্! রতি পরিণয়কালে মদনের শোভাকেও লজ্জীকৃত করিয়া আপনি সমধিক দ্যুতিমান হইয়া আমাকে মদনের রতিতুল্য প্রিয়কারিণী করিয়াছেন[৩৯]। হে মহারাজ! চন্দ্রকিরণশালিনী বিচিত্র মাল্যাম্বর ধারণ করিয়াছেন। সুমেরু প্রদেশে গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় আপনার বক্ষঃস্থলে চারু হার শোভা পাইতেছে[৪০]। হে নৃপ! কনক পদ্মে ভৃঙ্গ রাজির ন্যায় আপনার শিরোদেশে মন্দারকুসুমদাম পরিশোভিত অলকদাম শোভা পাইতেছে[৪১]। আপনি রত্নাংশু বিমণ্ডিত কুসুম রাশির দ্বারা রত্ন মণ্ডিত সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন[৪২]। এইরূপ কথোপকথন দ্বারা সেই ভাবী দম্পতী আপনাদের পূর্ব্ব প্রণয় সঙ্গোপন করতঃ সন্তুষ্ট মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন[৪৩]। অনন্তর মহারাজ শিখিধ্বজ মণিময় পর্য্যঙ্কে মদনিকাকে উপবেশন করাইয়া আপনি বিচিত্র আভরণ দ্বারা

সাজাইতে লাগিলেন[৪৪]। কর্ণভূষণ, মাল্য, বস্ত্র, মণিরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গরাগ এবং নানা প্রকার কুসুম দ্বারা তঁহার অঙ্গযষ্টি সাজাইতে লাগিলেন[৪৫]। বিকসিত নীলেন্দীবরনয়না রাজ্ঞী মদনিকা ভ্রমরমালাবৃত পদ্মিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[৪৬]। রাজা শিখিধ্বজ ঐরূপে সাজাইয়া বলিলেন, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় ও শঙ্করের গৌরীর ন্যায় তোমার মঙ্গল হউক[৪৭।৪৮]। তুমি রক্তবর্ণ পাণিতলসুশোভিত, বিপুল পয়োধরযুগলশালিনী কামকল্পপাদপের লতার ন্যায় শোভমানা হইয়াছ[৪৯।৫০]। কর্পূরকুন্দধবলা পদ্মহাসিনী পূর্ণেন্দুকান্তিবিশিষ্টা হাস্যের দ্বারা এই দেশকে তুমি অত্যন্ত প্রসন্নময় করিতেছ। অনন্তর মহারাজা শিখিধ্বজ পুনর্ব্বার বলিলেন, অয়ি বরারোহে! চল বৈবাহিক বেদীর উপর যাই[৫১]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুষ্প ও লতাজাল দ্বারা পরিশোভিত সেই বেদী যজ্ঞভূমির ন্যায় মুক্তাপদ্মরাগাদি পরিশোভিত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। সেই বেদীর চতুঃপার্শ্বে নারিকেল ফল প্রদান করা হইয়াছিল[৫২।৫৩]। গঙ্গাবারিপূর্ণ কলসসকল আরোপিত করা হইয়াছিল। এবং তন্মধ্যে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইয়াছিল[৫৪]। প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিসমীপে আসনোপরি পূর্ব্বাভিমুখে নবদম্পতী উপবেশন করিলে শিখিধ্বজ বিধাদির দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন[৫৫।৫৬]। অনন্তর সেই বনে ভব ও ভবানীর ন্যায় সমাগত হইয়া নিজ প্রণয়িণীর কর ধারণ করিলেন। নবদম্পতী অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া স্বকীয় হৃদয় পবিত্র মনে করিলেন[৫৭।৫৮]। পরস্পর মৃদুমধুর হাস্য বিনিময় পূর্ব্বক অগ্নি ত্রি প্রদক্ষিণ করিয়া লাজাদি অগ্নিতে প্রদান করিলেন[৫৯]। এইরূপে নবোদিত চন্দ্রের ন্যায় মুখকান্তিবিশিষ্ট নবদম্পতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা পরস্পর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন[৬০]। এবং তাঁহারা পূর্ব্বরচিত কুসুম শয়নে গমন করিবার নিমিত্ত কন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে চন্দ্রমণ্ডল আকাশ মার্গে চতুর্থভাগাবশিষ্ট হইলেন অর্থাৎ রজনীর শেষ যামে উপস্থিত হইলেন[৬১]। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, নবদম্পতীর শোভা সন্দর্শন উদ্দেশে, লতাকুঞ্জে কামুক ব্যক্তি যেমন ললনা ছিদ্র দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ, ভীত হইয়া

অল্পে অল্পে কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাবিধ বিশ্রম্ভালাপ দ্বারা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন৬২।৬৩। নবদম্পতী লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কে যেন তাঁহাদের জন্য কুসুম শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে৬৪।৬৫। এবং চতুর্দ্দিকে মুক্তাকলাপের ন্যায় কুসুমরাশি শোভা পাইতেছে এবং গ্লানিবিবর্জ্জিত অম্লান মন্দার কুসুমরাশি তদুপরি শোভা পাইতেছে৬৬। ক্ষীরোদ সাগরে কৌমুদীরাশি পতিত হইলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ, তুষার-ধবল-কুসুম-বিরচিত মনোজ্ঞ শয়নে নবদম্পতী শয়ন করিয়া নানাবিধ প্রণয়পেশল বাগ্বিন্যাস দ্বারা তাঁহারা কথোপকথন করিতে ও শোভা পাইতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের এই সুখ রজনী যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অস্তগমন করিল৬৭।৭০।

ষড়ুত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তোত্তরশততম সর্গ।
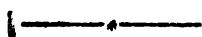
মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, অনন্তর ভগবান্ অংশুমালী স্বীয় লোহিত বর্ণ কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন রঞ্জিত করিলে, রাজমহিষী মদনিকা পুনরায় কুম্ভরূপ ধারণ করিলেন১। শিখিধ্বজ ও কুম্ভ উভয়ে দেব দম্পতীর ন্যায় সেই অনিন্দনীয় মহেন্দ্র পর্ব্বতের কন্দর প্রান্তে, নিভৃত গুহা প্রদেশে, লতাকুঞ্জে, তমালজাল পরিশোভিত মন্দার গহন স্থানে, সহ্য, দর্দ্দুর, কৈলাস, মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য এবং লোকালোক পর্ব্বত প্রান্তে আপনাদের ইচ্ছামত বিহার করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন২।৩। নিজ প্রিয়তম নিদ্রাগত হইলে চূড়ালা তিন দিন ব্যাপিয়া রাজভবনে গমন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেন ৭। সেই দেব দম্পতী সর্ব্বদা নানাবিধ কুসুম রাশির দ্বারা সুশোভিত হইয়া তথায় বিহার করিতে লাগিলেন৮। সরল-পাদপ-সমন্বিত সুরম্য

মহেন্দ্র পর্ব্বতের রত্নময় সানুপ্রদেশে জনগণ পূজিত হইয়া এক মাস বাস করিলেন[৯]। যে স্থান হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে মন্দার কুসুম সকল আহরণ করা যাইতে পারে তাঁহারা সেই শুক্তিমান নামক পর্ব্বত স্থিত লতাগৃহে এক পক্ষ অবাস্থিতি করিলেন[১০]। মৈনাক পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ স্থিত দক্ষিণ দিক্তটে যে দেবভোগ্য কুসুম স্তবকের চির প্রসূনাবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পারিজাত কাননে তাঁহারা ছুই মাস বিহার করিয়াছিলেন[১১]। মেরুর দক্ষিণ ভাগে জম্বু নদীর তটে যে স্থান হইতে জম্বুখণ্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা জম্বুফলাসব পান করিয়া স্থির যৌবন প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে এক মাস কাল অতিবাহিত করিলেন[১২]। এইরূপে উত্তর কুরু মণ্ডলে দশ দিন, উত্তর কোশল দেশে সপ্তবিংশতি দিবস যাপন করিলেন[১৩]। সেই নবদম্পতী রজনী যোগে উভয়ে সাম্মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ বন পর্ব্বত ও বিচিত্র অন্যান্য দেশ সমূহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন[১৪]। এইরূপে কতিপয় মাস অতীত হইলে দেবপুত্ররূপিণী নৃপভামিনী চূড়ালা অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণা হইলেন[১৫]। আমি প্রকৃত ভোগ বাসনার অনুকূল দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা নৃপতিকে পরীক্ষা করিয়া দেখি, ইনি কোনরূপ ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হন কি না[১৬]। চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সেই বন প্রদেশে অপ্সরোমণ্ডল বিভূষিত দেবেন্দ্রের আবির্ভাব করাইলেন[১৭]। মহারাজ শিখিধ্বজ সপরিবার সুরপতির আগমন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার যথোচিত পূজোপহার প্রদান করিলেন[১৮]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবরাজ! আপনি কি নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর প্রদেশ হইতে আমার নিকট আগমন করিলেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার আগমন প্রয়োজন বলুন[১৯]।

ইন্দ্র বলিলেন, যেরূপ পক্ষিগণ হৃদয়স্থিত বাসনা সূত্র অনুসারে (ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া) বন প্রদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকে, সেই প্রকার, আমিও আপনার গুণপরম্পরার পক্ষপাতী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি[২০]। অতএব, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন করুন। আপনাকে দেখিবার জন্য অমর পুরবাসী সকলেই অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়াছেন[২১]। আপনি পাদুকাদি

গ্রহণ পুরঃসর সিদ্ধ মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ স্বর্গ গমনে সমুদ্যত হউন[১১]। আপনি সেই দেবেন্দ্র পুরীতে বিবিধ ভোগসুখে তৃপ্তমনা হইয়া জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন[১৩]। সাধুগণ বাঞ্ছা করিয়া যে সকল সুখের আস্বাদনে অধিকারী হন না, আপনি সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তিরস্করণী বিদ্যার সহিত বিবিধ ভোগের দ্বারা পরিসেবিত হইবেন[১৪]। আপনি তথায় নির্ব্বিঘ্নে সুখে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ হরি যেমন ত্রিজগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই-রূপ, আপনিও অমরাবতী গমন পূর্ব্বক অমরাবতী পবিত্র করুন[১৫]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে দেবনায়ক! আমি সকল প্রকার সুখদায়ক বস্তু অবগত আছি। এই নিমিত্ত আমি যেখানেই থাকি, সেই স্থানেই আমার স্বর্গ বোধ হইয়া থাকে[১৬]। হে প্রভো! আমি সর্ব্বত্র সন্তুষ্ট ভাবে অবস্থিতি করি, সেই জন্য আমার, সর্ব্বত্রই আনন্দ বিদ্যমান্ থাকে। আমার মনে কোনও কামনা নাই বলিয়া আমি সর্ব্বত্র সদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকি[১৭]। হে শক্র! স্বর্গ আমার নিকট অতি তুচ্ছ। আমি আজ্ঞা পালনে সম্মত নহি[১৮]।

ইন্দ্র বলিলেন, হে সাধো! যাঁহারা জ্ঞেয় পদার্থ অবগত আছেন, সেই সকল প্রতিভাসম্পন্ন সাধুগণের ভোগ সুখকে সজ্জনগণ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় বলিয়া তাহার আচরণ করিয়া থাকেন[১৯]। দেবেন্দ্র এই কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্র যেই মৌন ভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সুরপতি "তবে কি আমি এখান হইতে যাইব না" এই কথা বলিয়া আপনার ও কুম্ভের মঙ্গল হউক, এই কথা বলিতে বলিতে অন্তর্দ্ধান করিলেন[২০।২১]। সেই সকল দেববৃন্দও তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। যেমন সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে কল্লোলরাশি জলেই বিনিবৃত্ত হয়, সেইরূপ, তাঁহারাও চলিয়া যাইলেন এবং বাক্য পরম্পরার ধ্বনি তিরোহিত হইল[২২]।

সপ্তোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ ।

——()○()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালা এই প্রকারে আত্মমায়ার বিস্তার ও তৎপরে তাহার শমতা করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বসুধাধিপতি ভাগ্যক্রমে নানা প্রকার ভোগে নিপতিত হইয়াও তাহার বশতা স্বীকার করিতেছেন না[১]। কি আশ্চর্য্য! ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাবে যিনি শান্তভাবাপন্ন এবং নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন আকাশের ন্যায় স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তিনিই নির্ভয়ে ও অবলীলাক্রমে অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজোপকরণাদি আহরণ করিতে গমন করিতেছেন[২]। নৃপমহিষী চূড়ালা নৃপতি পুনর্ব্বার যাহাতে বুদ্ধিভ্রংশকর রাগ-দ্বেষাদি প্রপঞ্চের অধীন না হইয়া পড়েন, এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন[৩]। ঐ রূপ চিন্তা করিয়া যৎকালে বনমধ্যে বিমল শশাঙ্ক কিরণ প্রতিফলিত হয় সেই সময়ে দিব্যকান্তি অঙ্গনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কমনীয়াকৃতি মদনিকা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যে সময়ে মধুরামোদদায়ি ফুল্ল কুসুম সৌরভ সমীরণ সহযোগে প্রবাহিত হইতে থাকে, যে সময়ে নদীতীরে শিখিধ্বজ সন্ধ্যোপাসনায় নিরত থাকেন, এবং শ্রেষ্ঠ কুসুম দ্বারা গহন সকল নীরন্ধ্র থাকে, যে সময়ে মদনিকা বনদেবীর ন্যায় মধুর মূর্ত্তিতে তথায় প্রবেশ করিয়া থাকেন[৪।৫]। উক্ত দম্পতী যে সময়ে মিলিতা হইতেন সেই সময় অতীত হইল দেখিয়া কুসুম শয়নে যুবক যুবতী যেমন কণ্ঠলীন হইয়া অধিশয়ান হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ পরস্পর গলদেশে হস্তালিঙ্গন দ্বারা আবদ্ধ করতঃ অধিশয়ান হইলেন[৭]। মহারাজ শিখিধ্বজ কুঞ্জ হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে লতাগৃহ মধ্যে অনবদ্যাঙ্গী মদনিকাকে দেখিতে পাই-লেন[৮]। তাঁহার সচন্দন মনোহর কুন্তলজাল শয়নে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন নিবন্ধন ইতস্ততঃ বিস্ফুরিত হইয়া রহিয়াছে[৯]। নয়নাভিরামা বালা শয্যোপরি তুষারধবল বাহু কপোলে সংন্যস্ত করিয়া অধিশয়ানা রহি-

য়াছেন১০। অনন্তর সেই নিভৃতে পরস্পর বিশ্রস্ত প্রণয় সম্ভাষণ দ্বারা এবং কুসুম লতার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রণয়ী যুগল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন১১। চঞ্চল কুসুম-শয়নে মদন পরিপীড়িত হইয়া অনুরাগচ্ছলে পরস্পর আলিঙ্গন প্রদান করিলেন১২। তাঁহাদের পরস্পর বক্ষতাড়নায় স্তনদ্বয় পীড়িত হইতে লাগিল, এবং বদনকমল সাতিশয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল১৩। শিখিধ্বজ এইরূপ অবলোকন করিয়া আমরা আজ যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সাগরে ভাসিতেছি তাহা অন্যের অনমুমেয় এই বলিয়া নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন১৪। পরে তিনি, হে মানিনি! তুমি যথাসুখে এ স্থানে বিহার কর, হে ভীরু! আমি তোমার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিব না, এই বলিয়া তিনি তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন১৫। অনন্তর নৃপভামিনী চূড়ালা মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার মায়া সঙ্গোপন পূর্ব্বক কাম ভোগ নিপুণ অর্থাৎ পর প্রেম মুগ্ধ স্বকীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া লতা কুঞ্জ হইতে বিনিক্রান্তা হইলেন১৬। এবং দেখিলেন, মহারাজা শিখিধ্বজ সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক হৈমময় শিলাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং তাঁহার নীলেন্দীবর সদৃশ নয়নদ্বয় ঈষৎ বিকসিত রহিয়াছে১৭। মদনিকা তথায় আগমন করিয়া ব্রীড়া বশতঃ আপনার মুখ কমল অবনত করিলেন। এবং খিন্ন ও পরিক্লান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ তুষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলেন১৮। মহারাজা শিখিধ্বজ কিঞ্চিৎ কাল মধ্যে বীতসমাধি হইয়া মধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অতি শ্রবণাভিরাম বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন১৯। অয়ি তম্বি! কি নিমিত্ত তুমি এত সত্বর প্রণয়োপভোগ ত্যাগ করিলে। জন্তু সকল আনন্দের নিমিত্ত এই ভুবনত্রয়ে বিচরণ করিয়া থাকে২০। তুমি প্রণয় পরিচারণ দ্বারা তোমার মনোবৃত্তির সন্তোষের নিমিত্ত পুনরায় গমন কর। এই জগতে পরস্পরের প্রণয় অতি দুর্লভ২১। অয়ি মানিনি! আমি ইহাতে কিছু মাত্র উৎকণ্ঠিত হইতেছি না। লোকের বাঞ্ছনীয় বিচিত্র ঘটনাবলী দেবপ্রসাদে সম্পন্ন হইয়া থাকে২২। তুমি দুর্ব্বাসার শাপে মদনিকা হইয়াছ। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে রত হইতে পার২৩।

মদনিকা বলিলেন, হে মহাভাগ! রমনীগণ স্বভাবতঃ এইরূপ চঞ্চল হইয়া থাকে। পুরুষাপেক্ষা রমণীগণের কামবৃত্তি অষ্ট গুণ অধিক।

অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন[২৫]। আমি অবলা, এই রাত্রি কালে গহন কাননে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকি। আপনি সায়ংকালীন জপে নিযুক্ত হইয়া থাকিলে আমি একাকিনী কি করিব[২৬]? অবলা কুমারী-ই হউন, আর তরুণী-ই হউন, উপপতি প্রাপ্ত হইলে তাহারা রতি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারে না[২৭]। রমণীগণ পুরুষের সহবাসে সুন্দরতা লাভ করিয়া থাকে। আপনি যদি বলেন যে, "আমি আপনার বিবাহিতা পত্নী, সুতরাং পরপুরুষ সমাগম দ্বারা পাতিব্রত্য ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তোমার প্রতি আমার অনুরাগ না থাকিলেও পারে[২৭]।" সে পক্ষে আমার কথা এই যে, আমি মূঢ়া বিদ্যাবুদ্ধি পরিহীনা অবলা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দেখুন, সাধুগণ সর্ব্বদাই ক্ষমাপরায়ণ হইয়া থাকেন[২৮]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে সুন্দরি! গগনতলে যেমন বৃক্ষ কখনও থাকিতে পারে না, সেইরূপ, আমার হৃদয়ে রাগও থাকিতে পারে না। কেবল সাধুগণের নিন্দাভয়ে তোমাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না[২৯]। যাহা হউক, হে বরারোহে! তুমি এই বনপ্রদেশে পূর্ব্বের ন্যায় যথাসুখে বিহার কর[৩০]।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপ ভাবে সমভাব পরায়ণ হইয়া মহাত্মা শিখিধ্বজ অবস্থান করিলে চূড়ালা, রাজা শিখিধ্বজের ঐরূপ রাগদ্বেষাদি শূন্য অন্তঃকরণ অনুভূতিগোচর করিয়া অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন[৩১]। কি আশ্চর্য! এক্ষণে ইনি পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া ভগবত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাগ দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন[৩২]। সুখ দুঃখ আপদ সম্পদ এবং ভোগাদি কিছুতেই ইহার চিত্ত বিচলিত হইবে না[৩৩]। এক্ষণে আমি ইঁহাকে নারায়ণের ন্যায় দেখিতেছি[৩৪]। অতএব, আমার সমুদায় আত্মবৃত্তান্ত ইঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই। আমি কুম্ভ রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চূড়ালা রূপে ইঁহাকে দর্শন দিই[৩৫]। চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ মদনিকা দেহ ত্যাগ করিয়া চূড়ালা রূপে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিতা হইলেন[৩৬]। অচিরকাল মধ্যে মহারাজ শিখিধ্বজ প্রণয়পেশলা নিজ দয়িতা চূড়ালাকে সন্দর্শন করিলেন। ভগবান্ কমলাপতি কমলার সহিত মিলিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, ভূমিতল হইতে লক্ষ্মীরূপিণী জনকনন্দিনীর উদ্ভব হইলে যেরূপ

শোভা হইয়াছিল, রত্নাধার হইতে রত্নজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ, নিজ প্রণয়িনীকে সম্মুখে উপগতা ও সুশোভিতা হইতে দেখিলেন[৩৭।৩৮]।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

নবাধিকশততম সর্গ।

——()○()——

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, মহাসত্ত্ব রাজা শিখিধ্বজ নিজ প্রণয়িনী চূড়ালাকে সন্দর্শন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, পরে তাঁহাকে বলিলেন[১]। অয়ি সুন্দরি! তুমি কে? অয়ি পদ্মপত্রাক্ষি! তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে? তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ এবং কি নিমিত্তই বা এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ[২]? অঙ্গসৌষ্ঠব, ব্যবহার এবং মধুর হাস্য দ্বারা আমি তোমাকে আমার নিজ দয়িতার ন্যায় দেখিতেছি[৩]।

চূড়ালা বলিলেন, হে প্রভো! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাই ঠিক্। আমি চূড়ালা, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি অকৃত্রিম দেহ ধারণ করিয়া অদ্যই এ স্থানে আসিয়াছি[৪]। কুম্ভাদি দেহ ধারণ করতঃ নানাবিধ মায়া প্রপঞ্চের দ্বারা এই বনান্তরে আপনাকে প্রতিবোধিত করিতেছিলাম[৫]। আপনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মোহ বশতঃ তপস্যাদির নিমিত্ত বনমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি সেই দিন হইতেই আপনাকে প্রতিবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্নশীলা হইয়াছি[৬]। কুম্ভদেহ ধারণ করিয়াই আপনাকে প্রতিবোধিত করিয়াছি। আপনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই কুম্ভাদি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম[৭]। হে মহীপতি! আমি মায়ার দ্বারা কুম্ভাদি দেহ ধারণ করিয়াছিলাম জানিবেন, তাহা সত্য নহে। এক্ষণে আপনি ধ্যানমার্গ দ্বারা সমস্তই বিদিতবেদ্য হইয়াছেন[৮]। আপনি ধ্যানমার্গ দ্বারা সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন। অনন্তর চূড়ালা কর্ত্তৃক ঐরূপে বিদিত হইয়া রাজা

ধ্যানযোগে রাজা পরিত্যাগাবধি চূড়ালা দর্শন পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিতে পাইলেন[১০]। মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা পরিত্যাগাবধি চূড়ালার ক্রম ও দর্শন বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন[১১]। রাজা সমস্ত অবলোকন করিয়া সমাধি হইতে বিরাম লাভ করিলেন, এবং পুলকিত হইয়া নয়নাম্বুজ উন্মুক্ত করিলেন[১২]। সত্বর বাহু প্রসারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন[১৩]। নকুল যেমন নকুলীকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করে, তদ্রূপ, রাজা মহারাণীকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন[১৪]। এতদুভয়ের মিলনে যেরূপ আনন্দ উত্থিত হইয়াছিল, স্বয়ং বাসুকী শত জিহ্বা দ্বারাও তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন না। শৈল সকল যেমন পরস্পর দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ, তাঁহারাও আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সংলগ্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অতি পুলকিত ও দেহ হইতে স্বেদ জল সকল নির্গত হইতে লাগিল [১৫।১৬]। তাঁহাদের পরস্পরের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রবাহ বহিতে লাগিল। ক্রমে বাহুদ্বয় শিথিলভাব ধারণ করিল[১৭]। মহারাজ তদীয় রমণীর চিকুরদেশে হস্ত সংলগ্ন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। যোষিৎ কুলের মধ্যে তুমি পরম রমণীয়া ও অতিমধুরা[১৮।১৯]। অদ্য পুণ্যরাশি চতুর্দ্দিকে স্ফুরিত হইতেছে, তোমার সঙ্গ অমৃত অপেক্ষাও সুখের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অয়ি নবোদিত শশিকলার ন্যায় মনোহারিণি! তুমি কি আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না[২০]। তুমি ভর্ত্তার জন্য অতি কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়াছ, এবং আমি দারুণ সংসারকুহর হইতে তোমার নিমিত্ত উদ্ধার পাইয়াছি। অরুন্ধতী, শচী, গৌরী, গায়ত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী হইতেও তুমি অধিকাবতী হইতেছ [২১।২২]। হে তম্বি! অদ্য সকল রমণী অপেক্ষা তোমার গুণ বিবৃদ্ধ হইয়াছে। ধী, লক্ষ্মী, কান্তি, ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা এ সকলকেও তুমি গুণদ্বারা পরাস্ত করিয়াছ[২৩]। অয়ি সুন্দরি! আমি অদ্য তোমা হইতে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। এক্ষণে কি প্রত্যুপকার করিয়া তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব, তাহা আমাকে অনুজ্ঞা কর। আমি দারুণ মোহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। স্নেহান্বিতা কুলযোষিৎগণ যেরূপ উদ্ধারসমর্থা, শাস্ত্র, গুরু ও মন্ত্রাদি সেরূপ সমর্থ নহে[২৪।২৫]। স্নেহময়ী কুলাঙ্গনারা ভর্ত্তার সখার, ভ্রাতার, সুহৃদের, গুরুর, মিত্রের ও ধনসম্পত্তির স্বরূপ[২৭]।

কুলাঙ্গনারা ভর্ত্তার নিকট শাস্ত্র, দাস ও গৃহাদির স্বরূপ। সেইজন্য কুলস্ত্রী ভর্ত্তার সর্ব্বদা মাননীয়া[২৮]। সাধ্বী রমণীরা স্বামীর ইহ-পর-উভয় লোকের সুখস্থান এবং সংসার সমুদ্রের পারনেত্রী[২৯]। আমার মনে হয়, তুমি সমুদায় কুলনারীকে জয় করিলে[৩০]। যে স্থানে অথবা যখন যখন নারীদিগের সদ্‌গুণের উল্লেখ হইবে, তখন তখনই তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গননীয়া হইবে। আরও মনে হয়, বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়া অরুন্ধতী প্রভৃতির কোপস্থান হইয়াছেন। তুমি সতী সাধ্বী ও অতিশয়শালিনী। এক্ষণে আইস, আমি তোমাকে পুনরালিঙ্গন করি।

বশিষ্ঠ বলিলেন, শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিয়া চূড়ালাকে পুনরালিঙ্গন করিলেন[৩১।৩৩]।

চূড়ালা বলিলেন, হে দেব! আপনাকে আমি নীরস ক্রিয়াতৎপর দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতাম। সেইজন্য আমি তোমার তত্ত্বজ্ঞান উদয়ের জন্য যত্ন করিয়াছি। ঐ যত্নে আমারই স্বার্থ ছিল, সুতরাং উহাতে আমি আপনার প্রশংসাপাত্রী নহি[৩৪।৩৬]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, তুমি যেমন সখা হইয়া স্বার্থ সম্পাদন করিলে, আজ্ সমুদায় কুলনারী এইরূপ স্বার্থ সম্পাদন করুক।

চূড়ালা বলিলেন, হে কান্ত! আপনি বোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে সংসার সাগরের তটে স্থিতি করতঃ বিশ্রাম সুখ অনুভব করুন[৩৭]। এখনও কি পূর্ব্বের সেই কঠোর তপস্যাদি মনে করেন? সে সকল মনে করিয়া এখন বোধ হয় মনে মনে হাস্য করিতেছেন। সে সকল কেবল মনঃকল্পনার কুহক[৩৮।৩৯]। হে দেব! আকাশে যেমন পর্ব্বতের স্থিতি দৃষ্ট হয় না, তেমনি, এখন আপনাতে কোনও দৃশ্যের দর্শন হয় না। এখন আপনি কোথায় এবং কি বাঞ্ছা করেন[৪০]? এখন কি কোনরূপ দেহ আছে?

শিখিধ্বজ বলিলেন, হে নীলাব্জলোচনে! এখন আমি নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নিরংশ, স্বস্থ ও নিস্পৃহ[৪১।৪২]। এখন আমি শান্ত, অরূপ ও মোহবর্জ্জিত। এখন আমি পরমার্থে অবস্থান করিতেছি[৪৩]। হরি হর ব্রহ্মা প্রভৃতি যে অবস্থার প্রতিষেধ করিতে পারেন না, আমি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি চিন্মাত্র ও স্বস্থ[৪৪]। এখন

আমি সংসার ভ্রমের অতীত সুতরাং এখন আমি রুষ্ট তুষ্ট খিন্ন, কিছুই নহি[৫৫]। হে সুন্দরি! আমি স্থূল নহি, সূক্ষ্ম নহি, অসত্য বা মিথ্যা নহি। এখন আমি সত্য ও ক্ষয়াদি রহিত। এখন আমি শান্ত স্বরূপ প্রাপ্ত, নিরাশয় ও সাম্যপ্রাপ্ত[৫৬,৫৭]। হে পতিব্রতে! আমি এখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ও যাহা ছিলাম তাহাই। অন্য কিছু হইও নাই এবং হইবও না। হে চপল নেত্রে! তুমি আমার গুরু, সে ভাবে তুমি আমার নমস্যা। তোমারই প্রসাদে আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছি[৫৮-৫৯]। আর আমার মালিন্য হইবে না। আজ্ আমি শান্ত স্বস্থ ও রাগাদি বিহীন[৬০]। আমি সর্ব্বাতীত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগামী।

চূড়ালা বলিলেন, হে মহামতে! হে হৃদয়প্রিয়! যদি তাহাই হয়, তবে এখন বলুন, আপনার কি ভাল লাগে?

শিখিধ্বজ বলিলেন, ইহা ভাল নহে অথবা ইহা ভাল, তএর কিছুই জানি না[৬১,৬২]। হে তন্বি! তুমি যাহা কর, এবং ভাল মনে কর, আমার পক্ষে তাহাই হউক[৬৩]। আমি ভাল মন্দ অনুসন্ধান করি না। এক্ষণে তুমি যাহা জান তাহাই কর[৬৪]। মণি যেমন প্রতিবিম্ব ধারণ করে, সেইরূপ, আমি তোমার অভিমত আচার ধারণ করিব। আমার নিজের কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই। আমি স্তুতি নিন্দা করিব না, তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ কর।

চূড়ালা বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে, আমার মনোগত কথা শ্রবণ করুন[৬৫,৬৬]। আপনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় অদ্বৈত জ্ঞানে কিছু কাল অবস্থান করুন[৬৭]। আমরা এখন উভয়েই নিরীচ্ছ, আকাশের ন্যায় নির্লেপ, এখন আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, চেষ্টা অচেষ্টা, সমান[৬৮]। আমরা আদ্যন্তরহিত ও চিন্মাত্র। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমরা আয়ুঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে থাকিব। পরে যথাকালে বিদেহ হইব।

শিখিধ্বজ বলিলেন, আমরা আদি মধ্য শেষ, এই তিন কালে কিংস্বরূপ তাহা বল[৬৯,৭০]। আয়ুঃ শেষ হইলে আমরা কিরূপ অবস্থায় থাকিব, তাহা বল।

চূড়ালা বলিলেন, আমরা আদিতে মধ্যে ও অন্তে সমান রাজমান [৭২]। মোহ অতীত ও মোহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে সেই রাজমান থাকিব[৭৩]। এখন আপনি পূর্ব্বের ন্যায় আপন নগরে ও আপন

সিংহাসনে রাজা হউন, আমিও আপনার লোকললামভূতা মহিষী হইয়া থাকিব। পুরবাসী নগরবাসী ও রাজ্যবাসী মানবেরা হৃষ্ট পুষ্ট থাকুক[৬৪]। রাজপ্রাসাদে পতাকা উড্ডীন হউক, নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি উত্থিত হউক, পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা নগর ভূষিত হউক[৬৫]। বসন্ত কালে যেরূপ লতা-বল্লী প্রভৃতি শোভমানা হয়, নগর শীঘ্রই সেইরূপ শোভমান হউক।

বশিষ্ঠ বলিলেন, চূড়ালা ঐ সকল কথা বলিলে রাজা শিখিধ্বজ হাস্য সহকারে ও অতিমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন—হে প্রিয়ে! যদি সেরূপ ইচ্ছা হয় ত আমি তাহাই করিব। এই মনুষ্যলোকেই আমি স্বর্গলোকের সুখ অনুভব করিব[৬৬,৬৭]।

চূড়ালা বলিলেন, হে মহারাজ! আমার আর ঐশ্বর্য্যাদি ও ভোগ্য বস্তুতে স্পৃহা নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে আমি তাহা-তেই তৃপ্ত আছি[৬৮]। স্বর্গ, রাজ্য, এ সমস্ত আমার সুখের বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। অবিক্ষুব্ধ অবস্থাই আমার সুখের কারণ[৬৯]। ইহা সুখের, ইহা দুঃখের, ইত্যাদি প্রকার দ্বৈতভাব তিরোহিত হওয়ায়, আমি সর্ব্বত্রই সুখে বিচরণ করিব[৭০]।

শিখিধ্বজ বলিলেন, অয়ি বিলোলাক্ষি! তুমি যথার্থই বলিয়াছ। রাজ্যাদির কি প্রয়োজন? সুখ দুঃখাদি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিগত মৎসর হওয়াই কর্ত্তব্য। তথাবিধ অবস্থায় আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিব[৭১,৭২]। এইরূপে নবদম্পতী কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে দিনমান যেন অতি সত্বর অতিবাহিত হইয়া গেল[৭৩]। অনন্তর তাঁহারা সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া সান্ধ্য বিধির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বর্গসিদ্ধিও অনাদর করিয়া উভয়ে নানাবিধ প্রণয়ালাপ দ্বারা রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রণয়পেশল বাক্যসকল শ্রবণ কামনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রজনী যেন অতিবাহিতা হইয়া গেল[৭৪,৭৫]।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

দশাধিকশততম সর্গ ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, রত্নাধার হইতে যেমন কান্তি বহির্গত হইতে থাকে, সেইরূপ, ভগবান্ মরিচীমালী তমোরাশি ধ্বংস করিয়া গগনমার্গে উদিত হইলেন[১]। অরবিন্দ যেমন সূর্য্যোদয়ে বিকসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ, মানবগণের নয়ন সূর্য্যোদয়ে বিকসিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ রাত্রি অবসানে জনসমূহ জাগরিত হইতে লাগিল। এবং জনসমূহ যেমন স্ব স্ব আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, তদ্রূপ, সূর্য্যরশ্মি সকল তাহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল[২]। পূর্ব্বোক্ত দম্পতী প্রভাত আগত দেখিয়া পত্রাসনে অবস্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবিধির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর নৃপভামিনী চূড়ালা, সম্মুখস্থিত সপ্তসমুদ্র-সলিলপূর্ণ রত্নকুম্ভ লইয়া রাজাকে অভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিলেন[৩।৪]। এবং সেই মঙ্গল কুম্ভসলিল দ্বারা পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট স্বকীয় স্বামীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন[৫]। সঙ্কল্পমাত্রে উপস্থিত হেমময় বিষ্টরে রাজাকে উপবিষ্ট ও অভিষিক্ত করিয়া দেবরূপিণী চূড়ালা এইরূপ বলিতে লাগি-লেন[৬]। হে প্রভো! আপনি এতদিন মুনিগণের উপযোগী যে সমস্ত তেজ সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অষ্টলোক-পালের তেজ অর্থাৎ রাজপ্রতাপ ধারণ করুন[৭]। অরণ্যমধ্যে চূড়ালা কর্ত্তৃক রাজা শিখিধ্বজ এইরূপে প্রতিবোধিত হইলে চূড়ালা বলিলেন, আপনি অদ্য এস্থানে মহারাজ হইলেন[৮]। তখন রাজা প্রতিহারপদস্থিতা মানিনী চূড়ালাকে রাজ্ঞীপদে প্রতিষ্ঠা করিবার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া সরোবর হইতে জল আনয়ন পুরঃসর অভিষেক করতঃ নিজ দয়িতাকে রাজ্ঞীপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন[৯।১০]। এবং বলিলেন, হে প্রিয়তমে! হে পদ্মপত্রাক্ষি! মহাবিভব সংযুক্ত সৈন্য সকল তুমি সংগ্রহ করিবার যোগ্য হইয়েছে[১১]। বরবর্ণিনী চূড়ালা দয়িতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ষাকালীন মেঘের জল সৃষ্টির ন্যায় সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিলেন[১২]। তখন তাঁহারা বাজী বারণ ও পতাকা সবলিত রথসঙ্কুল সৈন্যরাশি

অবলোকন করিতে লাগিলেন[১৩]। সেই নিবিড় বনভূমি ও সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত গুহা ভেরী নিনাদে নিনাদিত হইতে লাগিল। এবং সৈন্যগণের শিরস্ত্রাণ স্থিত রত্ন সমূহ দ্বারা তমোরাশি ধ্বংস হইতে লাগিল[১৪]। পরে সেই হৃষ্ট পুষ্ট সৈন্য সামন্তাদির দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া সেই নৃপ-দম্পতী রথারোহী হইলেন[১৫]।

তদনন্তর মহাবল রাজা শিখিধ্বজ রাজ্ঞী চূড়ালার সহিত পদাতি রথ গজ বাজী সঙ্কুল সৈন্য পরিচালন করতঃ সেই মহেন্দ্রাদ্রি হইতে বিনির্গত হইলেন। পথিমধ্যে অনেক পর্ব্বত, বহু দেশ, অনেক নদী, গ্রাম, বিবিধ অরণ্য সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন[১৬।১৮]। এবং পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যাশ্রম করিবার সময়ে পথিমধ্যে যে সকল বিষয় দেখিয়াছিলেন, নিজ প্রেয়সীকে সে সকল দেখাইতে দেখাইতে সুষমাময়ী নিজ রাজধানীতে সমুপস্থিত হইলেন[১৯]। তখন অমাত্যবর্গ মহারাজের নগরাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তদাগমনে সন্তুষ্টচিত্ত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই উৎকণ্ঠার সহিত সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সম্মুখে আগমন করিয়া জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল[২০।২১]। পুরবাসীগণ লাজ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। তিনি নগরের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী শ্রেণীনিবদ্ধ বণিকপথ সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন[২২]। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে নিজ পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, পতাকা শ্রেণীর দ্বারা পুরী বিচিত্র শোভায় শোভমানা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধাকারে গ্রথিত মাল্য সকল সংন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। পরকীয়া রমণীগণ নৃত্য গীত প্রভৃতির দ্বারা আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। বলিতে কি, সত্বর সেই পুরী কৈলাশ পর্ব্বতের ন্যায় অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। লোকপ্রসিদ্ধ দূর্ব্বাক্ষত প্রভৃতি, মাঙ্গল্য দ্রব্যের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া রাজা নিজ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং যে সকল প্রজাপুঞ্জ তথায় সমুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন[২৩।২৪]। অনন্তর সপ্ত দিন যাবৎ পুরীমধ্যে বিশেষ উৎসব করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। এবংক্রমে পৃথিবীতে চূড়ালার সহিত দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তৈলবিহীন হইলে দীপ যেমন নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ, তিনি পুনর্জ্জন্মবর্জ্জিত হইয়া মোক্ষধামে গমন করিলেন[২৫।২৭]। দশ সহস্র

বৎসর ঐরূপে সমদৃষ্টির দ্বারা রাজ্য পালন করিয়া তিনি নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৮]। তৎপরে বর্ণিত প্রকারে বিগতভয় বিগতবিষাদ ও জীবন্মুক্ত হইয়া মহামতি শিখিধ্বজ সমদৃষ্টির দ্বারা দশ সহস্র বর্ষ প্রজা পালন করিয়াছিলেন[১৯]। পৃথিবীতে নানাবিধ ভোগাবস্তু উপভোগ করিয়া রাজগণের চূড়ামণি হইয়া, অশেষ সুখ সম্ভোগ করতঃ মহাত্মা শিখিধ্বজ সসাগরা পৃথিবী প্রতিপালন পূর্ব্বক সংসারমুক্ত হইয়াছিলেন। রাম! তুমিও তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ও বিশোক হইয়া যথোপস্থিত কার্য্যের অনুসরণ কর, পশ্চাৎ তুমিও তাঁহার ন্যায় নির্ব্বাণ পদে স্থিতি করিও[২০]।

দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চূড়ালোপাখ্যান সমাপ্ত।

একাদশোত্তরশততম সর্গ।

—()○()—

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকট শিখিধ্বজ রাজার উপাখ্যান সবিশেষ বর্ণন করিলাম। যদি তুমি এই পথ অবলম্বন কর, তবে তুমি কখনও ক্লিষ্ট হইবে না[১]। তুমি এই প্রকার রাগ দ্বেষ বিনাশিনী সমদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বুদ্ধিতে বিষয়বাসনা-শূন্য ব্রহ্ম পদ লাভ করতঃ অবস্থান কর[২]। রাজা শিখিধ্বজ যেমন এইরূপে অশেষ রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমিও এইরূপে রাজ্য রক্ষা করতঃ ভোগ ও মোক্ষ পদ লাভ কর[৩]। হে রামচন্দ্র! শিখিধ্বজের সর্ব্বত্যাগানুসারে বৃহস্পতির পুত্র কচ যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর[৪]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে প্রভো! ভগবান্ বৃহস্পতির পুত্র মহাভাগ কচ যেরূপে তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, আপনি সংক্ষেপে তাহা কীর্ত্তন করুন[৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন! দেবগুরুনন্দন কচ যেরূপ শিখিধ্বজের ন্যায় অত্যুত্তম আত্মদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ

কর৬। কচ বাল্যকাল অতিক্রমের পর সংসার সমুত্তরণের ইচ্ছায় এই মহাবাক্যের মর্ম্মাবগত হইয়া পদ পদার্থাভিজ্ঞ অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" পিতা বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন৭।

কচ বলিলেন, হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আপনার কর্ম্ম প্রভাবে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীবগণ কি উপায়ে এই সংসার পঞ্জর হইতে নির্গত হয়, তাহা আমাকে বলুন৮।

বৃহস্পতি বলিলেন, হে পুত্র! জীবগণ অনর্থরূপমকরসঙ্কুল সংসার সমুদ্র হইতে সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে৯।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কচ পিতার নিকট এই প্রকার পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করতঃ বিজনবনে গমন করিলেন১০। ইহাতে বৃহস্পতির মনে কোনও উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় নাই। কারণ মহানুভবগণ ইষ্ট বিয়োগে বা অনিষ্ট সংযোগে কখনই বিধুর হইয়া উঠেন না১১।

অনন্তর, কোন মহারণ্যে ক্রমে অষ্টবর্ষ অতীত হইলে পরমাত্মা কচ এক সময়ে পুনর্ব্বার বৃহস্পতিকে দেখিতে পাইলেন১২। অনন্তর কচ নানাবিধ পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা বৃহস্পতির পূজা করিলে বৃহস্পতি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কচও বৃহস্পতিকে এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন১৩।

কচ বলিলেন, অদ্য অষ্ট বর্ষ যাবৎ আমি সর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। হে তাত! তথাপি আমি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না১৪।

বশিষ্ঠ বলিলেন, কচ এইরূপে কাতর হইয়া বনমধ্যে বৃহস্পতির নিকট এই প্রকার বলিলে বৃহস্পতি বলিলেন, তুমি সমস্ত পরিত্যাগ কর, এই বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন১৫। বৃহস্পতি গমন করিলে কচ বল্কল প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। এবং শরৎকালীন আকাশ যেমন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও মেঘমণ্ডলের অনুদয়ে শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন১৬। এবং পুনর্ব্বার সেই কাননে বর্ষত্রয় অতিবাহিত করিলেন। শরৎকালীন মেঘ যেমন জল বর্ষণ করিয়া শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন১৭। দিগন্তের এক দেশে অবস্থান করতঃ শান্ত ও শূন্য ভাব ধারণ করিলেন; এবং বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরে ক্ষুব্ধ হইতে

লাগিলেন। এইরূপ সময়ে বৃহস্পতি পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিলেন[১৮]। কচ তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। অনন্তর কচ পবিত্র বাক্যের দ্বারা পুনরায় সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন[১৯]।

কচ বলিলেন, হে তাত! আমি কন্থা ও বেণুদণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। এখন আমি কি করি[২০]?

বৃহস্পতি বলিলেন, যদিও তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, কিন্তু চিত্তকেই পণ্ডিতেরা সকল পদার্থময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি সেই চিত্ত পরিত্যাগ কর, চিত্ত ত্যাগ ব্যতিরেকে সর্ব্বত্যাগ সম্ভাবনা নাই[২১]। যাঁহারা সর্ব্ব পদার্থের মর্ম্মগ্রাহী, তাঁহারা চিত্তত্যাগকে সর্ব্বত্যাগ বলিয়া স্থির করিয়াছেন[২২]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, বৃহস্পতি পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। কচও অখিন্নমনে চিত্তত্যাগে সঙ্কল্প করিলেন[২৩]। তিনি বনবাসী থাকিয়া যে সময়ে চিত্ত পদার্থের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেন না, সেই সময়ে পিতৃসন্দর্শন লালসায় সুরলোকে গমন করিলেন। কচ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সুরলোকে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে পিতৃ চরণে অভিবাদন ও প্রণাম করিলেন[২৪।২৫]। অনন্তর তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! চিত্ত পদার্থ কি? এবং ইহার স্বরূপই বা কি? এবং আমি কি করিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারি[২৬]?

বৃহস্পতি বলিলেন, যাঁহারা চিত্ত পদার্থের স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা চিত্তকে অহঙ্কার বলিয়া জানেন। জীবের অন্তঃকরণে যে অহং ভাবের উদয় হয় তাহাই চিত্ত[২৮]।

কচ বলিলেন, হে মতিমন্! আপনি ত্রয়স্ত্রিংশকোটী প্রমাণজ্ঞ বুধগণের গুরু। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে চিত্তের স্বরূপত নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা কি প্রকার আমাকে বলুন[২৯]? আমি চিত্ত ত্যাগকে সুদুষ্কর বলিয়া অনুমান করি। এবং জানি ইহাকে ত্যাগ করিতে না পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। যাহা হউক, হে যোগীন্দ্র আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কি করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি[৩০]?

বৃহস্পতি বলিলেন, কুসুমদলাদি মর্দ্দন ও নয়ন বিমীলন অপেক্ষা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অতি সহজ। আমার বিশ্বাস ইহা পরিত্যাগে কোন ক্লেশ নাই[৩১]। হে পুত্র! ইহা বস্তুতঃ যে প্রকার, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যখন জীবের প্রকৃত পদার্থ জ্ঞান হয়, তখন অজ্ঞানের আশ্রয়ে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়[৩২]। হে পুত্র! মিথ্যা ভ্রম যে প্রকার, বস্তুতঃ ইহাও তাই। অহঙ্কার বলিয়া কোন পদার্থ নাই। বালকের বেতাল ভয় যে প্রকার, ইহাও সেই প্রকার। ইহার কোন সত্তা নাই[৩৩]। রজ্জুতে যেমন সর্প প্রতীতি হয়, মেরুপ্রদেশে জল বুদ্ধি হয়, সেই প্রকার মিথ্যাময় অহঙ্কার মিথ্যা রূপে প্রকাশ পায়[৩৪]। যেমন চন্দ্র এক হইলেও মোহবুদ্ধি বশতঃ চন্দ্রের দ্বিত্ব অনুভূতি হইয়া থাকে[৩৫]। এই সংসারে অন্য পদার্থ আর কিছুই নাই, কেবল আদি ও অন্ত বর্জ্জিত আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ সকলের জ্ঞানগম্য এক নিত্য পদার্থ আছে[৩৬]। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে সকল পদার্থে এবং সকল প্রাণীতে বিরাজিত আছেন। তিনি বিলোল বীচি বিশিষ্ট সমুদ্রে জল রূপে অবস্থিতি করেন[৩৭]। এই মহা ভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাহা হইতে রজোরাশি উদ্ভূত হইয়াছে, জল হইতে কাহার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং অনল হইতেই বা কাহার উৎপত্তি হইয়াছে[৩৮]। আমি সেই, এই প্রকার মিথ্যা প্রত্যয়কে পরিত্যাগ কর। কারণ উহা অতি তুচ্ছ ও পরিমিতাকৃতি এবং উহাতে দিক্ কাল সকল সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে[৩৯]। যিনি দিক্ এবং কালাদি হইতে অনবচ্ছিন্ন স্বচ্ছ বিস্তৃত নিত্যোদিত সর্ব্বার্থময় এবং অমল চৈতন্য স্বরূপ, তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হও[৪০]। সমস্ত দিগাবস্থিত ফল কুসুম দলের রসের ন্যায় তুমি এই জগতে চিরন্তন আছ। বিমলতর চিত্ত নিত্য, সেই পদার্থ হইতে তুমি ভিন্ন নহ[৪১]।

একাদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ।

—()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, এইরূপে অতি উৎকৃষ্টতর যোগমার্গোপদেশ লাভ করিয়া বৃহস্পতি সুত কচ জীবন্মুক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন [১]। হে রামচন্দ্র! কচ যেমন নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া প্রশান্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ, তুমিও অবিকৃত চিত্ত হইয়া অবস্থান কর[২]। অহঙ্কারকে অসৎ বলিয়া জানিও এবং এই আশ্রম পরিত্যাগ করিও না। যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা নাই তাহার আশা অসম্ভব[৩]। অহঙ্কার নষ্ট হইলে মরণ ও জন্ম উপলব্ধি হইতে পারে না। আকাশে বীজ বপন করিয়া কে কবে ফল সংগ্রহ করিয়াছে[৪]? যাহার কোন অংশ নাই সঙ্কল্পাত্মক মনোময় এবং পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম চিন্ময় মাত্র অবস্থিত আছেন[৫]। তরঙ্গ সকল যেমন জল ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে এবং কটকাদি যেমন সুবর্ণ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ, অহংজ্ঞান পরিশূন্য হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়[৬]। যাহার জ্ঞান নাই সেই অবোধ ব্যক্তিই এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন[৭]। হে অনঘ! তুমি দ্বৈত বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বুদ্ধি অবলম্বন কর; মিথ্যা পুরুষের ন্যায় অসৎ কল্পনার দ্বারা দুঃখিত হইও না[৮]। এই সংসার দুষ্পার মায়াময়, উহা ক্রমশঃ গাঢ় হইতেছে, শরৎকালীন শিশিরের ন্যায় উহার পরিক্ষয়ে যত্নবান্ হও[৯]।

রামচন্দ্র বলিলেন, আমি আপনার কথামৃত দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। কারণ চাতক মেঘের জল পান করে, কিন্তু যদি প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না[১০]। আমি অমৃত বর্ষণ দ্বারা অত্যন্ত শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপিও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না[১১]। ইন্দুসুধা পান করিয়া চকোর যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ, আমিও আপনার বাক্যসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না[১২]। যদিও আমি

প্রশ্নানুরূপ উত্তর লাভ করিতেছি, তথাপি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে অভিলাষ হইতেছে। কারণ অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা না করে[১৩]। হে মুনিবর! পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা পুরুষ কি? তাহা আমাকে বলুন[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাঘব! মিথ্যা পুরুষ বোধের নিমিত্ত তোমাকে একটী আশ্চর্য্য ইতিবৃত্ত বলিতেছি[১৫]। হে মহাবাহো! মায়ামর নামে এক পুরুষ ছিলেন। তিনি বালকের ন্যায় সর্ব্বদা অজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা আবৃত থাকিতেন[১৬]। সেই মিথ্যা পুরুষ কেহ কখনও দেখে নাই, এইরূপ জন্মিয়াছিল এবং সেই স্থানেই থাকিত। তাহার জন্ম ও স্থিতি মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ও আকাশে কেশণ্ড্রুকের ন্যায় (কেশণ্ড্রুক অর্থ মেঘের সংস্থান জনিত মিথ্যা আকৃতি)[১৭]। সে জন্ম সে ছাড়া সে স্থানে আর কেহ বাস করিত না। যদি কিছু থাকিত তাহাও তদাভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই দুর্ম্মতি সে রহস্য বুঝিতে পারে না[১৮]। তাহার সঙ্কল্প সেই স্থানেই (কার্য্য করিবার চিন্তা অর্থাৎ নানা প্রকার চিন্তা) জন্মিতে ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার চিন্তার বিষয় এই যে, আকাশেই আমার জীবন আকাশেই আমার রক্ষক অতএব আমি আকাশ অবলম্বন করিয়াই থাকিব[১৯]। আমি একটী আকাশ স্থাপন করিয়া তাহারি রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকি, কেননা আকাশই আমার আদরের বস্তু। সেই মিথ্যাপুরুষ এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ রক্ষার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিল[২০]। হে রঘুনন্দন! সে গৃহাকাশে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারি রক্ষায় নিযুক্ত হইল[২১]। বায়ুর দ্বারা তরঙ্গ যেমন ভগ্ন হইয়া যায়, ঋতুবৈপরীত্যে অব্দাদি যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, কিছু দিন পরে তাহার গৃহাদি নষ্ট হইয়া গেল[২২]। তখন সে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, হা গৃহ! হা গৃহাকাশ! তোমরা কোথায়? তোমরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলে[২৩]। এইরূপে বিলাপানন্তর সে এক কূপ প্রস্তুত করিল। সেই কূপ কূপাকাশে পরিণত হইল[২৪]। অনন্তর কালবশে সেই কূপাদিও নষ্ট হইয়া গেল। কূপাকাশ নষ্ট হইলে পুনরায় বিলাপ আরম্ভ করিল[২৫]। কূপাকাশ নষ্ট হইলে পুনরায় কুম্ভ প্রস্তুত করিল। কুম্ভাকাশ প্রস্তুত করিয়া সে সন্তুষ্ট হইল[২৬]। হে রঘূদ্বহ! এইরূপে কুম্ভও নষ্ট হইয়া যাইল। তখন

সেই দুর্ম্মতি দিগাশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু যে দিক্ আশ্রয় করিতে লাগিল, সেই দিক্ই নষ্ট হইতে লাগিল২৭। কুম্ভ নষ্ট হইলে কুণ্ড প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেই কুণ্ডও কুণ্ডাকাশে পরিণত হইল২৮। তখন সেই কুণ্ডও ক্রমে নষ্ট হইয়া গেল। তেজ রাশির দ্বারা অন্ধকার যেমন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ, সেই কুণ্ডও নষ্ট হইয়া যাইলে, সে অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইয়া উঠিল২৯। কুণ্ড নষ্ট হইলে সে আত্ম রক্ষার্থ এক চতুঃশালা প্রস্তুত করিল। সেই মহাশালাও কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গেল৩০। জীর্ণ পত্রপুঞ্জ যেমন কাল প্রভাবে পতিত হয়, সেইরূপ, তাহার সেই গৃহাদি নষ্ট হইলে, সে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল৩১। অনন্তর সেই মহাশালা গৃহাদি বিনষ্ট হইলে আকাশ রক্ষার জন্য এক কুণ্ডল (ভাষা কথা গোলা মরাই) প্রস্তুত করিল৩২। কাল তাহাকেও যথা সময়ে বিনষ্ট করিল এবং সে শোকেও সে পরিতপ্ত হইতে লাগিল৩৩। এইরূপে সেই মিথ্যা পুরুষের কাল ক্রমে অতীত হইতে লাগিল। সে উক্তরূপ গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াও কিছুতেই সংকল্পের সীমা শেষ করিতে পারিল না৩৪।

হে রাম! সেই মিথ্যা পুরুষ মূঢ়বুদ্ধি বশতঃ সেই গুহাপ্রদেশে (সেই দুষ্প্রবেশও দুর্ব্বোধ্য) উক্ত রূপে অবস্থান করতঃ এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখ ভোগ করিতে রহিল। তাহার গমনাগমনের শেষ হইল না৩৫।

দ্বাদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোত্তরশততম সর্গঃ।

——()•()——

রামচন্দ্র বলিলেন, মিথ্যা নরের প্রসঙ্গে আপনি যে মায়া পুরুষের কথা বলিলেন, তাহা কি১?

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! ঐ কথা আমি বিশদ করিয়া বলি, শ্রবণ

কর[২]। হে রঘুনাথ! আমি যে তোমাকে মায়াযন্ত্রময় পুরুষের অর্থাৎ মিথ্যা পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাহাকে তুমি অহঙ্কার বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ অহঙ্কারকেই আমি মায়াপুরুষ বলিয়াছি এবং শূন্যকে আকাশ অথবা আকাশকে শূন্য বলিয়াছি[৩]। হে সাধো! ঐ আকাশেই এই জগৎ অবস্থিত। ঐ আকাশ অসীম এবং উহা সৃষ্টির আদি ও স্বয়ং আবির্ভূত। উহা সকলেরই অন্তরে স্থিত অথচ দুর্লক্ষ্য। ব্রহ্ম প্রায় আকাশের সদৃশ, সেইজন্য ব্রহ্মেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছি। বায়ুতে যেমন স্পন্দন জন্মে, তেমনি, ব্রহ্ম হইতে অহঙ্কারের জন্ম হয়[৪]। ঐ অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইলে ঐ ব্রহ্মাকাশে আত্মভাব (আমিত্ব) কল্পন করে। যাহা আত্মা নহে, সে তাহাতেই আত্মভাবনায় ভাবিত হয়[৫]। অবশেষে সে অনাত্মস্বভাব দেহে আত্মভাব স্থাপন করে এবং তদুপলক্ষ্যে নানা প্রকার কল্পনা করিতে থাকে। দেহ বার বার বিনষ্ট হয়, তন্নিমিত্ত ব্যাকুল হয়, হইয়া বার বার সেইরূপে পুনঃপুনঃ দেহ সৃজন করে। সেই দেহ সৃজনকেই আমি মায়াপুরুষ ও মিথ্যাপুরুষের কার্য্য বলিয়াছি। অহঙ্কারও অসৎ এবং তদুত্থ দেহাদিও অসৎ[৭]। পূর্ব্বে যে কূপ, কুণ্ড, চতুঃশাল, গৃহ ও কুম্ভের কথা বলিয়াছি, সে সকলকে তুমি দেহ বলিয়া জানিবে। সেই অহঙ্কার সেই সেই দেহের কল্পনা করে, তাহার রক্ষার্থ ব্যাকুল হয়, এবং তাহাতেই আমিত্ব স্থাপন করে[৮,৯]। হে রঘুনাথ! সেই অহঙ্কারের নাম বলি, শ্রবণ কর। জীব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, মায়া, প্রকৃতি, সঙ্কল্প, কলনা, কাল ও কলা। এই সকল নামের নামী অহঙ্কার দ্বারা জগদ্‌ভ্রম ও মোহ জন্মিতেছে[১০,১১]। ঐ সকল নাম ব্যতীত তাহার আরও অনেক নাম আছে। সে সহস্র সহস্র নাম ধারণ করিয়া কল্পিত বিষয়ে বিচরণ করিতেছে[১২]। শূন্যাত্মা ভূতাকাশ বিস্তৃত করিয়া তাহাতে এই ভিত্তিশূন্য জগৎ প্রস্তুত করতঃ উক্ত মিথ্যা পুরুষ সুখ দুঃখ মোহ অনুভব করিতেছে[১৩]। মিথ্যা পুরুষ যেমন শূন্যে আমিত্ব স্থাপন করতঃ ঘটাকাশাদির জন্য ক্লেশ পাইয়াছিল, তুমি যেন সেরূপ ক্লেশ না পাও[১৪]। যে আত্মা আকাশাদি হইতেও মহান্‌ শুদ্ধ সূক্ষ্ম শিব ও শুভ, সে আত্মা কোথায় কিজন্য কাহার দ্বারা ক্লেশ পাইবে? তাহার আবার রক্ষা কি[১৫]? ভূত সকল শরীররূপ গৃহের বিনাশে বৃথা শোক করে, বলে—আমি মরিলাম[১৬]। যেমন ঘটাদি পদার্থের

বিনাশে আকাশের বিনাশ সিদ্ধ হয় না, তেমনি, দেহের বিনাশে দেহীরও বিনাশ হয় না[১৭]। যে দেহী সে শুদ্ধস্বভাব, চিন্মাত্র, সর্ব্বত্র অলিপ্ত এবং এই ভূতাকাশ অপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম। সে অনুভূতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার জন্ম নাই, বিনাশও নাই। তাহাই ব্রহ্ম ও জগদ্ভ্রান্তির আধার[১৮।১৯]। হে রামচন্দ্র! তাহাই সত্য, এক, শান্ত, আদ্যন্তবর্জ্জিত ও অহং ভাবের অতীত, এইরূপ জানিয়া সুখী হও[২০]।

তুমি সর্ব্বপ্রকার আপদের আলয়, অনিশ্চিত অবিবেকরূপী অহঙ্কার ত্যাগী হও। তাহা হইলে উত্তম পদ প্রাপ্ত হইবে[২১]।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

——()*()——

বশিষ্ঠ বলিলেন, পরব্রহ্ম হইতে প্রথমে মন জন্মে। সেই মন মননাত্মক (মনোবৃত্তি সদৃশ) এবং তাহাতেই জগতের স্থিতি[১]। যেমন পুষ্পে সুগন্ধ, সাগরে তরঙ্গ, সূর্য্যে কিরণরাশি, হে রামচন্দ্র! সেইরূপ, ব্রহ্মে মন[২]। এই জগৎ অন্য কোথা হইতে আইসে নাই। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ তেমনি এই মনের আত্মতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব বিস্মরণে জগৎ[৩]। যে ভাবে রশ্মিজাল সূর্য্য হইতে ভিন্ন, সূর্য্য তাহার নিকট ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হয়[৪]। যে ভাবে, হার কেয়ূর বলয়াদি হইতে সুবর্ণ পৃথক পদার্থ, সুবর্ণ তাহারই নিকট ভিন্ন হয়[৫]। যে ব্যক্তি জানে, রশ্মিজাল আদিত্যই, আদিত্য ভিন্ন নহে, আদিত্য তাহার নিকট রশ্মি হইতে অভিন্ন হয়[৬]। যে জানে, যাহা জল তাহাই তরঙ্গ, জলতরঙ্গ তাহার নিকট অভিন্ন[৭।৮]। যে হার বলয়াদিকে সুবর্ণ বলিয়া জানে, হার কেয়ূরাদি তাহার নিকট সুবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে[৯]। যে জ্বালা পদার্থকে (জ্বালনকে) অগ্নি বলিয়া জানে, তাহার নিকট জ্বলনপদার্থ বহ্নিই, অন্য কিছু নহে[১০]। বুদ্ধি যখন যে ভাবে বর্ত্তিত হয়, তখন তাহা

সেই ভাবেই স্থিতি করে[১১]। জলনে যাহার অগ্নিবুদ্ধি, তাহার সেই বুদ্ধি বিকল্প শূন্য[১২]। ঐ রূপে যে নির্ব্বিকল্প হয়, বিকল্পবুদ্ধির অতীত হয়, সে-ই মহান্। সেই ব্যক্তিই প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়, সে আর কোনও কিছুতে মগ্ন হয় না[১৩]। হে রাম! তুমিও বিকল্প অর্থাৎ নানাত্ব পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চিন্মাত্রে স্থিতি কর[১৪]। ঐ রূপে আত্মা আপনিই আপনার যখন সঙ্কল্প শক্তির উদ্রেক করেন, তখনই তিনি যেন পৃথক্ হইয়া পড়েন। মনই বিশ্বাত্মা অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা বিশ্বরূপ হন। মন যখন যে কল্পনা করে তৎক্ষণাৎ তাহা দৃষ্ট হয়[১৬।১৭]। মনই কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, বায়ু প্রভৃতি ও পর্ব্বতাদি কল্পনা করিতেছে, মনই জীব, চিত্ত, অহঙ্কারাদি নাম ধারণ করিতেছে[১৮]। ঐরূপ মনস্তত্ত্বেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। মন আপনি আপনার ভাবনার দ্বারা সেই সেই আকারে প্রকটিত হয়[১৯]। সুতরাং এই জগৎ কেবলমাত্র সংকল্প, সংকল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্বপ্ন যেরূপ, জগদ্দর্শনও সেই রূপ। অথবা মনোরাজ্য যেরূপ, এই জগত সেইরূপ। ইহাকে আমরা ব্রহ্মের মনোরাজ্য বলিয়া জানি[২০।২১]। এ সকল যদি পরমার্থ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে এ সকল কিছুই নহে বলিয়া স্থির হইবে[২২]। তদ্ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ অবিচার চক্ষে দেখিলে এ সকল শত শাখায় বিস্তৃত হয়। জল যদ্রূপ ঊর্ম্মি লহরী প্রভৃতি নানা বিভাগে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ[২৩]। সমুদ্র যেমন তরঙ্গাদি রূপে স্ফুরিত হয়, তেমনি একাদ্বয় চিৎপদার্থও বিশ্বাকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে[২৪]। ছিলনা হইল, এরূপ হয় না, ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ হইলে সমস্ত এক হইয়া যায়। গমন, আগমন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ব্যবহারে একাদ্বয় ব্রহ্ম চৈতন্যই বিভিন্নভাবে বিজৃম্ভিত হইতেছে। যে কিছু, সমস্তই ব্রহ্মবিৎ[২৫।২৬] এই সমস্ত জগৎ সেই সম্বিৎ, অন্য কিছু নহে। এ সকল সেই ব্রহ্ম-পদার্থেরই অবান্তরে স্ফুরিত হইতেছে। সুতরাং একমাত্র সম্বিদ্ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই। এই জগৎজালকে তুমি ব্রহ্মেরই বিস্তৃতি বলিয়া জানিবে, এবং ইহা আছে তাহা নাই এ সকল ভাব কাল্পনিক। সম্বিৎই আছে, তাহার প্রলাপ্য অর্থাৎ সম্বেদ্য নাই। সুতরাং বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। বন্ধমোক্ষও কাল্পনিক[২৭।২৮]।

এই মোক্ষ, এই বন্ধন, এ সকল চিন্তা ত্যাগ কর। নিষ্কাম

অভিমান বর্জ্জন কর। করিয়া মৌনী বশী মোহ বর্জ্জিত ও মহাত্মা হইয়া স্থিতি কর। অনাসক্ত চিত্ত ও নিরহঙ্কার হইয়া কার্য্য করিয়া যাও৩০।

চতুর্দ্দশশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চদশশততম সর্গ।

—()○()—

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে অনঘ! তুমি মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী হও। সর্ব্ব প্রকার শঙ্কা পরিত্যাগ কর, এবং ধৈর্য্যবান্ হও১।

রাম বলিলেন, মহাকর্ত্তাদি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ কি? অর্থাৎ কিরূপ ব্যক্তি মহাকর্ত্তাদির বাচ্য২।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! পূর্ব্বকালে মহাদেব ভৃঙ্গীশ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ তিন ব্রতের বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন। তৎ শ্রবণে ভৃঙ্গীশ সর্ব্ব ক্লেশ বিমুক্ত হইয়াছিলেন৩। শশিকলাধর পূর্ব্ব সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর শৃঙ্গে সপরিবারে অবস্থান করিতে ছিলেন। ভৃঙ্গীশ তৎসকাশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সেই উমাপতিকে বক্ষ্যমান কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন৪।

ভৃঙ্গীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! হে পরমেশ্বর! আমি আপনার নিকট যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছি তাহা আমাকে শীঘ্র বলুন৬। হে নাথ! এই জলতরঙ্গের ন্যায় বিরচিত সংসার দর্শনে আমি মোহগ্রস্ত হইতেছি, শান্তি পাইতেছি না৭। আপনি তাহাই আমাকে বিস্তারের সহিত বলুন, যাহাতে এই সংসাররূপ জীর্ণ গৃহে নির্ভয়ে থাকিতে পারি৮।

ঈশ্বর বলিলেন, হে অনঘ! তুমি সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক মহাভোক্তা মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী হও৯। ভৃঙ্গীশ বলিলেন, হে প্রভো! মহাভোক্তা মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী কাহাকে বলে, আপনি বিশদরূপে তাহা বলুন১০। ঈশ্বর বলিলেন, হে মহাভাগ! যিনি ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম এতদুভয়ে ইচ্ছা বিরু-

হিত হইয়া অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্ম হইবে এবং ইহাতে অধর্ম্ম হইবে এই রূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন তিনিই মহাকর্ত্তা[১১]। রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ফলাকাঙ্খা না করিয়া যিনি নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য করেন তিনিই মহাকর্ত্তা[১২]। যিনি মৌনী নিরহঙ্কার, নির্ম্মল চিত্ত এবং বিগত মৎসর এবং যিনি চিন্তা পরিশূন্য তিনিই মহাকর্ত্তা[১৩]। যিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বোধে কুশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া শুভাশুভ কার্য্যাদির বিবেচনা না করিয়া অর্থাৎ এই কার্য্য করিলে ইহাতে ধর্ম্ম হইবে; এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে ইহাতে অধর্ম্ম হইবে; এইরূপ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, যাঁহার চিত্ত সতত নির্ম্মল এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল বিষয়ে যিনি লিপ্ত না হন, তিনিই মহাকর্ত্তা[১৪]। যিনি সর্ব্ব বিষয়ে বিগত স্নেহ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া সাক্ষির ন্যায় অবস্থান করেন এবং যাঁহার কার্য্য বিষয়ে আশক্তি নাই, তিনি মহাকর্ত্তা[১৫]।

নির্ম্মল বুদ্ধির দ্বারা উদ্বেগ ও আনন্দ রহিত হইয়া যিনি দুঃখ বা আনন্দ উপভোগ করেন না তিনিই মহাকর্ত্তা[১৬]। যিনি কালভোগানুসারে অনাসক্ত হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যানুসারে অবস্থান করেন তিনিই মহাভোক্তা[১৭]। যিনি উদাসীন হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি উভয়বিধ কার্য্যাকার্য্যের সমভাব প্রদর্শন করেন তিনিই মহাকর্ত্তা[১৮]। যিনি স্বভাবত স্থির এবং সমভাব করণ পরিত্যাগ করেন না, যিনি শুভাশুভ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া ফল নিবন্ধন উৎকণ্ঠিত হন না তিনিই মহাকর্ত্তা[১৯]। জন্ম, স্থিতি এবং বিনাশ উদয় এবং অস্ত অর্থাৎ বৃদ্ধি ও সম যাঁহার নিকট একই বলিয়া প্রতীত হয় তিনিই মহাকর্ত্তা[২০]। যিনি কোন বিষয়েই দ্বেষ করেন না অথবা কোন বস্তুতেই যাঁহার স্পৃহা নাই এবং যিনি প্রারব্ধ উপস্থিত পদার্থ ভোগ করিয়া থাকেন তিনিই মহা ভোক্তা[২১]। যিনি কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না, দান করিয়া দানের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না, ভোগ করিয়া ও ভোগ নিমিত্ত ব্যাকুলতা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই মহা ভোক্তা[২২]। যিনি অখিলকামী হইয়া সাক্ষির ন্যায় লোক ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং বিগতস্পৃহা হইয়া ভোগ করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৩]।

যিনি সুখ ও দুঃখজনক ক্রিয়াদির লাভ বা ব্যয় নিবন্ধন উৎকণ্ঠিত হন না তিনিই মহা ভোক্তা[২২]। জরা মরণ আপদ ও রাজ্যাদি এবং দরিদ্রতা এ সমুদায় যিনি রমণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ রাজ্য প্রাপ্তিনিবন্ধন অতিশয় আনন্দ অথবা দুঃখ দরিদ্রতা নিবন্ধন কষ্ট ভোগ না করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৫]। সাগরে জল যেন সতত সমভাবে অবস্থিতি করে সেইরূপ যিনি সুখ ও দুঃখকে সমভাবে দর্শন করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৬]। চন্দ্র প্রতিবিম্বির ন্যায় যাঁহার অহিংসা তুষ্টি সমতা সঞ্জাত হইয়া ও অসঞ্জাত হইয়া অবস্থিতি করে তিনিই মহা ভোক্তা[২৭]। কটু অম্ল তিক্ত মধুর এবং উত্তম ভোজ্য ও অধম ভোজ্য সকল যিনি তুল্য রূপে ভোজন করেন তিনিই মহা ভোক্তা[২৮]। হে সৌম্য! যিনি সরস ও নীরস পদার্থে আনন্দ দায়ক ও দুঃখদায়ক উভয় বিধ পদার্থে যিনি, সম প্রদর্শন করেন তিনি মহা ভোক্তা[২৯]। শর্করা নির্ম্মিত খাদ্য দ্রব্যে এবং শুভ ও অশুভ উভয় বিধ দ্রব্যেই যিনি সর্ব্বদা সমভাব প্রদর্শন করেন তিনিই মহা ভোক্তা[৩০]। ইহা ভোজ্য ইহা অভোজ্য ইত্যাকার বিকল্প বা দ্বৈধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া যিনি স্পৃহা বিবর্জ্জিত হইয়া ভোগ করেন তিনিই মহা ভোক্তা[৩১]। যিনি তুল্য বুদ্ধির দ্বারা আপদ, সম্পদ, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, একরূপ বিবেচনা করেন তিনিই মহা ভোক্তা[৩২]। সম বুদ্ধি দ্বারা যিনি ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ ও দুঃখ এবং মরণ ও জন্ম এ সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ মাত্র। এইরূপ অনুভব করিয়া যিনি এই সকলে বিগতস্পৃহ হন তিনিই মহাত্যাগী[৩৩]। যিনি সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছা, সর্ব্ববিধ শঙ্কা এবং সর্ব্বপ্রকার কায়িক বাচনিক এবং মানসিক চেষ্টা এবং সর্ব্বপ্রকার নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৪]। দেহাদির সত্যতা নিবন্ধন যিনি দুঃখভোগ দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করেন না, ইন্দ্রিয়াদির স্থিতি নিবন্ধন যিনি মনের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা পরিচালন হইলেও যিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৫]। ইহা আমার কেহ নহে এবং আমার জন্ম বা মৃত্যু নাই এবং কর্ম্মে বা অকর্ম্মে আমার কোন অস্তিত্ব নাই, এইরূপ যিনি অনুভব করেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৬]। যাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হয়, যাহাতে দুঃখ বা সুখ হয়, যিনি এই সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ

করেন তিনিই মহাত্যাগী[৩৭]। যিনি সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা এই সকল দৃশ্য বস্তুর বশীভূততা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্যাগী হইয়াছেন[৩৮]।

হে অনঘ! রামচন্দ্র পূর্ব্বকালে দেব দেব ঈশ্বর ভৃঙ্গীশকে এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন অতএব তুমি এই প্রকার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বিগত সন্তাপ হও[৩৯]। সর্ব্বদা সত্য নিয়ত অবস্থিত বিমলরূপ আদ্যন্ত রহিত ব্রহ্মই নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরঞ্জন সাশ্বতনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া বিমল শান্তি প্রাপ্ত হও[৪০]।

হে অঙ্গ! এই সংসারে যে কিছু বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত বস্তুতেই আজন্মাবধি সর্ব্বকার্য্যের বীজভূত আদ্যন্তরহিত স্বয়ং জন্মাদিবিকার রহিত পরমাত্মা রূপী ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিও না এবং সেই ব্রহ্মই সর্ব্বভাব বিকল্পিত হইলেও নিরন্তর আকাশের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। মেঘ সকল যেমন আকাশে উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশ তাহাতে যেমন সংসক্ত থাকে না তদ্রূপ ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুতে থাকিয়াও দর্পণ প্রতিবিম্বের ন্যায় অসংসক্ত ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন[৪১]।

হে সাধো! ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা সৎ হইলেও অসৎ এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সমস্ত আশঙ্কা পরিত্যাগ কর[৪২]। হে সাধো! যদি তুমি অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর তবে তুমি কখনও খেদ প্রাপ্ত হইবে না[৪৩]।

পঞ্চদশশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্দশশততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ! অহঙ্কার নামক গলিত বা গলচ্চিত্ত মনের স্বরূপ কি প্রকার হয়, তাহা বলুন[১]। বশিষ্ঠ

বলিলেন, জল যেমন সরোরুহে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পরকর্ত্তৃক সম্পাদিত লোভ মোহাদি দোষ সকল নির্ম্মল মনে লিপ্ত হয় না[২]। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিষাদ হেতু পাপ সকল ভস্মীভূত হইলে মুদিতাদি শোভা কথনই ত্যাগ করে না[৩]। সকল বাসনাগ্রন্থিই ছিন্ন হয়। ক্রোধ, মদ, মোহাদিও নষ্ট হয়, কাম ও লোভ দূরে পলায়ন করে। ইন্দ্রিয়গণ উচ্চ উল্লাস পরিত্যাগ করে, খেদ ও স্ফূর্ত্তি পায় না। দুঃখ বৃদ্ধি পায় না, সুখও সঞ্চরণ করে না। এক মাত্র নির্ম্মল সুশীতল সমতাই হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকে[৪।৫।৬]। যদিও কখন সাধুদিগের বদনে সুখ দুঃখাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তুচ্ছত্ব নিবন্ধন সুখ দুঃখাদি তাঁহাদের মনে লিপ্ত হয় না[৭]। দেবগণও স্পৃহনীয় বস্তুর স্পৃহা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের নির্ম্মল সুশীতল সমতা সর্ব্বদাই হৃদয়ে উদিত থাকে[৮]। অপরের অনিষ্ট নাহয় এইরূপ কমনীয় শান্তিই সেব্য, দেবগণ ঐ শান্তিই বহন করিয়া থাকেন[৯]। সাধুগণের এই সংস্থিতি বিক্রম, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্রের দ্বারা বিচিত্র ও বিষম হইলেও সুখকর বা দুঃখকর হয় না[১০]। জ্ঞানালোকের দ্বারা লভ্য নিরাপদ ব্রহ্ম বস্তুতে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত না হয়, সেই নরাধমের জীবনে ধিক্[১১]।

হে রাম! দুঃখ রত্নের আকর জন্ম মৃত্যুরূপ সাগর পারেচ্ছুক পুরুষের মধ্যে নিরতিশয় পরমাত্মাতে চির বিশ্রান্তি লাভের অধিকারী আমি হইতে পারিব না। এই জগৎ বা কিরূপ পদার্থ, পরমাত্মতত্ত্বই বা কি, তুচ্ছ ভোগবাসনাই বা কি, চিরাভ্যস্ত বৈরাগ্যময়ী বুদ্ধিই এক মাত্র আত্মতত্ত্ব লাভের উপায়। তুমি এইরূপ বুদ্ধিকে আশ্রয় কর[১২]।

ষোড়শশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তদশশততম সর্গ।

মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন। হে রামচন্দ্র! তোমাদের আদিপুরুষ ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন, তুমি সেই ইক্ষ্বাকু রাজার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর[১]। মহারাজা ইক্ষ্বাকু নিজ রাজ্য পালন করিতে

করিতে একদা একান্তে অবস্থান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন[২]। এই জরা, মরণ, সুখ, দুঃখময় দৃশ্য প্রপঞ্চের কারণ কি?[৩]। তিনি এই জগতের বিষয় কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া এক দিন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় নিজপিতা মনুর নিকট সমুপস্থিত হইয়া চরণ বন্দনা পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকু বলিতে লাগিলেন, হে করুণা নিধে! আমি ধৃষ্টতায় পরিচালিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি[৪]। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জগতের বীজ কি তাহা বলুন। এই জগৎ কাহা হইতে উৎপন্ন হইল এবং কি নিমিত্তই বা উৎপন্ন হইল এবং আমরা কেনই বা ইহাতে মোহিত হই তাহা কীর্ত্তন করুন[৭]। পক্ষী সকল বাগুরা হইতে যেরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে সেইরূপ আমাদের কিরূপে এই সংসার জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি তাহার উপায় বলুন[৮]। মনু বলিতে লাগিলেন, তুমি অতি অনাময় প্রশ্ন করিয়াছ এই জগৎ যাহা কিছু দেখিতেছ প্রকৃত ইহা কিছুই নহে[৯]। হে নৃপতে! তোমাকে অধিক কি বলিব এই যে সকল দৃশ্য পদার্থ দেখিতেছ স্বপ্নাবস্থায় গন্ধর্ব্বনগর সৃষ্টি এবং মরুপ্রদেশে বারিসন্দর্শনের ন্যায় ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিও[১০]। যদ্যপি ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অতীত মনকে পদার্থ বলিয়া মনে কর কিন্তু তাহাও কিছুই নহে এইরূপ অনুমান করিও। যাহার ধ্বংশ নাই সেই পদার্থ জগতে সদাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে[১১]। যেরূপ মহাদর্পে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে সেইরূপ, হে রাজন্! এই যে পরিদৃশ্যমান সর্গ পরম্পরা বিরাজিত রহিয়াছে ইহারা উক্ত সদাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিত করে, এবং তাহাতেই উহাদের অনুভব হইয়া থাকে[১২]। ব্রহ্মের যে চৈতন্যময় স্ফুরণ শক্তি তাহা স্বভাবানুসারে কতক ব্রহ্মাণ্ড এবং কতকাংশ জীবাদি রূপে পরিণত হইয়া থাকে[১৩]। সেই শক্তি অন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এইরূপে জগতের স্থিতি হইয়া থাকে জানিও সংসারে বন্ধ বা মোক্ষ কোন পদার্থ নাই, তবে কেবল একমাত্র নিরাময় ব্রহ্ম সতত বিরাজমান রহিয়াছেন। একও নাই দুইও নাই তিনিই কেবল সার পদার্থ[১৪]। তরঙ্গ ভঙ্গ দ্বারা জল যেমন নানা হয় বস্তুত জল একমাত্র সেইরূপ এক ব্রহ্ম নানারূপ ভেদ ঘটাইয়া নানাত্ব রূপে কল্পিত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে অতএব হে মহারাজ

তুমি দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভবভয় বারণ অভয় ব্রহ্মপদ চিন্তা কর[১৫]।

সপ্তদশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোত্তরশততম সর্গ।

মহাত্মা মনু বলিতে লাগিলেন, হে ভূমিপ! জলের ন্যায় চৈতন্য মাত্রের উদয় হইলে সংস্কারাদির বিচিত্রতা হেতু জীব অন্তঃকরণের দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার অনুভব করিয়া থাকে[১]। জীবগণ এই জগতে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া থাকে, সুখ, দুঃখ, মায়া, মোহ সকলই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে[২]। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্য ভাবে কাল যাপন করে, সেইরূপ অনুভব দ্বারা আত্মার দর্শন লাভ হইয়া থাকে[৩]। শাস্ত্র অথবা গুরু দ্বারা পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয় না, স্বত্ব বুদ্ধির উদয় হইলে নিজেই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া থাকে[৪]। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ নির্লিপ্ত পথিকের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে[৫]। ইহাদিগের প্রতি আদর প্রদর্শন করিতে নাই, বরং অনাদর করিতে হয়, (অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত।) উদাসীনের ন্যায় সহাস্য মুখে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য[৬]। উদাসীনের ন্যায় দৃঢ় হইবে, দেহাদির প্রতি মমতা বিসর্জ্জন করিবে এবং অন্তঃকরণের স্থিরীকরণ সম্পাদন দ্বারা সর্ব্বদা আত্মময় হইবে[৭]।

এই দেহই আমি এই প্রকার বুদ্ধিই সংসারের বন্ধন প্রযোজিকা। মুমুক্ষুগণ এইরূপ বুদ্ধি কখনও গ্রহণ করেন না[৮]। আমি গগনাপেক্ষা সূক্ষ্ম চিন্মাত্র স্বরূপ এই প্রকার যে স্থিরনিশ্চয়, সংসার বন্ধনের কারণ হয় না[৯]।

সুবর্ণ হইতে যেরূপ অঙ্গদাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত বস্তুই আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়[১০।১১]। মহাসমুদ্রে বাড়বানল থাকে এই নিমিত্ত ইহা ভীমদর্শন, সেইরূপ মায়াময় ভাব জগতে ভূতাদিও সংসারের তরঙ্গের মত দর্শন করিয়া থাকে[১২]। কালসমুদ্রে একজন নিয়ন্তা আছেন,

হে রাজন! সেই নিয়ন্তা আত্মাকে অগম্য বলিয়া মনে করিও[১৩]। এই দেহাদিতেও সেই আত্মার অবস্থান আছে, ইহা জানিয়া তুমি আত্মময় হইয়া অবস্থান কর[১৪]। কুক্ষি মধ্যে সুপ্ত সন্তানকে বিহ্বল করিয়া জননী যেমন পরিতাপ করেন, সেইরূপ যিনি আত্মদর্শন লাভ করেন নাই, তিনিও তদ্রূপ রোদন করিয়া থাকেন[১৫]। আত্মাকে অজর ও অমর জানিতে না পারিলেই দুঃখিত হইয়া থাকে। আমি হত হইলাম, আমি অনাথ হইয়াছি, ইত্যাদি ভাব বিলাপ জনক অনাজ্য ব্যক্তিরই হইয়া থাকে[১৬]। জলের পরিস্পন্দন নিমিত্ত তরঙ্গ নানা আকারে হইয়া থাকে, সেইরূপ সঙ্কল্প নিবন্ধন বদ্ধ হইয়া জীব সকল রোদন করে। হে মহারাজ! তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় ভাবনা দ্বারা সুস্থচিত্ত হইয়া কাল যাপন কর[১৭,১৮]।

অষ্টাদশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

একোনবিংশোত্তরশততম সর্গ।

——)○()——

মনু বলিতে লাগিলেন, বালকগণ যেমন কোন্ প্রকার উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রেরিত না হইয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভগবান স্পন্দন দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং সংহারাত্মক শক্তির দ্বারা সর্গাদি নাশ করেন এবং নিজেই তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট থাকেন[১]। অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি মায়াবশে এই জগত নিরীক্ষণ করিয়া সুখ ও দুঃখ নিমিত্তক আহ্লাদ ও শোক অনুভব করিয়া থাকে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্তই আত্মময় বিবেচনা করিয়া দুঃখিত বা সুখে উদ্বেলিত হয়েন না। এই নিমিত্ত যাহাদিগের রাগ ও মোহ নষ্ট হয় নাই, তাহারা স্বকীয় শক্তি দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যাহারা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ইহাতে লিপ্ত হয় না[২]। প্রভাসমূহের প্রভেদ বশতঃ চন্দ্রাদির যেমন বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, সেইরূপ জগতের বৈচিত্র্য নিবন্ধন তত্তৎ বিষয়ে বুদ্ধির বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। বৃক্ষের পত্রসমূহ ও নির্ঝরাণব জলকণা

বস্তুতঃ তত্তৎ পদার্থ হইতে পৃথক নহে[৩]। সেইরূপ ভ্রম জ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মে জগৎ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে এবং অজ্ঞান নিবন্ধন তাহাতেই দুঃখের উদয় হইয়া থাকে[৪]। মায়ার কি আশ্চর্য্য বিশ্ব বিমোহিনী শক্তি! সর্ব্বত্র আত্মা বিরাজিত হইলেও আত্মা আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন না[৫]। জগতে চিত্তময় ভাবনা দ্বারা যিনি বিরাজমান আছেন, তিনিই শান্তিসুখ উপভোগ করেন[৬]। অহম্ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সমস্তই শূন্যময়, কেবল একমাত্র ব্রহ্ম সতত সত্য রূপে বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা করিবে[৭]। ইহা রমণীয় অথবা সুখপ্রদ নহে, এই দুঃখদায়ক এই প্রকার ভাবনাই দুঃখময়, সাম্যবুদ্ধি দ্বারা এতদুভয় দগ্ধ করিয়া সর্ব্বদা সুখী হও[৮]। হে রাজন্! অভাব রূপ অস্ত্র দ্বারা রম্যারম্য বিভাগ করিবে অর্থাৎ রমণীয় বলিয়া ও কোন পদার্থ নাই, অরম্য বলিয়াও কোন পদার্থ নাই, কেবল মাত্র অতিশয়িত পুরুষকার দ্বারা স্থিরভাবে অবস্থান কর[৯]। অভাব দ্বারা কর্ম্মাদির ভাবনা করিয়া অপগত শোক হইয়া কালযাপন কর। অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য শোক বা দুঃখে অভিভূত হইও না[১০]। বিবেকরূপ সমাধি দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া পরমানন্দের রসাস্বাদন পুরঃসর চিরশান্তি লাভ কর[১১]।

একোনবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

বিংশোত্তরশততম সর্গ

মনু বলিতে লাগিলেন, শাস্ত্র ও সজ্জন ব্যক্তির সমাগম দ্বারা প্রথমত প্রজ্ঞা শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যোগিগণের যোগমার্গের ইহাই প্রথম সোপান[১]। বিচার শক্তি ইহার দ্বিতীয় মার্গ, সম্ভাবনা তৃতীয় সোপান, বাসনা নাশাত্মিকা বিলাপনী, ইহার চতুর্থ সোপান, শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ আনন্দময়, পঞ্চম সোপান অর্দ্ধ সুপ্ত ও অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থার অব-

স্থান কর[২।৩]। ব্রহ্মা কারাত্মিকা সম্ভাবনা অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, এই প্রকার ভাবনা করা ষষ্ঠ ভূমিকা। আনন্দময় সুষুপ্ত অবস্থা সপ্তম অবস্থা, ইহাই তুর্য্যাবস্থা মুক্তির হেতু, সমতা সচ্ছতা সৌম্যভাব ইহাতেই প্রকটিত হইয়া থাকে[৪।৫]। তুর্য্য অবস্থার পর যে অবস্থা, তাহাই নির্ব্বাণরূপিণী, তাহাই সপ্তমী ভূমিকার প্রোক্তাবস্থা[৬]। ইহাতেই পূর্ব্বাবস্থাত্রয় জাগ্রত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, চতুর্থী স্বপ্নাবস্থা জগৎ স্বপ্নময়। পরমানন্দ স্বরূপত্ব প্রতীত হইলে সুষুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়[৭।৮]। অসংবেনরূপই (কোন বাহ্য বিষয় চিন্তা না করাই) ভূমিকা। তুর্য্যাতীত অবস্থাই সপ্তমাবস্থা অপেক্ষাও উত্তম, তাহা মন ও বাক্যের অগোচর[৯]। মহা সমতা দ্বারা চেত্য এবং চিত্ত বিভাবনা হইয়া থাকে, ইহাই মুক্তি[১০।১১]। যখন মরণ জীবন ইত্যাদি বোধ হইবে না, তখন আত্মারাম হইবে[১২]। ব্যবহারে উপশান্ততা নিবন্ধন গৃহস্থই হউন বা পথিকই হউন আমি কিছুই নই, জীব এই প্রকার অনুভব দ্বারা শোক প্রাপ্ত হন না[১৩]। আমি অজর অমল শান্ত বাসনা রহিত নির্ম্মল, এই প্রকার ভাবনা দ্বারা জীব শোক অনুভব করেন না[১৪]। আমি আদ্যন্ত রহিত অজর ও অমর এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা জীব শোক প্রাপ্ত হন না[১৫]। তৃণাগ্রে আকাশে সূর্য্যমণ্ডলে সর্ব্বত্রই আমি বর্ত্তমান আছি, এই প্রকার অনুভব করিয়া জীব শোকাচ্ছন্ন হন না[১৬]। যিনি চতুর্দ্দিকস্থ যর্জ্জাবতীয় বস্তুতে নিজের ব্যাপকতা লক্ষ্য করেন অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই আপনা হইতে অপৃথক্ প্রত্যেক বস্তুতেই নিজের সত্তা অনুভব করেন, অনন্ত বিলাসা শ্রয় সেই মহাত্মা ব্যক্তির ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ তিনি নিজের অমরত্ব দর্শন করেন[১৭]। যিনি কামনার দ্বারা বদ্ধ হন, তিনি আপাত রমণীয় সুখজনক বস্তুর সেবা করেন, যে বস্তু সুখের নিমিত্ত প্রতীত হয়, তাঁহার পক্ষে সেই দ্রব্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের কারণ হইয়া থাকে[১৮]। সুখ ও দুঃখের অবিনাভাবই অর্থাৎ সহাবস্থিতি নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে, যাঁহার বাসনা অল্প তিনি বাসনা বিহীন হইয়া দ্রব্যাদির সেবা করেন[১৯]। হে অনঘ! ইহা সুখের জন্যও নহে এবং দুঃখের জন্যও নহে, এইরূপ ভাবে ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে সুখ বা দুঃখের কারণ হয় না[২০]। দগ্ধবীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কারণ

রূপে কল্পিত হইয়া থাকে[২১]। হে অঙ্গ! সর্ব্ব প্রকার ভাব হইতে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ভাব হইতে নির্গত অহংভাব পরিত্যাগ করিলে একই কর্ত্তা ও একই ভোক্তার অনুভূতি হইয়া থাকে[২২]। তাঁহার পক্ষে শশাঙ্কের শীতলতা এবং রবিমণ্ডলের উষ্ণতা একই রূপ অনুমিত হয়, ক্রিয়মাণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মও একরূপ বোধ হয়[২৩]। কর্ম্ম সকল কালে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ধ্বংশ হয় না[২৪]। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে ধান্য যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গে উপস্থিত হইলে দিন দিন জ্ঞান কার্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[২৫]। যেমন সরোবরে ও সমুদ্রে একই জলের স্বচ্ছতা অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত মায়িক দ্রব্যে অভেদ জ্ঞান দ্বারা অনন্ত বিশ্বরূপ এক আত্মারই স্বরূপতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই যে, আধার ভেদে জলের উপাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জল একই প্রকার থাকে, সেইরূপ হে অঙ্গ! এই নিখিল জগৎ ভ্রম জ্ঞান দ্বারা উপাধি বৈচিত্র্য দ্বারা ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা অমুক, ইহা অমুক নহে ইত্যাকার ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের তিরোধান হইলে একমাত্র আত্মারই অভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে[২৬]।

বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

একবিংশোত্তরশততম সর্গ

——()*()——

মনু বলিতে লাগিলেন, যতক্ষণ বিষয় ভোগের আশা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার জীব আখ্যা হইয়া থাকে, এই প্রকার বিষয়ভোগাশা অবিবেক নিবন্ধন হইয়া থাকে, বাস্তবিক এই প্রকার আশা হইতে পারে না[১]। বিবেকের উদয় হইলে বিষয় ভোগের আশা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই সময়ে আত্মার জীবত্বোপাধি নষ্ট হইয়া অনাময় ব্রহ্মসংজ্ঞক হইয়া থাকে[২]। বিষয় ভোগাশা হইলে যে চিন্তা দ্বারা অঘটে

ঘটভাব হইয়া থাকে, এরূপ চিন্তায় চিন্তিত হইও না, এইরূপ চিন্তার দ্বারা উর্দ্ধ হইতে অধঃ এবং তথা হইতে আরও অধঃ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা না হইলে পুনরুর্দ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩]। ইহা আমার, আমি ইহার, এই প্রকার ব্যবহার ভ্রম জ্ঞানাধীন, যাহারা এই প্রকার মোহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৪]। আমি ইহার, ইহা সেই, এই প্রকার মোহ বুদ্ধির অপনোদন হইলে উর্দ্ধ হইতেও উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৫]। হে নৃপ! এই জগৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ, আত্মা হইতে অভিন্ন এবং চিদাকাশ স্বরূপ অবলোকন করুন[৬]। যখন চিত্তের এই প্রকার অবস্থা হয়, তখনই আত্মার পরমেশ্বরত্ব উপনীত হইয়া থাকে[৭]। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ যাহা করিতে পারেন, আমিও সেই সকল সম্পন্ন করিতে পারি, এই প্রকার অনুমান করিবে[৮]। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, হে অঙ্গ! সে সকলই সত্য[৯]। চিন্মাত্রত্ব লাভ হইলে তিনি পরমানন্দের উপভোগ করিয়া থাকেন তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না[১০]। অশূন্যও কিছুই নাই এবং শূন্যও কিছু নাই, রূপও নাই চিন্ময়ও নাই। আত্মার রূপও নাই এবং অন্য রূপও নাই, এইরূপ ভাবনা করুন[১১]। ইহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে প্রকৃতি স্বাভাবিকাত্মরূপতা শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন দেশ বা মোক্ষকাল বা স্থিতি বলিয়া কোন বিষয়ের সত্তা অনুভব হয় না[১২]। অহংভাব অপগত হইলে মোহ ক্ষয় হইয়া থাকে, প্রকৃতির অপর নাম ভাবনা, মোক্ষও ভাবনাত্মক[১৩]। শাস্ত্রার্থ বিচার লৌকিক বিচার পরিশূন্য এবং বিকল্পাদি রহিত হইয়া বিশ্বাত্মক হইয়া নিয়ত সুখে অবস্থান করুন[১৪]।

একবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোত্তরশততম সর্গ

—()○()—

মনু বলিতে লাগিলেন, যাহার আত্ম পর ভিন্নভাব নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, শয়নাশয়নে ভেদ জ্ঞান নাই, তিনিই সম্রাটের ন্যায় অবস্থান করেন[১]। কেশরী যেমন পঞ্জর হইতে নির্গত হয়, তিনিও সেই প্রকার বন ধর্ম্মাশ্রম আশ্রমাচার শাস্ত্রীয় নিয়ম হইতে বহির্গত হইয়া সংসার জ্বালা হইতে দূরে অবস্থান করেন[২]। শরৎ কালের নভোমণ্ডল যেমন মেঘ নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনিও বাক্যের অতীত বিষয় ও বিষয়াশা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন[৩]। পর্ব্বত প্রদেশে প্রসন্ন গম্ভীর হ্রদের ন্যায় পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুব্ধ ভাবে আত্মায় অবস্থিতি করেন[৪]। যিনি সকল কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করেন এবং নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয়, তিনি পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হন না[৫]। স্ফটিকের প্রতিবিম্বের ন্যায় আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন[৬]। জনতাবৃন্দে অবস্থিত হইয়া দেহাদির কর্ত্তন বা পূজন নিবন্ধন খেদ বা হর্ষের দ্বারা অভিভূত হন না[৭]। নিস্তোত্র নির্ব্বিকার পূজ্য ও পূজা বিবর্জ্জিত, সংযোগ বা বিয়োগ দ্বারাও তিনি উদ্বেজিত হন না[৮]। রাগ দ্বেষ ভয় ও আনন্দ দ্বারা লোক সকল বা তিনি লোকের দ্বারা উদ্বেজিত হন না অর্থাৎ সাংসারিক লোকের কোন কার্য্যেই তিনি বিরক্ত হন না, এবং তাঁহার কৃতকার্য্যেও কেহ বিরক্ত হয় না[৯]। কোন বস্তু মধ্যে গণ্য হন না। প্রমেয় বিষয়ে অন্তর্ভাব প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধ চিত্ততা নিবন্ধন তাঁহাতে পরিচ্ছিন্ন করিতেও কেহ শক্ত হন না[১০]। তীর্থ স্থানে দেহাদি ত্যাগ বা গৃহে দেহত্যাগ করিলেও তাহার সমভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে[১১]। জ্ঞানমার্গ প্রাপ্ত হইলে বিগতাশয় হইয়া মুক্তি পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অহং ভাব বন্ধের কারণ, মোক্ষ জ্ঞান দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে[১২]। তিনি পূজনীয়, তিনি স্তুত্য এবং সর্ব্বতোভাবে নমস্কার্য্য। বিভূতি বিভব দ্বারা যিনি পরিপুষ্ট হন, তিনিই

নিরীক্ষণীয়[১৪]। হে অঙ্গ! বাসনাব্যাধি হইতে দূরে অবস্থান করেন, এই প্রকার বাসনা বিহীন জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের পূজার দ্বারা যে পদ লাভ হইয়া থাকে, যজ্ঞ তপস্যা দান প্রভৃতির দ্বারা সে পদ লাভ করিতে পারা যায় না[১৪]।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ মনু এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মগৃহে গমন করিলেন, এবং ইক্ষ্বাকুও সেই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলেন[১৫]।

দ্বাবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তবে অপূর্ব্বাতিশয় কি হয় তাহা বলুন[১]।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, নিত্য তৃপ্ত প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি আত্মাতেই উপরমিত হন[২]। মন্ত্রসিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, তন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা আকাশ গমনাদি অনুষ্ঠিত হইলে অপূর্ব্বের প্রয়োজন হয় না[৩]। যদিও মন্ত্র সিদ্ধির দ্বারা অনিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেও অপূর্ব্বের প্রয়োজন হইয়া থাকে[৪]। তত্ত্ববিদ্গণ মন্ত্রসিদ্ধি ও অপূর্ব্বের মধ্যে অপূর্ব্বের আতিশয্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কারণ সর্ব্বাবস্থাতেই মনের নিরাগত্ব ও অমলত্ব লাভ হইয়া থাকে, এবং ইহা বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না[৫]। চিরভ্রম নিবৃত্তি নির্ব্বন্ধন পরমানন্দ প্রাপ্ত, অলিঙ্গ-মূর্ত্তি, (উপাধি শূন্য) তত্ত্ববিৎ পুরুষেরও ইহাই লিঙ্গ বা চিহ্ন যে ইহাতে শান্তভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং ইহার কামাদি বাসনাসমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়[৬]।

ত্রয়োবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোত্তরশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অপরাপর সিদ্ধিলাভ অপেক্ষা আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষই নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়া থাকে এবং ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেই আত্মার নিরতিশয় আনন্দ লাভ হয় অন্যথা আত্মার অনুৎকর্ষই হইয়া থাকে, যেমন কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় সাত্বিকভাব উপেক্ষা করিয়া কোন শূদ্রার উপভোগের নিমিত্ত শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বর জীবত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন[১]। ভূত সকল ত্রিবিধ, এক প্রথম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ নিষ্কারণ হইতে সমুৎপন্ন তাহাই কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ হওয়ায় বলিয়া উক্ত হয়[২]। ঈশ্বর হইতে আগত হইয়া জীব সকল নিজ কর্ম্মের দ্বারা পুনর্ব্বার জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩]। জন্ম ও কর্ম্মের এইরূপ কার্য্য কারণ ভাব প্রসিদ্ধ। জীব সকল পরমপদ পরমেশ্বর হইতে আপনাপনিই নিঃসৃত হইয়া থাকে[৪]। পশ্চাৎ তাহাদের স্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলই সুখ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে এবং আত্মার কর্তৃত্বাদি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সঙ্কল্পই কর্ম্মের কারণ[৫]। সঙ্কল্পই বন্ধের কারণ, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে, মোক্ষপদার্থ নিঃসঙ্কল্পিত, অতএব তাহার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ যত্নপরায়ণ হইবে[৬]। গ্রাহ্য ও গ্রাহকের ভ্রম বশতঃ অর্থাৎ গ্রাহকের গ্রাহ্য পদার্থে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা নিবন্ধন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি হইলে সঙ্কল্প দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব তাহা হইতে সাবধান হইবে[৭]। গ্রাহ্য গ্রাহকভাব লিপ্ত হইবে না, সমস্ত ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়তা অবলম্বন করিবে[৮]। জীব সর্ব্বদা সঙ্কল্পযুক্ত হইলে তাহাতেই বদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং বৈরাগ্যের উদয় হয় না, অতএব অনুরাগ দ্বারা বদ্ধ হইও না[৯]। যাহা দ্বারা অনুরাগ জন্মে, তাহাতেই বদ্ধ হইয়া থাকে, আর যাহাতে অনুরাগ না হয়, জীব তাহাতেই মুক্ত হইয়া থাকে[১০]। এই নিমিত্ত সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরাগ হও[১১]। যাহা করিবে, যাহা আহার করিবে, যাহা হোম করিবে, যাহা দান করিবে, তাহার কর্ত্তা বা ভোক্তা হইবে না।

তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শমতা লাভ করিবে[১২]। সাধু সকল অতীত কার্য্যের নিমিত্ত শোক করেন না, ভবিষ্যতের নিমিত্তও চিন্তা করেন না, বর্ত্তমানই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ কর্ম্মের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অচিন্তিত[১৩]। তৃষ্ণা, মোহ, মদাদি মনোধর্ম্মই ভাব, অর্থাৎ মনেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, হে রামচন্দ্র! তুমি মনের দ্বারাই সে সকলের ছেদন করিবে[১৪]। লৌহের দ্বারা যেমন লৌহ ছেদন করা যায়, সেইরূপ তীব্র বিবেক শক্তি দ্বারা মনের বাসনা সকল ছেদন করিবে[১৫]। পণ্ডিতগণ মনের দ্বারাই মনের ক্ষালন করিয়া থাকেন, কারণ বিষের দ্বারাই বিষাপনোদন হইয়া থাকে[১৬]। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরভেদে জীবের তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যাহা পররূপ, তাহারই ভজনা করিবে, অপর দুই মূর্ত্তি ত্যাগ করিবে[১৭]। হস্ত পদাদি বিশিষ্ট এই দেহ ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হইয়া থাকে, ভোগের নিমিত্ত যে দেহ, তাহা স্থূল দেহ[১৮]। সঙ্কল্পাত্মক ও ভাবি সংসার কারণ যে, চিত্ত স্বরূপ, তাহাই সূক্ষ্ম আতিবাহিক রূপ[১৯]। এবং আদ্যন্ত রহিত সত্য ও চিন্মাত্র নির্ব্বিকল্প রূপই তৃতীয় রূপ, ইহারই স্বরূপতা উপলব্ধি করিবে[২০]; ইহাই তুরীয় রূপ এবং শুদ্ধ, ইহাতেই ব্রহ্মপদ হইবে। পূর্ব্ব দুই রূপ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই মতি স্থির রাখিবে[২১]।

রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে মুনিনায়ক! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাবস্থায় অলক্ষিত তুরীয়-রূপের বিশেষ কি, তাহা বলুন[২২]। বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া যাহা সৎ, তাহাই তুরীয় মূর্ত্তি[২৩]। যাহা স্বচ্ছ, শম এবং শান্ত, তাহাই জীবন্মুক্ত এবং তাহাই সাক্ষী অর্থাৎ উদাসীনের ন্যায় তুরীয় মূর্ত্তি[২৪]। ইহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তাবস্থায় কিংবা সঙ্কল্পের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না[২৫]। প্রবুদ্ধগণের পক্ষে এই জগৎ যেরূপ, অবুদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে তুরীয় রূপও সেই প্রকার[২৬]। অহংভাব পরিত্যাগ করিলে সমতার উদ্ভব হইলে উক্ত তুরীয় মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে[২৭]। হে বিবুধোপম! এই সম্বন্ধে তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর[২৮]। এক কানন প্রদেশে মহামৌন (সর্ব্ব চেষ্টা রহিত) এক ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন, এক লুব্ধক (ব্যাধ) সেই মুনিকে পলায়িত মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন[২৯]। হে মুনিবর! আমার বাণবিদ্ধ মৃগ কোন দিকে গমন করিল, তাহা

বলুন৩০। মুনি বলিলেন, মৃগ কোন দিকে গমন করিল? আমার বনবাসী এবং সকলের প্রতি সমশীল৩১। ব্যবহারক্ষম অহঙ্কার আমাদের নাই, মনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে৩২। অহঙ্কারাতিশয্য বশতঃ কাহারও জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তাবস্থা জানিতে পারিতেছি না৩৩। তুরীয়মাত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং তাহাতে দর্শনক্ষমতা নাই। মুনির এই বচন শ্রবণ করিয়া সেই লুব্ধক তাহার অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। অতএব হে মহাবাহো! তুরীয় মূর্ত্তির অন্ত কোন দশা নাই৩৪।৩৫। নির্ব্বিকল্প মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অন্য ভাব ইহাতে নাই, চিত্তের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাবস্থা ভেদে তিন প্রকার রূপ আছে৩৬। ঘোর, শান্ত ও মূঢ়ভাব চিত্তেই অবস্থান করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত চিত্ত ঘোর, জাগ্রৎ, শান্ত ও স্বপ্নময় হইয়া থাকে৩৭। আর মূঢ় সুষুপ্তভাব হীন হইলে মৃত হইয়া থাকে। যে চিত্ত মৃত, তাহাতেই সমতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোগিগণ সেই চিত্ত প্রাপ্তির নিমিত্তই যত্ন করিয়া থাকেন৩৮। সমস্ত সঙ্কল্প-বিনাশ মুক্ত হইয়া তুরীয় পদে অবস্থিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ভেদ বুদ্ধি রহিত, মহাত্মা সাধু সকল যে পথে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদাই মুক্ত হইয়া থাকেন৩৯।

চতুর্ব্বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোত্তরশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিতে লাগিলেন, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সকল প্রকার দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলোপনই মুখ্য সিদ্ধান্ত, ইহাতে কোন প্রকার অবিদ্যা বা মায়ার সম্বন্ধ নাই, সমস্তই শান্ত ব্রহ্মময়১।

আত্মা অর্থাৎ জীব নিতান্ত নির্ম্মল সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মায় যখন একীভূত হয় তখন তাহার অপর নাম ব্রহ্ম। যাহারা জগতের মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করে তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার কল্পনা আবির্ভূত হয়। কেহ

বলে, শূন্য, কেহ বলে, কেবল বিজ্ঞান, কেহ বলে, ঈশ্বর[২,৩]। হে অনঘ! তুমি বাদীগণের কল্পনা সমূহ পরিত্যাগ করিয়া মহামৌনী, নির্ব্বাণ, নির্ম্মল, অচিন্ত ও বুদ্ধির অতীত হও[৪]। আপনাতেই দ্বৈত-রহিত তাহারা থাক[৫]। তুমি কার্য্য কর পরন্তু জাগ্রৎ থাকিয়া সুষু-প্তের ন্যায় কার্য্যবান্ হও। অর্থাৎ অন্তরে সর্ব্ব পরিত্যাগী ও বাহিরে (লোকে দৃষ্টিতে) কার্য্যবান্ হও[৬]। চিন্ত থাকাই দুঃখ কারণ, এবং নিশ্চিন্ত অবস্থাই সুখ। অন্তরস্থ চিত্তকে তুমি চিদাত্মায় লীন করিয়া যাও[৭]। যেমন প্রস্তরের রম্য অরম্য (ভাল মন্দ) জ্ঞান শূন্য, সেইরূপ তুমিও রম্য অরম্য জ্ঞান শূন্য হও। ঐরূপ হইতে পারিলে তুমি সংসার জয়ে সমর্থ হইবে[৮]। সুখ অসুখও তদন্তর বুদ্ধি কিছুই অনু-ভব করিও না, তাহা হইলেই তোমার দুঃখের অন্ত হইবে[৯]। যে ব্যক্তি জগতের সেই মূলতত্ত্ব পরব্রহ্মকে জানে, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবনের যাহা সার তাহা জানে এবং সে ব্যক্তি বাহিরে কর্ম্ম করিলেও অন্তরে কিছু করে না[১০]।

পঞ্চবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোত্তরশততম সর্গ

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগীদিগের যোগভূমি (যোগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা বা সোপান) সাত প্রকার, যোগীরা সে সকল কিরূপে অভ্যাস করেন, আয়ত্ত করেন, এবং সে সকলের চিহ্ন কি[১]?

বশিষ্ঠ বলিলেন, পুরুষ দ্বিবিধ। প্রবৃত্তি প্রধান ও নিবৃত্তি প্রধান। প্রবৃত্তির দ্বারা স্বর্গ ও নিবৃত্তির দ্বারা অপবর্গ (মোক্ষ) হইয়া থাকে। উক্ত উভয়ের লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর[২]।

নির্ব্বাণ লাভ কি? সুখ কি? কিছু নহে। এইরূপ ভাবিয়া যাহারা কর্ম্ম করে তাহারা প্রবৃত্তিপ্রধান[৩]। সংসারটা অসার, ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা, অতএব আমার সংসার উচ্ছেদ প্রাপ্ত হউক, এইরূপ বুদ্ধিতে যে কার্য্য করে, সে নিবৃত্তিপ্রধান। নিবৃত্তিপ্রধান বিবেকী নয় জন্ম জন্মান্তরের অন্তে কদাচিৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে[৪।৫]। যাহার অন্তরে তারতম্য রহিত নিষ্ক্রিয় অবস্থাই ভাল, এইরূপ নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে নিবৃত্তি বলা যায়[৬]। কিসে আমি বৈরাগ্য লাভ করিব? সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইব? বুদ্ধি যখন এই চিন্তায় রত হয়, তৎ ভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে, দিন দিন শৌচ সন্তোষ ঈশ্বরোপাসনা ও জপাদি কার্য্যে সুখ বুদ্ধি জন্মিতে থাকে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে,[৭।৮] পামর জাগরিত কার্য্য হইতে বিরত হইতে থাকে, পরদোষাদি অন্বেষণে ইচ্ছা জন্মে না, নিরন্তর সৎকার্য্যে রতি ও সৎকার্য্য সেবায় প্রবৃত্তি জন্মে, মনে উদ্বেগের আবির্ভাব হয় না, পাপে ভয় ও ভোগে অনিচ্ছা জন্মে,[৯।১০] স্নেহ ও প্রণয়পূর্ণ মনোরম বাক্য নির্গত হইতে থাকে, তখনই জানিবে, যোগী প্রথম ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছে। এইরূপ প্রথম ভূমিকাস্থ যোগী মনের দ্বারা, শরীরের দ্বারায় ও বাক্যের দ্বারায় সজ্জনের সেবা ও অসতের পরিহার করিতে পারিয়া থাকেন[১১।১২]। ঐরূপ গুণশালী পুরুষ সৎ শাস্ত্রের শ্রবণ মননাদি তৎপর হন ঐরূপ শুভেচ্ছাই যোগের প্রথমা ভূমি। পরে তিনি ক্রমে দ্বিতীয় ভূমিকায় প্রবিষ্ট হইতে থাকেন। দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে বিচার অর্থাৎ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক উপস্থিত হয়। তখন তিনি শ্রুতি স্মৃতি ও সদাচার নিষ্ঠ হইয়া ধারণা ও ধ্যানাদি কার্য্যে রত হন এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের নিকট হইতে ঐ সকলের তত্ত্ব কথা শুনিতে রত হন[১৩।১৪।১৫]। তখন তিনি কর্ম্মকাণ্ডের রহস্য ও জ্ঞানকাণ্ডের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হন কোন কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহাও তিনি স্থির করিতে পারেন[১৬]। অভিহিত অবস্থার যোগী লোক মর্য্যাদার অনুরোধে বাহিরে যৎকিঞ্চিৎ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি প্রকাশ করিলেও অন্তরে সে সকল সর্প নির্ম্মোকের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে[১৭]। এই সকল ব্যক্তি গুরু শাস্ত্রে ও সজ্জনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আত্মরহস্য বুঝিতে সমর্থ হন[১৮]। পরে তিনি তৃতীয়া যোগ ভূমিকায় অধিরোহণ করেন।

তাহাতে তিনি শাস্ত্র বাক্যকে তাৎপর্য্যার্থে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখেন এবং অধ্যাত্ম কথায় কাল হরণ করিতে থাকেন[১৯,২০]। এই সকল সংসার নিন্দুক ও বৈরাগ্যবান্ লোক শিলাশয্যায় অবস্থান দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হন[২১]। ইহাতে চিত্ত বনবাস বিহারে রুচিমান্ ও সংসর্গ ত্যাগকেই সুখ বিবেচনা করে[২২]। সৎ শাস্ত্রের আলোচনা, গুরু সেবা ও পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাদৃশ জীবের তত্ত্ব দৃষ্টি সুপ্রসন্ন হয়[২৩]। তৃতীয় ভূমিকাস্থিত যোগীরা দুই প্রকার অসঙ্গতা অনুভব করেন। এক সামান্য অসঙ্গতা, অপর উত্তম বা বিশেষ অসঙ্গতা। আমি কর্ত্তা ভোক্তা বাধ্যবাধক কিছুই নহি, এতাদৃশ অসঙ্গতা সামান্য-তর অর্থাৎ সামান্য নামের স্বামী সুখ দুঃখ বিষাদ প্রভৃতি সমুদায় পদার্থ পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ও ঈশ্বরের অধীন, সুতরাং এ সকল আমার কর্ত্তৃত্বা-ধীন নহে। লোকে যাহাকে ভোগাভোগ বলে, বস্তুতঃ তাহা একপ্রকার মহারোগ। যাহাকে সম্পদ বলে, ফলতঃ তাহা মহাবিপদ[২৪,২৫,২৬,২৭]। সংযোগ মাত্রেই বিয়োগান্ত, বুদ্ধির ব্যাধি আধি, অথবা আধির পরি-ণাম ব্যাধি, কাল সর্ব্ব ভক্ষ ও সদা ভক্ষ,[২৮] এইরূপ এ সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মে, সেই অনাস্থা ভাবনার দ্বারা শ্রবণ মননাদির সাহায্যে গুরূপদিষ্ট মহাবাক্য নিচয়ের যাহা অর্থ তাহা জানিতে পারে, জানিয়া তাহাতেই ব্যাসক্ত থাকে[২৯]। প্রাগুক্ত ক্রম পরম্পরা, মহাপুরুষদিগের সংসর্গ, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস, এইরূপ এইরূপ পুরুষকার প্রয়োগের ফলে পরম বস্তু পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত প্রকাশ প্রাপ্ত হয়[৩০,৩১]। সেই পরম বস্তু সংসার সমুদ্রের পরপারে ও তাহাই পরম কারণ। এতাদৃশ যোগী কোনও কিছুকে নিজের কর্ত্তৃস্বাধীন মনে করেন না, ইহারা জানেন, ঈশ্বর অথবা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সমুদায় বিষয়ের কর্ত্তা[৩২]। এইরূপ স্থিরতর সিদ্ধান্তের বশে অবস্থান করিতে করিতে যে অসঙ্গতা জন্মে সে অসঙ্গতাই শ্রেষ্ঠ[৩৩]। অন্তর, বাহির, অধঃ, ঊর্দ্ধ, দিক্, আকাশ, পদার্থ, অপদার্থ, জড় ও চেতন, কোনও কিছুতে সংসক্ত না হওয়া, তথা আদি, অন্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র সমান ভাব, এরূপ অসঙ্গতাও শ্রেষ্ঠ[৩৪]। সন্তোষ যাহার সুগন্ধ, সৎকার্য্য যাহার পল্লব, যাহা চিত্তরূপ মৃণালে আরূঢ়, বিঘ্ননিচয় যাহার মৃণালকণ্টক, বিচাররূপ সূর্য্য যাহাকে প্রফুল্লিত করে, বিবেক নামক পদ্ম অন্তরে

উৎপন্ন হইলে তাহারই ফল অসঙ্গ নাম্নী তৃতীয়া যোগভূমী[৩৪।৩৬।৩৭]। তত্ত্বদর্শীগণের সংসর্গে ও বিবিধ পবিত্র কর্ম্মের সঞ্চয়ে কাকতালীয় সংযোগের অনুরূপে প্রথমা ভূমিকার উদয় হয়। তাহাকে বিবেক দ্বারা রক্ষা ও যত্নসহকারে পালন করা কর্ত্তব্য[৩৮।৩৯]। বৈরাগ্য আদ্যভূমিকার অথবা শান্তি যে অংশে অঙ্কুরিত হউক, বিচারনিষ্ঠতার দ্বারা তাহারই বৃদ্ধি সাধন করিবেক[৪০]। কেন না প্রথমোদিত ভূমিকা হইতেই দ্বিতীয়াদি ভূমিকা জন্ম লাভ করে। এই যে, শ্রেষ্ঠ অসঙ্গতা, ইহাতে তৃতীয় ভূমিকা আরূঢ়[৪১।৪২]।

রামচন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্! যাহারা অসৎকুলোৎপন্ন, মূঢ়, কোন প্রবৃত্তিমান্ ও অত্যন্ত অধম, তাহাদের উদ্ধার আছে কি না, যদি থাকে ত তাহার প্রকার কি? তাহারা ত যোগীদিগের সংসর্গ প্রাপ্ত হয় না[৪৩]? অপিচ, এক, দুই, তিন অথবা আরও অধিক ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া যাহারা মৃত অথবা ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের গতি কি হয় তাহা আমাকে বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, মূঢ়দিগের সংসার অতি বিস্তৃত। তাহাদের শত শত জন্ম অতীত হইতে হইতে যদি দৈবাৎ কোনও জন্মে সাধুসঙ্গ লাভ অথবা বৈরাগ্য লাভ হয়, তাহা হইলে সেই জন্মে তাহাদের প্রথমা ভূমিকার উদয় হইবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে সংসার বিনাশ, ইহাই শাস্ত্রার্থ বলিয়া নিশ্চিত। যে ব্যক্তি যোগভূমিকায় থাকিয়া মৃত হয়, ভূমিকা অনুসারে তাহাদের দুষ্কৃতি ক্ষয় হইয়া থাকে। তাহারা নানাপ্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করে এবং সুকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে যোগীদিগের বংশেও বিশুদ্ধ সাধু সচ্চরিত্রদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করে[৪৪-৫০]। অনন্তর যোগসেবায় প্রবৃত্ত হয়, ক্রমে উত্তরোত্তর ভূমিকা রূঢ় হইতে থাকে[৫১]। হে রঘুনাথ! অভেদ বুদ্ধি হয় না, সেই জন্য শাস্ত্রে বর্ণিত ভূমিকাত্রয় জাগ্রৎ শব্দে উক্ত হয়। ঐ অবস্থায় সদ্গুণের উৎকর্ষ ও মুমুক্ষার উদয় হইয়া থাকে[৫২।৫৩]। যোগযুক্ত যোগীরা আর্য্য শব্দের অভিধেয় হন। যিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান, অকর্ত্তব্যের পরিহার পূর্ব্বক আচারনিষ্ঠ হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিয়া থাকেন[৫৪]। ইহারা আবার শাস্ত্র, আচার ও মন, এই তিনের সামঞ্জস্যে লোক ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন[৫৫]। আর্য্যতা প্রথম ভূমিকায় অঙ্কুরিত হয়,

দ্বিতীয় ভূমিকার বিকাশ প্রাপ্ত ও তৃতীয় ভূমিকায় ফলবতী হয়[৬৬]। আর্য্যতা প্রাপ্ত যোগী মরণের পর কিছু কাল পবিত্র কর্ম্মের ফলভোগ করেন, পরে পুনর্ব্বার যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন[৬৭]। ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসে অজ্ঞানের ধ্বংস হয়, তন্নিবন্ধন তত্ত্ব জ্ঞান পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদয় প্রাপ্ত হয়[৬৮]। যোগীরা চতুর্থী ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া এ সমুদায়কে একাদ্বয় ব্রহ্মে পরিশোষিত দেখেন। সেই অদ্বৈতভাব যখন দৃঢ় হয়, দ্বৈতভাব প্রশমিত হয়, তখন তাঁহারা এই লোক ত্রিতয়কে স্বপ্ন তুল্য সন্দর্শন করিতে থাকেন। অর্থাৎ স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল যেমন মিথ্যা দৃষ্টি-নিৰ্ম্মিত, এই জগৎ তাঁহারা মিথ্যা দৃষ্টিনির্ম্মিত দেখেন, সেই জন্য শাস্ত্র-কারেরা চতুর্থী ভূমিকাকে স্বপ্ন সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন[৬৯।৭০।৭১]। পরে তাঁহাদের পঞ্চমী ভূমিকা আগত হয়, তাহাতে তাঁহারা স্বপ্নে বিভাগও বিনিবৃত্ত হয় সুতরাং সে অবস্থার সংজ্ঞা সুষুপ্ত। অশেষ বিশেষ ভাব নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা বিভাগ বর্জ্জিত মাত্র অদ্বৈত সম্পন্ন হন, বহি-র্মুখী চিত্তবৃত্তি লুপ্ত ও অন্তর্মুখী নির্ব্বিভেদ আনন্দময়ী বৃত্তি উদিত হইতে থাকে[৭২।৭৩।৭৪], এই অবস্থায় যোগীরা লোক দৃষ্টিতে সদানিদ্রালুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকেন। ইহারা যে কিছু করেন সমস্তই পূর্ব্বোভ্যাস বশতঃ ও অনাসক্তের ন্যায়। ইহারই পরে ষষ্ঠী ভূমিকা আইসে। এই ষষ্ঠী ভূমিকা তত্ত্বশাস্ত্রে তুর্য্যা নামের নামী। তুর্য্যপদ প্রাপ্ত যোগীর সৎ অসৎ (আছে নাই) অহং নাহং (আছি আছে, নাই বা থাকিবে না) এ সকল আদৌ থাকে না, লুপ্ত হইয়া যায়। এই সকল যোগীরা লোকে ও শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাত। দ্বিত্ব একত্বাদি, ও অন্যান্য মানসী কল্পনা কিছুই থাকে না[৭৫।৭৬।৭৭]। চিত্র লিখিত যেমন নির্ব্বাণ অনির্ব্বাণ দুইএর অতীত, জীবন্মুক্ত যোগীরাও তদ্রূপ নির্ব্বাণ অনির্ব্বাণ দুএর অতীত অথবা আকাশস্থ কুম্ভের ন্যায় অন্তর্ব্বহিঃ শূন্য[৭৮]। অথবা সমুদ্রমগ্ন কুম্ভের ন্যায় অন্তরেও পূর্ণ ও বাহিরেও পূর্ণ[৭৯]। কিছু কাল ষষ্ঠী ভূমিকায় অবস্থান করার পর তাহারা সপ্তমী ভূমিকা প্রাপ্ত হন। সপ্তমী ভূমিকাই বিদেহ মুক্তি বলিয়া গণ্য। সে অবস্থা বাক্যের অবর্ণ-নীয়, অর্থাৎ বাক্য নাই যাহারা ঐ ভূমিকা বুঝান যাইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত উহাকে শিব, কোন ঋষি উহাকে ব্রহ্ম, কোন যোগী উহাকে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা বিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণনা করেন।

আরও অনেক তত্ত্ব চিন্তক আরও অনেক কথা বলিয়া থাকেন। হে রঘুনাথ! আমি তোমার নিকট সাত প্রকার যোগ ভূমি বর্ণনা করিলাম, তুমিও শ্রবণ করিলে[১০।১১।১২।১৩]। এ সকল অভ্যস্ত হইলে দুঃখানুভব তিরোহিত হয়। একটা হস্তিনী আছে, সে সদা মদোন্মত্তা ও সদা যুদ্ধপ্রিয়া। ইহার দুইটী ভীষণ দন্ত আছে, এই হস্তিনী অত্যন্ত অনিষ্টকারিণী। যদি এই হস্তিনীকে বিনাশ করা যায়, তাহা হইলে সমুদায় যোগভূমি আয়ত্ত হইতে পারে। যাবৎ সে হত না হয়, তাবৎ যোগভূমি জয় করা যায় না[১৪।১৫।১৬]।

রাম বলিলেন, প্রভো! সেই হস্তিনী কে? তাহার বিলাস স্থান কোথায়[১৭]? কি প্রকারেই বা তাহাকে নষ্ট করা যায় এবং সে কোথায় বিচরণ করে, তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! আমার ইহা হউক, তাহা হউক, ইত্যাকারের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাই হস্তিনী[১৮]। এই হস্তিনী শরীররূপ বনে বিচরণ করে এবং সদা উন্মত্তাবস্থায় থাকে। এই হস্তিনীই বিবিধ আকারের উল্লাস জন্মায়, প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ইহার নায়ক[১৯]। এ মনোরূপ গুহায় লীন থাকে এবং দুই প্রকার (শুভ ও অশুভ) কর্ম্ম ইহার দুই দন্ত। ইহার মন্দ বাসনা[৮০], হে রাম! সংসার দর্শন ইহার সমর ভূমি। জন্তু সকল যাহাতে পুনঃ পুনঃ জয় পরাজয় অনুভব করে শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই সংসার দর্শন বলেন[৮১]। এই যে ইচ্ছা হস্তিনী এ শত শত অজ্ঞানী জীবের বিনাশকারিণী। বাসনা, স্পৃহা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঙ্কল্প, ভাবনা, এ সকল ঐ হস্তিনীর অন্য নাম। কেবল ধৈর্য্য নামক মহা অস্ত্রের দ্বারা ইহার জয় সাধন করা যায় পরন্তু যাহাতে এই ইচ্ছা হস্তিনী সর্ব্বতোভাবে বিজিত হয়, তাহা করিবেন। অন্তরে যত কাল 'এই' 'তাহা' 'ঐ' ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ সংসার, যাহাকে পণ্ডিতগণ বিষ ও রোগ বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করেন। সংসার কি? 'আমার ইহা' ইত্যাকার মনই সংসার[৮২।৮৩।৮৪।৮৫] উহার উপনামই মোক্ষ। ইচ্ছা জয়ী মন নিস্মল, উপদেশ বাক্য সকল তাদৃশ মনেই স্বার্থ প্রকাশ করে[৮৬] এবং সংসারের অঙ্কুর স্বরূপ, ইহার অনুদ্রেক কেবল বিষয় বিস্মরণ হইতেই সম্পন্ন হয়[৮৭]। কদাচিৎ কদাচিৎ যদি অনর্থকারিণী ইচ্ছার উদয় হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিস্মরণ-

রূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিবেক৮৮। ইচ্ছার বশ্য জীব দুঃখ পরিহারে সমর্থ নহে। সুতরাং কেবল আত্মতত্ত্বে মনঃসমাধান করতঃ নির্বিক্ষেপ ভাবে থাকিবেক৮৯। নির্ব্বিক্ষেপ ভাব অভ্যাস কালে তীব্র প্রযত্ন আবশ্যক, পরন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইলে তখন তাহা সহজেই সম্পন্ন হয়। অহে শ্রোতৃগণ! তোমরা প্রত্যাহার (প্রত্যাহার—যোগের তৃতীয় অঙ্গ) রূপ বড়শির দ্বারা ইচ্ছা মৎস্যকে সংযত করিও৯০। আমার ইহা হউক, তাহা হউক, এতদ্রূপ মনোবৃত্তিকে পণ্ডিতগণ কল্পনা ও বিষয় বিস্মরণ অর্থাৎ উহার বিপরীত বৃত্তিকে কল্পনা-ত্যাগ নামে ব্যবহার করেন৯১। স্মরণই সঙ্কল্প ও অস্মরণই শিব অর্থাৎ মঙ্গল। যে কিছু পূর্ব্বানুভূত, সে সমুদায়কে অননুভূতের ন্যায় ভাবিবেক৯২। বিষয় অনুভূত হইলেও অননুভূতের ন্যায় বিস্মৃত হইবে। তোমরা এ সমুদায় বিস্মৃত হও, বিস্মৃত হইয়া কাষ্ঠ যেমন সদা বিক্ষেপহীন (অচঞ্চল) সেইরূপ নির্ব্বিক্ষিপ্ত হও৯৩। আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, তথাপি কেহ আমার সে কথা শুনিতেছে না। "সঙ্কল্প পরিত্যাগ পরম মঙ্গল!" সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে অন্তরে ও বাহিরে নির্ব্ব্যাপার হইতে পারিলে ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মপদের নিকট সম্রাটের পদ তৃণ অপেক্ষাও লঘু। পথিক যেমন গম্য স্থান পাইলে পদস্পন্দ পরিত্যাগ করে (পদস্পন্দ=গতি),৯৪।৯৫। তোমরা সেইরূপ ব্রহ্ম স্থান পাইয়া নির্ব্ব্যাপার হও৯৬। ঐ বিষয়ে আর অধিক বলিব না, সংক্ষেপে বলি, সঙ্কল্পই বন্ধন ও তাহার অভাব বা পরিত্যাগই মোক্ষ৯৭। এ সমস্তই জন্মাদি রহিত, শান্ত, ধ্রুব, ও অব্যয় ব্রহ্ম। তোমরাও জগৎকে ঐরূপে জয় কর ও সুখে থাক৯৮। জ্ঞান যদি তদ্রূপে পরিণত হয় তাহাই পরম যোগ। হে রঘুনাথ! তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে৯৯। পণ্ডিতগণ সংবেদনাভাবকেই যোগ বলেন এবং তাহাকে চিত্তবিনাশও বলেন। উহাই অকৃত্রিম। তুমি তন্ময় হও ও বর্ণিতভাবে অবস্থান কর১০০। হে রামচন্দ্র! ব্রহ্মবোধরূপী পরব্রহ্ম জন্মাদি বিক্রিয়া রহিত, তদ্ভাবে ভাবিত হওয়াই সর্ব্বত্যাগ, এইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইয়া কর্ম্মাচরণ করিবে১০১।

রঘুনাথ! যাবৎ আমি ও আমার, এতদ্বিধ জ্ঞান পুষ্ট থাকিবেক, তাবৎ দুঃখে বিমুক্তি হইবে না। ঐ বোধ তিরোহিত হইলেই দুঃখের

অগু হইবে। অতএব রাম! আমি উভয় কথাই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিবে[১০০]।

ষড়্‌বিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ

ভরদ্বাজ বলিলেন, মুনিগণাগ্রগণ্য সেই মুনিসত্তমের প্রমুখাৎ সম্প্রদায়াগত জ্ঞানসার শ্রবণ করিয়া নির্ম্মলমতি, বোধপূর্ণ ও সুখপূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন[১]।

ইনি অর্থাৎ শ্রোতা রঘুনাথ সামান্য পুরুষ নহেন। ইনি পরম যোগী, জগন্নাথ, দেবগণেরও ঈশ্বর, জন্ম মরণ বর্জ্জিত, চিদানন্দময়, গুণাধার, লোকত্রয়ের জনক, রক্ষক ও অনুগ্রাহক[২]।

ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন, কমললোচন রাম গুরু বশিষ্ঠের বেদান্তসার বাক্যনিচয় শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য মৌনী রহিলেন। কিছুই ইঁহার অবিদিত ছিল না, পরন্তু বাক্য শ্রবণ জনিত অখণ্ডাকারা মনোবৃত্তির উদয় বশতঃ ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বিকার চিদ্‌ঘন হইয়া রহিলেন[৩,৪]। ইহা প্রশ্ন, তাহা প্রত্যুত্তর, এ সকল বিভাগ বিস্মৃত হইয়া রোমাঞ্চিত শরীর ও আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ হইলেন[৫]। মনোরথ ইঁহার নিকট তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য সমুদায় ইঁহার অধীন এবং ইঁনিই সেই ব্রহ্মনাম ও সর্ব্বব্যাপিনী চিৎ[৬]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, অহো! রাম পরমপদ সম্পন্ন হইয়াছেন। হে মুনিনাথ! আমাদের এরূপ না হইল কেন, আমরাও শ্রবণ করিলাম, অথচ আমাদের ঐ উত্তমা গতি লাভ হইল না, অতএব হে মুনিনাথ! আমাদের ন্যায় মূর্খ, অহমভিমানী, অজ্ঞ ও পাপী আর কে আছে[৭,৮]? রামের ঈদৃশী স্থিতি ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্লভা। হে মুনীশ্বর! হে গুরো! কি প্রকারে আমি বিভ্রান্ত হইব ও কি উপায়ে এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, তাহা শীঘ্র বর্ণন করুন[৯]।

বাল্মীকি বলিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তান্ত, বশিষ্ঠ যাহা রামকে বলিয়াছেন, তাহা তোমরা আদ্যোপান্ত স্মরণ কর, এবং মনে মনে বিচার কর, অপর যাহা বলি, তাহাও শ্রবণ কর[১০]।'

এই সকলই অবিদ্যার বিস্তৃতি, অন্য কিছু নহে। ইহাতে অল্পমাত্রও সত্য নাই। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, পরন্তু যাহারা বিবেকী নহে, তাহারাই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ লইয়া পরস্পর বিবাদ করে, অর্থাৎ নানা জনে নানা কথা বলে[১১]। যখন চিৎ ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তখন আর প্রপঞ্চের দ্বারা তোমার রোধ সম্ভাবনা কি? তুমি প্রণব, তত্ত্ববোধক মহাবাক্য ও উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা শুদ্ধ-বুদ্ধি হও[১২]। প্রপঞ্চে চিত্তবৃত্তি উদিত রাখা আর জাগ্রৎ নিদ্রা সমান। যাহার অন্তরে কেবল চিৎ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত, সে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই জাগ্রৎ—প্রকৃত জাগ্রৎ[১৩]। হে সখে! ভরদ্বাজ! এই প্রপঞ্চ মূল-রহিত ও অসার, সে জন্য ইহার প্রতি অনাস্থা স্থাপনই পাণ্ডিত্য[১৪]। এই প্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও অনাদি বাসনাপুঞ্জের প্রভাবে সৎ, অর্থাৎ থাকার ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এই বহু বিভ্রমময় সংসার গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় মিথ্যা[১৫]। কেন তুমি বৃথা বাসনারূপ বিষ-বল্লীতে অধ্যাস্ত হইয়া মুগ্ধ হইতেছ?[১৬] তুরীয়াবস্থা লাভের পূর্ব্বেই এ সকল নিপতিত থাকে, পরে নহে। ইহা নিরালম্ব-চিন্তক তত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের অনুভব সিদ্ধ[১৭]। সংবিৎ নদী তাবৎ কাল তরঙ্গায়িতা থাকে, যাবৎ না তাহা আত্মরূপে দর্শন করা যায়[১৮]। হে সখে! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, যাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও নাই। অতএব, এই প্রপঞ্চদর্শন আর স্বপ্ন, উভয়ই সমান[১৯]। বুদ্বুদ যেমন জলে ও জলেরই প্রভেদ, সেইরূপ, এ সকল অবিদ্যারই প্রভেদ, অন্য কিছু নহে। এই প্রপঞ্চ বুদ্বুদ ক্ষণকালের নিমিত্ত উদ্ভূত হয় বটে, পরন্তু ইহা পুনর্ব্বার জ্ঞানসমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়[২০]। তুমি সুশীতল জ্ঞান-সলিলের নদীতে অবগাহন কর, বহির্ভ্রান্তির নিদাঘ (গ্রীষ্ম) অতি সহজে উপশম হইবে[২১]। এক অজ্ঞান-সমুদ্রই বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া রহিয়াছে, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের প্রধান তরঙ্গ অহং—আমি ইত্যাকারের বোধ। ইহা অবিদ্যাবায়ুর তাড়নায় উৎপন্ন[২২]। চিত্তবিক্ষেপ, ভেদবুদ্ধি ও রাগ-দ্বেষাদি উহার লহরী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতরঙ্গ। মমতা উহার আবর্ত্ত[২৩], এই

সমুদ্রের প্রধান জলজন্তু বিষয়াসক্তি ও দ্বেষ। ইহাদের দ্বারা গৃহীত হইলে অনর্থ-পাতালে প্রবেশ ঘটনা হয়[২৪]। হে ভরদ্বাজ! তুমি প্রশান্ত-কল্লোল অমৃতসমুদ্রে মজ্জন কর, দ্বৈতরূপ ক্ষারসমুদ্রে মজ্জন করিও না[২৫]।"কোথায় সংসার? সত্য সত্যই কি সংসার আছে? কে কাহার? কেইবা কোথা হইতে হইল ও আসিল? তুমি সংসার মায়ায় মগ্ন হইও না[২৬]। আত্মাই একাদ্বয় তত্ত্ব, জগৎও তাহাই। সুতরাং তুমিই সব, কিছুই তোমার অতিরিক্ত নহে। সুতরাং শোকের বিষয় নাই[২৭]। এই সমস্ত জগৎ অজ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মবিবর্ত্ত (ব্রহ্মই কল্পিত) পরন্তু জ্ঞানীর নিকট পরম আনন্দ[২৮]। বিবেকবিহীন নর নিষ্কারণে শোকাচ্ছন্ন ও হর্ষাবিষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া রহস্যজ্ঞানীরাও হাস্য করেন, মোহের বিড়ম্বনা তাহাদের নিকট পরাভূত[২৯]। সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত, তাই তাহারা জলে স্থল ও স্থলে জল দেখার ন্যায় দেখিতেছে। জগৎ যদি মহাভূতের অথবা পরমাণুপুঞ্জের রচনা বিশেষই হয়, তথাপি ইহার জন্য শোক ও দুঃখ করা বিধেয় নহে[৩০।৩১]। "অসতের অর্থাৎ কাল্পনিক পদার্থের বাস্তব জন্ম বা উৎপত্তি নাই এবং যাহা সৎ যথার্থ সদ্বস্তু, তাহার অভাবও অসম্ভব। আবির্ভাব ও ক্রিয়াভাব, এ দুটীই মায়ার পরিপাটী মাত্র। অতএব, দেহাদি ভোগের উৎসাহী হইলে পরে এই সকল বিষে পরিণত হইবে। এ রহস্য যদি মনকে বিকৃত করিতে না পারে, তাহা হইলে জগদ্গুরু পরমেশ্বর ভজনা কর, অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত হও, পরে পাপক্ষয়ের প্রান্তে ঐ রহস্যের বোধ জন্মিবে[৩৩]। বোধ হয় তোমার সমস্ত দুষ্কৃত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাণীর পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই দেব দেব পশুপতির পাশ, অর্থাৎ তাহাদের বন্ধনরজ্জু[৩৪]। যাবৎ না তোমার চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাবৎ তুমি সাকার ঈশ্বরের ভজনা করিবে, তৎপরে তোমার নিরাকার স্থিতি সফল হইবে[৩৫]। আগে ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব, তৎপরে অজ্ঞানের মোহশক্তির অভাব, তৎপরে গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাস, তৎপরে যম নিয়মাদি রূপে যোগপথের পথিক হইবে[৩৬]। তুমি ক্ষণকাল প্রত্যগাত্মায় সমাহিত হও, শেষে বুঝিতে পারিবে, তোমার পূর্ব্ববুদ্ধিরূপ রজনী কোথায় চলিয়া গিয়াছে, নরগণ পুরুষকার অবলম্বন করুক বা না করুক, কর্ম্মনিষ্ঠ হউক বা নাহউক, মহেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়।

হে সখে! প্রাণিগণের পূর্ব্ব কর্ম্মই অতীব বলবান্। তাহার নিকট আভিজাত্য, চরিত্র, নীতি, বিক্রম, এ সকল পরাভূত। যাহার প্রতীকার তর্কের অগোচর, তাহার জন্য অবসন্ন হইও না। ইহাই স্থির জানিবে যে, ঈশ্বরও ললাট লিপির (প্রাক্কৃত কর্ম্ম সংস্কারের শক্তি) বিলোপে অসমর্থ[১০]। ঈশ্বর কৃত নিয়তি অচিন্তনীয়। বক্তৃতা ও পাণ্ডিত্য তাহার নিকট পরাভূত[১১]।

হে ভরদ্বাজ! তুমি বিবেকশক্তির দ্বারা মোহজয়ী হও। তাহা হইলেই সেই অসাধারণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে[১২]। মহাসত্ত্ব রাজা যুদ্ধাদি উদ্দাম বিপদেও অবসন্ন হয় না, কিন্তু অল্পসত্ত্ব নর অতি যৎসামান্য বিপদে অবসন্ন হয়[১৩]। তত্ত্ববোধ পুণ্যের অধীন, এবং উহা বহু জন্মের অতি-পাতে প্রকটিত হয়। ইহা আরও জীবন্মুক্তদিগের কার্য্য দৃষ্টে অনুমিত হয়[১৪]। বৎস! যেমন প্রতিকূল কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন তেমনি অনুকূল কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ[১৫]। বর্ষা যেমন দাবানল বিনাশ করে, তদ্রূপ সাধুদিগের সাধুকর্ম্মের বেগও সঞ্চিত পাপ বিনাশ করে[১৬]। হে সখে! যদি তুমি সংসারচক্রের আবর্ত্তে ভ্রামিত হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে সমুদায় কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর ও ঈশ্বর ভক্ত হও[১৭]। কল্লোল-ময় জলেই সমুদ্রের বিক্ষেপ জন্মে, কেবল জলে নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, এই কাল্পনিক এই জগৎ তাবৎ বিদ্যমান থাকে যাবৎ বহির্দৃষ্টির বিলোপ না হয়[১৮]। কেন তুমি অন্ধতাজনক শোক অব-লম্বন করিতেছ? বিবেক (প্রজ্ঞা) যষ্টি অবলম্বন কর[১৯]। হর্ষ শোকাদি যাহাদিগকে তৃণ তরঙ্গের ন্যায়ে বশীভূত করে তাহারা নগণ্য[২০]। হে সখে! এই জগৎ দিবারাত্র হর্ষ বিষাদিরূপ দোলায় দোলায়িত হই-তেছে। কাল এই জীব জগৎকে উক্ত দোলায় দোলায়িত করিয়া ক্রীড়া করিতেছে। কাল লৌকীক সমুদায়ের উৎপত্তি, নাশ, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার প্রভৃতি নানা ভাব উত্থাপন করিয়া ক্রীড়া করি-তেছে[২১।২২]। এ সমস্তই কালসর্পের ভক্ষণ দ্রব্য[২৩]। মরণশীল জীব দূরে থাকুক, দেবতারাও কালের ভক্ষ্য[২৪]। কেন তুমি সম্পৎকালে প্রীত হইয়া নৃত্য কর, আর বিপদ কালে অবসন্ন হইয়া রোদন কর? তুমি নির্ব্বিকার থাকিয়া সংসার নাট্য দর্শন কর, স্বয়ং নাচিও না[২৫]। হে ভরদ্বাজ! বিবেকশালী পণ্ডিতেরা ক্ষণভঙ্গুর জগতের বিবিধ ভঙ্গীতে

মুগ্ধও হন না, বিষণ্ণও হন না[৫৬]। অমঙ্গল্য শোক পরিত্যাগ কর, যাহা মঙ্গল তাহারই চিন্তা কর। সদাকাল আপনাকে নির্লিপ নির্ম্মল আনন্দ ঘন চেতনরূপী বলিয়া ধ্যান কর[৫৭]। দেবে, দ্বিজে ও গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ হও এবং সদা শাস্ত্র প্রমাণ উপর নির্ভর কর। তাহা হইলে তুমি মহেশ্বরের কর্তৃক অনুগৃহীত হইবে[৫৮]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে ভগবান্! আমি আপনার প্রসাদে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি, বৈরাগ্য অপেক্ষা বন্ধু ও সংসার অপেক্ষা শত্রু নাই[৫৯]। এক্ষণে আমি ভগবান্ বশিষ্ঠের কথিত উপদেশ বাক্য সমূহের সার সঙ্কলন কি? তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি[৬০]।

বাল্মীকি বলিলেন, ভরদ্বাজ! তুমি মুক্তিপ্রদ মহাজ্ঞানের কথা শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে তুমি ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হইবে না[৬১], যিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা, যিনি এক হইয়াও বিবিধ রূপে স্থিত আছেন, আমি সেই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি[৬২]। এই জগৎ প্রপঞ্চের লয় কালে যে তত্ত্বের প্রকট ছিল, সেই তত্ত্বের উপদেশ শ্রবণ কর। তুমিও ত পূর্ব্বাপর সমস্তই বিদিত ছিলে, সে সকল বিস্মৃত হইলে কেন[৬৩।৬৪]? স্বয়ং স্বচিত্তে বিচার কর, সৎ সঙ্গ ও সৎ শাস্ত্র অবলম্বন কর, বৈরাগ্যবান্ হও, তাহা হইলে আর শোক মোহ থাকিবে না[৬৫]।

সপ্তবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টবিংশোত্তরশততম সর্গ।

——()*()——

বাল্মীকি বলিলেন, যাবৎ না চিত্ত প্রসন্ন হয় তাবৎ শম দম উপরতি (কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিত্যাগ) বিষয়াসক্তি শূন্য ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া যোগাসনে উপবেশন করতঃ অন্তর ও বাহ্য উভয়েন্দ্রিয় সংযত করিয়া ওঁ এই শব্দের উচ্চারণ করিতে থাকিবেক। পরে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেক এবং তৎসঙ্গে বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ-

ধ্বংস করিবেক[১,২,৩]। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীব যাহা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবেক, পরে সে সকলকে স্ব. স্ব কারণে লীন করিবেক। প্রথমে ভাবনার দ্বারা বিরাটে সমষ্টি স্থূল-শরীরাভিমানী আত্মার স্থিতি, পরে সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভে, তৎপরে মায়াধারী ঈশ্বরাত্মার ও তৎপরে তাহাও পরম কারণ পরমাত্মার বিলাপিত করিবেক[৪,৫]। ভাবনার দ্বারা দেহের মাংসাদি বিভাগ পৃথিব্যা-ভূতে, রক্তাদিভাগ জলভূতে, জলভাগ তেজোভূতে, তেজোভাগ বায়ুভূতে, বায়বীয় ভাগ আকাশভূতে লয় করিয়া দিবেন (মাংসাদি পার্থিব, সুতরাং মাংসাদি নাই, এইরূপ ভাবনার দ্বারা মাংসাদির জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিবেক, ইত্যাদি)[৬,৭] ঐ প্রকারে অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা শ্রবণে-ন্দ্রিয়কে দিক্ পদার্থে, ত্বগিন্দ্রিয়কে বিদ্যুতে, চক্ষুরিন্দ্রিয়কে সূর্য্যদেবতায় জিহ্বেন্দ্রিয়কে বরুণদেবতায়, প্রাণকে বায়ুদেবতায়, বাগেন্দ্রিয়কে বহ্নিদেব-তায়, পদকে বিষ্ণুদেবতায়, আয়ুকে মিত্রদেবতায়, উপস্থেন্দ্রিয়কে কশ্যপে, মনকে চন্দ্রদেবতায় ও বুদ্ধিকে ব্রহ্মার বিলাপিত করিবেক। (অর্থাৎ দৃঢ় ভাবনার দ্বারা ঐ সকলকেও ভুলিতে হইবে)[৮,৯,১০,১১]। শ্রুতি অনুসারে আমি ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উপদেশ করিলাম। অভিহিত প্রকারে আমিই বিরাট অর্থাৎ সর্ব্বস্থূলাভিমানী আত্মা, এইরূপ ভাবিবেক[১২]। যিনি এক হইয়াও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত বা ব্যাপ্ত, যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর ও সকলের আধার, যিনি সর্ব্ব কারণ, যিনি যুক্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সর্ব্বসমুদায় জগৎ ব্যাপার নির্ব্বাহিত হই-তেছে, তিনি ও আমি এক বা অভিন্ন, এইরূপ চিন্তা করিবেক। পৃথি-বীর দ্বিগুণ জল, জলের দ্বিগুণ তেজ, তেজের দ্বিগুণ বায়ু, বায়ুর দ্বিগুণ আকাশ, এতাদৃশ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমি ব্যাপ্ত। ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে অর্থাৎ অগ্নিকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে ও আকাশকে সমুদায়ের উৎপত্তি কারণ মহত্তত্ত্বে (প্রকৃতিতে) নিবিষ্ট করিয়া দিবেক[১৩,১৪,১৫,১৬,১৭]। যোগী কিছুকাল কেবলমাত্র লিঙ্গশরীর তদবস্থাধারী হইয়া থাকিবেন। বাসনা, সূক্ষ্মভূত, কর্ম্মসংস্কার, অবিদ্যা, পাঁচ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই গুলির সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলা যায়। ইহারই পরে 'আমি আত্মসম্পন্ন হইয়াছি' এইরূপ ভাবি-বেক[১৮,১৯]। ঐরূপ হিরণ্যগর্ভ ভাবনা। সিদ্ধ হইলে জড়ে জড়ভাগ

চিত্তে চিদাভাস (জীব ভাব) বিকাশিত করতঃ মাত্র অব্যক্ত নিষ্ঠ হইবেক[২০]। যারা এই সকল নাম রূপের অতীত ও যাহাতে জগতের স্থিতি (গঠন) তাহাকে কোন কোন ঋষি প্রকৃতি, কোন কোন ঋষি মায়া, কেহ কেহ পরমাণুরাশি ও কেহ কেহ অবিদ্যা সংজ্ঞা দিয়া উল্লেখ করেন। এই প্রকৃতিতে অথবা মায়ায় সমস্তই লয় হয় সুতরাং অব্যক্ত সম্পন্ন হয়। যোগীরাও সাধনার দ্বারা অব্যক্ত সম্পন্ন হন, নিঃসম্বন্ধ ও নিরাস্বাদ অবস্থায় পুনঃসৃষ্টি পর্য্যন্ত স্থিত থাকেন[২১।২২।২৩]। অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি ও প্রতিলোম ক্রমে সংহার বা লয় হইয়া থাকে। তৎপরে যোগী তুরীয় পদ প্রাপ্ত (পরব্রহ্ম) হয়, সে পদ অব্যয়[২৪]। ধ্যানের দ্বারা লিঙ্গশরীরও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, তদবস্থায় ভূতপঞ্চক, ইন্দ্রিয়-গণ, মন বুদ্ধি, কর্ম্মসংস্কার, প্রাণবায়ু এবং অজ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেননা, ঐ সকল পদার্থই লিঙ্গ দেহের অধীন বা আশ্রিত।[২৫] আশ্রয়ের বিলয়ে আশ্রিতের বিলয় সুপ্রসিদ্ধ[২৬]।

ভরদ্বাজ বলিলেন, এক্ষণে আমি বুঝিলাম ও লিঙ্গবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম[২৭]। যে হেতু আমি উপাধিকৃত চিদংশ, সেই হেতু উপাধি বিলয়ে আজ্ আমি অসীম চিদানন্দ-সমুদ্রে মিলিত হইলাম। অথবা ভেদ না থাকায় পরমাত্মসম্পন্ন হইয়াছি[২৭]। আমি নির্ব্বিকারস্বভাব, কেবল, ব্যাপী, এবং চিৎ অচিৎ যে কিছু সমস্তই আমি। যেমন ঘটের অভাবে ঘটাকাশ ও মহাকাশ অভিন্ন, তেমনি লিঙ্গবিলয়ে আমি পর-মাত্মা[২৮]। শ্রুতি সকল এই তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলেন। অগ্নি অগ্নিতে ক্ষিপ্ত হইলে সমান হইয়া যায়, প্রভেদ থাকে না। তৃণ লবণাকরে নিক্ষিপ্ত হইলে তৃণও লবণ হয়[২৯।৩০]। অজ্ঞানীর দৃশ্য এই অচেতন জগৎ চেতনেই ন্যস্ত বা প্রবিষ্ট রহিয়াছে। যেমন সিন্ধুতে সৈন্ধব (লবণ) সেইরূপ। সমুদ্রে প্রবিষ্ট লবণ সমুদ্র ব্যতীত পদার্থান্তর নহে। জলে জল, দুগ্ধে দুগ্ধ, ঘৃতে ঘৃত মিলিলে সে সকল বিনষ্ট হয় না, কেবল বিশেষত্ব বর্জ্জিত ও নাম রূপ রহিত হইয়া যায়। তদ্রূপ আমিও আজ্ চেতনে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইয়াছি[৩১।৩২।৩৩]। ইহাই নিত্যপদার্থ, আনন্দ ঘন, সর্ব্বজ্ঞ, পরমকারণ, সর্ব্বব্যাপী, নিরবদ্য, নিরঞ্জন ও শান্ত[৩৪]। অকিঞ্চন নিরংশ নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ ও ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় নহে, হেয় নহে, উপাদেয়ও নহে, পরন্তু কেবল ও পাপপুণ্য রহিত। এই ব্রহ্মই

জগৎ কারণ, দ্বিতীয় রহিত, সর্ব্বজ্যোতি। শাস্ত্রে এই ব্রহ্মই সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণের অতীত ও ঐরূপ গুণযোগী বলিয়া বর্ণিত হয়। জীব সর্ব্বদা এই ব্রহ্মের ধ্যান করিবেক। অভ্যস্ত হইলে মন তখনে ব্রহ্মে অন্তগত হইবে, মন অন্তগত হইলেই আত্মার প্রকাশ হইবে, আত্মার প্রকাশে সর্ব্বদুঃখের অবসানও আত্মসুখের অভিব্যক্তি আপনা আপনিই হইবে। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, আমিই চিদানন্দময় ও আমা ছাড়া কিছুই নাই[৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০]। আমি এক ও ব্রহ্ম, ইত্যাকারেই পরমাত্মার প্রকাশ হয়[৪১]।

বাল্মীকি বলিলেন, হে সখে ভরদ্বাজ! যদি তুমি সংসাররূপ আবর্ত্তে ভ্রাম্যমান হইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মভক্ত হও।

ভরদ্বাজ বলিলেন, গুরুদেব! আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানসার আমি বুদ্ধিস্থ করিয়াছি[৪২]। আমার বুদ্ধি মালিন্যশূন্য হইয়াছে, শীঘ্রই আমার সংসার অস্তগত হইবে। এক্ষণে আমি জানিতে চাই, জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম কিরূপ?[৪৩] তাঁহাদের কর্ম্ম কি প্রবৃত্তি ঘটিত? অথবা নিবৃত্তি ঘটিত?

বাল্মীকি বলিলেন, যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা এমন কর্ম্ম করিবেন না, যাহা করিলে দোষ হয়। অর্থাৎ যাহা মুক্তির বাধাদায়ক, তাহা করিবেন না[৪৪]। বিশেষতঃ কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য। জীব যখন মনোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মগুণে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধীনতা ত্যাগ করিয়া কেবল হয়, তখনই জানিবে যে, সে সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। জীব যখন আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির উপরবর্ত্তী, এইরূপ ধ্যান করিতে পারে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্ত হইয়াছে এবং সে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি বর্জ্জিত হইয়াছে[৪৫।৪৬।৪৭]। তখন সে সুখ দুঃখ মুক্ত। জীব যখন সর্ব্ব ভূতে আত্মদর্শন ও আপনাতে সর্ব্ব ভূতের অবস্থান দর্শন করে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্ত হইয়াছে। জীব যখন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া আনন্দপ্রচুর তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই জানিবে যে, সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। তুরীয় পদে অর্থাৎ পরমাত্মার স্থিতিই মুক্তি[৪৮।৪৯।৫০]। জাগ্রৎ স্বপ্নাদির বীজ বাসনাদিযুক্ত অজ্ঞান, তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিলে যে কেবলা ও সুখময়ী চিৎ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় ও সুখ স্বাস্থ্যের

উপলব্ধি স্থায়ী হয়, তাহাই ‍ঃযোগেরঃ নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি৫১। মন অন্তগত হইলে আত্মাতিরিক্ত পদার্থ উপলব্ধ হয়৫২। অতএব, হে ভরদ্বাজ! দ্বৈতরূপ ক্ষারসমুদ্রে মজ্জন করিও না। জগদ্গুরু পরমেশ্বরের ভজনা কর৫৩। বশিষ্ঠোপদেশের সার কথা তোমাকে বলিলাম, তদুক্ত জ্ঞান অথবা যোগ আশ্রয় করিলে সর্ব্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রার্থের অনুশীলন, গুরুবাক্যের অর্থবোধ, এই দুই উপায়ে তোমাতে সর্ব্বজ্ঞতা স্থিতি লাভ করিবে৫৪।৫৫। শাস্ত্রবাক্যের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ আবৃত্তিও সিদ্ধি লাভের উপায়। তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অভ্যাসনিষ্ঠ হও৫৬।

ভরদ্বাজ বলিলেন, হে মুনে! রাম বশিষ্ঠের পরম উপদেশে যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ তিনি ব্যবহারে রত রহিলেন, ইহার মর্ম্ম কি? জানিতে পারিলে আমি সদা অভ্যাসরত ও ব্যুত্থান কালে ব্যবহাররত হইতে পারিব৫৭।৫৮।

বাল্মীকি বলিলেন, এই সময়ে মহামনা বিশ্বামিত্র ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন৫৯।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে মহাভাগ! হে ব্রহ্মপুত্র! আপনি মহাপুরুষ। আপনি শক্তিপাত,* দ্বারা অতি শীঘ্র গুরুত্ব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ আপনার কৃপাদৃষ্টিতেই ইনি ব্রহ্মসমাধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন৬০। যিনি দৃষ্টির দ্বারা, স্পর্শের দ্বারা ও বাক্যরচনার দ্বারা শিষ্যদেহে শিবশক্তি সমাযোগ করিতে পারেন, তিনিই উত্তম গুরু৬১। এই বিশুদ্ধাত্মা বৈরাগ্যবান্ রামে সে যোগ স্বতঃই বিদ্যমান্, তথাপি ইনি বিশ্রান্তি ইচ্ছায় আপনার উপদেশ শ্রবণ করতঃ উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন৬২। শিষ্যের প্রজ্ঞাই (বুদ্ধিবল) গুরুবাক্যে জ্ঞান লাভের কারণ হয় বটে, পরন্তু যাহাদের মনোমল পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা শত শত গুরুবাক্যেও তত্ত্ববোধে সমর্থ হয় না৬৩। যাহারা উত্তম শিষ্য অর্থাৎ অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই শিষ্যেই গুরুবাক্য সফল। গুরু ও শিষ্য, উভয়ে যদি যোগ্য হয়, তবে তত্ত্ববোধ সহজ সিদ্ধ হইয়া থাকে৬৪। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি রামকে ব্যুত্থিত করুন, অর্থাৎ রামকে

* শক্তিপাত। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে অর্থাৎ জীব শক্তি চক্রাষ্টক ভেদ করাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ শিবতত্ত্বে মিলাইয়া দেওয়া।

নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে আকর্ষণ করুন এবং ব্যবহার যোগ্য করুন। কেন না, আমরা কার্য্যার্থী, রামের দ্বারা আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। আমার যে কার্য্য (যজ্ঞ সিদ্ধ করা), তাহা স্মরণ করুন এবং তদ্ব্যতীত অনেক দেবকার্য্যও রামের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সে সকল যেন বৃথা না হয়[৬৫,৬৬]। হে মুনে! দেবতাদের জন্যই রামের অবতার, তাহা যেন অন্যথা না হয়। আমি আমার সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যাইব। রাম রাক্ষস বিনাশ করিবেন। তৎপরে অহল্যার শাপ মুক্ত করিবেন, তৎপরে হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিবেন। অনন্তর পরশু-রামের দর্প বিনাশ করিবেন[৬৭।৬৮।৬৯]। ক্রমে পিতৃ পিতামহের রাজ্যে নিস্পৃহ হইয়া বনবাস আশ্রয় করিবেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কার্য্য রামের দ্বারা সম্পন্ন হইবেক। ইনি অনেক তীর্থস্থান নিষ্কণ্টক করিবেন এবং বিবিধ প্রাণীর উদ্ধার করিবেন। ইনি সীতাহরণের দুর্গতি দেখাই-বেন ও রাবণাদি রাক্ষসকে বধ করিবেন। যুদ্ধমৃত বানরদিগের প্রাণদান, সীতার পরীক্ষা ও জীবন্মুক্ত হইলেও ইনি লোকশিক্ষার্থ ক্রিয়াকাণ্ডে রত হইবেন[৭০।৭১।৭২।৭৩]। এক স্থানে জ্ঞানের ও কর্ম্মের সমন্বয় প্রদর্শন করিবেন এবং যাহারা ইঁহাকে দেখিবে, যাহারা ইঁহাকে স্মরণ করিবে, যাহারা ইঁহার কথা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগকে ইনি মুক্তি প্রদান করিবেন। লোকত্রয়ের অশেষ কার্য্য এই মহাপুরুষ রামের দ্বারা সাধিত হইবেক এবং আমারও যজ্ঞ-সিদ্ধিরূপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবেক। আমি ইঁহাকে নমস্কার করি, হে জনগণ! তোমরাও ইঁহাকে প্রণাম কর, তোমরাও বিনা সাধনে জয়লাভ করিবে। তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় কোন না কোন মহাপুরুষ নির্ব্বিকল্প পদে বিশ্রান্ত হইয়াছ[৭৪।৭৫।৭৬]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রাগুক্ত কথা বলিলে, সভাস্থ লিঙ্গাদি জনগণ ও বশিষ্ঠদেব সকলেই রামপাদপদ্ম স্মরণে মনোনিবেশ করিলেন[৭৭।৭৮]। ভগবান্ বশিষ্ঠ ও অন্যান্য মহর্ষি, সকলেই রামকথা শ্রবণজনিত তৃপ্তির কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না। অর্থাৎ আরও শুনিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিকে বলিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে বিশ্বামিত্র! হে মুনে! আমরা জানিতে চাহি, আপনি বলুন, এই রাজীবলোচন রাম কি? ইনি মানুষ? অথবা অন্য কেহ[৭৯।৮০]?

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন। আমি বলিতেছি, ইনি সেই পরমপুরুষ। ইনি বিশ্বের উপকারার্থ অবতীর্ণ। ইনিই সেই শাস্ত্রবৃহন্তের বেদ্য পূর্ণানন্দ ও শ্রীবৎসলাঞ্ছন। এই রাম সুপ্রসন্ন হইলে সমস্ত প্রাণী সুখ লাভ করিতে পারে[৮১।৮২]। ইনি কোপাবিষ্ট হইয়া সংহার করেন, এবং ইনিই ইচ্ছার দ্বারা সৃজন করেন। ইনিই বিশ্বের আদি, বিশ্বের জনক, বিশ্বের বিধাতা, বিশ্বের ভরণকর্ত্তা[৮৩]। ইনিই সেই বীতরাগ মহাপুরুষগণের অবগাহন স্থান—আনন্দসমুদ্র[৮৪]। কখন ইনি মুক্তপুরুষের ন্যায় আত্মস্থ, কখন তুরীয়পদে স্থিত, কখন প্রকৃতির পরিচালক, কখন বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা[৮৫]। ইনিই বেদপুরুষ ও গুণাতীত। ছয় বেদাঙ্গ ইঁহাকেই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে[৮৬]। ইনিই সেই চতুর্ভুজ বিষ্ণু, ইনিই বিশ্বের স্রষ্টা চতুর্মুখ এবং ইনিই সেই সংহার কর্ত্তা মহাদেব[৮৭]। ইঁহার জন্ম মরণ নাই, সেই জন্য ইনি অজ। অথচ মায়াসংযোগে জন্মবান্ হন। এই বিশ্বরূপী সদা জাগরূক ভগবান্ উক্ত প্রকারে বিরূপ। পরাক্রম যেমন জয় বহন করে, তেজ যেমন প্রকাশ করে এবং শাস্ত্র চর্চ্চা যেমন প্রজ্ঞার উৎকর্ষ বহন করে, তেমনি গরুড় ইহাঁকে বহন করে[৮৮।৮৯]। এই দশরথ রাজাও ধন্য। কেননা, যিনি পরমপুরুষ, তিনি ইহাঁর পুত্র। আর দশবদন রাবণও ধন্য। কেননা, ইনি তাঁহাকে আপনার প্রতিযোদ্ধা জ্ঞানে চিন্তা করিয়াছেন[৯০]। হায়! স্বর্গ আজ ইহাঁর পরিত্যাগে শূন্য, পাতালও শূন্য। ইহাঁর আগমনে আজ এই মর্ত্তলোক ধন্য[৯১]। যিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্, তিনি আজ রামরূপে এতল্লোকে অবতীর্ণ[৯২]। যোগিগণ জানেন, ইনি জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন। কিন্তু আমরা জানিতেছি, ইনি মনুষ্যরূপী[৯৩]। ইনি রঘুরাজার পাপ ক্ষয়কারী। হে বশিষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ইহার কৃপায় ব্যবহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাক[৯৪]।

বাল্মীকি বলিলেন, মহামুনি বিশ্বামিত্র ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া বাক্যবিশ্রান্তি অবলম্বন করিলেন। পরে মহাতেজা বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন[৯৫]।

বশিষ্ঠ বলিলেন, হে মহাবাহু রাম! হে চিন্ময় মহাপুরুষ! এখনও তোমার বিশ্রামের কাল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং তুমি এক্ষণে

লোকসমূহের আনন্দ বর্দ্ধন কর[৯৬]। লোকসকল যাবৎ না উত্তম অধিকার লাভ করে, তাবৎ যোগীদিগের নির্বীজসমাধি অবলম্বন বিধেয় নহে[৯৭]। হে পুত্র! নশ্বর রাজ্যবিষয়ের পরিচালনা কর, দেবতাদিগের অভিলষিত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ কর এবং সুখে অবস্থিতি কর[৯৮]।

বাল্মীকি বলিলেন, বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলেও রাম কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না, সমাধিলীন হইয়াই রহিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ বশিষ্ঠ যোগবলে সুষুম্না পথে তদীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। বায়ু যেমন বীজ মধ্যে লোকের অলক্ষ্যে প্রবিষ্ট হয়, হইয়া তাহা অঙ্কুরিত করে, বশিষ্ঠও সেইরূপ দর্শকগণের অলক্ষ্যে রাম শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন[৯৯]। প্রথমে তিনি শরীরস্থ প্রাণাদি পদার্থের মূলস্বরূপ আধার শক্তিতে অর্থাৎ কুণ্ডলিনী স্থানে, পরে প্রাণস্থানে, তৎপরে মনঃস্থানে, তৎপরে তত্রস্থ চিদাভাসে অর্থাৎ জীবতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমুদায় নাড়ীছিদ্রে সঞ্চরণ করিয়া তদীয় জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছা, সমুদায় সামর্থ্যকে সুপুষ্ট করিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল, তিনি দেখিলেন, গুরুদেব বশিষ্ঠ ও অন্যান্য সভাগত পুরুষ সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে এবং আপনার ব্যুত্থান অবস্থা আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে[১০০]। অতঃপর রামচন্দ্র গুরুদেব বশিষ্ঠ মহর্ষির বাক্যনিচয় শ্রবণ করত: মনে মনে চিন্তা করিলেন, গুরুবাক্য অবশ্য পালনীয়[১০১]।

পরে বলিলেন, আমি আপনার প্রসাদে বিধি নিষেধের অতিবর্ত্তী হইয়াছি। তথাপি, গুরু যাহা বলিলেন, তাহা আমার করণীয়[১০২]। হে মুনিবর! বেদ, আগম, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিহিত আছে, গুরুবাক্যই বিধি, যাহা তাহার বিপরীত তাহাই নিষেধ[১০৩]। করুণানিধান রাম ঐ বাক্য বলিয়া গুরুদেব বশিষ্ঠের চরণদ্বয় শিরোপরি ধারণ করিলেন এবং সভাগত জনগণকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরাম বলিলেন, তোমরা সকলে শ্রবণ কর। তোমাদের মঙ্গল হইবে। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই[১০৪।১০৫]।

সিদ্ধগণ বলিলেন, হে রাঘব! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই সকলের মনে নিশ্চয় আছে, সেই নিশ্চিতার্থ আজ্ তোমার প্রসাদে দৃঢ়ীকৃ

হইল[১০৬]। হে মহারাজ! হে রামচন্দ্র! তুমি সুখী হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। এক্ষণে আমরা বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া যথাগত স্থানে গমন করি[১০৭]।

বাল্মীকি বলিলেন, সভাসদ্গণ ঐরূপ বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন, পরে রামচন্দ্রের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল। হে ভরদ্বাজ! আমি তোমাকে সমুদায় রাম কথা বলিলাম। তুমি এই সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া সুখী হও। রঘুপতি রামের সিদ্ধিলাভঘটিত এই সকল কথা তোমাকে বলিলাম। এ সকল মুনিবরের কথিত, ইহা সমুদায় কবির ও যোগীর সেব্য। ইহাই পরমগুরু পরমেশ্বরের দয়ায় মুক্তিপথের প্রদর্শক। রাম ও বশিষ্ঠ উভয়ের এই সকল কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে বিমুক্ত ও ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়[১০৮।১০৯।১১০।১১১]।

অষ্টাবিংশোত্তরশততম সর্গ সমাপ্ত।

নির্ব্বাণ প্রকরণে পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপ্ত।